নব্যভারত

ষড়বিংশ খণ্ড।

জাতীয় মহাসমিতির পরিণাম।

বিগত ৫ই ও ৬ই বৈশাখ, শনি ও রবিবার, (১৩১৫) এলাহাবাদ সহরে,জাতীয় মহাসমিতির শেষ অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এতদিনও আশা ছিল, সুরাটের ভাঙ্গা কংগ্রেস আবার সম্মিলিত হইবে, কিন্তু সে আশা নির্ব্বাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ বঙ্গের নেতাগণ পরাজিত হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন। তাঁহারা প্রভূত চেষ্টা করিয়া পরাজিত হইলেন, কিন্তু স্বদেশের এক শ্রেণীর লোকেরা অন্য অর্থ করিতেছেন। "যার জন্য করি চুরি, সেও বলে চোর"—এই কথাটী তাঁহাদের জীবনে বর্ণে বর্ণেসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। "বন্দেমাতরম" ও "অমৃতবাজার পত্রিকা"গালাগালি বর্ষণ করিয়া অস্থির করিয়া তুলিতেছেন।* কনভেনসনের অধিবেশনের পূর্ব্বে, নবশক্তিতে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের কালীঘাটের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল—"যদি মিটমাট হয় ত ভালই, যদি না হয়,তাহা হইলে হাম বা বসন্ত লাট খাইয়া গেলে শরীরের যেরূপ সঙ্কট হয়, দেশের অবস্থাও তদ্রূপ হইবে। জাতীয় মহাসমিতি হইতে কেহ কাহাকেও জোর করিয়া বিচ্যুত করিতে পারে না। মিটমাট না হইলে, চরমপন্থীগণ হয় ত জোর করিয়া কংগ্রেস মণ্ডপে প্রবেশ করিবে এবং একখানির বদলে এবার সহস্র সহস্র জুতার অভিনয় হইয়া যাইবে। কিম্বা মেদিনীপুরের ঘটনার মত, মধ্যপন্থিগণ, রাজশক্তি তথা পুলিশ ও মিলিটারি শক্তির আশ্রয় লইয়া কংগ্রেস করিবে। তখন যে অশান্তি নিরারণ কল্পে এই সকল অবৈধ উপায় অবলম্বিত হইবে, সেই অশান্তি কোটী গুণে বর্দ্ধিত হইবে। বিশ্বত্রাস অত্যাচারের ঘাত প্রতিঘাতে দশদিক স্তম্ভিত হইয়া যাইবে।"*

রাম না হইতে রামায়ণ কীর্ত্তনের ন্যায়, এইরূপে,জুতার লীলা কীর্ত্তিত হইয়াছিল। বৈধ কি অবৈধ, সে বিচার দেশ করুক; আম[illegible] বলিতে চাই, বিপিন চন্দ্র, কংগ্রেস[illegible] নানাবিধ জাগাইতে বিধিপূর্ব্বক [illegible]ঙ্গলশক্তির বিস্তার এখনকার প্রধা[illegible]ন, তাহাই দেখাইয়াছিলাম, হলে, [illegible]ধিকাংশ জমীদারগণ যে তাঁহাদিগের

* অমৃতবাজার, ২৪শে এপ্রেল (১৯০৮) দ্রষ্টব্য।

ছিলেন, উপরোক্ত মন্তব্য যে তাহার বিরোধী, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। মিলনের মহা শাস্ত্র—প্রেম ; উপরোক্ত মন্তব্যের মধ্যে অপ্রেমের কীর্ত্তিকাহিনীই বিবৃত হইয়াছে। ইহার পর তাঁহার দলের কাগজ কি বলিতেছেন, সকলকেই বিশেষ মনোযোগ সহ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

৯ই বৈশাখ, বুধবার, ১৩১৫, বিদেশী কাগজে মুদ্রিত নবশক্তিতে "নিয়ে আয় ভাই বরণডালার" মন্তব্যের শেষাংশে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"যাহা হউক, অধুনা রাজভক্ত সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যেরা দেশে ফিরিয়াছে। তাই বলি, নিয়ে আয় ভাই বরণডালা। ভাল কোরে বরণ কোরে তাদের যে এখন আঘাটায় নামিয়ে নিতে হবে। সুরাট কংগ্রেসে এক খানি জুতার বরণডালা হইয়াছিল। এবার যেখানে যেখানে এই সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যের সভা হইবে, সেই সেই স্থানে যেন হাজার হাজার জুতার বরণডালা পড়ে। শুধু পড়া নয়, এমন ভাবে পড়তে হবে যে অনতিবিলম্বে যেন রাজভক্ত সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যেরা রাজশক্তির আশ্রয় ভিক্ষা করিতে বাধ্য হয়। তাই বলি,

নিয়ে আয় ভাই বরণডালা,
ফিরে আসে চিকণকালা।"

এইকাগজখানি চরমপন্থীদলের মুখপাত্র রূপে খ্যাখ্যাত এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার নামের সহিত জড়িত ছিল বলিয়া কথাটী উপেক্ষার যোগ্য নহে।

বাঙ্গালা দেশের কতদূর অধোগতি হইয়াছে, উপরোক্ত মন্তব্যটী তাহার দৃষ্টান্ত। অতঃপর সুরেন্দ্র বাবুর বক্ষে ছুরিকাঘাত করিবার ন যে দলের লোকদিগকে উত্তেজিত করা াহা কে বলিতে পারে? হায় ল নিঃস্বার্থভাবে দেশ- মার ভাগ্যে

াসে

অনেক প্রাণের কথা লিখিব, কিন্তু উপরোক্ত মন্তব্যটী পাঠ করিয়া আমাদের দারুণ আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। কাহার ভাগ্যে কখন কি যোটে, কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? কতকগুলি চরিত্রহীন, ভবঘুরে, চঞ্চল-প্রকৃতি যুবক আজ নেতৃত্বের পূজ্য আসন অধিকারে অগ্রসর হইয়াছে! তাহাদের ভাগ্যে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, তাহাই বা কে জানে? উত্তেজনার সময় মানুষ আপন পরিণাম কিছুতেই গণনা করিতে চায় না। তাই এইরূপ মতিভ্রম ঘটে। বর্ত্তমান-যুগে ইতিহাস-রচক ইংরাজের দুর্ব্বুদ্ধি-প্রণোদিত অশেষ প্রকার নির্য্যাতন একথার জীবন্ত দৃষ্টান্ত !!

বিপিনচন্দ্র কারামুক্ত হইয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, কংগ্রেসকে পুনর্জ্জীবিত করিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিবেন। তাহার কিছু দিন পরেই সুরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার দলের কাগজে এইরূপ তীব্র উক্তি প্রকাশিত হইল। তিনি প্রতিবাদও করিলেন না। চেষ্টার পরিণাম দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। বুঝি বা জেল-মুক্ত বিপিনচন্দ্র, কয়েক দিনের মধ্যেই, পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন।

আমরা বাল্যকাল হইতে আবেদন নিবেদনের এবং ইংরাজী-করণ বা সাহেবীপোষণের বিরোধী। চিরকাল আমরা স্বদেশের উন্নতির জন্য স্বদেশীকে বদ্ধপরিকর হইতে পরামর্শ দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু সামান্য কারণে স্বদেশের লোকের আস্পর্দ্ধা এবং দুর্ব্বুদ্ধি এতদূর প্রশ্রয় পাইতে পারে, স্বপ্নেও কখনও চিন্তা করিতে পারি নাই। জাতীয় মহাসমিতির এহেন পরিণাম দুঃখের হইলেও, প্রাদেশিক এবং জেলা সমিতি সমূহ জাগ্রত থাকিলে তত নিরাশার কারণ নাই; কিন্তু একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, যে

দলাদলিতে জাতীয় মহাসমিতির পরিণাম এই রূপ হইল, সেই দলাদলি কিছুতেই পোষণ করা যায় না;—ইহা ইংরাজের বিভাগ-নীতিকে জাগ্রত রাখিয়া এদেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। অতি অল্প দিনের মধ্যেই দেখা যাইতেছে, দেশের উন্নতি সুদূর-পরাহত হইয়া পড়িতেছে;—বয়কট আর নাই বলিলেই চলে,—চতুর্দ্দিকে আবার বিদেশী অবাধে চলিতেছে;—এখন সকলে দলাদলি লইয়াই মত্ত হইয়া উঠিতেছেন! কলিকাতার "মেলা" হইতেই এই দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে। এই দলাদলি দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া ছাড়িবে। হায়, ভারতভূমি, তোমার পরিণামে কি আছে? ঘরের শত্রু সিরাজের পতনের কারণ, ঘরের শত্রু প্রতাপের পতনের কারণ, ঘরের শত্রুই ভারতের সর্ব্ব প্রকার বিনাশের কারণ। ঘরের শত্রুই আবার এযুগে, ভারতের সর্ব্বনাশের কারণ রূপে সমুপস্থিত হইল!! হায়, দুঃখের কথা কাহাকে বলিব?

কংগ্রেস, ভারতে আর কিছু করিয়া না থাকিলেও, জাতীয় একতা যে আনয়ন করিতেছিলেন, এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। অসংখ্য টাকার বিনিময়ে, কংগ্রেস, ভারতে জাতীয় একতা-শক্তিকে জাগ্রত করিয়া সকলের পূজ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু যাহার দোষেই হউক, এই কংগ্রেসই, অমিলন-অলক্ষ্মীকে আনয়ন করিলেন! এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া কোন্ সহৃদয় স্বদেশহিতৈষীর প্রাণে বজ্রাঘাত হয় নাই? মনে হয়, ভারতের সর্ব্বনাশ ঘনাইয়া আসিতেছে।

আমরা কখনও পা-চাটার দলভুক্ত হই নাই। আমরা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বা তিলক, মেটা, বা গোখলে, কাহারও সহিত পরিচিত নই। আমরা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া, চিরকালই, মেটাকে দেশ-বৈরী পা-চাটার-দলভুক্ত বলিয়া বুঝিয়াছি; এবং ইহাও বুঝিয়াছি, প্রথমবার বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়াই গোখলে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, তিনি প্রভূত ক্ষমতাশালী হইলেও, দেশের অকৃত্রিম বন্ধু নহেন। ওয়েডারবরণ, হিউম, কটন প্রভৃতি, ইংরাজ রাজত্ব যায়, কখনও ইহা দেখিতে বা ভাবিতে ইচ্ছুক নহেন। গোখলে এই দলভুক্ত যেদিন হইতে, সেই দিন হইতে বুঝিয়াছি, তিনিও পা-চাটা-দলের অন্যতম সভ্য। সুতরাং দেশ-যজ্ঞে-আহূত "নববলি"র দলে তাঁহার সম্মান পাওয়া কখনও সম্ভবপর নয়। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ এবং তিলক—উভয়ই ভারতের পূজ্য, অকৃত্রিম স্বদেশ-হিতৈষী,—এদেশের অপ্রতিদ্বন্দী নেতা। বিনা কারণে বা সামান্য কারণে এই দুই নেতাকে সম্মান-চ্যুত করিলে পাপ প্রশ্রয় পায়। যেরূপে হউক, এই দুই শক্তিকে সম্মিলিত রাখাই দেশের মঙ্গলের পথ। অন্য পথ বা উপায় নাই।

ইচ্ছা করিলেই কেহ নেতৃত্ব পদ পায় না। বিধাতার নির্দ্দেশে, দেশের মঙ্গলের সমবেত-ইচ্ছা-শক্তি যেখানে কেন্দ্রীভূত হয়, সেই খানেই নেতার অভ্যুদয় সম্ভব। সুরেন্দ্রনাথ বা তিলক—অনেক পুণ্যের বলে, বিধাতার নির্দ্দেশে, এদেশের সমবেত-শক্তি-সাগরের মহা-তরঙ্গ রূপে সমুত্থিত। যিনি ইঁহাদিগের কাহাকেও উপেক্ষা করিবেন, তিনি ... নানাবিধ মহা শত্রু।

... মঙ্গলশক্তির বিস্তার
সুরেন্দ্রনাথ ... ন, তাহাই দেখাইয়াছিলাম,
তেছেন
অধিকাংশ জমীদারগণ যে তাঁহাদিগের
ছে

আর কিছুই নাই। অনাবিল স্বদেশহিতৈষণার প্রকট মূর্ত্তি—সুরেন্দ্রনাথ। চরিত্রহীনদিগের কথা বলিও না,—সুরেন্দ্রনাথের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র আমাদের সকলের চিরপূজার যোগ্য। তিনি উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শয়নে স্বপনে—কেবল দেশের চিন্তাই করিয়া থাকেন। তাঁহাকে যে জন অবহেলার চক্ষে দেখিতে ইঙ্গিত করে, সে কুলাঙ্গার এদেশের মহাশত্রু।

সুরেন্দ্রনাথের কোন দোষ নাই,বা ছিল না, একথা আমরা বলিনা, মানুষ মাত্রেই দোষ আছে এবং থাকা সম্ভব। থাকে থাকুক;—আমরা মহত্বের উপাসক—প্রতি জনে কেবল মহত্বই গণিব, মহত্বই দেখিব। মানুষের মহত্ব স্মরণেই মহত্বের উদয় হইবে। মহত্বের পথে হাঁটিতে হাঁটিতে আমরাও মহত্ব-সাগরের তীরে উপনীত হইব। হংস যেমন জল পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ করে, আমরা ব্যক্তির দোষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুণের অনুসরণ করিব। এই খানেই মিলনের পথ, এখানেই প্রেমের অভ্রান্ত গীতা-ভাগবত সংরচিত। অপ্রেম, কুজ্ঞান, পরনিন্দা, অমিলনের মহা শত্রু। পায়ে ধরি, তাহা হৃদয়ে পোষিও না, রাখিও না, ধরিও না। উহা কেবল অধীনতার শৃঙ্খলেই ভারতকে আবদ্ধ করিবে।

কিন্তু সামান্য ব্যক্তির কথা কে শুনিবে? বিভিন্ন দলের লোকেরা,আপন আপন ব্যক্তিত্বকে, পরন্তু আপন২ দলকে জাগাইয়া রাখাকেই মঙ্গলের পথ মনে করেন। তাঁহারা [illegible]ত্রে তাহা সাধন করিতেছেন। এই [illegible] পতন হইল; এই জন্যই [illegible] আসিল! ভারত [illegible]। এই [illegible]র

পূর্ব্বাভাস? আমাদের একজন বিশিষ্ট সহৃদয় বন্ধু একদিন বলিতেছিলেন;—"আর বেশী বিলম্ব নাই, "স্বরাজের" দিন আসিল আর কি? আরো বলিয়াছিলেন,—"স্বরাজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট, দেখিতেছেন না, আপনাদের মধ্যেই বিচরণ করিতেছেন।" তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাটই বটেন! বালকের করতালিতে উৎফুল্ল যে জন, সে হইবে সম্রাট! যে জন চরিত্রে হীন এবং অপ্রেমে নবীন, যে জন ভয়ে সদা বিহ্বল এবং অহঙ্কারে আত্মহারা, যে কাজে অপটু এবং বচনে সু-পটু, যে স্বার্থত্যাগে অক্ষম ও আত্মঘোষণায় দিগ্বিজয়ী, এবং যে অসংযত এবং অনুদার, সে হইবে সম্রাট! সিজার এবং রিয়াঞ্জির পরিণাম যাঁহারা জানে, তাঁহারা ঐ কথা শুনিয়া হাস্য বই আর কি করিতে পারেন?

স্বাধীনতা কাহাকে বলে? যে স্ব-অধীন, সে-ই স্বাধীন। যে ইন্দ্রিয়ের অধীন, রিপুর অধীন, যে সংসারের অধীন, সমাজের অধীন, সে কখনও স্বাধীন নয়। আত্মজয়ে যে অক্ষম, সংসার জয়ে যে অসমর্থ, যে অহঙ্কারে ধরাকে শরার ন্যায় জ্ঞান করে, সে কখনও স্বাধীন নয়। সর্ব্বাগ্রে মহাসংগ্রাম—প্রতি মানুষের রিপুরূপী আত্মা ও সংসাররূপী সমাজের সহিত; এই দুই সংগ্রামে যে জয়ী, সে একদিন স্বরাজের আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে। Spiritual freedom;—নৈতিক স্বাধীনতা যাহার অর্জ্জিত হয় নাই—সে কি করিতে পারে? কবি বলেন—

"রিপুর অধীন যেবা বার মাস
স্বদেশ উদ্ধার তার কর্ম্ম নয়।"

স্বদেশ-উদ্ধার-ব্রত—বালকের নৃত্য নয়।

সংসারজয়ী, আত্মজয়ী, স্বার্থজয়ী, সংযত-বীর ভিন্ন কেহই স্বাধীনতার রাজ্যে যাইতে পারিবে না। যদি তাহা সম্ভব হইত, নেপোলিয়নের দর্প কখনও চূর্ণ হইত না। নেপোলিয়নের জীবন সমালোচনা করিয়া মহাত্মা এমারসন বলিয়া গিয়াছেন,—

"So, this exorbitant egotist narrowed, impoverished and absorbed the power and existence of those who served him ; and the universal cry of France and Europe, in 1814, was "enough of him" : "assez de Bonaparte." It was not Bonaparte's fault. He did all that in him lay, to live and thrive without moral principle. It was the nature of things, the eternal law of the man and the world, which balked and ruined him ; and the result, in a million experiments, would be the same."

কঙ্গ্রেস,নীতি ধর্ম্ম ভুলিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন ;—পরিণামে বিবাদ বিসম্বাদ তাহার স্থান অধিকার করিল ;—স্বরাজের দলও যদি এইরূপ ভাবে চলিতে থাকেন, নিশ্চয় পতন অনিবার্য্য। যাহা হইবার হইয়াছে—আমাদের সকল আশা ভরসা কর্ম্মীর দল ভলান্টিয়ারগণ। তাঁহাদিগের নিকট করযোড়ে নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা সকলে ফিরিয়া দাঁড়ান ;—ভাবুন, চিন্তা করুন, সংযত-বাক্ ও জিতেন্দ্রিয় হউন, তৎপর অগ্রসর হউন। তাঁহারাই দেশের আশা ভরসা। মহা সাধনা, এবং স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগের দিন আসিয়াছে। সকলে ধীর এবং স্থির চিত্তে—সংযমের সাধনায় প্রবৃত্ত হউন। চাঞ্চল্য, অধৈর্য্য, অহঙ্কার, অপ্রেম, অজ্ঞান, স্বার্থ, ব্যক্তিত্ব সকল নিরঞ্জনা-তটে চিরতরে নির্ব্বাপিত হইলে, তবে ভারতজয়ের যুগ আসিবে। মহা সাধনায় সিদ্ধিলাভের এখনও অনেক বাকী!! বিধাতা সহায় হউন।

জমীদার ও জলাভাব।

সে অনেক দিনের কথা—নব্যভারতে "জমীদারগণের রাজত্ব"সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম। পরে, সেও প্রায় ১১ বৎসর হইল, ঐ সন্দর্ভটী আমার "প্রবন্ধ-লহরী" নামক পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে এক স্থানে যাহা লিখিয়াছি, অদ্য আবার তাহা বলিতেছি—"ধর্ম্মের পথে, উন্নতির পথে মঙ্গলকল্পে হে জমীদারগণ, তোমাদের ক্ষমতা ও প্রভুত্ব অদ্যাপিও অসীম। পূর্ব্বে যেমন তোমরা এক এক জন রাজা ছিলে, এখনও তেমনি আছ। পাপ স্বেচ্ছাচারিতায়, অনিষ্ট সাধনে এখন তেমন স্বাধীন নও বটে, কিন্তু মঙ্গল বিধানে, হিতসাধনে, তেমনি স্বাধীন আছ। মঙ্গলকল্পে তোমার জমীদারীতে তোমার সিংহাসন এখনও তোমার জন্য খালি রহিয়াছে। তুমি ইচ্ছা করিলে এখনও তুমি সেই খানে গিয়া বসিয়া রাজত্ব করিতে পার। তোমার সিংহাসনের পদপ্রান্ত হইতে দয়া ও ধর্ম্মের, জ্ঞান ও জীবনের নির্ঝর নিঃসৃত হউক ; তাহার পবিত্র বারিতে রাজ্য ধৌত ও সিদ্ধ হউক। খাদ্য ও স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সুবিচার বিতরণ হউক। দেখিবে, তোমার প্রত্যেক গ্রাম কেমন এক নবীন দিব্য রূপ ধারণ করিবে।"—কিন্তু এই প্রস্তাবের সহিত, গবর্ণমেণ্টের কোন সংস্রব ছিল না। বঙ্গের জমীদারগণ গবর্ণমেণ্ট-নিরপেক্ষ হইয়া আপনাদিগের প্রজাদিগের নানাবিধ উপকার করিতে নিজের মঙ্গলশক্তির বিস্তার করিতে পারেন, তাহাই দেখাইয়াছিলাম, এবং অধিকাংশ জমীদারগণ যে তাঁহাদিগের

কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছেন না, তাহা উক্ত প্রবন্ধে, এবং "জমীদার সাবধান" শীর্ষক ব্যাখ্যাতে লিখিয়াছিলাম। আমাদের দেশে অধিকাংশ দেশীয় আন্দোলনে একটা কুলক্ষণ দেখা যায়। আমরা বক্তৃতাতে, সংবাদপত্রে, আমাদিগের নিজের দোষ, ত্রুটী, দুর্ব্বলতা, কুমতি, ঔদাস্য প্রায়ই গোপন করি। আমাদের যত উৎসাহ ও উদ্যম, তাহা প্রায়ই গবর্ণমেণ্টকে গালি দিতে বা আক্রমণ করিতে ব্যয় হইয়া যায়। যাঁহারা আমাদিগের বাক্যে কিছুমাত্র বিচলিত নহেন, আমাদের যুক্তিতে কখন কার্য্যের গতি পরিবর্ত্তন করেন না, আমরা তাঁহাদিগের নিকট আবেদন ও নিবেদন করিতেই সতত ব্যস্ত। আর আমরা নিজের চেষ্টাতে যাহা করিতে পারি, নিজের উদ্যোগে দেশের যে উপকার করিতে পারি, সে বিষয়ে আমরা নির্ব্বাক্ থাকি। কেবল নির্ব্বাক্ থাকিলেও ভাল ছিল। আমরা আমাদের দুর্ব্বলতা ও দোষ সমর্থন করি। যাহা প্রত্যক্ষ দেখি, তাহাও দোষ বলিয়া স্বীকার করি না। এই বৈশাখ মাসে জলাশয় অভাবে গরীব গ্রামবাসীদিগের কণ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, গরীব প্রজা কলেরায় মরিতেছে, গাভী শুষ্ক পুষ্করিণী তটে আসিয়া নীরবে তাকাইয়া রহিয়াছে, কৃষক-কুলবধূগণ বহুদূর হইতে জল লইয়া কলস কক্ষে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্লান্তপদে কুটীরাভিমুখে মন্থর বেগে যাইতেছে —হায়! যে সকল গ্রামে পূর্ব্বে স্বচ্ছ, সুশীতল, প্রফুল্ল কমল-রাজিত গভীর-বারিপূর্ণ-সরোবরে সুশোভিত হইয়া, স্বাস্থ্য-শান্তি-ধাম ছিল, এখন সে সব শুষ্ক বা কর্দ্দমময় উদাপান—এখন সে সকল জলশূন্য বা পঙ্কময় বাপী, তৃষ্ণাতুর গ্রামবাসীগণকে শুধু নির্দ্দয়ভাবে উপহাস করিতেছে, এবং এ দেশের ধনী ও শিক্ষিতদিগের হৃদয়হীনতার ও পাপের সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু প্রায়ই যখন দেশে জলাশয়ের অভাব সম্বন্ধে সংবাদ পত্রে আলোচনা হয়, তখনও এ বিষয়ে আমাদিগের নিজের যে কিছু কর্ত্তব্য আছে, তাহার চিহ্ন মাত্র পাওয়া যায় না। জমীদারগণ কৃষকের শ্রমোৎপাদিত ধনে, সুখে ও আরামে, দিন অতিবাহিত করেন। কিন্তু এই পানীয় জলের অভাব সম্বন্ধে তাহাদের অধিকাংশের যে কিছু মাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য আছে, তাহার নিদর্শন বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সকল সংবাদ পত্রের সম্পাদক আপনাদিগকে প্রজাদিগের বন্ধু বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, দুঃখের বিষয়, তাঁহারাও এইরূপ কর্ত্তব্য কার্য্যে জমিদারদিগের প্রবৃত্তি দিবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, তাঁহারা, জমীদারদিগের অবস্থা মন্দ, তজ্জন্য জমীদারগণ সাধারণের মঙ্গলজনক কার্য্য করিতে অসমর্থ, গবর্ণমেণ্ট যখন পবলিক-ওয়ার্কস-সেস লইতেছেন, তখন জমীদারগণই জলাশয়ের জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া প্রজা বাঁচাইবেন—ইত্যাদি নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা বলিয়া, সাধারণ-জন-মঙ্গল-বিমুখ জমীদারগণকে পুণ্যকার্য্যে আরও অপ্রবৃত্তি দিয়া থাকেন। এই সকল সংবাদ পত্রে লেখা হইয়া থাকে যে, অধিকাংশ জমীদারের অবস্থা মন্দ। কিন্তু যাঁহাদের অবস্থা ভাল, যাঁহারা বৎসরে অর্দ্ধ লক্ষ বা এক লক্ষ টাকার অধিক খাটী মুনাফা লাভ করেন, এবং ঋণী নহেন, তাঁহাদেরও যে এ বিষয়ে কর্ত্তব্য কার্য্য কিছু আছে, তাহাও কেন লেখা হয় না? আমরা কি চোখের উপর নিত্য দেখিতে পাই না যে, কত ধনী ও অঋণী জমীদার,

বৃথা বিলাসে, মিছা আড়ম্বরে, দম্ভে,-বিদ্বেষজাত মামলা মোকদ্দমায়, সাহেব-পূজায়, ক্ষিপ্ত-খেয়ালে কত কত রাশি রাশি টাকা অপব্যয় করিতেছেন, কিন্তু যখনই কোন গ্রামে জলাশয় খনন করা আবশ্যক, তখনই তাঁহাদের ভাণ্ডারে ধন থাকে না, তখন তাঁহাদের সংসার, এই দুর্ম্মূল্যের দিনে, অতিকষ্টে চলিতেছে, তাঁহারা এইরূপ অনুভব করেন, এবং নিজের বিবেককে অনায়াসে এইরূপ প্রবোধ দেন। জমীদারদিগের অসার আমলাগণ খোসামোদ করিয়া এইরূপ বলিতে পারে যে, দুর্ম্মূল্যের দিনে জমীদারগণের নিজেদেরই চলে না, তার উপর আবার পুষ্করিণী কূপ খনন করিবে কেমন করিয়া। কিন্তু সংবাদ পত্রের স্বাধীন সম্পাদকগণ, যাঁহারা গরিব প্রজাগণের উপকার করিবার ব্রত লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কেমন করিয়া জমীদারদিগের পক্ষে ঐ কথাটী অনুমোদন করেন, কেমন করিয়া পুণ্যকার্য্যে প্রবৃত্তি না দিয়া, পাপ-ঔদাস্যের পোষকতা করেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সমর্থ জমীদারগণ যদি প্রতি বর্ষে একটী করিয়াও জলাশয় খনন করেন, অথবা পুরাতন জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করেন, তাহা হইলেও দেশে ক্রমে কত জলাশয় হইয়া যায়। মনে করুন,আপনি কাহাকে খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য বাজারে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু সে বাজার হইতে খাদ্যদ্রব্য আনিল না, আপনি পথ চাহিয়া চাহিয়া থাকিলেন, সে আসিল না —তখন কি তাহার উপর রাগ করিয়া সপরিবারে উপবাস করিবার জন্য প্রস্তুত হন, না ঘরে যদি কোন খাদ্য থাকে, তাহা সংগ্রহ করিয়া আহার করেন? আপনার কথা দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে কর্ত্তব্যকার্য্য করাইতে পারিবেন, যদি আপনার বিশ্বাস থাকে, গবর্ণমেণ্টের নিকট, মামুলি আবেদন নিবেদন করুন। কিন্তু নিজেদের অথবা সমর্থ জমীদারগণের এ বিষয় যে কিছু কর্ত্তব্য নাই, এ কথা কেন বলেন?

কেবলি জমীদারগণের দোষ নহে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা প্রভূত পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় করেন,তাঁহারা এখন আর পূর্ব্বের মত অর্থের সৎব্যয় করেন না। এখন পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষরোপণ, অতিথিশালা, ধর্ম্মশালা স্থাপন ইত্যাদি সৎকার্য্য করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে সুখশান্তি লাভ করিবার চেষ্টা করেন না। তৎপরিবর্ত্তে স্ত্রীর জড়ুয়া গহনা, নিজের জন্য গাড়ী ঘোড়া, প্রকাণ্ড বাড়ী, তাহার সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে অর্থ ব্যয় করেন, এবং তাহাতে আপনাকে মহৎ লোক মনে করেন। পূর্ব্বে কোন ধনবান ব্যক্তি সৎকার্য্য না করিয়া কেবল বাবুগিরিতে টাকা উড়াইলে, সাধারণ লোকে তাহাকে ঘৃণা করিত, অনেকে বাপান্ত পর্য্যন্ত করিত। এখন সাধারণ লোকে তাহা করে না। কারণ তাহাদিগের মনেতেও ঝুটা বাবুগিরির পাপবীজ ঢুকিয়াছে, প্রায় সকলেই পাশ্চাত্যবিলাসের মোহময় আস্বাদ পাইবার জন্য লালায়িত। তাই দেশের এখন এত দুর্দ্দশা।

যখন এদেশের সাধারণ লোকের মতি গতি ফিরিবে, তখন এ দেশের ধনী লোকদিগের মতি গতি ফিরাইতে বাধ্য হইবেন। এখন বঙ্গদেশের স্বার্থত্যাগী স্বদেশপ্রেমিক তেজস্বী ভলাণ্টিয়ার ছাত্রগণই আমাদিগের দেশের নেতাদিগেরও নেতা ও শাসক। যে নেতাগণের সৎকার্য্য নাই, স্বার্থত্যাগ নাই,

কেবল বক্তৃতা বা আস্ফালন আছে, সৎকর্ম্ম-প্রমুখ তেজস্বী ছাত্রগণ,তাঁহাদিগকে মান্য করা দূরে থাকুক,তাঁহাদের বাহ্য আড়ম্বরে মোহিত হওয়া দূরে থাকুক, প্রকাশ্যে অপমান করিয়া থাকে। বঙ্গের নেতৃত্ব এক্ষণে সুবক্তাগণের বা সুলেখকগণের জন্য নহে। এক্ষণ বঙ্গের নেতৃত্ব কর্ম্মীগণের জন্য, যাহারা কর্ত্তব্যের অনুরোধে সকল সময়ই নির্ভীক ভাবে জেলে যাইতে বা মরিতে প্রস্তুত। সুতরাং এক্ষণ নির্ভীক ও স্বার্থত্যাগী ছাত্র, বলহীন, গভীর পাণ্ডিত্যহীন হইয়াও, বৃদ্ধ, ভীত স্বার্থপরায়ণ পণ্ডিত নেতাগণেরও নেতা ও নিয়ামক হইয়া উঠিয়াছে। আমার বোধ হইতেছে, রাজনীতি ক্ষেত্রে যেমন যুবা ভলাণ্টিয়ারগণই নেতা, তেমনি, প্রজানীতি ক্ষেত্রে ক্রমে ইহারা নেতা হইবে,ইহারাই ক্রমে জমীদারগণেরও নেতা ও নিয়ামক হইবে। ইহারা কৃষকদিগের কুটীরের অঙ্গনে পবিত্র অগ্নি জ্বালিয়া দিবে, তাহা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিবে, তাহার আলোকে যে সকল বুদ্ধিমান জমীদার নিজের পুণ্যপথ খুঁজিয়া লইয়া চলিতে থাকিবেন, তাঁহারাই সম্মানিত হইবেন, পূজিত হইবেন। যাঁহারা এই পুণ্যালোক উপেক্ষা করিয়া, অন্ধ-কার পথে ঘৃণার্হ ভাবে চলিতে থাকিবেন, তাঁহারা সমাজে সম্মান হারাইবেন। তখন জনসাধারণ এবং অনেক ভাল জমীদার বুঝিবেন—"Without the rich heart wealth is but an ugly beggar." তখন ভলাণ্টিয়ারদিগের পুণ্যকার্য্যে, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক প্রদত্ত শিক্ষায়, তাঁহাদিগের স্বার্থত্যাগ মন্ত্রে, তাঁহাদিগের অপূর্ব্ব প্রচার কার্য্যে, যেন যাদুকরের যষ্টির আন্দোলনে, অধুনা জলাভাবক্লিষ্ট গ্রাম সকল গভীর জলপূর্ণ বাপী-শোভিত হইবে।

আশা করা যায়, জমীদারগণ অন্যের প্রদত্ত শিক্ষার অপেক্ষা না করিয়া, স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া, জলাশয় খনন করিয়া, প্রজাপুঞ্জকে জলদান করিয়া, কৃষকগণের হৃদয়ে নিজেদের সিংহাসন স্থাপন করিবেন এবং এইরূপে আপনাদিগের পুণ্য-রাজত্ব দেশে বিস্তার করিবেন।

আমি এ প্রবন্ধে যাহা লিখিলাম, তাহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে,আমি জমীদার-দিগের সম্মান ও গৌরব অনুভব করি না। আমি বঙ্গবাসীতে "জমিদারদিগের নূতন রাজত্বের প্রস্তাব" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে উপযুক্ত জমীদার-গণের হস্তে গবর্ণমেণ্টের শাসন-ক্ষমতা অনেক পরিমাণে দেওয়া উচিত, তাহা লিখিয়াছি এবং জমিদার যাহাতে সুচারু-রূপে এই ক্ষমতা চালনা করিতে পারেন, তজ্জন্য তাহার একটী মন্ত্রীসভা, নির্ব্বাচনদ্বারা গঠিত হওয়ার আইন করা উচিত, তাহাও বলিয়াছি। এই প্রস্তাব এখানে আলোচ্য নহে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

জাতি ও জাতীয় ভাষা। *

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, একদিন, মিসর-দেশীয় কোন প্রাণীতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিত, তাঁহার লেখনী-বিলম্বিত এক মসিবিন্দু দেখাইয়া তাঁহার কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, এই মসিবিন্দুর ভিতর দিয়া ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলে সহস্র সহস্র বৎসরের পূর্ব্বেকার মানব-সমাজের চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। প্রথমতঃ কথাটী কোন যাদুকরের ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারেরই বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে এই গল্পের নিগূঢ় অর্থ উপলব্ধি হইবে। হাজার বৎসর পূর্ব্বে, যে মনোভাব, এক ফোঁটা কালীর সাহায্যে একটী শব্দে প্রতিমূর্ত্তি লাভ করিয়া অমর হইয়া রহিয়া গিয়াছে, আজ, সেই সামান্ত বাক্যের সাহায্যে সেই অতি পূর্ব্ব কালের মনোভাব, ও তৎসঙ্গে সেই সময়কার মানব-সমাজ-চিত্র আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ধরিতে পারা যায়। দৃষ্টান্ত সাহায্যে ইহার প্রমাণ অতি সহজ হইবে। আমরা, দুই বেলা, যে আর্য্য কথাটী ব্যবহার করিয়া থাকি, সেই কথাটাই ধরুন। ইহার ধাতু ঋ, বা অর, অর্থাৎ কর্ষণ করা। পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় মনুষ্যেরা বন্য পশুদিগেরই মত, শিকারলব্ধ জীব জন্তু, বা স্বচ্ছন্দ বনজাত ফল মূল আহার করিয়াই প্রাণ ধারণ করিত। আহার অন্বেষণে একস্থান হইতে অন্যস্থানে, nomadic অবস্থায় বাস করিতে তখন তাহারা বাধ্য ছিল। তখনকার লোকেরা, আজকালের জটাভঙ্গ কমণ্ডলু-শোভিত কৌপীন-পরিহিত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের অপেক্ষাও, পরদিনের সংস্থান বিষয়ে, শতগুণে নিশ্চিন্ত থাকিত। আজ ত এক প্রকারে চলিয়া গেল, পরদিনের শিকারে কিছু মিলিবে কিনা, তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না। সেই সময়ে, যাহাদের মনে, এই অনিশ্চিত জীবনোপায়ের প্রতি বিরাগ সঞ্চার হেতু, একস্থানে স্থির ভাবে বাস করিয়া ভূমি কর্ষণ দ্বারা শস্যোৎপাদন, এই অভিনব প্রথা সর্ব্ব প্রথম উদয় হইয়াছিল, তাহারা নিজদিগকে আর্য্য বা কৃষিজীবী জাতি বলিয়া দীক্ষিত করিয়া অপরাপর লোকদের উপর তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও অনতিবিলম্বে প্রভুত্ব প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। আজ, এই আর্য্য কথাটীর ভিতর দিয়া ভাল করিয়া দেখিলে, আসিয়ার মধ্যদেশেই হউক, আর বল্‌টিক উপসাগরের উপকূলেই হউক —অসভ্য বন্য-মনুষ্য পরিবৃত, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালী, হলচালনশীল আমাদিগের সেই পূর্ব্বপুরুষদিগকে দেখা যায় না কি? অপর একটী কথা দুহিতা। আজকাল দুহিতা অর্থে, বাড়ীর কন্যা সন্তানকেই বুঝাইয়া থাকে,—সে কন্যা সংসারের কোন কাজই করুক, কিম্বা চেয়ারে বসিয়া কারপেটই বুনুক, আর বঙ্কিম বাবুর বিষবৃক্ষই পড়ুক। কিন্তু দুহিতা শব্দের দুহ ধাতুর ভিতর দিয়া দেখিলে, দেখিতে পাইব, সেই বহু পূর্ব্বকালে আর্য্য পরিবারের পরিশ্রমক্ষম পুরুষেরা যেমন বাহিরে ভূমিকর্ষণে নিযুক্ত থাকিত, সেইরূপ, গৃহপালিত গোমেষ মহিষাদি জন্তুর দুগ্ধ দোহন, বাড়ীর অল্প বয়স্কা কন্যাদেরই নির্দ্দিষ্ট

* দিল্লি বঙ্গসাহিত্য-সভার অধিবেশনে পঠিত।

কর্ম্ম ছিল। প্রবীণাদের দ্বারা রন্ধন, বালিকাদিগের দ্বারা দুগ্ধ-দোহন ও যুবকদিগের দ্বারা ভূমিকর্ষণ, পারিবারিক division of labour এইরূপ সুন্দররূপেই পরিচালিত ছিল। তৃতীয় বাক্য,pecus. এই বাক্যটী ইংরাজী pecuniary শব্দেই পাওয়া যায়। এই pecuniary শব্দের অর্থে, আজ কাল, সুবর্ণ বা রজত খণ্ডই বোঝা যায়। কিন্তু pecus, এই শব্দের প্রকৃত অর্থ, গোমেষ মহিষাদি জন্তু। যে সময়কার আর্য্যদিগের কথা আমি বলিতেছি, তখন তাহাদিগের মধ্যে সোণা রূপার টাকা প্রচলিত ছিল না। ক্রয় বিক্রয় গৃহপালিত জন্তু-বিনিময়েই সাধিত হইত। এক্ষণে, জিজ্ঞাসা করি, আর্য্য, দুহিতা ও pecus, এই তিন বাক্যের সাহায্যে, আজ এই ঘরে বসিয়া সেই যুগযুগান্তর অতীত কালের আর্য্য সমাজ-চিত্র চক্ষের উপর আনিতে পারা যায় না কি? পিতামাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র সহবাসে একান্নভুক্ত, গৃহপালিত নানা জাতীয় জন্তুর দুগ্ধ ও মাংস ভক্ষণে পরিপুষ্ট-দেহ, শস্য ধান্য সঞ্চয় হেতু, ভবিষ্যৎ বিষয়ে নিশ্চিন্ত-চিত্ত, তেজস্বী লোকদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী, হাটে বাজারে নানা প্রকার ক্রয় বিক্রয়োপযোগী দ্রব্যের ও নানা প্রকার জীবজন্তুর মেলা—এই প্রকার একটা চিত্র চক্ষের উপর আসে কি না? তাই বলিতেছিলাম, বাক্যের সাহায্যে জগতের পূর্ব্বকার ইতিহাস অনেকটা গঠন করিয়া লইতে পারা যায়। যে সময়ে আর্য্যেরা সভ্যতার কেবল মাত্র সর্ব্ব প্রথম সোপানে অবস্থিত ছিল, তখন তাহাদের মধ্যে Hume, Maculay বা Gardiner জন্মগ্রহণ করেন নাই। তথাচ তাঁহাদের তৎসাময়িক ভাষার যে দুই একটী কথা আজিও পর্য্যন্ত রহিয়া গিয়াছে, সেই সকল সামান্য শব্দের সাহায্যেই পণ্ডিতেরা সেই সময়ের ইতিহাস রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

পৃথিবীর শৈশবাবস্থা হইতে এই পৃথিবীতে কত জাতির, কত প্রাণীর অভ্যুদয় হইয়াছিল, আবার জলবুদ্বুদের মত সময়-স্রোতে তাহারা বিলীন হইয়া গিয়াছে। জগদ্বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত Cuvier সাহেব কেবল মাত্র কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ অস্থির সাহায্যে যেমন কোন বিলয়-প্রাপ্ত হস্তির অপেক্ষাও বৃহৎজন্তুর সমস্ত অবয়ব, এমন কি, তাহার জীবন-ইতিহাস পর্য্যন্ত প্রকটিত করিতে পারিতেন, সেই প্রকার, পূর্ব্বকালে জাতিদিগের যে ইতিহাস তাহাদের ভাষার বাক্যান্তরালে এত দিন পর্য্যন্ত লুক্কায়িত ছিল, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের যত্নে সেই ইতিহাস আজ প্রকাশিত হইতেছে।

রোমানেরা এককালে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর ছিল। যখন তাহারা জয়ডঙ্কা তুলিয়া ভুবনবিজয়ে মত্ত ছিল, তখনকার যে অসমসাহিকতার প্রভাবে রোমানেরা বিশ্বজয়ী হইতে সক্ষম হইয়াছিল, কেবল মাত্র সেই বীরত্বকেই তাহারা virtue বলিয়া জ্ঞান করিত। এই লাটিন বাক্য vir আর আমাদের বীর, ইহাদের মধ্যে বড়ই নিকট সম্বন্ধ। পূর্ব্বকায় রোমানদিগের মুখে virtue অর্থে, কেবল মাত্র বীরত্বকেই বুঝাইত। আর আজ কাল, বিশেষতঃ এই ভারতবর্ষে, যে ভীরু "নেটিভ" শ্বেতাঙ্গ হস্ত-নিঃসারিত চপেটাঘাত এক গালে খাইয়া, অন্য গাল পাতিয়া দেয়, তাহার সেই নীচ সহিষ্ণুতাকে আমরা virtue বলিয়া থাকি। যখন সেই বিশ্বজয়ী রোমানেরা, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের

virtue হারাইয়া, বর্ব্বরজাতিদিগের পদানত হইয়া গেল, তখন হইতে তাহারা গীত বাদ্য-বিশারদ জাতি বলিয়া জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বৃটন পুরোহিতের অভিশাপ পদে পদে ফলিয়াছে।

"Other Romans shall arise,
Heedless of a soldier's name ;
Sounds, not arms, shall win the prize,
Harmony the path to fame."

এখনকার রোমানদিগের সে বীরত্ব, সে বীর্য্য, সে গর্ব্ব নাই। তাহাদের আধুনিক ইটালিয়ান ভাষায় তাহাদের পরিবর্ত্তিত-মনের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের আধুনিক ভাষায় virtuoso অর্থে বীর না বোঝাইয়া পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বুঝায়। সামান্য আবেদন করাকে, umiliare una supplica বলে ; চতুরতার সহিত ঠকাইতে পারিলে, onesta অর্থাৎ respectability খ্যাতি লাভ করা যায়। কোন দ্রব্য ভাল, এই বলিয়া সুখ্যাতি করিতে হইলে, তাহাকে pelligrino অর্থাৎ বিদেশী, অথবা (আমাদের ভাষায়) বিলাতী বলা হয়। ইটালী দেশে, আজকাল সামান্য কুটীরের নাম un palazzo অর্থাৎ রাজপ্রাসাদ। সামান্য দুই চারি পয়সার উপহার, তাহাদের নিকট un regalo অর্থাৎ রাজার মতন দান বোধ হয় ; ভদ্রলোক বুঝাইতে হইলে, una-nomo di garbo অর্থাৎ উত্তম পরিচ্ছদ-বিশিষ্ট মনুষ্য বলা হয় ; সামান্য অন্ন ব্যঞ্জনকে una costa stupenda অসাধারণ খরচ বলা হয় ; আর চাকরকে জুতার দোকানে পাঠাইতে হইলে, una ambasciata অর্থাৎ ambassador বা রাজদূত পাঠান হইল, এইরূপ ভাষা। আমাদের ভারতবর্ষের অধুনা অধঃপতিত মুসলমানদিগের ভাষা হইতে এইরূপ অনেক বাক্য অনায়াসে বাহির করা যাইতে পারে। নবাব, জনাব, হুজুর, আমির, ওমরাহ, দৌলতখানা, ইত্যাদি শব্দের পূর্ব্বকার ও আজ কালের অর্থ মিলাইয়া দেখিলে, ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের অধঃপতনের ইতিহাস জানা যায়। যে সকল জাতির মনের জোর আছে, তাহাদের আত্মসম্মান ও সৌজন্য এরূপ বিসদৃশ ভাব ধারণ করে না, ইহা বলাই বাহুল্য।

যেমন ইটালিয়ান ও উর্দ্দু ভাষার সাহায্যে রোমান ও মুসলমান জাতির উন্নতি হইতে অবনতির ইতিহাস প্রকটিত করা যাইতে পারে, সেইরূপ, সামান্য আরম্ভ হইতে, উন্নতির উচ্চতম শিখরে অবস্থানের ইতিহাস ইংরাজী ভাষা হইতে অতি সহজেই দেওয়া যায়। যখন নরম্যানেরা ইংলণ্ডের অধীশ্বর ছিল, তখন আজ কালের এই গর্ব্ব-স্ফীত এংগ্লো-সাক্‌সনদের এই বিদেশী নরম্যানদিগের পদানত থাকিতে হইত। ইংরাজদিগের তখনকার মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এতদুরই হীন ও ঘৃণ্য ছিল যে, May I became an English-man এই উক্তি নরম্যানদিগের মুখে আত্ম-গ্লানির চরম পরিচয়স্থল ছিল। কিন্তু কয়েক শতাব্দীর পরে, অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দে English-man এই কথাটী কর্ণগোচর হইলে চক্ষের উপর কি চিত্র জাগিয়া উঠে?

Stern o'er each bosom reason holds her state
With daring aims irregularly great,
Pride in their port, defiance in their eye
I see the Lord of Human kind pass by.
Intent on high designs a thoughtful band,
By forms unfashioned—fresh from natures hand
Fierce in their native hardiness of soul
True to imagined right, above control
While e'en the peasant boasts these rights to scan
And learns to venerate himself as Man.

আজ কাল ইংরাজ জাতির চরিত্রগুণে Anglo-saxon এই বাক্যটী "উন্নতিশীল জাতি" এই নূতন অর্থ লাভ করিয়াছে। সেইজন্য অধুনা সুসভ্য জাপানীরা Anglo-saxons of the East নামে ইউরোপে সমাদর লাভ করিয়াছে। এক সময়ে ইংলণ্ডবাসী ইংরাজেরা আমেরিকাবাসী ইংরাজদিগকে ঘৃণা করিয়া Yankee বলিয়া ডাকিত। কিন্তু সেই আমেরিকাবাসী ইংরাজজাতির চরিত্রমাহাত্ম্যে Yankee এই অপমানসূচক শব্দ মাননীয় হইয়া উঠিয়াছে।

জাতি বিশেষের উন্নতি বা অবনতির ইতিহাস ভাষার সাহায্যে জানা যায়, তাহার কারণ, উন্নতি কালের মনের সাহস, উদারতা ইত্যাদি গুণ, আবার অবনত অবস্থার ভীরুতা, নীচতা প্রভৃতি মনের অবস্থা ভাষায় প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। জাতি বিশেষের ও তাহার ভাষার মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রমাণ করিবার জন্য কালাপানি পার হইবার প্রয়োজন হইবে না। আমি এই ভারতবর্ষের ভাষার সাহায্যে ভারতবাসী হিন্দুজাতির ইতিহাস রচনা করিব।

আমরা যে পূর্ব্বকালের উন্নত অবস্থা হইতে আজকাল অধঃপতিত, এ কথা পৃথিবীর কে না জানে? আমরা নিজেই সেই কথা লইয়া যখন তখন গুমোর করিয়া থাকি। আজ কেবল গুটি কয়েক কথার সাহায্যে এই অধঃপতনের ইতিহাস আপনাদের সম্মুখে ধরিব।

এক সময় "ব্রাহ্মণ" এই কথাটীর একটা গুরুতর অর্থ ছিল। যিনি পরমব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। একথা আমরা এখনও স্বীকার করিয়া থাকি। যিনি প্রকৃতই ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি যে সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইবেন, এই পৃথিবীতে তাঁহাকে পরমব্রহ্মের অবতার জানিয়া, লোকে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ডাকিবে ও পূজা করিবে, তাঁহার চরণ-রেণুকা সমাজের যে ললাটভূষণ হইবে, তাঁহার পাদোদক পানে শরীর ও মনের যে পাপক্ষয় হইবে, তাঁহার আগমনে যে গৃহস্থের গৃহ পবিত্র হইবে, তাঁহার উপদেশে যে ইহলোক ও পরলোকে মঙ্গল হইবে, রাজা মহারাজা তাঁহারই পরামর্শানুসারে রাজকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া জনসমাজে অক্ষয়-কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন, ইহাতে অবিশ্বাসের, আশ্চর্য্যের কথা কি আছে? যখন এই হিন্দুস্থান সেই প্রকার ব্রাহ্মণের পদ-চুম্বনে পবিত্র ছিল, ভোগ-সুখ-বিরত, স্বার্থত্যাগী, বিশ্বহিতার্থে চির-যত্নবান, ইহকাল পরকালের জ্ঞানলাভী এই প্রকার নরদেবতাদিগের আবাস, এই হিন্দুস্থান ছিল, তখন এই ভারতবর্ষ এই পৃথিবীতেই স্বর্গধাম ছিল না ত কি? যে সময়ে এরূপ ত্রিকালজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা সমাজের পরিচালক ছিলেন, সে কালে সকলেই ভাল ও ইষ্ট হইতে যে বাধ্য, হিংসা, দ্বেষ, নিন্দা, কলহ, বুদ্ধিভ্রম, কিছুইত হইবার জো ছিল না! "জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মহদ্বাণী তখনকার লোকদের মুখেই শোভা পাইত—কেন না, তখন এ কথায় কিছুমাত্র অসত্য ছিল না। আর আজ কাল ব্রাহ্মণ এই কথাটীর কিরূপ অধোগতি হইয়াছে, তাহা, আজ কাল, যাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাঁহাদের দেখিলেই সম্যকরূপে প্রতীয়মান হইবে। আমার সহিত একজন সন্ন্যাসীর পরিচয় আছে। একদা, কলিকাতায় গঙ্গাস্নানান্তে জল হইতে উঠিবার সময়, অসাবধানতা প্রযুক্ত সমীপোস্থিত কোন ব্রাহ্মণের গাত্রে

জলসিঞ্চন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহাতে সেই ব্রাহ্মণ, রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সন্ন্যাসীকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কি জাত"? তদুত্তরে সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন "আমি চামার"। "চামার! বেটা চামার হয়ে ব্রাহ্মণের গায়ে জল দিলি?" তচ্ছ্রবণে, সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি ব্রাহ্মণ না বামুণ্? এই কথায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন; আর সন্ন্যাসীর চিরানন্দময় প্রসন্ন বদন দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, যে সত্য সত্যই তিনি চামার নহেন। সেই জন্য সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "চামার? আমার সঙ্গে ঠাট্টা? কি জাত ঠিক করিয়া বল্?" সন্ন্যাসী পূর্ব্ববৎ স্থির ভাবেই উত্তর করিলেন, "আমি আপনার সহিত ঠাট্টা করি নাই; আমি সত্য সত্যই চামার; যখন চামড়ার ঘরে বাস করিতেছি, তখন আমি চামার নয় ত কি?" আজকাল ব্রাহ্মণেরা যে "বামুণে" অধঃপতিত হইয়াছেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? আজকাল ব্রাহ্মণ অর্থে কাহাদিগকে বুঝায়, তাহা সকলেই বিশেষ রূপে অবগত আছেন, বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় শব্দ "কুলীন"। কি কি গুণ থাকিলে লোককে এক সময় কুলীন বলা হইত, পূর্ব্বে কিরূপে এই আখ্যা লাভ্ করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আর আজ কালকার কুলীনেরা সেই সব গুণে বিভূষিত কিনা, তাহাও আপনাদের ভালরূপ জানা আছে। তৃতীয় শব্দটী পণ্ডিত। এক সময় সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, শাস্ত্রানুশীলনরত, শিষ্যসমাবৃত আচার্য্যকেই পণ্ডিত বলা হইত। আর এখন? আমি এমন অনেক অনেক পণ্ডিত দেখিয়াছি, যাঁহারা, সংস্কৃত ভাষা বা শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিন, ক, খ, এর পর্য্যন্ত কোন ধারই ধারেন না। আগেকার পণ্ডিতের দৃষ্টান্ত শঙ্করাচার্য্য বা চাণক্য, আর আজ কালের পণ্ডিতজি ছাত্রনিবাসের পাচক—স্বর্গ নরক ভেদ নয় কি? চতুর্থ শব্দ, মহারাজা। *এক সময়কার মহারাজা,*—রত্ন সিংহাসনোপবিষ্ট ন্যায়-দণ্ডশোভিত-হস্ত, প্রজাহিতসাধন তৎপর সমাজ-পরিচালক মহারাজা রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির বা বিক্রমাদিত্য; তাহাতেই পঞ্জিকাতে রাজদর্শনে পুণ্যসঞ্চয়ের কথা আছে। আর আজ কালকার মহারাজা দর্শনে যদি কাহারও অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে, কষ্ট করিয়া, সরযূতীরে বা হস্তিনাপুরে, বা উজ্জয়িনীতে যাইতে হইবে না, বোধ করি, তাঁহার নিজের রান্নাঘরের কোণে এক টুকরা ভগ্ন কাষ্ঠের উপর হুকা হস্তে তাহাকে বিরাজমান দিখিবেন। "কত যে পুণ্য হে তব ভাবি দেখ মনে!" পঞ্চম কথা—মহাশয়। যে মহানুভবের আশয় প্রকৃতই মহৎ ছিল, এককালে তাঁহাকেই মহাশয়, এই গৌরবসূচক আখ্যায় সম্মানিত করা হইত। আর আজকাল! আমরা সকলেই মহাশয়, অথবা "ম'শ'য়" সমাজের কি উন্নত অবস্থাই না হইয়াছে! আমরা আজকাল কতকগুলি ইংরাজী কথা, পরস্পরের প্রতি প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকি; তাহার মধ্যে দুই একটী শব্দের আলোচনা করিব। ইহার মধ্যে Gentleman কথাটী সর্ব্ব প্রথম। যিনি সত্য সত্যই born of geus বা noble ancestry, যাঁহার ধমনীতে উচ্চ বংশের শোণিতের সহিত হৃদয়ে উচ্চ বংশোচিত উচ্চ ভাব বর্ত্তমান, পূর্ব্বে ইউরোপে, তাঁহাকেই Gentleman বলা হইত। এক সময়ে Nature's 'Gentlemanকেই' Gentleman

খেতাব দেওয়া হইত। কিন্তু আজকাল ইউরোপে যেমন, সেইরূপ ভারতবর্ষেও, Gentleman আর প্রকৃতির কারখানায় সৃষ্ট হয় না। Messrs Ranken বা Phelps কোম্পানিদের Tailoring Estallishment তাঁহাদের উৎপত্তি স্থান। দ্বিতীয় শব্দ Martyr। বধ্যভূমিতে, বা অগ্নিশয্যায়, হাসিতে হাসিতে, বক্ষের শোণিত দিয়া নিজ নিজ ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া, সে সকল তেজস্বী পুরুষ বা রমণী, পুণ্যলোকে গমন করিয়াছেন, যাঁহাদের "শির দিয়া, তব্ ধরম নেহি দিয়া" মহাবাক্যে এখনও জগৎ অনুপ্রাণিত, সেই নির্ভীক, তেজস্বী, স্বধর্ম্মপরায়ণ, Dr. Riday বা Father Garnet বা বন্দগুরু বা পদ্মিনী প্রভৃতি সতীরাই এই Martyr নামের যথার্থ অধিকারী ছিলেন। আর আজ, যে স্কুল-পলাতক "বকাটে"ছেলে, গায়ে পড়িয়া, পুলিষের সহিত ঝগড়া বাধাইয়া, রাজদ্বারে বেত্র প্রহারানুগ্রহ পূতপৃষ্ঠ হইতে পারিয়াছে, কিম্বা বড় জোর, দুই এক দিনের জন্য শ্রীঘর তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ফিরিয়াছে,সেই বালকই আমাদের Political Martyr—কত ঘটা করিয়া, নিশান তুলিয়া, সভাসমিতিতে নিমন্ত্রণ করিয়া, স্বর্ণপদক দিয়া তাহাকেই আমরা পূজা করিয়া থাকি। কথিত আছে, কোন বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মা, সাধারণ বৈষ্ণব দেখিয়া, কখনও প্রণাম করিতেন না। তাহাতে কতিপয় আর্কফলা-শোভিত মুণ্ডিত-মস্তক, হরিনামালঙ্কৃত সুগোল-দেহ ভিক্ষোপজীবী বৈষ্ণব তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই মহানুভব তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ভগবান বিষ্ণু একবার বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই বরাহ মূর্ত্তিই চিরদিন আমার নমস্য, কিন্তু তাই বলিয়া, রাস্তার যে সে শূকরকে আমি নমস্কার করিতে পারিব না।" উত্তরটী কঠোর হইলেও,বড়ই সত্য। আগেকার Martyrএরা আমাদের নমস্য, একথা কেনা স্বীকার করিবে? তৃতীয় শব্দ education. এই কথার প্রকৃত অর্থ কে না জানে? প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা, যাঁহার মানসিক শক্তি সকল সম্যকরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে, যিনি সেই মানসিক শক্তি প্রভাবে সর্ব্বকার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়া সফল-কর্ম্ম হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাকেই educated man বলা যাইতে পারে। যে শিক্ষার প্রভাবে মানসিক শক্তি সমূহ পূর্ণবিকাশ পাইতে পারে, এক কথায়, যে শিক্ষায় মানুষ তৈয়ার হয়, সে শিক্ষা এখন কোথায়? তৎপরিবর্ত্তে, সুকুমারমতি বালকদিগের অপরিপক্ক মস্তিষ্কের মধ্যে, সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি কতিপয় শাস্ত্রের কতকগুলি facts জবরদস্তি প্রবেশ করাইয়া দেওয়াই আজকালকার বিধি নয় কি? এরূপ প্রথার যথার্থ নাম instruction; আর বোধ করি, British Government সেই জন্যই ভারতবর্ষের শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তাদিগকে Director of Public Education নাম না দিয়া Director of Public Instruction খেতাব দিয়াছেন। এ কুপ্রথার কল্যাণে, আজকাল,

"Bookfull Blockhead ignorantly read
With load of learned lumber in his head."

আমরা অনেক দেখিয়া থাকি। কিন্তু যাহাকে দেখিয়া Nature might stand up and say here is a man, সেরূপ educated man বড়ই বিরল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ বালককেই আমরা educated man বলিয়া

সম্মান দেখাইয়া থাকি। চতুর্থ কথাটী Professor. ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জরমানি প্রভৃতি শিক্ষিত দেশে, যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিশেষকে সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্বাধীন করিতে পারিয়াছেন, যিনি সেই শাস্ত্রে authority বলিয়া বিদ্বৎ সমাজে সম্মানিত, সেই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, কোন কলেজে শিক্ষা দেন আর নাই দেন, Professor পদবী পাইয়া থাকেন। ঐ সকল দেশে Maxmuller, Dowden, Herbert Spencer, Gervinus, Goldstucker প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত মহাত্মাদিগকেই Professor নামে অভিহিত করা হয়। আর আমাদের এই ভারতবর্ষে, যে লোক, কোন কলেজে, কোন এক শাস্ত্রের দুএক খানি পুস্তক, টীকা সাহায্যে কোন প্রকারে, ছাত্রদিগের মস্তিষ্কাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারেন, তিনি কোন বিষয় বিশেষ সম্যক্ জ্ঞাত বলিয়া Profess করিতে না পারিলেও, Professor বলিয়া জনসমাজে পরিচয় দিয়া থাকেন। ইউরোপের Professor আর আমাদের দেশের Professor-এর মধ্যে কত প্রভেদ, তাহা আপনাদের বুঝাইবার জন্য কেবল এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমি নিজেই একজন Professor। ইহার অপেক্ষা বিশদ বিবরণ আমার ভাণ্ডারে নাই। Lord Maculay যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন, a ship in India is but a boat in England.

ভারতবর্ষের ভাষা সমূহের মধ্যে এরূপ সহস্র সহস্র শব্দ আছে, যাহাদের সাহায্যে, ভারতবাসীর পূর্ব্বকার উন্নত ও বর্ত্তমান কালের শোচনীয় অধঃপতিত অবস্থা প্রমাণিত করিতে পারা যায়। কিন্তু আশা করি, যে কয়েকটী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতেই আমাদের অধঃপতিত অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। যে দেশে, তেজহীন ব্রহ্মণ্যের নির্ব্বিষ খোলস পৈতা মাত্র সম্বল, অনাচারী, পরগৃহে নিমন্ত্রণ-গ্রহণ-পেশাবলম্বী নিরক্ষর লোকদিগকে, যে মহাবাক্য একসময় বিশ্বামিত্র মুনিকে দান করিতে সমাজের মনে সঙ্কোচ আসিয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণ শব্দ প্রয়োগ করা হয়, যে দেশে মহারাজ বলিলে মাসিক চারি টাকা বেতন-ভোগী চৌর্য্যাপরাধী কলুষিত পাচক বুঝায়, যে দেশে জামা কাপড় পরিতে পারিলেই, una nomo di Garbo হইলেই, Gentleman হওয়া যায়, যে দেশে Martyr অর্থে, স্কুল-পলাতক "বকেটে"ছেলে, বৈষ্ণব অর্থে কৌপীনধারী স্থূলোদর Sturdy beggar, আর educated man এবং Professor অর্থে মূর্খকে বুঝায়, সে দেশের লোক যে বড়ই অধঃপতিত, এবিষয়ের অন্য কি সাক্ষ্যের প্রয়োজন?

হিন্দুজাতির এই অবনতির ইতিহাস, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত হইতেও প্রকটিত হইতে পারে; আমি কেবল ভাষার সাহায্যে তাহা প্রতিপন্ন করিলাম। আমাদের মধ্যে অনেকেরই এইরূপ ধারণা, যে দৈব দুর্বিপাকে মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আসিয়াছিল বলিয়াই, আমরা যেন accidentally, যেন নিতান্ত নিরপরাধেই পরপদানত ও অধঃপতিত হইয়াছি। ইংরাজ এদেশে আসিয়াছে বলিয়াই, আমরা পরাধীন, নহিলে বোধ করি, আমরা আজও স্বাধীন ও উন্নত থাকিতাম। ইহার অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর নাই। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে বেশ উপলব্ধি হইবে যে, কোন জাতি যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তঃসার-শূন্য না হয়, ততক্ষণ কেবল মাত্র বাহিরের আক্রমণে পরাভূত হয় না।

স্বধর্ম্মচ্যুত না হইলে কোন জাতি কখনই পতিত হয় নাই। শরীরের ভিতরের অবস্থা খারাপ না হইলে, কেবল মাত্র বাহিরের Bacillus, প্লেগ কি বসন্ত কি কলেরা আনিতে পারে না। ইহ জগতে, সকল জিনিষই—কি জড় পদার্থ, কি উদ্ভিদ, কি পশু, আর কি মানুষ, এই বিশ্ব নিয়মাধীন।

'Twere long to tell and sad to trace
Each step from splendour to disgrace
Enough—no foreign foe could quell
Our spirit, till from it self it fell
Yes ! self abasement paved the way
To villain bonds and despot sway.

হিন্দু জাতির এই স্বধর্ম্মত্যাগের—এই self-abasementএর পরিচয়, হিন্দুজাতির রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যের ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায়; "নড়িলে হীরক যথা পড়ে ঠিকরিয়া আলোক তাহার।" কিন্তু আমরা যে অধঃপতিত,আমরা যে কয়েক হাজার বৎসর পূর্ব্বে, উন্নত জাতি ছিলাম, আজকাল আমরা যে ভিতরে, বাহিরে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছি, আমরা যে এক সময়ে "ভাল ছেলে" ছিলাম,এখনই নয় নেহাতই "বেহেট" হইয়া গিয়াছি,শুধু এইটুকু জানিয়াই ফল কি? শরীর ও মন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে জানিয়া যে ব্যক্তি নিশ্চিন্ত থাকে, তাহার অপেক্ষা মূর্খ আর কে আছে? "আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে?"প্রতীকার চেষ্টা অবশ্যই কর্ত্তব্য। কথায় বলে, "যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।" যতক্ষণ আমরা জাতিরূপে এই ভারতবর্ষে বাঁচিয়া আছি, ততক্ষণ—ব্যাধি যতই কঠিন হউক না কেন—কতক ভরসা আছে, বলিতে হইবে বই কি! অতএব, হিন্দুজাতির এই মানসিক ব্যাধির উপায় অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করা উচিত।

যেমন মনুষ্যের মুখ, হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত প্রবৃত্তির পরিচায়ক, সেইরূপ ভাষাও। বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন, গন্ধ তার লুকাবে কোথায়?" মানুষের মনের ভাব, তাহার মুখভঙ্গিমায়, তাহার কণ্ঠস্বরে, তাহার ভাষায়, প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভাষা মানবের মস্তিস্কোদ্ভূত ভাব সকলের concrete picture বা algebraic মাত্র। মনের ভাব মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া ভাষা হইয়া থাকে। মুখ দেখিয়া যেমন ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র অনুমান করিতে পারা যায়, কোন ভাষা আলোচনা করিলেও, যে জাতির সেই ভাষা, তাহার মানসিক ইতিহাস জানিতে পারা যায়। কোন পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন, "Speak that I may see thee." বস্তুতঃ কথা বার্ত্তায় লোককে প্রকৃতই চেনা যায়। যতকাল জাতীয় মন উন্নত ও শুদ্ধ থাকে, ততদিন ভাষাও উন্নত ও শুদ্ধ থাকিতে বাধ্য। সে মন পুড়িলে ভাষা কেন না পুড়িবে? কিন্তু কেবল ইহাই নহে। মন ও ভাষার মধ্যে কেবল এই এক প্রকার সম্বন্ধ নহে। ইহারা পরস্পর নির্ভরশীল। মন দুষ্ট হইলে, শরীর অসুস্থ হয়, আবার শরীরের ব্যাধি হইলে, মন অসুস্থ হয়, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। মনের উপর শরীরের এই আধিপত্য বুঝিয়াই, হিন্দুশাস্ত্রকারগণ, ভোজন ও আচারের উপর বড়ই তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। আমরা সে কথা বুঝি না, কিম্বা বুঝিতে চাহি না বলিয়াই নবমীতে লাউ খাইতে নাই, নিষেধ দেখিয়া, গর্দ্দভকেই শাস্ত্রকার বিবেচনা করিয়া থাকি। মন ও শরীরের সম্বন্ধ যেমন পারস্পরিক, মন ও ভাষার মধ্যেও সেইরূপ। ভাষার উপর মনের আধিপত্য সকলেই স্বীকার করেন; কিন্তু মনের উপর ভাষার আধিপত্য কতকটা দুর্ব্বোধ্য। কবি বলিয়া গিয়াছেন, "A drop

of ink, falling like dew udon paper makes thousands, perhaps nations, think." এই পড়িতে পড়িতে হাসি কান্না পায়, পরের ক্রন্দনে, নিজেদের চক্ষে জল আসে, ইহা সকলেই জানেন। কবি গাহিয়া গিয়াছেন—

"সই ! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম !
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ"

মনের উপর ভাষার আধিপত্য না থাকিলে, পরের মুখের কথা, কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিয়া, প্রাণ আকুল করিবে কেন ? মনের উপর ভাষার আধিপত্য না থাকিলে, ভালমন্দ style, ভালমন্দ বক্তৃতা, ভালমন্দ কবিতার কিছুরই তারতম্য থাকিত না। মনের উপর ভাষার আধিপত্য না থাকিলে "মহাকবি কালিদাস আর বটতলার নাটক-লেখক একই মূল্য বহন করিত!" তাহা হইলে,সুরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতায় উত্তেজিত হই কেন,আর অন্য কোন বক্তৃতার সময় মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকি কেন ? আমাদের মনের ভাব, মনের ভিতর প্রচ্ছন্ন-অবস্থায় থাকে, পরের মুখের তেজস্বিনী ভাষায় সেই ভাব উত্তেজিত হইয়া থাকে, আবার পরের মুখের ভাষার দোষে আরও ম্রিয়মাণ হইয়া যায়। কবির "একবার তোমা মা বলিয়া ডাক" আহ্বান শুনিলে, কেন আমাদের অন্তরস্থিত স্বদেশ-প্রেমের ক্ষীণপ্রদীপ জ্বলিয়া উঠে ? ভাষার গুণে নয় কি ? "ডমরু-ধ্বনি, শুনি কালফণী কভু কি অলস ভাবে নিবসে বিবরে ?" অতএব মনের উপর ভাষার যদি এতই আধিপত্য, তাহা হইলে, ভাষাকে উন্নতি-পথে আনিতে পারিলে মনকেও সেই সঙ্গে উন্নতিমার্গে লইয়া যাইতে পারা যায়, একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি। ভাষাকে শুদ্ধ করিলে, জাতীয় মনকেও সেই উপায়ে শুদ্ধ করিতে পারিব, এ কথা আশা করি, পাঠকেরা স্বীকার করিবেন। ভাষার উন্নতি সাধন, জাতীয় মানসিক উন্নতির বহুবিধ উপায়ের মধ্যে একটী বিশিষ্ট উপায়, ভাষার উন্নতি-চেষ্টা যে নেহাতই "অকাজের কাজ" নয়, ভাষার উন্নতির জন্য যে কিছু উৎসাহ, কিছু যত্ন, কিছু ত্যাগস্বীকার যে নিতান্তই মুর্খোচিত বা বাতুলতার কাজ নয়, ইহা বোধ করি, আপনারা স্বীকার করিবেন।

কিন্তু আজকাল জাতীয় জীবনের উন্নতির চেষ্টা রাজনীতিমার্গেই, বোধ করি, বিশেষ ভাবেই ধাবিত ও প্রবাহিত হইতেছে। উন্নতির জন্য, হিন্দুজাতির সকল চেষ্টা, politics-এর একচেটিয়া হইয়া গিয়াছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না ! John Morley কি বলিয়াছেন, তাঁহার speech দিবার সময়, কে হাসিয়াছিল, কে করতালি দিয়াছিল, আর কেইবা hear hear বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল, Lord Mintoর মাথা ধরিয়াছিল, তিনি এক্ষণে কেমন আছেন, এই সকল মহা প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহে এবং এই সকল সংবাদের উপর আমাদিগের নিজের টীকা টিপ্পনী করিয়া জীবনটা অতিবাহিত করিতে পারিলেই, আমাদিগকে স্বার্থত্যাগী স্বদেশ-বৎসল মহাপুরুষ বলিয়া স্থির করিয়া থাকি। জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধনে রাজনৈতিক উন্নতি যে অত্যাবশ্যক, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে শতবার স্বীকার করি। কিন্তু আমার মনে হয়, জাতীয় মনকে অগ্রে উন্নত না করিয়া কেবল মাত্র রাজনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করিলে বিশেষ উপকার হইবে না। আমার ভয় হয়, জাতীয় মনকে পূর্ব্বে

উন্নত না করিলে, দৈবানুগ্রহে রাজনৈতিক উন্নতি, আকাশ হইতে নামিয়া আসিলেও, বেশী দিন স্থায়ী হইবে না। গোড়ায় কাটিয়া আগায় জল দিলে পরিশ্রম যে কত দূর সফল হইবে, বুঝিতে পারি না। স্বরাজ, moderate মতেই হউক, আর extremist মতেই হউক, জাতীয় মানসিক উন্নতির উপর স্থাপিত না হইলে, বালুকার উপর অট্টালিকার ন্যায় কোন দিন ভূ-স করিয়া ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। মধ্য আফ্রিকায় এখনও অনেক Negro জাতি পূরামাত্রায় স্বরাজ-ভোগ করিতেছে। কিন্তু তাহাদের অবস্থা যে অনুকরণ-যোগ্য, এরূপ আমার ধারণা নহে। যদি পূর্ব্ব হইতে আমাদের হৃদয়ে স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেম শক্তিরূপে বর্ত্তমান না থাকে, পরহিতার্থে আত্মত্যাগ যদি আমরা পূর্ব্ব হইতে না অভ্যাস করিয়া থাকি, যদি হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষকে আমাদের সঙ্কুচিতান্তকরণের মনে ধারণ করিতে আমরা পূর্ব্ব হইতে না শিখিয়া থাকি, তাহা হইলে, দৈবানুগ্রহে আমরা স্বাধীন হইলেও, সে স্বাধীনতা আমরা যে বেশীদিন ভোগ করিতে পারিব, এরূপ আশা কোথায়?

"নাদের সাহার মত যদি কোন জন,
দিল্লী বিনাশিয়া আসে বঙ্গে বীরভরে
কেমনে রাখিবে ধন, বাঁচাবে জীবন,
কেবল বাঁধিয়া বুক দাঁড়াবে সমরে,
হরিয়া সর্ব্বস্ব যদি প্রদানে কেবল
বিনিময়ে ভিক্ষাপাত্র, দাসত্ব-শৃঙ্খল?"

অনেকের মত, আগে ত স্বাধীন হইয়া লই, পরে, স্বাধীন অবস্থার উপযোগী মানসিক ক্ষমতা আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে। এরূপ ধারণা কতদূর বিচারসঙ্গত, বুঝিতে পারি না। যে সিংহাসনে এক সময়ে দিগ্বীজয়ী চন্দ্রগুপ্ত, রাজর্ষি অশোক, বা মহামতি আকবর সাহ বসিয়াছিলেন, সেই সিংহাসনে কেবলমাত্র বসিলেই, তাঁহাদের মত মানবের ক্ষমতা আপনা আপনিই জুটিয়া যাইবে, এরূপ optimism বেশ প্রীতিপ্রদ, সন্দেহ নাই, কিন্তু কতদূর ন্যায়সঙ্গত বলিতে পারি না। দুই বৎসর পাঠে অবহেলা করিয়া, পরীক্ষা-মন্দিরে প্রশ্নের উত্তর আপনা আপনিই মনে আসিয়া পড়িবে, এইরূপ ধারণা লইয়া যে বালক পরীক্ষা দিতে যায়, তাহাকে কি বলিতে ইচ্ছা করে?

বলিতে পারেন, স্বাধীন রাজত্ব সুচারুরূপে চালাইতে হইলে, স্বাধীনরাজত্বের ভার বহন করিতে শিখিতে হইবে—স্বাধীন রাজত্বের apprenticeship চাই। বলিতে পারেন, সন্তরণ শিক্ষা করিতে হইলে, জলে নামিতে হইবেই—মাটীর উপর সন্তরণ শিক্ষা সম্ভব নহে। স্বরাজের সহিত, স্বরাজ চালাইবার শক্তি আসিবে। এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যেমন জলে সন্তরণের চেষ্টার পূর্ব্বে, হস্তপদ চালনা স্থলেই, শিক্ষা করিয়া থাকি, পরে, সেইরূপ হস্তপদ চালনা শূন্যে না করিয়া জলে করিলেই সন্তরণ শিক্ষা হয়, সেইরূপ, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যবহার করিতে হইলে, কতকগুলি মানসিক ক্ষমতা পূর্ব্বাবস্থাতেই উপার্জ্জন করিয়া রাখিতে হয়। স্বাধীনতার apprenticeshipএর পূর্ব্বেও কতকগুলি "qualification"এর প্রয়োজন হয়। আমি যে সকল মানসিক ক্ষমতার কথা বলিতেছি, তাহা স্বাধীনতা সাপেক্ষ নহে, অধীন অবস্থাতেও তাহা আমরা উপার্জ্জনক্ষম, কারণ সে ক্ষমতা নিতান্তই আমাদের নিজ নিজ চেষ্টার

উপর নির্ভর করে। জাতীয় চরিত্র সংশোধন, জাতীয় মানসিক উন্নতি, জাতির নিজের চেষ্টার উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভরশীল। কবি যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন,

"How small, of all that human hearts endure,
That part which laws or kings can cause or cure,
Still, to ourselves, in every place consign'd
Our own felicity we make or find."

এই মানসিক ও চরিত্র শক্তি যে সকল শক্তির মূল, তাহা সকল জাতির প্রত্যেক মনুষ্যের ইতিহাসে প্রমাণিত হইবে। যে সিংহাসনে একদিন আকবর সাহ বসিয়াছিলেন, সেই সিংহাসনই বাহাদুর সাহের ছিল। তবে এ দুয়ের মধ্যে এত প্রভেদ কেন? যে সিংহাসন হইতে প্রথম চার্লস ও দ্বিতীয় জেম্‌স্‌ বিতাড়িত হইয়াছিলেন, সেই সিংহাসনেই ত মহারাণী ভিক্টোরিয়া ষাটি বৎসরের অধিক অধিষ্ঠিতা ছিলেন! এ সকল প্রভেদ কি জন্য—মনের ও চরিত্রের তারতম্যে নয় কি? যাঁহারা পাশব, শারীরিক বা Brute শক্তির আরাধনা করেন, তাঁহারা বড়ই ভ্রান্ত। শরীরের শক্তি কি একটা শক্তি? বাহুতে বল মন হইতেই আসে। কবি গাহিয়া গিয়াছেন,

"My good blade carves the casques of men,
My tough lance thrusteth sure,
My strength is as the strength of ten,
Because my heart is pure."

আবার শুনিতে পাই,—

"Self-reverence, self-knowledge, self-control
These three alone lead life to sovereign power"

এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই, self-reverence, self-knowledge and self-control, এই চরিত্র বল, এই মানসিক শক্তি, আমার নিজের উপর না ভারত-সচিব John Morley'র উপর নির্ভর করে?

আমরা নিজদিগকে extremist বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকি। আমরা মুখে বলি, Governmentএর সহিত কোন সম্বন্ধই রাখিব না, কিন্তু দেখিতে পাই, প্রকৃত কাজের সময়, Governmentএর উপর সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া আমরা নিশ্চিত মনে বসিয়া থাকি। স্বাধীন না হইলে মানসিক বিকাশ হইবে না, যতদিন না স্বাধীন হই, ততদিন কিছুই—কোন চেষ্টাই করিব না—ইহাই কি Governmentএর উপর নির্ভরশীলতা নহে? British Government না যাইলে আমরা চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করিব না, ইহাই কি Governmentএর মুখাপেক্ষিতা নহে? অধীন অবস্থায় যতদূর করা সম্ভব, ততটুক চেষ্টা করা কি এতই মন্দ? অধীন অবস্থায় যে টুকু সম্ভব, তাহাও করিব না, এ কি রূপ বুদ্ধি, আমি বুঝিতে পারি না। চরমপন্থীদিগের এ পন্থা চরম বলিতে হইবে বই কি? লোকে যে বলিয়া থাকে, "কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ" তাহা বড় মিথ্যা নয়।

যেমন, রাজনৈতিক উন্নতি, মানসিক উন্নতির উপর নির্ভর করে, সেইরূপ, সমাজ-সংস্কার ও মানসিক উন্নতি ব্যতিরেকে সাধিত হইতে পারে না। আমরা যদি হিন্দু সমাজকে বর্ত্তমান কুসংস্কার-কলুষিত অধঃপতিত অবস্থা হইতে পূর্ব্ব কালের মহত্ত্বে পুনরুদ্ধার করিতে বাসনা করি, তাহা হইলে, পূর্ব্বকার মহত্ত্ব কি, তাহা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। পূর্ব্বকার হিন্দু সমাজের বিশুদ্ধতা বুঝিতে পারিলেই, মনে তাহার অনুকরণেচ্ছা, স্বতঃই বলবতী হইবে। অনেকের ধারণা, গীতা, পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠ বা কণ্ঠস্থ করিলেই, সমাজ-সংস্কারের কার্য্য,

বুঝি, সমাধা হইয়া গেল। যে পাঠে মন স্পৃষ্ট হয় না, যে পাঠে মন উত্তেজিত হয় না, সে পাঠ ত অধর-যুগলের কষ্টের কারণ মাত্র —সে আবৃত্তিতে ফল কি? মহারাজা রাম চন্দ্রের প্রজারঞ্জনার্থ অলৌকিক স্বার্থত্যাগ, মহারাজা যুধিষ্ঠিরের সত্যব্রত, এসব ত যে সে বালকও জানে? যদি তাঁহাদের জীবনী পাঠে আমাদের মনে তাঁহাদের পদানুসরণেচ্ছা বলবতী না হইয়া উঠে, তাহা হইলে সে প্রকার রামায়ণ বা মহাভারত পাঠে ফল কি? তাই বলি, পাঠ বা কণ্ঠস্থ করা অপেক্ষা হৃদয়ঙ্গম করা বেশী প্রয়োজনীয়। কি সে কালকার সেই আজ কালকার সেই আজ-কালকার কল্পনাতীত মাহাত্ম্য প্রকৃতরূপে বুঝিতে হইলে,আমাদের নিজেদের মনে সেই মাহাত্ম্যের অঙ্কুর থাকা চাই। আমরা পরকে আপনা দিয়াই জানিয়া থাকি। আমার নিজের মনে আত্মত্যাগের চিহ্নমাত্র না থাকিলে, ভীষ্মদেবের দেবোপম চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে কেমন করিয়া সক্ষম হইব? সেই জন্য বলিতেছিলাম, সমাজ-সংস্কারের পূর্ব্বে মানসিক-সংস্কার বিশেষ প্রয়োজন।

মনের উন্নতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির যে মূল, তাহা বোধ করি পাঠকেরা স্বীকার করিবেন। এই ত্রিবিধ উন্নতির মধ্যে মানসিক উন্নতি সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান, তৎপরে সামাজিক উন্নতি ও পরিশেষে রাজনৈতিক উন্নতি। এই ত্রিবিধ উন্নতি এমনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ যে, তাহাদের একত্রারম্ভ সম্ভবপর, ও তাহা হইলেই পরস্পরের সাহায্যে তিন উন্নতিই চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইবে। উন্নতিশালী ইউরোপীয় জাতিবর্গের ইতিহাস পাঠে ইহার সার্থকতা উপলব্ধি হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকল উন্নতির ভিত্তি স্বরূপ মানসিক উন্নতির অনেক প্রকার উপায় আছে। তন্মধ্যে ভাষার উন্নতি একটী বিশিষ্ট উপায়, একথাও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ভাষার উন্নতি দ্বারা কিরূপে জাতীয় মনের উন্নতি সাধিত হইবে, এক্ষণে সেই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

কথিত আছে, ধর্ম্ম সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্যের অপলাপ হইলে ধর্ম্ম লোপ পায়। ভাষায় সত্য দুই প্রকারের। হাতে পটল লুকাইয়া রাখিয়া, ঝিঙ্গে আছে বলিলে সত্যের বিনাশ সাধন হয়,একথা সকলেই জানেন,এবং এপ্রকার অসত্য পরিত্যাগ করিতে অনেকেই সক্ষম ও সম্মত। অন্য প্রকার অসত্য; সৌজন্য বশতঃই হউক,আর অন্য কোন কারণেই হউক, কাণা ছেলেকে পদ্মলোচন বলিয়া ডাকা। যে যে নামের উপযোগী নহে, তাহাকে সেই নামে অভিহিত করিলে, অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না কি? যাহারা সত্য সত্যই বাবু বা জনাব বা মহাশয়, বা মহারাজ নহে, তাহাদিগকে সেই সব নাম দিলে, সৌজন্য প্রকাশ পাইতে পারে বটে, কিন্তু নিজের সর্ব্বনাশ করা হয় না কি? সত্য বটে, কবি বলিয়া গিয়াছেন,—

"What's in a name? That which we call
A rose, by any other name will smell as
sweet."

কবির এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নহে। নামে কিবা আসে যায়? একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিব, নামে অনেক আসে যায়। বলিয়াছিত, মনের উপর ভাষার বড়ই আধিপত্য। পুত্রকে "ভাইয়া" বলিয়া ডাকিতে অভ্যাস হইয়া যাইলে, তাহার সহিত ঠাট্টা তামাসা করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবে না কি? চারি টাকা বেতনের

পাচককে মহারাজ বলিয়া ডাকিতে অভ্যাস জন্মিলে, কালক্রমে মহারাজ শব্দের প্রকৃত অর্থ একেবারে ভুলিয়া যাইতে হইবেই; এবং তখন পাচক ব্যতীত মহারাজ অর্থে অন্য কোন প্রকার জীব বুঝাইত, এ কথায় প্রত্যয় পর্য্যন্ত মন হইতে বিলুপ্ত হইবে। সৌজন্য বশতঃ অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করিতে শিখিলে এমন দিন এক সময় আসিবে, হয়ত আসিয়াছে, যখন ব্রাহ্মণ কি ব্রহ্মতেজময় পদার্থ ছিল, তাহা বিশ্বাস করিতেও প্রবৃত্তি থাকিবে না। অবিশ্বাস একবার জাতীয় মনে স্থান পাইলে, তখন হাজার গীতা পড়, আর পুরাণ আবৃত্তি কর, কিছুতেই কিছুমাত্র উপকার হইবে না। তখন ঐ সকল মহাগ্রন্থ পাঠ করিবার সময় হৃদয়স্থিত অবিশ্বাস-উপদেবতা, আমাদের মনের কাণে কাণে বলিবে, "মহারাজ রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির বা ভীষ্মদেবের, বা সীতার বা লক্ষ্মণের কথা যাহা কিছু পাঠ করিতেছ, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজের কথা যাহা কিছু লেখা আছে, দেখিতেছ, সকলই ঘোর মিথ্যাবাদী লেখকদিগের গঞ্জিকা-উদ্দীপিত মস্তিষ্কোদ্ভূত grand mother's tale." অবিশ্বাস-উপদেবতা বুঝাইয়া বলিবে, 'human nature is human nature'—"আজ আমরা যেমন, সত্য যুগে মানুষ ঠিক আমাদেরই মতন ছিল, এই আজ কালকার মানুষদিগেরই মত, তাহারা পরশ্রীকাতর, পরধনলোভী, অসংযতেন্দ্রিয়, কদর্য্যচরিত্র লোক ছিল। লেখকেরা তাহাদিগকে বাড়াইয়া লিখিয়াছে মাত্র।" যাহাকে তাহাকে মহাশয় বলিতে শিখিলে, মহাশয় শব্দের প্রকৃত অর্থ আর কি মনে থাকিবে? তাই বলিতেছিলাম, নামে অনেক আসে যায়। ভাষায় এরূপ মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিলে, ধর্ম্ম লোপ পাইবেই। যদি বল, সৌজন্যের খাতিরে বলা যায়—আমি জিজ্ঞাসা করি, সৌজন্য বড় না ধর্ম্ম বড়? কাহার জন্য ইহকাল পরকালের সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ? "গঙ্গাজলপূর্ণ ঘট ঠেলি ফেলি, কেন অবগাহ দেহ কর্ম্মনাশা জলে?" যদি সৌজন্যের খাতিরে অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ, ক্ষুদ্রচেতাকে মহাশয়, মূর্খকে পণ্ডিত, এইরূপ মিথ্যা অভিধানে বেশ পাকা হইয়া যাই, তাহা হইলে কেমন করিয়া বুঝিব, ব্রাহ্মণেরা কি প্রকার নরদেবতা ছিলেন, মহাশয় ব্যক্তি কেমন লোক, আর প্রকৃত পণ্ডিত কাহাকে বলে? আর যদি তাহাই না বুঝিতে পারি, যদি "যবনে ব্রাহ্মণে, কুক্কুরে আপনে, শ্মশানে স্বরগে" সমান ধারণা হইয়া যায়, তাহা হইলে উন্নতির—সে সামাজিক হউক আর রাজনৈতিক হউক—আশা কোথায়? বৃহস্পতি-রমণী তারা লেখনীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিল,—

"কি লজ্জা কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি,
লিখিলি এ পাপ কথা, হায়রে কেমনে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোরে; হস্তদাসী সদা,
তুই, মনদাস হস্ত; সে মন পুড়িলে
কেন না পুড়িবি তুই? বজ্রাগ্নি যদ্যপি
দহে তরুশির মরে পদাশ্রিত লতা।
সত্য সত্যই মন পুড়িলে, সর্ব্ব বিষয়েই সর্ব্বনাশ।

বাক্যের প্রকৃত অর্থ, জাতীয় মন হইতে, সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইলে কি শোচনীয় পরিণাম হয়, তাহা আপনারা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন কিনা, জানিনা। আমি একটী সামান্য দৃষ্টান্তে তাহা প্রকটিত করিতে চেষ্টা করিব। পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও আকর্ষণ আছে, শাস্ত্রকার তাহা বুঝাইবার জন্য কৃষ্ণ ও রাধিকা, এই

দুই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কৃষ্ণ এই শব্দের প্রকৃত অর্থ, যিনি আকর্ষণ করেন, অর্থাৎ পরমাত্মা; আর রাধা এই শব্দেই যিনি আরাধনা বা ভজনা করেন, অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবাত্মা। এই দুই শব্দ, কবিকল্পনায় ও কালমাহাত্ম্যে, একটী পুরুষ ও অপরটী স্ত্রী, এই রূপ অর্থে পরিণত হইয়াছে। তৎপরে পরকীয়-প্রেমের বিশেষত্ব উপলব্ধি হওয়ায় কবিদিগের গ্রন্থে রাধা কৃষ্ণের পরকীয়া নায়িকা, এই অদ্ভুত অর্থ ধারণ করিয়াছে। কালক্রমে, জাতীয় মন হইতে এই দুই শব্দের প্রকৃত অর্থ একেবারে বিলুপ্ত হওয়ায় হিন্দুধর্ম্মে সাধারণ অর্থাৎ শতকরা ৯৮ লোকের মনে, রাধা কৃষ্ণের লীলার কি যে বীভৎস ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তাহা পাঠক মাত্রেরই সবিশেষ জানা আছে। এই রাধা কৃষ্ণের দোহাই দিয়া, ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে, কি প্রকারে সামাজিক বিশৃঙ্খলতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা বোধ করি সকল পাঠকই অবগত আছেন। ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে কোন বিশিষ্ট পর্ব্ব দিনে,

"ননী ছানা খাওয়াইয়া, রসরঙ্গ শিখাইয়া,
অঙ্গ ভঙ্গ দেখাইয়া, তুমি কৈলা কামী,
আগে হানি নেত্রবাণ, কাড়িয়া লইলে প্রাণ,
এবে কর অভিমান, আঃ আরে মামী,"

বলিয়া ভাগিনেয়, মাতৃসম মাতুলানীর সহিত প্রেম করিলেন, সমাজ তাহার পোষকতা করিয়া থাকেন। যে দেশে কৃষ্ণ রাধিকার এরূপ ধারণা, সে দেশে সামাজিক নিয়মও যে বীভৎস হইবে, তাহার আশ্চার্য্য কি?

আমরা বাক্যের অপব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছি সত্য; কিন্তু বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, বাক্যের অন্তরালস্থিত, পূর্ব্বকার মহত্ত্বকে সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হই নাই। কখন কখনও বিদ্যুৎ শিখার ন্যায়, মনের অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ গতিতে, সেই পূর্ব্বকার মহত্ত্ব ঝলসিয়া উঠে। তাই ভরসা হয়, এখনও বুঝি সময় আছে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, এই অসত্যকে ভাষা হইতে বিতাড়িত করিতে পারিলে, আমাদের সেই পুরাতন জ্যোতি জাতীয় মনে ফিরিয়া আসিবে, এরূপ আশা মনে হয়। কিন্তু যদি সৌজন্যের খাতিরে, অসত্যকে আরও প্রশ্রয় দিই, তাহা হইলে, পরে আমরা এতই অধঃপতিত হইব, যে তখন,

"The hell I suffer from success a Heaven"

বলিয়া মনে হইবে।

সামাজিক division of labour অনুসারে ভাষা-সংস্কার সমালোচকদিগেরই হস্তে ন্যস্ত। ভাষায় কোন দোষ প্রবেশ করিলে, কোন অশুদ্ধি বা মিথ্যার আবির্ভাব হইলে, সমালোচকেরা তাহার সংশোধনে প্রবৃত্ত হন। লেখকেরা ভ্রান্তি বশতঃ কিম্বা আপাতঃ সুবিধার বশবর্ত্তী হইয়া অযথা আর্শ প্রয়োগে ভাষাকে কলুষিত করিয়া থাকেন। সমালোচকেরা তাহার তীব্র সংশোধনে প্রবৃত্ত হইলে, লেখকেরা তাহাদের উপর ঝঙ্কার করিয়া থাকেন। দীনবন্ধু বলিয়া গিয়াছেন, ক্ষুদ্রবুদ্ধি সমালোচক কুট্ কুটে মাছি। কাব্যকলেবরে কত স্থান আছে, তাতে না বসে কোথায় নখের কোণে একটু ঘা আছে, ভন্ করে সেইখানে বসে কুট্ করে কামড়ায়। বচন আছে "মণিময় মন্দির মধ্যে পিপীলিকা শ্চিদ্রমন্বেষয়ন্তি"। অন্য এক লেখক সমালোচকদিগকে, Municipalityর scavengerএর সহিত তুলনা করিয়াছেন। যেমন সহরের রাস্তা ঘাট মানুষ পশ্বাদির দ্বারা দুষ্ট হইলে,

scavenger সেই আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া থাকে, সেইরূপ, লেখকদিগের দোষে, ভাষা আবর্জ্জনাময় হইয়া যাইলে, সমালোচকেরা ভাষা পরিষ্কার করিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিয়া থাকেন। লেখকেরা মনে করেন, "আমি করিব, রামগতি ন্যায়রত্নের তাহাতে মাথা ব্যথা কেন? সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা, বা বাঙ্গালার সহিত ইংরাজী মিশাইয়া অদ্ভুত খিচুড়ি তৈয়ার করিব, পাঠকের রুচি হয় পড়িবে, না হয় পড়িবে না"। এরূপ ধারণা, এরূপ ঝঙ্কার ন্যায়সঙ্গত নহে। জিজ্ঞাসা করি, সাহিত্য-সুন্দরীর নখের কোণে আপাতঃ ক্ষুদ্র ক্ষতের উপর সমালোচক দংশন না করিলে অবহেলা দোষে, ও অনাবৃত অবস্থায়, বাহিরের দুষ্ট বায়ুস্পর্শে, সেই অধুনা সামান্য ক্ষত ক্রমে বর্দ্ধিতায়ন লইয়া সমস্ত শরীরকে ব্যাধিগ্রস্ত করিতে পারে না কি? আর সাহিত্য-সুন্দরীর শরীর যদি ব্যধিগ্রস্ত হইয়া যায়, তবে সাহিত্য-সুন্দরীর অন্তরস্থিত জাতীয় মন কলুষিত হইবে কিনা? ভাষা-নগরীর দৈনিক আবর্জ্জনা পরিষ্কার না করিলে, সেই ভাষা কিছুদিন পরে কিরূপ অবস্থায় পরিণত হইবে বলিয়া মনে হয়? তখন সেই ভাষান্তরস্থিত জাতীয় মনের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে কিনা? তাই বলি, সমালোচক যখন একটী সামান্য শব্দের অশুদ্ধি সংস্করণে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার সেই নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজকে "অকাজের কাজ" বলিয়া উপহাস করিলে, আমরা নিজের বুদ্ধির পরিচয় দিই মাত্র। আমাদের মনে রাখা উচিত, ব্যারাম বাড়িতে না দিয়া, অল্প অবস্থাতেই সারিতে চেষ্টা করা বুদ্ধিমান চিকিৎসকেরই প্রথা। সুসভ্য ইউরোপে, সেই জন্য সমালোচকদিগের এত আদর ও সম্মান। সেখানে সামান্য সামান্য অশুদ্ধি লইয়া যেরূপ তুমুল আলোচনা চলে, ভারতবর্ষে তাহাকে বাতুলতার নিদর্শন বলিয়াই জ্ঞান করিবে। কথিত আছে, কোন বক্তা curiosityর i অক্ষর বাদ দিয়া curosity বলিয়া উচ্চারণ করিয়াছিলেন; এই সামান্য উচ্চারণ দোষে ক্রুদ্ধ হইয়া কোন শ্রোতা বলিয়াছিলেন "He is murdering the language" অপর কোন শ্রোতা, তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "Not so bad as that. He has only knocked an eye out of it." সামান্য দোষ লইয়া ইউরোপ কিরূপ আন্দোলন চলে, এই গল্প তাহার বেশ দৃষ্টান্ত। সভ্য ইউরোপে, যেমন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ উঠিয়া থাকে, সেইরূপ, ভাষা-সংস্কারের আন্দোলনও পূর্ণমাত্রাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। কোনটারই অবহেলা নাই। ইংরাজেরা, ফরাশিরা, জরমানেরা আজ যে উন্নতির উচ্চতম শিখরে অবস্থিত, সেইখানে তাহারা জন্মগ্রহণ করে নাই। সোপানের ধাপে অতি কষ্টের সহিত উঠিতে হইয়াছে। পুরাকালে ভারতবর্ষেও সংস্কৃত ভাষার উপর, পণ্ডিত ও বৈয়াকরণিকদিগের বড়ই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কোন প্রকার অশুদ্ধি উচ্চারণেই হউক, আর ব্যাকরণেই হউক, প্রশ্রয় পাইত না। কিন্তু আজকাল, সে শাসন উঠিয়া গিয়াছে। 'ব্যাকরণ' কাঁদুক আর মরুক, কবিরা "মনোসাধে" যথেচ্ছচার করিয়া, নিজেদের স্বাধীনতা প্রকাশ করিতেছেন।

ভাষা-সংস্কার, ভাষার উন্নতি, সমালোচক ও বৈয়াকরণিকদিগেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা, তাঁহাদের এই সংস্কার-কার্য্যে তাঁহাদের সাহায্য করিতে পারি না কি? আমরা সকলে, সামান্য লোক হইতে পারি

সত্য; কিন্তু সমাজে, আমরা যে যে স্তরে আছি, সেই সেই স্থান হইতেই আমরা সকলেই এই ভাষা সংস্কারে যোগদান করিতে পারি। ভাষা হইতে অসত্যকে বিতাড়িত করা আমাদের সকলেরই ক্ষমতাধীন। ইহাতে অসাধারণ রচনা বা বক্তৃতা শক্তির প্রয়োজন নাই—ইহাতে অলৌকিক স্বার্থত্যাগের দাবী নাই—ইহাতে seditionএর ভয় নাই। প্রয়োজন কেবল একটু সাহসের, প্রয়োজন কেবল মাত্র চক্ষু-লজ্জা-ত্যাগের। যদি আমরা প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞা করি, আজ হইতে ভাষায় আর মিথ্যার প্রশ্রয় দিব না—পরকে অযোগ্য নামে ডাকিব না—যে নামের যোগ্য নহি, সে নাম প্রাণান্তেও লইব না—যদি আমরা স্থির-প্রতিজ্ঞ হই যে ভাষা-প্রতিমার নূতন করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিব, তাহা হইলে, অচিরেই দেখিতে পাইব, এই হিন্দু জাতি হইতে, অনেক "বাবু", "মহাশয়", "রাজা", "পণ্ডিত", "ব্রাহ্মণ" তিরোহিত হইবেন। কিন্তু এই মিথ্যার মেঘ একেবারে সরিয়া যাইলে দেখিতে পাইব, সত্যনামের প্রকৃত গৌরব ও সেই প্রকৃত নাম অর্জ্জনে একটা প্রবল ইচ্ছা সমাজের মনে জাগরূক হইবে। তখন এই ভারতবর্ষে যে সকল ব্রাহ্মণ, সে সকল পণ্ডিত, যে সকল মহাশয় ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহারা সংখ্যায় অনেক অল্প হইতে পারেন বটে, কিন্তু মানসিক তেজে, গুণে গৌরবে, সেই অল্প সংখ্যক মহানুভবেরা ভারতে এক নূতন যুগ অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইবেন।* যদি চাণক্যের শ্লোকে কিছু মাত্র সত্য নিহিত থাকে—"বরমেক গুণী পুত্রো ন চ মূর্খ শতৈরপি একশ্চন্দ্র তমোহন্তি, ন চ তারা গণৈরপি।" তাহা হইলে এরূপ সত্যাশ্রিত, গুণালঙ্কৃত, দুই একটী সন্তানে, ভারতবর্ষে যতদূর উন্নতি হইবে, আজ কালকার সমগ্র লোক লইয়া তাহার কণামাত্রও হইবে না। ভাবিয়াছ কি, আমাদের মত অযোগ্য সন্তানেরা "বিশকোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে," মা তাহার উত্তর দিবেন? কেন? বিশ কোটি কণ্ঠ বলিয়া না কি? ডাকার অর্থ চীৎকার না কি? ভাবিয়াছ কি, আমাদের মা, মুখের আর প্রাণের ডাকের প্রভেদ বুঝেন না? ভাবিয়াছ কি, মা আমাদের বুঝেন না যে, তাঁহার বিশ কোটি সন্তান, তাঁহাকে কেবল মাত্র "অবসর মত ভালবাসে"। যদি কণ্ঠের চীৎকারেই দেবতাকে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে এত লোক ত দুবেলা ভগবানকে ডাকিয়া থাকে, ভগবান তাহাদের ডাক শুনেন না কেন? এত লোকের আবেদন উপেক্ষা করিয়া প্রহ্লাদের আহ্বানেই বা আসিয়াছিলেন কেন? তাই বলি, মনে তেজ, হৃদয়ে ভক্তি, প্রাণে প্রেম থাকা চাই। নহিলে আমাদের সকল চেষ্টা বাহ্যিক,লোক দেখান বলিয়া, বৃথা হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভাষা হইতে অসত্যকে দূরীভূত করা, আমাদের সকলের ক্ষমতাধীন, এই ভাষা সংস্কার সাহায্যে জাতীয় মনকে শুদ্ধ করিতে পারিব, এরূপ আশা করা যায়। জাতির মানসিক উন্নতির সহিত সকল প্রকার উন্নতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি সহজ ও সম্ভব হইবে। এসব জানিয়া শুনিয়াও কি আমরা অলস হইয়া থাকিব?—ঐ শুন কবি বলিতেছেন—

"Let us aid it all we can,
Every woman, every man,
Smallest helps, if rightly given,
Make the impulse stronger."

কবির এই সাদর নিমন্ত্রণ আমরা গ্রহণ করিব কি?

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস।

* "এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সে দিন আসিবে।"

বৈশাখে।

কি সৌরভে ভরপূর রসালে বাগান,
কুহু করি কোকিল গায় প্রাণহরা গান ;
হরিত নিকুঞ্জ হাসে,
বনমুগ্ধ ফুলবাসে,
মোহিত মাধুর্য্যে শ্যাম-প্রকৃতি পরাণ ;
আতপে কুমুদ কিবা কানন-বিতান !!

২

প্রকৃতি পাষাণী বালা নিদাঘে নিঠুর,
অধরে উছলে হাসি মরি কি মধুর !
তোর দীঘি ভরা জলে,
স্নান করি কুতূহলে,
জুড়ায় হৃদয় মোর বেদনা-বিধুর,
নিরানন্দ প্রাণে লভি' আনন্দ প্রচুর !

৩

আমোদে উন্মাদ মন সুহরিত কুঞ্জে,
শ্রবণে অমৃত ঢালি অলি দল গুঞ্জে ;
বহে নদী মৃদু-কল,
ঢল ঢল চল্ জল,
মদির বকুল-তল ঝরা-ফুল-পুঞ্জে,
ভ্রমর ভ্রমরী সহ সুধারস ভুঞ্জে।

৪

স্বচ্ছ শ্যাম পত্রপুট রবির কিরণে,
করে কিবা ঝিকিমিকি হেমাভ বরণে !
পাদপে জড়িতা লতা,
দোদুল,—সোহাগে নতা ;
চাঁচর বিকুর চারু চঞ্চল পবনে ;
আনত পল্লব মুখ অধীর চুম্বনে !

৫

মালতী মল্লিকা যূথী হাসে রাগভরে,
কদম্ব কেতকী চাঁপা ফোটা থরে থরে,
রজনী গন্ধার বাসে,
চোখে ঘুম ঘোর আসে,
কি ভাবে বিভোর প্রাণ ঢুলু ঢুলু করে,
মনে হয় আছি কোন স্বপ্নরাজ্য 'পরে !

৬

নিদাঘে বাসন্তী ডালা সাজায়ে সুন্দর,
অধীরা প্রকৃতি-রাণী—তৃষিত অধর ,
সুদূর ভূধর চূড়ে,
বর্ষার অঞ্চল উড়ে,
নবীন নীরদ মালে শোভে নীলাম্বর ;
বসন্ত নিদাঘ বর্ষা মিশে পরস্পর !

৭

আহা কি অপূর্ব্ব তিনে মিলন সুন্দর,
বৈশাখের বক্ষে বাঁধি সৌন্দর্য্যের ঘর ;
রম্য রৌদ্রদীপ্ত দিন,
বিহগ ঝঙ্কারে লীন ;
পশ্চিমে ঝলকে সাঁজে দামিনী প্রখর ;
গঙ্গার তরঙ্গলীলা মহা ভয়ঙ্কর !

৮

সুনীল বসনা নিশা মন্থর গমনে,
পশেন সুধীরে মঞ্জু কানন-ভবনে ;
শুভ্র রজতের পারা,
লভে ননী আত্মহারা
মুখর নূপুর রুণু মণ্ডিত চরণে,
সীমন্তে তারকা সিঁথি,—কি শোভা ভুবনে !

৯

হে প্রকৃতি ! কি সুহাসি ও শ্যাম অধরে,
সোণালী সন্ধ্যায় চৈত্রে বিদায়ি আদরে ;
জড়ায়ে ধরণী ভালে,
কোমল শিরিষ জালে,

মলয় হিল্লোলে পাখা বীজনি অম্বরে,
কর ষড় ঋতু লীলা এ বিশ্ব ভিতরে!

১০

রাখ তবে বুকে বাঁধি ত্রিবিধ স্বপনে,
প্রমত্ত মধুপ সনে মধু গন্ধি বনে;
আছি মজি ভ্রান্তি মদে,
ডুবি' রূপ কোকনদে,
রেখ এ অতিথি তব শোভার সদনে;
সৌন্দর্য্যে করিয়ে ভোর জীবনে মরণে!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ। (২)

আমরা 'নব্যভারতের' বিগত চারি সংখ্যায় শঙ্করাচার্য্যের মত সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়াছি, তদ্দ্বারা আমরা শঙ্করের অদ্বৈতবাদের কিরূপ অর্থ বুঝিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে দেখা আবশ্যক। বিগত প্রবন্ধগুলি দ্বারা ইহা দেখা হইয়াছে যে, শঙ্করাচার্য্য জগৎকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই এবং এই জগৎ যে শক্তি হইতে জন্মিয়াছে, সে শক্তিকেও অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। তিনি বারম্বার কেবল ইহাই বলিয়া দিয়াছেন যে, তত্ত্বদর্শীর চক্ষে এই শক্তি এবং জগৎ কেহই ব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' নহে। * যাহারা এই শক্তি ও জগৎকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া বোধ করে,তাহারা ভেদদর্শী এবং তাহারাই অজ্ঞানী। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ এইরূপ। শঙ্কর যে শক্তি ও জগৎকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, তাহার অর্থ কি? যদি শক্তিরও অস্তিত্ব রহিয়া গেল এবং জগতেরও অস্তিত্ব রহিয়া গেল, তবে কেবলমাত্র স্বতন্ত্রতা নিষেধ করিলেই কি অদ্বৈতবাদ টিকিতে পারে? এই তত্ত্বটা লইয়াই যত গোলযোগ। লোকে এই অংশটা বুঝিতে পারেনা বলিয়াই শঙ্করকে মায়াবাদী প্রভৃতি অপবাদগ্রস্ত করিয়া থাকে। আমরা এ প্রবন্ধে এই স্বতন্ত্রতার কথা লইয়াই শঙ্করের মতালোচনা করিব।

* স্বতন্ত্র—i.e. Independent and unrelated.

প্রথমতঃ আমরা এই জগৎটার কথাই বলিব। তৎপরে, এ জগৎ যে 'মায়াশক্তি' হইতে জন্মিয়াছে, তাহার কথা বলিব।

শঙ্কর বলেন যে, এই বিকারী জগৎ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে। এ জগতের স্বতন্ত্র সত্তা এবং স্ফূর্ত্তি (ক্রিয়া) নাই। জগতের সত্তা ও স্ফূর্ত্তি,—ব্রহ্মেরই সত্তা ও স্ফূর্ত্তির উপর নির্ভর করে। শারীরক ভাষ্যে (২।১।১৪) শঙ্কর বলিতেছেন 'এ জগৎ স্বরূপতঃ অনুপাখ্য।" টীকাকার অর্থ করিতেছে যে, "তদ্রূপেণ সত্তাস্ফূর্ত্তি-শূন্যত্বাৎ।" অর্থাৎ এ জগতের নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই এবং স্বতন্ত্র স্ফূর্ত্তি নাই। তাহা হইলেই আমরা এই কথা পাইতেছি যে, ব্রহ্মেরই সত্তা ও স্ফূর্ত্তির উপরে এ জগতের সত্তা ও স্ফূর্ত্তি নির্ভর করে।

"উপদেশ সাহস্রী" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে, টীকাকার রামতীর্থ ১৪ প্রকরণের ১০ম শ্লোকের টীকায় বলিতেছেন যে,—"আন্তর বা বাহ্য যে কোন বিষয় বলা কেন, সমুদয় বিষয়ই ব্রহ্মের সত্তা এবং স্ফূর্ত্তি দ্বারা আলিঙ্গিত রহিয়াছে। এই সত্তা এবং স্ফূর্ত্তি আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। সুতরাং সত্তা এবং স্ফূর্ত্তি ব্যতীত

বিষয় কোথায়?" আমরা এস্থলেও ইহাই পাইতেছি যে, ব্রহ্মের সত্তা এবং স্ফূর্ত্তি ব্যতীত জগতের স্বতন্ত্র সত্তা ও স্ফূর্ত্তি নাই।

এই "উপদেশ সাহস্রী" গ্রন্থের ১৫ প্রকরণের ৯ শ্লোকের টীকাতেও স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে,—"জগতে যত কিছু বিকারী পদার্থ দেখিতেছ, যাবতীয় বিকারের মধ্যে ব্রহ্মেরই সত্তা ও স্ফূর্ত্তি অনুস্যূত রহিয়াছে। অতএব তত্ত্বদর্শীর কর্ত্তব্য যে, বিকারের মধ্যে সেই সত্তা ও স্ফূর্ত্তির অনুসন্ধান করা।" এস্থলেও আমরা ইহাই পাইতেছি যে, জগতে ব্রহ্মেরই সত্তা ও স্ফূর্ত্তি ব্যতীত অন্য কোন স্বতন্ত্র সত্তা ও স্ফূর্ত্তি নাই।

এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের ১৯ প্রকরণের ১০ শ্লোকে ও ৯ শ্লোকেও এই তত্ত্বই উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। তথায় বলা হইয়াছে যে,—"জড়ের স্বতন্ত্র স্ফূর্ত্তি নাই এবং ব্রহ্ম সত্তা ব্যতিরেকে জড়ের স্বতন্ত্র সত্তাও নাই।" ১৮ প্রকরণেও এই কথা আছে যে, "জড়-সংসার 'আগন্তুক' বলিয়া ইহার স্বতন্ত্র সত্তা ও ক্রিয়া নাই।"

সর্ব্বত্রই একই তত্ত্ব উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ শঙ্কর-ভাষ্য-ব্যাখ্যাতা মহামতি আনন্দগিরি, গীতায় এবং উপনিষদ্ গুলির ব্যাখ্যায় নানা স্থানে বলিয়াছেন যে, "ব্রহ্মই মায়াশক্তির সত্তাপ্রদ এবং স্ফূর্ত্তিপ্রদ।" অর্থাৎ জগৎ যে শক্তি হইতে জন্মিয়াছে, সেই শক্তিরও স্বতন্ত্র কোন সত্তা বা স্ফূর্ত্তি নাই।

ঐতরেয় ভাষ্যে (৫।৩), নিগুর্ণ ব্রহ্মকে "প্রজ্ঞান" শব্দে উল্লিখিত করা হইয়াছে। তৎপরে বলা হইতেছে যে,—"সর্ব্বংতৎ প্রজ্ঞানেত্রং, প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং।" শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং এবং টীকাকার জ্ঞানামৃত যতি এস্থলে স্পষ্ট বলিতেছেন যে,—এই প্রজ্ঞান ব্রহ্মের সত্তা দ্বারাই জগতের সত্তা এবং তাঁহার দ্বারাই জগতের ব্যাপার (ক্রিয়া) নির্ব্বাহিত হইতেছে। জগতের সত্তা ও স্ফুরণ অন্যের সম্পূর্ণ অধীন; কিন্তু ব্রহ্মের সত্তা ও স্ফুরণ অন্য কাহারও অধীন নহে।"

প্রিয় পাঠক, আমরা আর অধিক ভাষ্য ও টীকা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি না। উদ্ধৃত স্থলগুলি হইতে ইহা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শঙ্করের মতে, ব্রহ্মেরই সত্তা এবং স্ফুরণ—এই জগতে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং আমরা জগতের যে সত্তা ও ক্রিয়া সকল দেখিতেছি, উহা প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মেরই সত্তা ও শক্তিমাত্র, স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে।

আমরা এই সকল উক্তি দ্বারা ইহা পাইতেছি যে, শঙ্করের নিগুর্ণ ব্রহ্মের সত্তাও আছে এবং স্ফুরণও আছে। অতএব তাঁহার নিগুর্ণব্রহ্ম কোন প্রকার 'শূন্য' বস্তু নহে। তাঁহার নিগুর্ণব্রহ্ম সত্তা স্বরূপ এবং শক্তি স্বরূপ। শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে নিগুর্ণ ব্রহ্মকে 'পূর্ণ ও অনন্ত' বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব এই সকল বিকীর্ণ ভাষ্য ও টীকা গুলির সমুদয় সিদ্ধান্তকে একত্র সংগ্রহ করিলে আমরা ইহাই পাই যে, শঙ্করের নিগুর্ণব্রহ্ম পূর্ণ ও অনন্ত সত্তা ও শক্তি স্বরূপা। এই পূর্ণ শক্তি স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে।

শঙ্কর বলেন, এই জগৎ বিকাশিত হইবার পূর্ব্বে অব্যক্ত ভাবে ব্রহ্মে অবস্থিত ছিল। শঙ্করের প্রসিদ্ধ রত্নপ্রভা টীকাকার "শক্তির" এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"কারণাত্মনা লীনং কার্য্যমেব অভিব্যক্তিনিয়ামকতয়া শক্তিঃ" (২।১।১৮)।

এই বিকারী কার্য্য সকল যখন কারণাকারে লীন থাকে, তখন তাহাকেই "শক্তি" বলা যায়।

তবেই, এই জগৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে, ব্রহ্মে অব্যক্তশক্তিরূপে লীন ছিল। এই অব্যক্তশক্তিই জগদাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

জগৎ-সৃষ্টির প্রাক্‌কালে, পূর্ণশক্তি স্বরূপ ব্রহ্মে অব্যক্তভাবে যে শক্তি একাকার হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারই সর্গোন্মুখ পরিণাম হইল।* এই পরিণামকে আনন্দগিরি, রত্ন প্রভাকার এবং জ্ঞানামৃতযতি প্রভৃতি টীকাকারেরা "আগন্তুক" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা আগন্তুক কেন? এই পরিণামকে 'আগন্তুক' এই জন্য বলা হইয়াছে যে, ইহা পূর্ব্বে ছিল না; এই পরিণাম সৃষ্টির প্রাক্‌কালে মাত্র আবির্ভূত হইল। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে আবির্ভূত এই আগন্তুক পরিণামকে লক্ষ্য করিয়া ইহার নাম রাখা হইল—"মায়াশক্তি।"

এই মায়াশক্তি আর কিছুই নহে। পূর্ণশক্তি স্বরূপ ব্রহ্মে যাহা একাকার হইয়া লীন ছিল, ইহা সেই শক্তি ব্যতীত অন্য কোন স্বতন্ত্র শক্তি নহে। তবে যে ইহাকে পূর্ণশক্তি না বলিয়া ইহাকে একটা স্বতন্ত্র নাম দ্বারা 'মায়াশক্তি' বলিয়া বলা হইল, তাহার কারণ—সেই আগন্তুক পরিণামকে লক্ষ্য করা ব্যতীত কিছুই নহে।

যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা জানেন যে, ইহাকে 'মায়শক্তিই বল, আর যাহাই বল না কেন,—ইহা সেই পূর্ণশক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে একটা সর্গোন্মুখ পরিণাম হইল বলিয়াই যে, ইহা একটা কোন স্বতন্ত্র বস্তু, তাহা নহে।

এই জন্যই শঙ্করাচার্য্য বলিয়া দিলেন যে, ব্রহ্মের সত্তা ও স্ফূর্ত্তি ব্যতীত, মায়াশক্তির 'স্বতন্ত্র' সত্তা ও স্ফূর্ত্তি নাই। একথা বলাতে মায়াশক্তির অস্তিত্ব উড়িয়া গেল না। তথাপি লোকে মনে করে যে "শঙ্কর ব্রহ্মে শক্তি স্বীকার করিতেন না!"

তারপর পাঠক এখন আর একটা কথা বিবেচনা করিয়া দেখুন্। এই পরিণামিনী মায়াশক্তিরই ক্রমশঃ বিকার হইতে হইতে, এই বিকারী জগৎ প্রাদুর্ভূত হইল। এই জগৎ কি তাহাতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ হইল?

শঙ্করাচার্য্য শারীরক-ভাষ্যে (২।১।১৮) বলিতেছেন—"কার্য্যাকারোপি কারণস্য আত্মভূত এব। ন হি বিশেষ-দর্শন মাত্রেণ বস্তুন্যত্বং ভবতি"।

মায়া-শক্তি কারণ; এই জগৎ তাহার কার্য্য। কার্য্য যাহা, তাহা কারণেরই একটা বিশেষ অবস্থান্তর মাত্র। ঘট কার্য্য; মৃত্তিকা উহার কারণ। ঘট,—মৃত্তিকারই অবস্থান্তর মাত্র। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ঘট কি মৃত্তিকা হইতে একটা কোন স্বতন্ত্র বস্তু? তাহা কদাপি হইতে পারে না। ঘট—মৃত্তিকা-ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। উহা মৃত্তিকারই অবস্থান্তর মাত্র।

সুতরাং, এই জগৎও সেই মায়াশক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র। একটা বিশেষ অবস্থান্তর হইলেই কি কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে? যদি তাহাই হয়, তবে এই যে আমি এখন বসিয়া লিখিতেছি,—ইহার পরে যখন আমি আহার করিতে বসিব, তখন কি আমি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইয়া যাইব? তাহা কখনই হইতে পারে না। কার্য্যাকারে পরিণত হইলেই যে কারণটী তাহার স্বাতন্ত্র্য হারায়, তাহা নহে। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, শক্তি যদিও জগদাকারে

* "... ..অবিদ্যায়াঃ... ..বিবিধধর্ম্মসংস্কারায়োঃ সর্গোন্মুখঃ কশ্চিৎ পরিণামঃ"—রত্নপ্রভা, ১।১।১

পরিণত, তথাপি শক্তি কোন স্বাতন্ত্র্য বস্তু হইয়া উঠে নাই;—শক্তি নিজের স্বাতন্ত্র্য হারায় নাই।

অতএব জগতের যে সত্তা ও ক্রিয়া দেখা যাইতেছে, উহা সেই মায়াশক্তিরই সত্তা ও ক্রিয়া।

পাঠক দেখুন, ইহাতে জগৎ উড়িয়া যাইতেছে না। তথাপি লোকে মনে করে যে "শঙ্করমতে জগতের স্থান নাই!"

পাঠক যদি উপরি উল্লিখিত যুক্তিগুলি অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তবে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ কিরূপ, তাহা বুঝিতে আর কোন কষ্ট হইবে না।

এ জগৎ অভিব্যক্ত হওয়াতেও, শঙ্করের পূর্ণশক্তিস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মের কোনই হানি হয় নাই। 'মায়াশক্তি' স্বীকারেও, শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্মের কোন ক্ষতি হয় নাই।

কথাগুলি সমুদায় একত্র করিলে, শঙ্করের যুক্তিগুলি এইরূপ দাঁড়ায়:—

ব্রহ্ম সর্ব্বদাই পূর্ণ-সত্তা ও শক্তিস্বরূপ। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে শক্তির একটা সর্গোন্মুখ পরিণাম উপস্থিত হইল। কিন্তু শক্তির এই একটা আগন্তুক অবস্থান্তর ঘটিল বলিয়াই যে, উহা কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু হইয়া উঠিল, তাহা নহে। উহা সেই পূর্ণশক্তিই থাকিল। আবার এই পরিণামিনী-শক্তির যতই অবস্থান্তর হইতে লাগিল, ততই উহা পরিণত হইয়া, এই জগদাকার ধারণ করিল। কিন্তু শক্তির এই জগদাকারে অবস্থান্তর হইল বলিয়া, উহা যে একটা কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু হইয়া উঠিল, তাহা নহে। উহা যে শক্তি, সেই শক্তি-ই রহিল।

তাহা হইলেই পাঠক দেখুন, শঙ্করের অদ্বৈতবাদের কোন ক্ষতি হইল না। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ এইরূপ। ইহাতে শক্তিও উড়িয়া যায় না; জগৎও উড়িয়া যায় না। ইহাতে কেবল ইহাই পাওয়া যাইতেছে যে, ব্রহ্ম হইতে শক্তিও স্বতন্ত্র নহে, জগৎও স্বতন্ত্র নহে।

কিন্তু যাহাদের পরমার্থদৃষ্টি উৎপন্ন হয় নাই, যাহারা অজ্ঞানী,—তাহারাও কি এইরূপে জগৎকে ধারণা করে? শঙ্কর বেদান্ত ভাষ্যে (২।১।১৪) বলিতেছেন যে,—"যাহারা অজ্ঞানী, তাহারা এ জগৎকে 'সত্য' বলিয়া মনে করে।" অর্থাৎ অজ্ঞানীরা, এ জগতের নিজের স্বতন্ত্র সত্তা আছে বলিয়া মনে করে। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা জানেন যে এ জগৎ 'অসত্য'। অর্থাৎ তাঁহারা জানেন যে এ জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ব্রহ্মেরই সত্তা ও স্ফুরণ এ জগতে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। তত্ত্বদর্শীরা জানেন যে, এ জগৎ 'কল্পিত'। 'কল্পিত' কাহাকে বলে? "যন্ন স্বতঃ সিদ্ধং তৎকল্পিতং" (উপদেশ সাহস্রী)। যাহা স্বতঃসিদ্ধ নহে, তাহাই কল্পিত। অর্থাৎ যাহার সত্তা অন্যের সত্তার উপরে নির্ভর করে, তাহাকে কল্পিত বলা যায়। ব্রহ্মসত্তাতেই এ জগতের সত্তা, সুতরাং এ জগৎ 'কল্পিত'। পাঠক দেখুন, এই সিদ্ধান্তে কি জগৎ অলীক হইয়া উড়িয়া গেল?

জগৎ সম্বন্ধে যে কথা, জগতের উপাদান (মায়াশক্তি) সম্বন্ধেও সেই কথা। যাহারা অজ্ঞানী, তাহারাই এই শক্তিকে স্বতন্ত্র একটা শক্তি বলিয়া মনে করে। ফলতঃ এ শক্তি স্বতন্ত্র নহে। সুতরাং এ শক্তিও 'অসত্য'। অর্থাৎ পূর্ণশক্তিস্বরূপ ব্রহ্মেরই সত্তা ও স্ফুরণ,—এই শক্তিতেও অনুস্যূত হইয়া আছে। বস্তুতঃ এই শক্তি,—পূর্ণশক্তি

স্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। এইজন্য শঙ্কর বেদান্তভাষ্যে (১।১।২২) স্পষ্ট বলিয়াছেন যে,—"যদি তোমাদের 'প্রকৃতি-শক্তি' স্বতন্ত্র কোন পদার্থ হয়, তবে তাহাতেই আমাদের আপত্তি। আর যদি তোমরা প্রকৃতিকে, আমাদের অস্বতন্ত্র 'অব্যক্তশক্তির ন্যায়, ব্রহ্ম হইতে স্বাধীন বলিয়া মনে না কর, তবে তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। আমরাও এইরূপ শক্তি স্বীকার করিয়া থাকি।" পাঠক দেখুন, শঙ্কর শক্তিকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই।

এই স্বতন্ত্রতা লইয়াই শঙ্কর, সাংখ্যের সঙ্গে বিবাদ বাধাইয়াছেন। সাংখ্যেরা প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলেন। সাংখ্যেরা প্রকৃতিকে সত্য বলেন এবং সাংখ্যেরা প্রকৃতিকে জ্ঞেয় বলেন। শঙ্কর প্রকৃতিকে স্বীকার করেন, কিন্তু প্রকৃতির স্বতন্ত্রতা মানেন না। শঙ্কর বলেন, প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা নাই; উহা ব্রহ্ম-সত্তার অধীন। শঙ্কর বলেন, প্রকৃতি সত্য নহে; যাহার নিজের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তাহা সত্য হইতে পারে না; তাহা কল্পিত। শঙ্কর বলেন, প্রকৃতি জ্ঞেয়ও হইতে পারে না; ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞেয়। প্রকৃতি সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মেরই বোধের উপায় মাত্র। (বেদান্ত-ভাষ্য, ১।৪।৪ ও ৯)।

প্রকৃতির এই স্বতন্ত্রতা-সম্বন্ধে শঙ্কর তাঁহার "উপদেশসাহস্রী" গ্রন্থে দর্পণের একটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আমরা তাহাই উল্লেখ করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

সম্মুখবর্ত্তী দর্পণে আমার মুখের একটী প্রতিবিম্ব পড়িল। এই দর্পণস্থ মুখটী আমার মুখ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিকৃত। দর্পণের কাঁচের জন্য এবং আরো নানা কারণে উহা কিঞ্চিৎ বিকৃত হয়। কিন্তু বিকৃত হইলেও উহা আমারই মুখ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। দর্পণস্থ মুখের নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই; আমার মুখেরই সত্তা ও স্ফুরণে, দর্পণস্থ মুখেরও সত্তা ও স্ফুরণ। আমার মুখ ছাড়া দর্পণস্থ মুখের স্বতন্ত্রসত্তা ও স্ফুরণ নাই বলিয়া, উহাকে একভাবে 'অসত্য' বলা যায়। অসত্য কেন? যাহার নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তাহাই অসত্য। কিন্তু তাই বলিয়া, দর্পণস্থ মুখ অলীক নহে। এস্থলে আরো একটী তত্ত্ব বুঝা যাইতেছে। আমার মুখ কিন্তু দর্পণস্থ মুখ হইতে স্বতন্ত্রই রহিয়া যাইতেছে। কেন না, দর্পণ ভাঙ্গিয়া ফেল বা দর্পণস্থ মুখের যাহাই কর না কেন, আমার মুখের তাহাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না।

এইরূপ, প্রকৃতি শক্তি যদিও পূর্ণশক্তি-স্বরূপ ব্রহ্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিকৃত (পরিণামিনী), তথাপি উহা সেই পূর্ণশক্তি ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। পূর্ণশক্তিস্বরূপ ব্রহ্মেরই সত্তা ও স্ফুরণের উপরে উহারও সত্তা ও স্ফুরণ নির্ভর করিতেছে। পূর্ণশক্তি ছাড়া উহার নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। কিন্তু তাই বলিয়া উহা অলীক হইয়া উড়িয়া গেল না।

বোধ করি, শঙ্করের অদ্বৈতবাদের প্রকৃত অভিপ্রায় সুস্পষ্ট হইয়াছে। শঙ্করের অদ্বৈত-বাদ এইরূপ।* শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

* এই প্রবন্ধটী, গত ফাল্গুন সংখ্যার প্রকাশিত প্রবন্ধের শেষ।

নবসমাগম।

যুদ্ধ বিগ্রহ সেকালেও হইত, একালেও হয়। এক দেশের লোক অন্য দেশে গিয়া বল পূর্ব্বক তাহার স্বাধীনতা হরণ করে,—ইহা পূর্ব্বেও ছিল, এখনও হয়। কি এ সকল পূর্ব্বে এত মারাত্মক ছিল না; এখন তদপেক্ষা অতীব সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে। তখনকার বিজেতৃগণ অপেক্ষা এখনকার বিজেতৃগণ অধিকতর ধ্বংস ক্রিয়ার অভিনয় করিতেছেন। তখন অধিকাংশ স্থলেই শক্তি পরীক্ষা, বিজয় গৌরব—এই সকলই প্রধান লক্ষ্য থাকিত। এখন তাহা প্রায় নাই। একালে বাণিজ্যই যুদ্ধ বিগ্রহ ও দেশ জয়ের প্রধান কারণ। প্রধানতঃ এই উপলক্ষেই এখন এক দেশের লোক অন্য দেশে যাইতেছে। তথায় বাণিজ্য স্থানীয় লোকের সহিত নানা প্রকার সংসর্গে আসিতেছে; তাহাদিগের অন্ন মারিবার জন্য নানারূপ নিষ্ঠুর আসুরিক ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতেছে। অবশেষে ছলে বলে কৌশলে তাহাদিগের রাজ্য অপহরণ করতঃ ঐ সকল আসুরিক ব্যাপার দ্বিগুণ বাড়াইবার সুবিধা করিয়া লইতেছে। ঐ সকল স্থলে বাণিজ্যই মূল লক্ষ্য। এই উপলক্ষে বিভিন্ন জাতীয় মানবের যে সংসর্গ হইয়া থাকে, তাহার ফল জীব-বিজ্ঞানের দিক হইতে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

বিভিন্ন জাতীয় মানবগণের প্রথম সম্মিলনে পরস্পরের মনেই কৌতুহল, বিস্ময় ইত্যাদি ভাবের উদয় হয়। কিন্তু যাহারা দূরদেশ হইতে আগত, তাহারা নূতন স্থানে আসিয়া, নূতন চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকায় ঐ সব ভাব-স্রোতে নিশ্চেষ্ট ভাবে ভাসিয়া যাইবার অবসর পায় না। বিশেষতঃ তাহারা উদ্যোগী, সাহসী ও কর্ম্মী; নচেৎ দূরদেশে আসিতই না। তাহারা অর্থ লাভের নানা চেষ্টায় নানা কর্ম্ম করিতে থাকে। যে পরিমাণে তাহাদিগের কর্ম্ম-ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়, সেই পরিমাণে তদ্দেশবাসিগণের কর্ম্মক্ষেত্র সংকীর্ণ হইয়া যায়। নবাগতেরা আদিমবাসীদিগের শ্রম লাঘব করিয়াই উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া লয়। এই হেতু আদিমবাসীদিগের কর্ম্মক্ষেত্র সংকীর্ণ হইতে হইতে ক্রমে তাহাদিগের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা নবাগতদিগের উদ্যম ও কর্ম্মশীলতা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হয়, এবং ক্রমে আত্মনির্ভরতা হারাইতে থাকে, তখনই তাহাদিগের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। * কর্ম্ম দেহ ও মনকে প্রফুল্ল, বলিষ্ঠ ও সতেজ রাখে। অধ্যবসায় এবং শ্রমশীলতা ব্যতীত বাণিজ্য হয় না। এ নিমিত্ত নবাগতগণ উত্তরোত্তর অধিক কর্ম্মী ও উদ্যমশীল হইয়া উঠে। তারপর দূরদেশে আসিয়া উহারা একতা-সূত্রে আবদ্ধ হয়। নচেৎ অল্প সংখ্যক ব্যক্তি বিপুল জনসঙ্ঘের মধ্যে আত্মরক্ষা করিতেই সমর্থ হয় না। একতা, সাহস, অধ্যবসায়, উচ্চাশা—এ সকল তাহাদিগের ক্রমেই বাড়িয়া উঠে। আর সেই পরিমাণে যদি আদিমবাসিগণের চেষ্টা ও

* মহাত্মা ডারউইন বলিয়াছেন, এ অবস্থায় Natives become bewildered and dull by the new life around them; they lose the motives for exertion, and get no new ones in their place. Descent of Man (1906) p 283.

উদ্যোগ করিয়া যায়, তবে অল্প কাল মধ্যেই তাহারা নবাগতদিগের নিকট পরাস্ত হয়। নবাগতগণ যদি সাত্বিক ভাবে অনুন্নত এবং পশুভাবে অধিকতর উত্তেজিত হয়, তাহারা যদি ন্যায়, নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞান বর্জ্জিত হয়, তবে অচিরে এরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার সকল অনুষ্ঠিত করিয়া তুলে যে,আদিমবাসিগণ ভীত, ত্রস্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। নবাগতবণ বাণিজ্যের জন্য যতদূর পশুভাবাপন্ন হইতে পারে, তাহার চরম দৃষ্টান্ত ইংরাজ কর্তৃক ট্যাস্‌ম্যানিয়ায় মানুষ শিথার! ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে উহারা ট্যাস্‌ম্যানিয়ার আদিম নিবাসীদিগকে পশুবৎ শিকার করিয়াছিল! তাহাতে ১২০ জন মাত্র অবশিষ্ট ছিল, আর সকলকেই উহারা গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল! * হা বিধাতঃ, এই অমানুষিক ঘটনা সত্য না হইলে, কেহ কি কল্পনাও করিতে পারিত যে, মানুষে মানুষ শিকার করে! সে বেশি দিনের কথা নহে, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে। ইহাদিগের অসাধ্য কর্ম্মই নাই।

ভিন্ন দেশে আসিয়া অর্থ লোভে এবং উদরান্নের নিমিত্ত নবাগতগণ বিবিধ নীচ বৃত্তির আধার হয়। সে সকল দেখিয়া শুনিয়া আদিমনিবাসিগণ ভগ্নপ্রাণ হইয়া যায়। ইহারা যদি ন্যায় ও ধর্ম্মে উন্নত অবস্থাপন্ন হয়, তবে ইহারা দুর্বিনীত মানব-চরিত্র দর্শনে একেবারে ম্রিয়মান হইয়া পড়ে। মহাত্মা ডারউইনের ভাষায় বলিতে গেলে ইহাকেই 'depression of spirits' বলা যায়। ইহাই মানসিক অবসাদ। নবাগতগণ বাণিজ্য ব্যপদেশে যে সকল নিষ্ঠুর কর্ম্ম সাধন করে, রাজশক্তি প্রাপ্ত হইলেও সেই বৈশ্য বৃত্তির হ্রাস হয় না। কারণ তদ্রূপ স্থলে রাজশক্তিও বৈশ্যবৃত্তিরই পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহে। পুরাকালে বৈশ্যত্ব ধর্ম্মমূলক ছিল; বর্ত্তমান যুগে প্রায় কোন স্থলেই সে ভাব দৃষ্ট হয় না। সুতরাং নবাগতগণের অর্থ লোভ ও অর্জ্জন-স্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইলে দেশীয়গণের হস্ত হইতে অন্নমুষ্টি খসিয়া পড়ে। অবশেষে তাহাদিগর উদরান্নের সংস্থানও চলিয়া যায়। তখন তাহারা শীর্ণ, রুগ্ন ও অবসন্ন হইয়া ক্ষুধায়, পীড়ায় ও নৈরাশ্যে দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই হৃদয়বিদারক ধ্বংসলীলা এ যুগের বাণিজ্য-নীতির চিরসহচর।

যে দেহ অন্নহীন, ক্ষুধার্ত্ত, শীর্ণ, সে নানা পীড়ার আবাসভূমি। পুষ্ট ও সবল দেহে পীড়ার বীজ বিশেষ অনিষ্ট করিতে সক্ষম হয় না। সবল রক্তকীটগণ * পীড়ার বীজ বিতাড়িত করে ও দূষিত অংশ সকল আত্মসাৎ করতঃ সংশোধিত করিয়া লয়। তাই পীড়া মারাত্মক হইতে পারে না। কিন্তু অন্নহীন শীর্ণ-দেহে রক্তশূন্য কঙ্কালে, সে সম্ভাবনা কোথায়? তাই দলে দলে মৃত্যু ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না। যাহারা মরে, তাহারা ত বাঁচে; কিন্তু যাহারা জীবিত থাকে, তাহারা অপত্যোৎপাদন করিতে ক্রমেই অক্ষম হইয়া পড়ে। যে সকল অপত্য জন্মগ্রহণ করে, তাহারাও অনেকেই বাল্যাবস্থায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই মানবলীলা সম্বরণ করে। এ অবস্থার পরিণাম যাহা, তাহা আধুনিক বাণিজ্য-নীতির বিষময় শেষ-ফল।

নবসমাগমের অপরিহার্য্য ফল।

দূরবর্ত্তী বিভিন্ন জাতীয় মানব সমাগমের অপরিহার্য্য ফল, পীড়া। যখন বিভিন্ন

* Ibid p 284.

* Phagocytes.

জাতীয় মানবগণের প্রথম সমাগম হয়, তখন তাহাদিগের সংস্রবজনিত, কি জানি কি এক অজ্ঞাত কারণে, আদিম-নিবাসিগণের মধ্যে নূতন নূতন পীড়া আসিয়া উপস্থিত হয়। * ঐ পীড়া সকলের পরিণাম অতি মারাত্মক হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্তস্থল এতদ্দেশের ম্যালেরিয়া, প্লেগ, কলেরা ইত্যাদি। আয়ুর্ব্বেদে এ সকলের উল্লেখ নাই। এই নবসমাগম-জনিত পীড়ায় অসংখ্য লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জগতের প্রধান প্রধান যুদ্ধ-বিগ্রহেও এত অধিক লোকক্ষয় হয় না। ইহাতে আদিম-নিবাসিগণের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে। জন্ম সংখ্যা দ্বারা তাহার পূরণ হয় না। আরণ এ অবস্থায় শিশুদিগের মৃত্যু সংখ্যা অনেক অধিক হইয়া উঠে। রুগ্ন ও নির্জীব লোকের সন্তান বাঁচিবে কেমন করিয়া? তাই একদিকে যেমন মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়া যায়, অন্যদিকে জন্ম-সংখ্যা দ্বারা তাহার পূরণ হয় না। আর ক্রমে, এই জন্ম-সংখ্যাও হ্রাস হইতে থাকে।

নবসমাগমের আর একটী গুণ, জনন-হীনতা। ইহাতে জনন-শক্তিরই হানি করে। জীবরাজ্যে এই নিয়ম অল্পাধিক পরিমাণে প্রায়সর্ব্বত্রই প্রযোজ্য, কিন্তু মানবে ইহার প্রধান কারণই খাদ্য, পরিচ্ছদ,আচার,ব্যবহার ইত্যাদির পরিবর্ত্তন। মানব সমাজে সর্ব্বত্রই দেখা যায়, একজাতীয় মানব বিভিন্ন জাতীয় মানবের সহিত সংস্পৃষ্ট হইলে পরস্পরের সংসর্গ বশতঃ পরস্পরের মধ্যে ঐ সকল বিষয়ে অল্পাধিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। আপনা হইতেই অনুকরণ-বৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। এই বৃত্তি মনুষ্যের যেমন অশেষ কল্যাণকর, তেমনই অনিষ্টজনক। শিশু এই বৃত্তি হইতেই যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষা করে। এই অতি স্বাভাবিক বৃত্তি, বিভিন্ন জাতীয় মানবের সংসর্গ হইলে, পরস্পরের আচার ব্যবহারে পরস্পরের মধ্যে অল্পাধিক প্রচলিত করে। ভাল মন্দ, ইষ্টজনক অনিষ্টজনক বিবেচনা করিবার অবসর দেয় না। নবব্যবহার সকল নূতনত্ব বশতঃই এক হইতে অপর কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। খাদ্য, পরিচ্ছদ, আচার, আচরণ, চলা ফেরা কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু আদিম-নিবাসীদিগের যে পরিমাণ পরিবর্ত্তিত হয়, অধিকাংশ স্থলেই নবাগতদিগের তদ্রূপ হয় না। বিশেষতঃ নবাগতগণ শক্তিশালী হইলে, অথবা রাজশক্তি লাভ করিলে, তাহাদিগের ব্যবহার অতিমাত্রায় আদিমনিবাসীদিগকে পরিবর্ত্তন করিয়া তুলে। এ সকল ঘটনা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু ইহার ফল কি? প্রাচীন আচার ব্যবহারের, খাদ্য পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন হইলে কি ফল উৎপন্ন হয়? ফল জনন-শক্তির খর্ব্বতা। ইহাতে জনন-শক্তি ক্রমে হ্রাস হইতে হইতে বংশলোপ হইয়া উঠে। মানব প্রাকৃতিক বহু পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে। চির-তুষারময় দেশ হইতে অগ্নিকুণ্ড তুল্য মানব বাস এবং বংশবৃদ্ধি করিতেছে। কিন্তু খাদ্যাদির পরিবর্ত্তন মানব সহ্য করিতে অক্ষম। ইহাদিগের জনন-যন্ত্রাদি এতই সহজে আক্রান্ত হয় যে, ঐ সকল বিষয়ে সামান্য পরিবর্ত্তন হইলেও মানব তাহা সহ্য করিতে সক্ষম হয় না। কোন জীবের জনন-যন্ত্রই এই সকল পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে না। মানব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় অক্ষম হয়। আচার ব্যবহারের সামান্য পরিবর্ত্তনেই মানবের জন্ম-

* It further appears, mysterious as is the fact, that the first meeting of distinct and separated people generates disease.
Ibid P. 283.

হীনতা উপস্থিত হয়; ও শিশুগণের মৃত্যু সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। সেই সকল নবাগত আচার ব্যবহার সাক্ষাৎ স্বরূপে অনিষ্টজনক অথবা অস্বাস্থ্যকর না হইলেও উহার ফল অতীব মারাত্মক। * উহা হইতে জন্ম-হীনতা, পীড়া এবং অবশেষে জাতীয় বিলোপ আসিয়া উপস্থিত হয়। এ তত্ত্ব এখন পণ্ডিতমণ্ডলীতে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে। যে জাতি চিরাতীত কাল হইতে বংশ পরম্পরায় যেরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছে, সে জাতি তাহার পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে অক্ষম। অসভ্য মানবও সম্পূর্ণ রূপে অক্ষম, সভ্য মানবও অনেকাংশে অপারক। যে দেশে যে জাতির যেরূপ খাদ্য, পরিচ্ছদ, ব্যবসায়, আচার আচরণ বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, তাহার পরিবর্ত্তন করা সহজও নহে, করাও বিপজ্জনক।

তাহার পর, আর একটী কথা বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। নবসমাগমের ফলে যদি এক জাতি আর এক জাতির অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিষময় ফল আরও সত্বর উৎপন্ন হয়। অধীন জাতি প্রভুগণের আচার ব্যবহার, খাদ্য পরিচ্ছদ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, সুতরাং জনন-হীনতা ও পীড়া অতি সত্বর আসিয়া উপস্থিত হয়। একেত অধীনতার স্বাভাবিক ফলই জনন-হীনতা ও পীড়া; তাহার পর আচারাদি পরিবর্ত্তনে ঐ ফল দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে। সমস্ত জীব রাজ্য পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অধীনতা, অর্থাৎ পরপুষ্টতা, গৃহপালিতাবস্থা, এবং অবরোধ,—এ সকল অনেক স্থলেই জনন-হীনতা উৎপাদন করে। মানবেও এ ফল বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। সুতরাং এসকল হইতেও মানব যথেষ্ট পরিমাণ আক্রান্ত হয়। অধীনতা আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন সাধিত করে, এবং তদ্ধেতু জনন-হীনতার পীড়া ও অবশেষে জাতীয় বিলোপ উৎপন্ন করিয়া নিবৃত্ত হয়।

নবসমাগম কি সর্ব্বনাশকর! আচার ব্যবহারাদির পরিবর্ত্তন কি মারাত্মক! ইহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায় কি? উপায় স্বাবলম্বন ও স্ব-ভাব। যাহা নিজের তাহা রক্ষণীয়, যাহা পরের তাহা বর্জ্জনীয়। অমর কবি মধুসূদন এই মহা শিক্ষা দিবার নিমিত্তই বলিয়াছেন।

নিগুর্ণ স্ব-জন শ্রেয়ঃ, পর পর সদা।

শ্রীশশধর রায়।

* The most potent causes of extinction appear in many cases to be lessened fertility and ill-health especially amongst children arising from changed conditions of life, notwithstanding that the new conditions may not be injurious in themselves. * * * The births have been few and the deaths numerous. This may have been in a great measure owing to their change of living and food......and depression of spirits.

Ibid p 284—5.

আমাদের শত্রু কে?

শুভক্ষণে লর্ড কর্জ্জন, বাঙ্গালা দেশ দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, বাঙ্গালীর সামাজিক একতা সাধনের পথ এক বিন্দু প্রশস্ততর করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইতর ভদ্র, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ, সকলেই এক অনিষ্ট-চিন্তা-পরিচালিত হৃদয়ের উত্তেজনার অধীন হইয়া, সমবেত ভাবে, ইহার প্রতিকার চেষ্টা করিয়াছে। প্রতিকার সুদূর-পরাহত দেখিয়া, ইংরাজ-রাজের বিচার বুদ্ধিতে প্রতিকার প্রত্যাশায় নিরাশ হইয়া, বাঙ্গালীর সমগ্র সমাজ-দেহ জাগ্রত হইয়া প্রতিশোধ লইতে ব্যস্ত হইয়াছে। পিপীলিকার পরিণাম শোচনীয় হইলেও, সমবেত পিপীলিকার শক্তি একদিন ক্ষণেকের জন্যও, বিশাল-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানবকেও বিব্রত করিতে পারে। আমরা দেখিয়াছিলাম, বাঙ্গালীর সমবেত পিপীলিকা-শক্তি প্রবল ইংরাজ-রাজকেও বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলন ও স্বদেশজাত পণ্য দ্রব্যের প্রচলন চেষ্টা ইংরাজজাতির অর্থোপার্জ্জনে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে, ইংরাজ ব্যবসাদারগণ নির্ব্বিঘ্নে ও পরমানন্দে যে অন্নের গ্রাস, ভারতবাসীর বুকে বসিয়া, ভারতবাসীর অনশন-ক্লান্ত কাতর দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া, আপনাদের শ্রীমুখে সাদরে তুলিয়া দিতেছেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ বাধা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, এতেই ইংরাজ জাতির ভাবনার সীমা নাই। লাঙ্কেশায়ারে ও ম্যান্চেষ্টারে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। অনেক কারবার বন্ধ হইবার আয়োজন দেখিয়া ইংলণ্ডের ধনী দরিদ্র উভয় সম্প্রদায়ই চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছে। পিপীলিকার সমবেত-শক্তির সঙ্কোচ-সাধনে সম্পূর্ণ সক্ষম মানবশক্তি ক্ষণেকের জন্য আপনাকে বিব্রত মনে করিয়াছে বলিয়াই, সহসা স্বদেশভক্ত বাঙ্গালী-বীরগণ, বাঙ্গালীর নেতৃবৃন্দ, তন্দ্রালস নয়নে স্বদেশের সমুত্থান কল্পনা করিয়া স্বরাজ-প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

এই স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার কল্পনা, কোথাও কোথাও, কোন কোন হৃদয়ে, সামান্যাকারে সঙ্কল্পে পরিণত হইতে যাইতেছে সত্য, কিন্তু এই স্বরাজ সাধনা কে করিবে? মুকুলিত পুষ্প ফল ধারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কীটাক্রান্ত হইলে যেমন হয়, স্বরাজ-সাধনায়ও তাহাই হইয়াছে। কোথায় স্বরাজ, তাহার সংবাদ নাই, আর এত শীঘ্র এরূপ একটা বৃহদনুষ্ঠানের সংবাদ পাওয়াও সম্ভব নহে, কিন্তু শুভদিনের সূচনার পূর্ব্বে মানবহৃদয়ে যে নিষ্ঠা, যে অনুরাগ, যে কাতরতা, যে পরাক্রম, যে প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন, তাহা কই? তর্কের স্থলে না হয় স্বীকার করিলাম যে, আমাদের অনুদার হৃদয় তাহা অনুভব করিতে পারিতেছে না—আমাদের মলিন-দৃষ্টি তাহা দেখিতে পাইতেছে না। কিন্তু "গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি"র ন্যায় স্বরাজ রূপ কাঁদির ভাগাভাগি দেখিয়া এবং কল্পিত স্বরাজের আশ্রয়ে আপন আপন সুখ,

সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধনের চেষ্টা দেখিয়া অবাক্ হইতে হইয়াছে। একশ্রেণীর নেতৃদল "ঔপনিবেশিক স্বরাজ" মন্ত্রের উপাসনা করিতেছেন বলিয়া পরিচয় পাড়িতেছেন। এই ঔপনিবেশিক স্বরাজবাদীদের জানা উচিত যে, এদেশে ঔপনিবেশিক স্বরাজ কোন দিনই হইবে না, হওয়া সম্ভব নহে। যে যে কারণ বর্ত্তমান ছিল বলিয়া অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানেডা, ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ঐরূপ স্বরাজ সম্ভব হইয়াছে, সে সকল কারণ এদেশে বর্ত্তমান নাই, কোনও দিন সেরূপ অবস্থার সংঘটনও সম্ভবপর নহে।

আর এক শ্রেণীর স্বরাজবাদী মারাট্টাবীর প্রাতঃস্মরণীয় শিবাজী মহারাজের আদর্শে স্বরাজ-সংস্থাপনে ব্যস্ত, ইঁহাদের কথা ও কথার অন্তর্নিহিত-ভাবের মূল্য অনেক অধিক, সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই ভবানীর উপাসক শিবাজী মহারাজের সাধনা ও সিদ্ধি-লাভের প্রধান সম্বল সে "রামদাস স্বামী" কই? সে আত্মবিক্রয় ও রাজ্য-দানের অতুল মহিমা কই? হিন্দু-মুসলমানে সে সমদর্শন কই? সে তীব্র-স্বদেশানুরাগ, সে উগ্র আত্ম-বিসর্জ্জন, সে দারুণ-পণ কখন বঞ্চনার সঙ্গে বসবাস করে না। যাহারা আপনাকে বাঁচাইতে ও বাড়াইতে চায়, তাহাদের সাধ্য নাই যে, মারাট্টাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে। যাহারা লোকের মুখাপেক্ষা করে, যাহারা দু' পয়সায় উঠে বসে, যাহাদের প্রাণ ধারণ অন্যের দয়ার উপর ন্যস্ত, তাহারা যেন শিবাজী মহারাজের নামের দোহাই দিয়া রসনাকে কলঙ্কিত না করে। এরূপ গর্হিত অনুষ্ঠান দ্বারা স্বরাজ-সাধনা সুদূরপরাহত হইয়া পড়িবে।

আর একশ্রেণীর লোক এই স্বদেশী আন্দোলন ও স্বরাজ-সাধন অবলম্বন করিয়া দেশের সর্ব্ববিধ কুসংস্কার ও কুরীতি ও জাতীয় কলঙ্ক গুলিকে বজায় রাখিবার জন্য এবং সেই সকলের পক্ষ-সমর্থন দ্বারা আত্মোদর পূরণের চেষ্টায় বিব্রত। আমরা আজ এই শ্রেণীর লোক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চাই। এটা একটা সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য কথা যে, যাহার যুক্তিমার্গ যত দুর্ব্বল, তাহার আলোচনা, তাহার কথাবার্ত্তা ততই অভদ্রজনোচিত ইতর ভাষায় পরিণত হয়। ইতর-ভাষা গুছাইয়া সাজাইয়া বলিতে পারায় যে বাহাদুরি প্রকাশ পায়, এই শ্রেণীর লোক সেই বাহাদুরির বাহবায় মাতোয়ারা। এই শ্রেণীর লোকেই মনে করে, অমুক দলকে বা ব্যক্তিকে খুব "গালাগালি দিয়াছি।" সত্যের অনুসন্ধান করা, সত্যানুসন্ধানে মতভেদ উপস্থিত হইলে যথোপযুক্ত সম্মান সহকারে তাহা প্রদর্শন করা, ইহাদের চিন্তা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের গণ্ডির বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। আক্ষেপের বিষয়, আমাদের দেশের কয়েক খানি বাঙ্গালা সংবাদ পত্র আজ কাল এই স্বদেশী-আন্দোলনের মস্তকমুণ্ডন করিয়া আপন আপন রুচি, প্রবৃত্তি ও সমাজ-জ্ঞানের পরিচয় দিতে এবং তদ্দ্বারা দেশের সাধারণ হিত-সাধনের সমূহ অনিষ্ট-সাধন করিতে বদ্ধপরিকর। আর এরূপ হওয়াও বিচিত্র নহে, কারণ অভিভাবক-শূন্য অথবা কর্ত্তৃত্ব করিতে অক্ষম ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে পরিবারবর্গ যেমন উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে, ঠিক সেইরূপ, সমাজ-পরিচালনে অক্ষম ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত সমাজে মানুষও স্বেচ্ছাচারী হইয়া আত্মমর্য্যাদা ও অপর ও দশ জনের মর্য্যাদা নাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না।

হিন্দুধর্ম্ম ও প্রাচীন হিন্দু-সমাজের নিত্য

নৈমিত্তিক জীবনের বিষয়ে এখনকার লোকদের অভিজ্ঞতা বড়ই অল্প। আমরা আমাদের বাল্যাবস্থায় হিন্দু-সমাজের রীতি-পদ্ধতি যাহা দেখিয়াছি, তাহা তুলনায় যে এখনকার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সহসা তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে অবস্থা আর ফিরিয়া আসিতে পারে না। কারণ প্রত্যেক পরিবর্ত্তনই এমন কিছু কিছু কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহার মূলোৎপাটন করা অনেক সময়ে সমাজশক্তিতে কুলাইয়া উঠে না। বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের মূলে কি কি কারণ বর্ত্তমান, তাহা একবার স্থিরভাবে আলোচনা করিয়া দেখা ভাল।

চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও, গ্রামপ্রান্তবাসী দিনহীন দরিদ্রের এক মুষ্টি অন্নাভাব ছিল না। উদরপূর্ণ আহার প্রত্যেক ব্যক্তির সহজ-প্রাপ্য ছিল। বর্ত্তমান সময়ে অন্নকষ্ট ও তাহার সংগ্রহে জীবন-সংগ্রাম ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে। অসংখ্য হিন্দুসন্তান বৎসর বৎসর কেবল অন্নাভাবে ও অন্নাভাব-নিবন্ধন নানারোগে আক্রান্ত হইয়া লোক-লীলা সম্বরণ করিতেছে। হিন্দু-সামাজিকগণ এই লোকক্ষয়ের নিবারণের কি কোন উপায় চিন্তা করিয়া থাকেন ?

২। ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া, ইংরাজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের রীতিপদ্ধতি স্বচক্ষে দেখিয়া, ইংরাজের সমাজ ও রাজনীতির অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া, ইংরাজের সুবিশাল স্বাধীন সাহিত্যের জ্ঞান লাভ করিয়া, দেশের শিক্ষিতমণ্ডলীর ও সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষিত লোকমণ্ডলীর রুচিপ্রবৃত্তি, আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি এত অধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে যে, এ সকলের উপর হস্তক্ষেপ করিতে হিন্দু-সামাজিকগণের শক্তি আছে কি না, সন্দেহ। লোকের ধোপা নাপিত ও পুরোহিত বন্ধ করাই ইহার একমাত্র ঔষধ নহে, এরূপ বন্ধ করাকে সমাজ-শাসন ও সমাজ-পালন বলে বলে না। এরূপ করিলে প্রপীড়িত ব্যক্তির সহজেই সমাজের উপর ঘৃণা ও সমাজ উপেক্ষা করিবার ভাব প্রবল হয়। সামাজিকগণ কি এদিকে দৃষ্টিপাত করিবার শক্তি ধারণ করেন ?

৩। সমাজ সময়ের অনুগামী। একই শাস্ত্র, একই ধর্ম্ম ও একই সামাজিক রীতিপদ্ধতির অধীন হিন্দু-সমাজ আসমুদ্র হিমালয় বিস্তৃত। পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে মণিকর্ণিকার স্নানে মারাট্টা, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, উড়িয়া, বেহারী ও বাঙ্গালী, একই মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন, গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদানেও সেই একই মন্ত্র উচ্চারিত হয়, শ্রীক্ষেত্রে একই রীতিপদ্ধতির অধীন হইয়া আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকল জাতিই পূজা করিতে ও প্রসাদ পাইতে অধিকারী, কিন্তু লৌকিক আচার ব্যবহারে এই সমগ্র হিন্দুসমাজ কত প্রকার বিভিন্নতার লীলাক্ষেত্র, হিন্দু-সামাজিকগণ কি সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া উচ্চ উদারভাবে চলিতে ও লোকরক্ষা করিতে সক্ষম নহেন ? অবগুণ্ঠনের পরাকাষ্ঠা মাড়ওয়ারী মহিলামহলে বর্ত্তমান, কিন্তু ইহারা পরে ঘাঘরা (গাউনের নামান্তর মাত্র) মারাট্টা-মহিলারা দীর্ঘবস্ত্রে পুরুষের ন্যায় কাছা ও কোঁচা দিয়া কাপড় পরিয়া থাকে। বাঙ্গালীর ঘরের লোক কথায় বলে, দশহাত কাপড়েও মহিলার লজ্জা নিবারণ হয় না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ অসংখ্য দেশাচারই কি ধর্ম্ম ? তাহা যদি না হয়, তবে শাস্ত্রের মূল গুলির আশ্রয় লইয়া অবান্তর নিয়মবলীতে প্রত্যেক

ব্যক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করাই কি সমাজ-রক্ষার পক্ষে কল্যাণকর নহে? প্রধানগণ কি এদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিবেন?

৪। নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুগণ হিন্দুসমাজে দীর্ঘকাল ধরিয়া লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত হইয়া ক্রমশঃ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে এবং এরূপে মধ্যভারতে, মান্দ্রাজে ও পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থানে অসংখ্য লোক বৎসরের পর বৎসর হিন্দু-সমাজ ও হিন্দু-ধর্ম্মের সুবিশাল ক্রোড়-শূন্য করিয়া আশ্রয়ান্তর গ্রহণ করিতেছে, এই বিষয়ে প্রত্যেক দশ বৎসরান্তরের আদম-সুমারিতে দৃষ্টিপাত করিলেই উত্তমরূপে চৈতন্যোদয় হইতে পারে। সংবাদ-পত্র বিশেষ এই সংবাদে ক্ষুণ্ণ না হইতে পারেন, বলিতে পারেন, মহাসমুদ্রবৎ হিন্দুসমাজের এক গণ্ডুষ জল গেল আর থাকলো, তাতে বিশেষ আসে যায় না। তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থ ক্রয় করিবার জন্য জনকতক লোক থাকিলেই তাঁহারা নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। এইরূপ বুদ্ধিকেই কি সমাজ-রক্ষার উপযোগী বুদ্ধি বলিব?

৫। সকল দেশেই মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর লোক-মণ্ডলীই দেশের শ্রীসম্পদ—দেশের শক্তি-সামর্থ্য এই শ্রেণীর হস্তেই ন্যস্ত থাকে। ইংলণ্ডের পৃথিবী-ব্যাপী সম্মান-সম্ভোগের মূলে ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকমণ্ডলীই শক্তিরূপে দণ্ডায়মান। সর্ব্বত্রই এই এক নিয়ম কার্য্য করিতেছে। বিগত পনের বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক বিবরণীতে বাঙ্গালাদেশের এই মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর লোক সংখ্যা হ্রাসের সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের দগ্ধভাগ্যে সংবাদ-পত্র-সম্পাদকেরাও এ সকল সংবাদ রাখেন না, রাখিলেও জনসাধারণের সর্ব্ববিধ কল্যাণ-কামনা-পরিচালিত সংবাদ-পত্রগুলি এ সকল গুরুতর সমাজ-সমস্যায় লেখনী-ধারণে সাহসী হন না। ইতর-জনোচিত রঙ্গ-রসে মাতোয়ারা হইয়া লোকের ইতরবৃত্তির তৃপ্তি-সাধনে ও দুটী পয়সা উপার্জ্জনেই ব্যস্ত। বাঙ্গালায় মধ্যবিত্ত-শ্রেণী লোপ পাইতে বসিয়াছে, একবার পল্লীগ্রাম সমূহের সংবাদ সংগ্রহ কর, দেখিবে, দশ বৎসর পূর্ব্বের সঙ্গে আজ তুলনায় জনসংখ্যা কত হ্রাস হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে যত প্রকার বিপৎ-পাতের সূচনা হইয়াছে, সে সকলের মধ্যে এই বিপদই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। দেশের বর্ত্তমান রাজশক্তি এ বিষয়ের প্রতিকারে ব্যস্ত নহেন, এদেশের হিন্দু-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্নসংস্থান-সমস্যায় রাজশক্তি বিব্রত ও বিপন্ন। রাজা নূতন প্রদেশের সৃষ্টি করিয়া, মুসলমান-প্রধান পূর্ব্ববঙ্গে গুণা-গুণ নির্ব্বিশেষে মুসলমান প্রতিপালনে ব্যস্ত। আর আসমুদ্র হিমালয় সমগ্র ভারতবর্ষে আপাততঃ ইংরাজরাজ, তাঁহাদের ভারতীয় বংশধরগণের প্রতিপালনে ব্যস্ত। সুতরাং যতই দিন যাইতেছে, বঙ্গের অবশিষ্ট হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকমণ্ডলী ততই অসহায় ও অন্নহীন হইয়া পড়িতেছে। অধুনা রাজনীতির প্রয়োজনানুরূপ পরিচালনে বঙ্গের মধ্যবিত্ত হিন্দু সন্তানগণই অধিকতর বিপন্ন। এই অসংখ্য মধ্যবিত্ত হিন্দু সন্তানগণের লোক-যাত্রা নির্ব্বাহে সমাজ-শক্তির যেরূপ সহায়তার প্রয়োজন, সামাজিকগণ তাহার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত কিনা? যদি এসকল গুরুতর বিষয়ে সমাজ-প্রধানগণের দৃষ্টি না পড়ে, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা নাম মাত্র প্রধান, তাঁহাদের শক্তি সামর্থ্য বড়ই অল্প, নাই বলিলেই হয়। এই শক্তিহীন মনুষ্যমণ্ডলী কোন দিন কোন কাজই সম্পন্ন

করিতে সক্ষম হইবে না। আর এই সকল সমাজ-ব্যাধির প্রতিকারে অক্ষম ব্যক্তিগণ নিরাপদে সামাজিক অবনত অবস্থা বজায় রাখিতে ব্যস্ত হয়। যাহা আছে, তাহাই ভাল, যেমন চলিতেছে তেমনি চলুক, এতে নূতন উদ্যম ও নূতন আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। আর বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তনে কতক বর্জ্জন ও কতক গ্রহণের কথা উঠিলেই, এই শ্রেণীর লোকের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, অথবা লেখনী মুখে দাবানলের সৃষ্টি করিয়া সমগ্র দেশ দগ্ধ করিতে উদ্যত হয়। আমরা অনেক দিন ধরিয়া কয়েকখানি সংবাদ পত্রের এরূপ দৌরাত্ম্য সহ্য করিতেছিলাম, কিন্তু আপাততঃ আমাদের দু একটী কথা বলার প্রয়োজন হইয়াছে, তাই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

সংপ্রতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বালিকা বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। হিন্দু-রীতি অনুযায়ী স্বঘর নির্ব্বাচন করিয়া, হিন্দু অনুষ্ঠান অনুসারে এই বিবাহ সম্পন্ন করিয়াছেন। এতেই দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আন্দোলন এত তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে যে, সে আন্দোলনের তরঙ্গমালা ক্ষণেকের জন্য স্বদেশী-আন্দোলনকেও মন্দীভূত করিয়াছে, এমন কি, স্বরাজবাদী দলের তাম্বুতে গিয়া তরঙ্গাঘাত করিয়াছে। তাঁহাদের সাধের তাম্বু (camp) আদ্র হইয়াছে। এমন কি, এই স্বরাজবাদীদের মধ্যে কার্য্যতঃ বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী পরিচালকগণও, আপন আপন কৃত বিধবা বিবাহানুষ্ঠান, অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য, বিস্মৃত হইতে চান। হায়, তাঁহারা যদি কিছু দিন পূর্ব্বে ঋষিদৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেন যে, বঙ্গের ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে তাঁহারা চক্রধারী হইবার সুযোগ পাইবেন, তাহা হইলে পত্নী-নির্ব্বাচনে সে সময় সাবধান হইতেন, এখন এই বিধবা-বিবাহের নূতন আন্দোলনে ক্ষুণ্নমনে কাল যাপন করিতে হইত না; স্বরাজ-সাধনায় বিধবা বিবাহ প্রশ্ন জলাঞ্জলি দিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি হইত না। বিধবার পাণি-পীড়নই পীড়ার কারণ হইয়াছে। এসব ত হইল। আমরা শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটী উক্তিতে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ ও ব্যথিত হইয়াছি। তাঁহার প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা অসীম। তাঁহার সঙ্গে পরিচয়ের দিন হইতেই শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রপাত হইয়াছিল। তিনি এখন নবোদ্যম-সম্পন্ন যুবাপুরুষ নহেন, তাঁহার বয়সের সঙ্গে বিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাই বেদনার কথা বলিলাম। কথাটী এই :—তিনি আশুবাবুর কন্যার বিবাহ বিষয়ে আলোচনা-ক্ষেত্রে আশু বাবুকে "উপবীত" ত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার মত বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির লেখনীতে এরূপ অন্যায় অসঙ্গত অবজ্ঞার ভাব কেন প্রকাশ পাইল? আশু বাবু কন্যার বিধবা বিবাহ দিয়া শাস্ত্রানুসারে হিন্দুর অননুষ্ঠেয় কোন কাজ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কার্য্যের পোষকতা করিতেছে। এই বালিকা-বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়া আশু বাবু দেশাচারের বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকিতে পারেন, লৌকিক সীমা অতিক্রম করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তিনি শাস্ত্রাদেশের বিরুদ্ধ কার্য্য করেন নাই।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিপাদিত শাস্ত্রালোচনা এখনও ভ্রম প্রমাদপূর্ণ বলিয়া

প্রতিপন্ন হইতে বিলম্ব আছে, সুতরাং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বঙ্গবাসীর" হাওয়ায় পড়িয়া কেন আত্মবিস্মৃত হইলেন এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দুকে এরূপ কঠোর কথা কেন বলিলেন, তাহ। বুঝিলাম না। যদি আশু বাবুর উপবীত ত্যাগ সমাজের পক্ষে অশেষ কল্যাণের কারণ বলিয়া তিনি অনুভব করিয়া থাকেন, আর এরূপ স্থলে উপবীত ত্যাগ করাই তাঁহার মতে শাস্ত্রসম্মত বিধান হয়, তবে ইতিপুর্ব্বে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই কথাটা তাঁহার বলাই কর্ত্তব্য ছিল, কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহার পুত্রের বিধবা বিবাহানুষ্ঠান সুসম্পন্ন করাইয়াছিলেন। তৎপরে বাঙ্গালা দেশের বহু বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের বহু বহু ক্রিয়া-কলাপে তিনি সমাজনায়ক রূপে বর্ত্তমান থাকিতেন, তাঁহার স্বর্গারোহণের অল্প দিন পুর্ব্বেও তিনি মাতৃভক্ত স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন। যে কাজ করিয়া বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজে অক্ষুণ্ণ প্রতিপত্তি লাভের অধিকারী, ঠিক সেই কাজ করিয়া আশু বাবু কেন তিরস্কার-ভাজন হইলেন, ইহাই আমাদের চিন্তার অতীত। সহসা মনে হয়, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বঙ্গবাসী"র বিকারে বিকারগ্রস্ত হইয়া এইরূপ অসঙ্গত প্রলাপ বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। আর একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক, সেটা এই, বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়া আশু বাবু যদি উপবীত রক্ষায় অধিকারে বঞ্চিত হন, তবে এত অসংখ্য অনধিকারী যে উপবীত গ্রহণ করিয়া সমাজে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিতেছে, তাহাদের বিষয়ে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নীরব কেন? এতেই বোধ হয় পদস্থ ব্যক্তিকে হীন করাই বর্ত্তমান সমাজধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে।•

আমরা সংস্কারের পক্ষপাতী হিন্দু, বঙ্গবাসীর নিকট চিরদিনই তীব্র কটাক্ষের পাত্র হইয়া রহিয়াছি। বঙ্গবাসীর সর্ব্ব-প্রথম কর্ণধার ও লেখকমণ্ডলী সবই সংস্কারপ্রিয় দলভুক্ত। বঙ্গবাসীর প্রথম খণ্ড হইতে বৎসরাধিক কাল পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ইত্যাদি সে সময়ের সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকগণ ইহার লেখক। "বঙ্গবাসী" এই সকল খ্যাতনামা ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় সবল হইয়াই সর্ব্বাগ্রে ইহাদিগকেই আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। এরূপ সংবাদ পত্রের ধর্ম্মজ্ঞান ও অর্থচিন্তায় সামঞ্জস্য কতটা আছে, তাহা প্রাচীনগণ সকলেই অবগত, এরূপ স্থলে বঙ্গবাসী যে আশু বাবুর কন্যার বিবাহ লইয়া ভদ্ররীতি বিরুদ্ধ আলোচনায় মাতিয়া উঠিবে, ইহাই স্বাভাবিক। দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় যে, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কুলশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রনাথ বাবু এই প্রবীণ বয়সে বঙ্গবাসীর আসরে অবতরণ করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কারের পরিচয় পাড়িলেন। এক্ষণে বঙ্গবাসীর সম্পাদকীয় প্রবন্ধাবলীর আলোচনা অনাবশ্যক। হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ প্রধান সমাজ, হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ মাথার মণি, "কানু বিনা কীর্ত্তন" ও "ব্রাহ্মণ-হীন হিন্দু সমাজ" এখনও অসম্ভব। কখন সম্ভব হবে কি না, বলিতে পারি না। বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণেতর জাতির পরিচালিত সংবাদ পত্র। ব্রাহ্মণ প্রধান হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে শূদ্র-পরিচালিত সংবাদ পত্রের যেরূপ সংযত-বাক্ হওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য, তাহা বঙ্গবাসীর স্বভাববিরুদ্ধ, সুতরাং বঙ্গবাসীর

সঙ্গে এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া সমাজপ্রধান ব্যক্তিদিগের পক্ষে কোন মতেই বিধেয় নহে, কারণ বঙ্গবাসী আপনাকে আস্থাবান হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা বঙ্গবাসীর পক্ষে গুরুতর অপরাধ এবং প্রাচীন সংস্কার হিসাবে শ্রদ্ধাস্পদ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্রাহ্মণ-জনোচিত কর্ত্তব্য-জ্ঞান উজ্জ্বল থাকিলে অবশ্যই তিনি শূদ্রের সঙ্গে একযোগে ব্রাহ্মণের সম্মান হরণে অগ্রসর হইতেন না। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে তিনি ব্রাহ্মণ-জনোচিত ধীরতা সহকারে স্বতন্ত্র পুস্তিকা প্রণয়ন দ্বারা আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিতেন। তাঁহার পক্ষে শূদ্রের সহিত একযোগে ব্রাহ্মণের মানহানির আয়োজন দেখিয়া আমাদের মনে এই সংস্কার দৃঢ় হইল যে, এদেশের পরিণাম বড়ই ভয়ঙ্কর দেশের লোকের অন্নাভাব ও হাহাকার-ধ্বনি পড়িয়া রহিল, অসংখ্য লোক বৎসর বৎসর অনাহারে শমনসদনে প্রেরিত হইতেছে, সে দিকে ব্রাহ্মণ-জনোচিত দৃষ্টি ও আলোচনার প্রয়োজন নাই, অসংখ্য লোক সমাজ-ক্রোড় শূন্য করিয়া অন্য সমাজভুক্ত হইতেছে, তাহার প্রতিবিধানে চেষ্টা নাই, দেশের শ্রীসম্পদ মধ্যবিত্ত-শ্রেণী লোপ পাইতেছে, সে বিষয়ে ব্রাহ্মণ-জনোচিত প্রতিকার-পরায়ণতা নাই। যত শক্তি সামর্থ্য, যত বিদ্যা বুদ্ধি, যত যুক্তি-তর্ক, সমস্ত একত্র করিয়া বিধবার সহমরণ ও অভাবে ব্রহ্মচর্য্য বিধানে পর্য্যবসিত। বালিকা বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়া পরিণাম শোকাবহ ও লজ্জাজনক হইলে "আমি করব কি" বলিয়া অপরাধ ভার বালিকা বিধবার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া আপনারা প্রবীণ ও বৃদ্ধ বয়সে একাধিক পত্নী গ্রহণের পথ খোলা রাখিয়া নিশ্চিন্ত। এ সংসারে আসিয়া দীর্ঘকাল কাটাইলাম, আমাদের দেশের সমাজ সম্বন্ধে যাহা যাহা দেখিলাম, সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি মানবের উক্তি, আচার ব্যবহার যাহা শুনিলাম ও দেখিলাম, তাহাতে মনে হয় যে, মানুষ পশুরও অধম। অনেক জ্ঞান অর্জ্জনের সুযোগ পাইয়া মানুষ তাহা ইতর কার্য্যেই প্রয়োগ করে, তাহা না হইলে এই "বঙ্গবাসী" আর এই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-প্রমুখ লোকমণ্ডলী আশু বাবুর বালিকা কন্যার বিধবা বিবাহে সমাজের ও হিন্দুধর্ম্মের যেরূপ বিপদ সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন, গত বৎসর জামালপুরে মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তি ভগ্ন হওয়ায় ইহার শতাংশের একাংশ আন্দোলনেও মাতিয়া উঠেন নাই। ভারতবর্ষে যে হিন্দু-শক্তি খর্ব্ব, হিন্দু-সংস্কার ও বিশ্বাস যে লোপ পাইয়াছে, তাহা ত গত বৎসর জামালপুরে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে, যে ধর্ম্ম দেব ধ্বংসে বিনাশ-প্রাপ্ত, আশু বাবুর বালিকা বিধবা কন্যার বিবাহ না হইলেই সেই ধর্ম্ম ও সেই ধর্ম্মালঙ্কৃত হিন্দু সমাজ বজায় থাকিত, না থাকিবে? কেবল কথার মালা গাঁথিয়া, বেল ফুলের মালার মত এক পয়সা দু পয়সায় বিক্রয় করিলেই কি সমাজ ও ধর্ম্ম রক্ষা পাইবে? "সন্ধ্যা"সম্পাদকের হিন্দুয়ানী, "নবশক্তির" নবজাগরণ ও প্রবীণা "বঙ্গবাসীর" নিদ্রালস ঈষদ্দৃষ্টি, এই বাড়ীর নিকট কলিকাতা মহা নগরীতে আশু বাবুর কন্যার বিবাহ প্রবল ঝড়ের আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু গত বৎসরে সুদূর ময়মনসিংহের পল্লী, প্রান্তে জামালপুরের প্রতিমা ধ্বংসের ফটো

তুলিয়া জনসমাজে হিন্দু শক্তি, হিন্দু বিশ্বাস ও হিন্দু সংস্কারের উচ্চ পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। মুসলমানের মসজিদে হাত দিতে রাজশক্তির সাহসে কুলাইল না, তাই হ্যারিসন রোড্ নির্ম্মাণে হিন্দু দেবালয় ধ্বংস ও মুসলমানের মসজিদ স্বস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত। নিত্য যাতায়াতে দেখ নাই কি, কলেজষ্ট্রীটে ইডেন হাঁসপালের প্রাঙ্গণ বৃদ্ধির সময়ে, মসজিদটী মনুমেণ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া, প্রাঙ্গণের সৌষ্ঠব হরণ করিতেছে, মস্জিদ উঠাইবার সাহস হইল না! শিথিল- বিশ্বাস ও শিথিল-সংস্কার এইরূপেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে, কাঁদা-কাটি করিলে, গালাগালি দিলে সমাজ-ব্যাধির নিরাকারণ ও নিবারণ হইবে না। আমাদের শেষ নিবেদন এই যে, ভাগবতী লীলা-সূত্রে এদেশের এই জাতীয় জাগরণের দিনে যদি আমরা কর্ত্তব্যের নির্ব্বাচনে অক্ষম হই, ন্যায়ান্যায় বিচার পরিশূন্য-হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তিগত অধিকারকে আক্রমণ করি, তাহা হইলে ভগবানের পালনীশক্তিই সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিবে এবং আমরা বিনষ্ট হইব। আজ মাননীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আর দশজন গৃহস্থ যদি সংস্কার ও বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আপন আপন বিধবা বালিকা কন্যার বিবাহ দেন, তবে তাহাতে সমাজ-দেহ এতটা উছলিয়া উঠিবে কেন? প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার পারিবারিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের অধিকার অন্যের হস্তগত হইতে পারে না। আশু বাবুর ন্যায় বিদ্বান ও পদস্থ ব্যক্তি আপন কর্ত্তব্য নিদ্ধারণে যদি শাস্ত্রসম্মত অধিকারটুকু নিজে গ্রহণ করিতে না পারেন, আর সেই কর্ত্তব্য নিদ্ধারণ ভার যদি শ্রীমতী "বঙ্গবাসী"-প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে একবাক্যে বলিতে হয় "বঙ্গসমাজ তুমি রসাতলগত গত হও, ভারত-মহাসাগর ভারতবর্ষকে ডুবাইয়া দিক।"

স্বদেশী আন্দোলন, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজ স্বরাজবাদীদের হিসাবে একই পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ দেশের বর্ত্তমান বিভিন্ন ধর্ম্ম ও বিভিন্ন জাতি সমূহের সম্ভবমত মিলন সাধন ও তদ্দ্বারা সমগ্র জাতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন চিন্তা ও স্পৃহা দিন দিন ক্ষুদ্রতর সীমার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা এইটাই সমূহ অকল্যাণের কারণ। এই শ্রেণীর সঙ্কীর্ণতার দৃঢ় নিগড়ে এদেশ আবদ্ধ হইতে চায় না, সুতরাং এরূপ হাতে মাথা কাটিবার শক্তিও এদেশবাসী কোনদিন অর্জ্জন করিতে পারিবে না। কোন ক্ষমতা নাই, ঢোঁড়ার গর্জ্জনেই বঙ্গবাসী দেশ জর্জ্জরিত করিতে চাহিতেছে, এতে অনিষ্ট করিবার শক্তি সঞ্চারিত হইলে কি আর বঙ্গবাসী-প্রমুখ ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহারও মানমর্য্যাদা রক্ষা পাইবে? সুতরাং স্বদেশ স্ববশে আসার আশা মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় চির দিনই দূরে দূরেই থাকিবে। স্বরাজবাদী বন্ধুমণ্ডলীকে বলি, তোমাদের যদি ক্ষমতা থাকে, তবে অগ্রে স্বদেশ-দ্রোহীদের শাসন কর, তাহাদের রসনা ও লেখনী সংযত কর, তাহাদিগকে শাসনের অধীন করিতে যদি না পার, তাহাদিগকে দেশের স্থায়ী কল্যাণের পরম শত্রু বলিয়া জনসমাজকে বুঝাইয়া দাও। জনসমাজ এই শ্রেণীর লোকদিগকে পরিত্যাগ করিলেই ইহারা আপনা আপনি শাসিত হইবে।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত আশুতোষ

মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ করি, তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া বীরের কার্য্য করিয়াছেন, এখন তিনি বিদ্যাসাগরের অনুকরণে এই সকল সমালোচনা উপেক্ষা করিয়া আর একটু অগ্রসর হউন। তাঁহার সুযোগ ও সুবিধা অসীম। তিনি চেষ্টা করিলে আর ২১০টী বালিকা বিধবার বিবাহে সহায়তা করিয়া পঙ্গুর আস্ফালনের তীব্রতা দমন করিতে পারেন। এ বিষয়ে তিনি আর একটু মনোযোগী হইলে তাঁহার নিকট অধিকতর কৃতজ্ঞ হইব। আমাদের এই অনুরোধ যে, তাঁহার নিজ কন্যার বিবাহেই তাঁহার ন্যায় মহদাশয় ব্যক্তির সমগ্র শক্তি সামর্থ্য ফুরাইয়া না যায়। তিনি আর ২১০টী বিবাহে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইলেই বঙ্গবাসী-প্রমুখ দল হয় নীরব হইবে, না হয় প্রলাপ বকিতে বকিতে নাড়ী ছাড়িবে। আশু বাবু কর্ম্মবীর, তাঁহার নিকট আমরা বীরোচিত কর্ম্মেরই প্রত্যাশা করিয়া থাকি।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কমলাকান্ত কথা-লহরী।

প্রঃ—সেদিন যোগযুক্ত জন্মভূমি-ভক্তগণের মধ্যে মহাত্মা ক্রম্‌ওয়েল ও গারিবাল্‌দির নাম করিলেন। তাঁহারা উভয়েই বিদেশীয়। ঐতিহাসিক যুগে ওরূপ লোক কি ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই?

উঃ—কেন করিবেন না? অতি অল্প দিনের কথা, পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ উক্ত প্রকারের পরাক্রম দেখাইয়া গিয়াছেন। উদয়পুরের রাণা প্রতাপ সিংহ আর এক জন। পরন্তু এই শ্রেণীর যে কয় জন ইদানীং অর্থাৎ পৌরাণিক যুগের পর, এদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তন্মধ্যে সকল বিষয়ে মহাভাগ শিবাজী শ্রেষ্ঠ।

প্রঃ—মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের সংস্থাপক শিবাজী সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি, যদি কৃপাপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বলেন, কৃতার্থ হই।

উঃ—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নানা ভাষার গ্রন্থাদিতে শিবাজীর জীবনচরিত বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে; তোমরাও যে তাহার কিছু কিছু না পড়িয়াছ, এমন নহে। তবে আমি তোমাদিগকে সংক্ষেপে তাঁহার অমূল্য জীবন সম্বন্ধেও গোটা কতক কথা বলিব। শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী ভিন্ন শিবাজী কিছুই নয়। প্রকৃত গুরুবলে বলীয়ান হইলে মানুষ কি না করিতে পারে, শিবাজী তাহার জীবন্ত প্রমাণ। "বলং বলং ব্রহ্মবলং" এই সনাতন সত্য নিজ জীবনে প্রচার করিয়া শিবাজী অমর হইয়াছেন। ঈশ্বর ও গুরুতে অচলা ভক্তি এবং গুরুকে ঈশ্বরের দৃশ্যমান মূর্ত্তি বোধে পূজার্চ্চনা তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা ও দুর্জ্জয় পরাক্রমের মূলে পরিলক্ষিত। জগদ্বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেক্‌জান্দার, অদম্য-প্রতাপ জুলিয়স্‌ সিজার, অমিত-তেজ তৈমুরলঙ্গ, অদ্বিতীয় রণবিদ্যা-বিশারদ নেপোলিয়ন, পুরুষসিংহ রণজিৎ প্রভৃতি বাহুবলে এক এক সময় মেদিনীকে কাঁপাইয়া গিয়াছেন, সন্দেহ নাই, তাঁহারাও বিধাতারই ইঙ্গিতে বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়াছেন, উহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না, —বিশ্বেশ্বরের হুকুম ভিন্ন গাছের একটী

পাতাও নড়ে না, জানিবে। পরন্তু ইঁহারা কেহই ধর্ম্মযোদ্ধা ছিলেন না। শাস্ত্রে বলে "ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতোবহ্পি তেন লোকত্রয়ং জিতং।" সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধে যিনি জীবন আহুতি দেন, তাঁহার দ্বারা ভূর্ভুবস্ব তিন লোক জিত হয়। শিবাজী এবম্বিধ ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া জয়লাভান্তে যোগযুক্তাবস্থায় তনুত্যাগ করেন।

প্রঃ--মহাত্মা রামদাস স্বামী কে ছিলেন, এবং তাঁহার সহিত শিবাজীর মিলন কিরূপে হয়, শুনিতে ইচ্ছা করি।

উঃ—শিবাজীর জন্মের উনিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে গোদাবরীতীরস্থ কোন গ্রামে ব্রাহ্মণ-কুলে রামদাসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম সূর্য্যাজীপন্ত, মাতার নাম রাণুবাই। পিতামাতা তাঁহাকে নারায়ণ নাম প্রদান করেন, পরে সন্ন্যাসব্রতাবলম্বী হইলে সমর্থ রামদাস স্বামী নামে অভিহিত হন। এরূপ কথিত আছে যে, তাঁহার পিতা কোন যজ্ঞ সমাপনান্তে যে সময় পূর্ণাহুতি দিতে যান, সেই সময় হঠাৎ একজন ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। যজ্ঞান্তে বর প্রার্থনা নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত দোষের বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ সূর্য্যাজী বর-গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন;—তিনি একজন বিষয়বাসনা-বিবর্জ্জিত প্রকৃত সাধু পুরুষ ছিলেন। অবশেষে রাণুবাই আসিয়া পুত্র কামনা প্রকাশ করিলে আগন্তুক ব্রাহ্মণ কহেন "তোমার দুইটী পুত্র হইবে। কনিষ্ঠটী মহাপ্রভাবশালী তপস্বী হইয়া সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা দ্বারা অশেষ খ্যাতিলাভ করতঃ সংসারে অমর হইবেন। তাহাকে পবননন্দন হনুমান বলিয়া লোকে পূজা করিবে।"

যথানিয়মে পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে রামদাসের উপনয়ন ও বিদ্যারম্ভ হয়। বালকের স্মৃতিশক্তি এতই প্রবল ছিল যে, স্বল্পকালের মধ্যে তিনি সমগ্র বেদ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন। সাত বৎসর বয়সে রামদাস পিতৃহীন হইয়া পঠদ্দশাতেই গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হন। পরন্তু অবসর পাইলেই অপোগণ্ড নারায়ণ গোদাবরীর নির্জ্জন তটে বা নিকটস্থ কানন মধ্যে উপবেশন করতঃ বিশ্বের নানাবিধ রহস্য ভেদ করিবার উদ্দেশ্যে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন; ঐ অবস্থায় এক এক দিন এমন আত্মহারা হইয়া পড়িতেন যে, আহার নিদ্রা মনে থাকিত না, অনেক অন্বেষণের পর ধরা দিতেন, এবং গৃহে আনীত হইয়া তিরস্কার প্রহার ভোগ করিতেন। এবম্বিধ বিড়ম্বনা সত্ত্বেও তিনি ঐ অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, বরং উহা তাঁহার নিকট আরও মিষ্টতর বোধ হইতে লাগিল।

সে সময়ে এখনকার মত পাশ্চাত্য স্বাধীনতার ভাব দেশে ছড়াইয়া পড়ে নাই। নরপাল স্বদেশী হউন আর বিদেশী হউন, সে বিষয় কাহারও বড় মাথাব্যথা ছিল না; ভূপতি হইলেই তাঁহাকে দেবাংশ বোধে পূজা করাই হিন্দুর কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল। যিনিই রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন, তাঁহার শাসনাধীনে যদি হিন্দুধর্ম্মের কোনরূপ ব্যাঘাত না হইত, তাহা হইলে প্রজাবর্গ সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে হৃদয়ের ভক্তি প্রদান করিয়া প্রীতি বোধ করিত। এই কারণে হিন্দুগণ মহাত্মা আকবর বাদসাহকে "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" বলিয়া পূজা করিতে কখন দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার প্রপৌত্র আওরঙ্গজেবের শাসনকালে

হিন্দু-প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি অত্যাচার ও তাহাদের ধর্ম্মের প্রতি যেরূপ আঘাত আরম্ভ হয়, তাহাতে স্বদেশবৎসল হিন্দুমাত্রেই অত্যধিক ব্যথা প্রাপ্ত হন। সেই নিদারুণ জাতীয় বেদনার প্রতিকার জন্যই রামদাসের আবির্ভাব জানিতে হইবে। সুতরাং যে ধারায় চলিলে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সাধনের পন্থা সুগম হইবে, তাহা তিনি ছাড়িবেন কি প্রকারে ?

মহাপুরুষদিগের হৃদয়ে কোন দেশের বা সমাজের একটা গুরুতর অভাবের বিষয় অত্যুজ্জ্বল রূপে চিত্রিত হইয়া কেবলমাত্র তাহার দূরীকরণ প্রয়াসে তাঁহাদের সমস্ত জীবন অতিবাহিত হয়। জ্ঞান হওয়া অবধি জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে তাঁহারা কেবল ঐ একদিকেই পরিচালিত হইয়া থাকেন, অন্য কোন প্রকার সাংসারিক ধান্দা তাহাদের মনে স্থান পায় না। নারায়ণ উপরোক্তরূপ চিন্তায় নিরত থাকা কালীন অষ্টম বর্ষ বয়সে একদিন বিধর্ম্মী রাজার অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে স্বদেশকে মুক্ত করতঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনঃ স্থাপন জন্য নির্জ্জন বনে বসিয়া একটী মহাসঙ্কল্প করিলেন :—অবিবাহিত থাকিয়া একাকী সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন; নিজে কঠোর দারিদ্র্য-ব্রতাবলম্বী হইয়া দেশের দৈন্য দূর করিতে যত্নবান হইবেন, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণান্তর ভারতে সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করতঃ লোক সমূহকে ভগবদভিমুখী করিতে চেষ্টা পাইবেন। এই সংকল্পের পরমুহূর্ত্ত হইতে বালকের চিত্ত প্রসন্নতাময় হইল, হৃদয়ে সহস্র মাতঙ্গের বল পঁহুছিল, আর যেন সে নারায়ণই নয়; এতদিন যে বিষাদভাবে তিনি সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ থাকিতেন,তাহা যেন কোথায় উড়িয়া গেল, ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘান্ধকারের পরিবর্ত্তে উজ্জ্বল রবিকিরণে তাঁহার হৃদাকাশ প্রদীপ্ত হইল। সমস্ত মনের কথা মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রকাশ করিয়া বলা সত্বেও তাঁহারা তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং রাণুবাইয়ের কাতরোক্তিতে নাচার হইয়া মাতৃভক্ত পুত্রও জননীর মতে একপ্রকার মত দিলেন। ক্রমে বিবাহের দিন স্থির হইল, মাতার আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু হায়! হায়! সকলকে নিরাশাসাগরে ভাসাইয়া আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণের সমক্ষে সন্ন্যাসব্রতাবলম্বী বাল-ব্রহ্মচারী নারায়ণ বিবাহমণ্ডপ হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন। অনেকে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইয়াও তাঁহাকে আর ধরিতে পারিল না।

এইবার নারায়ণের প্রকৃত জীবন-কার্য্য আরম্ভ হইল। স্বল্পকাল গোদাবরী-তীরস্থ পুণ্যক্ষেত্র পঞ্চবটীতে অবস্থানন্তর ভারতের সম্যক অবস্থা পর্য্যালোচনার উদ্দেশে নানা-তীর্থ-পর্য্যটনে নিযুক্ত হইলেন। এই সময় হইতে তিনি সমর্থ রামদাস স্বামী নামে পরিচিত হইয়া মাতৃভূমির উদ্ধারকল্পে ভিখারীর বেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া দেশের সর্ব্বপ্রকার অধোগতির সংবাদ-নিচয় সংগ্রহ করেন এবং মধ্যে মধ্যে হিমালয় ও তাহার অপরপারস্থ সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধাশ্রমের যোগী মহাপুরুষগণের নিকট যোগশিক্ষা দ্বারা মহাজ্ঞানের উচ্চ-শিখরে আরোহণ করতঃ কৃতার্থ হয়েন।

সন্ন্যাসিগণের একটা নিয়ম আছে যে, তাঁহারা দ্বাদশ বর্ষ কাল অন্তর এক একবার জন্মভূমি দর্শন করিয়া থাকেন, তদনুসারে রামদাস গৃহত্যাগের বার বৎসর পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এখন তিনি একজন প্রকৃত মহাপুরুষের পদপ্রাপ্ত, তাঁহার বহু শিষ্য প্রশিষ্য। রামদাসের সদাপ্রফুল্ল সুচারু

বদন, অলৌকিক তেজ ও শ্রীসম্পন্ন মনোহর কান্তি, অমায়িক সরস ব্যবহার, সুমধুর বচন এবং হৃদয়গ্রাহী উপদেশাবলী আপামর সাধারণের চিত্তে যাদুমন্ত্রের ন্যায় প্রভাব বিস্তার করতঃ জাতীয় জীবনে একটা অভিনব পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল। এই সময়ে তিনি সুবিখ্যাত "দাসবোধ" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ইহাতে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও ব্যবহার-নীতি সম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় প্রাঞ্জল-ভাষায় অতি সুন্দররূপে বিবৃত।

এইবার শিবাজীর সহিত পুণ্যশ্লোক রামদাসের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার কথা আরম্ভ করি। পুণার সরকারী মহাফেজখানায় * রক্ষিত মাহারাষ্ট্রা সাম্রাজ্যের বৃতান্ত সমূহ হইতে শ্রীযুক্ত আনন্দরাও কর্ত্তৃক সংগৃহীত সংবাদ দ্বারা জানা যায় যে,১৫৭১ শালিবাহিনী শকের (১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দ) বৈশাখী শুক্ল নবমী তিথিতে শিবাজী গুরুদেব সমর্থ রামদাস স্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

মহারথ শিবাজীর জীবন-চরিত পাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি একজন পরম ভাগবত ছিলেন; এজন্যু রামদাস তাঁহাকে "যোগী" আখ্যা প্রদান করেন। যে সূত্রে তাঁহার চিত্ত শ্রীগুরুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং অবশেষে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন লাভ হয়, তাহা নিতান্ত অসাধারণ। একদা কোন আদর্শ-চরিত্র সন্ন্যাসী কথকের মুখে দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক মহাভাগ ধ্রুবের দীক্ষাসম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে একটা অভিনব তৃষ্ণার উদ্রেক হয়। হরিকথা শুনিতে তিনি চিরকালই অনুরক্ত ছিলেন এবং তচ্ছ্রবণে সর্ব্বদা ভক্তিবিহ্বল হইতেন; পরন্তু এবার তাঁহার মনে যে এক নূতন ভাবের সঞ্চার হইল, তাহার বেগ সম্বরণ করা যেন তাঁহার সাধ্যাতীত। উক্ত স্থানে ধ্রুবোপাখ্যান শ্রবণাবধি তাঁহার চিত্তে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, শ্রীগুরুপাদকমল দর্শন ভিন্ন তাহা দূর করিবার আর অন্য উপায় ছিল না। একারণ তিনি গুরুচরণান্বেষী হইয়া তদ্দর্শন লাভের জন্য সম্যক চেষ্টা আরম্ভ করেন। আমাদের সকল বিষয়েই গুরুর আবশ্যক; সাংসারিক কোন কাজই আমরা কাহারও উপদেশ ব্যতীত শিখিতে পারি না; এক্ষেত্রে পারলৌকিক তত্ত্বাদি সম্বন্ধে গুরুকৃপা ভিন্ন আর কি উপায়ে জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হইব? এবম্বিধ কয়েকটী কথা যাহা কথকঠাকুর গাম্ভীর্য্য সহকারে সেদিন প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই এখন শিবাজীর জপমালা হইল এবং হৃদয়ের ব্যাকুলতার সঙ্গে তাঁহার চেষ্টার আধিক্যও প্রকাশ পাইতে লাগিল।

আমাদের মধ্যে অনেকের এরূপ ধারণা যে ক,খ শিখিতে গুরুর প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু আত্মতত্ত্বাদি অত্যাবশ্যকীয় অথচ জটিল বিষয়ে উপদেশ লাভের জন্য ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিটক যাইতে হইবে না, পরমাত্মা স্বয়ং যখন আমাদের অন্তরে বিরাজমান, তখন ঐ সকল দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা তিনিই করিয়া দিবেন। এ কথা শুনিতে বেশ, কিন্তু কাজে ইহার ফল পাওয়া আমাদের মত লোকের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহারা সাংসারিক স্বার্থ-সাধনের আশা ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজনে মানুষের নিকট মস্তক অবনত করিতে দারুণ কুণ্ঠাবোধ করিয়া থাকে, তাহারাই ঐরূপ একটা

* Poona Archives.

ফাঁকির খেলা খেলিতে চেষ্টা পায় মাত্র। যাহারা এ প্রকার গুরুতর ব্যাপারে ফাঁকি দিয়া কাজ সারিবার অভিপ্রায়ে থাকে, তাহারা নিজেরাই ফাঁকে পড়ে। ভাবের ঘরে ফাঁকির খেলার ফল বিষম। ওরূপ ফাঁকিতে ফাঁপা অসার লোকেই মুগ্ধ হয়, শিবাজীর মত প্রকৃত কর্ম্মবীর কেন ভুলিবেন? তিনি কতদূর দৃঢ়তা সহকারে গুরুর অন্বেষণে নিরত থাকিলেন, ক্রমে দেখা যাইবে।

ঐ সময়ে একদিন সংবাদ আইসে যে, শিবাজীর রাজধানী সাতারা নগরের সান্নিধ্যে পরমহংস রামদাস স্বামী বিচরণ করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে রামদাস সাতারার নিকটস্থ চাফল নামক ক্ষুদ্র গ্রামে একটী দেবালয় স্থাপন করেন; কিন্তু সর্ব্বদা তাঁহাকে সেখানে পাওয়া যাইত না; কখন ধ্যান ধারণা সমাধির জন্ত গহন কানন মধ্যে প্রবেশ করতঃ দিন যাপন করিতেন, কখন গঙ্গা যমুনা গোদবরী প্রভৃতি পুণ্যতোয়া নদী সমূহের তীরে কালাতিপাত করিয়া শান্তি সম্ভোগ করিতেন, কখন বা তীর্থ স্থানাদি দর্শন করিয়া বেড়াইতেন। শিবাজী মনে মনে এই প্রখ্যাত যোগীরাজকে গুরুপদে বরণ করিলেন; কিন্তু অনেক অনুসন্ধান ও যত্ন সত্ত্বেও তাঁহার চরণ দর্শনে বঞ্চিত থাকিতে হইল। অবশেষে একদিন অতীব আশান্বিত হৃদয়ে চাফলের দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীর সাক্ষাৎ না পাওয়ায় প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে পর্য্যন্ত তাঁহার দেখা না পাইবেন, অনশনে দিনপাত করিবেন। অত্যুৎকট ব্রতের ফল যে অচিরাৎ ফলিয়া থাকে, শিবাজীর জীবনে তাহা স্পষ্ট দেখা গেল। প্রথম উপবাসের দিবস রজনীযোগে গভীর নিদ্রাভিভূত অবস্থায় দেখিলেন, সমর্থ রামদাস স্বামী তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান; অবশ্য তৎপূর্ব্বে তিনি কখন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন নাই, অথচ পরদিন প্রাতে ভাবী গুরুদেবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যথাযথবর্ণনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন:—মস্তকে জটাভার, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ, বিভূতি-শোভিত প্রশস্ত ললাট, বিকশিত কমল সদৃশ আকর্ণ লোচন, সুগঠিত দীর্ঘ নাসিকা, দক্ষিণ হস্তে রুদ্রাক্ষ মালা, বামহস্তে কমণ্ডলু, পরিধানে কৌপিন, পৃষ্ঠে ব্যাঘ্রাজিন লম্বমান। স্বপ্নাবস্থায় শিবাজী গুরুচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণামান্তর সৌম্যমূর্ত্তির সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইলে রামদাস তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ মস্তকে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করেন, তৎপর তাঁহার প্রসন্নতা ও আশীর্ব্বাদের নিদর্শন স্বরূপ একটী নারিকেল ফল প্রদান করিয়া চলিয়া যান। অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে শিবাজীকে হিন্দুরাজোচিত ও রণবীরের উপযুক্ত কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া অনুযোগ করেন যে, বিদেশীয়গণ কর্ত্তৃক উৎসন্নদশাপ্রাপ্ত আর্য্যধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত করা তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। স্বামীজী অন্তর্হিত হইলে শিবাজী প্রফুল্লচিত্তে চক্ষু মেলিয়া স্থূল জগতে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল নারিকেলটী প্রকৃতক্ষেত্রে তাঁহার হস্তে রহিয়াছে, প্রত্যক্ষ করিলেন।

স্বপ্নদর্শনাবধি গুরু সাক্ষাৎকারের উদ্দেশে শিবাজী বিশেষ উৎসাহ ও ব্যগ্রতা সহকারে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর বহু স্থান পর্য্যটনের পর ওয়াই নামক গ্রামে পঁহুছিয়া রামদাসের নিকট হইতে এক খণ্ড লিপি প্রাপ্ত হন; এই পত্র এখনও পুণার

সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত, অনেকেই উহা স্বচক্ষে দেখিয়া কৌতুহল পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। এরূপ সুন্দর ও বিবিধ উপদেশপূর্ণ পত্র অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। পত্রখানির যথোপযুক্ত উত্তর প্রদানান্তর, শিবাজী, গুরু দর্শনাশায় চাফলস্থ দেবালয়ে উপস্থিত হইলে জানিতে পারিলেন যে, শিঙ্গল্‌ওয়াড়ি গ্রামের মারুতি-মন্দিরে গুরুচরণ দর্শন লাভ হইবে, এবং কল্যাণ গোস্বামী তাহাই উত্তর লইয়া চাফল হইতে তথায় রওনা হইয়াছেন। বৃহস্পতিবার দিবা দ্বিপ্রহরে মধ্যাহ্ন ভোজন কালের অব্যবহিত পূর্ব্বে শিবাজী চাফলে উপনীত হন, কাজেই মঠধারীরা তাঁহাকে আহার করিতে অনুরোধ করেন,কিন্তু উপবাস-ব্রতধারী শিবাজী উদ্‌যাপনের পূর্ব্বে কি প্রকারে ভোজন করিবেন? প্রকাশ্যে বলিলেন, "গুরুর দিনে অর্থাৎ গুরুবারে কিরূপে অন্ন গ্রহণ করা যায়?" মনোগত ভাব এই যে, গুরু কর্ত্তৃক মন্ত্রোপদিষ্ট হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিবেন। ক্ষণকাল বিশ্রামান্তর চাফল পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজেই শিঙ্গল্‌ওয়াড়ি অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং সেখানে পৌঁছিয়া এক উদ্যান মধ্যে গুরুদেবের স্থূলদেহের প্রত্যক্ষানুভূতি দ্বারা পরমপ্রীতি লাভান্তে কৃতার্থ হইলেন। সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গুরুপদে আত্মসমর্পণ করতঃ দীক্ষা করিলে প্রাগুক্ত কল্যাণ গোস্বামীও শিবাজীর বিশেষ প্রতিষ্ঠা সহ তৎসম্বন্ধে অনুরোধ করেন। পরন্তু তদুত্তরে রামদাস ভাবী শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিগত মঙ্গলবার নিশিতে তোমার নিকটে গমন করিয়া প্রসাদ স্বরূপ একটী নারিকেল ফল প্রদান দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়াছি।" এই কথায় শিবাজী ভক্তিপূর্ব্বক প্রণামান্তর সবিনয় নিবেদন করিলেন, "বাস্তবিক উহা ঘটিয়াছে; এখন হৃদয়ের এই প্রার্থনা যে স্থূল শরীরে মন্ত্রোপদেশ দ্বারা এ দাসের জন্ম সার্থক করিতে আজ্ঞা হউক।" রামদাস প্রসন্ন হইলেন, এবং সেই দিবসেই যথানিয়মে দীক্ষাকার্য্য সুসম্পন্ন হইল।

রামদাস স্বামী বালব্রহ্মচারী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার শক্তির সীমা ছিল না। "মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ" শাস্ত্রোক্ত এই মহাবাক্যের সার্থকতা বালব্রহ্মচারী অতুলশক্তিশালী মহাপুরুষগণ সংসারকে অনেকবার দেখাইয়াছেন। প্রকৃত গুরু যে প্রকৃত শিষ্যের জীবনে কিরূপ তেজ ঢালিতে পারেন, রামদাস ও শিবাজী তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। রামদাসের শক্তিসঞ্চার দ্বারাই যে শিবাজীর প্রবল পরাক্রম লাভ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিবাজী অনেক সময় সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই যে, গুরুবলই তাঁহার একমাত্র সহায় ও সম্বল ছিল। জীবনে যে কিছু মহৎকার্য্য, তাঁহা দ্বারা সম্পাদিত সমস্তই গুরু-প্রতাপ প্রভাবে নিষ্পন্ন জানিতে হইবে। সময়ে সময়ে নিবিড় অরণ্য মধ্যে শিবাজীকে ডাকাইয়া লইয়া রামদাস তাঁহাকে রাজকার্য্য ও যুদ্ধবিগ্রহাদি এবং সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও উপদেশ দিতে ক্রটি করিতেন না। যে পুরুষ স্বপ্নেও কখনও স্ত্রীসম্ভোগ করেন নাই এবং যে রমণী কোনরূপ অবস্থায় পুরুষ সহবাসের অভিলাষিণী হন নাই, কেবল মাত্র তাঁহারাই প্রকৃত আচার্য্যের পদ পাইবার উপযুক্ত। সাধারণ ধর্ম্মোপদেশক সবাই হইতে পারে, কিন্তু মন্ত্রোপদেশাদি গুরুতর দীক্ষাকার্য্যের জন্য উক্ত মহাত্মাগণই একমাত্র

অধিকারী। অনেকে হয় ত একথা কুসংস্কার-জনিত বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, সংসার-বন্ধনের প্রধান কারণ স্ত্রী পুরুষ সংসর্গের ফল একবার যাঁহাদের দেহ মন আশ্রয় করিয়াছে, তাঁহাদের হৃদয়ে উপর হইতে সত্য অবতীর্ণ হইলে তাহা কিছু না কিছু বিকৃত হইয়া বাহির হইবেই হইবে। জন্মজন্মান্তরের সাধন বলে যাঁহারা জীবন্মুক্তি বা তদনুরূপ কোন উচ্চপদবী আরোহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে স্বতন্ত্র কথা, কারণ বিধাতার বিধানে কোনরূপ দোষ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্ভিন্ন অন্যের প্রতি উল্লিখিত নৈসর্গিক নিয়ম সর্ব্বতোভাবে প্রযুজ্য জানিতে হইবে। সুতরাং রামদাস স্বামী যে শিবাজীর ন্যায় মহাপুরুষের আচার্য্য ও দীক্ষাগুরু হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন এবং তৎপদোচিত কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। শিবাজীও যে শেষ পর্য্যন্ত গুরুসেবাতে কোন প্রকার সামান্য ত্রুটিও করেন নাই, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়; উহা দ্বারা এই শাস্ত্র-বচনের স্বার্থকতা সম্যকরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল :—

"গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দেবো ন সংশয়ঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তস্মাৎ শিষ্যৈঃ প্রসেব্যতে ॥
গুরু প্রসাদতঃ সর্ব্বং লভ্যতে শুভমাত্মনঃ।
তস্মাৎ সেব্যো গুরুর্নিত্যমন্যথা ন শুভং ভবেৎ॥"

আমাদের শাস্ত্রাদিতে এরূপ উপদেশ আছে যে, যাঁহাকে একবারে গুরু বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তিনি যেরূপ চরিত্র বা গুণাগুণ সমন্বিত হউন না কেন, সাক্ষাৎ ঈশ্বর বোধে তাঁহার সর্ব্বদা পূজা করাই শিষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহার গূঢ় রহস্য এই যে, বিশ্বাস বড় শক্ত জিনিস, হৃদয়ের সরল বিশ্বাসের জোরে মানুষ তরিয়া যায়। আমরা জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, বিশ্বাসই স্বর্গ, সন্দেহই নরক। বাস্তবিক সুদৃঢ় বিশ্বাসের শক্তি অদ্ভুত, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিশ্বাসী বলেন এবং অনেকস্থলে দেখাও গিয়াছে যে, বিশ্বাসের বলে সব হয়। প্রচলিত কথায় বলিয়া থাকে,—"সাপের বিষ 'নেই' ব'ল্লেই নেই।" ইহা নিতান্ত ছুড়িয়া ফেলিবার যোগ্য নহে। তবে কিনা বিশ্বাসের মত বিশ্বাস চাই; রামও বলিব, কাপড়ও তুলিব, তাহা হইলে রামনামের প্রভাবে বিশ্বাস প্রকাশ পাইল কৈ? সে ক্ষেত্রে ত কাপড় নিশ্চয় ভিজিবে।

গুরুর প্রতি অটল বিশ্বাসের ফল সম্বন্ধে লোকশিক্ষার্থ আমাদের দেশে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। একটা এখানে উপস্থিত করিতেছি। জনৈক পেশাদার গুরু অর্থ-লোভে তাঁহার কোন ধনাঢ্য শিষ্যের শিশু-সন্তানকে বধ করতঃ তাহার সুবর্ণ অঙ্গাভরণ-সমূহ অপহরণ করিয়া গেরেপ্তার হন। তাঁহার অপর একজন প্রগাঢ় ভক্তিমান শিষ্য এই সংবাদ পাইবামাত্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া শিশুহন্তা গুরুর পদধূলি গ্রহণ করতঃ বালকের শবদেহে মাখাইবা মাত্র সে পুনর্জ্জীবন লাভ করে এবং সব গোল মিটিয়া যায়। লোভী গুরুঠাকুর এই ব্যাপার দেখিয়া ভাবিলেন, "আমার পদরজের এত শক্তি ও এরূপ মাহাত্ম্য! হায়! হায়! একথা আমি ইতিপূর্ব্বে জানি নাই!" অতঃপর লোভপরবশ হইয়া পুনরায় ঠিক ঐরূপ বিপদে পড়িয়া নিজের পদরেণু বারম্বার ব্যবহার করিয়াও

কোন ফল না পাওয়ায় আবার উক্ত ভক্ত-শিষ্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। শিষ্য আসিয়া ভক্তিবিশ্বাস সহকারে গুরুর পদধূলি লইয়া যেমন হতব্যক্তির অঙ্গে মাথাইলেন, অমনি পূর্ব্ববৎ সুফল ফলিল। এতদ্দর্শনে গুরু অতীব আশ্চর্য্যান্বিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া শিষ্যকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বুঝাইয়া দিলেন —"ঠাকুর! আমি আপনাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাকি, সুতরাং নিশ্চয় জানি,আপনার পদধূলিতে স্বয়ং ঈশ্বরের শক্তি বিরাজমান; এজন্য আমি উহা দ্বারা বাঞ্ছিত ফললাভে সক্ষম হই; আপনি যদি আপনার গুরুকে এই পরিমাণ বিশ্বাস করেন, তাঁহার পদধূলি আনয়ন করুন, আপনার দ্বারাও এবম্বিধ অসাধ্যসাধন অনায়াসে হইবে; নচেৎ আপনার নিজের পদরজে কিছুই হইতে পারে না, যে হেতু তৎপ্রতি আপনার শ্রদ্ধাভক্তির সম্পূর্ণ অভাব।" এরূপ গল্প বিশ্বাস না করিলেও এটুকু দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহা দ্বারা চরিত্রহীন গুরুর প্রতিও ভক্তিবিশ্বাসের মাহাত্ম্য সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এদেশে অন্যান্য বহু বিষয়ে যেমন কেবলমাত্র অক্ষরের প্রতি সম্মান রাখিয়া ভাবকে জলাঞ্জলি দেওয়া হইয়াছে, গুরু সম্বন্ধেও তদ্রূপ ঘটাতে দুরাচার কুলগুরুর উপদ্রব এত বাড়িয়াছিল। যাহা হউক, সাধারণ গুরুর প্রতি অচলা শ্রদ্ধাবশতঃ যদি কথঞ্চিৎ ফলও লাভ করা যায়, প্রকৃত গুরুপদযোগ্য মহাপুরুষগণের প্রতি ভক্তিবিশ্বাসের বলে কি যে না হইতে পারে, তাহা বলা যায় না। মহারাষ্ট্র-কেশরী শিবাজী তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

তাড়কার বন।

আবার ভারত হইয়াছে তাড়কার বন!
আবার দারুণ রাক্ষসেরা, সারা ভারত কর্ল্যে ঘেরা,-
জলে স্থলে দিগ্‌দিগন্ত সকল আচ্ছাদন!
ছিল রাজ্য যত ক'টি, সকল হ'ল পঞ্চবটী,
শঙ্কা নাইক ডঙ্কা মেরে বেড়ায় খর দূষণ!
আবার ভারত হইয়াছে তাড়কার বন!

২

আবার ভারত হইয়াছে তাড়কার বন!
নাইক দেশে দুগ্ধ—হবি, গরু বাছুর খাচ্ছে সবি—
উজাড় কর্ল্যে রাক্ষসেরা পশু পক্ষীগণ,—
নাইক মাংস, নাইক মৎস্য, নিত্য লুঠে ফল শস্য,
উপবাসী ভারতবাসী—নিত্য অনশন!
পশুর চর্ম্ম পশুর হাড়, তাও দেশে রয়না আর,
শূন্য ভাগাড় পাশে কাঁদে শিয়াল শকুনগণ!
পাখীর পালক—তৃণ গুচ্ছ, কিবা উচ্চ কিবা তুচ্ছ,
ঊর্দ্ধ পুচ্ছে কচ্ছে তারা কেবল বিলুণ্ঠন!
আবার ভারত হইয়াছে তাড়কার বন!

৩

আবার ভারত হইয়াছে তাড়কার বন!
আবার পুণ্য মাতৃযাগে, রাক্ষসের মত্ত রাগে,
অধীর হয়ে রুধির ধারা কচ্ছে বরষণ!
আবার দারুণ অত্যাচারে, কাঁদছে প্রজা হাহাকারে,
অবিচারে কারাগারে আবার নির্ব্বাসন,
আবার বন্দুক—আবার লাঠী, আবার মাথা ফাটাফাটি,
রক্তে রাঙ্গা আবার মাটী—আবার বাজ্‌ল রণ!
একটা কি নাই বিশ্বামিত্র, দেশের মিত্র—বিশ্বমিত্র,
অনুরাগে মাতৃযাগে জীবন করে পণ?
নাই সুমন্ত্র, নাই বশিষ্ঠ, কেউ দেখেনা দেশের ইষ্ট,
আত্মনিষ্ঠ পাপিষ্ঠেরা অন্ধ দু'নয়ন?

কেবল কি নাই কল্পষ—মলদ, সারাটা দেশ সবি বলদ,
একটা কি নাই কেউ দশরথ দিতে রাম লক্ষ্মণ ?
হিন্দুর বংশ কোটি কোটি, দে'না ছেলা সবাই দু'টী,
দেখ্‌ব কেমন রক্ষে করে যজ্ঞ নিবারণ !
হিন্দুর বালক ডরায় কারে ? বধবে তারা তাড়কারে,
করবে আবার বাহুবলে যজ্ঞ উদ্যাপন,
সর্ব্বজয়ী হিন্দুর ছেলে, শিবের ধনুক ভেঙ্গে ফেলে,
লাভ করিবে ভারত-লক্ষ্মী—কীর্ত্তি অতুলন,
জনকপুরে কনক সীতার নূতন নিমন্ত্রণ !

৪

এবার ভারত বেড়িয়াছে লঙ্কার রাবণ,
হারে মূর্খ, হারে অন্ধ, এবার নয় সে সেতুবন্ধ,
আগেই এসে নাগপাশে সে করেছে বন্ধন !
আগেই এসে গাড়ছে থানা, আগেই তারা দিচ্ছে হানা,
বন্দুকে আর তীর ধনুকে দিতে হবে রণ !
বিশ্বশাসী কোটি ভুজে, রাক্ষসেরা এবার যুঝে,
দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত নয় সে দশানন,
এ রাবণের নাই সে সংখ্যা, নূতন লঙ্কা নূতন ডঙ্কা,
নূতন বলে নূতন কলে নূতন প্রহরণ !
প'রে জটা বালক চীর, আয়না হিন্দুর বালক বীর,
বক্ষে ভক্তি পৃষ্ঠে তূনীর কক্ষে শরাসন,
ভাইয়ের পাছে আয় না ভাই, মায়ের কাজে বিপদ নাই,
ভক্তিবলে শক্তিশেলের হবে নিবারণ !
এবার ভারত বেড়িয়াছে লঙ্কার রাবণ !

৫

এবার ভারত বেড়িয়াছে লঙ্কার রাবণ !
ধরিয়া রাক্ষসী মায়া, শূর্পণখা পাপের ছায়া,
সাগরী নাগরী মাগে প্রেমের আলিঙ্গন,
ভীষণ উহার মিলন-লীলা, সারা ভারত গরাসিলা,
নাক কেটে দে—দূর করে'দে—করুক পলায়ন !
চুলের কাঁটা, কাচের চুরি, সোডা সাবান রঙ্গের গুড়ি,
ব্রাণ্ডী হুইস্কি বিয়ার শেরী ক্লারেট শ্যাম্পিয়ন,
কতই বসন, কতই বাসন, টেবিল চেয়ার কতই আসন,
চা চকোলেট চুরুট কফি—কতই প্রলোভন,—
চীনের পুতুল টীনের গাড়ী,ছেলে খেলার কাঠের বাড়ী,
শিয়াল কুকুর ছাগল ভেড়া অপার--অগণন,
এবার কেবল নয় কুরঙ্গ, অনন্ত মারীচের রঙ্গ,
গরাসিছে সিন্ধু বঙ্গ—শিক্ষা-দীক্ষা-মন !
ভুলাইয়া ঘোর কুহকে, মায়াবী ও দারুণ ঠকে,
ভারত-লক্ষ্মী সীতা চুরির কচ্ছে আয়োজন,
সাবধানে থাক্‌রে সবে, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে রবে,
আবার পাবি আপন রাজ্য আপন সিংহাসন !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

এলাহাবাদের কন্‌ভেন্‌শন-কমিটিতে সুরেন্দ্রনাথের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিয়া Madras Standard বলিয়াছে যে, তাহার কার্য্য "illogical, inconsistent and incomprehensible." আমাদের ধারণা কিন্তু অন্যরূপ। কন্‌ভেনশন-কমিটিতে সুরেন্দ্রনাথ যাহা করিয়াছেন, তাহা illogical বা incomprehensible নহে, কিন্তু তাঁহার পক্ষে কন্‌ভেন্‌শনে যোগ দেওয়াটাই আমাদের কাছে incomprehensible বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাই 'কংগ্রেস' প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম যে, বাবু সুরেন্দ্রনাথ ও লাজপত কন্‌ভেন্‌শনে যোগ দিয়া খিচুড়ী করিয়াছেন এবং আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, তাঁহারা সত্বরই এ কথাটা বুঝিবেন। তাঁহারা এত সত্বর বুঝিবেন এবং আমাদের কথা ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় সফল হইবে, এতটা অবশ্য তখন আশা করি নাই। আমাদের আশার একমাত্র হেতু ছিল যে, আমরা সুরেন্দ্রনাথকে জানি, আমরা জানি, দোষে গুণে সুরেন্দ্রনাথ আমাদের বাঙ্গালীর সুরেন্দ্রনাথ, বোম্বাইয়ের মোট্টা বা বাচ্চা নহেন। একশ্রেণীর ধনী মানী বিদ্বান অবস্থার ফেরে পড়িয়া কংগ্রেসের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন,

দেশের সেবার জন্য নয় বা দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের দ্বারা নয়। সুরেন্দ্রনাথ সে শ্রেণীর নহেন। তিনি দেশের জন্য খাটিয়া যৌবন হইতে বার্দ্ধক্যে আসিয়াছেন, বার্দ্ধক্যেও যুবোচিত বীর্য্যে দেশের সেবায় নিরত রহিয়াছেন এবং অন্তে দেহ মাতৃ-চরণেই রক্ষা করিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প। তিনি চান দেশের কল্যাণ, সুতরাং তিনি বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট। কিন্তু কংগ্রেসের কর্ণ ধরিয়া এমন অনেক নাবিক টানাটানি করিতেছেন, যাঁহারা বর্ত্তমান অবস্থায় একেবারেই অসন্তুষ্ট নহেন, বরং তাঁহাদের ধন মান বর্ত্তমান অবস্থার উপরই নির্ভর করিতেছে, সুতরাং তাঁহারা চান দেশটা যেমন চল্‌ছে, তেমনি চলুক। কেন না, তাঁহারা বর্ত্তমান অবস্থার সুযোগেই প্রচুর ধনধান্য উপার্জ্জন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইতেছেন। তবে তাঁহারা কংগ্রেসে আসিলেন কেন? তাহার কারণ এই, "অপদার্থ ব্রহ্মা দিনটাকে এমন লম্বা করেছেন" যে, সে দিন আর কিছুতেই যেতে চায় না, তাই দিন যাওয়াইবার পন্থা-স্বরূপ তাঁহারা কংগ্রেস করিয়াছিলেন। এখন কেঁচো খুঁড়তে সাপ উঠে দেখিয়া তাঁহারা যে কন্‌ভেন্‌সনের লালবাতী জ্বালিয়া পলায়নপর হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সুরেন্দ্রনাথের কথা স্বতন্ত্র। কন্‌ভেন্‌শনে যোগ দেওয়াই তাহার পক্ষে "illogical, inconsistent and incomprehensible" হইয়াছিল, কন্‌ভেন্‌শনটা ভেঙ্গে দেওয়া নহে! খিচুড়ী পাকাইতে হইলে উত্তাপ সংযোগে চাল ও ডালকে এক করিয়া দিতে হয়। কন্‌ভেনশন তো একটা ঠাণ্ডাজলের গামলা। যাঁহাদের গায়ে রক্ত চলে, তাঁরাতো উহাতে যোগ দেন নাই। দু'চার জন পথ ভুলিয়া গিয়াছিলেন মাত্র। সুরাটে আমাদের ভয় হইয়াছিল যে, দেশের রাজনীতি চর্চ্চা বুঝি খিচুড়ী বনিয়া উঠে। এলাহাবাদে ভুল ধরা পড়িয়াছে। চালের সঙ্গে ডাল মিশে নাই। মিশিবার সম্ভাবনাও নাই, সুতরাং চাল ডাল আলাদা হইয়া গিয়াছে। তা বেশ হইয়াছে, রাজনীতি-ক্ষেত্র কণ্টক-বিহীন হইয়াছে—ন্যাশনাল কংগ্রেশকা জয় জয়কার!!

এলাহাবাদ কন্‌ভেন্‌শন-কমিটীতে যে বাৎচিৎ হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, কংগ্রেস ভাঙ্গনের জন্য দায়ী কাহারা। গরমদলতো নরমেরও নরম হইয়া ভাঙ্গা কংগ্রেস জোড়া লাগাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তবে হইল না কেন? বেশীর ভাগ কন্‌ভেন্‌সনও ভাঙ্গিয়া গেল। আমরা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নরমদলের থয়ের খাঁ পাণ্ডাগণ একটা গোলমালের সুযোগ লইয়া বিপদসঙ্কুল বর্ত্তমান ভারতের প্রকৃত রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন, পাছে গায়ে আঁচড়টী লাগে? এখন তাহারা ভিড়িবেন কেন? বাচ্চাতো গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসটা যদি তাহার মনের মতন করিয়া তাঁহাকে গড়িতে না দেওয়া হয়, তবে তিনি হাতধোওয়া জলেই মাতৃপূজার মহা যজ্ঞাগ্নি নিবাইয়া দিবেন। সকলে যদি ভয় না পাইতেন, তবে হয়তো হনুমান যে প্রণালীতে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিলেন, বাচ্চা বাহাদুর সেই প্রণালীই অবলম্বন করিতেন। সঞ্জীবনী কি বলেন, ইঁহারাই কি মাতৃপূজার ঋত্বিকগণ, যাঁহারা এই মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিবেন? সাধক দেবতার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে চাহেন। কন্‌ভেনশনের এ সাধক

নিজ হাতে মনোমত দেবতা গড়িয়া ভুয়ী ধরিয়া নাচাইবার অভিলাষী। ইঁহারা চান পুতুলনাচের আনন্দ, মাতৃ-পূজা রূপ মহা হোমাগ্নির উত্তাপ ইঁহাদের সহ্য হইবে কেন? তাই কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া কন্‌ভেন্‌সন হইয়াছে, কন্‌ভেনশনও তিন মাসেই ভাঙ্গভাঙ্গ। সঞ্জীবনী নিস্তব্ধ, বেঙ্গলি একটু নাকে কাঁদিয়াছেন। তিলক কংগ্রেস ভাঙ্গিয়াছেন বলিয়া যে তীব্র রোষাগ্নি চরমপন্থীদলকে গ্রাস করিবার জন্য হুহু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, প্রয়াগে কনভেনশনের চিতা-ভস্মের চাপায় সে প্রচণ্ড হুতাসন আজ নির্ব্বাপিত। তাই কলেজস্কোয়ারে সাড়া নাই, কলুটোলা নীরব "ঠাকুর, মেকুড় মারলে কি হয়", "তুষানল করতে হয়।" "তোমার ছেলে মেরেছে", "তবে কিছু হয় না।" ওঁম শান্তিঃ। এখনও কি বলিতে হইবে, মাতৃবক্ষে কনভেনশন রূপ বিষফোড়া উঠিয়াছিল কেন?

আসল কথাটা এই যে, বঙ্গদেশে বা পঞ্চনদ প্রদেশে ঠাণ্ডা গরমের কচ্‌কচি নাই। সবাই একদল-ভুক্ত। যেথানে আগুন জ্বলিয়াছে, সেখানে সবাই গরম। তারপর পিটিয়া পিটিয়া আরও গরম করিয়া দিয়াছে। তাই বাঙ্গালী বা পাঞ্জাবী কন্‌ভেন্‌শনে স্থান পাইল না। রবীন্দ্রনাথ যাহাই কেন বলুন না, যাহা প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ, তাহা লইয়া টানাটানি করিয়া লাভ কি? হিন্দু প্রজাকে যদি শান্তশিষ্ট ধ্যানশীল থাকিয়াই জীবনে সিদ্ধিলাভ করিতে হয়, তবে তাহার জন্য হিন্দু যোগী রাজার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রুষ জারের অধীনে ধ্যানপরায়ণ হিন্দু প্রজা একটা অস্বাভাবিক প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ আবদার মাত্র। প্রজাকে চারিদিকে প্রাচীর-বেষ্টিত করিয়া তাহার হাত পা বাঁধিয়া সশস্ত্র সান্ত্রী পাহারায় অধীন রাখিয়াও যদি তাহাকে রুষ জারের চাবুকের দ্বারা শাসন করিতে থাক, তবে জানিও,ঐ জারের শকটে নিক্ষেপ করিবার জন্য বম-শেল প্রজার হাতে আকাশ হইতে বৃষ্টি হইয়া পড়িবে, ইহা শক্তিশালিনী প্রকৃতির নিয়ম, ক্ষুদ্র দুর্ব্বল মানুষের এই মহা নিয়তির পথ রোধ করিবার ক্ষমতা নাই। ইহা যতই অপ্রিয় হউক না কেন, ঘটিবেই। এই অপ্রিয় ঘটনা হইতে যদি প্রজাকে রক্ষা করিতে চাও, তবে প্রজাকে উপদেশ দিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে না, রুষজারের হস্ত হইতে ঐ চাবুকখানা কাড়িয়া লও, অন্য উপায় নাই। জানি, প্রকৃতির এই বাঁধা নিয়মের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া যদি জীবনের সিদ্ধিলাভ হইত, তবে বড়ই ভাল হইত। কিন্তু মানবের পার্থিব জীবনটা এমনই নিয়ম শৃঙ্খলের অধীন যে, যেমনটী চাই, তেমনটী হয় না। শরীরের উপর বসিয়া যে মশা রক্ত শোষণ করিতেছে, তাহাকে চপেটাঘাত করিলে সে মরিবে বটে, কিন্তু নিজের গায়ে আঘাত লাগিবে, তাহা অনিবার্য্য, নতুবা বসিয়া রক্তশোষণের যাতনা অনুভব কর। মশাও মারিবে, গালেও চড় পড়িবে না, তাহা হয় না। আর এই যে মানুষ-মশা মারিতে চড় খায়, তাহা পরামর্শ করিয়া খায় না, মশা কামড়াইলে চড়টা আপনা হইতেই সেখানে যায়। মশাও মরে, চড়ও খায়, কোন উপদেশ তাহা থামাইয়া রাখিতে পারে না। কেন না, উহা প্রকৃতির নিয়ম—আত্মরক্ষার জন্য, মশা মারাটা উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং রুষজারের রুষ-প্রজাই হইবে, জারের পক্ষে হিন্দুপ্রজা আকাঙ্ক্ষা করাটা অস্বাভাবিক কামনা। বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবীকে পিটিয়া গরম করা হইয়াছে, এখন যদি তাহা-

দের মধ্যে কেহ ঠাণ্ডার পোষাক পরিয়া ভেজা বেড়াল সাজিয়া ঠাণ্ডাদলে যাইয়া উপস্থিত হন, তবে উভয় পক্ষেরই সেটা গাত্রদাহের কারণ হয়। তাইতো কন্ভেনশন বঙ্গদেশ ও পঞ্চনদ প্রদেশ গ্রহণ করিতে পারিল না। ভারতে বঙ্গ ও পঞ্জাবের স্থান স্বতন্ত্র। মান্দ্রাজও সেই দলভুক্ত হইতেছেন। ইহাদের সঙ্গে অন্যেরা সহানুভূতি করিতে পারিতেছেন না, কেন না, "যেখানে অস্ত্রের লেখা, ব্যথাও তথায়।" ইহাদের আগুন ভিতরে, অন্যেরা কেবল বাহির হইতে একটু আধটু উত্তাপ পাইতেছেন মাত্র। তাই কন্ভেন্‌শনটা একটা conventionই রহিয়া গেল, কাজের হইল না।

দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে এই বাদ বিসম্বাদ দেখিয়া অনেকে মনে করিতেছেন যে, আর এ সব কচকচিতে কাজ কি, দেশের জন্য খাটিবার আরও তো অনেক ক্ষেত্র রহিয়াছে, সেখানে যাইয়া কাজ কর, রাজনীতিই সকল সময় ও শক্তি ব্যাপিয়া থাকিবে কেন? আমাদের বিশ্বাস, দেশের শক্তি, সময় ও সুবিধা এত বেশী নয় যে, দশ দিকে তাহা অপব্যয় করা যাইতে পারে। যা না করিলে নয়, তাহা তো করিতেই হইবে। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় রাজনীতিই সর্ব্ব প্রধান কার্য্যক্ষেত্র, এমন কি, একমাত্র ক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কেন না, আগে জীবন ধারণ, তারপর অন্য কথা। আমরা জীবন মরণ সমস্যায় আসিয়াছি এবং সে সমস্যার পূরণ রাজনীতির হাতে। অনেকে বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিতেছেন, এস না, এই তো দেশে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, এই দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য খাট, ও সব কচকচি ছাড়িয়া দাও। যাঁহারা দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য প্রাণপণ করিতেছেন, নিরন্নের অন্ন সংস্থানের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা পৃথিবীতে স্বর্গের দূত, তাঁহারা নমস্য। তাঁহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ বা নিন্দা করা আমার অভিপ্রায় নহে। কিন্তু যাহারা বলিতে চান যে, রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়িয়া দাও, তাহারা দুর্ভিক্ষ প্রশ্নের যে উত্তর দিতে চাহিতেছেন, তাহার মধ্যে যে আমাদের একটা মস্ত মূর্খতা লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। যে জন্য দেশে দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব, আমরা প্রকারান্তরে সেই উদ্দেশ্যই সিদ্ধি করিতেছি। দুর্ভিক্ষের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া রাজা নিশ্চিন্ত। আমরা যদি সব ছাড়িয়া দিয়া তাই নিয়েই মত্ত হই, তবে উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল এবং এক ঢিলে দুই পাখী মরিল। দেশের যে অবস্থা, তাহাতে নিরন্নকে অন্ন দিয়া দুর্ভিক্ষ সমস্যার মীমাংসা হইবে না—একজনের মুখে অন্ন দিতে গেলে আর এক জনকে অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে থাকিতে হয়। এ উপায় মীমাংসিত না হইয়া প্রশ্ন দিন দিন আরও জটিল হইতেছে। দেশের যখন সমস্ত লোক রোগ বিশেষের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন রোগের বীজ শরীরে না খুজিয়া দেশের জল বায়ুর মধ্যে খুজিতে হয়। অবশ্য যাঁহারা ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা ভুলিয়া রোগীর সেবায় নিযুক্ত, তাঁহারা দেবদূত, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে রোগের ব্যবস্থা হইল না। ভারতের ত্রিশ কোটী প্রজা যে আজ দুর্ভিক্ষ রোগগ্রস্ত, এই রোগের ঔষদ নিরন্নকে অন্ন দান নহে। দুর্ভিক্ষ-জনিত অনাহার, অনাহার-জনিত কষ্টের বিবরণ পাঠ করিয়া হাহাকার করিলে কি হইবে? ত্রিশ কোটী লোকের অনাহার

নিবারণ করিবার ক্ষমতা সমস্ত পৃথিবীরও হইবে না। গাছের সমস্ত ফলে যখন পোকা ধরে, তখন একটী একটী করিয়া ফল বাছিয়া পোকা নিবারণ করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র, গাছের চিকিৎসা করিতে হইবে। দুর্ভিক্ষ যে বিষবৃক্ষের ফল, তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিতে না পারিলে ভারতের দুর্ভিক্ষ প্রশ্নের সদুত্তর মিলিবে না। যাহারা আমাদের বুকের উপর বসিয়া কুশাসনের কারখানায় আমাদের জন্য দুর্ভিক্ষ গড়িতেছে, তাহাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী সুবন্দোবস্ত করিতে না পারিলে যে আমাদের দুর্ভিক্ষ-সমস্যার মীমাংসা পাওয়া যাইবে না, এ কথা এখনও যাঁহারা বুঝিলেন না, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার প্রয়াস রূপ ধৃষ্টতা আমাদের নাই। সুতরাং যাঁহারা বলেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়াও আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র আছে, তাঁহারা কৃপাপাত্র সন্দেহ নাই। একমাত্র এই রাজনৈতিক আন্দোলনেই দুর্ভিক্ষ-সমস্যার সুব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু এ আন্দোলন সেই প্রাচীন ক্রন্দন ও আবেদন নিবেদন নহে। ইহা স্বাবলম্বন ও আত্ম প্রতিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কন্‌ভেন্‌শন আমাদিগকে আবার সেই প্রাচীন পঙ্কেই লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল। সুতরাং যদি ত্রিবেণীতে তাহার আদ্যশ্রাদ্ধ সত্য সত্য হইয়া গিয়া থাকে, তবে আক্ষেপ করিবার কিছু আছে কি? অর্ব্বাচীনের মৃত্যুতে অশৌচও নাই।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

বাঙ্গালার সংবাদপত্র চর্চ্চা। (১)

ডিনার টেবিলের অট্টহাস্যের কোণে, চা'র পেয়ালার সহিত প্রত্যূষ-সম্ভাষণের কালে যেমন, তেমনি ডিবেটিং ক্লাবের উৎকট উৎসাহের করতালি-কোলাহলে বা আলবোলার প্রণালী হইতে ধূম্র আকর্ষণের সময়, মাঝে, মাঝে, ভূগোলের নানা প্রান্তে অবস্থিত দেশ সমূহের সংবাদ পত্র এবং তাহাদের ক্ষমতার উপর নানা ভাষ্য ও টীকা রচিত হয়। একথাও উঠে, বাঙ্গালার কাগজগুলি দেশে একটী শক্তিরূপে দাঁড়াইয়াছে। সঙ্কীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতার দুর্ব্বলতা এই সার্টিফিকেটের পীতোজ্জ্বল মসৃণ বার্ণিশ-চাকচিক্যের গবাক্ষ পথে বড় একটা ধরা দেয়না।

সত্য হউক কিম্বা মিথ্যা হউক, যদি এমন কথা থাকে থাকে মনে উঠে, তবে ধীরতার সহিত অচঞ্চল স্থৈর্য্য আশ্রয় করিয়া আমাদের এতদ্‌সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। কারণ সংবাদ-পত্রের উৎপত্তি তামাসা হইতে হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু পরিণতি ঠিক ঐ লঘুতায় পর্য্যবসিত হইবে না।

শৈশবের সহজ সারল্য এবং স্নিগ্ধতার ভিতর দিয়া বানব জীবন প্রসারিত হয়, কিন্তু কি পরিমাণ চিত্তবিপ্লবের ভিতর দিয়া উহা প্রসারিত হয়, তাহা বানপ্রস্থাবলম্বীকে করিলে উত্তর পাওয়া যাইবে। কাজেই জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা অবলম্বন করিয়া সংবাদ-পত্রের গতি ও গন্তব্য পথ, বিস্তৃতি ও বিক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

ঠিক নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নহে। সখের মাঝির হাতে নৌকার হালখানি নিঃশঙ্কে সমর্পণ করিলে, জোয়ার ভাটা, বাত্যা ও আবর্ত্ত যেমন সব সময়ে তরণীর বঙ্কিম গতির উপর সদ্ব্যবহার করিবে না, তেমনি, আমাদের ঔদাসীন্য, আমাদের স্বপ্নালস মদিরতা, বোধ হয়, বর্ত্তমান সময়ে কতকটা মারাত্মক। হাতে কলমে অবশ্য সংবাদ পত্রের নৃত্য-চঞ্চল গতি নিয়ন্ত্রিত করা হইবে না, কারণ স্বেচ্ছায় একাধারে নিহিত স্বাধীন কর্ত্তৃভাব শক্তির প্রতিষ্ঠা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব নহে। তবুও জাতীয় ভাব-পর্য্যায়কে যদি বরষাগমে কলাপীর অহেতুকী, সরব, আনন্দ নৃত্যরূপী ভবিষ্যচিন্তা-নির্ম্মুক্ত শৈশব-চাঞ্চল্য হইতে সংহরণ করিয়া তীব্রতর, কঠিনতর সাধনার আলিঙ্গনে নিক্ষেপ করা যায়, তবে আশা করা যায় আপনা আপনি আত্মরক্ষার স্বাভাবিক আকর্ষণে উহা সত্য পথে চলিতে থাকিবে। তজ্জন্য গবেষণার বহুমুখী ইন্দ্র-

জাল বা ভাবাধিক্যের অতিরিক্ত অশ্রুজল ব্যয় করিতে হইবে না।

যদি কিছু ভুলভ্রান্তি ঘটে, তবে তাহা আমাদের ভবিষ্যলক্ষ্য বা হৃদয়-বৃত্তি সমূহের যথার্থ শরবা-সম্বন্ধে কৃত্রিম ধারণার ফলে। বর্ত্তমানের প্রতি অবহেলা কিম্বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্ধতা, চিরকাল এরূপ কাণ্ড ঘটাইয়া তুলিয়াছে।

সপ্তস্বরা নামক সঙ্গীতযন্ত্রের একটা বিশেষত্ব এই যে, একই রূপ সাতটীপত্রের জলসংযোগজাত বিভিন্নতা হইতে যন্ত্রী জগতের সনাতন সাতটী সুর বাহির করিয়া অবলীলাক্রমে উহা লইয়া ক্রীড়া করে। ভৈরবী-ধ্রুপদ, বেহাগ-পূরবী-রাগিণীর অন্তহীন মধুর তন্তুজাল রাগ করিতে করিতে যন্ত্রী আত্মহারা হয়। তেমনি, বর্ত্তমানের দ্বৈতভাবহীন বৈচিত্র্য-বর্জ্জিত পথে জাতীয় হৃদয়রচিত রেখাশূন্য ধূসরপর্দ্দার উপর কোন্ প্রভাতের মেঘাড়ম্বরে রামধনু অঙ্কিত হইয়া উঠিবে, জানি না। পরে যদি এইজন্য আমাদের আব-হাওয়া এবং সামাজিক আকাশ থানিকে প্রস্তুত করিবার চিন্তা মনে আইসে, পরে আমরা সহজভাবে বিপ্লব বৈচিত্র্যকে হৃদয়শায়ী করিতে সক্ষম হইব।

বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ একটু নাড়াচাড়ার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। সমাজের আংশিক সুষুপ্তি ভঙ্গের পূর্ব্বেই দেখিতেছি, রাষ্ট্রাধিকারী সপ্তার্চ্চি-ধৃত দংষ্ট্রা, ক্রোধে ও কৌতুকে নির্গত করিবার উপক্রম করিয়াছেন। এবার এই মুখ-বহ্নির নানা রূপ নানাদিকে ধরা পড়িয়াছে। শাস্ত্র-কথিত কালী-করালী, মনোজবা বা সুলোহিতা—আর কত বলিব? ধূম্রবর্ণা বা উগ্রা, প্রদীপ্তা বা কৃপীটযোনি—এই সপ্তজিহ্ব বহ্নির সাতটী না হউক, কয়েকটীর উষ্ণতা বোধ হয় কিঞ্চিৎ উপভোগ করা হইয়াছে। কাহারও পৃষ্টদেশের মসৃণ-রাজ্যে, কাহারও বা কপোত-কোমল হৃদয়ের গোপন অন্তঃপুরে, ইহা কিঞ্চিৎ বিভীষিকা মুকুলিত করিয়া তুলিয়াছে, সন্দেহ নাই।

প্রথমেই বলা দরকার, সংবাদ-পত্র বা আক্ষরিক সাহিত্যের প্রভাব আক্ষরিক শিক্ষা-বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে। যে পরিমাণে ইহা এদেশে কম, সেই পরিমাণে ইহার ক্ষমতাও কম হইবে। দ্বিতীয় কথা, আর্থিক অভাব-বিহীনতাও ইহার ক্ষমতা-বিস্তৃতির পথে অন্যতম কণ্টক। এই ব্যয়সাধ্য উপায়ে লোকশিক্ষা বিস্তার করিলে দরিদ্রের মৃত-কুটীরে ইহার বাণী পৌঁছিবে না।

সংবাদপত্রের বাণী এদেশে অনেক পরিমাণে নূতন, কাজেই সহজে দেশের হৃদয়-রাজ্যে ইহার স্থান রচনা করিতে হইলে প্রথম ইহা দেশে কোন্ স্থান অধিকার করিতে অগ্রসর হইতেছে, আলোচনা করা প্রয়োজন।

বর্ত্তমান সময়ে সমাজে একটা অন্তর্গূঢ়-প্রলয় হইতেছে—গ্রামের অভিজ্ঞতা যাহাদের আছে, তাঁহারা জানেন। ধীরে ধীরে অনেক সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা তথাকথিত সমাজ-সংস্কারকগণের উচ্চ কলরব ছাড়াও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কেবল গ্রাম্য সরোবর কর্দ্দমপূর্ণ হইতেছে, এমন নহে—গ্রাম্যালোকের উন্মুক্ত মানস-সরোবরের উপরও অনেক যবনিকা ঘনাইয়া আসিতেছে। কেবল কমল-বনের ভাসমান কুঞ্জ অন্তর্হিত হইয়াছে, এমন নহে—হৃদয়ের অকপট প্রফুল্ল মুক্ততাও নূতন শ্রেণীর দারোগা পঞ্চায়েত, পুলিশ-চৌকীদারদের হট্টগোলে মুদিয়া আসিতেছে।

এই অপ্রস্ফুট অথচ স্পষ্ট রহস্যময়, অথচ মুক্ত, পরিবর্ত্তনের মাঝে কোন্ স্থানে কাহার স্থান, প্রকৃতি গঠন করিয়া তুলিতেছে, তাহা বিশেষ অনুধাবনার বিষয়। তাহা হঠাৎ বোঝা সম্ভব নহে। সংগ্রামের ভিতর দিয়া নৈতিক মুখামুখী যুদ্ধের প্রভাবে যাহা ঘটিয়া উঠে, তাহার অবসানে ফল আলোচনা করা এবং বিচার করা অত্যন্ত সহজ, কারণ বিপ্লব-বাদিগণের উদ্দেশ্য অনুসারেই তাহা অনেকটা গঠিত হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে অজস্র প্রবাহিত ভাব-প্রপাত পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া গমন করিয়া শ্বেত কৃষ্ণ মর্ম্মরের রঙ্গরাজ্যে যে চিত্র রচনা করে, ডিনেমাইটের ধাক্কায় চূর্ণীকৃত এবং ষ্টীম-মেশিনের কর্ত্তৃক পরিচিহ্নিত মার্ব্বেল প্রস্তরে চিত্রিত ছবির আকৃতির ন্যায়, তৎসম্বন্ধে একটা স্থির ধারণা করা যায় না। এই প্রপাতের জলরেখার পথ অনুসন্ধান করিয়া ধীরে ধীরে চিত্রখানিকে বুঝিতে হইবে, কারণ সে চিত্র রচনাকারী আমরা নহি। ক্রমশঃ

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

মৌনীবাবা। *

সূচনা।

স্বভাবসাধু, আজন্ম বৈরাগী, আত্ম-প্রতিষ্ঠা স্থাপনে অনিচ্ছুক, ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা মৌনীবাবা চিরদিন আপনাকে একান্তে মানব চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এমন প্রদর্শন-প্রবৃত্তি-বিহীন মানুষকে আমরা কিরূপে প্রকাশ করিব? তাঁহার কোন গুণ সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি অসম্ভব; বরং সে মহৎ জীবনের অসাধারণ বৈরাগ্য, ঐকান্তিক ব্যাকুলতা, গভীর ঈশ্বরানুরাগ সম্যকরূপে প্রকাশ করিবার সুযোগ এবং সামর্থ্য নাই, ইহাই একান্ত ক্ষোভের বিষয়। যে মহাসাধনার জন্য সে জীবন এ সংসারে প্রেরিত হইয়াছিল, অতি শৈশব কাল হইতেই তাহার বিশেষত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলে মোহিত হইতেন। ক্রীড়াশীল অন্যান্য সঙ্গীগণ যখন উদ্দাম আনন্দে অভিভূত হইয়া নানা প্রকার ক্রীড়ায় মত্ত থাকিত, এই শিশু-সাধু তখন একান্তে দাঁড়াইয়া গম্ভীর ভাবে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেন; কোন প্রকার আমোদে যোগ দিতেন না। উত্তরকালে ওঁকারনাথ পর্ব্বতে জীবনের শেষ পঞ্চবর্ষ কাল মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিয়া জীবনের অভীষ্ট লাভে প্রাণপণ করিয়াছিলেন। জীবনের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে একই ভাব, একই উদ্দেশ্য,একই সাধন সে জীবনের বিশেষত্ব ঘোষণা করিতেছে।

মৌনীবাবা আশৈশব নির্ম্মল চরিত্র এবং আমরণ পবিত্র জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। বাল্যকালে একটী অসত্য কথা কহিয়াছেন বা কাহারও মনে ব্যথা দিয়াছেন, ইহা কেহ জ্ঞাত নহেন। আজীবন সর্ব্বজনপ্রিয় এবং ভগবানে সমর্পিত-চিত্ত থাকিয়া উন্নততর লোকে নীত হইয়াছেন। এমন সাধু-চরিত্র প্রকাশ করিলেও পুণ্য, পাঠ করিলেও পুণ্য। এই জন্য আজ অযোগ্য-হস্তে, ভক্তিনতশিরে যথাসাধ্য সেই পূতচরিত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

শৈশব।

দ্বিপঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২৬৩ সালে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী আড়ুদিয়া গ্রামে এক ভক্ত বৈষ্ণব পরিবারে সাধু প্যারীলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ভক্ত শিবনাথ ঘোষ মহাশয় বাল্যকাল হইতে বিশুদ্ধ বৈরাগ্য-প্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বাল্যজীবনের কথা আমাদের সবিশেষ জানা নাই; দুই একটী মাত্র ঘটনা জানা গিয়াছে।

শিবনাথের বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন তাঁহাদের বাসগ্রামে এক সন্ন্যাসী আগমন করেন। শিবনাথ তাঁহার সঙ্গ লইয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইবেন স্থির করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি ভিক্ষা করেন। জ্যেষ্ঠ ইহাতে আপত্তি করিয়া তাঁহাকে বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে আদেশ করেন; কিন্তু বালক শিবনাথের বিষয়-বিমুখ হৃদয় ইহাতে সম্মত হইল না। জ্যেষ্ঠ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"যদি বিষয়কর্ম্মে মন না দাও, তবে বিষয়ের এক কপর্দ্দকও পাইবে না—ইহা লিখিয়া দিয়া যাও।" শিবনাথ জ্যেষ্ঠের

* সাধু প্যারীলাল ঘোষ মহাশয় মধ্যভারতে 'মৌনীবাবা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ইচ্ছানুরূপ লিখিয়া দিলেন। সেইদিন হইতে তিনি অবিষয়ী হইলেন।

তিন বৎসর নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিবার সময় শিবনাথ আজুদিয়া গ্রামে উপস্থিত হন। এই গ্রামের প্রধান ব্যক্তি এক লক্ষপতির গৃহে তিনি অতিথি হইলেন। এই সরল সাধু যুবককে দেখিয়া গৃহকর্ত্তার অত্যন্ত স্নেহ ও শ্রদ্ধা হইল। তিনি তাঁহাকে গৃহী হইতে অনুরোধ করিলেন। যুবক বলিলেন, বিষয়কর্ম্মে তাঁহার স্পৃহা নাই, মুক্তভাবে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেই তিনি উৎসুক। গৃহকর্ত্তা বলিলেন—"আমার তিন পুত্র, তুমি চতুর্থ পুত্র হইলে। আমার একমাত্র কন্যাকে তুমি বিবাহ কর—এই আমার ইচ্ছা। তোমাকে বিষয়কর্ম্ম কিছুই করিতে হইবে না।"

ধনীর একমাত্র আদরের দুহিতা। তৎকালীন প্রথা অনুসারে অতি শৈশবে তিনি কন্যার বিবাহ দেন নাই। দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই কন্যা পরম যত্নে পিতার গৃহে প্রতিপালিতা হইতেছিলেন। সৌন্দর্য্য এবং সুশীলতার এই কন্যা সর্ব্বজন প্রশংসিত ছিলেন। সুতরাং শিবনাথ তাঁহাকে বিবাহ করিতে সহজেই সম্মত হইলেন। বিবাহ করিয়া তিনি অধিকাংশ সময় তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন; বিষয় কর্ম্মের ধার ধারিতেন না। শেষ জীবনে কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে বিষয়কর্ম্ম দেখিতে হইয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিবনাথ পরম নিষ্ঠাবান ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। চিরজীবন তিনি এক নিয়মে যাপন করিয়াছেন। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি স্নান করিতেন, তাহার পর তিন চারি ঘণ্টা কাল পূজাহ্নিকে কাটাইতেন। পূজান্তে নিজেই নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতেন। এই সময়ে শিশু প্যারীলাল সময় সময় পিতার নৃত্যগীতে যোগদান করিতেন।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে তিনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেন। বিশ্রামান্তে গীতা, চৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিতেন। এই সময়ে গৃহের ও পল্লীর অনেক মহিলা ও পুরুষগণ আসিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া পাঠ শ্রবণ করিতেন। সন্ধ্যাবেলায় শিবনাথ আবার নৃত্যকীর্ত্তনে মত্ত হইতেন। ইহা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল।

শিবনাথ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। বাড়ীতে দুর্গোৎসবাদি হইত। তিনি কখনও দেবীর পূজা দর্শন বা প্রসাদ গ্রহণ করিতেন না। ভক্ত বৈষ্ণবগণ জাতিভেদের কঠোরতা গ্রাহ্য করেন না। শিবনাথ এ সম্বন্ধে বড় উদাসীন ছিলেন। বাড়ীর মুসলমান ভৃত্যের উপর কেহ কোন রকমে অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে, তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন, বলিতেন—"কৃষ্ণের জীব, সকলেই সমান।"

পুত্রেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেক সময় আলোচনা হইত। তিনি বলিতেন—"ঈশ্বর নিরাকারও সাকারও। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভক্তের হৃদয়ে দেখা দিতে পারেন। আমি চোক বুজিলেই, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মাধারী আমার আরাধ্যকে দেখিতে পাই। তোমরা তাঁকে নিরকার ব'লে বুঝেছ, সেই ভাবেই তাঁর পূজা কর। যে যে ভাবে তাঁকে পূজা করে, সেই ভাবেই তাঁকে পায়। যার তার খাওয়াটা লোকাচার বিরুদ্ধ। আমাদের ধর্ম্মে বলে—'লোকের কাছে লোকাচার, সদ্‌গুরুর কাছে সদাচার,

সমসাধকদের সঙ্গে অবিচারে, আহারাদি নিষেধ নাই,—কিন্তু সে সঙ্গোপনে। নতুবা সমাজের বন্ধন থাকেনা; সমাজ গেলে ধর্ম্ম দাঁড়ায় কোথায়?"

শেষ জীবনে, প্যারীলাল সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া তিনি বলিলেন—"ঠিক, ঠিক. আমার যা আগেই করা উচিত ছিল, প্যারী তাহা করিয়া আমাকে বড় লজ্জা দিয়াছে।" এই বলিয়া ভারতের পুণ্যতীর্থ সমূহ পরিভ্রমণ করিবার ইচ্ছায় সেই যে ভক্ত শিবনাথ গৃহ ছাড়িলেন, আর ফিরিলেন না। আজ পঞ্চদশ বর্ষ কালের বক্ষে লুকাইয়াছে,—শিবনাথ নিরুদ্দেশ। আজ তিনি এ লোকে কিম্বা লোকান্তরে, তাহা আমরা জানি না।

এই পিতার পুত্র হইয়াই সাধু প্যারীলাল স্বভাব-সাধু হইয়াছিলেন।

প্যারীলালের মাতা নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলা; সহিষ্ণুতা, কোমলতা, নির্ম্মল ও আড়ম্বরশূন্য ধর্ম্মভাবে ভূষিতা। বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারকে তিনি প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। আজীবন ভ্রাতৃবধূদের সঙ্গে বাস, কিন্তু সে পরিবারে অশান্তি নাই। ভ্রাতৃবধূরা চিরদিন তাঁহাকে সম্মানের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে রহিয়াছেন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ উদারতা। পুত্রদিগের ধর্ম্মকে তিনি অত্যন্ত পবিত্র মনে করিয়া শ্রদ্ধা করেন। তাঁহার পুত্রেরা যখন উপাসনা এবং ব্রহ্মসঙ্গীত করিতেন, তিনি অতি ভক্তির সহিত তাহাতে যোগ দিতেন এবং এখনও দেন।

তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র যখন তাঁহার এক বালিকা কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষার্থ লুকাইয়া কলিকাতায় লইয়া আসেন, তখন তিনি কন্যাকে ফিরাইয়া লইবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। রবিবার; মন্দিরে উপাসনা হইতেছিল। তিনি মন্দিরের উপাসনায় গেলেন;—নিরাশ-মনে ফিরিয়া আসিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন—"বাবা, তুই আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিস্।" পুত্র বলিলেন—"কেন, মা?"

মাতা বলিলেন—"তোর কথায় আমি বুঝেছিলাম যে, ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা দেবী; ধর্ম্মের জন্যই তাঁদের সব। দেখে তো তা মনে হ'ল না। এত বিলাসিতার মধ্যে যে প্রেম, ভক্তি আস্‌তে পারে, তা তো মনে হয় না। কুমুদিনীকে যদি সত্যিই ধর্ম্মের জন্য এনে থাকিস্, তাহ'লে রাখ; আর যদি এই রকম বিবি তৈ'রী করিস্, তবে ফিরিয়ে দে—আমি নিয়ে যাই।"

তিনিও জাতিভেদের কথা মানেন না। পুত্রদের বন্ধুগণ বাড়ীতে আসিলে, তিনি সকলকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে একত্রে আহার করাইতেন, কখনও জাতির বিচার করিতেন না। ইহাতে প্যারীলালের পিতাও আপত্তি করিতেন না; বরং দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

প্যারীলালের মাতার অসাধারণ সহিষ্ণুতা। পতি সর্ব্বত্যাগী নিরুদ্দেশ, পুত্রেরা গৃহত্যাগী, কিন্তু তাঁহার মুখে কোন দিন অনুযোগ শোনা যায় নাই। পতিপুত্র ধর্ম্মের জন্য সব ছাড়িয়াছেন—ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা। গতপূর্ব্ব বৎসর যখন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে একান্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"যে বস্তুর জন্য সংসার ছারখার করলে, এত দুঃখ দিলে—বল তা' পেয়েছ কিনা?" আরো

বলিয়াছিলেন—"কখনও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি নাই, পাছে তোদের অকল্যাণ হয়। ভগবান তোদের ভালই কর্‌বেন। তাঁকে লাভ কর্‌তে পার্‌বি—নিশ্চয় পারবি!"

এই মাতার প্রভাবে প্যারীলালের ধর্ম্মজীবন শিশুকালেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এই পুণ্যবতী নারী এখনও জীবিত আছেন।

প্যারীলাল, পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁহারা দুই ভ্রাতা ও পাঁচ ভগিনী। প্যারীলাল ব্যতীত সকলেই জীবিত আছেন।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে, আজুদিয়া গ্রামের ও তৎকাল-প্রসিদ্ধ ঘোষ-বংশের বর্ত্তমান হীনাবস্থা ছিল না। বিশালকায়া পদ্মা নদী গ্রামের পার্শ্বদেশ দিয়া প্রবাহিতা। গ্রামের ধনী-দরিদ্র সকলের দিন সুখে কাটিত। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় গ্রামবাসী সকলে মিলিয়া হরিসংকীর্ত্তন করিতেন। পল্লীমাতার এই শান্ত-ক্রোড়ে প্যারীলালের শিশুজীবন কাটিয়াছিল।

শিক্ষা।

প্যারীলালের গ্রাম্য-পাঠশালাতে শিক্ষারম্ভ হয়। পাঠশালার শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি চারি মাইল দূরবর্ত্তী ছাত্রবৃত্তি-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে যান। তাঁহাকে প্রতিদিন এই দীর্ঘপথ হাঁটিয়া যাওয়া আসা করিতে হইত। তাঁহার স্বাভাবিক ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। বার বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া তিনি বৃত্তিলাভ করেন। এই সময়ে, পঞ্চম বর্ষীয়া এক বালিকার সহিত প্যারীলালের বিবাহ হয়। এই বাল্যবিবাহ তাঁহার জীবনে কু-ফল আনয়ন করিয়াছিল।

ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া তিনি পাবনা জেলা-স্কুলে পড়িতে যান। এই স্থানেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

এই সময়ে প্যারীলালের এক অদ্ভুত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইনি সেই বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক। লোকে ইঁহাকে 'খ্রীষ্টান' বলিয়া ঘৃণা করিত। কিন্তু ইনি ব্রাহ্ম; খ্রীষ্টান পাদ্রীদের বাহিরের একখানি জীর্ণঘর ইঁহার আশ্রয়স্থান ছিল। মেথর-জাতীয়া এক রমণী ইঁহাকে রন্ধন করিয়া খাওয়াইত। অপরে ঘৃণা করিলে কি হয়, ইঁহার কথাবার্ত্তা, চলাফেরার মধ্যে এমন একটী তন্ময় ভাব ছিল যে স্বভাবসাধু প্যারীলাল শীঘ্রই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তিনি মাঝে মাঝে ইঁহার নিকটে যাইতে আরম্ভ করিলেন। শিশুকালে পিতার নিকট শুনিয়াছিলেন—"কাহাকেও ঘৃণা করিতে নাই; কৃষ্ণের জীব সকলেই সমান,"—ইঁহার জীবনে তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইলেন; রোগ-শয্যায় কষ্ট পাইলে পিতা বলিতেন—"হরিকে ডাক, সব কষ্ট যাবে,"—দেখিলেন ইনিও সর্ব্বদাই প্রার্থনার ভাবে থাকেন ও ধর্ম্মকথা কহেন। এমন মানুষ তিনি পূর্ব্বে দেখেন নাই; সুতরাং একেবারে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। ইনি কয়েকখানি ধর্ম্মবিষয়ক ক্ষুদ্র পুস্তক ও একখানি ব্রহ্মসঙ্গীত দিলেন; নিত্য প্রার্থনা করিতে বলিয়া দিলেন। প্যারীলাল প্রতিদিন গান ও প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই হইতে প্রার্থনা তাঁহার জীবনের সাথী হইল, ইহজীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ইহাকে সঙ্গচ্যুত করেন নাই।

বাল্যকালের ঐকান্তিকতা। যাহা শুনিতেন তাহা তখনই কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। একদিন গুরু উপদেশ দিলেন—"লোকে বলে যার তার খাওয়া তো ধর্ম্ম নয়; ঘরে বসে ঈশ্বরের নাম

কর, ভাল মানুষ হও, তাহাতেই ধর্ম্ম। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,—মুসলমানের ভাত খাওয়া ধর্ম্ম;—ইহাতে নিজের ও অপরের কুসংস্কার যায়। আমরা যে মুখে বলি—'সকলেই আমাদের ভাই'—কাজেও তাই করা চাই। সুতরাং তোমরা সকল জাতির অন্ন অবিচারে গ্রহণ করিবে; তাহাতে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হইবে।"

উপদেশ শ্রবণমাত্র তদনুযায়ী কার্য্য করা। ক্লাসে একটী মুসলমান বন্ধু পড়িতেন, তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া পিষ্টকাদি খাইয়া আসিলেন ও মুসলমানের পাউরুটি কিনিয়া খাইলেন এবং ইহা ধর্ম্মভাবে করিলেন—হাল্‌কা ভাবে নহে।

ছুটীর সময় বাড়ীতে যাইয়া সঙ্গীত ও উপাসনা করিতেন। পিতা, পুত্রদের মুখে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিয়া খুব সুখী হইতেন। ভক্তির গান ও ধর্ম্মকথা শুনিয়া ভক্ত পুত্রদের শত অপরাধ ভুলিয়া যাইতেন।

পাবনার প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্যারীলাল রাজসাহী কলেজে পড়িতে যান। এই স্থানে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে তাঁহার পরীক্ষা দেওয়া হইল না; শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করিয়া তিনি প্রথমে জলপাইগুড়ী ও পরে (রংপুর) সপ্তপুষ্করিণী গমন করেন। এই স্থানেই তাঁহার গার্হস্থ্যজীবনের সূত্রপাত; তাঁহার একমাত্র কন্যা এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করেন। প্যারীলালের গার্হস্থ্যজীবন নানা পরীক্ষায় পূর্ণ ছিল। বার বৎসর বয়সে, পাঁচ বৎসরের এক শিশু-বধূর সহিত পিতা বিবাহ-সূত্রে তাঁহাকে বাঁধিয়া দেন। এই বালিকা-বধূকে কিঞ্চিৎ শিক্ষিতা করিবার জন্য প্যারীলালের শত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। বধূ কিছুতেই পুস্তক স্পর্শ করিতেন না। এই পত্নীকে ধর্ম্ম-পত্নী করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বোধ করি, তাঁহার সে বাসনাও পূর্ণ হয় নাই।

পরীক্ষা।

কন্যার বয়স পাঁচ ছয় মাস হইলে পিতামহ পিতামহী তাঁহার অন্নপ্রাশনের আয়োজন করিলেন। প্যারীলাল তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, বলিলেন কন্যার অন্নপ্রাশন ও নামকরণ ব্রাহ্মমতে হইবে। পিতামাতা বলিলেন—"সেতো বেশ! তোমরা ধর্ম্মবন্ধুদের সঙ্গে ভগবানের নাম করে কন্যার নাম দিবে, ইহাতে আপত্তির তো কোন কারণ নাই। তোমাদের বন্ধুরা যিনি যেখানে আছেন, তাঁদের ডাক।"

কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে ধর্ম্মবন্ধুরা আসিলেন; হিন্দুসমাজের আত্মীয়-কুটুম্বও সকলে আসিলেন। ব্রহ্মোপাসনা করিয়া কন্যার নামকরণ হইল।

উপাসনান্তে আহারের সময় এক সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ঐ অঞ্চলের অনাচরণীয় দুই ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই সামাজিক ব্যাপারে লোকাচার পালন করিতে হইবে; সুতরাং পুত্রেরা উঁহাদের সহিত একত্রে আহার করিতে পারেন না। পিতা বলিলেন—"একক্ষেত্রে একত্রে আহার হইতে পারে না।" কিন্তু পুত্রগণ বলিলেন—"যে সকল ধর্ম্মবন্ধুর সঙ্গে সর্ব্বদাই একত্র পান ভোজন হয়, আজ তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে ভোজন না করিলে কপটতা হইবে।"

বেলা ক্রমে বাড়িতে লাগিল—আহারের ডাক পড়ে না। হিন্দু সমাজের বন্ধুগণ অনেকেই আহার করিয়া চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্ম-

বন্ধুগণ আলোচনা, সংকীর্ত্তনাদি করিতে-ছেন ;—সকলেই অভুক্ত। শুভদিনে এই অকল্যাণ-চিহ্নে সকলে শঙ্কিত হইয়া উঠি-লেন ; বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল।

বেলা শেষে স্থির হইল, নিকট-গ্রামবাসী এক ব্রাহ্ম বন্ধুর বাড়ীতে আহারের আয়োজন হইবে ; রাত্রিতে সকলে সেখানে আহার করিবেন।

প্যারীলালের মাতা ইহা শুনিলেন, দেখিলেন গৃহ হইতে অতিথি অভুক্ত ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি সমাজিক বন্ধন তুচ্ছ করিয়া, সকলের সমক্ষে আসিয়া বলিলেন— "আপনারা আমার পুত্রস্থানীয়। আমি আপনাদিগকে একত্রে আহার করাইব ; আপনারা অভুক্ত অবস্থায় ফিরিবেন না।"

মাতা স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া সকলকে একত্রে আহার করাইলেন। সেই দিন প্যারীলাল পিতাকর্ত্তৃক বন্ধুগণসহ লাঞ্ছিত হইয়া গৃহতাড়িত হইলেন।

তাঁহার হৃদয় অতিশয় স্নেহ-প্রবণ ছিল। পিতামাতা, ভাই ভগ্নী, স্ত্রী সন্তান, এমন কি দূরসম্পর্কিত আত্মীয়গণের প্রতিও তাঁহার ভালবাসা অতি গভীর ছিল। কাহারও দুঃখ সহিতে পারিতেন না,—কাঁদিয়া আকুল হই-তেন। এমন কোমল হৃদয়েই পবিত্র বৈরাগ্য অবতীর্ণ হয়। ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসে এ ঘটনা বিরল নহে। পিতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, একদিকে যেমন তাঁহার স্নেহ-প্রবণ হৃদয় শতধা ভাঙ্গিয়া গেল, অন্য দিকে তেমনি তাঁহার স্বাভাবিক বৈরাগ্য সেই আহত হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া, পরম পিতাকে লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। এই সময়ে তিনি প্রায়ই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিতেন—"আমাকে তোমরা বিদায় দাও ; আমাকে নির্জ্জনে ধর্ম্মসাধন করিবার সুযোগ দাও।" ঈশ্বর সে সুযোগ করিয়া দিলেন।

কিছু দিনের মধ্যে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইল। ইহাতে তাঁহার আহত হৃদয় আরও ব্যথিত হইয়া উঠিল ; তাঁহার সংসার-বিমুখতা বৃদ্ধি পাইল।

পত্নী-বিয়োগের পর, প্যারীলাল কার্য্য-স্থান হইতে দু'মাসের বিদায় লইয়া কলিকাতা আসিলেন। ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে নানাস্থানে গমন করিতেছিলেন। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, প্যারীলাল তেমনি তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া গেলেন। তৎপরে যশোহর জেলার অন্তঃপাতী বাগআঁচড়া গ্রামবাসী ব্রাহ্মদের হীনাবস্থার কথা শুনিয়া তিনি সেস্থানে গমন করিলেন এবং বালক বালিকা-দের জন্য একটি মাইনর বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার হৃদয়ের প্রজ্জ্বলিত অগ্নির নির্ব্বাণ হইল না। ব্রাহ্ম-জীবনের বহির্ম্মুখীন অবস্থা তাঁহার হৃদয়ের এই অগ্নিকে আরও প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল। তাঁহার মনে হইল, সাধনাদ্বারা জীবন লাভ করিয়া, ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া ব্রাহ্মসমাজের এই বহির্ম্মুখীন গতিকে ঈশ্বরাভিমুখী করিতে হইবে। প্রবল ধর্ম্মতৃষ্ণা তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। আহারে রুচি নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই। বহু রাত্রি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাপন করিতেন। অবশেষে, একত্রিশ বৎসর বয়সে, কর্ম্মত্যাগ করিয়া, তিনি শেষ জীবনের সাত বৎসর কাল কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত করেন। প্রথম দুই বৎসর চিত্রকুট পর্ব্বতে ও শেষ পাঁচ বৎসর ওঁকার-নাথ পর্ব্বতে তপস্যা করেন। সংসারত্যাগে

কৃত-সংকল্প সাধু প্যারীলাল যখন কার্য্য-ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন তাঁহার পরিচিত, আত্মীয়, ধর্ম্মবন্ধু ও তাঁহার একান্ত অনুরক্ত ছাত্রবৃন্দ অত্যন্ত কাতর হইয়া তাঁহাকে এ সংকল্প ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রগণ তাঁহাকে ধর্ম্মগুরুর ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। গুরুশিষ্যে এমন মিষ্ট সম্বন্ধ একালে অতি বিরল। যেদিন প্রকাশ্য সভায় সকলে প্যারীলালকে বিদায় দিলেন ও ছাত্রগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন, সেদিনের দৃশ্য অতীব হৃদয়দ্রবকারী।

কর্ম্মত্যাগ করিয়া তিনি নলহাটীতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনীদের নিকট বিদায় লইতে আসিলেন। এখানে সকলে তাঁহার সংকল্পে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতা যাঁহাকে আহ্বান করেন, পৃথিবীর সকল বাধা তাঁহার নিকট তৃণের ন্যায়। তিনি কর জোড়ে সকলকে বলিতেন—"আমি অতি দুর্ব্বল লোক। চারিদিকের এই সকল চিত্ত-বিক্ষেপকারী ঘটনা ও প্রলোভনের মধ্যে বাস করিয়া আমার ন্যায় ব্যক্তির ধর্ম্মসাধন হয় না। আপনারা আমার প্রতি সদয় হইয়া প্রসন্নমনে আমাকে বিদায় দিন। আমি যদি ভগবানকে লাভ করিয়া, তাঁহার আদেশ পাই, অবশ্যই পুনর্ব্বার আপনাদের সঙ্গে সম্মিলিত হইব। তাহাতে আমার জীবন সার্থক হইবে, আপনাদেরও মঙ্গল হইবে। এ অসার জীবন লইয়া আমি কি করিব? আপনারাই বা তাহাতে কি লাভবান হইবেন?"—তিনমাস এইরূপে সকলকে বুঝাইলেন, কত সান্ত্বনা করিলেন, কত আশার কথা বলিলেন। এই তিনমাস নিজেও বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

"জন-সমাজেই ধর্ম্ম সাধনের ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র," বন্ধুগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। বিনয়ী প্যারীলাল শত দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেন—নির্জ্জন সাধনের আবশ্যকতা কত বেশী। "মহাত্মা বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাজনগণ অসাধারণ প্রতিভাশালী ও ধর্ম্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। কিন্তু, ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইঁহারা কি কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাঁহার সাক্ষ্য দিতেছে। বুদ্ধ শত বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া সত্যজ্ঞান লাভ করেন; খ্রীষ্ট জোহনের নিকট অভিষিক্ত হইয়া চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় তপস্যা করেন। তাঁহার জীবনের প্রথম ত্রিশ বৎসরে ঘটনা জানা যায় না; কিন্তু, ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই সময় তিনি কোন নির্জ্জন প্রদেশে তপস্যার নিমগ্ন থাকিয়া জীবনের মহৎকার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন; মহম্মদ আড়াই বৎসর হোরা পর্ব্বতের উপরে গভীর তপস্যায় মগ্ন থাকিয়া মহান ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই সকল ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদিগকে যদি এত কঠোর সাধন করিয়া ধর্ম্মলাভ করিতে হইয়াছিল, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের তদপেক্ষা কত অধিক সাধনার দরকার আছে! সংসারে থাকিয়া বীর সাধকগণ ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সাধারণ ভাবে চলিতে পারেন বটে, কিন্তু উচ্চ ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে, বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদের ন্যায় একবার নির্জ্জনে গমন করিয়া ব্রহ্মলাভ করিতেই হইবে। বিশেষতঃ, ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় উচ্চ আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম কঠোর সাধনা ব্যতিরেকে লাভ করা দুষ্কর। বর্ত্তমান ব্রাহ্মজীবন ও ব্রাহ্মসমাজ ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। ধর্ম্ম

আমাদের জীবনের উপরে উপরে ভাসিতেছে। ধর্ম্মের বাহিরের অভিনয় আছে,—ভিতরের বস্তু নাই। পাশ্চাত্য অনুকরণে লোক ঘোর রাজসিক ভাবে পূর্ণ হইয়া ভক্তি ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে; তাহার আনুসঙ্গিক পাপ ও দুর্ব্বলতা তো দেখা দিবেই। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম এ দেশকে উদ্ধার করিবে; ইহাকে এমন হাল্‌কা ভাবে সাধন করিলে চলিবে না। অতএব আপনারা কৃপা করিয়া আমার জন্য প্রার্থনা করুন,—আমি নির্জ্জনে যাইয়া সেই ধন লাভ করিয়া ফিরিয়া আসি। আমার জন্য, আপনাদের জন্য, এই দেশের জন্য আমাকে আপনারা সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় দিন। সেই নিরীহ মানুষ এই সকল কথা বলিতে বলিতে অনবরত অশ্রুপাত করিতেন। মহাজনেরা যেমন জীবের দশা দেখিয়া অস্থির হইয়াছিলেন, সাধু প্যারী-লালের নির্ম্মল আত্মাও দেশের, বিশেষত ব্রাহ্মসমাজের, দশা দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং, বন্ধুদিগের শত চেষ্টা আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি ১৮৮৮ খৃঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট, নলহাটী হইতে চিত্রকূট পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে ভ্রাতাকে বলিলেন—"আমার আজ কি আনন্দের দিন! অতঃপর আমার 'আমার' বলিবার ভগবান ভিন্ন আর কেহ থাকিবেন না। সংসারের দিক থেকে একে-বারে অসহায় ও নিরাশ্রয় হইলে, তবে ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত নির্ভরতা আসে। জগদীশ্বর দয়া করিয়া আমাকে সেই অনুকূল অবস্থা দিলেন। পিতা আছেন, তোমাদের দুঃখ কি?"

সাধু প্যারীলাল সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সত্যধর্ম্ম লাভ করিতে গৃহ ছাড়িলেন। তাঁহাকে রেলওয়ে ষ্টেশনে বিদায় দিয়া সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে শূন্য ঘরে ফিরিলেন।

সন্ন্যাস ও তপস্যা।

সন্ন্যাস যাত্রাকালে প্যারীলালের সঙ্গী—কয়েকখানি ধর্ম্মগ্রন্থ—উপনিষদ, গীতা, বাই-বেল, ব্রহ্মসঙ্গীত ও আরও কয়েকখানি ধর্ম্ম গ্রন্থ তিনি সঙ্গে লইয়াছিলেন এবং চিত্রকূট অবস্থান কালেও মাসে মাসে পুস্তক চাহিয়া পাঠাইতেন। তিনি প্রথম কয়েক মাস বন্ধু বান্ধবদিগকে পত্রাদি লিখিতেন এবং তাঁহাদের একান্ত অনুরোধে দৈনিক কার্য্যাবলী লিখিয়া রাখিতেন। আমরা তাঁহার সেই দৈনন্দিন লিপি হইতে তুলিয়া দিলাম।

১৮৮৮।

১২ই আগষ্ট। রাত্রিতে নলহাটী হইতে বাহির হইয়া কোথায়ও বিশ্রাম না, করিয়া ১৩ই তারিখ প্রায় ১১টা রাত্রি নাইনি ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া পিতার কৃপায় পরম সুখে রাত্রি এবং তাহার পরদিন ১২টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ৪টার সময় মাকুণ্ডি ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। রাত্রিতে পথ চলা অসম্ভব বোধ করিয়া, সহকারী ষ্টেশন-মাষ্টারের অনুরোধে, পিতার কৃপা সম্ভোগ করিতে করিতে সুখে সে রাত্রি সে স্থানে অতিবাহিত করিলাম।

১৫ই। পূর্ব্বদিন গাড়ী হইতে নামিলেই পিতার কৃপায় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া নিজ ইচ্ছায় আমার সঙ্গী হইলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, আরও একটী ব্রাহ্মণ সঙ্গে ছিলেন। পিতার দ্বারা প্রেরিত দুইটী কোল * আমাদিগকে অর্দ্ধরাস্তা পর্য্যন্ত পথ দেখাইতে দেখাইতে আসিয়া, রাখিয়া প্রস্থান করিল। সেখান হইতে অগ্রগামী

* কোলজাতীয় লোক।

ব্যক্তির ঘোটকের পদচিহ্ন দেখিতে দেখিতে আমরা প্রায় ১২টার সময় চিত্রকুট পৌছিয়া মন্দাকিনী নদীর অপরপারে সঙ্গীগণকে পরিত্যাগ করিয়া ফটকশিলাভিমুখে গমন করিলাম। স্থানটী ধর্ম্মের জন্যই যেন প্রস্তুত হইয়াছে। নদীর উভয় পার্শ্বে উচ্চ উচ্চ পাহাড় উঠিয়াছে। পাহাড়ের গায় এবং নদীর উভয় পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুন্দর মন্দির। মন্দির সকল সন্ন্যাসী এবং দেব-দেবীতে পূর্ণ। ফটকশিলাভিমুখে পৌছিয়া নদীর মধ্যে দুইটী প্রকাণ্ড প্রস্তর দেখিলাম। বোধ হইল যেন সেই দুইটীর জন্যই স্থানের নাম "ফটকশিলা" হইয়াছে। সেখানে তিন জন লোক ছিল। তাহারা স্নান করিবার জন্য এবং অন্য কার্য্যে সেখানে আসিয়াছিল। তাহারা বলিল উপরে এক ঘর আছে,—সেখানে উঠিবার রাস্তা নাই। আমি এক খাড়া উচ্চস্থান দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু অপারক হইলাম। পুনরায় চেষ্টা করিয়া, অন্য রাস্তা দিয়া উঠিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলাম না। মধ্যম রকমের একটা বাড়ী এবং তাহাতে অনেক গুলি ঘর ছিল। এখন বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। যেস্থানে বসিয়া পিতাকে লাভ করিব বলিয়া বঙ্গদেশ হইতে এখানে আসিলাম, সে স্থানের দুরবস্থা দেখিয়া প্রাণ ব্যাকুল হইল। * * * অনাহারে প্রায় ১৩ মাইল পার্ব্বতীয় পথ পার হইয়া আসিয়া এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া নানা প্রকার গোলযোগে পড়িলাম। একবার মনে হইল নীলকান্তকে পত্র লিখি, আর বার মনে হইল কুঞ্জলালকে টাকা পাঠাইতে লিখি এবং মহর্ষির শান্তি নিকেতনে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া, খণ্ডগিরিতে প্রস্থান করি; কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা স্মরণ হওয়াতে এবং পিতার কৃপা স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিতে বসিলাম। প্রার্থনার স্থান, কয়েকটা বড় বড় বৃক্ষের নিম্নস্থ একটী ভগ্ন ইঁদারার পার্শ্বস্থ বাঁধানো স্থান। যতই প্রার্থনা চলিতে লাগিল, ততই আশা প্রবল হইয়া অবিশ্বাস চলিয়া গেল। উপাসনা, প্রার্থনা এবং সেই স্থানেই শয়ন করিয়া রাত্রি অতিবাহিত হইল।

১৬ই। পিতার অপার করুণায় একটী ব্রাহ্মণ আসিয়া আমার বিষয় সমস্ত অবগত হইয়া আমার জন্য কিছু করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তিনি নানা স্থানের কথা বলিলেন। সে সকল স্থান দেবদেবীতে পূর্ণ এবং গুরুমহাশয়দের আবাস স্থান মনে হওয়াতে যাইতে ইচ্ছা হইল না। তাঁহার নিকট শুনিলাম—"নানকপন্থী এক বাবাজীর প্রকাণ্ড এক বাগান এবং বাড়ী কেবল উদাসীনদের জন্য আছে। আপনি সেখানে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবেন।" তাহাতে আমার মন বড় আনন্দিত হইল। আমি পিতার কৃপা অনুভব করিতে লাগিলাম। তাহারপর তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া এই পবিত্র স্থানে আনিলেন। আসিবামাত্রই নির্জ্জন একটা প্রকাণ্ড হলে আমার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল এবং দুই দিনের পর অন্ন এবং রুটি আহার করিয়া প্রচুর মার কৃপা অনুভব করিলাম।

"কি স্বদেশে কি বিদেশে
মা আমার সর্ব্বদা পাশে......"

নানা প্রকার কুস্বপ্ন দেখিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

১৭ই। প্রচুর মার কৃপা সম্ভোগ করি-

লাম। মা অগু রুটি এবং পরমান্ন খাওয়াইলেন।

১৮ই। অগু এক প্রকার যাইতেছে। দুই দিন হইল বৃষ্টি হইতেছে। খুব প্রার্থনা চলিতেছে। মা যেরূপ করিয়া আমার বাসস্থান এবং খাদ্য দিতেছেন, তাহা তাপসমালায় কোন কোন সাধকজীবনে যে পড়িয়াছি, তাহা অপেক্ষা কম আশ্চর্য্য নয়। এমন মাকে না পাইলে আর আমি গৃহে ফিরিব না। রাত্রিতে এক প্রকার জড়তা আসিয়া ঘুমকে অধিক করিয়াছিল।

১৯শে। আজ কাল্‌কার চেয়ে অবস্থা ভাল। পিতার কৃপায় উপাসনা গাঢ়তর হইতেছে। "যিনি মহারাজা, বিশ্ব যাঁর প্রজা" এই গানের মর্ম্ম এখন আমি বুঝিতেছি।

২০শে। প্রাতঃকালে একব্যক্তি মহন্তের আজ্ঞানুসারে আমাকে অতি বিনীত ভাবে প্রস্থান করিতে বলিল। আমিও কিঞ্চিৎ প্রার্থনার পর গাত্রোত্থান করিয়া প্রস্থান করিলাম। পুনরায় ফটকশিলায় গেলাম। সেখানে কয়েকজন লোক ছিল; তাহারা অনসূয়া মার আশ্রমে যাইতেছিল। আমিও তাহাদের সঙ্গী হইলাম। ১২টার সময় এখানে পৌঁছিয়া, লছমন ভায়ার পত্র দেওয়ার পরই রুটি ও ভাত খাইতে পাইলাম; তাহারপর অতি সুন্দর স্থানে এক নির্জ্জন গৃহ পাইলাম। আশ্রম অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতের দ্বারা বেষ্টিত; মধ্যে মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত। আশ্রমে অনেক প্রস্তর-নির্ম্মিত ঘর আছে এবং অনেক প্রস্তুত হইতেছিল, তাহা ঐ রূপেই রহিয়া গিয়াছে; যেহেতু সিদ্ধিবাবাজির মৃত্যুতে আশ্রমের আয় কমিয়াছে।

আশ্রমবাটিকা পর্ব্বতের বাহির করা (Projecting) শিরোদেশের নিম্ন হইতে আরম্ভ হইয়া পাদদেশের নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমি পাদদেশের মন্দিরের বারান্দায় থাকি। রাত্রি এক প্রকার কাটিল।

২১শে। আমি আর উপরে যাই নাই; কাজেই দিনের বেলায় আমার আর খাবার আসে নাই। সন্ধ্যায়, মায়ের করুণায়, উপর হইতে যথেষ্ট দুগ্ধ এবং রুটি পাইলাম।

২২শে। অগুকার উপাসনায় বড় প্রীতি লাভ করিয়াছি। মায়ের কৃপায় বিশ্বাস এবং নির্ভরতা বৃদ্ধি পাইতেছে। অগুও মা যথেষ্ট খাদ্য দিলেন।

২৩শে পাপের জ্বালায় মন বড় অস্থির।

২৪শে। জ্বালা আরও তীব্রতর। কাঁদিতে কাঁদিতে দিন যাইতেছে। সময় সময় আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমার অবস্থা অন্তর্য্যামী জানেন।

২৫শে। গত কল্য বিকাল হইতে অগু প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। আজ যেরূপ পিতার কৃপা অনুভব করিতেছি, এরূপ জন্মে কখন করিয়াছি কিনা মনে পড়ে না।

ধন্য পিতার কৃপা!
জয় ব্রহ্মকৃপার!
ব্রহ্ম কৃপাহিকেবলম্!

এইরূপ সময়ে যদি ব্রহ্মকৃপা লোককে রক্ষা না করে, তবে মানুষ বাঁচিতে পারে না।

২৬শে। অগু এক প্রকার ভালই যাইতেছে। এক ঘণ্টা অবস্থা ভাল ছিল না। কেবল অবিশ্বাসের জন্যই এইরূপ হয়। এখানে যে প্রকারে আমার খাদ্য আসিতেছে, তাহা অধিকতর আশ্চর্য্য। মার অপার কৃপায়, একটি ভ্রাতা প্রত্যহ আমার খাদ্য

যোগাইতেছেন। এখানেও অন্ন রুটি এবং ডাইল মিলিতেছে। আমার প্রতিজ্ঞা আছে, আমি ভিক্ষা করিব না। যাহার পিতা বিশ্বাধিপ, সে ভিক্ষা করিবে কেন?

২৭শে। বিকালে খুব ভাল অবস্থায় ছিলাম।

২৮শে। আজ ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় দিন যাইতেছে। পিতার কৃপা ধরিয়া আছি। দেখা যাক কি হয়।

২৯।৩০।৩১শে। অল্লাধিক পরিমাণে নরকভোগ চলিতেছে। এইপ্রকার থাকিলে জীবন-ধারণ আমার পক্ষে কঠিন হইবে। অদ্য বিকালে প্রার্থনায় খুব ভাব হইয়াছিল। শরীরের মধ্যে কেমন এক প্রকার কার্য্য হইতে লাগিল। সমস্ত বিকাল প্রার্থনায় কাটিল। সন্ধ্যার পর যেই আসন হইতে উঠিয়াছি এবং মনে করিতেছি, দাঁড়াইয়া কিছুকাল প্রার্থনা করি, অমনি অচৈতন্য হইয়া মেজেতে পড়িয়া গেলাম। কিছুকাল পরে চৈতন্য হইলে দেখিলাম, হাতে পায়ে ঘা হইয়া গিয়াছে, আর বাহিরের লোক ভিতরে আসিয়াছে, এবং আমাকে ডাকিতেছে। পিতা মঙ্গলই করিবেন, কিন্তু আমি যে বিশ্বাসী হইতে পারিতেছি না।

আমি এখানে ধর্ম্মশালায় (পান্থ-নিবাসে) বাস করি। এই তিন দিন জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে এখানে বহু সংখ্যক লোকের সমাগম হওয়াতে, আমি প্রথম দিন একখানা প্রকাণ্ড পাথরের নীচে কাটাইয়াছিলাম, আর দুই দিন দুই রাত্রি স্থানাভাবে দেয়ালের মধ্যের আলমায়রার নীচের তাকে বাস করিয়াছিলাম। ধন্য পিতা! প্রত্যহই আমার গৃহে আমার খাদ্য যোগাইতেছেন। আমি এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট কিছু চাই নাই।

সেপ্টেম্বর।

১লা। আজও নরকভোগ চলিতেছে। এখানে বড় গোলমাল হইতেছে। বর্ষার পর গুহাতে বাস করিব মনে করিতেছি। বর্ষা আরও দেড়মাস থাকিবে, শুনিতেছি। যাহা হউক, পিতাই এক প্রকার করিয়া দিবেন। বিকালে কথঞ্চিৎ ভাল ছিলাম। উপরে মহন্ত মহাশয়ের নিকট গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—"বিনা গুরুতে সিদ্ধি হইবে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি"। কিছু কটুভাষাও ব্যবহার করিলেন।

২রা। আজ পিতা দয়া করিয়া প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা করিতে দিতেছেন। আমি যে ঘরে বাস করি, তাহার কিছু দূরে, দক্ষিণের দিকে, নদীর তীরে অত্রিমুনি এবং অনসূয়া দেবীর আশ্রম। পৃথক পৃথক মন্দিরে উভয়ের প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলি পরবর্ত্তী সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। যাহা হউক, তাঁহাদের হৃদয়ের তেজ মানব হৃদয়কে স্পর্শ না করিয়া পারে না। কি জলন্ত বিশ্বাস! যখন সমস্ত স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, তখন একটি পুরুষ এবং একটি স্ত্রীলোক ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য অমিত তেজ এবং উৎসাহের সহিত ধর্ম্মসাধন করিয়াছিলেন। অনসূয়া দেবী অত্রিমুনির পত্নী। এইরূপই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হওয়া উচিত। মূর্ত্তিটী প্রকৃতই হউক আর অপ্রকৃতই হউক, দেখিলেই বোধ হয় তাহার মধ্য হইতে তেজ বাহির হইতেছে। ধন্য ধর্ম্মরত্ন! তোমাকে যে পাইয়াছে, সে যুগান্তরেও মানব-হৃদয়ে ধর্ম্মের তেজ সঞ্চালন করিতে পারে। ধন্য ভারতমাতা! তুমি এক সময় এমন কন্যা প্রসব করিয়াছিলে, যাঁহার তেজে বনভূমি এখনও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। মাতার দুই জোড়া

খড়ম প্রস্তুত হইয়াছে; এক জোড়া পিত্তলের আর এক জোড়া, বোধ হইল পাথরের। সে দুই জোড়া তাঁহার সম্মুখে একখানা ছোট চৌকির উপর স্থাপিত। আরও অনেক দেবমূর্ত্তি আছে; সেগুলির সহিত খড়মের পূজা হইয়া থাকে। অত্রিমুনির চেয়ে অনসূয়া দেবীই অধিক তেজস্বিনী ছিলেন; কারণ তাঁহার নামেই আশ্রমটি পরিচিত এবং প্রবাদ আছে, তাঁহার তপঃপ্রভাবেই স্বর্গ হইতে মন্দাকিনী নামিয়া আসিয়া আশ্রমের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। আশ্রমের দক্ষিণে একটা প্রকাণ্ড পাথর আছে। তাহার গায়ে অনেকগুলি মূর্ত্তি আছে, যথা—শিব, গণেশ, কালী ইত্যাদি; কতকগুলি পুরুষ এবং স্ত্রীমূর্ত্তি আছে। আমি সমস্ত দিন গুহার মধ্যে কাটাইয়াছিলাম।

৩রা। অবস্থা খারাপ। প্রায় দুইটা পর্য্যন্ত গুহার মধ্যে ছিলাম। পুনঃ পুনঃ আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। যন্ত্রণা ক্রমাগতই অধিকতর হইতেছে। সন্ধ্যার সময় দেখিলাম, আমি খাঁটি অবিশ্বাসী। পিতার কৃপায় বিশ্বাস পাইলাম।

৪ঠা। অদ্য অবস্থা ভাল। প্রার্থনা করিতে পারিতেছি। পিতা কৃপা করিয়া "করুণাময়ী মহাশক্তি" এই নাম সাধন করিতে দিয়াছেন। তাহাতে সকল মেঘ দূর হইয়াছে। আজও অবিশ্বাস একবার দেখা দিয়াছিল; কিন্তু পিতার মহাশক্তিতে কুকুরের ন্যায় পলায়ন করিয়াছে। সর্দ্দী হইয়া জ্বরবোধ হইতেছে। পিতার ইচ্ছাতে ইহা হইতেও মুক্তি পাইব। রাত্রিতে জ্বর অধিক বলিয়া বোধ হইয়াছিল; কিন্তু পিতার আমার প্রতি কি আশ্চর্য্য কৃপা!

৫ই। আজ প্রাতঃকালে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। জ্বর আর নাই, আহার রীতিমত প্রত্যহই চলিতেছে। পিতা যাহা দেন তাহাই খাই এবং তাহাতেই সুস্থ থাকি। আহার গুরুতর হইয়াছিল বলিয়া আবার বিকালে জ্বর আসিল।

৬ই। সমস্ত দিন জ্বর থাকিল। এই দিন উপবাস দিলাম।

৭ই। এই দিন প্রাতঃকালে জ্বরত্যাগ হইয়া শরীর সুস্থ হইল। আজও উপবাস দিলাম। রাত্রিতে কিছুমাত্র ঘুম হইল না।

৮ই। কম্প দিয়া জ্বর আসিল। জ্বর থাকিতে থাকিতেই ডাল ভাত আহার করিলাম। খাওয়ার পরেই জ্বর ছাড়িল।

৯ই। সমস্ত দিন সুস্থ থাকিলাম; কিন্তু রাত্রিতে ঘুম আসা বড় কঠিন হইল।

১০ই। জ্বর আসিল। বিকালে কিছু আহার করিলাম।

১১ই। ভাল রহিলাম। বিকালে কিছু আহার করিলাম।

১২ই। জ্বর হইল। অদ্য কুঞ্জলালকে পত্র লিখিলাম।

১৩ই। এখনও ভাল। শরীর খুব স্বচ্ছন্দ। পীড়াতে কখন পিতার এরূপ কৃপা অনুভব করি নাই। পিতা আমার মঙ্গলই করিতেছেন। ইহার মধ্যে পিতার মঙ্গল ভাবই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

১৪ই। জয় দয়াময়। জয় দয়াময়! জয় প্রেমময়! পিতঃ! পাপীর প্রতি তোমার অপার করুণা। এরূপ পাপীকেও কি পিতা, এরূপ ভালবাসিতে হয়? দেখ পিতা! তুমি এই বন্ধুবান্ধব-বিহীন স্থানে রোগ-শয্যায় আমাকে যেরূপ করিয়া পালন করিয়াছ, যেরূপ ভালবাসিয়াছ, তাহা তুমি জান আর আমি জানি। হায় পিতা! আমি যদি

বিশ্বাসী হইতে পারিতাম তবে না গলিয়া থাকিতে পারিতাম না। পিতা! তুমি স্থায়বান, পরম দয়ালু। তোমার উপর যখন আমার সমস্ত জীবনের ভার, তখন আর আমার মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবে না। তুমি আজ যেমন আমার শরীর সুস্থ করিয়া আমাকে অপার আনন্দ দান করিতেছ, পিতা, সেই প্রকার আমার মনকে ভাল করিয়া আমার হৃদয়ে তুমি নিত্য বিরাজ কর। তোমার পদে আমার কোটী কোটী প্রণাম। তুমি আমাকে গ্রহণ কর।

১৫ই। পরম দয়ালু পরম মঙ্গলময় পিতার কৃপায় আজ কয়দিন সুস্থ শরীরে অতিবাহিত করিলাম। অদ্য সুস্থসংবাদ দিয়া কুঞ্জলালকে পত্র লিখিলাম।

১৬ই। পিতা! এস্থান আর আমার ভাল লাগিতেছে না। আমাকে একটা নির্জ্জন স্থান ঠিক করিয়া দাও। পিতা! তুমি তো আমার অবস্থা সমস্তই জান; তবে কেন, প্রভু, আমাকে এইরূপ গোলমালের মধ্যে রাখিলে? আমি তোমাকে চাই—অন্য কিছু চাই না। আমাকে এরূপ স্থান দাও, যেখানে বসিয়া নিরাপদে তোমাকে ডাকিতে পারিব। পিতা! তুমি আমার সঙ্গে কথা বল। আমি যে আর এরূপ করিয়া দিন কাটাইতে পারি না। আমাকে দয়া কর। দোহাই পিতা! তোমার নামে যেন আমা-দ্বারা কলঙ্ক পড়ে না।

১৭ই। পরম কারুণিক, পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় আর একদিন অতিবাহিত হইতে চলিল। তাঁহার অপার কৃপা সম্ভোগ করিতেছি।

১৮ই। অদ্যকার দিনও পিতার কৃপায় অতিবাহিত হইতে চলিল। কেবলই পিতার কৃপা সম্ভোগ করিতেছি, তবুও পিতাকে তেমন করিয়া ধরিতে পারিতেছি না—যে প্রকার ধরিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

১৯শে। প্রাণের পিতার কৃপায় তাঁহার অপার কৃপা অনুভব করিতেছি। এখনও আমার পাপ আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। পিতা আমাকে অবশ্য ভাল করিয়া দিবেন। রাত্রি ভাল ভাবে যায় নাই।

২০শে। অদ্য প্রাতঃকাল হইতে পিতার অপার করুণা অনুভব করিতেছি।

২১শে। আজ আমার জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা জর্জ্জ মূলারের জীবনের চেয়ে কম নয়। যে দুইটী ভ্রাতা আমাকে উপর হইতে এতদিন খাদ্য যোগাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন কাল সন্ধ্যার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি গুরু গ্রহণ করিয়াছেন?" আমি বলিলাম—"না। ঈশ্বরকে ডাকিয়া যদি তাঁহাকে না পাই, তবে গুরুতে আমার কি করিবে?" তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—"রামকৃষ্ণ কে ছিলেন?" আমি বলিলাম—"মানুষ।" ইহাতে তাহারা ভয়ানক চটিয়া আমাকে 'নাস্তিক' নামে অভিহিত করিল এবং মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতীর শিষ্য মনে করিল। আরও অনেক কথা হইয়াছিল;—তাহাতে তাহারা চটিয়াছিল। একজন অদ্য প্রাতঃকালেই গ্রামান্তরে তাহার বাটীতে প্রস্থান করিয়াছে, অন্যটী খাবার সময় আমার খাদ্যদ্রব্য আনিতে অস্বীকার করিয়া, আমাকে উপরে যাইতে বলিয়া গেল। আমি যথাসময়ে উপরে গেলাম, কিন্তু আমাকে খাবার জন্য ডাকিল না। পিতা ঘরে বসাইয়াই আমাকে খাদ্য দিবেন এই আজ্ঞা অবহেলা করিয়া উপরে আসিয়াছি বলিয়া এইরূপ ঘটিল মনে করিয়া

নামিয়া আসিলাম। আজ প্রাতঃকাল হইতেই পিতা আমাকে অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আসিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। খানিক পরে সেই লোকটী আসিয়া "আমার জ্বর হইয়াছে" বলিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু পিতা কি পুত্রকে ভুলিয়া থাকিতে পারেন? খানিকপরেই উপর হইতে আর একব্যক্তি আমার খাদ্য লইয়া উপস্থিত! ধন্য পিতা! আর কি লিখিব!

২২শে। আজ কুঞ্জলালের পত্র পাইলাম। পত্র পড়িয়া চক্ষে জল আসিল। কুঞ্জলালের পত্রের উত্তর দিলাম। এই সকল গোলযোগে পিতার কৃপা সম্ভোগ করিতে অনেক ব্যাঘাত হইয়াছিল।

২৩শে। অবস্থা মোটের উপর ভাল।

২৪শে। অবস্থা ভাল নয়।

২৫শে। আজকার অবস্থা ভাল।

২৬শে। দিন একপ্রকার ভালয় ভালয় গিয়াছিল। রাত্রি অতিকষ্টে অতিবাহিত হইল।

২৭শে। প্রার্থনা হইতেছে। শারীরিক অবস্থা ভাল বোধ হইতেছে।

২৮শে। আজ পিতার কৃপায় ভালই যাইতেছে। একটা নির্জ্জন স্থানাভাবে বড় কষ্ট হইতেছে। সিদ্ধিবাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের এখনও দশদিন বাকী আছে। আজ প্রায় কুড়ি পঁচিশ জন লোক মিঠাই প্রস্তুত এবং অন্যান্য কার্য্য করিবার জন্য এলাহাবাদ হইতে আসিল। আমাদের গৃহ আজও স্থির। গোলমাল হইলে চিত্রকূটে চলিয়া যাইব, ইচ্ছা করিতেছি।

২৯শে। দিন একপ্রকার ভাল ভাবেই যাইতেছে। আজও আমাদের গৃহে গোলযোগ নাই। দেখি পিতা কি করেন।

৩০শে। দিন পিতার অপার কৃপায় অতিবাহিত হইয়াছে। পিতার চরণে কোটী কোটী প্রণাম।

অক্টোবর।

১লা। বর্ত্তমান মাসে তোমাকে কোটী কোটী প্রণাম করি। তোমা ভিন্ন আমার আর অন্য গতি নাই। তোমাকে একেবারে প্রাণ দিতে পারিতেছি বলিয়া আমার আনন্দ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। তুমি আমাকে শীঘ্রই মুক্ত করিবে, তাহাতে আর এক বিন্দুও সন্দেহ নাই। পিতা, এই মাসে আমাকে আরও উন্নত কর।

২রা। প্রাতঃকাল নীরসভাবে এবং বিকালবেলা অতি সরলভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল।

৩রা। ঐ।

৪ঠা। প্রায় ঐরূপ।

৫ই। অবস্থা ভাল না।

৬ই। পিতার কৃপায় অবস্থা অতি সুন্দর। কাল চিত্রকূট যাইব। শুনিলাম, ফটকশিলা শুষ্ক হইয়াছে।

৭ই। মহন্ত মহাশয় আমাকে যাইতে দিলেন না। আর দুই দিন পরে তাঁহার গুরুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ। আজও আমাদের গৃহ স্থির। পিতার কৃপা যথেষ্ট সম্ভোগ করিতেছি। পিতা আমাকে দিন দিন উন্নত করিতেছেন। পিতার কৃপা আসিলে কোন গোলমাল কিছু করিতে পারে না।

৮ই। অবস্থা মন্দ নয়।

৯ই। নীলকান্তের পত্র পাইলাম। অবস্থা পিতা ভালই রাখিয়াছেন।

১০ই। অদ্য প্রাতে উঠিয়াই স্থান পরিত্যাগ করিবার যোগাড় করিলাম। প্রায় একটার সময় চিত্রকূট পৌঁছিয়া উদাসীন

বাবাজিদের ওখানে বিশ্রাম করিলাম। পরে সন্ধ্যার সময়, জানকীকুণ্ডে পৌঁছিয়া এক গুহা পাইলাম। গুহা অতি সুন্দর। ইহাই আমার সাধনের স্থান নিশ্চয় করিলাম।

১১ই। অদ্য দিন ভাল যাইতেছে না। অদ্য প্রাতঃকালে উঠিয়াই গুহা পরিস্কারে নিযুক্ত হইলাম। প্রায় বারোটার সময় গুহা সংস্কার শেষ হইল।

১২ই। অদ্য দিন ভাল যাইতেছে না। অদ্য কুঞ্জ ও নীলকান্তের পত্রের উত্তর দিলাম। রাত্রি আরও ভয়ঙ্কর।

১৩ই। অবস্থা ভাল না। রাত্রি ভাল।

১৪ই। অদ্য পিতার অপার কৃপায় সমস্ত দিন তাঁহাকে ডাকিতে পারিতেছি। বিকালে একটি সাধুর নিকট গিয়াছিলাম। ধর্ম্মকথা হইতে হইতে এত ভাব হইল, যে তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং কাঁদিতে লাগিলেন। এই সাধু অযোধ্যা হইতে আসিয়াছেন এবং ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ব রাখেন।

১৫ই। অদ্যও পিতার কৃপা সম্ভোগ করিতেছি।

১৬ই। পিতার অপার করুণা বর্ষিত হইয়াছে। পিতার কৃপা ভিন্ন মুক্তির অন্য দ্বার নাই।

১৭ই। অদ্যও ভাল। ক্রমেই ভাল বোধ হইতেছে।

১৮ই। অদ্য জ্বর হইয়াছিল। অবস্থা খুব ভাল ছিল না।

১৯এ। অবস্থা পিতার কৃপায় ভাল।

২০এ। ক্রমেই ভাল।

২১এ। ঐ। রাত্রি বড় ক্লেশে গিয়াছে।

২২এ। পিতার দয়া বড় বর্ষিত হইতেছে।

২৩এ। পিতার কৃপায় ক্রমেই ভাল।

২৪এ। অতি সুন্দর ভাবে দিন যাইতেছে।

২৫এ। পিতার কৃপা অপার। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হইয়াও কীটস্য কীটের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। মানব যদি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার আর অন্ন, বস্ত্র এবং মুক্তির জন্য কোন চিন্তা থাকে না; মঙ্গলময় নিজ হস্তে তাহার সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। তিনি এই অবিশ্বাসীর সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

২৬এ। আমি যেস্থানে এখন জপ করিতেছি, সেস্থানের কিছু বর্ণনা থাকা প্রয়োজন। স্থানটি স্বর্গ তুল্য। ভারতে এরূপ স্থানের অস্তিত্ব খুব কম আছে; এই এই জন্যই পূর্ব্বতন ঋষিগণ এস্থানে আশ্রম প্রস্তুত করিয়া প্রকৃতির জীবন্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে বসিয়া সংসারের অতীত হইয়া ভগবানে চিত্ত সমাধান করিতেন। তাঁহার যে সকল গুহায় বসিয়া তপস্যা করিতেন, এখনও তাহার দুই একটী বিদ্যমান আছে। এখন পিতা আমাকে যে স্থানে স্থাপন করিয়াছেন, তাহার নাম 'জানকীকুণ্ড'। সমস্ত চিত্রকূটই রাম এবং সীতার লীলাভূমি। তাঁহারা এ স্থানে ঋষিদের আশ্রমে ছিলেন; বনে বনে মৃগয়া করিতেন, আমোদ প্রমোদ করিতেন, সে সমস্ত স্থান এখন পবিত্র ভাবে রক্ষিত হইতেছে। এস্থানে নদীর গঠন অতি সুন্দর। অতি অল্প-বিস্তৃত দুইধার হইতে যেন শ্বেত প্রস্তর দ্বারা বাঁধানো দুই Projecting অংশ আসিয়া প্রায় মিলিত হইয়াছে। বোধহয় ঐ দুই অংশ সময়ে কঠিন মাটি ছিল এখন শ্বেত প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। দুই দিকে প্রশস্ত নদী, মধ্যস্থান অপ্রশস্ত প্রণা-

নীর ন্যায়; কাজেই নদীর বেগ এখানে অধিক এবং সর্ব্বদাই কল কল শব্দে স্বচ্ছ জল প্রবাহিত হইতেছে। এত অপ্রশস্ত যে এখন অনায়াসে লাফাইয়া এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে যাওয়া যায়। ঐ প্রস্তরে, আমাদের পার্শ্বে (অর্থাৎ চিত্রকূট যে ধারে স্থাপিত সেই পার্শ্বে) কতকগুলি মানুষের পদচিহ্ন আছে। এখানে প্রবাদ যে সে গুলি জানকীর পদচিহ্ন সুতরাং-ই তীর্থ স্থান। সেখানে কতলোক আসিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করে এবং গড়াগড়ি দেয়। এইস্থান সাধকদের জন্য বিখ্যাত। এ স্থানে অনেকগুলি সাধক আছেন; ইঁহারা সকলেই রামভক্ত বৈষ্ণব। ইঁহারা আমাদের দেশের বৈষ্ণবের ন্যায় নিরক্ষর নহেন। সকলেরই সংস্কৃতে এক প্রকার প্রবেশ অধিকার আছে। ভিক্ষা আর সাধনই ইঁহাদের কার্য্য। এক একজন দূরদেশ হইতে আসিয়া এক এক গহ্বরে পড়িয়া রহিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে জাতিভেদগত কুসংস্কার অতি অল্পই আছে। আমাকে ব্রাহ্ম-সমাজের লোক জানিয়াও তাঁহারা ঘৃণা করেন না; একসঙ্গে বসিয়া খান, দণ্ডবৎ করেন। একজন বলিলেন—"আমার আবার জাত কি?" যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ে এরূপ দেব-সঙ্গ লাভ করা খুব অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। এই সকল সাধক নদীর তীরে স্বহস্ত-খোদিত অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী সাধক দ্বারা খোদিত গহ্বরে বাস করেন। গহ্বরগুলি মাটির নীচে। সকল গুলিরই খোলার দ্বারা ছাওয়া বারান্দা আছে। একটী পাকা কোঠাও আছে। দুইটী ঘর কেবল মাত্র খোলার ছাউনি, গহ্বর নাই। পিতা আমাকে যে গৃহটি দিয়াছেন, সেইটিই সকলের চেয়ে সুন্দর স্থানে স্থাপিত। আমার গৃহটির মাটির নীচে, তিনটি প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠ তিনটি অল্প-বিস্তৃত। প্রথমটিতে আলো আছে, দ্বিতীয়টি অর্দ্ধ আলো বিশিষ্ট, তৃতীয়টি প্রায়ই অন্ধকার। শীত ভিন্ন ইহার মধ্যে থাকা যায় না। শীতকালে বোধহয় কাপড় না হইলেও চলে। খোলা দ্বারা ছাওয়া একটী বারান্দা আছে; বারন্দাটির মধ্যে গলি, যেমন আমাদের দেশের দরজা ঘর। তাহার একপার্শ্বে উনুন এবং খা'বার স্থান; অন্য পার্শ্বে আমি দিনেরবেলায় পিতাকে ডাকি। নানাপ্রকার বৃক্ষে গহ্বরটী পরিবেষ্টিত, তাহার মধ্যে আমার প্রিয় নিমগাছই অধিক। প্রাঙ্গনটী আমি প্রস্তরদ্বারা অতি সুন্দর করিয়া লইয়াছি। পিতাই আমার সহিত কার্য্য করিয়া সুন্দর করিয়াছেন। নানাপ্রকার সুন্দর পাখী আসিয়া আমাকে আনন্দিত করে। ময়ূরগণ স্বচ্ছন্দে নদীর মধ্যে বিচরণ করে; কারণ এখানে তাহাদিগকে হিংসা করিবার কেহ নাই। নদীর মধ্যে মৎস্যের ক্রীড়া বড় সুন্দর। জানকী-কুণ্ডের মধ্যে অনেকগুলি মাছ আছে। স্বচ্ছজলে তাহাদের ক্রীড়া দেখা যে কি সুন্দর, তাহা না দেখিলে জানা যায় না; আর বাঙ্গালাদেশের লোকের তাহা বুঝিবারও ক্ষমতা নাই। এখানে সকল স্থানেই মাছ মানুষকে দেখিয়া ভয় পায় না। আমার আশ্রমের নীচেও কয়েকটী মাছ আছে। আমি তাহাদিগকে ছোলা খাইতে দিই। নদীর মধ্যে শ্বেত-প্রস্তরের বেদীর ন্যায় সুন্দর বেদী আছে। আমার অবস্থা আজ ভাল। কল্য আরও লিখিবার ইচ্ছা রহিল—এখন পিতার কৃপা।

২৭শে। অধিকাংশ সময় সাংসারিক ভাবে অতিবাহিত করিয়াছি বলিয়া দুঃখ পাইয়াছি; তথাপি পিতার অপার কৃপা

হইতে বঞ্চিত হই নাই। অন্য স্থানের বিবরণ লেখা হইল না।

২৮শে। আজ পিতা ভাবে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। মুক্তি দিবার জন্য পিতা সর্ব্বদা প্রস্তুত, কেবল নিজ দোষে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। এত দিনে পিতার কুটীর খানি বেশ পরিষ্কার হইল। স্থানের বর্ণনা—

পূর্ব্বদিকে, নদীর অপর পারে, কিছু দূরে, পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর-দক্ষিণ বিস্তৃত রহিয়াছে। উত্তরে একটী লম্বা পর্ব্বত, দক্ষিণে আর একটী ঐরূপ, মধ্য স্থানে নৈবেদ্যের ন্যায় একটী ছোট পাহাড়। এই সকল পাহাড় বৃক্ষ দ্বারা সুশোভিত। আমার গৃহখানির মুখ উত্তর দিকে—পূর্ব্বদিকে কিছু ফিরানো; সুতরাং সূর্য্য যখন পাহাড়ের অপর পার্শ্ব হইতে উদয় হয়, তখন তাহার সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। আমাদের পার্শ্বে ও পশ্চিম দিকে অনেকগুলি পাহাড় আছে; তন্মধ্যে কান্তানাথই সুন্দর। এই পর্ব্বতটীর সৌন্দর্য্য অপার। আমি একদিন ভাল করিয়া দেখিয়া লিখিব।

২৯শে। আজ কিছু নীরসতা অনুভব করিতেছি। অনেক দিনের পর অদ্য কেবল ভাত খাইয়াছি। দেশের খাদ্য খাইয়া বড় প্রীতি হইল।

৩০শে। আজও প্রাতঃকাল নীরবভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল। মধ্যাহ্নের উপাসনার সময়ে পিতার কৃপা অনুভব করিতে পারিলাম। বিকালে কান্তা-পর্ব্বত দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহাতে অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম হইয়াছিল এবং আসিতে আসিতে রাত্রি হইয়াছিল বলিয়া কিছু ঠাণ্ডা লাগাতে শরীর খারাপ হইয়াছিল। কান্তা পর্ব্বতের বিবরণ—

পিতার অনন্ত সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে ইহা একটী অপূর্ব্ব সৃষ্টি। পর্ব্বতটী পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ—প্রায় গোলাকার। ইহার পাদদেশ শত শত সুন্দর প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার সমস্তগুলিই দেবমূর্ত্তি দ্বারা পরিপূর্ণ। যে গুলিতে কোন প্রকার নির্ম্মিত মূর্ত্তি নাই, সে স্থানে একখানা প্রস্তর থাকিয়া তাহার কার্য্য সমাধা করিতেছে। এই মন্দিরগুলির পাদদেশ দিয়া আবার এক প্রস্তর নির্ম্মিত বলয়াকার রাস্তা পর্ব্বত বেষ্টন করিয়াছে। রাস্তাটী প্রস্তরদ্বারা উত্তমরূপে গঠিত। এই রাস্তার বাহিরে অন্যান্য লোকের আবাস স্থান; দুই এক স্থানে সীমা অতিক্রম করিয়া ভিতরেও গিয়াছে। মন্দিরগুলির উপরে, পর্ব্বতের একেবারে পাদদেশে পিতা বৃহদাকার প্রস্তর দ্বারা আর এক বেষ্টনী দিয়াছেন; তাহার উপর সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ। উপরের চেয়ে নীচের বৃক্ষগুলি কিছু বড় বলিয়া বোধ হইল। পর্ব্বতটী যে কি সুন্দর, তাহা না দেখিলে অনুভব করা কঠিন। হিন্দুগণ এই পর্ব্বতটী, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত এবং উড়িষ্যায় আর একটী কি পর্ব্বত—এই তিন পর্ব্বতকে ভগবানের খাস পর্ব্বত বলেন।

৩১শে। আত্মার অবস্থা ভাল ছিল, কিন্তু গত দিবসের অনিয়মে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে পুনরায় জ্বর হইয়াছিল। পিতার কৃপায়ই জ্বর ভাল হইবে।

নভেম্বর।

১লা। পিতা আজ বিশেষ করিয়া তাঁহাকে অনুভব করিতে দিতেছেন। শরীর মন সুস্থ।

২রা। পিতার কৃপা প্রচুর বর্ষিত হইয়াছে।

৩রা। পিতার কৃপায় আজ সুস্থ শরীরে

থাকিয়া কাল্‌কার চেয়ে অধিকতর কৃপা অনুভব করিতেছি। পিতা আমাকে রাজপুত্র করিয়া এস্থানে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি আমাকে যেস্থানে রাখিয়াছেন, তাহা সাধন ভজনের পক্ষে এই চিত্রকূটের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গৃহটী অতি পরিপাটী এবং নির্জ্জন ;—এমন নির্জ্জন যে আমার দুধওয়ালা ভিন্ন অন্য লোকের সহিত প্রায়ই দেখা হয় না। যদিও কদাচিৎ কোন ব্যক্তি আসেন, খুব অল্প সময় থাকিয়াই চলিয়া যান। কেবল অযোধ্যা হইতে আগত একটী সাধক-বন্ধু সময় সময় আসিয়া ধর্ম্মকথাতে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। এদিকে পিতার কৃপা প্রচুর বর্ষিত হইতেছে। যখনই তাঁহার চরণতলে বসিতেছি, তখনই কৃপা করিতেছেন। পিতার ইচ্ছা শীঘ্র শীঘ্র আমাকে নবজীবন দান করিয়া মুক্ত করিয়া দেন।

অন্যান্য সাধকদের দুই প্রহরের রৌদ্রের সময় ভিক্ষা করিতে হয়, তাহাতে তাঁহাদের অনেক সময় নষ্ট হয় এবং বড় ক্লেশ পাইতে হয়। পিতার অপার কৃপায় গৃহে বসিয়া আমি তাঁহার প্রেম-খাদ্য ভক্ষণ করি। এখানে কাঁচা দুধই বিক্রয় হয়; কিন্তু পিতার কৃপায় আমার দুধওয়ালা আমার দুধ গরম করিয়া দেন। মাসের মধ্যে পনের দিন ছোলা খাই, অবশিষ্ট পনের দিনের মধ্যে পাঁচ দিন ভাত, পাঁচ দিন রুটি, আর পাঁচ দিন ছাতু খাই, সুতরাং আমি রান্নার দায় হইতেও এক প্রকার মুক্ত। আর সে রান্নাও অতি অল্প সময়ের জন্য, কারণ কেবল ভাত এবং রুটি ভিন্ন ত আর কিছু রান্না করি না। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের কথা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যে জলে স্নান করি, তাহার ন্যায় নির্ম্মল জল আর কমই আছে। যদিও কৌপিন পরি, তাহা হইলেও বস্ত্রের অভাব অনুভব করি না; কারণ আমার কোট পরিলেই সমস্ত অভাব চলিয়া যায়। আর এখানে কৌপিন ধারণ লজ্জাকর নহে, কারণ আমার সহসাধকগণ সকলেই কৌপিনধারী। আমার গৃহের দ্বার বন্ধ করিলে, শীতের বাবারও সাধ্য নাই যে প্রবেশ করে; সুতরাং শীতকষ্টও আমার এপর্য্যন্ত হয় নাই। এই প্রকার পিতা আমাকে এখানে পরম সুখে রাখিয়াছেন। নিমন্ত্রণেরও অভাব নাই। আমি সমস্ত ভার তাঁহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছি। মধ্যে মধ্যে যদিও অবিশ্বাস আসে, শীঘ্রই পিতা তাহা হইতেও আমাকে মুক্ত করিবেন। কারণ—আমি তাঁহারই কৃপার উপর নির্ভর করিয়াছি। লোকে এমন গুরুকে ফেলিয়া মানুষকে অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়! এ গুরু যে কি করেন, তাহা আর কি লিখিব!—মহাপাপীকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে উদ্ধারের পথে লইয়া যান; অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করেন, অধিক কি, নিয়ত সঙ্গে থাকিয়া তাহার সমস্ত তত্ত্বাবধান করেন। অধিক কি লিখিব—পিতা যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন।

৪ঠা। লালসার বশবর্ত্তী হইয়া নীরস ভাবে দিন অতিবাহিত করিয়াছিলাম। রাত্রিতে পিতা চরণে স্থান দিয়াছিলেন।

৫ই। অদ্য প্রাতঃকালের উপাসনায় পিতার কৃপায় খুব প্রীতি অনুভব করিয়াছিলাম, তৎপর ছাতু দুধ ভক্ষণ করিয়া মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম—সেই কান্তা পর্ব্বতের পূর্ব্ব দিকে। আমার সঙ্গী আমার দুধওয়ালা বৈরাগী। ডাকঘরে যাইয়া মার পত্র পাইলাম। তাহার উত্তর কলম অভাবে অতি বিশ্রী ভাবে দিলাম। কুটীরে আসিয়া নিত্য

কর্ম্ম সমাধা করিতে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যার পর অবস্থা ভাল ছিল না।

৬ই। মোটের উপর অবস্থা মন্দ নয়। স্বর্ণ এবং মহেশকে পত্র লিখিলাম। আমার খাদ্য—

দয়াময়ের, মঙ্গলময়ের যে পাপীর সহিত কি লীলা খেলা, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। আমি যেদিন এখানে পৌঁছিয়াছিলাম, কেবল সেই দিন অনাহারে ছিলাম। ফটকশিলা দেখিয়া আমি যখন অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি, আর উপায়ান্তর নাই, কোথায় যাইব—কাহারও সহিত আলাপ নাই, তখন চিত্রকূটের দিকে আসিয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া, একটা ভাঙা ইঁদারার ধারে সমস্ত রাত্রি কাটাইলাম। কিন্তু যিনি কীটানুকীটেরও পর্য্যন্ত তত্ত্ব লন, তিনি কি তাঁহার পুত্রকে অনাহারে রাখিতে পারেন? এক ব্যক্তি খুব প্রাতে সেখানে উপস্থিত। সে আমারই জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। সে আসিয়াই আমার জন্য কিছু করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। অনেক কথাবার্ত্তার পর সে আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, আমাকে উদাসীন নানকপন্থী বাবাজীদের আশ্রমে লইয়া গেল। সেখানে যাওয়ার পর রুটি, ভাত, পরমান্ন প্রভৃতি পিতা আমাকে খাওয়াইলেন। এই প্রকার রুটি, লুচি, পরমান্ন প্রভৃতি খাইয়া চারিদিন সেখানে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। একেবারে সেখানে থাকিলে এক 'বাবু' হইয়া উঠিতাম; এই জন্য পিতা আমাকে অনুসূয়া দেবীর মন্দিরে লইয়া গেলেন। ২০শে আগষ্ট হইতে ১০ই অক্টোবর পর্য্যন্ত সেখানে কাটাইয়াছি। পীড়ার জন্য দুইদিন উপবাস ভিন্ন আর উপবাস দিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এখানে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা অতি বিচিত্র। প্রথম দিন যাইয়াই খাদ্য পাইলাম। দ্বিতীয় দিন আমার সেই নিভৃত স্থান হইতে আমি বড় বাহির হই নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সিদ্ধি বাবাজির এক চেলা আসিয়া, আমি উপরে দেখা করিতে অথবা খাইতে যাই নাই বলিয়া অনুযোগ করিতে লাগিল। তাহার পর দেখি, সন্ধ্যার সময় তিন খানা রুটি এবং দুধ আমার জন্য আসিয়া উপস্থিত। তাহার পর দিন বুঝি উপরে গিয়াছিলাম, কিন্তু বাঁদরের উৎপাতে এবং চাকরদের তাচ্ছিল্যে আর উপরে যাইব না ঠিক করিলাম। কিন্তু পিতা কি পুত্রকে উপবাসে রাখিতে পারেন? একব্যক্তি স্বতঃই প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে খাদ্য আনিয়া দিতে লাগিল। খাদ্য আনয়ন সহজ ব্যাপার নয়। একশত দেড়শত হাত উপর হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া এবং সেই ভয়ঙ্কর বাঁদরের উৎপাত সহ্য করিয়া কে কাহার জন্য খাদ্য আনিয়া থাকে? দুই তিন খানা রুটি আসিত, শেষে আমার অনুরোধে একখানা দেড়খানা আসিত। কোন দিন লুচি এবং অন্যান্য মিষ্টখাদ্যও জুটিত। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইতে হইতেই আর এক ব্যক্তি আসিল। সেও আসিয়া পিতার আজ্ঞায় আমার সেবায় নিযুক্ত হইল। জন্মাষ্টমীর দিন রাত্রি একটা কি দুইটার সময় আমার জন্য মোহনভোগ লইয়া আসিয়া উপস্থিত। পিতা এইরূপে আমার সেবায় নিযুক্ত আছেন। এই সময়ে আমার বোধ হইত, আমাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া মঙ্গলময় পিতা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রুটি কাপড়ে বাঁধিয়া এবং ঘটিতে জল লইয়া আনিয়াছেন। এইরূপে দিন যাইতেছে, এরূপ সময়ে পূর্ব্বে কোন স্থানে লিখিত এক ঘটনাতে তাহারা

আমাকে 'নাস্তিক' বলিয়া ঠাওরাইয়া আমাকে খাদ্য আনিয়া দিবে না ঠিক করিল। পরদিন বলিল—"আপনি উপরে যাইবেন।" খা'বার সময় উপরে গেলাম, কিন্তু কেহ কথা বলিল না। আমি চলিয়া আসিয়া শুইয়া রহিলাম। খানিক পরে যিনি আমার খাদ্য আনিতেন, তিনি "জ্বর হইয়াছে" বলিয়া শুইয়া কোঁ কোঁ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কোঁকানি দেখিয়া ভাণ বলিয়া বোধ হইল। অবশেষে, কি আশ্চর্য্য, যাহারা কোনদিন আমার খোঁজ লয় না (একদিন আমার খাবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল) এরূপ এক ব্যক্তি আমার খাদ্য দিয়া গেল। আমি দেখিয়া অবাক্ হইয়া খাইতে লাগিলাম। আর সেই ব্যক্তির জ্বর ঠিক এই সময় ছুটিল। তাহার পরদিনই পিতা কুঞ্জলালের দ্বারা উপযুক্ত সময় বুঝিয়া টাকা পাঠাইলেন। ঠিক এই সময় অন্য দুই ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত। তাহারা আমার সেবায় রত হইল। একদিন খাবার আসিল না দেখিয়া রাত্রিতে খিচুড়ি রাঁধিয়া আমাকে খাওয়াইল। এখানে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত উদাসীনবাবাদের ওখানে রুটি এবং খিচুড়ি খাইয়া আমার বর্ত্তমান বাসস্থানে আসিলাম। এখন পিতা খাদ্যের ব্যবস্থা নিম্নলিখিত প্রণালীতে করিয়াছেন—ইহাতে আমি হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতেছি—

১ম দিন	—	ভাত এবং দুধ
২য় "	—	ছোলা " "
৩য় "	—	রুটি " "
৪র্থ "	—	ছোলা " "
৫ম "	—	ছাতু " "
৬ষ্ঠ "	—	ছোলা " "

ইহাতে আমাকে মাসে কেবল দশদিন রান্না করিতে হইবে। অদ্য আবার জ্বর হইল। আধ্যাত্মিক অবস্থা মন্দ ছিল না।

আমার শয্যা।

প্রথমদিন বৃক্ষতলস্থ ভাঙ্গা ইঁদারার পার্শ্বে। তাহার পর কোট এবং ক্ষুদ্র আসনের উপর শরীরের উপরিভাগ রাখিয়া শয়ন করিয়াই যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। জ্বর হইবার পর হইতে কোট এবং আসনখানা বিছাইয়া শয়ন করিতাম। এখন কোট গায় দিই; সুতরাং আসন এবং তাহার উপরের কাপড় খানা প্রথমতঃ শুইবার সময় বিছাইয়া লই, কিন্তু তাহা থাকে না; প্রকৃতপক্ষে মাটীতেই শুইতে হয়। উপাধান একখণ্ড প্রস্তর।

চিত্রকূট।

চিত্রকূটের বসতি প্রায় এখান হইতে দেড় মাইল দূরে নদীর অপরপার্শ্বে স্থাপিত। নদীর উভয় ধার দিয়া উচ্চ প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির সকল শোভা পাইতেছে। স্থানটী দেখিলেই কেবল ধর্ম্মের জন্য প্রস্তুত বলিয়া বোধ হয়। গ্রামের মধ্যে দেয়ালনির্ম্মিত গৃহ খাপড়া দ্বারা ছাওয়া, উপরে কাঁটা। কাঁটা না দিলে বানরভায়ারা খাপড়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন। আমাদের এখানে বানর নাই, কিন্তু দুই একদিন এক এক পাল আগমন করেন। তাঁহারা স্থায়ীরূপে থাকেন না, কিন্তু যেটুকু থাকেন, তাহাতেই অস্থির করিয়া তোলেন। গ্রামের মধ্যে সামান্য রকমের বাজার আছে; মিঠাই, চাল, ডাল প্রভৃতি পাওয়া যায়। নদীর পরপারেও এইরূপ আর একটী বাজার আছে, আর কান্তা-পর্ব্বতের নিকটও অন্য একটী আছে। এই সকল স্থান হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয়। গ্রামের মধ্যে সীতাপুর নামক স্থানে ডাকঘর আছে। কান্তানাথ পর্ব্বতের নিকটও এক

ডাকঘর আছে। অধিবাসীদের মধ্যে অনেক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী আছেন।

আমার সুখ।

যখন পিতার অপার করুণায় নিষ্পাপ থাকি, তখন সকলই আমাকে অপার সুখ দেয়। গৃহের দিকে তাকাইলে গৃহ তাঁহাতে পরিপূর্ণ দেখি; বৃক্ষ, পর্ব্বত, বন, আকাশ সকলই মঙ্গলময় দেবতায় পরিপূর্ণ দেখিতে পাই। তখন আনন্দময় পিতার পুত্র হইয়া, আনন্দে তাঁহার সহিত নৃত্য করিতে থাকি। আমার সে সময়ের আনন্দ লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। পিতার অপার কৃপায় আমি দিন দিন উন্নতি-লাভ করিতেছি। পিতা আমার অবিশ্বাস দূর করিতেছেন, আমার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার করিতেছেন, আমার রিপুদিগকে দমন করিতেছেন। যখন পিতার প্রেমান্ন ভক্ষণ করি, প্রেমদুগ্ধ পান করি, তখন যে কি সুখ অনুভব করি—বলিতে পারি না। যখন মঙ্গলময়ের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া রাত্রিতে ঘুমাই, তখন আর আমার কোন চিন্তা থাকে না। পীড়িত অবস্থাতে মঙ্গলময় আমাকে কোলে কোলে করিয়া রাখেন, সুতরাং আমার আর অসুখের সম্ভাবনা কি? বাসনা, লালসা প্রভৃতির দিকে মন গেলে যখন পিতাকে দেখিতে পাই না, তখন যে যন্ত্রণা অনুভব করি, তাহা অবর্ণনীয়। পাপ দুঃখের মূল। লোকে নিষ্পাপ থাকিলে, এই পৃথিবীতেই স্বর্গভোগ করিতে পারে; কিন্তু নিষ্পাপ থাকা নিজের আয়ত্ত নয়। সম্পূর্ণ ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর না করিলে নিষ্পাপ হওয়া যায় না। যে নিজের বলে নিষ্পাপ হইতে চেষ্টা করিবে, সে আরও পাপে পড়িবে।

আমার গৃহের সম্মুখে বাবলা গাছের ন্যায় একটা কচি কচি পত্র বিশিষ্ট বৃক্ষ আছে। বৃক্ষটী একেবারে সম্মুখে। বৃক্ষটীর পত্রে পত্রে ব্রহ্মনাম লিখা। এই বৃক্ষে কত রকম ছোট ছোট পাখী আসিয়া আমার চিত্তরঞ্জন করে, বলিতে পারি না। ইহাদের মধ্যে দুইটী পাখী অতি সুন্দর। তাহারা দেখিতেও সুন্দর, স্বরও মিষ্ট। ইহাদের মধ্যে একটী পাখী আমাকে দেখিয়া ভয় করেনা, অতি নিকটে আসে। তাহাকে দেখিলে আমার বড় আনন্দ হয়; পূর্ব্বকালের ঋষিদের আশ্রমের কথা মনে হয়। ইহারা এবং আর দুইটী অতি ক্ষুদ্র পাখী নিয়ত বৃক্ষে বাস করিয়া আমাকে আনন্দ দান করিতেছে। আমার চিত্ত বিনোদনার্থে পিতা এই সুন্দর গায়ক এবং নর্ত্তককে নিযুক্ত করিয়াছেন। যখন কোন স্থান হইতে শ্রান্ত হইয়া আসিয়া গৃহের সম্মুখস্থ প্রস্তরে বসি, তখন ইহারা আমার হৃদয়ে পিতার অপার প্রেম ঢালিতে থাকে। ময়ূরগণ সর্ব্বদাই চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। নদীতে মৎস্যগণও আমাকে অপার সুখ দেয়।

৯ই। পিতার কৃপায় অবস্থা ভাল। এ পর্য্যন্ত শরীরও ভাল আছে। বোধ হয়, ভালই থাকিবে।

ফটকশিলা।

আমি যেখানে বাস করি, সেখান হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে নদীর মধ্যে দুই খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর রহিয়াছে; তাহারই নাম ফটকশিলা। প্রবাদ, এখানে রামচন্দ্র নিজ হস্তে সীতাকে সাজাইয়াছিলেন। উপরে একটা ভগ্ন গুহা আছে; কোন যোগী সেখানে যোগাভ্যাস করিতেন। পর্ব্বতের উপরে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত বাড়ী আছে। বাড়ীটীর ভগ্নদশা।

বিকালে পিতার কৃপায় জ্বর হইয়াছিল। আমার এই সমস্ত লইয়া আমি পরমসুখে পিতার ক্রোড়ে বাস করিতেছি। যদি জীবন পাইয়া এই স্থান হইতে যাইতে পারি, তবে জগৎকে শুনাইব, পিতার কৃপা কেমন।”

এই সময় প্যারীলালের তপস্যার প্রথমাবস্থা; এই তাঁহার তপস্যার আরম্ভ। ক্রমে ধর্মজীবনের গভীরতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পত্রাদি লেখা বন্ধ করিলেন; অনুক্ষণ ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দ রসপানে বিভোর থাকিতেন।

দুই বৎসর চিত্রকূটে তপস্যার পর প্যারী লাল ওঁকার নাথ পর্ব্বতে গমন করেন। চিত্রকূটে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল থাকিত না; প্রায়ই জ্বর হইত। তিনি শুনিলেন, মধ্যভারতে নর্ম্মদা তীরে ওঁকারনাথ সাধুভক্তের তপঃক্ষেত্র। তিনি ওঁকারনাথে যাত্রা করিলেন।

ওঁকারনাথ পর্ব্বত ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত। নর্ম্মদা এই স্থানে আসিয়া দ্বিধা হইয়া পর্ব্বতের দুই প্রান্ত দিয়া বক্রগতিতে বহিয়া পর্ব্বত শেষে আসিয়া আবার মিলিত হইয়াছে। নদীর এই বক্র গতিতে পর্ব্বতের আকার “ওঁ”এর ন্যায় হইয়াছে। নর্ম্মদা যেন রজত রেখায় পর্ব্বত গাত্রে “ওঁ” লিখিয়াছেন। নদীর উপরেই পর্ব্বত গাত্রে সাধকদের গুহা বা গুফা।

পর্ব্বতের পাদদেশে সহর। সহরে ওঁকার নাথ শিবের মন্দির; একটী বাজার আছে। এই স্থানে ইন্দোর-রাজের অধীন এক ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্রীয় নরপতি বাস করেন।

প্যারীলাল চিত্রকূট হইতে আসিয়া সন্ধ্যা কালে নর্ম্মদা পার হইয়া এই সহরের এক মিঠাই-বিক্রেতার দোকানে বিশ্রাম করেন; পরে পর্ব্বতে উঠিয়া গুহা-বাস করিতে আরম্ভ করেন। এখন হইতে তিনি স্নানাহার, নিদ্রা এক প্রকার ত্যাগ করিলেন, মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। এই সময়েই তাঁহার নাম “মৌনীবাবা” হইল।

ঘটনাক্রমে, মিঠাই-বিক্রেতার দোকানে মৌনীবাবার পদার্পণের পর হইতে, তাহার ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল। মৌনীবাবার আশীর্ব্বাদে এইরূপ হইয়াছে মনে করিয়া, সে সস্ত্রীক, তাঁহার আশ্রমে আসিয়া তাঁহার সেবা করিবার অধিকার ভিক্ষা করিল। মহাত্যাগী বৈরাগী মৌনীবাবার কাহারও সেবা গ্রহণের আবশ্যকতা কি? তিনি তাহাদের ব্যাকুলতাতে প্রতিদিন বিকাল বেলায় একপোয়া দুধ ও বেলপাতার রস গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহাই তাঁহার তখনকার দৈনিক আহার।

মিঠাই-বিক্রেতা কোন কোন দিন আধ সের, তিন পোয়া দুধ জ্বাল দিয়া একপোয়া করিয়া আনিত, মৌনীবাবা বুঝিতে পারিয়া, ইহাতে তাঁহার তপঃবিঘ্ন হয় বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। তিনি সেবা গ্রহণ করেন না বলিয়া মিঠাই-বিক্রেতা ও তাহার পত্নী বড় ক্ষুব্ধ হইত। অবশেষে তাহারা তাঁহাকে ভাল করিয়া একটী গুফা নির্ম্মাণ করিয়া দিবার অনুমতি চাহিল; মৌনীবাবা সম্মত হইলেন।

কিছুদিনের মধ্যে সিদ্ধপুরুষ রূপে মৌনীবাবার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি বিকাল বেলায় একবার মাত্র গুহার বাহির হইয়া নর্ম্মদায় আসিতেন। সেই সময় দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার পদধূলি লইবার জন্য, গুহাদ্বারে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। একাদশীতে সমস্ত

দিন উপবাসের পর, কত লোক তাঁহার পদ-ধুলি মস্তকে লইয়া জলগ্রহণ করিবার আশায় দ্বারে পড়িয়া থাকিত। এক একদিন মৌনী-বাবা গুহা-দ্বার খুলিয়াই জনতা দেখিয়া পুন-রায় দ্বার বন্ধ করিতেন। ইন্দোরের মহা-রাজা হোলকার একদিন নর্ম্মদাস্নান করিতে আসিয়া মৌনীবাবাকে দেখিতে আসেন। মৌনীবাবা দ্বার খুলিতেই তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিলেন; একব্যক্তি হোলকারের পরিচয় জানাইলেন। শুনিয়াই মৌনীবাবা গুহাপ্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন;—হোল-কার দ্বাররোধ করিলেন। তিনি বলিলেন—"বাবা, আমাকে উপদেশ দিন।" মৌনী-বাবা ঊর্দ্ধে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন—"ঈশ্বরই মুক্তিদাতা," এবং আপ-নাকে দেখাইয়া ইঙ্গিত করিলেন—"আমি কিছুই নই।" হোলকার কর্ত্তৃক তাঁহার চরণে অর্পিত সহস্র মুদ্রা চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে ইঙ্গিত করিয়া মৌনীবাবা দ্বাররোধ করিলেন। ইহার পর তিনি দেবনাগর অক্ষরে গুহা-দ্বারে লিখিয়া রাখিলেন—

"নাহং ব্রাহ্মণর্ন্ন চ সাধুঃ।"

এই সময়ে এক ব্রাহ্ম পরিব্রাজক (পর-লোকগত কুঞ্জবিহারী সেন মহাশয়) খাণ্ডো-য়াতে আসিয়া এক বাঙ্গালী সাধু পুরুষের যশোবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে ওঁকারনাথে আগমন করেন। আসিয়া দেখিলেন, তাঁহাদেরই বন্ধু সাধু প্যারীলাল। প্যারীলাল তখন মৌনী, কথা কহেন না। বন্ধু যাহা প্রশ্ন করিতেন, তাহার উত্তর তিনি প্রস্তর খণ্ডে লিখিয়া দিতেন; বন্ধু তাহা আপন দৈনন্দিন লিপিপুস্তকে উঠাইয়া লই-তেন। আমরা নিম্নে তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কাহারও নিকট কোনদিন কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই; কেবল ভগবানের নিকট কাঁদি-য়াছি। তিনি বাধ্য করিয়া আসন, প্রাণায়াম, মনঃসংযম করিয়া দিয়াছেন। অল্প কয়েক দিন হইল দেখিতেছি, আর নিদ্রার প্রয়োজন নাই; কারণ নিদ্রা গেলেই এরূপ একপ্রকার অনুভূতি হয়, যাহাতে যোগের নাশ হয়। কি বলিব—তাহা বলিয়া প্রকাশ করিবার নয়। এক কথায় ভগবান জাগ্রত জীবন্ত। যে তাঁহার শিশু সন্তান হইতে পারে, তাহার অন্তর বাহিরে কোন অভাব থাকে না। প্রথম পিতা আমার অহঙ্কারের বিনাশ করি-য়াছেন। কি বলিব—এই অহঙ্কারের বিনাশ জন্য কি যাতনা না আমি পাইয়াছি। এরূপ দিন গিয়াছে, এই স্থানে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করি-য়াছি। ভগবানের নাম লইতে গেলে, অশ্লীল ভাষা আমার মুখ দিয়া বাহির হইত। আমি যতই চেষ্টা করিতে যাইতাম, ততই আরও খারাপ হইতাম। এক কথায়, আমি একেবারে বিকলাঙ্গ হইয়া গিয়াছিলাম। সমস্ত কেরদানি ছাড়িয়া দিয়া যতই পিতার চরণে আত্ম সমর্পণ করিতে পিতা দিতেছেন, ততই দিন দিন যেন পিতা আমাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর রাজ্যে উঠাইয়া লইতেছেন। কিন্তু শিশু হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। তাঁহার অপার কৃপা ভিন্ন এই প্রকার হয় না; কারণ এক দিন আমি ভগবানের চরণে পড়িয়া কাঁদিতেও পারি নাই;—কাঁদিতে গিয়াছি, কে যেন হৃদয়ের মধ্য হইতে বিকট হাসি হাসিয়াছে। প্রার্থনা করিতে গিয়াছি, মুখ দিয়া অশ্লীল কথা বাহির হইয়াছে। এ সকল বলিবার এখন সময় নাই। জাগ্রত জীবন্ত পিতার কথা—যদি কখনও আদেশ গ্রহণ করিতে পারি—প্রতি দ্বারে বলিব। এখন

দয়াময়ের কৃপায় আমি আর ইহলোকবাসী নই,—পরলোকবাসী। আমি পিতার চরণে ডুবিয়া রহিয়াছি। শাস্ত্র মিথ্যা নয়। আমি পিতার চরণ হইতে স্বতঃই যাহা পাইতেছি, শাস্ত্রের সহিত তাহা মিলিয়া যাইতেছে। গীতা, পাতঞ্জল দর্শন, বাইবেল পড়, অতি পবিত্র সত্য সকল লিখিত রহিয়াছে। গীতার ন্যায় রত্ন পৃথিবীতে আর নাই। মানব জীবন ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি এই রত্নে বঞ্চিত, তাহার ন্যায় দুর্ভাগ্য আর নাই। গুরু গ্রহণ না করিয়া যে এই পথে যায়, তাহাকে বড়ই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। বাহ্য জগতের ন্যায় ইহার নিয়ম আছে; সদ্‌গুরু তাহাই প্রদর্শন করেন। যদি ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় কাঁদিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর কোন অভাব হয় না। যে মন, চিত্ত এবং বুদ্ধিকে তোমরা জ্ঞান বলিয়া থাক, তাহা জ্ঞান নয়। জ্ঞান আত্মার স্বাভাবিক সম্পত্তি। এই তিনের বিনাশ আছে,—জ্ঞানের কখন কোন অবস্থায় বিনাশ নাই। এই তিন জড়ীয় গুণ। জ্ঞান ভগবানের অপার কৃপায় উৎপন্ন হয়। এই সকল তোমাদের জানাইতে গেলে, একখানি পুস্তক লিখার প্রয়োজন। আমার সময় এখন বড় মূল্যবান, তাই বলিতেছি, ভাই, ক্ষমা করিও। সময় নষ্ট এক মুহূর্ত্ত করিও না। যদি সে ধনে পাইতে চাও, তবে অবিচ্ছেদে তাঁহাকে ডাক। আমি বলিতেছি, নিশ্চয় তিনি দেখা দিবেন। কেবল মাত্র সত্য লাভ করিতে গিয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। এ সমস্ত এখন আর কিছু বলিবনা—জ্ঞান লাভ করিয়া সমস্ত বলিব।"

"অহঙ্কার"

"শঙ্কর প্রভৃতি দেবতাগণের মূর্ত্তি কল্পনা না করিলেও উপস্থিত হয়। জড়কে নিগ্রহ না করিলে কখনই আত্মা পরিস্ফুট হইবে না। প্রাণায়াম না হইলে মন ঠিক হয় না। মন জড়ীয় গুণ। জড় বশীভূত না হইলে, মন ঠিক কখনও হইবে না। এই নিমিত্তই আসন এবং প্রাণায়াম দরকার সর্ব্ব প্রথমে।"

"ইহাকে * বলিয়া দিন, অর্থ না বুঝিয়া যেন কিছু না করে। অর্থ না বুঝিয়া গায়ত্রী মন্ত্র প্রভৃতি জপ করিলে কোন ফল নাই। হিন্দি টীকা সহিত একখানা গীতা এবং একখানা ব্রাহ্মধর্ম্ম সংহিতা এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কোন বন্ধুর নিকট হইতে আনিয়া দিলে উপকৃত হই।"

"চীৎকার করিয়া কাল স্বপ্ন দেখিতেছিলে। এ প্রকার করিলে যোগ হইবে না। ধ্রুবের ন্যায় না হইলে ভগবান মিলেনা। সমস্ত ছাড়িয়া দশ বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া জীবন লাভ করিয়াছেন এবং গুরু গ্রহণ করিয়াছেন। আমি বলিতেছি, সকলের এক নিয়ম নয়। প্রকাশিতের মধ্যে যাঁহারা অতি উচ্চ, তাঁহারাই দেবতা-শরীরধারী। বুদ্ধদেব অবতার বলিয়া গণ্য;—সর্ব্বভূতেই ভগবানেরই প্রকাশ।—তবে গুরু গ্রহণ করিয়া যোগাভ্যাস করা উচিত। বিজয় গোঁসাইকে তোমরা হেয় মনে করিও না। তুমি দেশে যাইয়া তাঁহাকে আপনার বিষয় সরলভাবে জানাও।—রাস্তা বুঝিবার সুবিধার জন্য। যে ব্যক্তির ভগবান ভিন্ন পুস্তকপাঠ পর্য্যন্তও, এমন কি ধর্ম্মপ্রসঙ্গ পর্য্যন্তও ভাল লাগে না, সে ব্যক্তির পক্ষে গুরু গ্রহণ না করিলে চলে;—যেমন ধ্রুব, প্রহ্লাদ, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি। সকল দিক ঠিক রাখিয়া চলিতে হইলে, কাজেই,

* এক ব্রাহ্মণ। বোধ হয় মৌনীবাবার সেবার্থী।

নিয়মের বশীভূত হইয়া চলিতে হইবে। সমস্ত ছাড়, দিনরাত্রি তাঁহার চরণে পড়িয়া কাঁদ। গুরু আবশ্যক হইলে তিনি দিবেন; জ্ঞান আবশ্যক হইলে তাঁহার চরণ হইতে পাইবে। গৃহীর পক্ষে গুরু-গ্রহণ অবশ্য-কর্ত্তব্য। তবে তাঁহার চরণে পড়িয়া থাক, কিন্তু সংসার ঠিক রাখিয়া চলিবে না।"

ইহার পর ভক্তিভাজন আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ওঁকারনাথে গমন করেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তর মৌনীবাবা তাঁহার গীতার অলিখিত অংশে যাহা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করা গেল।—

"দয়াময়ের অপার করুণা লাভ করিয়াছি। যদি বাস্তবিকই মরিয়া কেহ বাঁচিয়া থাকে, তাহা আমার হইয়াছে। বহির্জীবনের তো কথাই নাই। আমার শরীর সম্পূর্ণ অবশ হইয়াছিল। সম্পূর্ণ রূপে যদি কেহ ভগবানের শিশু হইতে পারেন, নিশ্চয়ই তিনি ভগবানের কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। সম্পূর্ণ রূপে ভগবানের হইয়া যাওয়াই প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম।"

"তর্ক যুক্তি করিয়া কতকগুলি মত এবং বুদ্ধিগড়া সত্য অবধারণ করা হইয়াছে—যাহা জ্ঞান এবং ভক্তির নিকট স্থান পায় না।"

"এখন যদি পিতা আহার দেন, আহার করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিব। তাহার পর পিতার চরণ পূজায় রত হইবার ইচ্ছা।"

"আর নিদ্রার দরকার কি?"

"সত্যং শিবং সুন্দরং" কখন কখন জপ করি। 'ওঁ হরি'ই আমার মূল মন্ত্র।"

"এখানে এক সাধু ছিল।"

"যদি পিতা কখনও দিন দেন, আপনাদের চরণের দাসানুদাস হইব। আপনাদের সঙ্গ দেবতাগণ বাঞ্ছা করেন,—আমি কি তুচ্ছ।"

"মনস্থির সম্বন্ধে কি বলিব? মানুষের মুখাপেক্ষী কোন বিষয়ের জন্যই হইবেন না। ইচ্ছা এবং দ্বেষ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঠিক ভগবানের কচিখোকা হইতে হইবে। আলস্য ধর্ম্মজীবনের যে প্রকার শত্রু, এ প্রকার আর নাই। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আলস্যকে প্রশ্রয় দিলে ধর্ম্মলাভ কখনই হইবে না। এই আলস্য, যাহা সর্ব্ব-দুঃখের মূল, তাহা পরিত্যাগের জন্য আসন-সিদ্ধি দরকার। প্রাণায়ামও একটী বাহিরের উপায়; কিন্তু অহেতুকী ভক্তি ভিন্ন সকলই পণ্ড। অসত্য পরিত্যাগ অতি প্রয়োজন। স্বপ্ন পরিত্যাগ না করিলে ভগবান লাভ অতি কঠিন।"

"আমি মন এবং বুদ্ধির অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছি। জ্ঞানের তত্ত্ব অতি অল্পই পাইয়াছি; সুতরাং মিথ্যা বলিবার ভয়ে (বাক্য, মন এবং বুদ্ধি দ্বারা নির্দ্ধারিত বাক্য ঠিক নয়) তাহা বলিয়া মিথ্যাবাদী হইতে আর ইচ্ছা নাই। কর্জ্জকরা কথা অনেক বলিয়া আত্ম-নষ্ট হইয়াছে। মন এবং বুদ্ধি লয় হইলেই জ্ঞানলাভ করিব; তখন নিশ্চয়ই সত্য বলিব।"

"ফলাকাঙ্ক্ষা-শূন্য হইয়া কার্য্য করাকে আমি দোষ মনে করি না। কিন্তু অহঙ্কার নামক মহাশত্রু বিনাশ না হইলে ফলাকাঙ্ক্ষা দূর হইবে না, জ্ঞান লাভ হইবে না।"

"আপনার কি উপদ্রব?"

"চৈতন্য, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির ন্যায় যাঁহারা প্রেমিক না হইতে পারিতেছেন, যাঁহাদিগকে অভ্যাসের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে অবশ্যই গুরু গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহারা ভগবানের শিশু হইয়া প্রতিনিয়ত কাঁদিতে পারেন,

তাঁহাদিগকে আর অন্য কিছুই করিতে হয় না; ইহা আমি খাঁটি বুঝিয়াছি।"

"এক দুই মাস পরে কতক স্নান করি।"

"আমার নয়—আমার শারীরিক দুঃখের মধ্যে স্বপ্নমাত্র আছে। আশা করি, ভগবানের করুণায় অতি শীঘ্রই খাঁটি হইতে পারিব।"

"দেবী বাবু কি আছেন? নবদ্বীপ বাবু এবং হেরম্ব বাবু কি আছেন?"

কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিষয় লিখিলেন—

"প্রচার করিয়া আত্মনষ্ট না করিয়া, কোনরূপ কার্য্য করিয়া জীবন লাভ করিবার চেষ্টা করা তাঁহাদের এখন উচিত।"

পূজনীয় আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মৌনীবাবাকে দেখিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, —"বুদ্ধদেবের ন্যায় জীবন্ত সাধক দেখিয়া আসিলাম। পুস্তকে বুদ্ধের কঠোর তপস্যার কথা পড়িয়াছিলাম, এবার স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম।" মৌনীবাবাও সাত বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন।

ওঁকারনাথ অবস্থান কালে পাঁচ বৎসরের মধ্যে মৌনীবাবা একবার মাত্র সহরে গিয়াছিলেন। এক জন্মাষ্টমীর মেলায় তাঁহাকে পাল্কীর ন্যায় এক প্রকার যানে উঠাইয়া সকলে মিলিয়া বহন করিয়া সহর পরিভ্রমণ করাইয়া আনিয়াছিল। এই দিন সহর শুদ্ধ লোক এবং যাত্রীগণ তাঁহার প্রতি যে সম্মান দেখাইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। সকলে তাঁহাকে জোর করিয়া যখন যানে তুলিয়া লইল, তখন তিনি ধ্যানস্থ হইলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি করিয়া সকলে টাকা, পয়সা, কড়ি ছড়াইতে লাগিল। প্রায় আড়াই মাইল পথ এই প্রকার মিছিল হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর বাহকগণ তাঁহাকে গুফায় ফিরাইয়া দিয়া গেল।

মৌনীবাবা ওঁকারনাথে পাঁচ বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে দুখানি মাত্র পত্র লিখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রথম পত্র খানি হারাইয়া যায়; দ্বিতীয় পত্রের নকল নিম্নে দেওয়া হইল; ইহাই তাঁহার শেষ পত্র। মৃত্যুর তিন চারি মাস পূর্ব্বে এই পত্র লিখিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

"প্রাণের ভাই,

তুমি যে ভাব পাইয়াছ, তাহা সত্য; কিন্তু 'সমর' কথাটা কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অসত্যের সহিত সংগ্রামকে তুমি 'সমর' বলিয়াছ। আমি তো সেই অসত্য জীবন সমূলে উৎপাটন করিয়া সত্যরত্ন লাভ করিবার জন্য জীবন অর্পণ করিয়াছি। তবে আর তোমার ন্যায় ভাই আনন্দ না করিয়া দুঃখ কেন করিবে? অসত্য এই মন এবং ইহার কার্য্যাবলী; (মন অর্থ চিত্ত, সন্দিহান বৃত্তি, অহঙ্কার এবং বুদ্ধি) বুদ্ধি অস্থায়ী, মিথ্যাবাদী এবং পরিবর্ত্তনশীল; কারণ ইহার মূলে মন মহাশয় বিরাজ করিতেছেন। স্বপ্ন প্রভৃতি মনেরই কার্য্য। আমার সহিত মিথ্যাবাদী, অস্থায়ী বুদ্ধি মহাশয়ের যোগেই অহঙ্কারের সৃষ্টি। বুদ্ধি মহাশয়ের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেই জ্ঞান-রত্ন লাভ হয়; কারণ অসত্য হইতে সম্পূর্ণ রূপে আত্মাকে মুক্ত না করিলে সত্য স্বরূপ নিরঞ্জন পুরুষকে লাভ করিবার আশা বাতুলতা মাত্র। জ্ঞান চিরস্থায়ী, অপরিবর্ত্তনীয় এবং নিষ্কলঙ্ক। জ্ঞানীর নিকট ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এক; ইহকাল, পরকাল এক এবং সর্ব্বভূত চরাচর এক। জ্ঞান আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি। অসত্য হইতে আত্মাকে সম্পূর্ণ রূপে

মুক্ত না করিলে, ভগবানের কচিখোকা হওয়া যায় না। যে পর্য্যন্ত জ্ঞান লাভ না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই; কারণ সত্য অসত্য অবধারণ আমি কিরূপে করিতে পারি? যদি জ্ঞান লাভ করিয়া ভগবানের আদেশ লাভ করিবার ক্ষমতা হয়, তবেই আমাকে দেখিতে পাইবে। আমি দয়াময় পরাৎপর পরমগুরুর অতিশয় কঠিন শাসনে এই জ্ঞান-রত্ন লাভ করিয়াছি যে—"আমি তুমি কেহই কিছু নয়, সকলেই তাঁহারই প্রকাশ। আমরা সকলেই তাঁহার লীলাক্ষেত্র। তিনি হৃদয়ে বসিয়া যাহাকে যে ভাবে চালাইতেছেন, সে-ই সেই ভাবে চলিতেছে। কেহই পাপী পুণ্যাত্মা নাই। বুদ্ধির সহিত আত্মার যোগেই লোককে বৃথা অহঙ্কারে মত্ত করিয়াছে এবং নানা প্রকার বৃথা উপাধির সৃষ্টি করিয়াছে।

দয়াময় অপার করুণা করিয়া আমার সমস্ত উপাধি বিনাশ করিয়াছেন। আমি এবং আমার এখন কিছুই নাই। সমস্ত জগতই সেই একমাত্র পরাৎপর পরমাত্মার প্রকাশ। আমার এখন কোন সমাজ নাই, জাতি নাই, কুল নাই, মান নাই, অপমান নাই এবং ঘৃণা ও আদর, কিছুই নাই। আমার নিকট সমস্ত সমাজ এবং সর্ব্বলোক এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার শত্রু নাই, মিত্র নাই; আমার ভাই, ভগ্নী, পিতা, মাতা, কিছুই নাই। এক ব্রহ্মই সর্ব্বভূত চরাচরে সুন্দররূপে জাগ্রত জীবন্তরূপে প্রকাশিত। আমি কাহাকে আপনার এবং কাহাকে পর বলিব এবং কাহার প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিব? এখন সর্ব্বজীবে এবং সমস্ত লোকে আমার সমভাব এবং অতি পবিত্রভাব। আমার মস্তক শঙ্কর, কৃষ্ণ এবং যীশু প্রভৃতি মহাত্মাগণ হইতে একটী কীটাণুকীটের নিকট অবনত। আমার অন্তরাত্মা দয়াল হরি প্রকৃত পক্ষে এবং ভক্তির সহিত অবনত হইতে শিক্ষা দিয়াছেন। এখন আমি সর্ব্বলোক সহিত সেই অখণ্ড অব্যয় পুরুষকে মস্তকে ধারণ করিতেছি। এখন আমি অপূর্ব্ব ধর্ম্ম পাইয়াছি। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান এবং ব্রাহ্ম, আমার নিকট এক হইয়াছে; পাপী এবং পুণ্যাত্মা এক হইয়াছে। আহা! আমার অন্তরাত্মায় দয়াল হরির কতই দয়া! আমি ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি যে সকল মিথ্যা উপাধি হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা সমূলে বিনাশ করিয়া আমাকে তাঁহার কচি খোকা করিয়াছেন। এখন কাহারও নিকট কিছু চাহিতে এবং জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জা হয়। দয়াল হরি আপনা আপনি প্রার্থনা বিনা সকল বিধান করিতেছেন এবং সংসার হইতে আমাকে রক্ষা করিতেছেন। আমি বিপথে যাইতে চাহিলেও আমাকে ফিরাইয়া আনিতেছেন। দেখ, দয়াল হরির অপার করুণা! আমি এখানে আসিয়াই কিছুদিন পরে খরচের জন্য তোমাদিগকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। আমি প্রায় একমাস তোমাদের প্রেরিত টাকার আশায় ছিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সে পত্র ব্যারিং, তথাপি তোমরা পাও নাই। দয়াময় তোমাদের নিকট সেই পত্র না পৌছাইয়া যে কি উপকার সাধন করিয়াছেন এবং কি অপূর্ব্ব লীলা দেখাইয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। জাগ্রত জীবন্ত দয়াল হরির অপার করুণা। হরি জাগ্রত জীবন্তভাবে আমার পিতা, মাতা, গুরু এবং সেবক হইয়া অপার লীলা দেখাইতেছেন। আমি প্রায় চারি পাঁচ মাস বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

এই ব্যাধির প্রথম অবস্থাতে আমি সম্পূর্ণ অবশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। সর্পগতিতে চলিতাম, নিজের হস্তপদাদি পর্য্যন্ত এক প্রকার গতিহীন হইয়াছিল! সমস্ত শরীর যেন বরফে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছিল। হস্ত-পদ সকলই আছে, অথচ উঠিয়া সোজা হইয়া বসিতে অক্ষম, নিজের অন্নগ্রহণে অক্ষম এবং শৌচাদি কার্য্য করিতে অক্ষম। বল দেখি, এই অবস্থা হইতে কে আমাকে এই বন্ধু-বান্ধবহীন নির্জ্জন স্থানে রক্ষা করিল? আমি অক্ষরে অক্ষরে লিখিয়া দিতেছি—"আমার জাগ্রত জীবন্ত দয়াল হরি।" হরিই নিজ হস্তে আমার অন্নপানাদি করাইয়াছেন এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পৃষ্ঠে করিয়া এবং নানাপ্রকারে আমাকে বহন করিয়াছেন। তুমি হয় তো ব্যাধির তীব্রতা বুঝিতেছ না। আমি দয়াময়ের করুণায় এক প্রকার মৃত্যু-ঘর হইতে ফিরিয়াছি। এই বাতব্যাধির উপর কাশী ও জ্বর ছিল। দয়াময় হরি অতি আদরের সহিত আমার সেবাশুশ্রূষা এবং চিকিৎসা করিয়াছেন। আমি তাঁহার কৃপায় এখন লাঠিতে ভর দিয়া থাপস্ থুপস্ করিয়া রামচন্দ্রপুরের কালীর ভাইয়ের ন্যায় চলিতে পারি। আশা করি, দয়াময় শীঘ্র আমাকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিবেন। আমি পীড়িত হইলাম বলিয়া যখন অন্যান্য সকলে আমাকে পরিত্যাগ করিল, অন্যস্থান-নিবাসী এক ব্রাহ্মণকে অবলম্বন করিয়া প্রভু আমাকে কত অদ্ভুত কাণ্ড দেখাইলেন। এই ব্যক্তির আহ্বানে এবং কাতর প্রার্থনায় স্থানীয় ডিস্‌পেনসারীর ডাক্তার মহাশয় আসিয়া আমাকে দেখিতে লাগিলেন এবং আজ পর্য্যন্ত আমাকে চিকিৎসা করিতেছেন। এই ব্যক্তি যে প্রকারে আমাকে শুশ্রূষা করিয়াছেন, তাহা পিতা হইতে হয় না, মাতা হইতে হয় না, স্ত্রী হইতে হয় না, ভাই ভগ্নী হইতে হয় না এবং বেতন-ভোগী ভৃত্য হইতে হয় না। এই ব্যক্তি আমার নিকট কিছু আশা করেন না, কেবল আশীর্ব্বাদ-ভিখারী। আমার সেবা করিতে পারিলেন বলিয়াই সর্ব্বদা প্রসন্ন। ভাই, আমি কি বলিব, স্বয়ং হরি এই ব্যক্তির হৃদয়ে বসিয়া আমাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। এই ব্যক্তি জমিদারী কাছারীর পেয়াদা ছিল; একটী স্ত্রীলোকের ধর্ম্মভাব দেখিয়া ইহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়। এখন এক প্রকার সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্ত্রীর সহিত এখানে বাস করিতেছেন। যদি ব্যাধির প্রথম অবস্থায় তোমাকে জানাইতাম, তুমি নিশ্চয়ই আমার জন্য এক শত দুই শত টাকা খরচ করিতে। তাহাতেও আমি আরোগ্য লাভ করিতাম কি না, সন্দেহ। আমি এক প্রকার আরোগ্য লাভ করিয়াছি, এখন আর তোমার আসি-বার প্রয়োজন নাই। আমার ভার হরির হাতে দিয়া সুখে থাক। আমি জ্ঞানলাভ করিলে এবং হরির আদেশ পাইলে, অবশ্যই আপনা হইতেই তোমাদের সহিত দেখা করিব; কিন্তু সংসারে আর বিষপান করি-বার জন্য যাইব না। দয়াময় হরি সংসার হইতে উদ্ধার হইতে তোমার দ্বারা আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। আমার একটী কাতর প্রার্থনা এই—শীঘ্র সৎপথে সম্পন্ন হইবার জন্য তৎপর হও। আর আমাকে বৃথা পত্র লিখিয়া প্রয়োজন কি? হরিকে বিশ্বাস করিয়া আনন্দচিত্তে কাল যাপন কর। পিতামাতা এবং অনাথা আত্মীয়-গণের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিও না। সময় সময় তাঁহাদের সহিত দেখা করিও, এবং

আমার প্রণাম জানাইয়া বলিও, হরিলাভ পক্ষে যেন তাঁহারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করেন। কারণ সাধক-বাণী এই—"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।" গীতা এবং পাতঞ্জল দর্শন পাঠ কর, গুরুর অনুসরণ কর, শান্তি পাইবে।

আর আমাকে পত্র লিখিও না—উত্তর পাইবে না। কারণ আর এক মুহূর্ত্তও আমাকে হরির চরণ ছাড়াইয়া বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট করিও না।

* * * * *

ভগিনী কুমুদিনী এবং তোমার অধীনস্থ সকলকে গীতা পাঠ করাইবে এবং সদ্‌গুরুর অধুসরণ করাইবে। কুমুদিনীকে যদি সংসার হইতে বাহির করিয়াছ, সে যাহাতে সৎপথে সম্পন্ন জ্ঞানলাভ করে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে। তাহাকে পুস্তক পড়া বিদ্যা এবং কার্য্য করা ধর্ম্ম দিয়া ক্ষান্ত হইও না। সে এবং মা মোক্ষ এবং অনাথা ভগিনীগণ যাহাতে জ্ঞানাপন্ন হইয়া তোমাদের মুখোজ্জ্বল করিতে পারে, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে। যদি ভগবান আকর্ষণ করেন, অতি শীঘ্রই তোমরা ব্যাকুল হইয়া তাঁহার জন্য ছুটিবে।

যদি পূজনীয় গুরু বিজয়বাবুকে একবার আমার দুঃখের কথা শুনাইয়া এদিকে পাঠাইতে পার, পাঠাইতে চেষ্টা করিবে। আমি ভগবানকে সাক্ষী করিয়া তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

এক আত্মন্! যদি তোমার অন্তরাত্মা এই ব্যক্তিকে * ঋণমুক্ত করিয়া প্রসন্ন হয়, তবে তাহার ঋণ শোধার্থ ২০৲ এবং পুস্তক ক্রয়ার্থ ১০৲ এইরূপ ভাবে পাঠাইবে যে সে যেন বুঝিতে না পারে, তুমি ইহার প্রেরণকর্ত্তা এবং আমি তাহাতে সংসৃষ্ট আছি। তাহার ঠিকানা—

Sree Ramjee Brahman,
c/o Babu Lachmi Narayan Seth,
Mandata.
Khandwa.

এই ব্যক্তি যেমন আমার সেবা করিতে পারিলেন বলিয়াই সুখী এবং দিনদিন রোগমুক্ত হইতেছি দেখিয়াই সুখী, তোমার অন্তরাত্মা যদি তোমাকে সেইরূপ সুখী করেন, তবে পাঠাইবে, নচেৎ নয়। তুমি যদি আমার কঠিন পীড়ার সময় একদিন ইঁহার কার্য্যাবলী দেখিতে, তবে দেবতা বলিয়া ইঁহার চরণে নত হইতে। ফলতঃ হরি এই ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া, আমার মা হইয়া মুখে অন্ন তুলিয়া খাওইয়াছেন, আত্মায়, ভাই, বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন, নাপিতের কার্য্য করিয়াছেন, অবশেষে আশ্চর্য্যরূপে মেথরের কার্য্য করিয়াছেন। আমি বলিতেছি, এই ব্যক্তি বিন্দুমাত্রও ইহার কর্ত্তা নয়, সেই হৃদয়বিহারী দয়াল হরিই ইহার কর্ত্তা।

আমি এত লিখিলাম বলিয়া মন ও বুদ্ধি মহাশয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া আমার কোন motive আছে বলিয়া মনে করিওনা। আমার তোমার নিকট কিম্বা অন্য কাহারও নিকট পত্র লিখিতে ইচ্ছা ছিল না, কেবল আমার সম্বন্ধে তোমার ভুল সংশোধন করিবার জন্য পত্র লিখিলাম। আমি সংসারে ফিরিব বলিয়া যে আশা মনে ধারণ করিতেছ, তাহা মিথ্যা। বৃথা অর্থব্যয় ও কষ্ট করিয়া আর আমাকে দেখিতে আসিও না। হরিকে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাক।

* পূর্ব্বোক্ত সেবক ব্রাহ্মণ।

সর্ব্বশেষে, এই ব্যক্তিকে টাকা পাঠাইলে নোট রেজেষ্টারী পত্রের মধ্যে ভরিয়া পাঠাইবে এবং দেবনাগর অক্ষরে কেবল এই কথা লিখিবে—"ঋণ শোধ দেনা" এবং"পুস্তক কেন্না।"

নির্ব্বাণ।

ওঁকারনাথ গমনের পাঁচ বৎসর পরে মৌনীবাবা একদিন কথা কহিলেন। সকাল বেলায় তাঁহার মিঠাই-বিক্রেতা সেবক ও তাহার পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমরা আমার মা বাপ; আমার দোষ তোমরা ক্ষমা কর। তোমরা আমার বড় উপকার করিয়াছ। আমাকে ইচ্ছামত সেবা করিতে পার না বলিয়া তোমরা দুঃখ কর। আজ তোমাদের যাহা ইচ্ছা আমাকে আনিয়া দাও, আমি খাইব।"

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি খাইবেন?" মৌনীবাবা বলিলেন—"খিচুড়ী করিয়া আন।"

মিঠাই-বিক্রেতা পত্নীসহ খিচুড়ী আনিতে গেল। আসিয়া দেখে, মৌনীবাবা সমাধিস্থ। খিচুড়ী লইয়া তাহারা মৌনীবাবার ধ্যান ভঙ্গের প্রতীক্ষায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া রহিল, তাঁহার ধ্যান আর ভাঙ্গিল না। তাহারা বুঝিল না, মৌনীবাবা মহাসাধনান্তে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার এ সমাধি আর ভাঙ্গিবার নয়। অবশেষে সন্ধ্যাবেলায় পুত্রশোকাতুর জনক জননীর ন্যায় তাহারা কাঁদিতে লাগিল।

বহুসংখ্যক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া নর্ম্মদাতীরে প্রস্তর মধ্যে মৌনীবাবার দেহ সমাধিস্থ করিয়া আসিল। এদিনও ওঁকারনাথে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা গেল। স্থানবাসী আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলে মৌনীবাবার গুহায় আসিয়া তাঁহার মৃতদেহের প্রতি সম্মান দেখাইলেন। পাঁচখানি বৃহৎ নৌকা সুসজ্জিত করিয়া শব বহন করিয়া সমাধি-ঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। পঁচিশখান কাপড় ও পাঁচমণ মালপুয়া বিতরিত হইল; এবং মৌনীবাবার নামে মুহুর্ম্মুহু জয়ধ্বনি উঠিয়া ওঁকারনাথকে কম্পিত করিয়া তুলিল।

তথাকার লোকদের বিশ্বাস যে, যথার্থ সাধুব্যক্তির মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবার পর দিনই সমাধিস্থান নর্ম্মদা-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায়। পরদিন দেখা গেল, নর্ম্মদার জল বৃদ্ধি হইয়া মৌনীবাবার সমাধিস্থান আপন বক্ষে ধারণ করিয়া লইয়াছেন; * জলরেখা সমাধি স্থান অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিয়াছে।

আটত্রিশ বৎসর বয়সে মৌনীবাবা নির্ব্বাণ লাভ করেন। সাত বৎসর মহাসাধনার পর যে জীবন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার মহৎ ফল তাঁহার দুঃখিনী জন্মভূমিকে, জগতকে দান করিবার অবসর পাইলেন না। সকলই বিধাতার ইচ্ছা।

এইরূপে, নব্যভারতের এক মহা সাধক, গোপনে আসিয়া, গোপনেই জীবনের কার্য্য শেষ করিয়া গেলেন। ফলবাদীরা ফলাফলের বিচার করুন। আমরা অনুভব করিতেছি, তাঁহার জীবন আমাদের মহোপকার সাধন করিতেছে। যখন হিংসা, দ্বেষ, বিলাসিতা প্রভৃতি প্রবেশ করিয়া সমাজকে বিকৃত করে, তখন সাধুগণ সমাজের সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আত্মবলিদান করেন। সকল দেশে এবং সকল কালেই এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি, তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রভাব, তাঁহার বৈরাগ্য, তাঁহার

* মৌনীবাবার দেহান্তে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওঁকারনাথে গমন করিয়া ইহা শুনিয়াছিলেন।

ব্যাকুলতা ব্যর্থ হয় নাই। সমাজের যে বহির্ম্মুখীনতা ও রাজসিকতা দেখিয়া তাঁহার সাধু আত্মা অস্থির হইয়া বৈরাগ্যানলে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিল, সমাজের সে পাপ আর অধিক দিন থাকিবে না। ধর্ম্মপ্রাণ, বৈরাগ্য-প্রবণ ভারত জগৎকে আবার তাঁহার সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিবেন। সাধু প্যারীলালের আকুল প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। তাঁহার মুক্ত আত্মা দেবলোক হইতে দেখিবেন "ভারতের গৃহ, ভারতের বন, গিরি আবার পুণ্যময় তপোবন হইয়াছে,—ব্রহ্মলাভ করিয়া ভারত স্বাধীন হইয়াছেন।

ওঁ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

বাঙ্গালার সংবাদ পত্র চর্চ্চা। (২)

অনেক প্রাচীন ব্যাপার লুপ্ত হইয়া যাইতেছে এবং ইতিমধ্যেই অনেক পুরাতন প্রতিষ্ঠা অন্তর্হিত হইয়াছে।

কফি-শালগমের ন্যায় অনেক নূতন পদার্থ চকিতনেত্রে ধীরে ধীরে এই ভগ্ন-ভিত্তি প্রাচীন সমাজ-দুর্গের অভ্যন্তরে অগ্রসর হইতেছে। নূতন যুগের সকল অতিথিই দুর্গাভ্যন্তরে সমান সম্ভাষণ পায় নাই। কাহাকে হয়ত প্রহরীর তর্জ্জনে সিংহদ্বার হইতে ফিরিয়া আসতে হইয়াছে, কেহবা ছদ্মবেশে, কেহবা উৎকোচের দ্বারা, কেহবা বাহুবলে ভিতরে ঢুকিয়াছে। বাহুবলে যাহারা গিয়াছে, তাহারা এখনও উপবেশনের স্থান পর্য্যন্ত পায় নাই।

অনেকে কিছু হাওয়ার ভিতর দিয়া বা আহুত হইয়া প্রবেশ করিয়াছে। সুবিধার তাড়নায় এইরূপে নানা নূতন সখা দুর্গাভ্যন্তরে উপস্থিত হইয়াছে।

এই পরিবর্ত্তন-বিপ্লব আমাদিগকে নিবিড় ভাবে অধ্যয়ন করিতে হইবে এবং সমাজ-দেহের মাঝে নূতন অতিথি-সম্প্রদায় যাহাতে সহজভাবে প্রাচীন, অনাদৃত এবং সময়ের ঘূর্ণিবাত্যায় কক্ষভ্রষ্ট ও হীনপ্রভ পেনসনারগণের স্থান অধিকার করিতে পারে, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই নব-সম্প্রদায়কে সমগ্রভাবে প্রাচীন কর্ত্তব্যগুলিকে স্কন্ধে ধারণ করিতে হইবে।

আমাদের দেশে সংবাদপত্রের সূচনা হইয়াছে অল্পকাল, তৎপূর্ব্বে ইহা ছিল না, এমন নহে, থাকিবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না; কারণ ইহা মুদ্রাযন্ত্ররূপী মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণ। প্রভেদ এই যে, রামায়ণের মহীরাবণের মাত্র একটী দিগ্বিজয়ী পুত্ররত্ন ছিল, কিন্তু এই মুদ্রারাক্ষস কত পুত্ররত্নের অধিকারী, গণনা করা যায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবী ব্যাপিয়া নগরে নগরে ইহার লৌহ-উদর হইতে অঙ্কিত হইয়া ইহারা হরিনামাঙ্কিত বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় সকলের ক্ষুধার তৃপ্তিসাধন করিতেছে ও বহিরাবরণরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

দেখা যাইতেছে, এই স্বল্পসময়ে আমাদের সমাজ-অঙ্গে সংবাদপত্রগুলি ধীরে ধীরে লোকশিক্ষার ভার গ্রহণ করিতেছে। এইটী এমন গুরুতর কাজ যে, কেহ উদাসীন হইয়া এতৎসম্পর্কে আলোচনা করা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। লোকশিক্ষার স্বাস্থ্যের

উপর সমাজস্বাস্থ্য নির্ভর করে—সংক্ষেপে ইহাই সমাজের মেরুদণ্ড। যদি প্রতীচ্য সমাজের কার্য্য-কলাপ, আচার-আকারে এবং আমাদের ক্রিয়া-কৃত্যে কোন বৈষম্য দেখা যায়, বলা অনাবশুক, তাহা এতদুভয়ের শিক্ষার ধর্ম্মগত বৈপরীত্যে সম্ভব হইয়াছে। কাজেই অতি সংক্ষেপে সংবাদপত্রগুলি জাতীয় সমাজ-দুর্গে কোন্ স্থান অধিকার করিতে যাইতেছে, আলোচনা করা যাক্।

লোকশিক্ষা-কার্য্যে ভারতে মৌখিক-শিক্ষার চিরকাল একাধিপত্য ছিল। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য কথোপকথনের ছাঁচে ঢালা। এসিয়াব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্ম-বিপ্লব, ভারতব্যাপী শঙ্করাচার্য্যের ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা, চৈতন্তের ধর্ম্ম-বিপ্লব প্রভৃতি যাবতীয় বিচার্য্য ভাব-বিপ্লব মৌখিকভাবে বিস্তৃত হইয়াছে—আক্ষরিক উপায়ে এই বিরাট-বিস্তৃতি সম্ভব হইত না। রামায়ণ মহাভারত পাঠ, পূজাবসানে চণ্ডী প্রভৃতি পুঁথি পাঠ, গীতা-পুরাণ পাঠ, কথকতা ব্রতাপারণার পুঁথি শ্রবণ প্রভৃতি ভারতে ধর্ম্মকৃত্যে ও সমাজকৃত্যে যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে, তাহাতে আক্ষরিক-শিক্ষা-বিহীন কৃষকেরাও রামায়ণের মধুর চরিত-শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হয় নাই এবং এইজন্য এখানকার জনসাধারণ উরোপীয় পাশব-প্রকৃতিরূপী পুতনার আলিঙ্গন হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ভারতের গ্রামে গ্রামে এই সুমধুর প্রাচীন-কাহিনীর গীত-রেখা যে স্নিগ্ধ-বিতান রচনা করিয়াছিল, নানা উৎপাত অত্যাচারের কণ্টক আবর্ত্তের মাঝেও ভারতের প্রাণ উহারই স্নিগ্ধছায়ায় নিজের শঙ্কিত-কম্পিত প্রাণের বেপথু গোপন রাখিয়াছিল এবং উহারই মোহন আকর্ষণের মাঝে নিবিড় গোপন-ক্রন্দন ভুলিয়া গিয়াছিল।

এদেশে শিক্ষাকার্য্যটী কখনও পণ্যদ্রব্য রূপে ব্যবহৃত হয় নাই, ইহার বাণিজ্য বা ক্রয় বিক্রয়, কল্পনার বহির্ভূত ছিল। আমাদের দেশকলেবর যেমন বিরাট, দেশের হৃদয়ও তেমন বিরাট ছিল। আমাদের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ কখনও দুর্ভেদ্য প্রাচীরের অভ্যন্তরে হয় নাই—সর্ব্বত্র আতিথ্যের উন্মুক্ত আহ্বান ছিল। দেশের আচারে ব্যবহারে, দরবার-মজলিসে,সাহিত্যে-চিত্রে সর্ব্বত্র একটা বিরাট হৃদয়বত্তার নিদর্শন ছিল। ভারতের মন্দির বা মস্‌জিদের চতুষ্কোণে কখনও কোথাও প্রহরীর স্থান ছিল না।

কাজেই লোকশিক্ষা অতি সহজে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। বিনাব্যয়ে তখন সম্পদের সময়ও শিক্ষালাভ হইত। আজ এই ঘোর দারিদ্র্য-দুর্দ্দিনেও নূতন প্রণালীর বর্ত্তমান সভ্যতার কৃপায় শিক্ষাকার্য্যটী পণ্যদ্রব্য রূপে ব্যবহার্য্য হওয়ায়, শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দরিদ্র জনসাধারণ শিক্ষার সুবিধা ততটা পাইতেছে না। শিক্ষার মৌলিক সনাতন প্রাণ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার বাহিরের আবরণটীকে আধুনিক সুধীগণ মন্দর-পর্ব্বতের ন্যায় বিঘূর্ণিত করিয়া অমৃতমরীচিকা সংগ্রহ করিবার জোগাড় করিতেছেন। ইতিমধ্যেই ফলের আস্বাদ পাওয়া গিয়াছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে উপরোক্তভাবে দেশের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসময়ে সরস্বতী দেবী খরচের তালিকা এক হস্তে এবং অন্য হস্তে বিলাতী-শিক্ষার ভোজবাজী হাতে লইয়া উপস্থিত হইতেছে। এই ভেল্‌কির কৃপায় মানুষ মেষে পরিণত হইতেছে এবং কখনও বা মেষশাবক মানবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে—ভাবের প্রচার এবং

বিস্তৃতির প্রশ্ন ঝাপ্‌সা হইয়া আসিতেছে। কয়েকটা হস্তকৌশল কিম্বা বাক্যজাল কার্য্য-সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে। বীণার ঝঙ্কারে কাহারও মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না—কিন্তু শুভ্র মরালরূপী কলিকাতা গেজেটের চানা-পুটি সঞ্চালন-রবে বক্ষপঞ্জর সহসা গুঞ্জন করিয়া উঠে।

দেশে এখনও ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে মৌখিক শিক্ষার আদান প্রদান হয়, কাজেই মোটা-মুটী এক রকমের শিক্ষা সকলেই পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু সে শিক্ষা রামায়ণ মহা-ভারতের বা কোরাণ-হদিসের, বর্ত্তমান সভ্যতার নবপ্রসূত ইতিহাস ভূগোলের নহে। এই নবশিক্ষা পাইতে হইলে পয়সা খরচ করিতে হইবে।

স্কুল কলেজ ছাড়া বর্ত্তমান সময়ে সংবাদ-পত্রে একশ্রেণীর শিক্ষা দিয়া আসিতেছে। অনেকস্থলে ইহার উচ্চকোলাহল, যাবতীয় সমগ্র কলরব নিঃশব্দ করিয়া দিয়াছে। এই শ্রেণীর শিক্ষা আমাদের সমাজকলেবরে নূতন অতিথির ন্যায় উপস্থিত হইতেছে—নগর এবং উপনগরে মোটামুটী ইহা কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—গ্রামে ততটা পারে নাই। সে পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করি-তেছে।

সংবাদপত্র যে মুহূর্ত্তে লোকশিক্ষার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, সে মুহূর্ত্তে দেশের শিক্ষা-প্রণালীর সনাতন প্রকৃতি চর্চ্চার প্রশ্ন উত্থা-পিত হওয়া প্রয়োজন। বলা বাহুল্য,সংবাদপত্র বিনামূল্যে বিতরিত হয় না এবং উহাতে লেখক ও পাঠকের হৃদয়-সম্বন্ধ ঘনাইয়া তুলি-বার সর্ব্বপ্রকার পথ বন্ধ করা হয়। ভারতীয় সনাতন-প্রণালীর সহিত মূলেই এই সংঘর্ষ উপস্থিত, দেখা যাইতেছে।

বাঙ্গালা দেশের ভট্টসম্প্রদায়, বৈষ্ণব বৈষ্ণ-বীর দল এক সময় সংবাদপত্রের স্থল অধি-কার করিত। তাহারা পল্লীতে পল্লীতে নানা বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া যাইত। এসব ছাড়া বিবাহের বৈঠকে এবং প্রাঙ্গণে আধ্যাত্মিক জগতের আলোচনা ছাড়া, ভৌতিক জগৎ সম্বন্ধে এত অত্যধিক পরি-মাণ চর্চ্চা হইত যে, বর্ত্তমান সময়ের নিষ্প্রভ মজ্‌লিস্‌ এবং আহারকালের পূর্ব্বান্ত পর্য্যন্ত সময়কর্ত্তনের কৌশল অস্ত্র স্বরূপ কথা-বার্ত্তায় জীবনহীন উদ্যম দেশের অভিজ্ঞ অবস্থা স্মরণ করাইয়া দেয়।

কাজেই যে নূতন স্থল ইহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে, তদুপযোগী সার্টিফিকেট ইহার নাই—এই জন্য সাতকোটি বাঙ্গালী অধ্যুষিত বাঙ্গালা দেশে কোন পত্রিকা ত্রিশ চল্লিশ হাজার, এমন কি পঞ্চাশ হাজার গ্রাহকের মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। দেশে লিখিত বা মুদ্রিত শিক্ষা তেমন ভাবে প্রচা-রিত হয় নাই—মৌখিক শিক্ষাই চিরকাল আদৃত হইয়া আসিতেছিল। এই জন্য সংবাদ পত্র জাতীয়-হৃদয়ে এখনও প্রশস্ত আসন লাভ করে নাই। বিনা ব্যয়ে যাহা চিরকাল পাওয়া যাইত, তাহা লাভ করিতে নূতন টেক্স দেওয়ার প্রবৃত্তিও এখনও সম্যক্‌ জাগরুক হইয়া উঠে নাই। এজন্য ভারতের হৃদয়চিত্রশালায় সংবাদ পত্রের ছবি স্পষ্ট হইয়া মুদ্রিত হইতে পারে নাই। ইহার ক্রোধ কিম্বা ক্রন্দনের মূর্চ্ছনা, হাস্য কিম্বা পরিহাসের শৃঙ্গচূড়া বিরাট সমাজ-দুর্গের শুভ্র শ্বেতমর্ম্মর-খচিত সিংহদ্বার হইতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।

এই কারণে পল্লী জীবনের সারল্যের মাঝে সহস্র বৎসর পূর্ব্বের মহীয়ান পুরুষগণ

এখনও রাজত্ব করিতেছেন—আমাদের কেকারব এবং করতালি যে রাগিণী সৃজন করিতেছে, তাহা সহজ ভাবে প্রসারিত না হইয়া সামাজিক বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে।

জন সাধারণের হৃদয়-রাজ্য দখল করিতে হইলে মূল্য হ্রাস করিতে হইবে এবং আক্ষরিক শিক্ষার বিস্তারও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কারণ সংবাদ পত্রের ক্ষমতা ইহার প্রচারের উপর নির্ভর করে—গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইবে। পরে এইটুকু বলা প্রয়োজন, সম্পাদকের দলের মাঝে সংশিক্ষা এবং উপযুক্ত "কাল্‌চার" না থাকিলে লোক শিক্ষার প্রশ্নই উঠে না। এই খানে কোন অভিজ্ঞ ইংরেজ লেখকের উক্তি উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন ছাড়িতে পারিতেছি না :—

"The development of the modern newspaper is due to a union of causes that may well be termed marvellous. A machine that from a web of paper 3 or 4 miles long can in one hour print, fold, cut and deliver 24,000 or 25,000 perfected broadsheet is after all not so great a marvel as is the organizing skill which centralises in a London office telegraphic communication from every important town in Europe, Asia, Austria and Australia and which then, while transmitting shelter the news of London, distributes those communications to thousands of recipients simultaneously by day and night throughout all Britain. *And but for unusual mental gifts conjoined with high culture and with great staying power* in the editorial rooms, all these marvels of ingenuity—which now combine to develop public opinion on great public interests and to guide it--would be nothing better than *a vast mechanism for making money out of man's natural aptitude to spend his time either in telling or in hearing some new thing.*"

নানা স্বাধীনরাজ্যে আক্ষরিক শিক্ষা এত বিস্তৃত হইয়াছে যে, অতি সহজেই সংবাদ পত্র দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এজন্য তাহা অনেক সময় 'চা'র ন্যায় অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের ন্যায় আয়তনে ক্ষুদ্র ভূখণ্ডেও দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার ছড়াছড়ি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। লণ্ডনে "Times","Morning Post""Daily news" "Standard,""Daily Telegraph"প্রভৃতি বিখ্যাত প্রভাত-পত্র এবং "Globe","Evening Standard","St. James's Gazette," "Evening News","Pall mall Gazette," "The Echo" প্রভৃতি বিখ্যাত সান্ধ্য-পত্রিকার প্রচার দেখিয়া স্তব্ধ হইতে হয়। তিন চারি লক্ষ গ্রাহক এই সমস্ত কাগজের পক্ষে বিস্ময়জনক ব্যাপার নহে। তদুপরি দৈনিক বা সাপ্তাহিক কাগজ যেখানে রাজধানীর সম্পত্তি মাত্র নহে—প্রায় দুই শত দৈনিক কাগজ ইংলণ্ডের মফঃস্বল হইতে বাহির হইতেছে—সাপ্তাহিক পত্রের ত কথাই নাই। বলা আবশ্যক, ফ্রান্স ও জর্ম্মনী এবং বর্ত্তমানের জাপান সম্বন্ধেও উপরোক্ত উক্তি খাটে।

আক্ষরিক শিক্ষালব্ধ সাধারণের সংখ্যা অনুপাতে নিতান্ত সামান্য, সন্দেহ নাই। তবুও ইহাদের মধ্যে যাহাতে সংবাদ পত্রের প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্নপর হওয়া প্রয়োজন। এবারই যথার্থ ঘরের কথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

এক্ষেত্রে প্রথম কণ্টকই হচ্ছে মূল্যাধিক্যতা। জনসাধারণের আয় এবং অবস্থা বিচার

করিতে হইবে এবং কি উপায়ে স্বল্প মূল্যে কাগজ বিতরিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। একটু বিচার করিলেই অনেক সুবিধা চোখের উপর পড়িবে। এ সমস্ত সুবিধা ত্যাগ করা ঠিক নহে। যবে

"রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখ পথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার
স্বর্ণ শিখর রথে"—

তখন যদি মণিহার ছিড়িয়া তাহার পথের ধূলায় নিক্ষেপ না করি, শেষে দেশকে ধিক্কার দিয়া লব্ধ-সুযোগ অবহেলার প্রায়শ্চিত্তের ভার সাধারণের উপর অর্পণ করি, তবে তাহা বড় প্রশংসার কার্য্য হইবে না। এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করিলে দেশের প্রাণ এবং প্রকৃতির সহিত যেন আমরা কলহ না করি।

আমাদের দেশের মূল সূত্রগুলি আমরা ধরিতেই চেষ্টা করি না। যে দেশের লোকেরা কথাবর্ত্তায় "হোম—নিউস্" বলিতে ইংলণ্ডের সংবাদ বোঝেন, তাঁহারা বুদ্ধি বৃত্তির সহিত কলহ করিয়াছেন, সহজেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বাহির হইতে দেশের অর্থ আকর্ষণ, ব্যক্তিগত আড়ম্বর ও ভোগ-লিপ্সার বিলাতী আদর্শ, অর্থের ঝঙ্কারে খ্যাতির দ্বার উদ্ঘাটন প্রভৃতি এই দেশের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নানা ব্যাপারে এ দেশের সাধারণের মধ্যে ভয়ানক অর্থাভাব ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সমাজ-রাজ্যে প্রাচীন কালে ক্ষুদ্র পরিবারটীই ভালবাসা বা ভাবের আদান প্রদানের গণ্ডী না হওয়াতে ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতির জন্য সামান্য অর্থ মাত্র ব্যয় করিতে দেশ অভ্যস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর পল্লীরাজ্যে সকলেরই অল্প বিস্তর দাবী-দাওয়া আছে, এজন্য প্রত্যেকে যাহা কিছু অর্জ্জন করে, তাহা নিজের বক্ষপঞ্জরে লুক্কায়িত রাখিয়া সে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। বিবাহে—পার্ব্বণে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বা বাধ্য হইয়া ব্যয় করিয়া কপর্দ্দক শূন্য হওয়া আমাদের দেশে দুর্লভ দৃশ্য নহে। দেশে অর্জ্জনের পন্থা সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিবাহ বা শ্রাদ্ধের ব্যয়ের পথ সঙ্কীর্ণ করিবার উপায় নাই!

এজন্য দেশের উপর সাধারণের দিক হইতে নূতন ট্যাক্স আদায়ের মৎলব করিলে একটুখানি অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। অবশ্য অপেক্ষাকৃত ধনশালী লোক লক্ষ্য হইলে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু উঁহারা যে কলেবরে সামান্য ভগ্নাংশমাত্র দখল করিয়া আছেন, একথা যেন করতালির কোলাহলে আমরা ভুলিয়া না যাই।

আমাদের দেশ গরীব—এ কথাটী কি শুধু ভাবুকতা ফলাইবার নৃত্যগীতি না একটী কঠোর এবং শুষ্ক সত্য! যদি তাহাই হয়, তবে আমাদের বিবেচনা করা উচিত, আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে সংবাদ পত্র প্রচার করিতে হইলে উহার মূল্যের পরিমাণ কমাইতে হইবে। যে ভূমি উৎপীড়নে অত্যাচারে নগ্না, কঙ্কাল-কণ্ঠা, মসীবর্ণা শ্মশান-কালীতে পরিণত হইয়াছে, আজ তাহার জন্য তোমার পত্রিকার অফিসে ব্যাণ্ডবাদ্য বাজিলে অবস্থা বিশেষ অগ্রসর হইবে না—ওই শ্মশানের দারিদ্র্য স্মরণ করিয়া তোমাকে চলিতে হইবে। নূতন টেক্সের আতিরিক্ত্যও বর্জ্জন করিতে হইবে।

যথার্থতঃ এই অজ্ঞান শৌণিক-বৃত্তি দ্বারা কোন দিকে লাভ নাই। এক দিকে ইহা

অনন্ত মূর্দ্ধা মানবের মাথায় গিয়া পৌছেনা, অন্য দিকে সম্পাদকের গৃহকোণের লৌহ-বেষ্টনে লুক্কায়িত রজত কাঞ্চনের সংখ্যাও বৃদ্ধি হয় না। সম্প্রতি সংবাদপত্রের সফলতা বিষয়ে যে উল্লম্ফনমুখী বীরজয়স্তিকার কাহিনী শোনা যায়, তাহা সত্যের চন্দ্রাতপ হইতে কত দূরে, এই একটী কথা হইতেই উপলব্ধি হইবে।

ঠিক এই জন্যই দেশ দুর্ব্বল থাকা সত্ত্বেও অবস্থা পরিবর্ত্তন সহজসাধ্য হইতেছে না। ভারতবাসীর মোটামুটি দৈনিক আয় এবং ইংলণ্ডীয়ের দৈনিক আয় এতদুভয় তুলনা করিয়া সংবাদপত্রের মূল্যরূপী নূতন টাক্স ধার্য্য হওয়া প্রয়োজন।

কোন কোন চতুর বিজ্ঞাপনদাতা এক অভিনব উপায়ে বিক্রেয় দ্রব্যের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কথিত আছে, কোন ঔষধ-বিক্রেতা বিনা মূল্যে কিছুকাল ঔষধ বিতরণ করিতে থাকে। সেই ঔষধে লোক অভ্যস্ত হইয়া গেলেই একটা মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া বসে। প্রথম আবিষ্কারের পর ঘড়ি বিক্রয় সম্বন্ধেও এইরূপ কিম্বদন্তী শোনা যায়। সম্প্রতি এইরূপ দৃষ্টান্ত অসংখ্য দেওয়া যায়।

অবশ্য বর্ত্তমান আক্ষরিক শিক্ষার অপেক্ষাকৃত অবিস্তৃত অবস্থায় কোন হতভাগ্য সম্পাদক বা স্বত্বাধিকারীকে উপরোক্ত উপদেশ প্রদান করিবার প্রলোভন হইতেও আত্মসংবরণ করিতে হইতেছে। কারণ উপরোক্ত কার্য্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

কিন্তু এটা বোধ হয় বিনা প্রতিবাদে বলা যায় যে, ধীরে ধীরে সাধারণের হৃদয়ের এক কোণে সংবাদপত্রের জন্য আসন রচনা করিবার পূর্ব্বে কেবল পাটোয়ারী বুদ্ধি খরচ করিলে দেশের সর্ব্বাভিভাবী ভাব-তরঙ্গের সহিত যোগ রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইবে। বিকল্প-স্বরূপ সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, আমাদের দেশে সংবাদ পত্রের মূল্য বার্ষিক আট আনা কিম্বা বার আনার বেশী হইতেই পারে না। দৈনিকপত্রের কথা হইতেছে না, কারণ তাহা চাষামুটে প্রভৃতির কুটীরে কিছুকাল প্রবেশ করিতে পারিবে না। অথচ সম্প্রতি নগর ও পল্লীর যাবতীয় সংবাদ পত্রের মূল্য দেড় টাকা, দুই টাকার কম নহে।

তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, কি করিয়া বাঙ্গালা দেশে এত স্বল্প মূল্যে কাগজ দেওয়া যাইতে পারিবে? যখন জগতে ইহা অপেক্ষা নানা দুরূহ প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া গিয়াছে, তখন সংক্ষেপতঃ ইহার আংশিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

দেখা যাইতেছে, বায়ান্ন সপ্তাহে তের আনা পয়সা পোষ্টেল বাক্সরূপী তিমি মৎস্যের উদরে প্রেরণ করিয়া আট আনা পয়সা খরচ করিয়া কি করিয়া এই দুরূহ, দুস্তর সাগর পার হওয়া যায়। এই 'ভেলা'র সাহায্যে উত্তরণ চেষ্টা যে নিতান্ত মোহধ্বান্ত-জাত নির্ব্বুদ্ধিতা নহে,ইহা কিঞ্চিৎ দেখাইতে হইবে। আমি মনে করি, মফঃস্বলে পোষ্ট আফিস যন্ত্রটীর যত কম ব্যবহার হয়, ততই ভাল। ইহাতে অনেক পয়সা বাঁচিয়া যায়, অথচ কার্য্যও পণ্ড হয় না। কিঞ্চিৎ ভূমিকা পূর্ব্বক একটী উদাহরণ দেওয়া যাক্।

আমাদের দেশের জনসাধারণ অনবরত খবরের কাগজ অধ্যয়ন করিয়া এমন সংবাদ-কাতর হইয়া উঠে নাই যে,ঠিক কেবল বিশেষ দিনে,বিশেষ সময়ে কাগজ হাতে না আসিলে একেবারে অস্থির ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবে।

বলা আবশ্যক, আমি শিক্ষিত সাধারণের কথা বলিতেছি না।

যেদিন উপরোক্ত অবস্থা হইবে, তখন আমরা বহু পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছি, মনে করিতে হইবে। ঐরূপ অবস্থায় সংবাদ পত্রের আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলে জনসাধারণ স্ব-ইচ্ছায় অনায়াসে অন্যান্য ব্যয় হ্রাস পূর্ব্বক এতদর্থে কিছু অধিক ব্যয় করিতে ইতস্তত: করিবে না।

অর্থাৎ আপাততঃ দুই একদিন পরে কাগজ হাতে আসিলেও, কৃষক-বণিক্‌দের তেমন কোন হানি নাই। কাজেই কোন গ্রামে পাঠাইতে হইলে সেই গ্রামগামী কোন লোকের দ্বারা দুই তিন শত কাগজ পাঠান পৃথিবীর পক্ষে তেমন আশ্চর্য্য ব্যাপার হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বুকপোষ্টে পাঠানও মন্দ নহে। যে জায়গায় এই তিন শত কাপি পাঠান হইবে,সেই জায়গা হইতে আবার তাহা দূরতর এবং অন্তরতর প্রদেশ সমূহে আরও পাঠান হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ তাহা পল্লীর বাঁশবনের ছায়ামলিন কুটীরে, বট গাছের ছায়ায় সমবেত পল্লী সাধারণের অন্তঃপুরে সহজে প্রবেশ লাভ করিবে।

বর্ত্তমান আন্দোলনের মাঝ হইতে কলিকাতার কোন কোন নূতন প্রকাশিত দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র পোষ্টআফিস পরিত্যাগ করিয়া মফঃস্বল সহর সমূহে চারি শত কি পাঁচ শত কাপি রেলওয়ে পার্শেলে প্রেরণ করিয়া স্বল্প মূল্যে কাগজ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া অত্যন্ত সফল হইয়াছে। ইহাদের আশ্চর্য্য কাটতি হইয়াছে। এই উপায়ে এবার ভাব প্রচারের সহায়তা সম্ভব হইয়াছে।

ইহাতে মূল্যের স্বল্পতা আরও একদিকে সম্ভব হয়। একদিনে সমগ্র বৎসরের মূল্য দেওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু এক পয়সা দিয়া সংবাদ ক্রয় করিতে যাওয়া তেমন দুঃসাধ্য নহে। এ কথাটা সংসারী ধনী দরিদ্র সকলেই অল্পবিস্তর বোঝে।

কাজেই দেখা যাইতেছে,দুএকটা বিলাতী ফ্যাসন ত্যাগ করিয়া আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় মূল্য হ্রাস করিলে তেমন কিছু অন্যায় করা হয় না। তুবরী হাতে লইয়া মধুর আওয়াজে পুলকিত, মুগ্ধ, আত্মবিস্মৃত করিয়া গর্ত্তের ভিতরে লুক্কায়িত সূর্য্যালোক-কাতর অনন্তদেবকে আহ্বান করিতে হয়। তারপরে একবার তোমার ঝুলির ভিতর ঢুকিলে এবং তোমার অন্ন আস্বাদন করিলে, তুমি যাহাই করনা কেন, সে তোমাকে আর ছাড়িবে না। সুলভতার যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্রবিস্তৃতি সম্বন্ধে কোন ইংরেজ লেখকের মত উদ্ধৃত করিলে প্রতীয়মান হইবে।

"Nearly every town of 15,000 inhabitants has its own *daily paper*. Scarcely a county seat in the settled part of the United States is without its weekly paper even if the population should be below 1000" W. Ried.

নূতন আমদানী করা কোন কাজের গোড়াতেই আমাদের বিভীষিকা জন্মান ঠিক নহে। আমাদের দেশে আখেড়া এবং ধর্ম্মশালার জন্য জাতি অকুণ্ঠিতচিত্তে যতটা ব্যয় করে, হাস্পাতাল বা ক্লাব হাউস প্রভৃতির জন্য উহার ভগ্নাংশও করেনা। কারণ পূর্ব্বোক্ত আখেড়া ও ধর্ম্মশালা জাতির হৃদয় রাজ্যে স্থান পাইয়াছে, শত বৎসর পর্য্যন্ত উহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হইয়াছে, কাজেই মনঃশিলাবিচ্ছুরিত ভূখণ্ডের ন্যায়

জাতির হৃদয়ে উহার শোণিত-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। আজ ঐ সেকেলে আখেড়া ও ধর্ম্ম-শালার জন্য বহু হর্ম্ম্যপতিকে সর্ব্বস্ব দান করিতে দেখা যায়।

বর্ত্তমান যুগের ভারতবাসীর মাঝে কেবল একদিকে দান করাইবার প্রবৃত্তি জন্মাইলে চলিবে না। এক হাতে কেবল একদিকের কাজ কর্ম্ম অভাব অভিযোগ প্রভৃতি লইয়া নাড়াচাড়া করিলে চলিবে না। সব্যসাচীর ন্যায় উভয়হস্তে উভয় দিকের বিরাট কর্ম্ম-আবর্ত্তের গতি নিয়ন্ত্রিত ও সফল করিয়া তুলিতে এজন্য পূর্ব্বকথিত সমাজদুর্গে নবাগত অতিথির স্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উপরোক্তভাবে বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে গ্রামগণ্ডীর ক্ষুদ্রতার কর্দ্দমে নিমজ্জিত সাধারণের মাঝে সংবাদপত্রবিস্তৃতির ব্যবস্থা করিলে সহজেই স্থানে স্থানে কয়েকটী কেন্দ্র গঠিত হইয়া উঠা সম্ভব। এইরূপ স্থান বিশেষ হইতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে নিত্যগমনশীল লোকের হস্তে দুই তিন শত পত্র অর্পণ করা যাইতে পারে। এই কেন্দ্রগুলি শুধু সংবাদ-পত্র প্রেরণের কারখানা মাত্র হইবেনা, ইহা হইতে সংবাদ পত্রের জন্য সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থাও হইবে।

যাহারা গ্রামে থাকে, তাহারা ভাবেনা যে, জগতের উড্ডীন কল্লোলের মাঝে তাহা-দেরও যথানির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। যে সব সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক অনু-ষ্ঠান জগতের প্রাণে প্রাণে প্রবাহিত হই-তেছে, তাহার জীবন-ধারার সহিত যে তাহা-দের কোন সম্পর্ক আছে, কিম্বা থাকিতে পারে, একথা তাহাদের কিছুতেই কল্পনা করিবার অবসর থাকেনা; কাজেই তাহারা স্বীয় ক্ষুদ্র গ্রামগণ্ডীর মাঝে আপনার অফুরন্ত মানব-শক্তি প্রোথিত করিয়া ফেলে।

আমাদিগকে তাহাদের এই সঙ্কীর্ণ চিত্তের মাঝে প্রসারতা আনিতে হইবে, তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপালোকোদ্ভাসিত পর্ণকুটীরের মাঝে জগতের সনাতন, চির-জাগ্রত সৌর-কিরণের প্রতিচ্ছায়া দেখাইতে হইবে। তখনি তাহারা বিস্মিত হইয়া নিজের গৃহদ্বার খুলিবে এবং চকিতবিস্ময়হাস্যে ক্ষুদ্র কুটীর-সোপান হইতে জগতের অম্লান-বিগলিত জীবনরাজ্যে আপনার আসন দেখিয়া সুদূর-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে।

কাজেই সংবাদপত্রের সংখ্যাগুলি উপ-কূলের স্থান বিশেষ হইতে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রখণ্ড সমূহের ন্যায় হৃদবক্ষে অজ্ঞাত, অসংলগ্ন, বন্ধন-বিহীন, চঞ্চল, ক্ষুদ্র, চক্রাবর্ত্ত-চূর্ণ মাত্র সৃজন না করিয়া সমাজ বক্ষে শৈবাল-জালের ন্যায় একটা হৃদ্য, ঘনিষ্ট যোগবন্ধন ঘনাইয়া তুলিবে।

স্বল্পমূল্যে কাগজ দেওয়ার অন্য ব্যবস্থাও যে বাঙ্গালা দেশে হয় নাই, এমন নহে। তন্মধ্যে প্রতি বৎসর নানা মূল্যবান গ্রন্থ উপহার প্রদান করিবার ব্যবস্থা অন্যতম। অবশ্য কেবল কলিকাতার সাপ্তাহিক গুলি একটা উপহার দিতে সক্ষম হইয়াছে।

পত্রিকার মূল্য এই উপায়ে এক হিসাবে কম করা হইয়াছে, কারণ সাধারণের নজর পত্রিকার মূল্যবান্ পুরস্কারগুলির উপর যতটা লোলুপ থাকে, পত্রিকার জন্য ততটা নহে; সেটাকে একটা অতিরিক্ত লাভ মনে করা হয়। পত্রিকার প্রতি এইরূপ তাহাদের অনেকের বিরক্তি সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা, এই জন্য পুরস্কার দেওয়ার প্রথাটী কাহারও নিকট নিন্দনীয় হইয়াছিল, শোনা যায়।

আমার মনে হয়, এই পুরস্কারের প্রথায়

বাঙ্গালা দেশের ইংরাজী শিক্ষিতগণের এবং কিঞ্চিৎ অর্থবান্‌গণের বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাবসম্পদের অধিকারী হইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রোথিতনামা লেখকগণের গ্রন্থাবলী স্বল্প মূল্যে আয়ত্তাধীন হওয়ায় বাঙ্গালার সাধারণ ভাব ও জ্ঞানসম্পদ্‌ বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া নানা শাস্ত্রগ্রন্থ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত গুলি দেশময় বিস্তার কার্যাটী, চীনের খবর বা তিব্বতের কল্পনা দেশকে বিতরণ করা অপেক্ষা কম কার্য্য নহে। সমগ্র বাঙ্গালা দেশ অন্য কোন কারণে হউক না হউক, এই বিরাট কার্য্যের জন্য বাংলার সংবাদপত্রকারগণের নিকট ঋণী। আমেরিকা এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে মনীষী গ্রন্থকারগণের গ্রন্থাবলি কিরূপ স্বল্পমূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, সকলেই জানেন।

কিন্তু ইহাতে আমার বক্তব্য কথা বিশেষ অগ্রসর হইতেছে না। পুরস্কার খরিদ করিয়া খবরের কাগজ পড়িবার ক্ষমতা বাঙ্গালার জনসাধারণের নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই জন্য মূল্য সংক্ষেপ নিতান্ত প্রয়োজন এবং সম্ভব হইলে এক একখানি, কিম্বা একখানের চারিখানি, কাগজের মূল্য স্বতন্ত্রতঃ লওয়া দরকার, কারণ একসঙ্গে আট আনা পয়সা দেওয়া ও মুদী মুটে বা কৃষক-বেণের পক্ষে সহজ হইবে না।

পূর্ব্ব-কথিত উপায়ে স্থানে স্থানে কতক গুলি কেন্দ্র গঠিত হইয়া উঠিবে। সম্প্রতি বিদ্যালয় এবং শিক্ষামন্দিরগুলির উপর রাজপুরুষের শ্যেনদৃষ্টি পতিত হইয়াছে। ইহা সত্বেও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এই নব-বন্ধনে আনিয়া ফেলা প্রয়োজন। যতদিন পর্য্যন্ত আক্ষরিক শিক্ষা বিস্তৃত হইবে না, ততদিন সন্ধ্যায় একত্রিত করিয়া, ভৃত্য, জেলে, কৃষক, তাঁতি, জোলাদের মাঝে পাঠ করিয়া মৌখিক উপায়ে ভাব বিস্তারের একান্ত প্রয়োজন।

বলিতে গেলে যথার্থতঃ আমাদের নিম্ন শ্রেণীর মাঝেই সাহস ও সংকল্প সারল্যের একমুখী তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং বিশ্বাসের অক্ষয় অমৃত-উৎস রহিয়াছে। এই নিম্নশ্রেণীকে একান্তই আমাদের হাতে আনিতে হইবে। হাতে যে নাই, তাহা নহে, কিন্তু যথার্থ হাতে টানিয়া আনার অর্থই হচ্ছে কার্য্যের ভিতর দিয়া সম্পদ ও বিপদের, অত্যাচার ও উৎপীড়নের কালে খাঁটি বন্ধন ঘনাইয়া তোলা।

নিম্নশ্রেণীরা বরাবর আমাদেরই দিকে চাহিয়া আছে, এ কথাটীর ভেরী-নিনাদ করিলে কার্য্য বেশীদূর অগ্রসর হইবেনা— ইংরেজ গবর্ণমেণ্টও ঐ এক কথাই দিবারাত্র বলিয়া বেড়াইতেছে।

বিবাদে যদি তুমি একান্ত আশ্রয় হও, পুলিশ-চৌকীদারের উৎপীড়নে, অর্থকৃচ্ছ্রতার মাঝে, গৃহদাহে, জলপ্লাবনে, পুত্রশোকে, দুর্ভিক্ষের কোপে, রোগের জ্বালায় যদি তোমার অভয়বাণী, মুক্তহস্ত ও আলিঙ্গন অনুভব করিতে পারে, তবে হিন্দুই হোক্‌, মুসলমানই হোক্‌, কেহই ইংরাজের কথায় মাথা ফিরাইয়া বসিবেনা। তোমার অঙ্গুলি হেলনে সকলেই চালিত হইবে, তোমার তর্জ্জনী দেখিয়া সকলেই সঙ্কুচিত হইবে। নচেৎ বাক্যজালে চক্ষুর দৃষ্টি মাত্র ফিরাইতে পার—হৃদয়ের দৃষ্টি নহে। এই জন্য সাময়িক কোলাহলে স্থায়ী অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার বালকত্ব ত্যাগ করিয়া পল্লীর মাঝে প্রশস্ত-শীতল, উদার-মধুর, স্বচ্ছশুভ্র দীর্ঘিকার ন্যায় তোমার উন্মুক্ত আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া

বর্ত্তমানের পল্লীজীবনের স্নেহ ও প্রীতির দুর্ভিক্ষ অন্তর্হিত কর।

দেশের এই মলিন জনসাধারণ তোমাদের দিকে তৃষিত নেত্রে চাহিয়া আছে। আশ্রয় এবং আশ্রিতের ভাব চিরকালই সমাজে বর্ত্তমান থাকে, স্বাভাবিক নিয়মে চিরকালই ইহা ঘটিয়া আসিতেছে। সকলের মাঝে এইরূপ একটী প্রবৃত্তি শৈশব হইতে মুকুলিত হইয়া উঠে, সামাজিক জীব বলিয়া মানুষ এই অপরাধ বা গৌরব স্বীকার করিয়া লইতে পারে। তজ্জন্য ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন।

পিতাপুত্র, সুহৃদ্‌বন্ধু, শুভার্থী, শুভকামী অল্পবিস্তর সকলেই এই সামাজিক স্নেহের ফাঁদে পড়িয়াছে। আমাদের পল্লীসাধারণও এইরূপে মণ্ডল, পঞ্চায়েত, জমিদার, উত্তমর্ণ প্রভৃতির আকর্ষণে চিরকালই জ্যোতিষ্কের ন্যায় মণ্ডলনৃত্য করিয়া আসিয়াছে। আজ হঠাৎ ইংরাজরাজের আগমনে সকলের দৃষ্টি পরস্পর হইতে সংহৃত হইয়া ইংরাজের পুলিশ-সান্ত্রী, বন্দুক-সিপাহী, ব্যবহার-বিধি, পোষাক-পরিচ্ছদ, গাড়ীঘোড়ার দিকে ফিরিয়া গিয়াছে, কাছে থাকিয়াও পরস্পরকে কেহ চিনেনা, একের উপর অত্যাচারে অন্যে নিজের উপর কষাঘাত অনুভব করে না। মাঝে মাঝে মাত্র ইংরাজ হইতে বিধাতার দিকে চাহিয়া সাধারণ হাহাকার করিয়া উঠে।

সময় হইয়াছে, যখন এই অনাদরে উপেক্ষায় লুপ্তশ্রী জনসাধারণের ভিতর প্রাচীন সম্বন্ধ প্রস্ফুটিত করিয়া তোলা প্রয়োজন। এই জন্য সংবাদপত্রগুলি এক ঝাঁক মাছির ন্যায় কলিকাতা হইতে উড়িয়া আসিয়া পড়িলে চলিবে না—ঐ পানা-পুকুরের শ্যামল আবরণ, পদাঙ্কগঠিত বঙ্কিম পথের উপর স্বভাবজাত ধইঞ্চা ও শণের কার্পেট, ভাঙ্গা বেড়ার উপর দোদুল্যমান উচ্ছে লতিকার নৃত্য, তিসি সরিষার ক্ষেত, বাঁশবনের সমীপস্থ ময়ূরকণ্ঠী অনারসবৃক্ষের গুচ্ছশ্রেণী, পুকুর পাড়ের কাঁঠাল বন হইতে উচ্ছ্রিতদেহ ফলভারনত ডুমুর-বৃক্ষ, সূক্ষ্ম-কুঞ্চিত-পল্লব তিন্তিড়ী বৃক্ষের শাখারাজি, শাখাপ্রশাখায় নৃত্য-বিহ্বল বালকের কোলাহল প্রভৃতি হইতে আবেগ ও ভাব সংগ্রহ ও পুষ্ট করিতে হইবে—রবার টায়ারের নিঃশব্দ তস্কর-গতি, ফুটপাতের ধাকাধাক্কি ও রেলওয়ের নাসিকা-গর্জ্জন হইতে নহে।

সংবাদপত্র আলোচনার এই সন্ধিস্থলে আমরা একটী নিতান্ত গুরুতর প্রশ্নে উপস্থিত হই। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সংবাদপত্র চর্চ্চায় সর্ব্বপ্রথমই এই প্রশ্ন উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। "নগর ও পল্লী বিপর্য্যয়" শীর্ষক প্রবন্ধে উহার আলোচনা করিয়াছি। তবুও তৎসম্বন্ধে দুচারটী কথা উত্থাপিত করিলে বিশেষ অন্যায় করা হয় বলিয়া বোধ হয় না।

ইংরাজ রাজত্ববিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সমগ্র সহরগুলি ধীরে ধীরে তৈলবিহীন প্রদীপের ন্যায় নিষ্প্রভ ও হৃতজ্যোতিঃ হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে ধীরে ধীরে অতীত ইতিহাসের চিহ্নকণা পর্য্যন্ত মুছিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের লাঠি ও সর্কির জোর, বাঙ্গলার জমিদারদের অপ্রতিহত ক্ষমতা, দেশব্যাপী, সজীব, সুস্থ সমাজবন্ধন, জমিদারদের মধ্যে সংগ্রাম, বিরাট-বিদ্রোহের আয়োজন, রক্তের উন্মত্ত, উদ্দাম, দিশাহারা নৃত্য, আজ মসৃণ চাপকানের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত, পদে পদে লাঞ্ছিত, ধিক্কৃত

বাঙ্গালী-হৃদয়ে জাগে না। নবাবী আমলের উন্নত-ললাট, গর্ব্ব-পুলকিত-দেহ, দশদিকের দিক্‌পালের ন্যায় অবস্থিত দশটী ফৌজদারীর বিরাট ভাবসম্পদ কোথায় গেল? কোথায় আজ রাজমহল, বর্দ্ধমান, পুর্ণিয়া, চট্টগ্রাম, আকবরনগর, হুগলী প্রভৃতির ঐশ্বর্য্য ও সম্মান? ফৌজদারগণের সাজসজ্জা, হাজারী দোহাজারী মনসবদারগণের মস্তকোপরি প্রসারিত কিঙ্খাপের ছত্র, 'আসাশোটার' আড়ম্বর, বাঙ্গালা সৈনিকের সদর্প পদনিক্ষেপ, মজলিসের মাঝে ধনীদরিদ্রের সম্মিলন, স্বাধীন-শক্তির উন্মাদনায় রোমাঞ্চিত-দেহ যুবকগণের স্মৃতি আজ কোথায়? রেলওয়ে-ষ্টীমারের এঞ্জিন-মিলের ধূম্ররাশি আজ সব কিছুর উপর পর্দ্দা ফেলিয়াছে।

লোক সব ভুলিয়াছে। ভাবিতেছে, শুধু লাট সাহেবের লেভি, লাট সাহেবের দেশের ঐশ্বর্য্য। ভাবিতেছে, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের ভূগোল, ইংরাজের বিদ্যা, ইংরাজের ভাষা, ইংরাজের মধুর স্মিত হাস্য। ইংলণ্ডটী এখনও অধিকাংশ যুবকের কাছে যেন স্বর্গের কাছাকাছি কোন ব্রহ্মলোক। ইংলণ্ড হইতে কেহ আসিলে যতটা বিস্ময় উদ্রেক করিবে, স্বয়ং সহস্রচক্ষু হাজির হইলেও ততটা হইবে কিনা, জানি না। অবশ্য সম্প্রতি এই ভাবের কিঞ্চিৎ ভাটা পড়িয়াছে।

নবাবী আমলে উপরোক্ত উপনগর গুলি ইউরোপীয় ইতিহাসের "borough" নামক নগরশ্রেণীর ন্যায় ছিল। উহাদের ইতিহাসের স্বাতন্ত্র্য ছিল। মোটামুটী তখন দেশের প্রাণ ও শক্তি দেশকলেবরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে থাকিয়া উহার স্বাস্থ্যবিধান করিত—একস্থান হইতে উহারা নির্গম করিয়া দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিত না।

ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত উপনগরের শ্মশানের উপর ভারতের অর্থ-লুণ্ঠনের প্রধান দ্বার-স্বরূপ কলিকাতা নগর-রূপী বিলাতী কল বসিয়াছে। এই ইংরাজ-শিকারীর অদৃশ্যজালের আকর্ষণে এবং নিক্ষিপ্ত তণ্ডুলকণার লোভে তথাকথিত অনেক বিশ্ব-ঝঙ্কারী লোক জুটিয়াছে। গ্রাম, পল্লী, সমাজ ছাড়িয়া, সকলে হৈ হৈ রবে কলিকাতার দিকে ছুটিয়াছে—কলিকাতা এই কলিযুগে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সব কিছু দিতে পারে, এই বিশ্বাস এখনও প্রবল রহিয়াছে। এই নগর-চুম্বকে অনেক ঐশ্বর্য্য চূর্ণীকৃত হইয়াছে।

জাতি-কলেবরে যদি নানা স্থান সম্মানের সহিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, পরে মনুষ্যত্বগর্ব্বে সকলেই পুলকিত এবং আত্মসম্মান-জ্ঞানের উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-প্রসার ও আত্ম-বিস্তৃতির সূচনা হইবে—নচেৎ নগর ছাড়া পল্লীমাত্রই যদি বিকৃত হয়, নগরের টিক্‌টিকিও যদি পল্লীর কুম্ভীরের পদবীকে জয়ঢাক বাজাইয়া নগণ্য করিয়া তোলে, তবে উভয়তঃ জাতীয় স্বাস্থ্যনাশের সূত্রপাত হয়।

কলিকাতা যেরূপ মফঃস্বলের উপর ছায়াপাত করিয়া আছে, এমন কোন একটি ক্ষুদ্র নগর এরূপ বিরাট-দেশের উপর শুধু কথার জোরে এবং কতকটা পল্লী ও মফঃস্বলের নিরীহতায় ছায়াপাত করিতে দেখা যায় না। এই অস্বাভাবিক ব্যাপারে পল্লীর লোকের কোন বিষয়ে নেতৃত্ব করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। নগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকের বড় বড় কথাও মফঃস্বল শুনিতে বাধ্য হইতেছে।

এই সব সম্ভব হইয়াছে, কলিকাতার সংবাদ পত্রের প্রভাবে। দেশের যাবতীয়

দৈনিক এবং প্রতিপত্তিশালী সাপ্তাহিকগুলি কলিকাতা হইতে অর্থাৎ লক্ষ বর্গ মাইল প্রদেশের তথ্য ছয় বর্গ মাইল-ব্যাপী ক্ষুদ্র স্থান-বিন্দু হইতে নির্গত হইতেছে।

মফঃস্বলের কাগজ মফঃস্বলের লোকেরাই পড়ে না, এক ডিষ্ট্রীক্টের কাগজ অন্য ডিষ্ট্রীক্টে কখনও পড়া হয় না। মফঃস্বলের কাগজের আয়তন-অনুসারে দাম অত্যন্ত বেশী, তার উপর কোন মূল্যবান্ গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয় না—এইজন্য ইহার গ্রাহক সংখ্যা যৎসামান্য। যে কারণে উপনগর দিন দিন হতশ্রী ও প্রতিপত্তি-শূন্য হইয়া উঠিতেছিল, সে কারণে মফঃস্বলের সংবাদপত্র গুলিও মাথা তুলিতে পারে নাই।

পুরস্কার প্রভৃতি দ্বারা গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি ও আর্থিক লাভ প্রভৃতি হওয়ার কলিকাতার কাগজগুলির আকৃতি ও ক্ষমতা বাড়িয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতার কাগজগুলি কেবল কলিকাতার নহে, সমগ্র বিরাট বঙ্গদেশের প্রতিনিধি হইতে স্পর্দ্ধা করিতেছে।

ইহাতেই মুস্কিল। কারণ মফঃস্বল সম্বন্ধে কলিকাতার সম্পাদকগণের অভিজ্ঞতা নাই বলিলেও চলে—ইঁহারা মফঃস্বলের সহরগুলিও জীবনে কখনও দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। আমি এমন একটী সম্পাদককেও জানিনা, যিনি বাঙ্গালার সহরগুলি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। অথচ বাঙ্গলাদেশ সম্বন্ধে কলরব করিতে কেহই পশ্চাদ্‌পদ নহেন।

এই জন্যই বাঙ্গালা দেশের নানা স্থান হইতে নগরের ন্যায় ক্ষমতাশালী সুবৃহৎ কাগজ বাহির না হইয়া কেবল একটী জায়গা হইতে ভাল মন্দ সব কিছু বাহির হইতেছে।

বলা আবশ্যক, এক জায়গায় নির্ব্বিঘ্নে উপবেশন করিয়া কলের জল পান করিয়া ও গ্যাসালোকে চস্‌মা খুলিয়া সম্পাদকতা করা যে কোন জাতির শৈশবে মাত্র সম্ভব হয়। কাজেই ইহার প্রতিকার সহজেই জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভব হইবে।

ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি জেলার জন সংখ্যা কুড়ি হইতে ত্রিশ লক্ষ পর্য্যন্ত। এজন্য আমার মনে হয়, প্রত্যেক প্রধান ডিষ্ট্রীক্ট হইতে অন্ততঃ পঞ্চাশ সহস্র গ্রাহক কর্ত্তৃক অনুগৃহীত এক এক খানা পত্র বাহির হওয়া উচিত। এতদভাবে দৈনিক অন্ততঃ একখানি ডিভিশন (Division paper) কাগজ বাহির হইলেও মন্দ হয় না।

কলিকাতার দৈনিক কাগজগুলির ন্যায় অর্থাৎ "অমৃতবাজার", "বেঙ্গলি", "বন্দেমারতম্" প্রভৃতি ন্যায় পত্র যদি এক একখানি পত্র বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজসাহী প্রভৃতি বিভাগ হইতে বাহির হয়, তবে মুহূর্ত্তের মধ্যে বাঙ্গালা দেশ কিরূপ আলোকিত ও অধৃষ্য হইয়া উঠে, কল্পনা করিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। মফঃস্বলের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি সম্যক্‌রূপে জাগ্রত না হইলে ইহা সম্ভব হইবে কিনা জানিনা। কবে এই শ্রদ্ধা ও ভক্তি জাগিবে? কবে নগর হইতে দেশের চক্ষু পল্লীর দিকে ফিরিবে? সংবাদপত্রগুলি ব্যবসা প্রভৃতির দ্বারা অস্বাভাবিক উপায়ে কেন্দ্রীভূত হওয়াতে, পল্লীজগৎ আলোকিত হইতে পারিতেছে না এবং জাতীয় ভাবসম্পদেরও যথার্থ স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। কাজেই এই অস্বাভাবিক অসামঞ্জস্য দূর করা একান্ত প্রয়োজন। মফঃস্বলের মধ্যে আত্মসম্মান জাগ্রত হইলে এবং কলিকাতা-নিরপেক্ষ

হইয়া নিজেদের মধ্যে ঘনবন্ধনের সূচনা করিতে পারিলে কার্য্যটী বোধ হয় অসম্ভব হইবে না।

বাঙ্গালার সংবাদপত্র চর্চ্চায় ব্যক্তিগত কাগজের সংখ্যাধিক্য সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিলে চলে না। কেহ না কেহ এক একটী কাগজকে নিজের সম্পত্তি করিয়া রাখিয়াছেন—নিজের সুবিধা অসুবিধা অনুসারে কাগজে লিখা চলে, পল্লির বা সাধারণের সহিত নিতান্ত স্বার্থের প্রয়োজন ছাড়া আর কোন সম্পর্কবন্ধন নাই। এই জন্য বিলাতী কাগজগুলির ন্যায় মতামতের অদ্বৈত স্রোতঃ নাই—রবারের ন্যায় ইহাদের মতামত একান্ত স্থিতিস্থাপক। এইরূপ সংবাদ পত্রের সাহায্যে, আত্মবাহাদুরীর বৃষ্টিজাল নিক্ষেপ করিয়া মেঘরাজ্য হইতে নিজকে স্বনির্ব্বাচিত নেতা ঘোষণা করার আতিশয্য দেশবাসীর অজ্ঞাত নহে।

বাঙ্গালার ভাবসম্পদ নিতান্ত কম নহে—ভাবুকের সংখ্যাও নিতান্ত কম বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশতঃ সকলের হাতে খবরের কাগজ থাকে না এবং থাকা সম্ভবও নহে—এই সহজ কথাটী আশা করা যায়, সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা ভুলিবেন না। ইহা যদি না ভোলেন, তবে ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতার পঙ্কিল সলিলকণা নিক্ষেপ না করিয়া, হৃদয়বান লোকের ভাব-পরাগ চূর্ণে দেশকে অভিষিক্ত করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না। নিজের মস্তকের উপর পুষ্পবর্ষণ ও পুরন্ধ্রীর লাজবর্ষণ কল্পনা করিয়া উন্মত্ত না হইয়া যোগ্যতম ব্যক্তির জন্য সেই স্থান মুক্ত রাখিবেন।

ইহা উপলব্ধি হইলে ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতার প্রাকার-বেষ্টনের মাঝেও বাহিরের হাওয়া প্রবেশ করিতে পারিবে।

সৌভাগ্য ক্রমে বর্ত্তমান সময়ে যৌথ-যত্নে কয়েকখানি পত্র বাহির হইতেছে। যৌথ কোম্পানীরই সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হওয়ায় অনেক প্রলোভন অতিক্রম করা হইয়াছে।

এ কথা যেন আমরা কিছুতেই ভুলিয়া না যাই যে, বর্ত্তমানের সুপ্রতিষ্ঠিত, সুশৃঙ্খলিত স্বাধীন ইংলণ্ডে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সংবাদপত্রগুলি কেবল প্রশংসার প্রগল্‌ভতায় হালফ্যাশনের কার্পেট-বিহারী যে সমস্ত ড্রয়িং-রুম-নেতা তৈয়ার করিতেছে, উহার অনুকরণে, পরাধীন, হৃতসর্ব্বস্ব ভারতে সেইরূপ সংবাদ পত্রের তৈয়ারী বিলাসী নেতা রচনা করা সম্ভব নহে। স্বাধীন ইংলণ্ডে গারিবল্ডী, ওয়াশিংটন, নেপোলিয়ন, ম্যাট-সিনীর জন্মগ্রহণের দিন চলিয়া গিয়াছে—ভারতে এখনও যায় নাই। সংবাদপত্র চেম্বার-লেন বা বেলফোর, রোজবেরীরূপী নেতা সৃজন করিতে পারে, ওয়াশিংটনকে পারে না। ইহারা কার্য্যের ভিতর দিয়া জন্মগ্রহণ করে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার ভয়ে আত্মসংবরণ করিতে হইতেছে। সংবাদপত্র দেশের মধ্যে বিরাট ক্ষমতার আধার, ইহার স্বাস্থ্য সর্ব্বান্তঃ-করণে অনুধাবনার বিষয়। বিশেষতঃ ভারতে ইহার একটী বিরাট ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু সেই জন্য বিলাতী ফ্যাসানে চলিলে হইবে না। ইউরোপ ও ভারতের অবস্থা আকাশ পাতাল তফাৎ।

মফঃস্বল সংবাদ পত্রের মধ্যে গ্রাম্য নীতির আলোচনা যত অধিক হয়, ততই ভাল। শুধু, তীব্বত-নীতি, জাপান-নীতি ও সীমান্ত-নীতি আলোচনা প্রচুর নহে। বরং ইহা-দের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাকৃত কম। যথা-সম্ভব গ্রাম্য কথা, গ্রামের দুঃখ দৈন্য, গ্রামের

ইতিহাস সাহিত্য প্রত্নতত্ত্ব অতীত-বর্ত্তমান আলোচনা হওয়া দরকার। গ্রামের উপর, দেশের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টি প্রসারিত করা প্রয়োজন।

পল্লীবাসীদের নিভৃত কোণে থাকিবার অর্থাৎ অতটুকু ক্ষুদ্র বিশ্বের মাঝে থাকিবার কোন অধিকার নাই। একান্তই তাহারা যতটুকু অজ্ঞান-সন্তোষে আছে, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আমরা দ্বিধা করিব না। তাহাদিগকে ঐ নিভৃত মৌন কানন হইতে জীবনের পরিধি দূর-দূরতম দেশে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

যে সমাজে গ্রাম সজীব নহে, সে সমাজ শক্তিহীন। যে সমাজে উচ্চনীচের মধ্যে উর্ম্মি-মুখরিত শৈলনদী প্রবাহিত, সে সমাজে ছিন্নমস্তার ন্যায় নিজের রুধির-ধারা নিজে পান করিতেছে। আমাদের সমাজ বড়ই দুর্ব্বল, কারণ শিক্ষিত অশিক্ষিতের মাঝে ঘনবন্ধন শ্লথ হইয়া আসিতেছে। পল্লিবাসী ও নগরবাসীর মাঝখানে প্রশান্ত সাগর। আমাদের কাজ অত্যন্ত সহজ নহে, এই সাগরের উপর সেতু-রচনা করিতে হইবে। মানবের মন জড়জগতের ন্যায় হৃদয়হীন, বিচারহীন নহে—এজন্য সফলতা কল্পনা করিতে আমরা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিনা।

পল্লীর অনাদৃত মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি স্কুলে যখন সকলে দলে দলে যাইয়া উপস্থিত হইবে এবং বিচিত্রতাবিহীন গ্রাম্য স্কুলমাষ্টারের জীবনকে অভিনন্দন করিয়া, 'ভাই' বলিয়া আহ্বান করিবে এবং সমান ধর্ম্মী কর্ম্মী বলিয়া সম্মাননা করিবে, তখন কি তাহার একঘেয়ে দৈন্য হইতে সে একটু সুখ না হউক, শান্তিও পাইবে না এবং নিজের দশটী রৌপ্য মুদ্রায় বিক্রীত জীবনকে ধিক্কারের পরিবর্ত্তে সামান্যরূপেও অনুমোদন করিবে না?

কাজেই গ্রামের সর্ব্বত্র সম্প্রতি আলোক নিক্ষেপ করা একান্ত প্রয়োজন, বাঙ্গালীর কাছে বাঙ্গালা দেশ অজ্ঞাত থাকা বড়ই লজ্জার কথা। বাঙ্গালী যুবকমাত্রেরই শিক্ষাবসানে সমগ্র বাঙ্গালা দেশ পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করা একান্ত কর্ত্তব্য মনে করি। দেশকে না চিনিয়া উন্নত করিতে যাওয়াটা কতকটা হাস্যজনক।

পরিশেষে সম্পাদক সম্বন্ধে দুইচারিটী কথা বলিতে পারি কি? উপদেশ দেওয়ার দুরভিসন্ধি বর্ত্তমান লেখক কখনও করে নাই এবং কখনও করিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তবে অবস্থা পর্য্যালোচনা করার অধিকার অল্প বিস্তর সকলেরই আছে। সম্পাদকগণের নিকট জিজ্ঞাস্য, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বাঙ্গালা দেশটা নিজের চোখে দেখিবেন কি? জয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ করিবার জন্য নহে, করতালির পটহ-নাদে স্ফীত হইবার জন্য নহে, অশ্ববিহীন মনুষ্যবাহিত শকটে আরোহণ করিতে নহে, সারি সারি পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান স্কুল ছাত্রের সেলাম পাইবার লোভে নহে—একান্ত কর্ত্তব্যবোধে, অপরিহার্য্য সম্পাদকীয় শিক্ষার অঙ্গ-রূপে, তাঁহারা বৎসরের অত্যন্ত ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ, মফঃস্বল ও পল্লীতে কাটাইবেন কি? ইহাতে অপমানের কোন কারণ ত দেখিনা। ইহাতে সম্পাদকীয় কিরীট খসিয়া পড়ার ত কোন আশঙ্কা দেখিনা।

যাঁহারা সম্পাদক হইতে চাহেন, যে যুবকগণ ঐ পদবীর জন্য লালায়িত, তাঁহাদিগকে কি স্মরণ করাইতে পারি যে, রাজনীতি-বলিয়া একটা শাস্ত্র আছে? এই শাস্ত্র যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সের অন্তর্ভুক্ত নহে,

এবং ইহাও যে একান্ত অধ্যয়নযোগ্য পদার্থ, একথা যেন তাঁহারা না ভোলেন। এইজন্য অন্ততঃ পাঁচটী বৎসর, তদভাবে উহার আংশিক কিছুটা কাল, অধ্যয়ন করা একান্ত দরকার, এ কথা স্মরণ করাইয়া দিলে আশা করি, তাঁহারা ক্রোধান্বিত হইবেন না।

সংবাদপত্র জগতের সর্ব্বত্রই অতিরঞ্জনপ্রিয়, এইরূপ একটা কিম্বদন্তী আছে। কিন্তু একথা বলা প্রয়োজন, গুরুতর প্রশ্নসমূহে সত্যের উপর আস্থা না থাকিলে সংবাদপত্র গুলি, জাতীয় কলঙ্করূপে দাঁড়ায়। অবশ্য সব সময় সকল কথা একেবারে নিখুঁত ভাবে প্রকাশ করা সহজসাধ্য হয় না। কিন্তু সত্যের প্রতি যদি একাগ্রতা এবং নিষ্ঠা থাকে, এবং সত্য পথে অগ্রসর হইবার যদি একটা তীক্ষ্ণ প্রবৃত্তি থাকে, তবে সত্য পথ হইতে বহুদূরে যাওয়া সম্ভব নহে। কিছুকাল হইতে এই সত্যপ্রাপ্তির অভাবে এই বাঙ্গালা দেশের সংবাদ পত্রগুলি জাতির পক্ষে লজ্জাজনক হইয়া উঠিয়াছিল। কংগ্রেসের বিখ্যাত বক্তৃতাগুলির রিপোর্ট দৈনিক পত্রিকাসমূহে কত বিভিন্ন ভাবে বাহির হইয়াছে, আলোচনা করিলে দেখা যাইবে। অন্যান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এই ব্যাপারেও ইউরোপীয় আদর্শের প্রাধান্য দেখা যাইতেছে, সনাতন বিশ্বের সভ্যতাজননী এসিয়ার সভ্যতার নহে।

বাঙ্গালার সংবাদপত্রের একটা গৌরবের কথাও বলা প্রয়োজন। ইহার সাহস পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে, রাজদ্বারে অভিযোগ-ভীতি বহুপরিমাণে দূরে গিয়াছে। চিরকাল সংবাদপত্রের এই সাহস থাকা প্রয়োজন, ইহাই দেশের আশার কথা।

পরিশেষে একটা প্রস্তাব করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের বার্ষিক কি ত্রৈবার্ষিক কোন সম্মিলন বা কন্‌ফারেন্স্‌ সম্ভব কি? ইহাতে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা আছে। এক-মতাবলম্বী সংবাদপত্রগুলির মধ্যে কোন বন্ধন সম্ভব কি? একটা যৌথ কোম্পানী হইতে বাঙ্গালার প্রধান উপনগরগুলি ও কলিকাতা হইতে আট দশ খানি অভিন্নমতাবলম্বী কাগজ বাহির করা অসম্ভব কি? এই কেন্‌ষ্টিটিউসনের মাঝে সম্পাদকগণ মাঝে মাঝে স্থানান্তরিত হইতে পারেন। এক স্থানে বহু বৎসর একজন থাকিলে নানা দুর্ব্বলতা ও দলাদলির জালে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা, এই জন্য হুগলীর সম্পাদক মেদিনীপুরে, কি মেদিনীপুরের সম্পাদক চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হইলে কার্য্যক্রম সুস্থ হয়। ইহাঁদের গঠিত কোন কেন্দ্রসমিতির হাতে এইরূপ পরিবর্ত্তন করা প্রভৃতির ভার দেওয়া যাইতে পারে।

Cut and dried scheme দেওয়া নিষ্ফল। কার্য্যের ভিতর দিয়াই নানা সুবিধা অসুবিধা, কণ্ঠক-বিঘ্নের ভিতর দিয়া আপনা আপনি স্বাভাবিক ভাবে কার্য্যক্রম বিকশিত হইয়া উঠে, নচেৎ মাপকাটি দ্বারা নির্ম্মিত নিখুঁত প্ল্যানও হাস্যজনক। প্রাণী-শরীরের ন্যায় যে কোন স্থায়ী কার্য্যের উৎপত্তি, গতি ও বিস্তৃতি স্বাভাবিক ভাবে মুখরিত হইয়া উঠে। বাঙ্গালা দেশে অনেক স্কিম্‌ বাহির হইয়াছে, কিন্তু বাহির হইতে তৈয়ারী করা ফুল ও ফল কোন পল্লীবৃক্ষে সংলগ্ন করিয়া দিলেই অমনি উহা প্রস্ফুটিত ও পক্ক হইয়া উঠিবে না—স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক স্থানের মৃত্তিকা হইতে রসগ্রহণ না করিলে চলিবে না—এ সহজ কথা যেন আমরা না ভুলি।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী।

কিছুকাল হইতে ভারতীয় রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে দুইটী বিভিন্ন দলের অবতারণা হইয়াছে। একটীর অনুচরবর্গকে moderates বা মধ্যমপন্থানুবর্ত্তী ও অপর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তকে সাধারণতঃ extremists বা চরমনীতি-বাদী আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। এই দুই রাজনৈতিক দলের গুণাগুণ বা বিভিন্নতা যাহাই হউক, উভয়েই জাতির হৃদ্‌গত গভীর আলোড়ন ও অনুপ্রাণনের অভিব্যক্তি, উভয়ই দেশের অস্বাভাবিক অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল; উভয়ই জাতীয় ক্রমবিকাশের দুইটী ভিন্ন প্রতিচ্ছবি। এইরূপ বিভিন্ন ও বিসংবাদী শ্রেণী-বিভাগ সকল যুগের সকল অবস্থাতেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রভিন্নতাযুক্ত দল বা আয়োজন, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্বরূপ ও বিভিন্ন মুখীন আভ্যন্তরীন বিকাশসূচক পরিবর্ত্তনের বাহ্যিক নিদর্শন মাত্র। সুতরাং আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে এইরূপ দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতির অনুষ্ঠান দেখিয়া যাঁহারা রোষ, ক্ষোভ ও বিস্ময় পরবশ হইয়া, এইরূপ অনুষ্ঠানকে নিন্দা ও সেই কারণে আমাদের জাতীয়-জীবন-লক্ষণগুলিকে মুমূর্ষু দশাগ্রস্ত রোগীর ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের ন্যায় জ্ঞান করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিব যে, হয় তাঁহাদের অভিমত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বা অর্ব্বাচীনতাজ্ঞাপক, না হয় তাঁহাদের উক্তি বিশুদ্ধবিদ্বেষদুষ্ট, সুতরাং ঘৃণায় পরিবর্জ্জনীয়। চিন্তা ও মতের বিভিন্নতা ও বিরোধ চিরকালই মানব জীবনের একটী স্বাভাবিক ও অবশ্য-বিশেষত্ব। এই জন্য শুধু নৈতিক বিষয়ে কেন, সাহিত্য রাজ্যে, দর্শনশাস্ত্রে, বিজ্ঞানালোচনায়, ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে, মানব জীবনের সকল বিভাগে ও সকল কার্য্যেই বিভিন্নরূপ গবেষণা, সিদ্ধান্ত ও মতের প্রভাব আবহমান কাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। সুতরাং আমাদের জাতীয় রাজনীতি বিষয়ে বিভিন্নরূপ চিন্তা ও মতের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? "টাইমস্", "পাইওনিয়ার" প্রমুখ ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্‌গণ অতিশয় নৈপুণ্য সহকারে নানা সুরে গাহিতে আরম্ভ করিয়াছেন :—

"মডারেটস্ আর এক্‌ষ্ট্রীমিষ্টস্ এই যে দুই দল,
ভেঙ্গে চুরে দেবে তোদের পলিটিকস্ সকল।"

এবং দয়া ও সহানুভূতি পরবশ হইয়া এই আশ্বাসপূর্ণ উপদেশে বাক্যে ক্লিষ্ট ও বিক্ষিপ্ত ভারতীয় ভ্রাতাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন :—

"আন্দোলন আস্ফালনে নাহি কিছু ফল,
পেটার্ণাল গবর্ণমেণ্টকে কর্‌রে সম্বল।"

আরও পরিতাপ ও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অনেক জ্ঞানবান ও বুদ্ধিসম্পন্ন ভারতবাসী ও ভারতবন্ধুর মুখস-পরিহিত এই প্রবঞ্চকদের মোহে দিক্‌হারা হইয়া, কখন কখন, প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে, সোৎসাহে নৈরাশ্য ও কুৎসার প্রহসন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, আমাদের এই রাজনৈতিক আন্দোলনে দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতির দলের সৃষ্টি দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইবার কোনও কারণ নাই, বরং আনন্দিত

ও উৎসাহিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই জানেন যে, মানবের জ্ঞানানুশীলনের অসংখ্য বিভাগে ও জগতের অশেষবিধ কর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন অভিমত, বিভিন্ন চিন্তা, বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, বিভিন্ন উপায়, বিভিন্ন প্রণালী উদ্ভাবিত ও প্রচারিত হওয়ায় জ্ঞান-রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়ীভূত ও পরিধি-বিস্তৃত হইয়াছে এবং কর্ম্মজগতের অশেষবিধ সমস্যা সহজ-সাধ্য হইয়াছে। বিজ্ঞান রাজ্যে নানারূপ বিরোধী মতের অবতারণা হইয়াছে,দর্শনশাস্ত্রে অগণ্য প্রকার সমস্যা ও প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, ধর্ম্মজগতেও নানা প্রকার যুক্তি-সম্পন্ন নানা মুনির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; কিন্তু এই সকল কারণে বিজ্ঞানালোচনা, দর্শন শাস্ত্রাধ্যায়ন বা ধর্ম্ম-সমস্যা সমাধানের কোনও রূপ ব্যাঘাত না হইয়া, বরং নানা রূপ গবেষণা, যুক্তি ও সিদ্ধান্তের ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাতে প্রত্যেকটীরই কাঠিন্য দূর ও মীমাংসাকরণ সহজ ও সম্ভব হইয়াছে। বিজ্ঞান বিষয়ে নানা মতের (theory) অবতারণা হইয়াছিল বলিয়াই, ঐ সকল বিরোধী মতেরই নানা ভাবে বিশ্লেষণ, সংয়োগ ও বিযোগ দ্বারা বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিৎ আধুনিক মত ও প্রণালী (the most modern principles and methods) আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আস্ফালন করেন; দর্শন শাস্ত্রে নানা মতাবলম্বী চিন্তামার্গের অভ্যুদয় হইয়াছিল বলিয়াই ঐ সকল চিন্তা ও মীমাংসার সারাংশ গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান দার্শনিক সগর্ব্বে বলিতেছেন যে, তিনি সব চেয়ে সুযুক্তিপূর্ণ দার্শনিক প্রথা (the most rational system of philosopy) অবলম্বন করিতে পারিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ্যেও নানা মতাবলম্বী মুনির আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়াই ঐ সকল জ্ঞানিগণের চিন্তা-প্রসূত ধর্ম্মশাস্ত্রের সাহায্যেই এত শীঘ্র বর্ত্তমান ধর্ম্ম-ইতিহাসালোচক সমালোচনা-সিদ্ধ ধর্ম্মের(comparative religion) আশাপ্রদ সংবাদ সত্যজগতে প্রচার করিতে পারিয়াছেন। রাজনৈতিক বিভাগেও, বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন রূপ চিন্তা, গবেষণা ও প্রস্তাবের সাহায্যে, মানবীয় অন্যান্য চিন্তনীয় বিষয়ের ন্যায়, রাজনৈতিক সমস্যাবলীরও সহজ-মীমাংসা হইবে। তবে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম ও নীতি প্রভৃতি বিষয়ে যেমন জগতের জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিসংবাদী চিন্তামার্গ তিরোহিত হইয়া নূতন মার্গ ও প্রণালীর জন্ম হইয়াছে,তেমনি, রাজনৈতিক বিভাগেও কালের পরিপক্কতা ও মানবের জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাগরিত উন্নতির অপরিহার্য্য নিয়মানুসারে,অনেকগুলি বিরোধী রাজনৈতিক শ্রেণী তিরোহিত হইয়া অতি অল্পসংখ্যক বা একটী সুদৃঢ়, সুসংস্কৃত, সুবিস্তৃত রাজনৈতিক আয়োজনের (political institution or orgnisation) সৃষ্টি হইবে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত এরূপ একীভূততা (integration or unification) আমাদের রাজনৈতিক বিষয়ে সংসাধিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত শুধু বিভিন্নতা দেখিয়া ভীত বা ভাবিত হইবার কোন কারণ নাই। আপাততঃ যাহা কিছু ভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন বা বিরোধভাব-যুক্ত, তাহা তাহাদেরই সাহায্যে পরিবর্ত্তিত, পরিশোধিত ও পরিশেষে একীভূত হইয়া যাইবে, কেননা জগতের গতিই মিলন ও একীভূতত্বের দিকে। (The law of unification or integration is sown already in the lawn of Disintegration) বিশ্বাস কর, আমাদের সংবিরোধী রাজনৈতিক-ক্ষেত্রেও এই সার্ব্বভৌমিক নিয়ম

(universal law) কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে আমাদের ন্যায় সংসৃষ্ট (concerned) লোকের কর্ত্তব্য, যাহাতে আমরা ঐরূপ বিভিন্ন মত ও প্রণালী অবলম্বন করিয়াও এবং আমাদের স্বভাবজাত ন্যায় ও সত্য বুদ্ধিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া, জাগতিক ব্যাপারের অবিরাম ও অপ্রতিহত সংঘর্ষে উদ্রিক্ত নূতন তত্ত্বালোকের ক্ষীণ কিরণরাশি অবলোকন করি এবং সেই নবালোকোদ্ভাসিত পথ বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করিয়া আমাদের অন্তরগুরুর মহদাদেশ পালন করি। এস্থলে রাজনৈতিকদলের অনপকারিতা সম্বন্ধে এমন একজন প্রসিদ্ধ ও চিন্তাশীল ব্যক্তির কতকগুলি উক্তি উদ্ধার করিব, যিনি কোনও প্রকার রাজনৈতিকদলের সহিতই সংসৃষ্ট ছিলেন না, অথচ যাঁহার গভীর গবেষণাপূর্ণ উক্তি, অভিমত ও সিদ্ধান্ত অনেক বিষয়ে সভ্যজগতের অনেকস্থলেই বেদবাক্যের ন্যায় পূজিত হইয়া থাকে। তিনি বলেন :—

"Parties are also founded on instincts, and have better guides to their own humble aims than the sagacity of their leaders. They have nothing perverse in their origin, but rudely mark some real and lasting relation. We might as well wisely reprove the east wind, or the frost, as a political party, whose members, for the most part, could give no account of their position, but stand for the defence of those interests in which they find themselves." [Emerson.]

যাহা হউক, এক্ষণে এই সকল দার্শনিক-পর্য্যালোচনা ছাড়িয়া আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের মূল বিষয়গুলির বিচারে প্রবৃত্ত হই। অধুনা আমাদের দেশে প্রধানতঃ যে দুইটী রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থানে আমাদের দেশে ও বিদেশে নানা জাতীয় লোকের মধ্যে নরম ও গরম সমালোচনা (favourable and adverse criticism) চলিয়াছে, তাহার প্রকৃতি, কার্য্যপ্রণালী, উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছে। মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী উভয়েরই উদ্দেশ্য মূলতঃ ও স্থূলতঃ এক—স্বদেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করা। উভয় দলই চাহেন, দেশের বর্ত্তমান দুঃখ দুর্গতি অপনোদন করিয়া ইহার পূর্ব্বতন গৌরবশ্রী পুনরুদ্ধার করিতে। উভয়েই চাহেন, ভারতের লুপ্তশিল্পের পুনরুদ্ধার হউক, উভয়েই চাহেন, ভারতের পূর্ব্ববাণিজ্য-গৌরব ফিরিয়া আসুক; উভয়েই চাহেন, ভারতের অর্থে ভারতের প্রজাবৃন্দ সুখে, স্বচ্ছন্দতায় ও শ্রী-বৃদ্ধিতে প্রতিপালিত হউক; উভয়েই চাহেন, ভারতের সন্তান জাতীয় প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়া জাতীয় অভাব অসম্পূর্ণতা দূর করিবার জন্য ও জাতীয় কর্ত্তব্য সম্যক্‌রূপে পালন করিবার জন্য উপযোগী হউক; উভয়েই চাহেন, ভারতের রাজ্যশাসন ভার প্রধানতঃ (বা সম্ভব হইলে সম্পূর্ণতঃ) ভারতীয়ের হস্তে ন্যস্ত হউক। এই সকল মূল বিষয়ে উভয় দলের মধ্যে বিশেষ কোনও রূপ বিরোধ নাই বা থাকা উচিত নয়। কিন্তু তাঁহাদের রাজনৈতিকপ্রণালী সম্বন্ধে কোনও কোনও বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে গুরুতর মতগত ও কার্য্যগত প্রভেদ (theoretical and practical differences) আছে। যাঁহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে (বোধ হয় শুধু পুরাতনত্ব ও সনাতনত্বেরই গুণে) সাধারণতঃ পুরাতন ভাব ও মত লইয়া এবং পুরাতন প্রথা ও প্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন (অর্থাৎ যাঁহাদিগকে সাধারণতঃ মধ্যপন্থী, ধীরপন্থী বা moderates নামে অভিহিত করা হয়),

তাঁহারা বলেন:—আমরা স্বাধীনতা লাভের জন্য, দেশকে উন্নত করার জন্য যথাসম্ভব আমাদিগের শাসকবর্গেরই অনুকম্পা ও সাহায্যাপেক্ষী হইয়া চলিব এবং আমাদের দুঃখ দুর্গতির কথা তাঁহাদিগের সমীপে নিবেদন করিয়া তাঁহাদের দয়া ও সহানুভূতির উদ্রেক করিব। কিন্তু যাঁহারা নূতন রাজনৈতিক আদর্শাবলম্বী ও নূতন পন্থানুসারী (অর্থাৎ, যাঁহাদিগকে সাধারণতঃ চরমপন্থী বা extremists নামে বরণ করা হয়,) তাঁহাদের মত অন্যরূপ, তাঁহারা বলেন:—অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর হইতে আমরা আমাদের রাজকীয় প্রভুদের নিকট নানাভাবে আবেদন ও নিবেদন করিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাহাতে আমাদের দুঃখ ও দৈন্যের বড় কিছু উপশম হয় নাই; তাহা ছাড়া, সর্ব্ববিষয়ে আমাদের শাসয়িতাদিগের গলগ্রহ হইয়া পড়ায়, আমরা ক্রমশঃ শক্তিহীন, উদ্যমহীন ও সাহসহীন হইয়া পড়িতেছি। এক্ষণে আমাদিগকে আমাদেরই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে আরম্ভ করিতে হইবে এবং আমাদের জাতীয় দুঃখদুর্গতি দূর করিতে আমাদেরই নিজশক্তি, নিজবুদ্ধি, নিজ গবেষণা নিয়োগ করিতে হইবে। প্রত্যেক জাতির নিয়তি, শত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও, প্রধানতঃ নিজ শক্তি, জ্ঞান ও চেষ্টার সমীচীন প্রয়োগের উপর নির্ভর করে—ইহা ইতিহাস-প্রমাণিত চিরন্তন সত্য। পৃথিবীর সকল জাতির উত্থান ও উন্নতি এই নিয়ম অনুসারেই সংসাধিত হইয়াছে এবং প্রবল শক্তি-সম্পন্ন আর্য্যজাতির বংশধর ভারতীয়ের বর্ত্তমান বাসভূমে এই মহানিয়মের ব্যত্যয় ঘটিবে—একথা বলিবার বোধ হয় এখনও উপযুক্ত সময় ও কারণ আসে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই দুই পৃথকদলের সৃষ্টির জন্য দুঃখ করিবার কিছুই নাই, কেননা, এরূপ পার্থক্য ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ক্রম-বিভাগের একটা নিদর্শন মাত্র। প্রত্যেক জাতির জীবনক্ষেত্রে এইরূপ পার্থক্যের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ পার্থক্যের বর্ত্তমানতা অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মানবজীবন ও মানবজীবনের ইতিহাস এত বৈচিত্র্যযুক্ত ও জটিলতাপূর্ণ। তারপর, বৈবর্ত্তনিক যুক্তি ছাড়িয়া দিয়াও, আমাদের দেশের এই দুই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি ও স্থায়িত্ব অন্য ভাবেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সকলেই জানেন, স্থিতিশীলতার প্রতি মানবের একটা যেন স্বাভাবিক আসক্তি আছে। (conservatism is an undeniable fact of human nature). সেই জন্য প্রত্যেক জাতির জীবনের প্রত্যেক বিভাগে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরিবর্ত্তনরূপ মহানিয়মের কার্য্যকারিতার সঙ্গে সঙ্গেই স্থিতিশীলতার দিকেও একটা প্রবল অনুরক্তি ও গতি রহিয়াছে। সেইজন্যই মানবসমাজের সংস্কার কার্য্য যত সহজ মনে করা যায়, বাস্তবিক কার্য্যতঃ তত সহজে সংসাধিত হয় না। যাহা ছিল এবং যাহা চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই সঙ্গত ও সমীচীন, একথা মানুষ যত জোরে ও যতবার বলে, আর কোনও বিষয়েই সেরূপ বলে না। ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে দেখুন, এই রক্ষণশীলতার প্রভাব কিরূপ প্রবল। আজ এই বিংশ শতাব্দীর নবালোকোদ্ভাসিত যুগেও অনেক খ্রীষ্টশিষ্য অনন্ত নরকের মহিমা প্রচার করিতে বিরত হইতেছেন না; অনেক আর্য্যনামদৃপ্ত কৃতবিদ্য ভারত-সন্তানও জাতিভেদ ও বাল্য-বিবাহ বাক্যে ও কার্য্যে প্রকাণ্ড সমর্থন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। সেদিন

বিলাতপ্রত্যাগত বেহারের সুসন্তান শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর লালের প্রতি অনেক সম্ভ্রান্ত-বেহারীর কঠোরাচরণ বিষয়ে সমালোচনা করিতে যাইয়া শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বেঙ্গলী" পত্রে প্রসঙ্গ ক্রমে লিখিয়াছিলেন যে, আমাদের ধর্ম্মটা আমাদের সাময়িক প্রয়োজনীয়তানুসারে পুনর্গঠিত হওয়া উচিত। এই কথা গুলি শুনিয়া বেহারের একজন সম্ভ্রান্ত ও ধর্ম্মকাতর ভূম্যধিকারী নিতান্ত দুঃখিত হইয়া প্রত্যুত্তরে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন :— কি দুঃখের কথা, আমাদিগের হিন্দুধর্ম্মের মত সনাতন-ধর্ম্মেরও কি পরিবর্ত্তন দরকার! রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে ও (বিশেষ ভাবে ইংলণ্ডের ন্যায় এক-নায়কত্বপ্রধান রাজ্যে) এই ব্যাপার। প্রজাসাধারণের উন্নতি ও সুখকল্পে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক অভিনেতাদিগকে যে কিরূপ পরিশ্রম স্বীকার, উৎপীড়ন সহ্য ও সময় ব্যয় করিতে হইয়াছে, তাহা ইতিহাসাভিজ্ঞ সকল ব্যক্তিই অবগত আছেন। তবে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনের গতিরোধকারী শক্তি শুধু মানবের স্বাভাবিক স্থিতিশীলতাই নয়; অনেক সময় ইহার সহিত আরও দুই একটী ব্যাপার প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে জড়িত থাকে এবং কখনও বা স্থিতিশীলতার কারণীভূত হইয়া থাকে। সেগুলি (১) স্বার্থ-বিনাশের ভয়, (২) মান বা ইজ্জৎ সংরক্ষণের আত্যন্তিক ইচ্ছা। আমাদের সমাজে যে ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা অনেক অতি প্রয়োজনীয় সংস্কারেরও বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন, তাহার মূলে অধিকাংশস্থলেই এই দুইটী কারণ প্রধানতঃ বর্ত্তমান থাকে। গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তন-বিমুখতা ও সংস্কারোপেক্ষার মিয়েও অনেক সময় এই দুইটী কারণ বর্ত্তমান থাকে। শাসয়িতাদিগের মধ্যে অনেকেরই বোধ হয় এই ধারণা যে, শাসিতদিগের প্রার্থনানুযায়ী রাজকীয় শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে গেলে হয়তো তাহাদের আবেদন ও দাবীর সংখ্যা এত বাড়িবে যে, প্রজানুকূল হইতে গেলে হয়তো পরিশেষে গবর্ণমেণ্টের কিছু গুরুতর ক্ষতি ঘটিবে। তার সঙ্গে আর একটী কারণ সম্বন্ধে তো বর্ত্তমান রাজনৈতিক ইতিহাস-পাঠকের কোনও রূপ সন্দেহই থাকিতে পারে না, কেননা, আমরা জানি যে আমাদের কর্ত্তৃপক্ষেরা ইজ্জতের (prestige) দোহাই দিয়া দুই একটী গুরুতর ভ্রান্তিমূলক কার্য্যেরও পোষকতা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অনেক পাঠক হয়তো একটু রুষ্ট হইবেন, কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতে হয় যে, আমাদের দেশের মধ্যপন্থীদিগকে (moderates) কতকপরিমাণে স্থিতিশীল (conservatives) বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; কতক পরিমাণে বলিতেছি এইজন্য যে, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে মধ্যপন্থী নাম লইয়া এবং ঐ দলের মধ্যে থাকিয়াও বাক্যতঃ এবং কার্য্যতঃ অপর দলের নীতি এবং কার্য্য-প্রণালীর সহিত এক-মত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। এই মধ্যপন্থীদিগের অনেকেরই ধারণা, আমরা পূর্ব্ব হইতে যে পথ অনুসরণ করিয়া আসিতেছি, সে পথ অনেকদিনের বলিয়াই শ্রেয়ঃ ও অনুসরণীয়, এবং সাধারণ স্থিতিশীলতা-বাদীদিগের ন্যায় তাঁহারা উহার বিরুদ্ধে কোনও রূপ নূতন-যুক্তি শুনিতে অনিচ্ছুক। ইহা ছাড়া বোধ হয় উপরোক্ত কারণ দুইটীও তাঁহাদের মধ্যে অনেকের স্থিতিশীলতা বা মন্থরগামিতার হেতু হইতে পারে। কেননা, অনেকেরই এরূপ

ধারণা হওয়া সম্ভব যে, হয়তো তাঁহাদের ক্ষিপ্রগামিতা ও রাজকীয় কার্য্যের ব্যক্ত প্রতিবাদে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ হারাইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত ভক্ত বন্ধুবর্গের নিকটও পসার হারাইবেন।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আজকাল এই রাজনৈতিক-দলেরই গবর্ণমেণ্টের নিকট কিছু (যদিও খুব সামান্য) আদর ও প্রতিপত্তি আছে এবং ভবিষ্যতেও কিছু থাকিবে। কিন্তু আমাদের দেশোদ্ধার-কার্য্যে নিযুক্ত মহারথীদের যোগ্যতা কি শুধুই বা প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্টের মনস্তুষ্টিরই উপর নির্ভর করিবে? এরূপ কার্য্যে যৌক্তিকতা, সময়োপযোগীতা, ইতিহাস-সাপেক্ষ্যতা ও ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রেরণার স্থান কি উচ্চতর ও মহত্তর বলিয়া বিবেচিত হইবে না? কোন্ দেশে কোন্ সময়ে রাজনৈতিক কার্য্য শুধু বা প্রধানতঃ কর্ত্তৃপক্ষের মনরক্ষা করিয়া সম্পাদিত হইয়াছে? আমি বলিতেছি না যে, শুধু শুধু গবর্ণমেণ্টের আক্রোশভাজন হওয়াটা আমাদের উদ্দেশ্য-সাধনপক্ষে বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয় বা উপযোগী। বরঞ্চ আমার মতে, যতদূর সম্ভব, গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন না হইয়া কার্য্য করিতে পারিলেই ভাল। তবে গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন না হওয়াটা যদি আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আমাদের রাজনৈতিক কার্য্য কখনই সুচারুরূপে ও প্রকৃতভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না এবং ক্রমশঃ উহা শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে একেবারে বিলুপ্ত হইবে। হে স্বদেশ-সেবক, তুমি মুখ ফুটিয়া বল আর না বল, তোমাকে মনে মনে স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের স্বদেশোদ্ধার যদি একটা মহৎ কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে সে কার্য্যে আমাদিগকে সমগ্র প্রাণের সহিত প্রবেশ করিতে হইবে, সে কার্য্যে স্বার্থ ও নীচ-ভয়-বিরত হইয়া যোগদান করিতে হইবে, সে কার্য্যে সকল প্রকার সঙ্গত ও সমীচীন উপায় নিয়োগ করিতে হইবে; অল্পকথায়, সে কার্য্যে উৎসাহ,অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগের চরমসীমায় উপস্থিত হইতে হইবে। বড় দুঃখের বিষয় যে, এই রাজনৈতিক-দলকে অযৌক্তিক, ক্রূরনীতি-পরায়ণ, দুষ্টপ্রকৃতি ইত্যাদি আখ্যা দিয়া গবর্ণমেণ্ট ও অপর দলান্তবর্ত্তী গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত শুভানুধ্যায়িগণ তাঁহাদের মূল্য ও মর্য্যাদা খর্ব্ব করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বযুগেই সাধারণ জীবনের কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রগামী ভীতিনিরপেক্ষ নব্য ও উন্নতভাবাপন্ন দলকেই এইরূপ অপবাদ ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে, ইতিহাস সে বিষয়ে ভূরি ভূরি সাক্ষ্য প্রদান করিবে এবং ভারতীয় রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে যে এই নব্যভাব ও প্রণালী-অবলম্বী আশুপরিবর্ত্তন-প্রয়াসী দলটীকেও এই দশায় পড়িতে হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। এই নব্য রাজনৈতিক দলের অভিনির্দ্দিষ্ট কার্য্য প্রণালীর (programme) কোনও রূপ অযৌক্তিকতার চিহ্ন আমরা তো এ পর্য্যন্ত আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের দ্বারা খুজিয়া পাই নাই। কেননা, আমরা জানি যে কোনও একটা নিয়ম বা প্রণালীর প্রণয়ন বা প্রয়োগ কোনও একটী বিশেষরূপ অবস্থানিচয়ের সহিত জড়িত। একটা উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে; এক প্রকার অবস্থাবলীর বর্ত্তমানতায় একটা বিশেষ উপায় বা প্রণালীর ভিতর দিয়া যাইতে হইবে; এবং অবস্থাবিপর্য্যয়ে একই উদ্দেশ্য সাধনার্থে অন্য একটা উপায় বা প্রণালীর

অবলম্বন বিধেয়। একজন কোনও একটী বিশেষ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে; চিকিৎসকের উদ্দেশ্য এক—রোগীর রোগ সারান; কিন্তু রোগীর শারীরিক অবস্থা বিশেষে অনেক প্রকারের চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়া থাকে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের অভিনেতাগণ একটা বিশেষ প্রকার রাজনৈতিক কার্য্য প্রণালী উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিয়াছিলেন; তখন হয়তো আমাদের রাজনৈতিক চিকিৎসকগণ ভাবিয়াছিলেন যে, ঐরূপ উপসর্গ থাকায় ঐরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থাই সমাচীন। কিন্তু যদি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, ঐরূপ ব্যবস্থায় দেশরূপ রোগীর উপসর্গগুলির বিশেষ কোনও আশাপ্রদ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, এবং রোগীর দেহে শক্তি ও সুস্থতার চিহ্ন বড় একটা পরিলক্ষিত হয় নাই; তাহা হইলে কি সুচিকিৎসকের একটা অনুসন্ধিৎসা ও প্রয়োগফলজ্ঞানেচ্ছার (curiosity and experimentation) খাতিরেও একটা নূতন ব্যবস্থার আয়োজন করা উচিত নয়? আমাদের দেশে যে রাজনৈতিকদলটীকে চরমপন্থী বলা হয়, তাঁহারা বিশ বৎসর পর্য্যন্ত একই কার্য্যপ্রণালীর বিশেষ কোনও রূপই কৃতকার্য্যতা না দেখিতে পাইয়াই অন্য প্রণালী অবলম্বন করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন, এবং দেশের সকলেরই কর্ত্তব্য, ইঁহাদের এই নবোদ্ভাবিত প্রণালীর কার্য্যকারিতা ও সমীচীনতা পরীক্ষার জন্য ধীরভাবে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া দেখেন; নতুবা যদি আমরা শুধু এই প্রণালীর নূতনতা ও বিভিন্নতা দেখিয়াই ইহার ফল ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হই, তাহা হইলে ইহা অন্ধতা, অনুদারতা ও অর্ব্বাচীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দলের সপক্ষে সর্ব্বপ্রধান যুক্তি এই যে, ইহাদের কার্য্যপ্রণালী মানবের সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সমগ্র মানব ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত। যে স্বাবলম্বন-নীতি ইঁহাদের কার্য্যাবলীর ভিত্তি ও বিশেষত্ব, তাহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বযুগেই স্বদেশোদ্ধার-কার্য্য-নেতাদিগের প্রধান যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাঁহাদের অভীপ্সিত সুফল আনয়ন করিয়াছে। বিশেষভাবে এই বর্ত্তমান যুগে সভ্যজগতের চারিদিক হইতেই জৈবনিক সকল প্রকার কার্য্যেই স্বাবলম্বনের উপযোগিতা সুস্পষ্টস্বরে প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। মার্কিন ঋষি মহাত্মা ইমার্সন বলেন,—

"It is only as a man puts off all foreign support, and stands alone, that I see him to be strong and to prevail * * * A who knows that power is inborn, that he is weak because he has looked for good out of him and elsewhere, and so perceiving throws himself unhesitatingly on his thought, instantly rights himself, stands in the erect position, commands his limbs, works miracles, just as a man who stands on his feet is stronger than a man who stands on his head."

শুধু ব্যক্তি জীবনের নয়, জাতীয় জীবনেরও সর্ব্ববিভাগে ইহার আবশ্যকতা এক্ষণে সুস্পষ্টরূপে স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজ যে আমাদের জাতীয় জীবনের অনেক দিকে সজীবতা ও সুশৃঙ্খলতার অনেক চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহা কেবল এই স্বাবলম্বন প্রণালী কতক পরিমাণে অনুসরণ করার ফল এবং এই স্বাবলম্বনীতি যে পরিমাণে অনুসৃত ও বিস্তৃত হইবে, সেই পরিমাণে আমাদের জাতীয় জীবন সুশ্রী, সবল ও সুগঠিত

হইবে। একথা আজকাল আমাদের মধ্যে প্রায় সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহাদের এই নূতন প্রণালী অবলম্বন করার প্রধান হেতু এই যে, আমাদের পুরাতন রাজনৈতিক প্রণালীগুলির উপযোগীতা ও কার্য্যকারিতা আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। এই যুক্তির সত্যতা আমরা পূর্ব্বে উপলব্ধি করিয়া থাকি আর নাই থাকি, বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির পর হইতে আমরা উহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি। বরিশালে যখন আমাদের সম্ভ্রান্ত রাজনৈতিক নেতাদিগের প্রতি বৃটিশ-বর্ব্বরের অমানুষিক অত্যাচার হয়, তখন অনেক ধীরপন্থিকেই এই মর্ম্মান্তিক অভিবেদন জ্ঞাপন করিতে হইয়াছিল--"There is no responsible Government in the land"। তারপর দেশে যত কিছু শাসন-ও-শাসিত-সম্পর্কিত আন্দোলনসূচক ব্যাপার ঘটিয়াছে, ব্যবস্থাপক-সভায় যে সকল নির্দ্ধারণ স্থিরীকৃত হইয়াছে, ভারত-সচিবের দপ্তর হইতে যে সব মন্তব্য ও আদেশ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেক ব্যাপারেই আমাদের পূর্ব্বতন রাজনৈতিক প্রণালীর নিষ্ফলতা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-প্রাণতা ও সত্যানুগামিতার দৃষ্টান্তও এই দলভুক্ত লোকের কার্য্য ও আচরণেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কেননা, চতুর্দ্দিকের বিপদ ও বাধা সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাদের পবিত্র ও কঠিন ব্রত অসীম সাহস ও উদ্যমের সহিত সম্পন্ন করিতেছেন, ইহা গভীর ধর্ম্মভাব ও দৃঢ় সত্য পালনেচ্ছা ব্যতিরেকে কখনই সম্ভব হইতে পারে না। কর্ম্মবীর ভূপেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের ন্যায় অকৃত্রিম ধর্ম্মপরায়ণতা ও সত্যব্রতানুগামিতার জলন্ত উদাহরণ বর্ত্তমান যুগে অতি বিরল। এই নূতন দলের দিকে যৌক্তিকতা, মানব ইতিহাসের সাক্ষ্য, ধর্ম্মানুগামিতা ও ঐকান্তিকতা আছে বলিয়াই দেশে এই দলের প্রতি ক্রমশঃ লোকের আনুরক্তি ও সহানুভূতি বৃদ্ধি পাইতেছে; এবং গবর্ণমেণ্টও এই নূতন দলটাকে ক্ষীণ ও খর্ব্ব করিবার নানারূপ উপায় ও কৌশলচিন্তায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, কিন্তু বুঝিতেছেন না যে, সত্য ও ন্যায়ের বীজ একবার উপ্ত ও অঙ্কুরিত হইলে, তাহা কিছুতেই ধ্বংস পাইবার নয়। বলা বাহুল্য যে, আমরা চরমপন্থী বলিলে কলহ বিদ্বেষ ও উদ্ধত-পন্থী বুঝিনা। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, এই দলের মধ্যে কেহ কেহ অযথা বিবাদ ও বিসম্বাদ দোষে অভিযুক্ত হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের ভাব ও আচরণের দ্বারা তাঁহাদের কার্য্য ও প্রণালীর প্রতি অনেকেরই অসন্তোষ এবং অপবাদের উদ্রেক করিয়াছেন; কিন্তু এস্থলে বক্তব্য এই যে, এসব ব্যাপার তাঁহাদেব মত, কার্য্যপ্রণালী এবং উক্তির অন্তর্ভূত নয়। এজন্য চরমপন্থীদলের লোকেরাও যেরূপ দোষী, মধ্যপন্থীদলের লোকেরাও সেরূপ দোষী, কেননা, এরূপ ব্যাপার উভয় দলেই ঘটিয়াছে; এবং জাতীয় একটা আন্দোলন ও বিপ্লবের সময় এরূপ আতিশয্য, অসঙ্গতি ও উগ্রতা স্বাভাবিক।

পক্ষান্তরে, ইহাও বলিতে হইবে যে, মধ্যপন্থিদলের মধ্যেও অনেক লোক আছেন, যাঁহারা স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণকামী ও স্বদেশোদ্ধার কার্য্যে নীরবে যথেষ্ট সময় ও শক্তি ব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন; যাঁহারা জানে, অকৃত্রিম-স্বদেশানুরাগে, স্বদেশের কল্যাণার্থ আত্মত্যাগে অনেক চরম-

পন্থীদের শীর্ষস্থানীয়। শুধু কোনও কোনও অবান্তর বিষয়ে মতভেদের জন্ত ইঁহাদিগকে অবহেলা করা চরমপন্থিদের কোনও ক্রমেই বিধেয় নয়। মধ্যপন্থিদিগের মধ্যে অনেকে যেমন চরমপন্থিদের কার্য্যপ্রণালীর শুধু নূতনত্ব দেখিয়াই ইঁহাদের প্রতি অনুদারতা প্রকাশ করেন, নূতন পন্থাবলম্বীদের মধ্যেও অনেকে আবার মধ্যপন্থী নাম শুনিয়াই রুষ্ট হইয়া বসেন এবং তাঁহাদিগকে দূরে রাখিবার জন্য সচেষ্ট হয়েন। দুঃখের বিষয়, ইঁহারা ভুলিয়া যান যে, আমাদের মধ্যে যাহা কিছু সত্য ও সঙ্গত, তাহা অন্তকে শিখাইবার জন্ত বিশেষভাবে প্রয়াস বা পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন হয় না। মহামতি ইমার্সন বলিয়াছেন :—That which we are, we shall teach not voluntarily, but involuntarily"। বলা বাহুল্য যে, উভয় দলের মধ্যে এরূপ অযথা বিসম্বাদ ও অসদ্ভাব, অকৃত্রিম ও ঐকান্তিক স্বদেশপ্রীতির অভাব জ্ঞাপক এবং এরূপ ভাবের বৃদ্ধি ও প্রসারে আমাদের এই ব্রতের মহত্ব ও পবিত্রতা ম্লান হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনগ্রন্থি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যাইবে এবং জাতীয় বিনাশ-সংঘটনের সম্ভাবনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। যদি বিপিন বাবুর মত অপরদলের গুণগ্রাহিতা চরমপন্থিদলে এবং গুরুদাস বাবুর মত উদারতা মধ্যপন্থিদলে একটু বিস্তারিত আকারে পরিলক্ষিত ও অনুকৃত হইত, তাহা হইলে, আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলন বাস্তবতা, শক্তিশীলতা ও ব্যাপকতায় অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইত।

বড় দুঃখের বিষয় যে, এই দুই দলের মধ্যে কয়েকটী বিষয়ে মতভেদ থাকায় আমাদের মধ্যে কতকগুলি অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়, জাতীয় মহাসমিতির বিনাশ। বহুকাল হইতে যে দেশে এই মহাসমিতি জাতীয় শক্তি ও জাতীয় অনুপ্রাণনা-লাভের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাহা শত্রুমিত্র সকলকেই কিছু পরিমাণে স্বীকার করিতে হইবে; ইহার উচ্ছেদ-সাধনে যে আমাদের কোনও প্রকার জাতীয় ক্ষতি হয় নাই বা হইবে না, তাহা এখনও বলিবার যো নাই। কংগ্রেসের মধ্যপন্থী পাণ্ডারা চরমপন্থিদের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া ও তাঁহাদের দাবী উপেক্ষা করিয়া জাতীয়-যজ্ঞে একছত্র প্রভুত্ব লাভ করিবার জন্ত একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন; অপরদিকে দুর্দ্দমনীয় চরমপন্থি-নেতারাও সর্ব্ব প্রকারের বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া জাতীয় রথের সারথিত্ব লাভ করিবার জন্য তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন; ইহারই ফলে জাতীয় যজ্ঞ পণ্ড হইল, অনেক অকপট স্বদেশ-সেবীর প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল এবং যে সকল উদারহৃদয় বিদেশীয়েরা কংগ্রেসের মধ্য দিয়া আমাদের জাতীয়-বিকাশ-ইতিহাস দেখিতেছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ে ঘোর বিষাদের ছায়া পড়িল। এইরূপ বাদ, বিসম্বাদ ও সংঘর্ষ অনেক সময়েই বিভিন্ন মত ও প্রণালী অনুসরণের অপরিহার্য্য ফল বটে এবং অনেক সময় উহাদ্বারা উভয় পক্ষীয়েরই চিন্তা ও ভাবপ্রণালী সুস্পষ্টতর এবং কার্য্য ও উদ্যমের প্রবাহ ক্ষিপ্রতর হইয়া থাকে বটে, * কিন্তু

* বিখ্যাত পণ্ডিত জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার এক খানি গ্রন্থে দুইটী রাজনৈতিক দলের আবশ্যকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—"In politics, again, it is almost a commonplace, that a party of order or stability, and a party of progress or reform, are both necessary elements of a healthy state of political life, until the one or the other shall have so enlarged its mental grasp as to be a par-

আমাদের মন প্রাণ যদি কেবল আত্মমত-সমর্থন ও বিরোধ বিসম্বাদ সমুত্থাপন কার্য্যেই নিযুক্ত ও পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে সহজেই আমাদের উদ্দেশ্য-বিস্মৃতি ও কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটিবে এবং আমাদের পরস্পরের কার্য্যে জাতীয় জীবনের শক্তির সমূহ ক্ষয় হইবে। আমাদের মতভেদ যাহাই হউক না কেন, আমাদের সকলকেই অতি গভীরভাবে প্রণিধান করিতে হইবে যে, আমাদের সকলেরই অবস্থা অতিশয় শঙ্কটাপন্ন এবং আমাদের সকলকেই এই ঘোর সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আপ্রাণ যত্ন করিতে হইবে। অন্যান্য বিষয়ে আমাদের যাহারই যাহা মত ও বিশ্বাস হউক না কেন, এই দুই প্রধান বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। সুতরাং নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয়ে আমাদের মত-বৈগুণ্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমাদের এই সাধারণ কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করিতে হইবে। আমাদের যেন স্মরণ থাকে, এ সময় অপ্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া বাদ বিসম্বাদ করিলে আমরা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইব। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া একটা গল্প মনে পড়িল। একবার একটী বৃহৎ নদীবক্ষে একটী নৌকাযোগে দুইটী ভিন্নস্থানের কয়েকজন অধিবাসী ভ্রমণ করিতেছিলেন। যাইতে যাইতে হঠাৎ দেখা গেল যে, নৌকার গাত্রে একটী ছিদ্র দিয়া খুব জল প্রবেশ করিতেছে এবং এই কারণে নৌকাখানি জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। নৌকার সকল আরোহীই সম্মুখীন বিপদ দেখিতে পাইলেন এবং নৌকার জলগুলি কিছু কিছু করিয়া বাহির করিয়া দিবার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিলেন। এমন সময়ে যাত্রীদের মধ্যে একজন একটু দর্পের সহিত বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহাদের দেশের লোকেরা যেমন বুদ্ধি ও বল সম্পন্ন, তেমন আর কেহই নয়। অপর দলের মধ্যে একজন লোক ইহাতে বিশেষরূপ আপত্তি প্রকাশ করিলেন এবং তিনিও খুব তেজের সহিত তাঁহাদের দেশের লোকের শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার মহত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রোৎসাহিত হইলেন। এইরূপে ক্রমশঃ দুই দলের মধ্যে তর্ক বিতর্ক খুব চলিতে লাগিল এবং অবশেষে দুই দলের মধ্যে তুমুল মারামারি বাধিয়া গেল। এদিকে নৌকার জলও ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল এবং পরিশেষে অল্পক্ষণের মধ্যেই নৌকা জলমগ্ন হওয়ায় সকলকেই প্রাণ হারাইতে হইল। আমাদের দেশের রাজনৈতিকদের অযথা বাক্‌বিতণ্ডা দেখিয়া মনে হয়, ইঁহারা যেন এইরূপে দেশের নৌকা না ডুবান। অসংখ্য প্রকার মতভেদ লইয়াও খ্রীষ্টীয়মণ্ডলীর অগণ্য শাখা প্রশাখা গুলি অনেক দেশহিতকর ব্যাপারে একযোগে দাঁড়াইতেছে ও কার্য্য করিতেছে; আর আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলি অতি সামান্য ও অবান্তর বিষয়ে ভিন্নমত লইয়া একই মহৎ উদ্দেশ্যসাধনার্থে একত্রও যুক্ত হইতে পারিবে না, ইহা অপেক্ষা অসঙ্গত ও অসম্ভব কথা কিছুই নাই। তাই বলি:—

ty equally of order and of progress, knowing and distinguishing what is fit to be preserved from what ought to be swept away. Each of these modes of thinking derive its utility from the deficiencies of the other; but it is in a great measure the opposition of the other that keeps each within the limits of reason and sanity. * * * Truth, in the great practical concerns of life, is so much a question of the reconciling and combining of opposites that very few have minds sufficiently capacious and impartial to make the adjustment with an approach to correctness and it has to be made by the rough progress of a struggle between combatants fighting under hostile banners."

ধীর-চরমপন্থী হও একপ্রাণ,
উভয়েরই তো এক জন্মস্থান,
উভয়েরই তো এক ভগবান,
উভয়েরই তো এক গম্যস্থান,
উভয়ে মিলিয়া হও আগুয়ান,
উভের হিতে উভে কর আত্মদান।

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

"পথ ও পাথেয়" এবং "সমস্যা।"

এই নামে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয় ভাষায় যে দুটী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহা *বঙ্গদর্শনে* প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধ দুটী পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াছি; "ধৈর্য্য" রক্ষণ করিয়া 'শ্রদ্ধার" সহিত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি নহেন, তিনি মনীষী; তাই তাঁহার রচনা আমি চিরদিনই শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া থাকি। বর্ত্তমান প্রবন্ধ দুটীও তদ্রূপই পড়িয়াছি; কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝিয়াছি কিনা বলিতে পারি না। যেরূপ বুঝিয়াছি, প্রথমতঃ তাহা বিবৃত করিব; পরে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। সমালোচনা করিবার স্পর্দ্ধা আমি রাখি না। ঐ প্রবন্ধ পাঠে মনে যাহা উদয় হইয়াছে,তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। তাহা হইতে যদি কোন সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার মীমাংসা তিনিই করিবেন, আমি করিব না।

আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাতে "পথ ও পাথেয়" সম্বন্ধে এই কয়েকটী বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

(১) "অন্য দেশে মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশ", ভারতবর্ষেই তাহার পূর্ণ বিকাশ হইবে।

(২) "আদি কাল হইতে জগতে যত গুলি বড় বড় শক্তির প্রবাহ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের সকলগুলিরই কোন না কোন বৃহৎ ধারা এই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।" হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, ন সকল শক্তিই এখানে মিলিত; ইহাদিগের মিলন হইতে ভবিষ্যতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হইবে।

(৩) ঐ সকল শক্তির "সমস্ত অনৈক্য ও সমস্ত বিরোধের" মধ্য হইতে "মুক্তির উদার নির্ম্মল জ্যোতি বিকীর্ণ" হইবে।

(৪) তাই ইংরাজ "গবর্ণমেণ্টের শাসন নীতি যে পন্থাই অবলম্বন করুক এবং ভারতবর্ষীয় ইংরাজের ব্যক্তিগত ব্যবহার আমাদের চিত্তকে যেমনি মথিত করিতে থাক্, আমাদের পক্ষে আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মহত্যা করা তাহার প্রতিকার নহে।" অর্থাৎ ইংরাজ যাহা ইচ্ছা তাহা করুক, আমরা পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের আশায় অপেক্ষা করিব।

(৫) হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান, "এত জাতি, এত ধর্ম্ম, এত শক্তি" ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য "কোন তীর্থস্থানেই একত্র হয় নাই। একান্ত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে প্রকাণ্ড সমন্বয়ে বাঁধিয়া তুলিয়া বিরোধের মধ্যেই মিলনের আদর্শকে পৃথিবীর মধ্যে জয়ী করিবার এমন সুস্পষ্ট আদেশ জগতের আর কোথাও ধ্বনিত হয় নাই।" সুতরাং ভগবানের এই সুস্পষ্ট আদেশ অনুসারে এই সকল বিভিন্ন

জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্ম ও বিভিন্ন শক্তির সমন্বয় করিতেই আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। কাহাকেও বর্জ্জন করা উচিত নহে।

(৬) "ভারতবর্ষে এত জাতি বিভাগসত্ত্বেও কেমন করিয়া এক মহাজাতি হইয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিব।" "ভেদলক্ষণই ত চারিদিকে। নিজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাই যখন প্রবল, তখন কোন মতেই আমরা নিজের কর্ত্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব না। তাহা যখন পারি না, তখন অন্যে আমাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেই—কিছুতেই ঠেকাইতে পারিব না।" সুতরাং অকারণ গণ্ডগোল করা নিষ্প্রয়োজন।

(৭) আর যদি নিতান্তই গণ্ডগোল করি, তবে এখন ত করা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। কারণ আমাদিগের কোন সম্বলই নাই। অগ্রে সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত করিয়া তাহার পর গণ্ডগোল (?) করিতে হয়। প্রদীপ জ্বালিবার উদাহরণ দিয়া এই তথ্য বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অগ্রে "তাহার আধার গড়িতে হয়, সলিতা পাকাইতে হয়"...ইত্যাদি।

(৮) উপকরণ সংগ্রহের পূর্ব্বে গণ্ডগোল করিয়া দেশের লোককে মাতাইয়া তোলা অসঙ্গত। বৃথা উত্তেজনায় লোককে মাতাইয়া তুলিলে যে বিদ্বেষবুদ্ধি জাগ্রত হইবে, সেই "রক্তপিপাসু বিদ্বেষ-বুদ্ধির দ্বারা স্বরাজ লাভ হইলেও আমরা পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত" করিব। স্বরাজ রাখিতে পারিব না।

(৯) পরাধীনতা জিনিষটা মাথার বোঝার মত নয় যে, কোন প্রকারে ফেলিয়া দিলেই আমরা হাল্কা হইব। "অত সহজ নহে।" অর্থাৎ ফেলিয়া দেওয়া সহজ নহে। সুতরাং বৃথা স্বাধীনতার ভাব দেশমধ্যে জাগাইয়া তোলাটা এক প্রকার মত্ততা মাত্র। ভাবের এইরূপ মত্ততায় কোন কাজ হয় না। যাহারা মনে করে, ভাব বিস্তার হইলেই তদুপযোগী কার্য্যও হইবে, তাহারা বৃথাই লোককে "মাতাল" করিয়া তুলে। ইহাতে কেবল বিদ্বেষই জন্মিবে, আর কোন ফল নাই।

(১০) বিদ্বেষ জন্মিলেই একটা পথ বাহির হইবে, এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ নাই। ফল যখন বিপজ্জনক, অথচ অনিশ্চিত এবং দেশটা যখন "অনেকের" একার নহে; তখন এরূপ অনিশ্চিত বিপদের পথে দেশকে লইতে কাহারও অধিকার নাই।

(১১) "যে সমস্ত বিচিত্র উপকরণ কালকালান্তর ও দেশ দেশান্তর হইতে এখানে আহরিত হইয়াছে, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে গেলে আমরা নিজেই আহত হইব, তাহার কিছুই করিতে পারিব না।" এদিকে আমাদিগের মধ্যে যত প্রকার ভেদ রহিয়াছে, তাহাতে ঐ "ক্ষুদ্র" শক্তিকে বৃহৎ করিবারও উপায় নাই। আর উপায় থাকিলেও যে সকল জাতি, যে সকল শক্তি এতদ্দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকে বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করা অনুচিত; কারণ তদ্রূপ চেষ্টায়, ঐ সকল জাতি ও শক্তি একত্রিত হইয়া ভবিষ্যতে পূর্ণ মনুষ্যত্ব গঠিত হইবার যে "সুস্পষ্ট আদেশ" পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। পূর্ণ মনুষ্যত্ব গঠিত করিতে নিভৃতে তপস্যা করা উচিত। "তাহা নিশ্চয়ই কেহ করিতেছে।" গোলমালে তাহার তপস্যা ভঙ্গ হইতে পারে, আর কোন লাভ হইবে না।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ হইতে আমি

যাহা বুঝিয়াছি, তাহা উপরে বিবৃত করিলাম। আমি অনেকস্থলে তাঁহার ভাষাই উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। বোধ হয় কদর্থ গ্রহণ করি নাই, অন্ততঃ জ্ঞাতসারে করি নাই, ইহা নিশ্চয়। প্রবন্ধে আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া যাহা আমার বোধ হইয়াছে, তাহাই উপরের এগার দফাতে প্রকাশ করিলাম। উহাকে আরও সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। তাহারও চেষ্টা করিব। প্রবন্ধের মূল কথা বোধ হয় এই :—

আমরা বিচ্ছিন্ন, আমরা ক্ষুদ্র, আমরা কিছুই করিতে পারিব না। এমত অবস্থায় স্বরাজের ভাবে বর্ত্তমান সময়ে দেশকে মাতাইয়া তোলা মত্ততা মাত্র। উহাতে ইংরাজের প্রতি কেবল বিদ্বেষ ভাবই জাগিয়া উঠে; আর কিছুই হয় না। কিন্তু বিদ্বেষভাব জাগাইয়া তোলা অকর্ত্তব্য। কারণ ভগবান যখন কালকালান্তর, দেশদেশান্তর হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ধর্ম্ম ও শক্তিকে এতদ্দেশে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, তখন তাহাদিগকে মিলিত ও একত্রিত করিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্ব গঠিত করাই তাঁহার অভিপ্রেত। এই অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে আমাদিগের বৃথা গণ্ডগোল করা উচিত নহে। স্বরাজ লইয়া আন্দোলন করিলে দেশের লোক ভাবে মত্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহা হইতে কর্ম্ম হইবে না। পূর্ণ মনুষ্যত্ব গঠিত করাই লক্ষ্য; আর সেই উদ্দেশ্যে কোথাও "নিশ্চয়ই আমাদের দেশে কল্যাণময় চেষ্টা নিভৃতে তপস্যা করিতেছে।" এরূপ অবস্থায় স্বরাজভাবের মত্ততা লইয়া গোলযোগ করিলে তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হইতে পারে।

ইহাই যদি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধের আসল কথা হয়, তবে প্রথমেই এই মনে হয় যে, যে জাতি পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন শক্তি কর্ত্তৃক পরাজিত হয় নাই এবং যাহার দেশে বিভিন্ন বিজেতৃগণ খুঁটাগাড়ি করিয়া বসে নাই, তাহার মত দুর্ভাগ্যবান কেহই নহে। কারণ সে কদাচ "মুক্তির উদার নির্ম্মল জ্যোতিকে বিকীর্ণ" করিতে পারিবে না। সে জাতি পুনঃ পুনঃ অপরাপর জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে তাড়াইতে পারে নাই, সে বড়ই ভাগ্যধর; কারণ সে-ই পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী, এবং তাহার দেশই পরম পবিত্র তীর্থস্থান। পুনঃ পুনঃ পরাজিত জাতির ইহা অপেক্ষা সুখের সংবাদ আর কি আছে? কিন্তু তাহাতেও একটু গোল বাধিয়া যাইতেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খ্রীষ্টান, সকলকেই একত্রে মিলিত করিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্ব একই দেশেই গঠিত করা যখন ভগবানের আদেশ, আর বৌদ্ধ যখন এদেশে একরূপ নাই বলিলেই হয়, তখন জাপানী কিম্বা চীনাদিগকে আনিবার চেষ্টা করা বৈধ কি না? কিন্তু চেষ্টা করিবই বা কেমন করিয়া? ডাকামাত্র তাহারাও আসিবে না, খ্রীষ্টানেরাও তাহাদিগকে সহজে স্থান দিবেন না। আর খ্রীষ্টান-বিদ্বেষ না জন্মিলেই বা সকলে বৌদ্ধদিগকে ডাকিবে কেন? কিন্তু এ পথও যখন বিপজ্জনক, তখন সকলের মত ভিন্ন এ পথ অবলম্বিত হইতেই পারে না। একার ত দেশ নহে; সুতরাং সকলের মত না হইলেও হয় না; কিন্তু সকলের মত পাইব কেমন করিয়া? এস্থলে রবীন্দ্রনাথ আর একটী কথা বলিয়াছিলেন। "সংশয়াপন্ন ব্যবস্থা" "চক্ষু বুজিয়া"

অনুষ্ঠান করিবার কাহারও অধিকার নাই, অর্থাৎ চরম লক্ষ্য বিবেচনা পূর্ব্বক নিশ্চয় রূপে স্থির না করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। একথা আপাততঃ সত্য বলিয়া বোধ হইলেও, ইহা মানব-চরিত্রের প্রকৃতিগত নহে। বিবেচনা বুদ্ধি দ্বারা মানব সমাজের গুরুতর কার্য্য সকল অল্পই সাধিত হইয়া থাকে। * ভাব কর্ম্মকে প্রবর্ত্তন করিবে, বুদ্ধি উপায় উদ্ভাবন করতঃ তাহাকে সফলতা প্রদান করিবে; ইহাই মানবের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। ইহাকে বিস্মৃত হইয়া বুদ্ধির প্রতি অনুষ্ঠানের ভার দিলে 'অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি' প্রবচনেরই সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে, আর কিছুই হইবে না।" "সংশয়াপন্ন ব্যবস্থা" লইয়াই কর্ম্ম আরম্ভ করিতে হইবে, নতুবা নিশ্চয় মৃত্যু। †

রবীন্দ্রনাথ কবি এবং মনীষী। তিনি দূরদৃষ্টিতে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খ্রীষ্টানের যে প্রেমের সম্মিলন দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। এ সম্মিলন কিরূপ, তাহাও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। ইহা কি "যান্ত্রিক" না "জৈবিক"? এই দুইটী শব্দ তাঁহার নিজের, আমার নহে। মানুষের দুইটী পদার্থই সম্বল, দুই ভিন্ন তিন নাই। সেই দুইটী— দেহ ও মন। ভগবানের আদেশ যে সম্মিলন, তাহা কি দেহের না মনের? দেহের হইলে ত যৌন সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিতে হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খ্রীষ্টান কি এইরূপ সম্বন্ধে মিলিত হইতে স্বীকার করিবে? অবশ্য, ভগবানের আদেশ থাকিলে স্বীকার করিতেই হইবে। এ হিসাবে দেখিতে গেলে, যে সকল হিন্দু কি মুসলমান প্রেম বিবাহ করিতেছেন, তাঁহারা ভগবানের আদেশ মতই কার্য্য করিতেছেন, সন্দেহ নাই। এই পক্ষেই যদি যত্নবান হওয়া উচিত হয়, তাহাতেও সকলের মত লওয়া আবশ্যক হইতেছে না কি? আর যদি মনের মিলনই ভগবানের আদেশ হয়, তবে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্মী সকলে একমন হইবার আদেশ মন্দ বোধ হয় না। তাহা হইলে সকল বিরোধ চলিয়া গিয়া ধরাতলে এক বিরাট শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা হইতে মহানুভাব আর কি হইতে পারে? এই বিরাট শান্তি, সাম্য ও মৈত্রীকে অপেক্ষা করে। সুতরাং ইহাই প্রেমের রাজ্য। এই মিলননিয়ম্‌ যে কতদূরে আছে, তাহা আমিত কল্পনাই করিতে পারিব না। "শনৈঃ শনৈঃ" যাইতে সম্মত আছি, কিন্তু অনন্ত কালেও পথ ফুরাইবে ত? এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, এক জাতি প্রভু, আর এক জাতি ভৃত্য; এক জাতি শাস্তা, আর এক জাতি শাসিত, এইরূপ স্থলে প্রকৃত মৈত্রী, প্রকৃত মিলন হইতে পারে কিনা? অবশ্য ভগবানের আদেশে সবই হইতে পারে। কিন্তু আমরা মরচক্ষুতে যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে ঐরূপ স্থলে প্রকৃত মিলনের আশা করা যায় কি না? এ প্রশ্নের উত্তর পাঠকগণ নিজেরাই দিবেন। তারপর আর এক কথা। অধীনতা পদার্থটাই যে মহা অবসাদক, ইহাতে জাতীয় বিলোপ হইবেই, দেহ ও মন অবসন্ন হইতে হইতে শেষে বিনাশ প্রাপ্ত হইবেই। মানুষের বিষয় বলিতে হইলে,

* Human nature is such that we rarely find our way through the pure light of reason.

Herbert Spencer Lecture 1907. p 24.

† He that will not stir till he infallibly knows the business he goes about will have little else to do but to sit still and perish. Human understanding IV. 14, para I.

মানব তত্ত্বজ্ঞগণের মত আদরনীয় বলিয়া বোধ করি। তাঁহারা ত প্রায় এক বাক্যেই বলেন যে, অধীনতার উপর বিধাতার অভিসম্পাৎ আছে। * ইহাতে প্রভু ও ভৃত্য উভয়কেই অধঃপাতে ফেলিয়া দেয়। সুতরাং কোন জাতি অপর জাতির অধীন হউক অথবা থাকুক, ইহা ত ভগবানের অভিপ্রেত হইতে পারে না। কারণ অধীনতা হইতে জাতীয় বিলোপ আসিবেই। মহাশান্তির রাজ্য, বিরাট প্রেমের রাজ্য ধরাতলে প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব্বেই অধীন জাতি নির্ম্মূল হইয়া যাইবে, তাহার কি? এ স্থলে দড়ির বন্ধনের অধীনে থাকিয়া দুইটী ডালের মিলনের উদাহরণ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। এ বিষয় আমি "পরবশতা" নামক প্রবন্ধে"নব্যভারতে" অতি অল্প দিন হইল বিস্তৃত রূপে আলোচনা করিয়াছি; এস্থলে তাহার পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ণ মনুষ্যত্বের অপেক্ষায় থাকিতে হইলে তত কালের মধ্যে প্লীহা ফাটিয়াই যে পঞ্চত্ব পাইব। রবীন্দ্রনাথের উপদেশ এই যে "গবর্ণমেণ্টের শাসননীতি যে পন্থাই অবলম্বন করুক এবং ভারতবর্ষীয় ইংরাজের ব্যক্তিগত ব্যবহার "যেরূপই হউক, আমরা "আত্মবিস্মৃত" হইব না। এই উপদেশ পালন করা আমার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে করি; কারণ আমার প্লীহা কেন, হাড়েও অত সহ্য হইবে না। আমার পঞ্চত্ব তৎক্ষণাৎ। জিজ্ঞাসা করি, জীব যে নিম্ন হইতে উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছে, ইহা কি এই উপায়ে সাধিত হইয়াছে?

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের শেষ উপদেশে অতীব শান্তিময়। শুধু ভাব চাই না, উহা মত্ততা মাত্র। কাজ না হইলে ভাব দিয়া কি করিব? কিন্তু ভাব না জাগিলেও যে এ শ্রেণীর কাজ হয় না। হৃৎপিণ্ড ধক্ ধক্ করে, নাড়ী টক্ টক্ করে; ভাব না জাগিলেও এ সব কাজ হয়। কিন্তু আর যে কিছুই হয় না, তাহার উপায় কি? ভাব না হইলে কাজ আসিবে না; অথচ কাজ না আসিলেও শুধু ভাবকে চাই না; এ যে বিষম সমস্যা। এস্থলে নীরব নিশ্চল থাকা ব্যতীত আর উপায় কি? এ একরূপ গভীর শান্তি, সন্দেহ নাই। সেই বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ Francis Galton, যিনি বৃদ্ধবয়সেও মানবের উন্নতির জন্য Eugenics নামক জীবতত্ত্বের সারভূত শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং যুবার অধিক অধ্যবসায়ের সহিত তাহার আলোচনা করিতেছেন, তিনি কি বলেন, শুনিতে ইচ্ছা হয়। তিনি বলেন, জনসাধারণের মধ্যে ভাব সম্যক প্রকারে জাগ্রত হইলে কর্ম্ম হইবেই। * জানি না, রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদিগের কথা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন কি না। কিন্তু ভাব বিস্তারের আবশ্যকতা অস্বীকার করিলে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত করিতে পারিবেন, ইহাত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। আমরা "বিচ্ছিন্ন", এই নিমিত্ত "অন্যে আমাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেই— কিছুতেই ঠেকাইতে পারিব না"—এই নৈরাশ্যই কর্ম্মের প্রধান প্রতিরোধক। আপনার উপর যাহার বিশ্বাস নাই, সে জগতে কিছুই করিতে পারিবে না, সে চিরদিন পরপদানত থাকিবেই, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কেবল সহিষ্ণুতার দ্বারা পূর্ণ মনুষ্যত্ব গঠিত হয় না; অন্ততঃ পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা একান্ত অসম্ভব।

* Weisman's Heredity, Vol II, p 27.

* Herbert Spencer Lecture 1907 p 29.

"পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে উপকরণ সংগ্রহের একটা কথা আছে। ভাব বিস্তার না হইলে তাহাই বা কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? প্রদীপ জ্বালিবার একটা ভাব না হইলেত প্রদীপজ্বালার উপকরণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায় না! আর "অনেকের" মত লইয়াও কি কখন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে? দেশব্যাপী কর্ম্ম দেশের সকলের সহিত কিম্বা অনেকের সহিত পরামর্শ করিয়া হয় না। যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরোজনঃ *। শ্রেষ্ঠ যেরূপ আচরণ করেন, ইতর জনেও তদ্রূপ করে। ইহারই নাম দৃষ্টান্ত। কোন সমাজে কোন কর্ম্মই অনেকে মিলিত হইয়া অনুষ্ঠান করে না। অল্পের দৃষ্টান্ত অনেকে অনুসরণ করে, ইহাই নিয়ম। এ নিয়মের অন্যথায় কিছুই হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, তিনি "দণ্ডশালার দ্বারে বসিয়া" আছেন, সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় চাঞ্চল্য ও ভীতির মধ্যে সত্য রক্ষা করা কঠিন। এ কথা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার প্রবন্ধকে নিশ্চয়ই গভীর চিন্তার ফল ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। তথাপিও আমার মনে হয় যে, চিন্তা অপেক্ষা ভাবের এবং কল্পনার খেলাই আলোচ্য প্রবন্ধে অধিকতর পরিস্ফুট। সকল জাতির প্রেম-সম্মিলন ও পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ—একটা প্রকাণ্ড কল্পনা। ইহারই অপেক্ষা করিয়া নীরব নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকাই কি পরম পুরুষার্থ? পূর্ণ মনুষ্যত্বের অপেক্ষা যেন করিলাম; সে কথা না হয় মানিয়াই লইলাম, কিন্তু তৎপক্ষে অপেক্ষা করা ভিন্ন আর কোন কর্ম্ম আছে কি? কি করিব? উহার প্রত্যাশার আমাদিগের অনুষ্ঠেয় কি? রবীন্দ্রনাথ এ সকল কথার কোনই স্পষ্ট উত্তর দেন নাই। ইহাতে বোধ হয় যেন নীরবে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্বের অপেক্ষা করাই আমাদিগের কাজ; স্বরাজ লইয়া আন্দোলন করতঃ বৃথা মত্ততা উৎপাদন করা নিতান্ত অনুচিত।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, আমি উহা পাঠ করিয়া যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে প্রকৃত রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে না পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। তিনি এতদ্দেশে বর্ত্তমান যুগের একজন প্রধান প্রবর্ত্তক; অথচ প্রবন্ধ মধ্যে তাঁহার নিজের চিরন্তন উপদেশেরই বিপরীত ভাব লক্ষিত হয়; ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে? বর্ত্তমান সময়ে রাজা প্রজার মধ্যে যেরূপ ভাব দেখা যাইতেছে, তাহা শোচনীয়, সন্দেহ নাই। আর সম্প্রতি যে লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তাহাও অতীব ক্লেশকর। সে সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু এতদ্দেশীয়গণ "স্বাধীনতার দোহাই দিয়া "অপরের" মতের অনৈক্য ও ইচ্ছার বিরোধকে দণ্ড উত্তোলন করিয়া বলপূর্ব্বক একাকার করিয়া" দিতেছে, এই কথা রবীন্দ্রনাথের মুখ হইতে শুনিতে হইল, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর নাই। বয়কট ব্যাপারে যে যুবকগণ দণ্ডিত হইয়াছে, ইহারাই কি বল প্রয়োগ অপরাধে দোষী? ইহারা কোথায় কাহার উপর বল প্রয়োগ করিয়াছে? ইহারা হাতে পায়ে ধরিয়া অনুনয় বিনয় করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। তাহারই নাম কি বল প্রয়োগ? ইংলিস্‌ম্যান, পাইওনিয়ারের মুখে এ কথা শুনিয়াছি; তাহাতে দুঃখিত হই নাই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মুখে এই কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হই-

* গীতা। ৩২১।

লাম। তার পর বয়কট ব্যাপারে যুবকগণ যদি নৈতিক বল প্রয়োগ করিয়াই থাকে,—দৈহিক বল প্রয়োগ ত করেই নাই,—তাহাই কি দূষণীয়? কোন্ দেশে শ্রেষ্ঠগণ জনসাধারণের হিতের জন্য এরূপ বল প্রয়োগ করেন না? রাজবিধি দ্বারা বাধ্য করিয়া, অভিভাবকদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করা; ঐরূপে বাধ্য করিয়া জনসাধারণকে সৈনিকদল-ভুক্ত করা;—এ সকল কি এক প্রকার বল প্রয়োগের দৃষ্টান্ত নহে? ইহার অধিক আমাদিগের যুবকগণ আর কি করিয়াছে? সকলকে বুঝাইয়া কখনই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। বরং প্রথমতঃ সকলে ঈপ্সিত ভাবে প্রবুদ্ধ না হইলে একটু চাপ দেওয়াও বিধিসঙ্গত *। একাগ্র এবং উদ্যোগী ব্যক্তিই কর্ম্ম আরম্ভ করিবে। বিজ্ঞতা তাহার পরিচালনা করিবে। তাহার পর,—ফল ভগবানের হস্তে। ফল সকল সময়েই যে সু হইবে, কু হইবেই না, এরূপ আশা করা অসঙ্গত। সময়ে অকৃতকার্য্য হওয়া অতীব সম্ভব। কিন্তু ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, অনেক স্থলেই অকৃতকার্য্যতার মধ্য দিয়াই সফলতা লাভ করিতে হয়। অকৃতকার্য্যতা বৃথা হয় না, বরং উহাই সফলতার জনক।

সর্ব্বজাতির মহাসম্মিলন বিধাতার আদেশ হইতে পারে, কিন্তু উহা সকলের শুনিতে বিলম্ব আছে। যে পর্য্যন্ত সকলে ঐ আদেশ প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত গভীর নিশ্চেষ্টতা, একান্ত সহিষ্ণুতাই আমাদিগের অবলম্বনীয়; পথ ও পাথেয় কি এই শিক্ষা দিতেছে? গবর্ণমেণ্ট এবং ইংরাজেরা আমাদিগের চিত্তকে যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া মথিত করুক, আমরা মহামিলন স্মরণ করিব, কখনই "আত্মবিস্মৃত" হইব না, এই মহা শিক্ষা দিবার নিমিত্তই কি পথ ও পাথেয়ের অবতারণা? আমরা চিরপদানত থাকিব, অন্যে আমাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবে, "আমরা কিছুতেই ঠেকাইতে পারিব না।" ইহাই কি মহাকবি রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধ বয়সের প্রবীণ মত? আমি যদি আলোচ্য প্রবন্ধ ঠিক বুঝিয়া থাকি, তবে কপালে করাঘাত করত; নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিতেছি না। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

"সমস্যা।"

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ "পথ ও পাথেয়"নামক প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় আরও বিশদ করিবার নিমিত্ত "সমস্যা" নাম দিয়া একটী প্রবন্ধ আষাঢ়ের বঙ্গদর্শনে ও অন্যান্য কাগজে একই সময়ে প্রকাশ করিয়াছেন। উপরে পূর্ব্ব প্রবন্ধটী বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি, এক্ষণে "সমস্যা"ও বুঝিবার চেষ্টা করিব।

"পথ ও পাথেয়" রচনার উদ্দেশ্য কি ছিল, তাহা "সমস্যা" আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে। প্রথমতঃ ভারতবর্ষের পক্ষে দেশহিত ব্যাপারটা কি? * * * দ্বিতীয়তঃ সেই হিতসাধন করিতে হইবে কেমন করিয়া?—এই দুইটী কার্য্যই বুঝাইয়া দেওয়া রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল। "পথ ও পাথেয়ের" আলোচ্য এই দুইটী কথাই ছিল, তাহা এক্ষণে তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্ব প্রবন্ধের ন্যায় এ প্রবন্ধও বলিতেছে যে, "পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে ভাষায়, স্বভাবে আচ-

* Public opinion may however be easily directed into different channels by opportune pressure. Herbert Spencer Lecture 1907, p 26.

রণে, ধর্ম্মে বিচিত্র—* * * সেই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একাঙ্গী করিয়া দেখিব ;" ইহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য, ইহাই প্রকৃত হিতসাধন। এ প্রবন্ধে "পূর্ণ মনুষ্যত্ব" কথাটা নাই ; কিন্তু "একাঙ্গত্বই" বোধ হয় "পূর্ণমনুষ্যত্ব" হইবে। এই হইল হিতসাধন। আর তাহার উপায় হইল, "সকল সন্দেহকে দূর করা" "সকল বিদ্বেষকে পরাস্ত করা," "মানবের প্রতি সর্ব্বসহিষ্ণু পরম প্রেম" করা, এবং "সর্ব্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধি"। সকল মানুষকে একাঙ্গ করা, পূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যাহাই হউক, কিন্তু উপায়গুলি যে লেখকের উচ্চ হৃদয়ের, মহান্ উদার ভাবের পরিচয় দিতেছে,তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাব উদার হইলেও, ফল কর্ম্ম জগতের অতীত। কারণ, "সর্ব্বত্র ব্রহ্মের উপায় উপলব্ধি হইলেই সে সকল কর্ম্ম ফুরাইয়া যায়, জীবের কর্ম্ম-বন্ধন মোচন হয়, মানব মুক্ত হইয়া যায়,—তাহার কি ? উপনিষদাদি বেদান্ত শাস্ত্রে ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে সে "সর্ব্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধি" হইলেই জীব মুক্ত হয়—সুতরাং উপায় কি করা যাইতে পারে ? "একাঙ্গ" হইলেই যে মুস্কিল ! আর "মহাজাতি" গঠন করিয়া হইবে কি ? কর্ম্মই যে আর থাকিল না! চিরশান্তিময় বিশ্বব্যাপ্ত প্রেমের রাজ্য স্থাপিত হইলে ত সকল গোল চুকিয়াই গেল। মানব আর মানবই রহিল না। কিন্তু মানবকে কর্ম্ম জগতের মহা সংঘর্ষণের মধ্যে রাখিয়া, মিলেনিয়ম্ আসিবার পূর্ব্বে, আমাদিগের ন্যায় দগ্ধকপাল, পরবিজিত জাতির কি উপায় হইতে পারে,এই সমস্যাই আলোচনার বিষয়। রবীন্দ্র বাবু তাহা হইতে অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছেন। আমরা নীচের দিক হইতে তাঁহার কথাগুলি বুঝিতে পারিব কি ? যদি পারি, একবার তাহারই চেষ্টা করিব।

কিন্তু সে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের একটী উপদেশ স্মরণ করা আবশ্যক। এই উপদেশটী দুই প্রবন্ধের মধ্য হইতেই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা "বিচ্ছিন্ন, কোন দিনই মিলিতের সঙ্গে বিরোধ করিয়া জয়লাভ করিতে পারিব না।" "যে দেশে একটী মহাজাতি বাঁধিয়া উঠে নাই, সেদেশে স্বাধীনতা হইতেই পারে না।" তাঁহার মতে মহাজাতি বাঁধিয়া উঠাইবার উপায় হইতেছে, সকল বিচিত্রকে একাঙ্গ করা, সর্ব্বত্র ব্রহ্মের উপলব্ধি করা। সুতরাং এই অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে মহাজাতিও বাঁধিল না, মহাজাতি না বাঁধিলে স্বাধীনতাও আসিতে পারে না। কিন্তু এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও একদম্ নির্ব্বাণ মুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আর কিসের মহাজাতির বাঁধা ? তখন আর কিসের "ইংরাজ তাড়ানো" ? কিসের স্বাধীনতা ? তবেই দেখা যাইতেছে, যে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভের পূর্ব্বে আমাদের পরাধীনতা ঘুচিবার আর উপায় নাই ; দুই কর্ম্ম এক সঙ্গেই হইতে হইবে। ইহার নাম আমি বুঝি—চিরদাসত্ব। এই আশার বাণী লইয়াই যদি রবীন্দ্রনাথ এই হতভাগ্য দেশের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া থাকেন, তবে এদেশের সমগ্র নরনারীকে বিধাতা এখনই বধির করিয়া দিন, যেন এ বাণী তাহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে। জীবের ইতিহাসে একজাতি অপর জাতির অধীন হওয়া প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, এক বা একাধিক ব্যক্তি, অপর ব্যক্তির অধীন হইতে পারে, তাহার কর্ত্তৃক বিনষ্টও হইতে পারে। কিন্তু ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ পর্য্যন্ত

কোন জাতিই কখনও পরাধীনতা স্বীকার করে নাই। মানবও স্বেচ্ছায় ঐ অবস্থা গ্রহণ করে নাই, স্বেচ্ছায় ঐ অবস্থায় থাকিতেও চাহে না। বিভিন্ন জীব প্রত্যেকে স্বাধীন অবস্থাতেই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পথে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কখন উন্নত কখন বা অবনত হইয়াছে। এই উন্নতি, অবনতির মধ্য দিয়াই জীব নিম্ন হইতে উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। অবরোধ, গৃহপালিত অবস্থা এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপরের শাসন বহন,—এই ত্রিবিধ মূর্ত্তিতেই পরাধীনতা অবসাদ আনিয়া উপস্থিত করে, তাহার পরিণাম ধ্বংস, বিলোপ। পরাধীন ও পরবশ, এ পরিণামের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেই পারে না। অধীনতা, প্রভু ও ভৃত্য, উভয়কেই অবসন্ন করিয়া ফেলে। মানব-সমাজ এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলে প্রভু হইতেও আর ইচ্ছা করিবে না। যেমন মানব দাসত্ব চাহে না, তেমনি প্রভুত্ব চাহিবে না। কিন্তু এ অবস্থা আসিবার বহু বিলম্ব; অন্তরায়ও অনেক। যাহা হউক, পূর্ণ মনুষ্যত্ব এবং প্রেমের রাজ্য আমিও যে বিশ্বাস করি না, তাহা নহে। আমি অন্য ভাবে বিশ্বাস করি। সে কথার উল্লেখ এস্থলে অনাবশ্যক। এস্থলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের অর্থই উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছি। "সমস্যা" হইতে বুঝা যায় যে, বর্ণ, ভাষা, স্বভাব, আচরণ, ধর্ম্ম, এই সকলের বৈচিত্র্য বিলুপ্ত করিয়া একাতীত্ব প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার লক্ষ্য। বর্ণ কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না, উহা কি জাতি, না দেহের রং? ভারতের জাতিভেদ যে প্রকারের, তাহাকে বিলুপ্ত করা অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু গুণকর্ম্মভেদে জাতিভেদ মানব সমাজ হইতে কেহই দূর করিতে পারিবেন না; উহা মানবের প্রকৃতিগত। আর দেহের রং জীববিজ্ঞানের বল বিক্রম ছাড়িয়া একপা-ও এদিক ওদিক যাইবে না। রং বংশগত, প্রধানতঃ এই কারণই রঙ্গের নিয়ামক, ইহা বর্ণোপকরণের * উপর নির্ভর করে। শঙ্কর জাতিরাও বংশানুক্রমে পিতা মাতার রং সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে না। পিতামাতার রং মিশ্রিত হইয়াও আবার কতিপয় অপত্যে পৃথক্ হইয়া দেখা দেয়; তখন ঐ সকল অপত্য ঠিক পিতা অথবা মাতার রং প্রাপ্ত হয়। মানব সমাজে এই নিয়ম সর্ব্বত্র প্রযোজ্য না হইলেও, ইহার প্রয়োগ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং বর্ণ বলিতে জাতিই হউক, অথবা রং-ই হউক, বৈচিত্র্য ত গেল না; একাঙ্গত্ব প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ হইয়া উঠিল। প্রকৃতি ঠাকুরাণীর নিয়ম অস্বীকার করিবার মত জোর কাহারও নাই। উহা মানিয়াই উহার উপরে উঠিতে হয়। সুতরাং "একাঙ্গ" অথবা একাকার ত হইল না। ভাষাই বা কেমন করিয়া এক হইবে? বিভিন্ন জাতি একটা ভাষা অবলম্বনে পরস্পরের সহিত কাজ কর্ম্ম করিতে পারে; কিন্তু সকলের এক ভাষা হইতেই পারেনা। ভাষাভেদের কারণ সকল অতীত কালেও যে প্রণালীতে কার্য্য করিয়াছে, চিরদিনই ত তদ্রূপই করিবে। জোর করিয়া একাঙ্গ করিয়া দিলেও ভাষা আবার পৃথক হইয়া যাইবে। ভাষা মানব প্রকৃতিকে অনুসরণ করে; বিভিন্ন মানবের প্রকৃতিও, মিলেনিয়মের পূর্ব্বে, এক হইবে না; ভাষাও এক হইবে না। স্বভাব এবং আচরণ প্রায় এক কথাই; স্বভাব অনুসারেই

* Pigment.

আচরণ নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহাতে মানুষের চির বৈচিত্র্য এক হইবার কোন উপায়ই নাই। সুতরাং ধর্ম্মও যখন স্বভাবের অনুসরণ করে, তখন তাহাও চির বিচিত্র থাকিবেই। মানব অথবা ভারতীয় মানব সকলে এক ধর্ম্ম অবলম্বন করার কোন সম্ভব এখন পর্য্যন্ত বুঝা যাইতেছে না। রবীন্দ্রবাবু সত্যই বলিয়াছেন "বিচিত্রকে লইয়াই বিরাট।" বিচিত্র মানবের সমষ্টি লইয়াই বিরাট, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিচিত্র মানব যখন বিরাটে পরিণত হইবে, তখনত কর্ম্মজগত অন্তর্হিত হইবে, সকলই বিরাট পুরুষে লীন হইবে। সে সময়ের আলোচনা এস্থলে আনাবশ্যক। কিন্তু সে সময়ের পূর্ব্বে বৈচিত্র্য যে কিছুতেই যাইবার নহে। দেহ মন, এই দুই-ই মানবের সম্বল। ইহাদিগের একটীও যে বিচিত্র হইতে ভুলে না। যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বিবিধ জাতিকে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করিয়া সমগ্র মানবকে, অথবা ভারতীয় সমস্ত জাতিকে এক মিশ্র জাতিতে পরিণত করা সম্ভব হইলেও, দেহ মন বিচিত্র থাকিয়াই যাইবে। পিতামাতার দেহ ও মন, অপত্য প্রাপ্ত হইবেই। এ বিধির লঙ্ঘন নাই। সুতরাং পূর্ণ মনুষ্যত্বের সম্ভাবনা এদিক দিয়া কিরূপে হইতে পারে? পরিবর্ত্তন যে বিধাতার নিয়ম, প্রভেদ যে জগতের অনিবার্য্য বিধি। "একাঙ্গ" করিব কেমন করিয়া? ভাব প্রভেদের মধ্যেও একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, যদি লক্ষ্য এক হয়, উদ্দেশ্য এক হয়। কোন একটী উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া হস্ত, পদ, মুখ ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গ যেমন সমবেত চেষ্টা করিতে পারে, তেমনি, এক উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া, নিগ্রো, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিও এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। উদ্দেশ্যের একতায়, আমরা বিচ্ছিন্ন হইলেও, সমবেত চেষ্টা করিতে অসমর্থ হইব না। আর বিচ্ছিন্ন শব্দে শ্রীযুত রবীন্দ্র বাবু কি বোধ করেন? ভারতীয় ত্রিশ কোটী বিচ্ছিন্ন থাকা পর্য্যন্ত মিলিতের নিকট পরাভূত হইবেই, ইহা কি তিনি বলিতে চাহেন? কেন, তিন কোটী অথবা তিন লক্ষও কি কোন কালেই একাঙ্গত্ব প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে? যাহারা বর্ত্তমান যুগে স্বাধীন জাতি, তাহারা কি অগ্রে সকলেই একাঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, পরে স্বাধীন হইয়াছে? তাহারা কি সকলেই অগ্রে সমস্ত সন্দেহ জয় করিয়া, সমস্ত বিদ্বেষ পরাস্ত করিয়া, প্রেমের রাজ্য স্থাপিত করিয়া, সর্ব্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধি করিয়া, তাহার পর মহাজাতি গঠিত করিয়াছিল? তাহার পর স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল? সকলেই ত একাঙ্গত্ব লাভের পূর্ব্বেই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। মহামতি গ্লাডষ্টোনের মহোপদেশ এস্থলে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। তিনি শিখাইয়াছেন যে, স্বাধীন না হইলে কোন জাতিই স্বাধীনতা লাভের যোগ্য হয় না। রবীন্দ্রনাথ কি ইহা অস্বীকার করেন! তিনি লিখিয়াছেন, "এমন তর্কও শুনা যায় যে, যতদিন আমরা পরের কড়া শাসনের অধীন হইয়া থাকিব, ততদিন আমরা জাত বাঁধিয়া তুলিতেই পারিব না। * * একথা যদি সত্য হয়, তবে এ সমস্যার কোন মীমাংসাই নাই।" এ লেখা হইতে ত ঐ মহোপদেশ তিনি স্বীকার করেন বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু কেবল রাজনীতিজ্ঞ নহে, বৈজ্ঞানিকগণও পরাধীনের অযোগ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। পরাধীন অযোগ্য থাকিবেই, কিন্তু তাহারই মধ্য দিয়া

পরাধীনতার অবসাদকে ঠেলিয়া ফেলিতে হয়। তখন, তৎপূর্ব্বে নহে, ক্রমে যোগ্যতা আসিয়া উপস্থিত হয়। যে পরাধীন এক বিষয়ে অযোগ্য থাকে, সে অন্য বিষয়ে যোগ্য থাকিতে পারে। আর তাহাতেই তাহার শৃঙ্খল মোচন হইতে পারে। ইহা অতীব সম্ভব, সম্ভব না হইলে কোন পরাধীনই কখনও স্বাধীন হইতে পারিত না। অবশ্য, আমরা এখনই স্বাধীন হইব, এ কথা বলিলেই স্বাধীন হওয়া যায় না, তাহা বুঝি। কিন্তু তাই বলিয়া "এ সমস্যার শেষ মীমাংসাই নাই", "বিচ্ছিন্ন কোন দিনই মিলিতের সঙ্গে বিরোধে জয়লাভ করিতে পারিবে না" ইত্যাকার নৈরাশ্যজনক কথা কখনও স্বীকার করিতে পারি না। এ সকল কথা খণ্ডন করা কঠিন নয়। এ সকল রবীন্দ্র বাবু যেরূপ ভাবে বলিয়াছেন, তাহাতে অসত্যের সহিত সত্য এবং অর্দ্ধ সত্য জড়িত রহিয়াছে, এই নিমিত্তই ইহার প্রতিবাদ করা কঠিন। বিচ্ছিন্ন বাস্তবিকই ত মিলিতের সহিত বিরোধ করিতে পারে না। কিন্তু আমরা কি এই অর্থে বিচ্ছিন্ন? অথবা এই অর্থে কি চিরদিনই বিচ্ছিন্ন থাকিব? উদ্দেশ্যের একতায় আমাদিগের কোন বিশেষ অংশও কি মিলিত নহে? অথবা মিলিত হইতে পারে না? ফলতঃ চিরদাসত্ব কোন জাতিরই হইতে পারে না; চিরপ্রভুত্বও কাহারও ভাগ্যে নাই। ভাগ্য, চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহা বিধাতারই নিয়ম। ইহাই পতিত জাতির আশা স্থল। এই আশা, এই ভাব বিস্তার করাই কর্ত্তব্য; ইহাকে উৎপাটিত করা, ইহাকে নির্ম্মূল করা কাহারও উচিত নহে। বৃদ্ধ মনীষী গ্যাণ্টনের সহিত আমাদিগেরও স্বীকার করা উচিত যে, "ভাব প্রবল হইলে কর্ম্ম হইবেই।"* 'স্ব' কর্ম্মায়ত্ত। রবীন্দ্রনাথ আমাদিগের স্বাধীনতার "স্ব"ই খুঁজিয়া পান নাই, অথচ কর্ম্মেই পরকেও আপন করা যাইতে পারে, ইহা তিনি স্বীকার করেন। "স্ব জিনিষটা" কর্ম্ম হইতেই পূর্ণতা লাভ করে। ভাবের ঐক্য হইতে উহার জন্ম, কর্ম্মে উহার পরিণতি।

বর্ত্তমান সময়ে এ সকল আলোচনায় সত্যকে লঙ্ঘন করিবার আশঙ্কা আছে, ইহা রবীন্দ্র বাবু পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছেন, তাহা ঠিক। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অধিক ঠিক হইতেছে, রবীন্দ্র বাবুর নিজের মতের সহিত নিজের অনৈক্য। কবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা এরূপ ভাবে বুঝি নাই; প্রাদেশিক সমিতির সভাপতিকেও আমরা এরূপ ভাবে বুঝি নাই। কি জানি, বুঝি আমরাই ভ্রমে ডুবিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা হইলেও, তাঁহাকে বর্ত্তমান জাতীয় ভাবোন্মেষের গুরু বলিয়া স্বীকার করিব। তাঁহার বর্ত্তমান উপদেশ, আর তিনিও দেশীয় হৃদয়ে প্রবিষ্ট করাইতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। জাতীয় ভাব হইতে জাতীয় সমবেত ধর্ম্মের আরম্ভ হইতেছে, ইহা হইতে সুসময়ে সফলতা আসিয়া উপস্থিত হইবেই। কিন্তু কবে সেই সুসময় আগত হইবে, কাহার দক্ষিণ বাহুর উপর কৃতার্থতা স্বর্গীয় সিংহাসন রচনা করিবেন, তাহা তিনিই জানেন, যিনি দীনের বন্ধু, দুর্ব্বলের বল এবং পতিতের চির সহায়। অলমতি বিস্তরেণ। শ্রীশশধর রায়।

* Hebert Spencer Lecture. 1907.

পশুপতি। *

—সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাদ্ বুদ্ধি নাশো
বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি॥
গীতা।

১

পশুপতি!
পর হিতে বিশ্ব হিতে,
জন্মে দ্বিজ অবনীতে,
তাই তো ব্রাহ্মণগণ নমস্য সবার,
কলঙ্ক কালিমা ঢালি,
সেই কুলে দিতে কালি,
কেন তুমি বঙ্গদেশে এলে কুলাঙ্গার?

২

কি বুভুক্ষা সীমাশূন্য,
দুরাকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ,
বিশ্বগ্রাসী বিষমাগ্নি জ্বলিছে উদরে,
পুড়িয়াছে পুণ্যধর্ম্ম,
পুড়িয়াছে জ্ঞানকর্ম্ম,
কে জানে রাক্ষসী ক্ষুধা কত গ্রাস করে!

৩

স্বার্থ,অর্থ, রাজ্য-লোভ,
দুর্ব্বার যশের ক্ষোভ,
নরের নরত্ব নাশি গড়ে এ রাক্ষস,
মোহমত্ত দিবা রাতি,
কপটী বিশ্বাসঘাতী,
নিষ্ঠুর পাষণ্ড ভণ্ড, চিত্তে দুঃসাহস।

৪

জননী জনম ভূমি,
আরামে আছিলা ঘুমি,
অরাতি আনিয়া মূঢ়! গভীরা নিশায়,
বিজাতি বিধর্ম্মী-পা'য়
বি'কালি নিদ্রিতা মায়,
বজ্রাঘাত ও রাজত্ব—ইন্দ্রত্ব মাথায়!

৫

মানবের হৃদি প'রে,
ধর্ম্ম প্রেম বাস করে,
গড়ে তারা স্বর্গপুরী এ মর ভুবন,
তাইতো সাধুর চিত,
দেব-পদে নিয়ন্ত্রিত,
পরার্থে করেন সাধু আত্ম বিসর্জ্জন।

৬

স্বদেশ-প্রেমিক বীর,
মাতা পিতা রমণীর,
কত ব্যথা কত অশ্রু উপেক্ষিয়া হায়,
সাধিছে দেশের কর্ম্ম,
সার্থক তাদের জন্ম,
মরণে অমৃত মানি অমরতা পায়।

৭

কোথা বা করুণা-তরে,
আত্ম বলিদান করে,
রাজসুখ শাক্যসিংহ ত্যজে অনায়াসে;
মুছিতে পরের পাপ,
সহিয়া অসহ্য তাপ,
প্রিয় মাতা পত্নী ছাড়ি নিমাই সন্ন্যাসে!

৮

জন্মি সে মানব-কুলে,
স্বার্থে যে মহত্ত্ব ভুলে,
স্বদেশ-স্বজাতি-রক্তে যাহার পিপাসা,
ধিক তার পাপজন্ম,
ধিক্ তার প্রতিকর্ম্ম,
ধিক্ তার চিন্তা, ধ্যান, ধিক তার আশা!

* সাহিত্য-গুরু মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র কৃত "মৃণালিনী" গ্রন্থের পশুপতি-চিত্র দ্রষ্টব্য।

অই মুখে, লক্ষ্মী-সমা,
চাহ কি না "মনোরমা"
শোভিবে শূকর-গলে মণিময় হার ?—
কি ভাবিছ ভাগ্যহীন,
বিধি এত অর্ব্বাচীন ?
মরুদেশে শতদল, এত আশা কার ?

১০

আমি কেন দেই গালি—
হে পশু ! দেখিও কালি,
তুষিতে ও দগ্ধোদর কি করেছ হায়,
শ্মশান সোণার গেহ,
মাতৃরক্তে আর্দ্র দেহ,
সোদরের ছিন্ন শির লুটিছে ধূলায় !

১১

সেই সব শব ঠেলি,
গর্ব্বিত চরণ ফেলি,
বিজেতা দুয়ারে যবে যাবে ভিক্ষা-আশে,
তখন কি বজ্রানল,
পোড়াবে না ভূমণ্ডল,
মরিবে না তৃণ তরু বিষাক্ত বাতাসে ?

১২

উচ্ছ্বসি বারীন্দ্র-বক্ষ,
গর্জ্জিয়া তরঙ্গ লক্ষ,
গ্রাসিবে না লোভাতুরে চিরদিন তরে,
কালফণী ঊর্দ্ধ শিরে,
বিষদন্তে হৃদি চিরে,
দেখাবে না মাতৃঘাতী কত জ্বলি মরে ?

১৩

স্মরিতে শিহরে গাত্র,
শত্রু সপ্তদশ মাত্র,
মায়েরে করিলি দাসী আপনার হাতে,
হায়রে স্বার্থের দাস,
ঘটালি কি সর্ব্বনাশ,
আপনি যে ছাই দিলি আপনার ভাতে !

১৪

এ ব্রহ্মাণ্ড নহে শূন্য,
আছে সত্য ধর্ম্ম পুণ্য !
দেবতা কেমনে সবে হেন পাপাচার,
উঠ জাগ বৈশ্বানর !
বঙ্গের হৃদয়-পর,
মাতৃ-ভ্রাতৃ-দ্রোহী আজি করগো সংহার !

১৫

অই—

সন্ধানিয়া মৃত্যুবাণ,
জ্বলে অগ্নি লেলিহান,
কালান্ত মরণ-ক্রীড়া সহস্র শিখায়,
দিক্‌পাল দেখে রঙ্গে,
কুযশ রাখিয়া বঙ্গে,
মহাপাপী পশুপতি ভস্ম হয়ে যায় !

* * * * *

১৬

সেতো গেছে কত দিন
ফুরায়েছে তার চিন্,
তবু মা ! নয়নে তোর কেন এত জল—
বল্‌না শিশুর কাছে,
আজো কি সে পাপ আছে,
নাহি কি মা প্রায়শ্চিত্ত নাহি কি অনল ?

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম।

এক্ষণে দেশের চারিদিকে উত্তেজনা দেখা যাইতেছে। এ উত্তেজনার কারণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষে যে একটা উত্তেজনা হইয়াছে,তাহা,কি ইংরাজ কি ভারতবাসী, কি রাজভক্ত কি রাজদ্রোহী, সকলেই স্বীকার করিতেছেন। উত্তেজনা কেন হয়, কখন হয়? কখন বা ক্ষতি বোধে, কখন বা অপমান বোধে,কখন বা আত্মরক্ষার চেষ্টায় মনুষ্য-হৃদয়ে উত্তেজনা হয়। আবার কখন বা লাভের আশায়, কখন বা গৌরবের আকাঙ্ক্ষায়, কখন বা কর্ত্তব্যজ্ঞানের তাড়নায়, কখন বা প্রেমের মাদকতায়, কখন বা ধর্ম্মের প্রেরণায় মনুষ্য উত্তেজিত হয়।

ক্ষতি ও অপমান-বোধ-জনিত উত্তেজনায় বিদ্বেষের অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। ইহাতে বিরোধ-বুদ্ধি জন্মে, ইহাতে লোককে আঘাতে,কলহে, সংগ্রামে প্রবৃত্ত করে। আর গৌরবের ইচ্ছায় কর্ত্তব্যজ্ঞানের ও ধর্ম্মের উত্তেজনায় অধিকাংশ স্থলে শীতল প্রেমবারি বর্ষিত হয়, উসর ভূমি উর্ব্বরা হয়, এবং বিরোধ যদি কখন অনিবার্য্য হয়, তাহা হইলে তাহা অধিক দিন থাকে না; এবং পরিণামে তাহা মঙ্গলপ্রসূ হয়। বিরোধ-বুদ্ধি, বা বিদ্বেষ অতি উগ্র হইলে, মনুষ্য নিজের বলের সহিত শত্রুর বল তুলনা করে না, সময় অসময় বিবেচনা করে না, পরিণামের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। আপনার সর্ব্বনাশ হইবে, অথবা জয়লাভের কোন সম্ভাবনা নাই, তাহা জানিয়াও শত্রুকে আঘাত করিতে উদ্যত হয়। ধর্ম্মবুদ্ধিজাত উত্তেজনা হিতাহিত বিবেচনা করে, পরিণামে মঙ্গল হইবে, না অমঙ্গল হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখে। অন্যকে আঘাত করা তাহার উদ্দেশ্য নহে, আপনার বা অন্যের মঙ্গল সাধনাই তাহার লক্ষ্য।

উত্তেজনা যে কারণেই সঞ্জাত হউক, তাহাতে মানুষের যে শক্তি বাড়ে, তাহা যে মনকে বলীয়ান, সাহসী ও উদ্যমশীল করে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগত উত্তেজনা যদি প্রসারিত হইয়া জাতিগত হয়, তাহা হইলে ইহার শক্তি আরও অধিক হয়। কেন না,প্রত্যেকে পরস্পরের উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, এবং এইরূপে জাতীয় উত্তেজনার শক্তি ক্রমশই অতর্কিত ভাবে বাড়িয়া যায়; কখন কখন এত বাড়িয়া যায় যে,সে ঘূর্ণবায়ুর ন্যায় অসহ্য হইয়া উঠে, সম্মুখে, যে বাধা পায়, তাহাকে উড়াইয়া লইয়া যায়, এবং কোন্ মুহূর্ত্তে কোন্ দিকে যাইবে, কেহই বলিতে পারে না। ঐ উত্তেজনায় যাহারা মত্ত হয়, তাহারা প্রাণের ভয় করে না, তাহারা কখন বা ছিন্নমস্তার ন্যায় নিজের রুধির নিজে পান করে, কখন বা একটা মহাবিপ্লব উৎপাদন করে। তাহার দৃষ্টান্ত ফরাসী বিপ্লব।

জাতীয় উত্তেজনা, যেমন একদিকে, সৎপথে যাইলে, দেশের উন্নতিকে সহজে দ্রুতবেগে আনিতে পারে, দশ বৎসরের উন্নতি এক বৎসরে সম্পাদন করিতে পারে, তেমনি অন্যদিকে, তাহা অসংযত হইয়া ক্ষিপ্তভাব ধারণ করিলে, রথের ক্ষিপ্ত অশ্ব যেমন সারথিকে অগ্রাহ্য করিয়া, রথ গভীর খাতে নিক্ষেপ করিয়া আরোহী-

দিগের প্রাণনাশ ঘটায়, তেমনি,জাতীয় উত্তেজনা যদি অসংযত হইয়া ক্ষিপ্তভাব ধারণ করে, তাহা হইলে দেশকে সর্ব্বনাশের অতল সাগরে ডুবাইয়া দেয়।

আগ্নেয়গিরির উদ্‌গার হইলে নিকটবর্ত্তী জনপদবাসিগণ চকিত হইয়া ভয়াকুল চিত্তে আকাশে অগ্নির লাল আভা দেখে, তাহার পর আগ্নেয়-নিঃস্রাবের গতি লক্ষ্য করে, "লাভার" উদ্গারে কোন্ নগর বা গ্রাম ডুবাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করে, এবং আপনাদিগকে তরল অগ্নির প্রবাহ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। তেমনি,যখন বহুদূর বিস্তৃত, গভীর উত্তেজনায় কোন জাতি উত্তপ্ত হয়, এবং সেই উগ্র উত্তেজনার কোন ভীষণ চিহ্ন বাহির হয়,তখন জনসাধারণ স্তম্ভিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে ভবিষ্যাকাশের প্রতি দৃষ্টি করে, ব্যাপারখানা কি, ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করে। যখন বুঝে, সমাজ-গর্ভে কোন স্থানে আগ্নেয়গিরি জ্বলিয়াছে, তখন আপনাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। এবম্বিধ জাতীয় উত্তেজনার সময় অতি ভয়াবহ। জাতীয় উত্তেজনা অসংযত,অদম্য ও পরিণাম-বুদ্ধিশূন্য হইয়া, অন্ধ ও ক্ষিপ্ত হইলে, অতি ভয়ানক রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে।

তাই বলি, স্বদেশ প্রেমিকগণ, স্বদেশ-নৌকার নাবিকগণ যেন সাবধান হন। এই যে জাতীয় উত্তেজনার বিস্ময়-জনক আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাকে যেন সংযমের ও শান্তিময় মঙ্গল পথে লইয়া যান। যাঁহাদের বুঝাইবার কিছু মাত্র শক্তি আছে, শঙ্কটে যাঁহারা বুদ্ধি স্থির রাখিতে পারেন, তাঁহারা সকলে মিলিয়া, যাহাতে এই প্রচণ্ড জাতীয় উচ্ছ্বাসে কর্ম্মীগণ শান্তিময় কর্ম্মক্ষেত্রের পথ অবলম্বন করেন, যাহাতে স্বদেশপ্রেমিক যুবকগণ শোচনীয় আত্মহত্যা-শ্মশানের দিকে ধাবিত না হয়, তাহার জন্য, প্রবীণ স্বদেশ-মঙ্গলপ্রার্থিগণ, বাৎসল্যে, স্নেহে স্বদেশ-প্রেমিকগণকে হৃদয়ে ধারণ করুন, তাঁহাদিগকে মঙ্গলবর্জ্জিত করুণাবহ মরণান্তিক পরিণাম হইতে রক্ষা করুন। বর্ত্তমান সময়ে, দেশের জন্য কাহারও আত্মহত্যার প্রয়োজন নাই: জীবনই প্রয়োজন। কেন না, দেশের শান্তির কর্ম্মক্ষেত্র "পতিত" রহিয়াছে, শ্রমীর অভাবে হাহাকার করিতেছে। এমন জমী, যাতে সোণার ফসল ফলিতে পারে, স্বদেশী কৃষাণগণের অভাবে আবাদ হইতেছে না।

গুপ্ত ভাবে হউক, আর প্রকাশ্য ভাবেই হউক, বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা বৃথা আত্মবলি, নিতান্ত শোচনীয় অমঙ্গলময় আত্মহত্যা।

আত্মহত্যা বলিতেছি কেন, তাহা কি বুঝাইতে হইবে? ভারত এককালে স্বাধীন ছিল না কি? সে স্বাধীনতা গেল কেন? যে সভ্যতা-রবি একদিন সমুদয় জগতকে জ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম্ম দান করিয়া আলোকিত করিয়াছিল, তাহা অস্তমিত হইল কেন? জগতের কোন দেশে রাজপুতগণের অপেক্ষা অধিকতর বীর্য্য শৌর্য্যময় পুরুষ কখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল কি? করে নাই। ক্ষত্রিয়গণ আপনাদিগের পবিত্র শোণিত দিয়া ভারত-জননীর চরণ-পঙ্কজ অবিরাম ধৌত করিয়াছিল, তথাপি মোগলদিগের সহিত সংগ্রামে বিজয় লাভ করিতে পারে নাই কেন? স্বাধীনতা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছিল কেন? প্রাচীন গ্রীসে এক 'থার্মপলির'

গৌরব-ভেরীতে সমুদয় ইউরোপ অদ্যাপি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু, সমুদয় রাজস্থান "থর্ম্পলি"ময়। তুমি রাজপুতনার যেখানেই পদক্ষেপ করিবে, সেখানেই পূর্ব্বতন রাজপুতের পবিত্র শোণিতপূত-ভূমি-স্পর্শে তোমার দেহ পবিত্র হইবে। ভারতের ক্ষত্রিয়গণ যেন বীরত্বের অবতাররূপে ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তথাপি স্বাধীনতা হারাইল কেন? স্বদেশে স্বাধীনতা রক্ষার বা লাভের জন্য যেমন সাহস, বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গ চাই, তেমনি আর কি চাহি, তাহা কি স্বদেশী চরমপন্থীগণ ধীর চিত্তে ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কি শিক্ষা করা যায়? বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেম যেমন কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তেমনি, কোন দেশে কেবলমাত্র একশ্রেণীর মধ্যে বীরত্ব ও স্বদেশিকতা আবদ্ধ থাকিলে সেই দেশের স্বাধীনতা রক্ষা বা লাভ হয় না। দেশের সমুদয় শ্রেণীর লোক, অন্ততঃ দেশের অধিকাংশ লোক, যখন স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়, সমুচিত জ্ঞান লাভ করে—সাহসে, বিজ্ঞানে, কৌশলে, ঐক্যে, সমন্বয়শক্তিতে, নৈতিক উন্নতিতে, প্রতিযোগী জাতিগণের তুল্য বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, তখনই তাহারা স্বাধীনতার যোগ্য হয়। ধর্ম্ম যেমন জাতীয় উৎকর্ষের ফল, তাহার শিখা আপনা হইতেই যেমন ভগবানের দিকে উত্থিত হয়, তেমনি, সমগ্র জাতির উন্নতির সমষ্টি উত্থিত হইয়া জাতীয়-স্বাধীনতায় পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে সে অবস্থা হয় নাই, এবং সে অবস্থা হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। এই অবস্থায় স্বাধীনতার চেষ্টা করা নিতান্ত শোচনীয় ভ্রম, এবং এই ভ্রান্ত চেষ্টাতে দেশের মঙ্গল না হইয়া ঘোর অমঙ্গল হইতে পারে।

সিকন্দরের সময় হইতে ভারতের হাতনাগাত ইতিহাস দেখুন, ভারতের উপর্য্যুপরি পরাভবের কারণ কি? ঐ সমন্বয়ের অভাব—গৃহ-বিচ্ছেদ। বিজয়ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে দিগ্বিজয়ী সিকন্দর পঞ্চনদ ভূমিতে উপস্থিত। কিন্তু পঞ্চনদের হিন্দুরাজারা গৃহবিচ্ছেদে ব্যাকুল ও অবসন্ন। তাহারা সমন্বিত হইয়া যুদ্ধ করিল না। একমাত্র পুরুরাজ যুদ্ধ করিলেন, সুতরাং পরাজিত হইলেন।

আবার যখন মুসলমানগণ ভারত আক্রমণ করিল, তখনও ঐ গৃহবিচ্ছেদের শোচনীয় পরিণাম সংঘটিত হইল। অষ্ট শতাব্দীতে যখন আরবদেশের মহম্মদ কাশিম সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিল, তখন হিন্দুরাজা একক যুদ্ধ করিলেন, নিহত হইলেন। তখন রাণী দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। হায়! নিকটবর্ত্তী কোন হিন্দুরাজা এই বীরাঙ্গনাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। তৎপরে—তৎপরে সেইত প্রাচীন লোমহর্ষণ কাহিনী—রাজপুত বীরাঙ্গনাগণ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া নিজের ধর্ম্ম ও মান রক্ষা করিল! তাহার পরে, রাজপুতগণের ধারাবাহিক ইতিহাস, রাজপুত পুরুষের ও রমণীর ধারাবাহিক আত্মবলি, হৃদয়বিদীর্ণকারী আত্মহত্যার করুণাবহ গাথা। কিন্তু এই ভীষণ নিষ্ফলতার মূলে পাপ ছিল,—গৃহ-বিবাদ, পরস্পরের বিদ্বেষ ছিল। কান্যকুব্জের হতভাগ্য জয়চন্দ্র, দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজকে নষ্ট করিবার জন্য, মহম্মদ ঘোরিকে ডাকিয়া আনিল, অন্যের অনিষ্টসাধনের জন্য নিজের ঘরে দস্যু ঢুকাইল, অন্যকে মজাইল, নিজেও মজিল।

সেকালকার কথা ছাড়িয়া দিন। ইদানীং যাহা হইয়াছে, তাহাই মনে করুন। মারহাট্টার অভ্যুত্থান হইল, পতন হইল কেন? হলকারে পেশোয়াতে বিদ্বেষ, সিন্ধিয়া হলকারে বিদ্বেষ। মারহাট্টার সাহস ছিল, বীরত্ব ছিল। কিন্তু সমন্বয় ছিল না। শিখদিগের মধ্যে সুনীতি ও সমন্বয়ের অভাবে তাহাদের পতন হইল।

ইউরোপে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখিবেন। স্বজাতির মধ্যেত সমন্বয় আছেই। তাহার উপর,—যখন সাধারণ বিপদ উপস্থিত হয়, তখন ভিন্ন জাতিও সমন্বিত হইয়া সাধারণ শত্রুকে দমন করে, পরাজিত করে। দুর্দ্ধর্ষ নেপোলিয়নের অভ্যুত্থানে ইউরোপ কাঁপিল। ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন জাতি তাহাকে দমন করিবার জন্য সমন্বিত হইল; তাই ম্যারেঙ্গোর বিজেতাকে ওয়াটার্লুতে পরাজিত করিতে পারিল; ফরাসীকেশরীকে সকলে মিলিয়া ধরিয়া সেণ্ট-হেলেনার পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া ইউরোপের স্বাধীনতা রক্ষা করিল।

স্বাধীনতার জন্য যে সকল গুণ অবশ্য প্রয়োজনীয় ও অপরিত্যজ্য, তাহার একটীমাত্র সমন্বয়ের অভাবে ভারতে কি অশুভ ঘটিয়াছে! আর বাঙ্গালা দেশে অন্য স্বাধীনতার প্রায় সমুদয় উপকরণেরই কম বেশী অভাব। জ্ঞান?— অধিকাংশ বাঙ্গালী অশিক্ষিত। দরিদ্রগণ গভীর মূর্খতায় নিমগ্ন, জ্ঞান-নেত্র অভাবে তাহারা একবারে অন্ধ এবং নিতান্ত দুর্ব্বল। সুনীতি?— বঙ্গদেশে দিন দিনই নীতির অবনতি হইতেছে। সমাজে দিন দিনই স্বার্থপরতা বাড়িতেছে। ঐক্য ও সমন্বয়?—চতুর্দ্দিকে অনৈক্য। মুসলমান ও হিন্দুতে অনৈক্য। বিহারী ও বাঙ্গালীতে অনৈক্য। জমীদার ও রায়তে অনৈক্য। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদিগের মধ্যে অমিল। ধনী ও নির্ধনে অমিল। সরকারী চাকুরে ও বেসরকারী চাকুরেতে অমিল। চাটুয্যে মুখুয্যেতে অমিল। ভাই ভাইতে অমিল। অনৈক্য ও বিদ্বেষ দিন দিন বাড়িতেছে; মোকর্দ্দমাও দিন দিন বাড়িতেছে। এমন মিল নাই, স্বদেশের লোকের উপর এমন আস্থা নাই যে, দশজনে মিলিয়া দেশের লোককে মধ্যস্থ মানিয়া বিবাদ মিটাইয়া লয়। মুখে স্বদেশপ্রেমের ভাণ, কিন্তু সামান্য স্বার্থের জন্য কতজন আদালতে উধাও হইয়া ছুটিতেছে, নিজে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও ভাই ভাইকে উৎসন্ন দিবার চেষ্টা করিতেছে। এই অনৈক্য-বিদ্বেষ-জর্জ্জরিত দেশে কেমন করিয়া, কেবলমাত্র আত্মহত্যা দ্বারা, কোন মঙ্গল-সাধন হইতে পারে?

এই জন্যই আমরা বরাবরই রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষপাতী নহি। এ কথা আমরা কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ার আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত বলিয়া আসিতেছি। আমাদিগের "নবপ্রভা" মাসিক পত্রে প্রতি বৎসর কংগ্রেসের পূর্ব্বে এই কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিতাম। বর্ত্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলনে কেবল উপকার নাই, এমন নহে। উহাতে অপকার হইবার সম্ভাবনা। তজ্জন্য আমরা বলিয়া আসিতেছি, আবার অদ্যও বলিতেছি যে, রাজনীতির ক্ষেত্র ছাড়িয়া, আবেদন নিবেদনের পন্থা ত্যজিয়া, গবর্ণমেণ্টকে গালি দেওয়া ছাড়িয়া দিয়া, যে সকল ক্ষেত্রে আমাদের নিজের চেষ্টায় দেশের উপকার করিবার ক্ষমতা আছে, সেই সকল ক্ষেত্রে আমাদিগের কার্য্য করা উচিত। অসংগতভাবে গবর্ণ-

মেণ্টের উপর উগ্রভাষা প্রয়োগ করিলে আমাদের লাভ নাই, কিন্তু ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। দেশের প্রতি প্রেমই আমাদিগের কার্য্যের ভিত্তি হওয়া উচিত। বিদেশীয়দিগের প্রতি বিদ্বেষ বা ক্রোধ আমাদিগের কার্য্যের পরিচালক শক্তি হওয়া উচিত নহে। আর এ কথাও আমরা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, কংগ্রেস ইত্যাদি সভার আন্দোলন সত্ত্বেও দেশে যে প্রকৃত স্বদেশ-প্রেম অধিক পরিমাণে সঞ্জাত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কথাগুলি একটু বিস্তৃত ভাবে বলা আবশ্যক। দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষক। জমীদার এই কৃষককুলের হর্ত্তা কর্ত্তা। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, জমিদার ও কৃষকগণের মধ্যে দিন দিনই অসদ্ভাবের বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বে জমীদারগণ প্রজাদিগের উপকারার্থে জলাশয় খনন, বৃক্ষরোপণ, ধর্ম্মশালা স্থাপন প্রভৃতি নানা বিধ সাধারণের হিতজনক কার্য্য করিতেন। তাহা দিন দিনই কমিতেছে। সেদিন একজন উকীল বলিলেন যে, "আমার পরিজ্ঞাত কোন বাঙ্গালী ধনী কুড়ি বৎসরের মধ্যে, সাধারণের উপকারার্থে, স্বেচ্ছায় একটী মাত্রও পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন, তাহা আমার স্মরণ হয় না।" এই কথাটীর মধ্যে একটু "রেটরিক" থাকিতে পারে। তথাপি অলঙ্কার-বর্জ্জিত করিয়া লইলে এই কথাটী মিথ্যা নহে।

জমীদারদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকদিগের বিষয় বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলেও স্বদেশ-প্রেমের প্রকৃত প্রমাণ পাওয়া কঠিন। তাঁহাদিগের মধ্যে, যাঁহারা লিখিবার বা বক্তৃতার সময়, প্রজাবাৎসল্যের উৎস ছাড়িয়া দেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কাহারও ভূসম্পত্তি হয়, তাহা হইলে, তখন তিনি লেখা বা বক্তৃতাভ্যস্ত স্বদেশ-প্রেম বর্জ্জন করেন; তখন খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা, প্রজাদিগের নিকট শুষিয়া খাজনা আদায়ের উদ্যম—তখন প্রজার জন্য জলাশয় খনন ইত্যাদি কার্য্য দূরে থাকুক, প্রজা উঠানের ডোবাটী যদি নিজের খরচে পঙ্কোদ্ধার করিয়া, বৈশাখের দারুণ রৌদ্রে জলকষ্ট নিবারণ করিতে চাহে, তখন আইন কানুনের সাহায্য লইয়া তাহাকে বাধা দেন। প্রজাদিগের পীড়াদায়ক কোন ব্যবস্থার যদি সংস্কারের প্রস্তাব হয়, তাহা হইলে অধিকাংশ স্বদেশী তাহার আনুকূল্য করেন না।

জমীদার বা দেশের সুশিক্ষিত মধ্যবিত্তগণ কৃষকদিগের উন্নতির জন্য কোন কার্য্য করা দূরে থাকুক, তদ্বিষয়ে যে তাঁহারা কখন চিন্তা করেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিলাতের জমীদারগণের মধ্যে কত ব্যক্তি কৃষি সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছেন এবং সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। হরেস প্লঙ্কেট (Horace Plunkett) একজন লর্ডের পুত্র, তিনি আয়র্লণ্ডের কৃষি ও শিল্প বিভাগের সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি স্বজাতির কৃষিকার্য্যে বিস্ময়কর উন্নতি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি কৃষকদিগের উন্নতির জন্য, রাজনৈতিক সংস্রব-বর্জ্জিত, বিশিষ্ট একটী বিশাল সমন্বিত সঙ্ঘ উদ্ভাবন, স্থাপন, পরিবর্দ্ধন ও পরিচালন করিয়াছেন। তিনি কৃষিবিভাগ ও আয়র্লণ্ড সম্বন্ধে চিরস্মরণীয় গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আমাদের দেশে জমিদার বা মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে অদ্যাপি কোন্ মহাত্মা প্লঙ্কেটের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন? উপন্যাস-লেখক হ্যাগার্ড (Haggard) ইংলণ্ডের কৃষি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য পূর্ণ পুস্তক লিখিয়াছেন।

তাঁহার "The poor and the Land" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক সাধারণ লোকেও বেশ বুঝিতে পারে। আমাদিগের দেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকের মধ্যে হ্যাগার্ডের ন্যায় কে গরিব কৃষকগণের উন্নতির জন্য চিন্তা ও তথ্যপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন?

মহাজনগণের করাল কবল হইতে গরিব কৃষকগণকে বাঁচাইবার জন্য নির্দ্ধন মহাত্মা রিফীসেনের মত, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া, কে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করিতেছেন? আমাদের দেশে চৌদ্দ বা বার আনা লোক কৃষক। অথচ আমরা এমনি অবিবেচক যে, আমরা যেন বিশ্বাস করি যে, এই চৌদ্দ বা বার আনা লোক দুর্দ্দশা ও মূর্খতাতে নিপতিত থাকিলেও, স্বদেশ তাহাদিগকে ছাড়িয়া উন্নতিলাভ করিবে। আমরা এমনি মোহে মুগ্ধ হইয়াছি যে, আমরা এইরূপ ভাবে কার্য্য করিতেছি, যেন কেবল বিলাতী বস্ত্র ত্যাগ করিলেই, চৌদ্দ বা বার আনা স্বদেশীকে ত্যাগ করিয়াও, আমরা প্রকৃত "স্বদেশী" হইতে পারিব! ইহার অপেক্ষা শোচনীয় ভ্রম আর কি হইতে পারে!

দেশের অনেক ব্যারিষ্টার ও উকীল প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন। কেহ বা ঐ অর্থে জমীদার হইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অল্প লোককেই সাধারণের মঙ্গলজনক কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতে দেখা যায়। নিজের গ্রামের লোকে জলাভাবে মরিতেছে, তৎপ্রতি তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই দৃষ্টি পড়ে না। জল নিকাশের অভাবে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তৎপ্রতি তাঁহারা উদাসীন।

যাঁহারা সবজজ বা ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া মান ও অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কত জন সৎকার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকেন? একটী ঘটনা মনে পড়িল। একজন বড় চাকুরে পেন্সন লইয়াছেন। তিনি নিজের গ্রাম ত্যাগ করিয়া অধিকাংশ সময় কলিকাতায় থাকেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "আমাদের বড় জলকষ্ট, তাই সেখানে থাকিতে পারি না।" শুনিলে কত দুঃখ হয়। এতদিন ধরিয়া দাসত্ব করিয়া, অর্থ উপার্জ্জন করিলেন; অথচ নিজের গ্রামের জন্য, নিজের পল্লীর জন্য, নিজের পরিবারের জন্য, একটা ছোট পুকুরও কাটাইতে পারিলেন না! এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজে এক্ষণে বিরল নহে।

অধিকাংশ ধনীগণের স্বভাব দিন দিন এত বিকৃত হইতেছে যে, সাধারণ লোকের উপকার করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের ব্যয়-সম্পাদিত কার্য্যে, তাঁহাদের নিজের কোন অনিষ্ট বা অসুবিধা না হইয়াও যদি সাধারণের কোন উপকার হয়, তাহা হইলে যেন তাহারা ক্ষুব্ধ হন।

যতদিন ধনীগণ গরিবদিগের দুঃখের প্রতি উদাসীন থাকিবেন, জমীদারগণ রায়তদিগের কষ্টের প্রতি উদাসীন রহিবেন, যত দিন উচ্চ শ্রেণীর সহিত ও নিম্ন শ্রেণীর সমবেদনা সঞ্জাত না হইবে, ততদিন কথনই আমাদের দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে না।

আর এক কথা, যদি আমাদিগের দেশের ধনী ও শিক্ষিত লোক স্বদেশী গরিব ও মূর্খ লোকের সুখ দুঃখের সহিত সহানুভূতি করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমরা কেমন করিয়া আশা করিতে পারি যে, বিদেশী শাসনকর্ত্তারা আমাদিগের সুখ দুঃখের সহিত সম্পূর্ণ রূপে সহানুভূতি

স্থাপন করিতে পারিবেন ? বস্তুতঃ আমাদের পাপের শাস্তি আছে। আমরা স্বদেশী গরিব ভাই ভগ্নীর কষ্টের প্রতি উদাসীন ও নির্ম্মম। তাই, আমাদের সেই পাপের ফল ভোগ করিতে হইতেছে।

কোনও সাহেব যদি কোন গরিব লোকের উপর অত্যাচার করে, আমাদের "প্রেটিয়ট"-গণ চীৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করেন। ইহা করাও উচিত। কিন্তু, যখন স্বদেশী ধনী কোন গরিবের উপর অত্যাচার করেন, তখন তাঁহারা নির্ব্বাক, তখন তাঁহাদের স্বদেশ-স্নেহ ও মানবপ্রেম একবারে অন্তর্হিত হয়। গরিব লোকের কষ্ট নিবারণের জন্য কয়-জন স্বদেশী "পেট্রিয়ট" চেষ্টা করেন ? বঙ্কিম বাবু আন্দোলনকারী স্বদেশী'পেট্রিয়ট'ছিলেন না ; গবর্ণমেণ্টের কার্য্য তীব্র ভাবে আলোচনা করাই তাঁহার জীবনের কার্য্য ছিল না ; কংগ্রেস-মঞ্চে তিনি আরোহণ করেন নাই। তথাপি তিনি বঙ্গদর্শনে বঙ্গের কৃষক সম্বন্ধে যে প্রবন্ধাবলী, নিরপেক্ষ ও নির্ভীকভাবে,প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি প্রকৃত "স্বদেশী" ছিলেন। দুঃখের বিষয়, এক্ষণকার অধিকাংশ "স্বদেশী" আন্দোলনকারী কৃষকদিগের দুরবস্থার প্রতি নিতান্ত উদাসীন।

গরিবদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে "স্বদেশী"গণের চেষ্টা অদ্যাপি বড় দেখা যাইতেছে না। অদ্যাপি সেই পুরাতন আবেদন নিবেদন গবর্ণমেণ্টের নিকট চলিতেছে, free primary educationএর জন্য। কিন্তু আমরা শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে এ বিষয় কিছু করিতে পারি বা এ বিষয়ে যে আমাদের কিছু কর্ত্তব্য আছে, তাহা আমরা সম্যক্‌রূপে অনুভব করি না। যখন আমরা কোন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে অর্থ ব্যয় করিতে অনুরোধ করি, তখন বিস্মৃত হই যে, গবর্ণমেণ্ট ঐ কার্য্যের জন্য বিলাত হইতে টাকা আনিবেন না, আমাদের নিকট হইতে টাকা লইবেন। ঐ টাকা ঠিক আমাদের মতানুযায়ী খরচ হইবে না।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেশের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। ইহাতে স্বদেশবৎসল ব্যক্তিগণের যে প্রচুর পরিমাণে কর্ত্তব্য কার্য্য আছে, তাহা যে আমরা অনুভব করি, তাহার নিদর্শন লক্ষ্য হয় না। এই ক্ষেত্রেও কেবল গবর্ণমেণ্টের নিকট মামুলি আবেদন নিবেদন হইয়া থাকে।

সামাজিক বিষয়েও দেখা যায়, দেশ দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে। বিবাহে পাত্রপক্ষ কর্ত্তৃক পাত্রীপক্ষকে মর্দ্দন, নিষ্পেষণ ও অর্থরুধির নিঃসারণ করা যে অতি নীচ, ঘৃণিত ও জঘন্য কার্য্য, তাহা সকলেই বুঝেন। কিন্তু সমাজে এই পৈশাচিক প্রবৃত্তির দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। কোন কোন গৃহস্থ, মাসিক ২০৲।৩০৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়াও, কন্যার বিবাহার্থে ভদ্রাসন বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ্জ করিতে বাধ্য হন এবং শেষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, ভগ্নহৃদয়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। হিরোডোটসের ইতিহাসে পাঠ করা যায়, কোন কোন দেশে প্রাচীনকালে বিবাহের জন্য বাজারে পাত্রীর নিলাম হইত। আমাদের দেশেও হয়ত আর কিছুকাল পরে বাজারে বা এক্সচেঞ্জে পাত্রের নিলাম হইবে। এ বিষয় গবর্ণমেণ্টের ত কোন দোষ নাই। প্রতীকার আমাদের হাতেই আছে। সুখের বিষয়,সংবাদ পত্রে দেখিলাম,এই বিষয় প্রতীকার করিবার জন্য কতকগুলি ছাত্র একটা সভা করিয়াছেন। ইহাতে ভরসা করা যায় যে,ছাত্রগণ শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন যে,তাঁহাদের মহামূল্য স্বার্থত্যাগী জীবন রাজনীতি

ক্ষেত্রে বৃথা বিপন্ন ও বৃথা নাশ না করিয়া, অন্যান্য নানা কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন।

সহসা আত্মহত্যা করা অপেক্ষা দীর্ঘকাল কষ্ট সহ্য করিয়া সমাজের নানাবিধ মঙ্গল কার্য্য সমাধা করা শ্রেয়।

আত্মহত্যা করিলেই যে একটা গৌরবের কার্য্য হয়, তাহা নহে। অভিমানিনী বঙ্গবধূ শাশুড়ীর বা স্বামীর সামান্য তিরস্কারে আক্ষেপ করে। অলস বালক লেখাপড়া করে না বলিয়া পিতা তাহাকে তিরস্কার করিলে কখন বা আত্মহত্যা করে। তাহাতে তাহাদের গৌরব নাই। কেবলমাত্র জীবনত্যাগে গৌরব নাই। জীবনত্যাগের উদ্দেশ্য ও ফল মহৎ হইলেই জীবনত্যাগ গৌরবান্বিত হয়। এক্ষণে বালকগণের আত্মহত্যার উদ্দেশ্য ও ফল প্রকৃতপক্ষে দেশের হিতজনক নহে। সুতরাং তাহাদের আত্মহত্যাতে পৌরুষ নাই।

গুপ্তহত্যার দ্বারা কোন দেশ স্বাধীন হয় নাই। ইতিহাস তাহার সাক্ষী। সমগ্র দেশের উন্নতি না হইলে দেশ স্বাধীন হয় না। এ সহজ কথা। বিদেশ-বিদ্বেষ স্বাধীনতার মূল নহে, স্বদেশপ্রেমই স্বাধীনতার জনক। যখন স্বদেশপ্রেম দেশের সমুদয় লোকের উপর ছড়াইয়া পড়িবে, যখন সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ অপর সকল অঙ্গের বেদনা অনুভব করিবে, যখন দেশের অধিকাংশ লোক শিক্ষিত হইবে, যখন নীচতা, ক্ষুদ্র নীচ স্বার্থ দেশের অধিকাংশ লোকের মন হইতে দূরীভূত হইবে, যখন কি গরিব কি ধনী, কি জমিদার কি রায়ত, কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলে আন্তরিক ভ্রাতৃস্নেহে ও স্বদেশপ্রেমে পরস্পরের দ্বারা আলিঙ্গিত হইবে, তখনি দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে। হে সাধু স্বদেশপ্রেমিকগণ, আপনারা দেশের প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র দীর্ঘকাল অধ্যবসায়ের সহিত শান্তিময় সেবা-কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হউন। হে স্বদেশপ্রেমিকগণ, আপনারা দয়া ও স্নেহে দেশের মূর্খ, গরিব, ভ্রান্ত, পাপী লোকদের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হউন। দেশে শিক্ষা বিস্তার করুন, স্বাস্থ্যের উদ্ধার করুন, অন্ন সংস্থানের উপায় করুন, কৃষিকার্য্যকে উন্নত করুন, কৃষকদিগকে রক্ষা করুন, দেশের গৃহ বিবাদ বিসম্বাদ দূর করুন, মিশনারিগণের ন্যায়, দেশে ছড়াইয়া পড়ুন। দরিদ্রের অন্ধকার-কুটীরে জ্ঞানের দীপ লইয়া যাউন, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যালয় স্থাপন করুন, দুর্ভিক্ষে মুমূর্ষু ব্যক্তির মুখের নিকট অন্ন লইয়া যাউন, গ্রাম সকল পরিষ্কার করাইয়া, জলনিকাশ করাইয়া, জলাশয় খনন করাইয়া ম্যালেরিয়া ও কলেরা তাড়াইয়া দিন। সাধু স্বার্থত্যাগী-জীবনের দৃষ্টান্ত বলে জনসাধারণকে—ধনী নির্ধনকে—ক্ষুদ্র স্বার্থ, বিদ্বেষ জড়তা ত্যাগ করিয়া, বিশুদ্ধ জীবন অবলম্বন করিতে শিক্ষা দিন। এক কথায়, সকলকে—ধনী ও গরিবকে, হিন্দু ও মুসলমানকে, সর্ব্বশ্রেণীর লোককে, পক্ষপাত ছাড়িয়া, সেবা করুন; কার্য্যে ও উপদেশে সেবাধর্ম্ম বিস্তার ও প্রচার করুন। প্রীতি ও সেবার মধুর বন্ধনে সকলকে বাঁধিয়া ফেলুন; পরকে আপন করুন, দূরকে নিকট করুন, শত্রুকে মিত্র করুন।

এই সেবাধর্ম্ম অতি উদার, অতি বিশাল, ইহা সকল ধর্ম্মেরই মূল মন্ত্র, সকল ধর্ম্মকেই ইহা আলিঙ্গন করে। কেন না, সকল ধর্ম্মই ইহার অন্তর্গত। অভেদ জ্ঞান ইহার

চক্ষু, পরোপকার ইহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, প্রেম ইহার আত্মা। ঐক্য ও সমন্বয় ইহার পুত্র। এই সেবা-ধর্ম্মের এমন সমন্বয়-শক্তি আছে যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে স্নেহে সংযুক্ত করিয়া এক মহাজাতি সৃষ্টি করে; তখন সেবাধর্ম্ম, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-চক্র কৌশল পূর্ব্বক সংযোগ করিয়া, একটী সমন্বিত মহাযন্ত্র সৃষ্টি করে, যে মহা যন্ত্রের প্রত্যেক চক্র আপন আয়তন ও স্থান অনুসারে ঘুরিতে থাকে। তখন এই সমন্বিত কার্য্যের ফলে, সমুদয় সমাজের উন্নতি ও মঙ্গল সুচারুভাবে সংসাধিত হয়। নবসমন্বিত মহাজাতির ঐকতানিক গৌরব-সঙ্গীত, নানা রকমের রাগরাগিণীতে গীত হইয়া, বিশ্বমন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। তখন সেই ঐকতানিক ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যদেব হাসিতে হাসিতে উদিত হন; তখন সেবাধর্ম্ম-বিরাজিত ধরাতল পুলক-কিরণে প্লাবিত হয়। তখন মনুষ্যচিত্ত মঙ্গল আকাশে, সুখ-বিভোর বিহঙ্গের ন্যায়, উল্লাসে উঠিতে থাকে, ছুটিতে থাকে, গাহিতে থাকে—সুদূর মেঘপুঞ্জ হইতে মধুর ঝঙ্কার বর্ষণ হয়, জগৎ-রঙ্গমঞ্চে সেবা-ধর্ম্মের পবিত্র নাটক অভিনয় হয়।

এই সেবাধর্ম্ম বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম। ইহাই আমাদের মঙ্গলের একমাত্র পথ, সর্ব্বাঙ্গীন স্থায়ী উন্নতির একমাত্র সোপান। ইহা যিনি সম্যক্‌রূপে অভ্যাস করেন, তিনি দেবতা হইয়া যান; যাঁহাদিগের উপর অভ্যাস করা যায়, তাঁহারা ক্রমে দেবতা হইবার যোগ্য হন। ইহা মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করে। স্বদেশ-উৎসর্গীকৃত সাধুগণ, তোমরা এই যুগধর্ম্মের প্রচারক। তোমাদের স্বদেশপ্রেম, তোমাদের আত্মোৎসর্গ—আত্ম-হত্যা পাপের ও অশান্তির ভ্রান্ত বিপথে যাইলে দেশের মঙ্গল হইবে না, বরঞ্চ প্রভূত অমঙ্গল হইবে। গুণরাশি পুণ্যকর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োগ করিবার জন্য, সেবার স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবার জন্য, ভগবান তোমাদিগের হৃদয়ে এই দিব্যজ্যোতি প্রেরণ করিয়াছেন। নবযুগ-ধর্ম্মে তোমরা শান্তি ও প্রেম, সেবা ও মঙ্গল সংসাধিত কর।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা।

বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি কি, ইহা নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া শত্রু মিত্র অনেকেই ইহাকে নানা দিক্ হইতে আক্রমণ করিতে ছাড়িতেছেন না। অনেক আছেন, যাঁহারা দেশের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁহারাও বুঝিতে না পারিয়া এই আন্দোলনের উপর মাঝে মাঝে কটাক্ষ-পাত করেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস এম্-এ মহাশয়ের জাতি ও জাতীয় ভাষা নামক যে সুন্দর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধটী গত বৈশাখ মাসের নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও এই ত্রুটী লক্ষ্য করিয়া

আমরা দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহার মূল প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে, তবে তিনি ভাষাকে যে কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন, তাহা করা সম্ভব কিনা, তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন। তিনি ভারতীয় ভাষার যে দোষের সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা ভারতের বাহিরে সভ্য অসভ্য অনেক জাতির মধ্যেই লক্ষিত হইবে। ভাষায় যৌগিক, যোগরূঢ় ও রূঢ়, এই তিন প্রকার শব্দই থাকিবে। ধাত্বর্থের দ্বারা বিচার করিয়া যদি শব্দ রক্ষা করিতে হয় এবং যে শব্দ ধাত্বর্থ-সম্মত নহে, তাহা যদি বর্জ্জন করিতে হয়,তবে এক কোপে ভাষার অর্দ্ধেক শব্দ ছাটিয়া ফেলিতে হইবে, ইহা একেবারে অসম্ভব। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে,যাহার যাহা উপযুক্ত নয়,তাহাকে সেই সম্মান প্রদান করিলে ঐ সম্মানের লোভে সে উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করে। মানব চরিত্রকে উন্নত করিবার এই প্রণালীটী একেবারে বর্জ্জন করা যুক্তিযুক্ত হইবে কি? যাহা হউক, আমি এ বিষয়ের আলোচনায় এখন প্রবৃত্ত হইব না। যোগেন্দ্র বাবু যে নিতান্ত গায়ে পড়িয়া বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে একটী নাতিহ্রস্ব, নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিতেছি।

যোগেন বাবু সর্ব্ব প্রথমেই বলিতেছেন যে,বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু জাতির উন্নতির সকল চেষ্টা রাজনীতির একচেটিয়া হইয়া গিয়াছে এবং সে রাজনীতি কি, না মিণ্টো সাহেবের মাথা ধরিয়াছে কিনা, তাহারই সংবাদ সংগ্রহ করা। যোগেন বাবু তাঁহার উক্তি দ্বারা ইহাই বিশেষ ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান রাজনীতি-ক্ষেত্রের সঙ্গে তিনি একেবারেই অপরিচিত। মিণ্টো মর্লীর Speech বা মাথাধরা তো দূরের কথা, তাঁহাদের বাপের শ্রাদ্ধ বা প্লেগ কলেরার খবর লইতেও যে বর্ত্তমান রাজনৈতিকগণ নারাজ এবং সেই জন্যও যে তাঁহারা Extremist বলিয়া অভিহিত, এই মহা অপ্রয়োজনীয় সংবাদটীও যোগেন বাবু জানেন না, ইহা অতীব দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। আর বর্ত্তমান আন্দোলন নির্জ্জলা রাজনৈতিক, ইহাও একটা নিতান্ত মিথ্যা অপবাদ। জাতীয় শিক্ষা, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টার জন্য যে শত শত লোক প্রাণ দিয়া খাটিতেছেন, ইহা যদি চোখে না পড়ে, তবে আমাদের নিতান্তই দৃষ্টি-দোষ ঘটিয়াছে, বলিতে হইবে। তবে রাজনৈতিক বাধায় আমাদের সমস্ত উন্নতি আটকাইয়া গিয়াছে বলিয়া যদি সে দিকে একটু বেশী ঝোঁক পড়িয়া থাকে, তবে তাহা স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়াছে, কিছু দোষের হয় নাই। আমাদের জাতীয় জীবনের রাজনীতি বিভাগ যেরূপ পীড়াগ্রস্ত হইয়াছে, আশু প্রতীকার না হইলে,তাহাতেই যে আমাদের জীবন বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, ইহা তো সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন এবং সেই জন্যই সে দিকে বেশী নজর দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে। মুখের মধ্যে অনেক দাঁত আছে। কিন্তু যে দাঁতটা পীড়িত, জিহ্বা সব কর্ম্ম ভুলিয়া কেবল সেখানেই যায়, চেষ্টা করিয়া ফিরাইয়া রাখা যায় না। ইহাতে দোষ দিতে পার, কিন্তু স্বভাবের গতি রোধ করিতে পার না। আমাদের রাজনৈতিক জীবন যে স্বাভাবিকরূপে পীড়াগ্রস্ত,ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং where

the shoe pinches, এই নীতি অনুসারে, যেখানে অস্ত্রের লেখা, ব্যথাও তথায় এবং যেখানে ব্যথা, হাতখানাও সমস্ত শরীর ছাড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সেইখানেই যায়। ইহাতে রাগ করিলে চলিবে কেন? আগে জীবন রক্ষা, পরে তো উন্নতি। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে এ জাতি যে জীবন-মৃত্যুর সমস্যায় উপনীত হইয়াছে, এ কথা কি কাহারও অস্বীকার করিবার সাধ্য আছে? এবং এ সকল ব্যাধির মূল যে ভারতের বর্ত্তমান দরিদ্রতা, তাহাই বা কে অস্বীকার করিতে পারে? এ দরিদ্রতার মূল যে আবার বর্ত্তমান অস্বাভাবিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেই স্বীকার করিতেছেন। ইহা আমাদের অজ্ঞানতা বিজৃম্ভিত প্রলাপ নহে, কিন্তু বিলাতের ও এ দেশের অর্থনীতিবিদ্‌গণ এক বাক্যে তাহা ঘোষণা করিয়াছেন। ডিগ্‌বি সাহেব, দাদাভাই নৌরজী ও রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ মহাত্মাগণ ইহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। এখন কি, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ পর্য্যন্ত বহুদিন পূর্ব্ব হইতে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। Sir W. Hunter বড় লাটের সভায় ১৮৬৯ খ্রীঃ বলিয়াছিলেন, "The Government assessment does not leave enough food for the cultivator to support himself and his family throughout the year." ইহাই কি দুর্ভিক্ষ নহে এবং ইহাই কি দরিদ্রতার কারণ নহে? সমাজ সংস্কারই কর, আর চরিত্রের উন্নতি করিয়া বুদ্ধ যীশুই হও, এ মৃত্যুর হস্ত হইতে কি রাজনৈতিক কর্ম্ম চেষ্টা ছাড়া আর কিছুতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে? যে শাসন প্রণালী এই দরিদ্রতার কারণ, তাহার আমূল সংস্কার ছাড়া এ বিপদের হস্ত হইতে উদ্ধার নাই এবং রাজনৈতিক কর্ম্ম-চেষ্টা ছাড়া ইহার সংস্কারেরও আর পন্থা নাই। পুত্রকে সাপে কামড়াইয়াছে এবং পিতা আপনার সমস্ত শক্তি সামর্থ্য ও অর্থ নিয়োগ করিয়া ওঝা আনাইয়া তাহার প্রতিবিধানে নিযুক্ত। এমন সময়, যদি কোন বুদ্ধিমান্ আসিয়া বলেন "ওহে তুমি তো ভারী নির্ব্বোধ, সব টাকা খরচ করিয়া ফেলিলে? তারপর, পুত্রের শিক্ষার জন্যই বা কি ব্যয় করিবে, আর পুত্রের বিবাহে নববধূকেই বা কি যৌতুক দিবে?" তাহা হইলে, যেমন দুরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয়, বর্ত্তমান সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীগণকে আক্রমণ করিয়া আমরা তেমনি বুদ্ধির পরিচয় দিতেছি।

যোগেন্দ্র বাবু বলেন যে, আগে সামাজিক উন্নতি, তারপর রাজনৈতিক উন্নতি। এই উক্তিটীর মধ্যে একাধিক Fallacy বর্ত্তমান। fallacy আছে বলিয়াই তিনি এ বিষয়ে স্ববিরোধিতা দোষে দুষ্ট হইয়াছেন। তিনি আবার নিজেই বলিতেছেন যে, মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি একত্র আরম্ভ করিলে পরস্পরের সাহায্যে সকলেই চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। যদি সকল উন্নতি পরস্পরের সাহায্য সাপেক্ষ, তবে একটা আর একটার আগে আরম্ভ হইবে কেন, এ যুক্তি বুঝা গেল না। তারপর, কতটা সামাজিক উন্নতি হইলে স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ততা লাভ হয়, তাহাও আমাদিগকে বলিয়া দেওয়া হয় নাই। যদি বলা হয় যে, সামাজিক উন্নতি পরাকাষ্ঠা লাভ করিলে রাজনৈতিক উন্নতি আরম্ভ হইবে, তবে বাস্তব জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে

ইহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে। কেন না, জগতে যাঁহারা রাজনীতিতে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, তাঁহাদের সমাজ উন্নতিতে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় নাই। আমেরিকায় বা ফ্রান্সে ভুরি ভুরি সামাজিক দোষ ক্রুটী লক্ষিত হইবে। অন্য দিকে আবার জগতে এমন অনেক দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বর্ত্তমান, যেখানে সমাজ ভারতীয় সমাজ অপেক্ষা কোন অংশেই উৎকৃষ্ট নহে। সুতরাং আগে সমাজ উন্নত কর, পরে রাজনৈতিক অধিকার লাভের চেষ্টা করিও, ইহা একটা নিতান্ত ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। আর একটা কথা এই যে, সমাজ বা রাজনীতি জাতীয় জীবন-শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ। সুতরাং আগে তোমার প্লীহাকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর কর, পরে তুমি লিভার পাইবে, বলাও যা, আগে সমাজ সংস্কার কর, পরে তুমি রাজনৈতিক অধিকার পাইবে, ইহা বলাও তা। অথবা তোমার লিভার যখন আমার অপেক্ষা দুর্ব্বল, তখন তুমি আমার অপেক্ষা সবল ফুস্‌ফুসের অধিকারী হইতে পার না, ইহা যে শ্রেণীর যুক্তি, তোমাদের সমাজে যখন গলদ আছে, তখন তোমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইতে পার না, ইহাও সেই শ্রেণীর যুক্তি। উভয়ই সমান অশ্রদ্ধেয়। শরীরে কোনও স্থানে আঘাত লাগিলে, সমস্ত রক্তের গতি যেমন সেই দিকে হয়, শরীরে বিষ প্রবেশ করিলে যেমন সমস্ত শরীরই সেই বিষকে বাহির করিয়া দিবার জন্য চেষ্টিত হয়, আমাদেরও রাজনীতি অঙ্গ বিশেষ আহত বলিয়া অতি স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের সকল চেষ্টা সেই দিকে ঝুঁকিয়াছে। বাস্তবিক আমরা আর সকল ভুলি নাই। আমার প্লীহাটা বড় হইলে, ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়া আমি তাঁহাকে কেবল প্লীহার কথাই বলি, আর কোন কথা বলি না। যাহাতে প্লীহা সুস্থ হয়, সেই ব্যবস্থা করিবার জন্যই ডাক্তারকে বার বার অনুরোধ করি। এ কার্য্যে ইহা বুঝায় না যে, আমি কেবল একটা প্লীহা মাত্র এবং আমার অন্য কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই বা তাদের বিষয়ে অমনোযোগী। ইহার কারণ এই যে, প্লীহাটা বেশী রুগ্ন, সুতরাং তার ব্যবস্থা আগে করা কর্ত্তব্য। নতুবা ক্রমে সকল যন্ত্রই বিকল, হইয়া সমস্ত দেহের বিনাশ সাধন করিবে। আমাদের রাজনৈতিক যন্ত্র অত্যন্ত বিকল, তাহাকে সারিতে না পারিলে যে জাতীয় বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং তাহার জন্য বেশী মনোযোগ অত্যন্ত স্বাভাবিক, না করিলে অত্যন্ত অস্বাভাবিক হইত। তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হইত যে, আমরা মরিয়া গিয়াছি। তবে যাঁহারা মনে করেন যে, আমরা আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় সুখে শান্তিতে আছি, এস, আমরা এখন নির্ব্বিঘ্নে অন্যান্য উন্নতির চেষ্টা করি, তাহাদের অবস্থা যক্ষ্মা রোগীর অবস্থার সমতুল। মৃত্যু যতই নিকটবর্ত্তী হয়, রোগী ততই মনে করে, আমি বেশ আছি, তারপর মৃত্যুর দিন মনে করে, আমি সারিয়া গিয়াছি।

আর একটী কথা এই, ভারতবাসী কি বাস্তবিকই সামাজিক উন্নতির চেষ্টা করিতেছে না? এ অপবাদটা নিতান্ত মিথ্যা অপবাদ। সামাজিক উন্নতিরও চেষ্টা হইতেছে, তবে অতি স্বাভাবিক কারণে রাজনৈতিক চেষ্টা ও উদ্যম বেশী। তবে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের মধ্যে যে সমাজসংস্কার-বিরোধী নাই, তাহা নহে। কিন্তু সেটা তাহাদের রাজনীতির দোষ নহে, বুদ্ধির

দোষ। দেশে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন না থাকিলেও, তাঁহারা সংস্কারের বিরোধী হইতেন। সুতরাং তাঁহাদের দোষ রাজনীতির ঘাড়ে চাপানটা একটা fallacy মাত্র। তারপর ভারতের সমাজ অন্ততঃ তিন চার হাজার বছরের প্রাচীন, কিন্তু রাজনীতি নিতান্ত অর্ব্বাচীন। সুতরাং এ দুয়ের পরিবর্ত্তন এক শ্রেণীর অন্তর্গত নহে।

আর একটী গুরুতর বিষয়ে যোগেন বাবু বর্ত্তমান আন্দোলনের ভিতরকার কথা ধরিতে অসমর্থ হইয়াছেন। যাঁহারা স্বরাজ চাহিতেছেন, তাঁহারা এ কথা বলেন না যে, স্বরাজ পাইলেই স্বরাজোচিত গুণ আকাশ হইতে তাঁহাদের জন্য ঝুপ করিয়া পড়িবে, বরং তাঁহারা বলিতেছেন যে, স্বরাজ না পাইলে এই সকল গুণগ্রাম লাভের উপায় নাই। সেই জন্যই তো স্বরাজের আন্দোলন এত শক্তিশালী হইয়াছে। আন্দোলনের মধ্যে এ কথা কেহ কখনও বলে নাই যে, পড়া মুখস্ত না করিয়াও পরীক্ষা-মন্দিরে প্রশ্নের উত্তর আপনা হইতে জুটিয়া যাইবে। বরং এই কথাই বলা হইতেছে যে, স্বরাজ ছাড়া পড়া মুখস্থ করিবার উপায় নাই, পরীক্ষা তো দূরের কথা। অধীনতায় স্বাধীনতার উপযোগী মানসিক ক্ষমতা জন্মে না, এই কথার উপর টিপ্পনি করা যোগেন বাবুর মত বিদ্বান্ লোকের উপযুক্ত হয় নাই। যে সিংহাসনে চন্দ্রগুপ্ত বসিয়াছিলেন, সেই সিংহাসনে বসিলেই চন্দ্রগুপ্ত হওয়া যায় না, তাহা ঠিক্। কিন্তু সেই সিংহাসনে বসিবার অধিকার থাকিলেই মাঝে মাঝে চন্দ্রগুপ্ত অশোক জন্মগ্রহণ করে। যদি সে সিংহাসনের ত্রিসীমায় কাহারও যাইবার অধিকার না থাকে, তবে কোন কালেই যে একটা সাধারণ রাজাও জন্মিবে না, অশোক তো বহুদূরের কথা, এ কথা কি যোগেন বাবু অস্বীকার করিতে পারেন? "Go to the Chair and the Chair will make you a Deputy Magistrate"—এই উক্তিটী যে গভীর অর্থপূর্ণ, তাহা কেহ স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। পরমুখাপেক্ষিতায় বর্দ্ধিত হইয়া স্বাবলম্বন শিক্ষা করিবার চেষ্টাও যা, অধীনতায় পুষ্ট হইয়া স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হইবার চেষ্টাও তা, একই কথা। যোগেন বাবু যে দৃষ্টান্তটী দিয়াছেন, তাহার অর্থ তিনি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। বালক কি কেবল পড়া মুখস্থ করিয়াই পরীক্ষা-মন্দিরে উপস্থিত হয়, তাহাকে কি সারা জীবন পরীক্ষা-মন্দিরের apprenticeই করিতে হয় না? তাহাকে কি সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক পরীক্ষার apprenticeshipএর ভিতর দিয়া তবে পরীক্ষা-মন্দিরে উপস্থিত হইতে হয় না? এই Kindergarten system সর্ব্বত্রই প্রযুজ্য। যে বালক পরীক্ষা-মন্দিরে প্রবেশের পূর্ব্বে পরীক্ষা কি করিয়া দিতে হয়, তাহা জানে না, পরীক্ষা-মন্দিরে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহাকে তো মন্দিরের দ্বার হইতেই অর্দ্ধচন্দ্র খাইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়, দুই বৎসর ধরিয়া যতই পাঠ মুখস্থ করুক না কেন। এরূপ ছাত্রের শিক্ষকের প্রতিও বেতন ছাড়া আরও কিছুর—বেত্রের ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়। সেই জন্যই স্কুল কলেজকে পরীক্ষা-মন্দিরে পরিণত করিয়া কত কৌশলে ছাত্রকে পরীক্ষায় অভ্যস্ত করিতে হয়। তাহাকে কত প্রকারে হাতে কলমে শিখাইয়া দেওয়া হয়

যে, কলেজে কেতাব লইয়া আসিলেও পরীক্ষা-মন্দিরে কেতাব লইতে নাই, কলেজে কথা বলিতে পাইলেও পরীক্ষা-মন্দিরে একেবারে নির্ব্বাক থাকিতে হয়। সুতরাং সময়ে সময়ে স্কুল কলেজ একেবারে পরীক্ষা-মন্দিরে পরিণত হয়। কেন না, কলেজের হাবভাব পরীক্ষা-মন্দিরের নহে। সব রকম শিক্ষায় যে কিণ্ডারগার্টেন প্রথার এত আদর, রাজনৈতিক শিক্ষার বেলায় কোন্ বিভীষিকা আমাদিগকে সে পথ-ভ্রষ্ট করিতেছে? রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও লর্ড রিপন এই প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এখন সেই নীতির বিস্তর বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, এবং সেই জন্যই আন্দোলন বাড়িয়াছে।

জলে না নামিয়া সাঁতার শেখার দৃষ্টান্তটা সর্ব্বজন বিদিত। যোগেন্ বাবু বলেন, সাঁতার শেখার পূর্ব্বে অঙ্গ সঞ্চালন শিক্ষা প্রয়োজন। যে অঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারে না, কিন্তু পঙ্গু, সে সাঁতার শিখিতে পারে না, একথা সত্য। কিন্তু অঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারে না, এমন লোক বিরল হইলেও সকলেই সাতার জানে না কেন? যোগেন বাবুর বোধ হয় চৌবাচ্চার জল নাড়া ছাড়া সন্তরণের অন্য অভিজ্ঞতা নাই, তাই বোধ হয়, তিনি স্থলে অঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারাই সন্তরণ শিক্ষা করা যায়, এই হাস্যকর প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বোধ আরও মনে করিয়াছেন যে, ভারতবাসী মধ্য আফ্রিকার নিগ্রো অপেক্ষা রাজনৈতিক অঙ্গ সঞ্চালনে অধিকতর দক্ষ নহে। কিন্তু যাঁহারা জানেন যে, এই বিশাল ভারত-ক্ষেত্রটা ভারতবাসীই চালাইতেছে, তবে তাহাদের মাথার উপর বসিয়া যাঁহারা কেবল মাত্র নাম সই করিয়া মাসে চার পাঁচ হাজার টাকা গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা সাক্ষী গোপাল মাত্র, তাঁহারা অবগত আছেন যে, ভারতবাসীর রাজনৈতিক অঙ্গ সঞ্চালনের কিছু মাত্র অভাব নাই, অধীনতায় যতদূর সম্ভব তাহা হইয়াছে, এখন কেবল মাত্র গা ঝাড়া বাকী। অঙ্গ সঞ্চালনের কিছুই ত্রুটী নাই।

যোগেন বাবু গায়ের জোরে যাহাই বলুন না কেন, স্বাধীন দেশের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন—"It is liberty alone that fits man for liberty" তাহা অপেক্ষা উচ্চতর উপদেশ আমরা আর কোথাও পাইতে পারি না। আমরা ভারতবাসীকে যদি নিতান্ত নিগ্রো বলিয়া না ঠাওরাই, তবে মহাত্মা গ্লাডষ্টোনের এই মহাবাক্য অবশ্যই গ্রহণ করিব। বাস্তবিক যদি অধীনতায়ই স্বাধীনতার উপযোগী গুণগ্রাম লাভ হয়, তবে স্বাধীনতা ও অধীনতায় পার্থক্য কি? চরিত্রের উন্নতিই উদ্দেশ্য। অধীনতায় যদি তাহা সম্ভব হয়, তবে স্বাধীনতার জন্য এত হাঙ্গামা কেন? ইহা যাহারা বুঝেন না, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই লর্ড মেকলে বলিয়াছেন—"The maxim is worthy of the fool in the old story who resolved not to go into water till he had learnt to swim. If men are to wait for liberty till they become wise and good in slavery they may indeed wait for ever."

আসল কথাটা এই, কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়া মানুষ কখনও মানসিক উন্নতি করিতে সমর্থ হয় না। যোগেন বাবু যে ভাবে কথাটা তুলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, আগে মানুষ আকাশে বসিয়া মানসিক উন্নতি সম্পন্ন করিবে, তারপর সেই উন্নতির সাহায্যে সামাজিক উন্নতি হইবে এবং সর্ব্বশেষে রাজ-

নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করা হইবে। এ প্রণালী নিতান্ত ভ্রান্ত। উন্নত সমাজে বাস করিলে মানুষের মন উন্নত হয়। সমাজের যেরূপ নিয়ম প্রণালী, সেই অনুসারে চরিত্র গঠিত হয়। একজন ইংরাজ কুলি বলে—"What the Deuce do I care for the Prince of Wales, will he come and fill my belly?" অথচ রুষিয়ার Grand Dukeএর কুর্ণীশ করিতে করিতে ঘর্ম্মাক্ত হইতে হয়, ইহা কিসের ফল? Shakespeare-কে জুলুদের মধ্যে নিয়া রাখিয়া দিলে কি তিনি Shakespeare হইতেন, না কুকীদের মধ্যে বসিয়া বাল্মীকি সীতা চরিত্র অঙ্কন করিতে পারিতেন? মানসিক উন্নতি আগে, তারপর সামাজিক উন্নতি, ইহা অতি অবৈজ্ঞানিক কথা, সামাজিক আব হাওয়ার উপর সাধারণতঃ মানুষের মানসিক উন্নতি অবনতি নির্ভর করে। কর্ম্মক্ষেত্রেই মানুষের চরিত্র গঠিত হয়, শক্তি বিকাশিত হয়। John Stuart Mill বলিয়াছেন "Capacity for nobler feelings in most natures a very tender plant, easily killed, not only by hostile influences, but by mere want of sustenance; and in the majority of young persons it speedily dies away if the occupations to which their position in life has devoted them, and the society into which it has thrown them, are not favourable to keeping that higher capacity in exercise." সুতরাং কি রূপে যে অরাজ বা পররাজের মধ্যে স্বরাজোচিত গুণাবলী উন্নতি প্রাপ্ত হইতে পারে, ইহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত। রাজনৈতিক জীবনের উচ্চতর কর্ম্মক্ষেত্র সকল হইতে বঞ্চিত হইয়া কখনও কোন শিক্ষাতেই তদুচিত গুণগ্রাম লাভ হইতে পারে না। যোগেন্ বাবু তো ভাষার উন্নতির দ্বারা মানসিক উন্নসিক সাধনের কথা বলিয়াছেন? কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বার যদি উন্মুক্ত না থাকে, তবে কর্ম্মচেষ্টাই বা আসিবে কোথা হইতে, কর্ম্মের উত্তেজনা না থাকিলে হৃদয়ে মহৎ ভাবই বা আসিবে কোথা হইতে, এবং হৃদয়ে যদি উচ্চ ভাব না থাকে, তবে উন্নত ভাষা কি আকাশ হইতে সৃষ্ট হইয়া আমাদের কাছে আসিবে? তারপর আরও একটী কথা। লিভারের বা হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইলে যে ঐ ঐ বিশেষ বিভাগেই শরীরের অনিষ্ট হয়, তাহা নহে, কিন্তু সকল বিভাগেরই কর্ম্ম ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া আসে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের হাত পা বাঁধা বলিয়া সব ক্ষেত্রেই যে আমাদের কর্ম্মচেষ্টা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে, ইহা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। সদা সত্য কহিবে, এই বাক্য উচ্চারণ করিলে চরিত্রের উন্নতি হয় না, কিন্তু ঐ বাক্য অনুসারে কার্য্য করিলে। যাহা সত্য বলিয়া ভাবি, তাহা যদি প্রকাশ করিয়া বলিতে না পারি বা সেই অনুসারে কার্য্য করিতে না পারি, তবে কি আমার চরিত্র উন্নত হইতে পারে? রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিন্তু আমার মুখ বন্ধ। আমার বিবেক কিন্তু একটী। রাজনৈতিক বিবেক বা সামাজিক বিবেক বলিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিবেক নাই। সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাধ্য হইয়া কপটতা করিয়া করিয়া আমাদের বিবেক একেবারে ভোতা হইয়া যাইতেছে, আর নড়ে না। ইহা পরাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল। যাহারা ভাবেন যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাহস দেখাইতে পারি আর না পারি, এস আমরা সমাজ-সংস্কারে বীরপুরুষ সাজি,

তাহারা যে মানব-চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ, তাহা বলিতে পারি না। একটা পা আমাদের বাঁধা আছে, থাকুক, আর একটা পা তো খোলা আছে, তবে এস আমরা হাটিব না কেন, একথা বলিলে কি হাস্যস্পদ হইতে হয় না? একটা পা যদি এমন ভাবে বাঁধা থাকে যে, নড়িলেই তাহার উপর আঘাত পড়ে, তাহা হইলে ও পদ তো বন্ধ হয়ই, সঙ্গে সঙ্গে আর এক পদের সঞ্চালন বন্ধ হইয়া যায়। কেন না, পা দুটীর এমন সম্বন্ধ যে একটী নড়িলেই অপরটীও নড়ে। সুতরাং একটীকে আঘাত দিবার ভয়ে আরটীও ধীরে ধীরে নিশ্চল হইয়া যায়। জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র গুলিরও সম্বন্ধ ঐ রূপ। এক দিক বন্ধ করিয়া দিলে ধীরে ধীরে সব দিক বন্ধ হইয়া যায়। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল এক যোগে আবদ্ধ, একটীকে বন্ধ করিলে সব গুলি বাধা পড়ে। যাঁহারা মনে করেন, মানব জীবন একটী অট্টালিকা, একটী একটী বিভাগ নির্ম্মাণ করিয়া উহাকে গড়িয়া তোলা যায়, তাহারা ভ্রান্ত। মানব জীবন organism, উহা ভিতর হইতে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া সমবেত ভাবে বর্দ্ধিত হয়। আগে সমাজ, পরে রাজনীতি, এইরূপ একটী একটী করিয়া গঠন চলে না। তবে যে আমি বলিয়াছি, এখন রাজনীতির দিকে জাতীয় জীবনের বিশেষ ঝোঁক পড়িয়াছে, তাহাও organism-এর একটী স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়াছে। জাতীয় জীবনের একটা বিশেষ Necessity হইতেই উহা উৎপন্ন হইয়াছে। বাহির হইতে বাধা দিয়া ইহাকে বিরক্ত করিতে চেষ্টা করিলে বিশেষ অনিষ্ট হইবে। Cowper বলিয়াছেন—

"I could not endure the room in which I now write were I conscious that the door were locked. In less than five minntes I should feel myself a prisoner, tho' I can spend hours in it under an assurance that I may leave it when I please without experiencing any tedium at all."

ইহার মত সত্য কথা আর নাই, ইহা মানব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত কথা। আমি এই ঘরে বসিয়া সমস্ত দিন লেখা পড়া করিতে পারি, বাহিরে যাইবার উত্তেজনা একটুও অনুভব করিব না। কিন্তু তুমি যদি বাহির হইতে তালা লাগাইয়া ক্রমাগত বলিতে থাক "তোমাকে আর বাহির হইতে দিব না" তাহা হইলে আধ ঘণ্টার মধ্যে বাহিরে যাইবার জন্য ছটফট করিয়া উঠিব। মানব আর সব সহ্য করিতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতা-হরণ সহ্য করিতে পারে না। এ কথা ঠিক যে আমি হয়তো আমার স্বাধীনতার কোনই ব্যবহার করিতেছি না। আমি হয়তো মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আমার স্বাধীনতার কথা ভাবিতেছি না। আমি যে স্বাধীনজীব, স্বাধীন-চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমার কাজ করা উচিত, ইহা আমার খেয়ালেই আসিতেছে না। আমি ভাবের প্রবাহে বা গতানুগতিকতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া কাজ করিতেছি, কিন্তু তুমি যেই বলিলে "তোমাকে আর এ কাজটী করিতে দেওয়া হইবে না"—আমার উপর ফেলিয়া রাখিলে আমি হয়তো সে কাজের দিকে যাইতামই না। কিন্তু যেই তুমি আমার স্বাধীনতা হরণ করিলে, আমার সমস্ত ঝোঁক অমনি ওই কাজের উপর যাইয়া পড়িল। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁকের ইহাও একটী কারণ। আমাদের

ছাত্রগণকে যদি এ কথা বলা না হইত যে, তোমাদের রাজনীতিতে কোন অধিকার নাই, তাহা হইলে হয়তো তাহাদের শতকরা পঁচানব্বই জন রাজনীতির কোনই ধার ধারিত না। কিন্তু যেই তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিলে, অমনি তাহাদের শতকরা ৯৯ জন সকল ছাড়িয়া কোমর কাসিয়া আপনাদের রাজনৈতিক স্বত্ব সাব্যস্তের জন্য লাগিয়া গেল। যতই তাহাদিগের মাথায় আঘাত করিয়া তাহাদিগকে দাবাইয়া দিতে চেষ্টা হইল, ততই তাহারা মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইল। অনেক সময় অতিরিক্ত ঔষধ প্রয়োগে সামান্য রোগকে গুরুতর করিয়া তোলা হয়, বিনা সিকিৎসায় ফেলিয়া রাখিলেই হয়তো রোগ আপনিই আরাম হইত, কিন্তু চিকিৎসা-বাহুল্যে তাহাকে দুরারোগ্য করিয়া তোলা হইল। আমাদের unrest রোগেরও তাহাই হইয়াছে। আমাদের শাসনকর্ত্তাগণ অতিরিক্ত ঔষধ প্রয়োগে দেশকে পাগল করিয়া তুলিতেছেন। সার্কুলারের উপর সার্কুলার চাপাইয়া ছাত্রগণের প্রকাশ্য দিবালোকে দশজনের সম্মুখে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিবার অধিকারের ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিলে, তাহারা মাটীর তলে গর্ত্ত করিয়া অন্ধকারে গোপনে বজ্রশেল প্রস্তুত করিতে বসিয়া গেল। মানবের প্রকৃতিই এই, তাহাকে যদি ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত কর, সে অন্যায্য অধিকার গড়িয়া তুলিবে। বিলাতের ছাত্রগণ যে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিতেছে, ভারতীয় ছাত্রগণকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে গেলে তাহারা তাহা স্বীকার করিবে কেন? কেহ কেহ উপদেশ দিতেছেন, আরও অধিকার হরণ কর, আরও নির্য্যাতন কর। আমরা আমাদের শাসনকর্ত্তাগণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এ ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করুন। তাঁহারা মনে রাখিবেন, এ বিবাদ বাঙ্গালীর সঙ্গে নহে, মানব-প্রকৃতির সঙ্গে, বাঙ্গালীকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিতে পারেন, ধরাপৃষ্ঠ হইতে বাঙ্গালীর নাম মুছিয়া ফেলিতে পারেন, কিন্তু মানব-প্রকৃতির যিনি স্রষ্টা, মানবজীবনের যিনি বিধাতা, তাঁহার শাসন লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। ইহা না বুঝিয়া তাঁহারা যদি ভ্রান্তপথেই চলিতে থাকেন, তবে ইংলণ্ড ও ভারত উভয়েরই বিষম অমঙ্গল ঘটিবে। ভগবান এ অমঙ্গল হইতে দেশকে রক্ষা করুন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা।

পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে "নব্যভারত" কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার কালে আশা করিয়াছিলেন, বঙ্গভাষাই নব্যভারতের ভাষা হইবে। তাঁহার সে আশা কখন পূর্ণ হইবে কি না, বলা যায় না, তবে শিক্ষিত বাঙ্গালী আজি কালি মাতৃ ভাষার সেবায় বদ্ধপরিকর ও অনেকাংশ সিদ্ধহস্ত হইয়াছে—এ কথা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারা যায়। পূর্ব্বে শিক্ষাভিমানী বঙ্গীয় যুবক পাশ্চাত্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মাতৃভাষায় আপন নাম উচ্চারণ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেন, এমন কি, —বড় অধিক দিনের কথা নহে—তৎসম্প্র-

দায়ের মৌখিক কথায় ইংরাজি-বাঙ্গালার অবাধ মিশ্রনজনিত খিচড়ায়ের গুরুপাকে অস্থির হইয়া শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে তাঁহাদিগের জন্য মহাত্মা Southey-বিহিত দণ্ডাজ্ঞার বিধান করিতে হইয়াছিল; আর এখন বিলাত-প্রত্যাগত, অন্যথা ইংরাজতন্ত্রে-নিয়ন্ত্রিত, যুবক—পরন্তু, ভারতের এক প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর প্রবাসী প্রৌঢ় পর্য্যন্ত মাতৃভাষার মর্য্যাদা সংরক্ষণে সম্পূর্ণ সচেষ্ট। ইহা নিরতিশয় আনন্দের কথা, এবং দীনা বঙ্গভাষার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের লক্ষণ, সন্দেহ নাই। *

যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি বঙ্গভাষার মর্য্যাদা রক্ষায় ও উন্নতি কল্পে সচেষ্ট, ইদানীং "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ" তন্মধ্যে অগ্রণী। অন্যবিধ নানা চেষ্টার সঙ্গে "বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা" প্রবর্ত্তন পক্ষে তাঁহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ ও যত্নের বিষয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সৌভাগ্যক্রমে, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে ও তজ্জন্য পরিষৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া আনন্দ প্রকাশের অবসর পাইয়াছেন। পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়ের মুখে তদ্বিবরণ আমরা এইরূপ শুনিতে পাই :—

"বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ জন্মলাভের (?) কিছুদিন পরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ও বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের নিকট স্কুল কলেজে বাঙ্গালা সাহিত্যালোচনার উপায় নির্দ্ধারণ জন্য আবেদন করেন। ইংরাজি স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে বাঙ্গালায় শিক্ষাদান অনুচিত বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তখন পরিষদের আবেদন অগ্রাহ্য করেন। বিশ্ববিদ্যালয় বহু আলোচনার পর এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনা পরীক্ষায় প্রবর্ত্তন মাত্র করিয়া নিরস্ত ছিলেন। কিছু দিন পরেই বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া ইংরাজি স্কুলে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলেন। পরিষদের যে প্রস্তাব কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে অনুচিত বোধ হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে সমুচিত বলিয়া গৃহীত হইল। ভারত-গবর্ণমেণ্ট Indian Educational Policy, অর্থাৎ ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে যে Resolution অর্থাৎ প্রস্তাব (মন্তব্য ?) প্রকাশ করিলেন, তাহাতে পরিষদের প্রস্তাব সর্ব্বতোভাবে সমর্থিত হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার জন্য যে Commission অর্থাৎ অনুসন্ধান-সমিতি বসিয়াছিল, সেই সমিতিও উচ্চ শিক্ষায় বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা সমর্থন করিয়া এম্-এ পরীক্ষাতেও বাঙ্গালা প্রবর্ত্তনের অনুরোধ করেন। আলোচ্য বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে নূতন আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় বিধি সঙ্কলনের জন্য * * * যে সমিতি গঠিত হয়, * * * সেই সমিতির নির্দ্দেশানুসারে উচ্চ শিক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য স্থান পাইয়াছে। নিয়ম হইয়াছে যে,—

(১) প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থী ইতিহাসের পরীক্ষায় বাঙ্গালায় উত্তর লিখিতে পারিবে।

(২) উচ্চশিক্ষার মধ্য পরীক্ষায় (Intermediate in Arts পরীক্ষায়) প্রত্যেক ছাত্রকেই বাঙ্গালা—বা তদ্বিধ অন্য ভাষা—সম্বন্ধে পৃথক্ পরীক্ষা দিতে হইবে, তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য গ্রন্থ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

(৩) বি-এ পরীক্ষায় প্রত্যেক ছাত্রকে

* "সাহিত্য-সেবক"-প্রতিষ্ঠা-কল্পে, ১৩০২ সালের পৌষ মাসে, আমরা এই কথা আর একবার 'নিবেদন' করিয়াছিলাম।

বাঙ্গালা সাহিত্যের পরীক্ষা পৃথক্ ভাবে উত্তীর্ণ হইতে হইবে—তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য গ্রন্থ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

* * * ১৩০৩ সালে, দশ বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ যে প্রার্থনা লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে উপস্থিত হইয়া আশানুরূপ ফল পান নাই, অধিকন্তু অনেক পণ্ডিতের নিকট উপহাসের পাত্র হইয়াছিলেন, দশ বৎসর পরই পরিষদের সেই প্রার্থনা সর্ব্বাংশে পূর্ণ হইয়াছে। দেশের উচ্চশিক্ষা-কার্য্যে বাঙ্গালার এই স্থান দেখিয়াও পরিষদের বহু দিনের মনোরথ পূর্ণ হইতে দেখিয়া পরিষৎ পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন।"*

আমরা পণ্ডিত নহি, পরিষদের প্রার্থিত বিষয়ে পরিহাস করিবার যোগ্যতাও রাখি না; বরং নগণ্য হইলেও, আজীবন বঙ্গ সাহিত্যের সেবক রূপে বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি দর্শনে আনন্দলাভই করিয়া থাকি। কিন্তু বক্ষ্যমান ব্যাপারে, পরিষদের সদস্যরূপ সম্মানের অধিকারী হইয়াও, উহাঁর সহিত পূর্ণমাত্রায় আনন্দ প্রকাশ পক্ষে স্থির নিশ্চয় হইতে পারি নাই। ইহার কারণ—যে সূত্রে, দশ বৎসর পরে, পরিষদের প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে, সেই Indian Educational Policyর পরিবর্ত্তন। এতদিন ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি যে অপূর্ণ বা লক্ষ্যভ্রষ্ট ছিল, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই; কর্জ্জন হইতে ক্রে'ক পর্য্যন্ত যে সকল মহাত্মারা উহার পরিবর্ত্তনের প্রয়াসী বা পক্ষপাতী, তাঁহারা যে ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, সে বিষয়েও সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ না থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের এক আধটা কার্য্য, বা দু' একটা কথা, কি যেন কেমন একটু অলক্ষ্যে আতঙ্ক উদ্দীপন করে। কর্জ্জনের কার্য্যের কথা আর তুলিয়া কাজ নাই। সম্প্রতি স্কটলণ্ডীয় শিক্ষাবিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ Sir Henry Craik K. C. B., M. P. মহোদয় ঐ শিক্ষা পদ্ধতির সমালোচনা প্রসঙ্গে—

"A wise observer, of long experience, said to me the other day, 'It would have been a happy thing for India had Macaulay never lived." *

এইরূপ মুখবন্ধের দ্বারা মেকলে-প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি বিলক্ষণ একটু শ্লেষোক্তি করিয়া,

"Why should we teach them that education is impossible without acquiring the English language? What can that impress upon them, except that education is useful only to enable them to undertake those administrative duties which are their absorbing ambition?" *—

ইত্যাকার কথাচ্ছলে ভারতবাসীর ইংরাজি-ভাষা শিক্ষার, পরন্তু তজ্জনিত রাজকার্য্য পরিচালন দক্ষতার আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিবার ইঙ্গিত করিয়া, এবং

"If Education is to do anything for them, it must be by making them cultivated gentlemen."—*

ইত্যাদি কথায়, বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় যেন সুসভ্য ও সম্ভ্রান্ত নহেন, এইরূপ মনোভাব জ্ঞাপন করিয়া, উক্ত পদ্ধতির পুনর্গঠন কল্পে এইরূপ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—

"We must show the native (!) that education has other aims than to make Babus (!) subordinate officials, and pleaders, we must teach them that there are other spheres of activity for the educated man than the Law Courts and Govern-

* সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রয়োদশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণী, ১৩১-২ পৃষ্ঠা।

ment appointments * * * we must recognise that it is a mistake to insist that a man shall not be considered to be an educated man unless he can express his knowledge otherwise than in a language which is not his own. Place no restriction on English as an optional subject, but cease to demand it as the one thing necessary for all."*

উদ্ধৃত বচনগুলি সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন বর্ত্তমান বাবু 'কুলের' প্রতি একটু বিদ্বেষভাব-জড়িত বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজি-অনভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রকে অশিক্ষিত বিবেচনা করা অর্ব্বচীনতার লক্ষণ, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইংরাজি-বর্জ্জিত শিক্ষা, বর্ত্তমান কালে, ভারতবাসীর কি উপকার সাধন করিতে পারে, আমরা নির্ণয় করিতে অক্ষম। ব্যবহারজীবীর ও সরকারি ভৃতিভুকের বৃত্তি ভিন্ন শিক্ষিতের পক্ষে কার্য্যকুশলতা প্রকাশের অন্য ক্ষেত্র অবলম্বনীয় বটে, কিন্তু নিতান্ত পক্ষে মুদীর দোকান বা হলচালন-ক্ষেত্র ব্যতীত ইংরাজি ভিন্ন তাঁহার গতি কোথা? কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য—যে কোন ক্ষেত্রই বলুন, যাহার উন্নতির জন্য আজ দেশব্যাপী আন্দোলন চলিতেছে, কোনটীরই বর্ত্তমান যুগের উপযোগী প্রকৃত উন্নতি চর্চ্চা মূলে ইংরাজি শিক্ষা ভিন্ন সম্ভবপর বোধ হয় না। আর Sir Henry Craikএর ও তৎশ্রেণীস্থ ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষী পণ্ডিত-মণ্ডলীর ঘৃণিত ঐ দুই বৃত্তি পরের হস্তে ছাড়িয়া দিতে, বা "administrative dudies" গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা একেবারে পরিহার করিতেই বা আমরা পারিতেছি কৈ? অতএব, ইংরাজি-বর্জ্জিত বা হতাদৃত শিক্ষা আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থার অনুকূল কি না, এবং শিক্ষাপদ্ধতির অন্ততঃ এই অঙ্গের মীমাংসায়—মেকলে বা ক্রেক আমাদিগের প্রকৃত হিতৈষী কে, সে পক্ষে আমাদিগের সম্পূর্ণ সংশয় আছে। ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্ত্তনের মূলে ইংরাজি শিক্ষার গতি রোধ না হউক, মন্দীভূত করনের অভিপ্রায় যেন প্রচ্ছন্ন বোধ হয়, আর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রার্থনা পূরণ পরোক্ষভাবে সেই অভিপ্রায়ের অনুকূল বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা-প্রবর্ত্তন আমাদিগের মনে বিশেষ আনন্দের সঞ্চার করিতে পারে নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয় যে এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনা পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, উচ্চশিক্ষার্থীর বাঙ্গালা জ্ঞানের পরিচয় লওয়া পক্ষে তাহাই, বোধ হয়, পর্য্যাপ্ত ছিল। অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বিধিসঙ্কলন-কর্ত্তাগণের নির্দ্দেশানুসারে ঐ দুই পরীক্ষায় বাঙ্গালা-সাহিত্যের পৃথক্ ভাবে পরীক্ষার জন্য পাঠ্যগ্রন্থ নির্দ্দেশ করায় পূর্ব্বপ্রথার অপেক্ষা অধিক ফল হইবে বলিয়া বোধ হয় না, বরং যে cramming নিবারণের জন্য এতদূর চেষ্টা ও আন্দোলনের কথা শুনা গিয়াছে, কতক মাত্রায় তাহারই প্রশ্রয় সাধন করা হইবে! পরন্তু ইতিহাসের পরীক্ষায় বাঙ্গালায় উত্তর লেখা প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর ইচ্ছাধীন করার বিধান, ও তন্নিম্নে সকল শ্রেণীর ছাত্রের পক্ষে ইংরাজি স্থলে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা, উল্লিখিত নিয়মাপেক্ষাও, এক হিসাবে, অধিকতর ক্ষতিজনক বোধ হয়। ইতিহাস পাঠ সাহিত্য-শিক্ষায় অন্ত-

* Adopted from quotations in the Modern Review, Vol. III. No. 4. pp. 330—31.

তর উপকরণ বলিয়া পূর্ব্বাপর খ্যাতি আছে ; —বস্তুতঃ, ধারাবাহিক ঘটনার বা আভ্যন্তরিক অবস্থার যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ করার সঙ্গে, শুদ্ধ ও মার্জ্জিত ভাষা প্রয়োগের ক্ষমতা অর্জ্জন ইতিহাস-পাঠকের পক্ষে সামান্য লাভ নহে ; প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীকে, প্রথমোক্ত বিধানে, ইংরাজি ভাষা সম্বন্ধে সামান্য মাত্রায় হইলেও, সেই লাভ হইতে বঞ্চিত করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। আর শেষোক্ত ব্যবস্থানুসারে আমরা সুকুমারমতি শিশুগণের হস্তে গণিত, বিজ্ঞান, জ্যামিতি, পরিমিতি, খগোল, ভূগোল, প্রভৃতি নানা বিষয়ের রাশি রাশি পুস্তক দেখিতে পাই, এবং 'গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক', 'লঘিষ্ট সাধারণ গুণিতক', অনুমান, যবক্ষার, অনুপূরক-পরিপূরক কোণ, আয়ত ও বর্গক্ষেত্র, হর্শেল ও নেপচুন *, দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা, প্রভৃতি সরল ও সুমিষ্ট বাঙ্গালার রসাস্বাদন করি। এইরূপ পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলনের জন্য পরিষৎ বহুদিন যাবৎ চেষ্টিত ছিলেন ও আছেন এবং সঙ্কলন বিষয়ে অনেক পরিমাণে সিদ্ধকামও হইয়াছেন। এই চেষ্টার ফলে বাঙ্গালার শব্দসম্পদ বর্দ্ধিত ও সঙ্কলন-কর্ত্তার পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয়, সন্দেহ নাই ; কিন্তু তদ্দারা শিক্ষার্থীর বিশেষ উপকার সাধিত হয় বলিয়া বোধ হয় না। শিক্ষানবিশ শিশুর পক্ষে Greatest common measureএর বাগর্থপ্রতিপত্তি যেরূপ দুরূপ ব্যাপার, গরিষ্ট সাধারণ গুণনীয়কের জ্ঞানলাভ তদপেক্ষা কম কষ্টসাপেক্ষ নহে ; ফলতঃ তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই উহার মর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া মুখে G. C. M. বা গ-সা-গু বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। শিশুগণকে ইংরাজি ব্যাকরণের মূল সূত্রগুলি বাঙ্গালায় বুঝাইবার জন্য গঙ্গাধর বাবু প্রমুখ কোন কোন শিক্ষক যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সুসঙ্গত ও সুফলপ্রদ হইয়াছে ; কিন্তু 'ঘরট্টপেষক'-জাতীয় শব্দ সহযোগে ইংরাজির অনুবাদে, বা উচ্চশ্রেণীর পরিণতবুদ্ধি ছাত্রগণকে বিষয় বিশেষের আলোচনায় ইংরাজির পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ব্যবহারে প্রশ্রয় দেওয়ায়, কোন ফল নাই।

যাহা হউক, এই নববিধি প্রবর্ত্তন কল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে উদ্দেশ্যই থাকুক, তৎপক্ষে পরিষদের চেষ্টার মূলে বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি সাধন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উহার একটা বিশিষ্ট স্থান নিরূপণ রূপ সাধু ইচ্ছাই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদিগের অবলম্বিত প্রণালী সর্ব্বথা সমীচীন কি না, ইহাই বিবেচ্য। 'নব্যভারতে'র আশা যতদিন পূর্ণ না হয়—বঙ্গভাষাই যতদিন নব্যভারতের ভাষা না হয়—ততদিন আমরা ইংরাজির বিনিময়ে বাঙ্গালা ব্যবহার করিয়া 'স্বদেশী'-ব্রত সাধনের সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারিতেছি না। বস্তুতঃ ইংরাজিই নব্যভারতের Lingua Franca হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—ইংরাজির প্রসাদেই জাতীয় মহাসমিতি প্রভৃতি সার্ব্বজনীন সভাস্থলে ভারতের এক প্রান্তের অধিবাসী অন্য প্রান্তের লোকের নিকটে অনায়াসে মনের ভাব জ্ঞাপন করিতেছেন, ভারতবাসীর হৃদয়ে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা কল্পে ইংরাজিই মূলমন্ত্র। বঙ্গভাষায় উন্নতি-চেষ্টায় এহেন ইংরাজি ভাষার প্রতি কিছুমাত্র অবহেলা প্রদর্শন কোন ক্রমে যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। পরন্তু, বঙ্গভাষার উন্নতি-সাধনের ইহাই কি প্রকৃষ্ট পন্থা? স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্রাদি

* পাঠ্যগ্রন্থে এতদূর বাঙ্গালা পৌছে নাই।

হইতে অধুনাতন রিদ্রোৎসাহীবর্গ পর্য্যন্ত যাঁহারা বঙ্গভাষার বর্ত্তমান অবস্থা গঠনের মূল, এবং যে সমস্ত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি দেশের উচ্চশিক্ষা কার্য্যে বঙ্গভাষা প্রবর্ত্তনে সচেষ্ট, তাঁহাদিগের মধ্যে কয়জন বাল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিলেন? অথচ তাঁহাদিগেরই রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার্থীর পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ঐ সমস্ত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির জীবনী আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যুগপৎ সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্যের অভিজ্ঞতাই তাঁহাদিগের কৃত বাঙ্গালা রচনার মূল উপাদান। মাত্র সংস্কৃত-শাস্ত্রে সুশিক্ষিত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণ—দর্শন, স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার, প্রভৃতি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য সম্পন্ন হইলেও—অনেকস্থলেই বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল বাঙ্গালা রচনা করিতে অক্ষম; পক্ষান্তরে, ইংরাজি শিক্ষার প্রথম যুগে মাত্র ইংরাজি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণের অধিকাংশই যে শুদ্ধরূপে আপন নাম স্বাক্ষর করিতেও অক্ষম ছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু সংস্কৃত ও ইংরাজি—এই উভয় ভাষাজ্ঞানের ফলস্বরূপ আমরা 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র ন্যায় ভাষাতত্ত্বে, 'বিশ্বকোষে'র তুল্য অভিধানে, 'প্রভাতচিন্তা'-দির ন্যায় প্রবন্ধ পুস্তকে, 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতির মত মহাকাব্যে, 'নীলদর্পণা'দির ন্যায় নাটকে, 'আনন্দমঠ' প্রভৃতির ন্যায় উপন্যাসে, 'শকুন্তলাতত্ত্বা'দির সদৃশ সমালোচনায়, সিপাহি যুদ্ধা'দির ইতিহাসে, 'মাইকেল' প্রভৃতির জীবন-চরিতে এবং 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থে বঙ্গসাহিত্য অলঙ্কৃত দেখিয়া আনন্দ উপভোগের অবসর পাইতেছি। অতএব আমাদিগের বিবেচনায়, বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন পক্ষে সংস্কৃত ও ইংরাজি শিক্ষা অপরিহার্য্য এবং এতদুভয়ের সাহায্যে বাঙ্গালা রচনায় অনুশীলনই শিক্ষার্থীর পক্ষে যথেষ্ট।

বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা কার্য্যে বঙ্গ-প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বাঙ্গালা রচনার প্রকৃতি ও গঠন বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা কোন অংশে উৎকর্ষ-লাভ করিবে কি না বলা যায় না। বর্ত্তমান বাঙ্গালা লেখকগণের মধ্যে একদল সংস্কৃতশব্দ-বহুল ও অন্যদল গ্রাম্যশব্দ-বহুল ভাষাগঠনের পক্ষপাতী। ভাষার পারিপাট্য ও ওজস্বিতা সাধন-কল্পে ইহাঁদিগের মধ্যে কোন্ দলের অভীপ্সিত প্রথা প্রকৃত উৎকর্ষবাচক, তৎপক্ষে মতভেদ আছে। তবে সংস্কৃত ও ইংরাজির মধ্যে কোন ভাষার প্রতি হতাদর প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালার চর্চ্চা করিলে যে উহার কোন ক্রমেই উন্নতির আশা নাই, ইহা একরূপ সুনিশ্চিত।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

মেঘদূত

কাব্য-সৌন্দর্য্যে এবং নির্ম্মাণ-কৌশলের অভিনবত্বে কালিদাসের মেঘদূত পৃথিবীর সাহিত্য-ভাণ্ডারে অতি মহামূল্য রত্ন। হংসদূত, কোকিলদূত, উদ্ধবদূত, পদাঙ্কদূত,

পবনদূত প্রভৃতি অনেক কাব্য উহার অনুকরণে রচিত হইয়াছিল। অনুকরণ করিয়া যাঁহারা কালিদাসের মত খ্যাতি লাভের দুরাশা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা যেন কবি মেঘদূতের একটী বর্ণনায় পূর্ব্ব হইতেই লিখিয়া রাখিয়াছিলেন :—

যে সংরম্ভোৎপতনরভসাঃ স্বাঙ্গভঙ্গায় তস্মিন্
মুক্তাধ্বানং সপদিসরভা লঙ্ঘয়েয়ুর্ভবন্তম্
তান্ কুর্ব্বীথাস্তুমুলকরকাবৃষ্টিপাতাবকীর্ণান্।
কেবানস্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ ?

হেরিয়া তোমার সুদূর গমন, শরভনামে কুরঙ্গ—
লঙ্ঘিতে কোপে তোমারে,স্ববেগে পড়িয়া ভাঙ্গিবে অঙ্গ।
ছত্রভঙ্গ করি দিওগো তাদিগে তুমুল করকা-পাতে ;
দুরাশায় হেন অস্ফালন ফল,—অপমান হাতে হাতে !

মূল কাব্যের ছন্দে এবং শব্দ নির্ব্বাচনে যে একটা মাহাত্ম্য এবং মোহ আছে, অনুবাদে তাঁহা বজায় রাখা অসম্ভব। ভাষান্তর করিবার সময়েও মনে হয়,—"কে বানস্যুঃ পরিভব পদং নিষ্ফলারম্ভ যত্নাঃ ?" কিন্তু কাব্যখানির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অনেকেই নানাদেশে, নানা ভাষায় উহার অনুবাদ করিয়াছেন।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে উইল্‌সন্ সাহেব উহার ইংরেজি পদ্য-অনুবাদ প্রকাশ করেন, পণ্ডিতটী স্থানে স্থানে অর্থ-বিভ্রাট এবং পাঠ-বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার পদ্য রচনায় মাধুর্য্য আছে। বিদেশের ভাষায় কবিতা লেখা দুঃসাধ্য ; তথাপি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার এম, এ, যে ইংরেজি পদ্য অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রশংসা করিবার জিনিস। ভাষা বিশুদ্ধ এবং সরল, অনুবাদ যথাযথ, এবং টীকা টিপ্পনি অতি চমৎকার। সুরেশচন্দ্রের গ্রন্থের আর একটা প্রশংসার দিক এই যে, কালিদাস এবং মেঘদূত সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় তিনি সযত্নে সংগ্রহ করিয়াছেন। এদেশের অন্য কোন সংস্করণে এ সকল জিনিস নাই। আমাদের কলেজের ছাত্রেরা যদি উহা পাঠ করেন, বিশেষ উপকৃত হইতে পারিবেন।

প্রায় ২৭ বৎসর পুর্ব্বে মল্লিনাথ ধৃত পাঠ অবলম্বনে স্বর্গীয় কবি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মেঘদূতের বঙ্গ-পদ্য-অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখন আর ঐ গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ঐ অনুবাদ প্রকাশের কয়েক বৎসর পরে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটী অনুবাদ পড়িয়াছিলাম ; কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া এখন উহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম-এ, সি-এস্, মেঘদূতের যে পদ্য অনুবাদ প্রকাশ করেন, তাহা প্রশংসার উপযুক্ত বলিয়াই খ্যাতি লাভ করিয়াছে। মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই ঐ অনুবাদ পড়িবার সুবিধা পাইয়াছিলাম বলিয়া আমার নিজের একটা "নিষ্ফলারম্ভযত্ন" খাতার খাতে সমাধিস্থ করিয়াছিলাম।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত মেঘদূতের একটী পদ্য অনুবাদ, ভৌগোলিক ও অন্যান্য টীকাসহ প্রকাশ করিয়াছেন। অখিল বাবুর ভাষা ভাল, ব্যাখাও সরল হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার ছন্দ এবং শব্দ নির্ব্বাচনের ফলে মেঘের গুরুগম্ভীর ধ্বনি বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। ধূম-জ্যোতি-সলিল-মরুতের সন্নিপাতে রচিত মেঘ আরো গাঢ় হইলে ভাল হইত। অখিল বাবুর অনুবাদে সর্ব্বত্রই এই প্রকারের ছন্দ ও ভাষাঃ—

কার্য্যে অবহেলা দোষের কারণ
কুবের যক্ষেরে দিলা এই শাপ,

"সহিবে হারায়ে মহিমা আপন,
এক বর্ষ প্রিয়া বিরহের তাপ।"

অপিচ :—

কোথা সেই মেঘ—জড় দেহ যার
ধূম-জ্যোতি-বায়ু-সলিলে রচিত ?
বারতা বহন কোথায় বা আর—
চেতন প্রাণীর যাহা সমুচিত ?

আর একটী কথা। বঙ্গ দেশের সকল সংস্করণই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মল্লিনাথ ধৃত পাঠ অবলম্বনে। সুরেশচন্দ্রের সযত্ন-সংগৃহীত পাঠও মল্লিনাথের পাঠ। শ্রীযুক্ত কে, বি, পাঠক মহাশয় ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে জিনসেনের পার্শ্বাভ্যুদয় কাব্যের পরিচয় দেন; এবং উহার অল্প পরেই বোম্বায়ের নন্দর্গিকর ঐ পার্শ্বাভ্যুদয় ধৃত পাঠ অবলম্বন করিয়া একটী চমৎকার সংস্করণ প্রকাশ করেন। রাজা অমোঘ বর্ষের সময়ের কবি ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই তাঁহার কাব্যে মেঘদূত জড়াইয়া নূতন কৌশলে উহার পাঠ রক্ষা করিয়াছিলেন। অত প্রাচীন আর কোন পাঠ পাওয়া যায় না।

যে সকল কবিতা মল্লিনাথের পাঠে পাওয়া যায় না, কিন্তু পার্শ্বাভ্যুদয়ে আছে, তাহা যে সকল কবিতা নয়, তাহার যথেষ্ট আভ্যন্তরিক প্রমাণ আছে। দৃষ্টান্ত দিতেছি। সকল পাঠেরই ৩১ সংখ্যক কবিতায় 'উদয়ন কথার' উপন্যাস আছে; কিন্তু ষষ্ঠ এবং ৭ম শতাব্দীতে যে অতি প্রাচীন উদয়ন কথা বিস্মৃতির গর্ভে গিয়াছিল, এবং নূতন উদয়ন কথা হইয়াছিল, তাহা হর্ষবর্দ্ধনের সময়ের কবিদিগের রচনা হইতে জানিতে পারা যায়। বহু প্রাচীন 'উদয়ন কথা' খুব পুরাতন পালি সাহিত্যে যাহা পাই, পার্শ্বাভ্যুদয়-ধৃত পাঠে তাহারই উপন্যাস। এই আভ্যন্তরিক প্রমাণ হইতেই বুঝিতে পারি যে, নিম্নের উদ্ধৃত কবিতাটী অযথা পরিত্যক্ত হইয়াছে। কবিতাটী এই :—

প্রদ্যোতস্যপ্রিয়দুহিতরং বৎসরাজোঽত্রজহ্রে
হৈমংতালদ্রুমবনমভূদত্র তস্যৈব রাজ্ঞঃ
অত্রোৎভ্রান্তঃ কিল নলগিরিঃ স্তম্ভমুৎপাট্যদর্পাৎ
ইত্যাগন্তূন্‌রময়তিজনো যত্র বন্ধু ন ভিজ্ঞঃ।

আগন্তুকজনে দেখায়ে দেখায়ে কেহ সেই বৃদ্ধগণ :—
"হেথা প্রদ্যোতের প্রিয় দুহিতায় হরেছিল উদয়ন;
হেথা ছিল আগে অবন্তীপতির খ্যাত স্বর্ণতালবন;
স্তম্ভভাঙ্গি হেথা নলগিরি করী করেছিল বিচরণ।"

নলগিরি যে হাতীর নাম, স্বর্ণতালবন যে উপন্যাসে ছিল, সে কথা খুঁজিয়া না পাইয়াই হয়ত ঐ কবিতা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পালি সাহিত্যের সহিত অপরিচিতেরা রীস্ ডেভিডের বৌদ্ধ-যুগের ইতিহাসে এই গল্পটী পাইবেন। কাজেই পার্শ্বাভ্যুদয়ের অন্য কবিতাগুলিও গ্রহণীয়। উজ্জয়িনীর পণ্য-বীথিকার বর্ণনায় আছে :—

হারাং স্তারাং স্তরল গুটিকান্ কোটিশঃ শঙ্খশুক্তীঃ,
শষ্পশ্যামান্ মরকত মণীনুন্ময়ুখ প্ররোহান্
দৃষ্ট্বাযস্যাং বিপণিরচিতান্ বিদ্রুমানাঞ্চ ভঙ্গান্
সংলক্ষ্যন্তে সলিল নিধয় স্তোয়মাত্রাবশেষাঃ।

বিপণি সজ্জিত যথা কোটিহারে ভাতে মধ্যমণি তারি;
বালতৃণসম শ্যাম মরকত, শঙ্খশুক্তি সারি সারি;
বিদ্রুম কতই রয়েছে বিছানো; দেখিলে বুঝিবে বেশ—
মাণিক শূন্য হয়েছে সাগর, জলটুকু আছে শেষ।

উত্তর মেঘের একটী কবিতা বোম্বাই সংস্করণের মেঘদূতে ভুলক্রমে পূর্ব্বমেঘে বসিয়াছে। কবিতাটী এই :—

পত্রশ্যামা দিনকর হয়স্পর্দ্ধিনো যত্র বাহাঃ
শৈলোদগ্রাস্তমিব করিনো বৃষ্টিমন্তঃ প্রভেদাৎ
যোধাগ্রণ্যঃ প্রতিদশমুখং সংযুগেতস্থি বাংসঃ
প্রত্যাদিষ্টাভরণরুচয়শ্চন্দ্রহাসব্রণাঙ্কৈঃ।

পত্রের মতন শ্যামল অশ্ব, জিনিয়া রবির হরি;—
ঢালে মদধারা তোমার মতন, গিরিসম উচ্চ করী;

যোধাগ্রণী তথা দশমুখ সহ সম্মুখ সমরে যুঝি,
ক্ষত ভূষণেতে করেছে অঙ্গে মলিন ভূষণ-রুচি।

আশা করি, ভবিষ্যতে সকল সংস্করণেই এই কবিতাগুলি গৃহীত হইবে। উদ্ধৃত শেষ কবিতাটী উত্তরমেঘের ১৩শ কবিতার পরে গৃহবর্ণনার পূর্ব্বে বসিবে।

অখিল বাবু যেমন তাঁহার অনুবাদের শেষে ক্ষুদ্রাক্ষরে মূলটী মুদ্রিত করিয়াছেন, সকল অনুবাদের পরিশিষ্টেই ঐরূপ মূলটী দেওয়া উচিত। টীকার অংশ অখিলবাবুর খুব ভাল, কিন্তু ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক টীকা লিখিবার সময়ে একালের অনুসন্ধানের ফল যত্নে দেখিয়া লইলে ভাল হইত। টীকা এবং ভূমিকা সুরেশচন্দ্রের ইংরাজি সংস্করণেই খুব ভাল। এদেশের সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের জন্য একালের প্রত্নতত্ত্ব-সম্বলিত টীকা সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া একটী সংস্করণ করিলে টোলের পণ্ডিতদিগকে নূতন সমালোচনার সংস্পর্শে আনা যাইতে পারে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

গিরি-নির্ঝরিণী।

রৌদ্রদগ্ধ পথিকের মরুভূ-তৃষায়,
নিবারিলে তৃষ্ণাহারী স্নিগ্ধস্নিগ্ধ জলে ;
অমৃত-লহরী কিবা হৃদয়ে বহায়,
চিরছায়াময় স্থল—বিজন বিরলে ;
কোন্ প্রেমে, কোন্ স্নেহে, কোন্ মমতায়,
ধর ওই বক্ষে চির সুধা-তরঙ্গিনী !
এ মর্ত্ত্যে বহিছ কোন্ ত্রিদিব-লীলায়,
পাষাণে বাঁধিয়ে প্রেমে গিরি-নির্ঝরিণী !
আমি বড় ভালবাসি ওরূপ-শোভার,
তাই এ কান্তার ভাল লাগে বিমোহিনী !
কঠোর কোমলে মিশে কি চিত্র শোভার
যেমতি কণ্টকভরা মৃণালে নলিনী !
প্রেমের যুগলমূর্ত্তি প্রকৃতি-বাসরে,
গিরিবক্ষে নির্ঝরিণী আছ কি আদরে !

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

জগন্নাথের রথযাত্রা।

গান।

আবার লইয়া রথ, উজলিকে এ ভারত,
যদি হে আসিলে জগন্নাথ,
কিন্তু কেন রথ খালি, হে কৃষ্ণ, হে বনমালী,
কোথা সে অর্জ্জুন তব সাথ ?
এলে বটে পুনরপি, কোথা সেই ধ্বজ—কপি,
শুনিনা সে ভীষণ চীৎকার,
শত্রুর শোণিত মাখা, কোথা সে রথের চাকা,
মেদ মজ্জা ক্লেদ চিহ্ন তার ?
কোথা সেই শঙ্খ রব, স্তিমিত স্তম্ভিত সব—
দিগন্ত ভাঙ্গিয়া কই ছুটে,
কোথা সে গাণ্ডীব ধনু, লৌহময় ভীম তনু,
অর্জ্জুনের বজ্র করপুটে ?
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির, কোথা বৃকোদর বীর,
সহদেব কোথা সে নকুল,
আজিও অজ্ঞাত বাস, আজো বিরাটের দাস,
আজিও কি ভাঙ্গে নাই ভুল ?
আজিও কি শমী গাছে,সে ধনুক বাঁধা আছে,
বর্ম্ম চর্ম্ম গদা অসি পাশ,
আজিও কি শব রূপে, রয়েছে সমাধি স্তূপে,
মহাশক্তি ব্রহ্মাণ্ড-বিনাশ ?

২

কল্পনা আশার নেত্রে, এ পুণ্য ভারত ক্ষেত্রে,
কুরুক্ষেত্র চেয়ে আছে আজি,

বাজিল ভীষণ রণ, কৌরব পাণ্ডবগণ,
দুই দিকে দুই দল সাজি!
কোথা বীর ধনঞ্জয়, রহিয়াছে এ সময়,
কেন সে হয়না আগুসার,
ক্লীব কাপুরুষ বেশে, ঘৃণিত দাসত্ব ক্লেশে,
জীবন যাপিবে কত আর?
সৈরিন্ধ্রী ভারত-রাণী, হায় কি কলঙ্ক—গ্লানি,
কীচকে করিছে অপমান,
পাপিষ্ঠে হরিছে বস্ত্র, পাণ্ডব নিঃস্ব—নিরস্ত্র,
নাহি হয় তেজে আগুয়ান।
দেও গীতা উপদেশ, আবার জাগুক দেশ,
ভীরুতা করিয়া পরিহার,
জাগুক অর্জ্জুন শত, লইয়া স্বদেশ ব্রত,
গাণ্ডীব ধরিয়া পুনর্ব্বার!
বাজাইয়া পাঞ্চজন্য, ভারত করিয়া ধন্য,
লইয়া এসহে সব্যসাচী,
তুমিহে সারথী যার, নিশ্চয় বিজয় তার,
তব প্রানে তাই চেয়ে আছি।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

জন্মদিনে ভিক্ষা।

পঞ্চবিংশ বৎসরের প্রথম উষায়
সুন্দর দেবতা মোর! প্রণমি তোমায়!
কতদুর, কতদুর, নাথ, আর কতদুর,
তীর্থ-যাত্রা সমাপন হইবে কোথায়!
ক্ষুদ্র কাণা কড়ি এক, তার কিবা অভিষেক,
তার কিবা ঘুরে মরা আশা-নিরাশায়!

হে দেব, বিচিত্র বড়! শুনে হাসি পায়!
যাঁহাদের শুভ্রাকাশে চুর্ণ মেঘমালা,
তারে নিয়ে একি রঙ্গ, একি তব খেলা!
সঙ্গী-হারা, লক্ষ্য-হারা, কর্ম্ম-হারা, প্রাণ-হারা,
সেত শুধু শব্দ-হীন দ্বিপ্রহর বেলা,
কোন্ দিগন্তের বুকে, মিশিতে চলেছে সুখে,
সেত তা'ও নাহি জানে, নহেগো উতলা!
হে দেব সুহৃদ একি কেন তারে ছলা!

সিন্ধুর অনন্ত কোলে একটী লহর,
তা'রি সনে ভাব তব, অপূর্ব্ব খবর!
আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান-হীন, অতি তুচ্ছ, অতি দীন,
সেত নাথ, এ বিশাল বিশ্বের ভিতর!
অর্থ-হারা গানে তার, কেন চাহ বারংবার,
প্রকাশিতে আপনার রাগিণী সুন্দর!
এযে স্বপ্নাতীত কথা ওগো বিশ্বেশ্বর!

কোন্ বন-অন্তরালে ফুটিয়াছে কুঁড়ি,
তা'রি সঙ্গে হে দেবতা, তব লুকোচুরী!
তার ছোট বক্ষ মাঝে, একটু না সুধা রাজে
নাহি তাতে এক বিন্দু সুবাস-মাধুরী!
ক্ষণে ক্ষণে তনু হায়, পদ-ধ্বনি শুনা যায়,
তুমি তারে নিতে চাও সাজাইতে পুরী!
এযে অতি অসম্ভব অচিন্ত্য-চাতুরী!

লীলাময়! তব লীলা দেখেছি অপার;
শুনিনি, দেখিনি কিন্তু হেন কভু আর!
ক্ষান্ত হও এবে তুমি, রুদ্ধ কর রঙ্গভূমি,
সাঙ্গ হোক্ মহা নাট্য জীবন আমার!
তীর্থ-যাত্রা হোক্ শেষ, অন্ত করি সর্ব্ব ক্লেশ,
তোমার চরণ-প্রান্তে ডাক এইবার!
হে বরণ্য, কর পূর্ণ ভিক্ষা আজিকার!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

স্বদেশ-সেবকের গৌরব।

উচ্চ বংশে জন্ম যার হৃদয় উদার,
বিশুদ্ধ চরিত্র সদা পবিত্র আচার;
শিষ্টাচারী, মিষ্টভাষী, বিনয়ী সরল,
পুণ্য কার্য্যে অবিরত বিবেক প্রবল;
নীতিশাস্ত্রে মহাজ্ঞানী, বহু কার্য্যে প্রাজ্ঞ,
পণ্ডিত দর্শন শাস্ত্রে, ন্যায়ে অতি বিজ্ঞ;
দিবানিশি জপ তপ, দেবতার ধ্যান,
শাস্ত্র আলোচনা সদা, ধর্ম্মে ভক্তিমান্;

বহুতীর্থ পর্য্যটন, নিত্য গঙ্গা স্নান,
ব্রাহ্মণে ভকতি সদা দীনে অন্ন দান;
কিন্তু স্বদেশের কার্য্যে নাহি স্পৃহা মাত্র,
ভ্রমেও সেজন নহে প্রশংসার পাত্র!
স্বদেশ-সেবক যদি অতি মূর্খ হয়,
বিদ্বান, ধার্ম্মিক, তার সমকক্ষ নয়।

শ্রীঅম্বিকাচরণ সেনগুপ্ত।

বিয়োগ।

আহা! যদি পারিতাম করিতে বিভাগ
একেকটী করি অবিরল
জীবনের প্রতি অনুপল,
আর তাহা হ'তে যদি পারিতাম কভু,
বাছিয়া তুলিতে শুধু শুভক্ষণ গুলি—
নেত্র আগে, স্মৃতি আগে তবে বিশ্ব ভুলি'
তা'রি অনুরাগ—
পরাণের অগ্নি দিয়ে করিতাম যাগ।
বাকী টুকু জলে পুড়ে হ'য়ে যেত ছাই;
অর্দ্ধ পথে জীবনের প্রার্থনা তাহাই।

সরাই বালুকা রাশি যবে সন্তর্পণে,
শুভ্র স্বচ্ছ আনন্দ তরল,
উৎসারিত করে কলকল,—
ভরি' মোর শত রন্ধ্র, বক্ষের কলস,
চিন্তাহীন উঠে আসি নিমিষে এপারে,
তখনি আবিলে তাহা পশি' শত ধারে
লুকায়ে গোপনে,
অতৃপ্ত আশাটী মরে যায় শূন্য মনে।

নিশি—দিন,আলো—ছায়া,অশ্রু আর হাসি,
কি দুচ্ছেদ্য লোহার নিগড়ে—
বাঁধা আছে চিরকাল ধরে,
কাহাকে ছাড়িয়া কেহ সরিতে না চা'য়;
কোথায় নিরবচ্ছিন্ন দামিনীর খেলা—
মেঘ-হীন বজ্রহীন স্বর্ণ সন্ধ্যা বেলা,
কেবা তবু আসি'
দেখাইবে বলি যদি, বড় ভালবাসি?
সুখের জনম কথা আনে যেই হাসি,
মরণের অশ্রু জলে যায় তাহা ভাসি',
স্মৃতির প্রদীপ যবে চাহিবে লুকা'তে
অশুভ অপ্রিয় সত্য, শুধু সেই দিন
বিশ্বগ্রাসী প্রলয়ের প্রধোত-প্রভাতে,
নেহারিবে রুদ্ধ-গৃহে সুপ্ত সংজ্ঞাহীন
হতভাগা মোরে, আর বেদনা-বিস্মৃত
সাথে র'বে হাসি রাশি আনন্দ সম্বল,
যাতনা পড়িয়া র'বে ত্যক্ত অনাদৃত,
আসঙ্গ-বিহ্বল ব্যাপি' সারা ভূমণ্ডল।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী

নন্দন-কানন।

মুকুলিত হইবে কি নন্দন-কানন?
আবার গাইবে পিক,
আমোদিত চতুর্দ্দিক,
আবার দ্বিরেফপংক্তি করিবে গুঞ্জন?
মুকুলিত হইবে কি নন্দন-কানন? ১

উছলিয়া উঠিবে কি নবীন জীবন?
হ'তেছ মা বঙ্গ! তুমি,
জন-শূন্য মরুভূমি;
শুকিয়ে যেতেছ তব স্তন্য-প্রস্রবণ!
ক্ষীরের সঞ্চার তাহে হবে কি এখন? ২

ফুটিবে কি বঙ্গে আর নূতন-জীবন?
আধি ব্যাধি শোকতাপে,
নানাবিধ মনস্তাপে,
বিশেষ আহার্য্যাভাবে বিশুষ্ক-আনন!
বঙ্গেতে মৃত্যুর বীজ করেছ বপন! ৩

কেমনে ফুটিবে মাতঃ নূতন জীবন?
কোথা দয়া, কোথা ধর্ম্ম?
কোথা শ্রম, কোথা কর্ম্ম?
কোথায় জীবনামৃত একতাবন্ধন?
কেবলি ত চারিদিকে প্রলাপ বচন! ৪

এই কি জাতীয় ধর্ম্ম দয়া প্রদর্শন ?
শত শত নর নারী,
অনাহারী, একাহারী ;
বিরলে বিধবা করে অশ্রু-বিসর্জ্জন !
এই কি জাতীয় ধর্ম্ম দয়া প্রদর্শন ! ৫

এই কি জাতীয় কর্ম্ম জাতীয় উদ্যম ?
যাহা জ্ঞানে বুঝে সত্য,
তাহাকেই দলে নিত্য,
অবলা দলিতে আর আসুর-বিক্রম !
এই কি জাতীয় ধর্ম্ম জাতীয় উদ্যম ! ৬

আশীবর্ষী বৃদ্ধ করে বালিকা-পীড়ন !
কামেতে মোহিত হয়ে,
জলাঞ্জলি লজ্জা ভয়ে
দিইয়া, বেহায়া নাশে সতীর জীবন !
তাহাকে দলিতে বঙ্গে নাহি কোন জন ! ৭

জাতীয় সেবার অহো কিবা পণ্ডশ্রম !
এ স্বর্গীয়া স্রোতস্বতী
হায় ! কোথা করে গতি,
ভস্মমধ্যে প্রকাশিছে আপন বিক্রম !
জাতীয় সেবার অহো কিবা পণ্ডশ্রম ! ৮

না দেখে এ পুণ্যদেবী জীবনকানন,
যেখানে বহিলে মরি,
নানাপুষ্পে শোভা ধরি,
ফুটিবে অচিরে চারু কানন-নন্দন !
না দেখে এ স্রোতস্বতী জীবন-কানন ! ৯

না দেখে এ যুবগণ জীবন-কানন।
বরপণে পেয়ে নাশ,
কত গৃহে হা হুতাশ !
কত গৃহে দীর্ঘশ্বাস ! বিরলে-রোদন !
স্বেচ্ছা-সেবকের হেথা না পড়ে নয়ন। ১০

কত বালা অশ্রুজলে পিতৃ-নিকেতন !
ত্যজে, যবে চলে যায়,
অঞ্চলে পড়িয়া হায় !
দুঃসহ জীবন-ভার করয়ে বহন।
স্বেচ্ছা-সেবকের হেথা না পড়ে নয়ন ! ১১

স্পর্শ-দোষে ঘৃণ্য হয়ে সদা ক্ষুব্ধ মন।
কত লোক শত শত
হয়ে চির মর্ম্মাহত,
হৃদয়ে অনৈক্য-বহ্নি করয়ে পোষণ।
স্বেচ্ছা-সেবকের হেথা না পড়ে নয়ন ! ১২

সেবার বড়াই করি বেড়িয়া বেড়ায় !
যেখানে প্রকৃত সেবা,
সে স্থান দেখিছে কেবা,
যেখানে হৃদয়-বল সেবা কোথা তায় ?
সেবার তামাসা খেলি বেড়িয়া বেড়ায় ! ১৩

যেমন কংগ্রেসী বাবু সেবাও তেমন !
দণ্ডমধ্যে হ'ল সেবা,
তার পর কার কেবা,
দণ্ডেই দেশের হ'ল উদ্ধার-সাধন !
যেমন কংগ্রেসী বাবু সেবাও তেমন ! ১৪

যদ্যপি স্বদেশ-সেবা করিবারে চাও,
হও অগ্রে আশুতোষ,
কিম্বা হও চন্দ্রঘোষ,
কঠিন সমাজ-ব্যাধি সত্বর উপড়াও।
নিন্দুকের বাক্যে কভু কর্ণ নাহি দাও। ১৫

স্বদেশ-সেবায় যদি থাকে সত্য মন,
মাথে তুলি লও বেদ,
তুলি দাও জাতিভেদ,
প্রত্যেক মানবে কর সমান দর্শন,
উপশাস্ত্র প্রতি আর রাখিও না মন। ১৬

খ্রীষ্টের আদর্শে কর চরিত্র গঠন,
হও মহাম্মদ মত,
বিশ্বাসী স্বধর্ম্মে রত,
কার্য্য উপস্থিত মন্ত্র করহ সাধন।
কেহ কার মুখাপেক্ষা ক'র না কখন। ১৭

তা'হলে ফুটিতে পারে নন্দন-কানন ;
তা'হলে আবার হাস,
হতে পারে পরকাশ,
মাতৃ মুখে হ'তে পারে রোদন বারণ !
তা'হলে ফুটিতে পারে নন্দন-কানন। ১৮

শ্রীমধুসূদন সরকার।

ফল্গু-নদী।

১

নহ নীরময়ী তুমি ফল্গু অন্তঃশীলা,
কায়া তব বালুকার সমষ্টি কেবল,
সৃষ্টির অদ্ভুত সৃষ্টি দেবতার খেলা,
বালুকার অভ্যন্তরে তটিনী শীতল।

২

শত শত নর নারী বক্ষের উপর,
পিতৃ-পুরুষের পিণ্ড করিতেছে দান,
এ দৃশ্য মরমস্পর্শী করুণ সুন্দর
পবিত্র প্রফুল্ল যথা ত্রিদিব মহান্।

৩

সুবিশাল বক্ষে তব খোদিয়া বালুকা,
বাপীর মতন করি তুলিয়াছে জল,
নর নারীগণ—আহা মিষ্ট-মধু মাখা,
এই স্বল্প জল সদা সর্ব্বদা শীতল।

৪

বক্ষোপরি মহাযজ্ঞ হয় প্রতিদিন,
পবিত্র তুলসী পত্রে সজ্জিত সতত,
ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ, রজঃ তম গুণহীন
অনুক্ষণ অহর্দিন মন্ত্র-মুখরিত।

৫

তটভূমে রাম-শীলা বিচিত্র পাহাড়,
শত গুল্ম লতা তরু স্বভাবের শোভা,
হেতায় নিবাস যেন শত দেবতার,
শত সুর হেতা যেন ঢালিছে প্রতিভা।

৬

তব তটে স্থিত ফল্গু প্রশান্ত মন্দির,
অভ্যন্তরে "গদাধর" করেন বসতি,
উচ্ছ্বসিত সদা প্রেম-উচ্ছ্বাস-গভীর
হেতা "পাদপদ্মে" পিণ্ড পড়ে নিতি নিতি।

৭

ওহো কি করুণ-দৃশ্য হেরিলে হৃদয়,
কি এক মহান্ ভাবে হয় বিমোহিত,
মনে হয় স্বর্গ ইহা মর্ত্ত্য-ধাম নহে
সকলের সার শোভা হেথা একত্রিত !

৮

পর পারে, "সীতা-কুণ্ড" দেখিতে সুন্দর,
প্রস্তরে নির্ম্মিত হেতা শত দেব দেবী,
চতুর্দ্দিকে পুঞ্জ পুঞ্জ পাহাড়, প্রস্তর,
প্রকৃতি এঁকেছে যেন অলকার ছবি।

৯

তটভূমে আর কত সুন্দর পাহাড়,
নির্ঝরিণী ঝরিতেছে পাহাড়ের গায়,
সৌন্দর্য্য ঝরিছে যেন রৌপ্য মেখলার,
সাজিয়াছে ছবি যেন সহস্র শোভায়।

১০

প্রকৃতির মহালীলা এই গয়াধাম,
পার্ব্বতীয় সৌন্দর্য্যের প্রিয়-বাস-ঘর,
কিন্তু সব শোভা মাঝে ফল্গুই প্রধান
শোভিছে গয়ার পূত চরণ উপর।

১১

কিম্বা সুর পুন্নাগের আদর্শ শোভিছে,
গয়ার শ্রী কণ্ঠে ইহা যেন রৌপ্যহার,
গয়ার বক্ষেতে ফল্গু সৌন্দর্য্যে হাসিছে,
বালুকা দশন খুলি কিবা চমৎকার।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা।

বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অধ্যায়।*

"শ্রী
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য
চরিত্রং
শ্রীযুত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়েন
রচিতং
"কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ ধরণীর মাজ।
যাহার অধিকারে নবদ্বীপ সমাজ॥
পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যত করিয়া প্রচার।
কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র পরে কহিব বিস্তার॥"
লন্দনমহানগরে চাপা হইল
১৮১১।"

বঙ্গভূমিতে হাবিলি পরগণায় কাঁকদি গ্রামে কাশীনাথ রায় মহাশয়ের বসতি ছিল পরগণা ও তাহার জমিদারি কিছু কাল পরে রাজ করের কারণ ঢাকার শুভার সহিত বিবাদ উপস্থিত হইল সেই বিবাদে পরাভব হইয়া বনিতাকে সঙ্গে করিয়া দেশ ত্যাগ করিলেন বহু কাল ভ্রমণ করিতে করিতে বাগুয়ান পরগণায় বিশ্বনাথ সমাদ্দারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সমাদ্দার যথেষ্ট সমাদর করিয়া নিজালয়েতে অপূর্ব্ব স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়া রায়কে এবং রায়ের গৃহিণীকে যত্নপূর্ব্বক পালন করিতে লাগিলেন কিঞ্চিৎ কালান্তরে রায়ের বনিতা গর্ব্ভিণী হইয়া রায়কে কহিলেন হে নাথ বুঝি আমার গর্ব্ভ হইল ইহা শুনিয়া রায় অত্যন্ত কাতর হইয়া কহিলেন রাজ্যচ্যুত হইয়া পরের বাটীতে থাকিয়া রাণী কি প্রকারে প্রসব হইয়া। এবং অনেক অনেক বিলাপ করিলেন। অনেক বিবেচনানন্তর প্রভাতে সমাদ্দারকে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়া কহিলেন হে আমরা তোমার সন্তান সন্ততি আপনি ইহাই বিবেচনা করিয়া যে উচিত হয় তাহাই করিবেন সমাদ্দার অনেক অনেক আশ্বাস করিয়া কন্যা ভাবে রাণীকে পালন করিতে লাগিলেন রায় দেখেন সমাদ্দার আত্ম কন্যার ন্যায় রাণীকে পালন করিতে প্রবর্ত্ত তখন চিন্তা করিতেছেন রাজ্য গেল পরের বাটীতে কত কাল বাস এ রূপে করিব ইহাই অন্তঃকরণে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখেন ইহার উপায় হস্তিনাপুরে না গেলে আমার উপায়ান্তর হইবেক না ইহাই ধার্য্য করিয়া সমাদ্দারকে না কহিয়া এবং আত্ম বনিতাকে না বলিয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন।

সমাদ্দার রায়কে না দিখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং রায়ের গৃহিণী রায়ের অন্বেষণ না পায়া বিপদ সাগরে মগ্না ক্ষিপ্তমানা রোদনপরা শোকাকুলা। সমাদ্দার অতিশয় কাতরা দেখিয়া রাণীকে কহিতেছেন তুমি কন্যা যদ্যপি রায় এরূপ করিলেন আমি তোমাকে প্রতিপালন করিব তুমি কদাচ চিন্তা করিবা না। তখন রাণী সমাদ্দারের কথা শ্রবণ করিয়া স্থিরা হইয়া কহিলেন পিতা তোমা ব্যতিরেকে আমার আর অন্য জন নাই। সমাদ্দার কহিলেন কন্যা কদাচ ভাবনা করিবা না। তখন বনিতা স্থিরা হইলেন সমাদ্দার সর্ব্বদা রাণীকে অধিক স্নেহেতে পালন করেন। সময় ক্রমে রায়ের বনিতা প্রসব হইলেন অপূর্ব্ব বালক দর্শন

* রাজীবলোচনের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত ১৮১১ খ্রীঃ লণ্ডন নগরে মুদ্রিত এক অপূর্ব্ব জিনিষ। এই পুস্তকখানি অবিকল মুদ্রিত করিলাম। ইহার অক্ষরগুলি অপূর্ব্ব, বোধ হয়, বহু অর্থ ব্যয়ে হাতের লেখা দেখিয়া লণ্ডনে অক্ষর প্রস্তুত করা হইয়াছিল। পাঠকগণ ইহাতে আধুনিক কুলাঙ্গারদিগের ন্যায় শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালার অনেক প্রাচীন স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গারদিগের তথ্য জ্ঞাত হইতে পারিবেন। ন, স।

করিয়া পরম হৃষ্টা হইয়া কহিলেন পিতাকে ডাক সমাদ্দার উপস্থিত হইলেই কহিলেন পিতা দৌহিত্র দর্শন কর। সমাদ্দার দর্শন করিয়া দেখেন লক্ষণাক্রান্ত দৌহিত্র ভাবে সমাদ্দার পালন করিতে লাগিলেন। সময় ক্রমে অন্নপ্রাশন দিয়া নাম রাখিলেন শ্রীরাম। সকল লোক জানিলেক সমাদ্দারের পরিবার এই হেতু নাম হইল রাম সমাদ্দার॥

এই রূপে কতক কাল যায় রায় হস্তিনাপুর গমন করিলেন কিন্তু পুনরায় আগমন হইল না। সমাদ্দার বিবেচনা করিলেন বালকের যজ্ঞোপবীতের সময় উপস্থিত হইল অতএব প্রধান প্রধান পণ্ডিতের স্থানে জিজ্ঞাসা করি তাহারা যে মত কহেন সেই মত কার্য্য করিব। এই সকল বিবেচনা করিতে করিতে রায়ের দ্বাদশ বৎসর গত হইল। পরে পণ্ডিতের ব্যবস্থা মতে রায়ের শ্রাদ্ধ করাইয়া শ্রীরামের যজ্ঞোপবীত দিয়া বিবাহ দিলেন।

কিছু কালান্তরে শ্রীরাম সমাদ্দারের জায়া গর্ব্ভিনী হইলেন। সময়ক্রমে রাম সমাদ্দারের বনিতা প্রসব হইলেন অপূর্ব্ব বালক সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত অতিশয় রূপবান চন্দ্রের ন্যায়। রাম সমাদ্দার পুত্রকে দেখিয়া বিবেচনা করিতেছেন বুঝি এই পুত্র হইতে আমাদিগের কুল উজ্জ্বল হইবেক আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন। পুত্র দিনে দিনে চন্দ্রকলার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন অন্নপ্রাশনাদি দিয়া নাম রাখিলেন ভবানন্দ॥

ক্রমে ক্রমে রাম সমাদ্দারের তিন পুত্র হইল জ্যেষ্ঠ ভবানন্দ মধ্যম হরিবল্লভ কনিষ্ঠ সুবুদ্ধি। ভবানন্দ মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় অতিশয় তেজপুঞ্জ। কিঞ্চিৎ কাল গৌণে ভবানন্দ বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবর্ত্ত শ্রুতিধর যাহা শুনেন তৎক্ষণেতে তাহাই অভ্যাস হই প্রতম শাস্ত্র পাঠ পশ্চাৎ বাঙ্গালা লিখন পঠন এবং পারসি ও আরবি ইত্যাদিতে বিসারদ হইলেন। অস্ত্র বিদ্যাতে অতি বড় ক্ষমতাপন্ন হয়ারোহণে নলরাজার ন্যায় সর্ব্ব বিদ্যায় বৃহস্পতি তুল্য রাম সমাদ্দার দেখিলেন পুত্র সর্ব্ব বিদ্যায় অতিশয় গুণবান হইল মনে বিবেচনা করিতেছেন এখন পুত্র রাজধানিতে গমন করে তবে উত্তম হয় কিন্তু পুত্রের বিবাহ অতি স্বরায় দিতে হইয়াছে ইহাই স্থির করিয়া ভবানন্দের বিবাহ দিলেন। ক্রমে ক্রমে তিন পুত্রের বিবাহ হইল।

ভবানন্দ অন্তঃকরণে নানা প্রকার বিবেচনা করিলেন আমার বাটীতে থাকা পরামর্শ নহে আমি রাজধানিতে গমন করিব। ইহাই স্থির করিয়া পিতাকে কহিলেন পিতা আমি বাটীতে থাকিব না রাজধানিতে গমন করিব। রাম সমাদ্দার কহিলেন উপযুক্ত পরামর্শ করিয়াছ ভাল দিবস স্থির করিয়া যাত্রা কর। পিতার অনুমতি পাইয়া ভবানন্দ কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া দিব্য যানে রাজধানিতে গমন করিলেন। তখন রাজধানি ঢাকায়। ভবানন্দ ঢাকায় উপস্থিত হইয়া উত্তম এক স্থানে রহিলেন এবং সর্ব্বত্রে গমনাগমন করিতে প্রবর্ত্ত বঙ্গাধিকারির নিকটে যাতায়াত করিতে করিতে বঙ্গাধিকারির নিকটে প্রতিপন্ন হই লেন। বঙ্গাধিকারী মহাশয় দেখেন ভবানন্দ অতি বড় গুণবান। অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া আত্ম্য কার্য্যের মধ্যে প্রধান কার্য্যে ভবানন্দকে নিযুক্ত করিলেন খ্যাতি রাখিলেন রায় মজুমদার। সেই অবধি খ্যাতি হইল ভবানন্দ রায় মজুমদার।

রায় মজুমদারের উন্নতি যথেষ্ট হইল। কিছু কালান্তরে যশহর নগরে প্রতাপাদিত্য নামে রাজা অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া রাজকর নিবারণ করিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত প্রতাপাদিত্য চরিত্রে বিস্তার আছে।

রাজা প্রতাপাদিত্যকে ধরিতে ঢাকার বাদসা রাজা মান সিংহকে আজ্ঞা করিলেন তুমি যাইয়া রাজা প্রতাপাদিত্যকে ধরিয়া আন, তাহাতে রাজা মানসিংহ যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিলেন পশ্চাৎ রাজা মানসিংহ অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলেন রাজা প্রতাপাদিত্য বড় দুর্বৃত্ত আমাকে আনিতে সুবা আজ্ঞা করিলেন কিন্তু সেই দেশীয় একজন উপযুক্ত মনুষ্য পাইলে ভাল হয় ইহার পূর্ব্ব ভবানন্দ রায় মাজুমদার রাজা মানসিংহের নিকট যাতায়াত করিতেছেন তাহাতেই রাজা মানসিংহ ভবানন্দ রায় মজুমদারকে জ্ঞাত ছিলেন স্মরণ হইল যে

ভবানন্দ রায় মজুমদার সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং গৌড় নিবাসী অতএব বঙ্গাধিকারীকে কহিয়া রায় মজুমদারকে লইব ইহার স্থির করিয়া বঙ্গাধিকারীকে আজ্ঞা করিলেন তোমার চাকর ভবানন্দ রায় মজুমদারকে আমাকে দেহ আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। বঙ্গাধিকারী কহিলেন যে আজ্ঞা কিন্তু বঙ্গাধিকারির যথেষ্ট ক্ষেদ হইল যে এমন চাকর আর কখন পাইব না কি করেন রায় মজুমদারকে আহ্বান করিয়া কহিলেন তোমাকে রাজা মানসিংহের সঙ্গে যাইতে হইল। রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন, কোন দেশে যাইতে হইবেক তাহাতে বঙ্গাধিকারী কহিলেন গৌড়ে যশহর নগরে রাজা প্রতাপাদিত্য রাজকর বারণ করিয়াছে তাহাকে ধরিতে রাজা মানসিংহ যাইতেছেন তুমিও তাহার সহিত গমন কর যে আজ্ঞা বলিয়া রায় মজুমদার স্বীকার করিলেন। পরে রাজা মানসিংহ ভবানন্দ রায় মজুমদার ও নব লক্ষ সৈন্য সঙ্গে করিয়া প্রতাপাদিত্য নিধন করিতে গৌড়ে প্রস্থান করিয়া দুই মাসে বালুচর গ্রামে উপনিত হইলেন। রায় মজুমদারকে কহিলেন রায় মজুমদার এ স্থানের কি নাম তাহাতে রায় মজুমদারকে নিবেদন করিলেন মহারাজ এ স্থানের নাম বালুচর গঙ্গার তীরেতে গ্রাম পত্তন হইয়াচে। রাজা মানসিংহ কহিলেন অপূর্ব্ব স্থান এই স্থানে রাজধানি হইলে উত্তম হয়। এই কথোপকথনের পর আজ্ঞা করিলেন, আমি কিঞ্চিত্ কাল এখানি বিশ্রাম করিব। রায় মজুমদার সকল মনুষ্যকে কহিলেন তোমরা এই স্থানে বিশ্রাম করহ। কতক কালান্তরে রাজা মানসিংহ রায় মজুমদারকে আজ্ঞা করিলেন, সকল সৈন্যকে সংবাদ করহ কল্য এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। আজ্ঞানুসারে যাবদীয় সৈন্যকে ভেরীর নাদে জানাইলেন যে, কল্য এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। পর দিবস সৈন্যের সহিত রাজা মানসিংহ গমন করিলেন।

এক দিবসের পর বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া রাজা মানসিংহ রায় মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কোন স্থান। রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন মহারাজ এ স্থানের নাম বর্দ্ধমান এ স্থানের অধিপতি রাজা বীরসিংহ ছিলেন এক্ষণে তাহার পুত্র রাজা ধীরসিংহ রাজত্ব করিতেছেন। রাজা ধীরসিংহ শ্রবণ করিলেন যে রাজা মানসিংহ রাজা প্রতাপাদিত্যকে নিপাত করিতে নব লক্ষ দলে আসিয়াছেন। রাজা ধীরসিংহ নিজ পরিবারের উপর আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে সসজ্য হও আমি মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব এবং নানা প্রকার সামগ্রী ভেট দিতে হইবেক তাহার আয়োজন করহ রাজা ধীরসিংহ নিজ ভৃত্যেরদিগের প্রতি আজ্ঞা করণে নানা বিধ সামগ্রীর আয়োজন হইয়া প্রস্তুত হইল। পরে রাজা ধীরসিংহ দিব্য যানে আরোহণ করিয়া ভেটের দ্রব্য সকল সঙ্গে করিয়া রাজা মানসিংহের নিকট সাক্ষাত্ করিতে গমন করিলেন। অগ্রে একজন প্রধান চাকর রায় মজুমদারের নিকট যাইয়া নিবেদন করিলেক যে বর্দ্ধমানের রাজা ধীরসিংহ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন মহারাজার নিকটে আপনি যাইয়া নিবেদন করুণ। পরে রায় মজুমদার রাজা মানসিংহকে নিবেদন করিলেন মহারাজ বর্দ্ধমানের রাজা ধীরসিংহ সাক্ষাত্ করিতে আসিতেছেন। রাজা মানসিংহ কহিলেন আসিতে কহ। পরে রাজা ধীরসিংহ নানা দ্রব্য ভেট দিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন ভেটের দ্রব্য দধি দুগ্ধ ক্ষীর আম্র কাঁঠাল নারিকেল গুবাক শ্রীফল আতা ও আর আর নানা জাতীয় ফল এবং অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বস্ত্র পট্ট বস্ত্র ও উত্তম সূতার বস্ত্র ও বনাত মখমল এবং চুনি চন্দ্রকান্ত মণি সূর্য্যকান্ত মণি নীল কান্ত মণি অয়স্কান্ত মণি এবং সহস্র সহস্র স্বুবর্ণ দিলেন। ভেটের দ্রব্য দর্শন করিয়া আর রাজার শিষ্টতা দেখিয়া রাজা মানসিংহ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া রাজা ধীরসিংহকে বসিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজা ধীরসিংহ নানা প্রকার শিষ্টাচার করিয়া কহিলেন মহারাজ আমার নগরের ভাগ্যক্রমে এবং আমার অদিষ্ট প্রসন্ন প্রযুক্ত মহারাজার আগমন হইয়াছে। রাজা মানসিংহ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া

রাজা ধীরসিংহকে হস্তি ঘোটক এবং দ্রব্য রাজ বস্ত্র মুক্তার মালা নানা বিধ আভরণ প্রসাদ করিলেন আর কহিলেন আমি তোমার নগর ভ্রমণ করিয়া দেখিব। রাজা ধীরসিংহ নিবেদন করিলেন যে আজ্ঞা। এই সকল কথার পর ধীরসিংহ প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। পরদিবস রাজা মানসিংহ রাজা ধীরসিংহের নগর ভ্রমণ করিতে গমন করিলেন। ভবানন্দ রায় মজুমদারকে সঙ্গে করিয়া রাজা মানসিংহ নগর ভ্রমণ করিতে করিতে দেখেন এক সুরঙ্গ রায় মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন কিসের সুরঙ্গ। তাহাতে রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন বীরসিংহের এক কন্যা বিদ্যা নামে ছিল সে কন্যা সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিতা ইহাতেই কন্যা প্রতিজ্ঞা করিলেক যে আমাকে শাস্ত্রের বিচারে পরাভব করিবেক তাহাকে আমি বর মাল্য দিব এই সংবাদ দেশ দেশান্তর প্রচার হওনে অনেক অনেক রাজ পুত্র আসিলেন সকলকে পরাভব করিলেক। পরে দক্ষিণ দেশে কাঞ্চিপুরের গুণসিন্ধু মহারাজার তনয় সুন্দর নামে অতিশয় রূপবান এবং সর্ব্ব শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় এই সকল সংবাদ পাইয়া পিতা মাতাকে না কহিয়া বর্দ্ধমানে হিরা নামে এক মালিনীর বাটীতে বাসা করিয়া রহিলেন সেই সুন্দর সুরঙ্গ কাটিয়া বিদ্যার নিকটে যাইয়া শাস্ত্র বিচারে জয়ী হইয়া বিদ্যাকে গন্ধর্ব্ব বিবাহ করিলেন। ইহার বিস্তার চোর পঞ্চাশতে আছে। রাজা মানসিংহ আজ্ঞা করিলেন সে গ্রন্থ আনিয়া আমাকে শুনাও। রায় মজুমদার চোর পঞ্চাশত শ্লোক আনাইয়া যাবদীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন॥

পশ্চাত্ রাজা মানসিংহ বর্দ্ধমান হইতে গমন করিয়া বিবেচনা করিলেন যে ভবানন্দ রায় মজুমদারের বাটী দেখিয়া যাইব। রাই মজুমদারকে কহিলেন আমি তোমার বাটী দেখিয়া যাইব। রায় মজুমদার যে আজ্ঞা বলিয়া পরম তুষ্ট হইলেন। রাজা মানসিংহ বাগুয়ান পরগণায় উপস্থিত হইয়া ভবানন্দ রায়ের বাটীতে উপনিত হইলেন। রায় মজুমদার নানা জাতীয় ভেটের সামগ্রী রাজার গোচরে আনিলেন। রায় মজুমদারের আহ্লাদ এবং সামগ্রীর আয়োজন দেখিয়া রাজা মানসিংহ অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে ঝড় বৃষ্টি অতিশয় উপস্থিত রাজা মানসিংহের সঙ্গে নব লক্ষ সৈন্য খাদ্য সামগ্রীর কারণ মহা ব্যস্ত রায় মজুমদার যাবদীয় সৈন্যের আহার পরগণা হইতে এবং নিজালয় হইতে দিলেন। এই প্রকার সপ্তাহ হস্তি ঘোটক পদাতিক প্রভৃতি সকলেই কোন ব্যামোহ পাইলেক না। ইহাতে রাজা মানসিংহ ভবানন্দ রায়কে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া রায় মজুমদারকে কহিলেন যদি ঈশ্বর আমাকে জয়ী করিয়া আনেন তবে তোমার উপকারের প্রত্যুপকার করিব। পশ্চাত্ যশোহরে গমন করিয়া রাজা প্রতাপাদিত্যকে শাসিত করিয়া কিছুকাল গৌণে ঢাকায় প্রস্থান করিলেন॥

ভবানন্দ রায় মজুমদার রাজা মানসিংহের সহিত ঢাকায় গমন করিলেন। এক দিবস রাজা মানসিংহ রায় মজুমদারকে কহিলেন তুমি আমার সাহায্য অনেক অনেক করিয়াছ অতএব কোন বাসনা থাকে আমাকে কহ আমি তাহা পূর্ণ করিব। ইহা শুনিয়া রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন তবে বাগুয়ান পরগণা আমার জমিদারি আজ্ঞা হয়। রাজা মানসিংহ স্বীকার করিয়া কহিলেন ঢাকায় উপস্থিত হইয়া অগ্রে তোমার বাসনা পূর্ণ করিব। ভবানন্দ রায় মজুমদারের অন্তঃকরণে যথেষ্ট আহ্লাদ হইয়া বিবেচনা করিতেছেন বুঝি কুল লক্ষ্মীর কৃপা হয়।

রাজা মানসিংহ জয়ী হইয়া আসিতেছেন এই সংবাদ বাদসা পাইয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া রাজা মানসিংহকে রাজপ্রসাদ দিবেন তাহার আয়োজন করিতে আজ্ঞা করিলেন প্রধান মন্ত্রীরা সামগ্রী সমাধান করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন।

ভবানন্দ রায় মজুমদারের বাটীতে আশ্চর্য্য এক প্রকরণ হইল তাহার বৃত্তান্ত এই বড়গাছি নামে এক গ্রাম তাহাতে হরি হোড়ের বসতি। হরি হোড় অতি বড় ধনবান এবং পুণ্যশীল অত্যন্ত ধার্ম্মিক লক্ষ্মী সর্ব্বদা স্থিরা

হইয়া হরি হোড়ের নিবাসে বসতি করেন। বহুকাল এই রূপে গত হইল হরি হোড়ের পরিবার অতি বিস্তর সর্ব্বদা বিবাদ করিতে প্রবর্ত্ত বাটীর মধ্যে হাটের কোলাহলের ন্যায় লক্ষ্মী বিবেচনা করিলেন এই বাটীতে আর তিষ্ঠান গেল না অতএব আমার পরম ভক্ত ভবানন্দ মজুমদার তাহার বাটীতে গমন করি ইহাই স্থির করিয়া হরি হোড়ের বাটী হইতে ভবানন্দ মজুমদারেব বাটীতে চলিলেন। পথের মধ্যে স্মরণ হইল নদীর নিকট ঈশ্বরী পাটনী আছে সে আমার অনেক তপস্যা করিয়াছে তাহাকে সাক্ষাৎ নিয়া বর প্রদান করিয়া পশ্চাৎ মজুমদারের বাটীতে যাইব। এই চিন্তা করিয়া পরম সুন্দরী এক কন্যা হইলেন কুক্ষি দেশে একটি ঝাঁপী লইয়া নদীর নিকটে যাইয়া কহিলেন ঈশ্বরী পাটনী আমাকে পার করিয়া দেহ। ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক মা তুমি কে অগ্রে আমাকে কহ পশ্চাত্ পার করিব ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন ঈশ্বরী আমি ভবানন্দ মজুমদারের কন্যা শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলাম সেখানে বিবাদের জ্বালাতে তিষ্টিতে পারিলাম না এখন পিত্রালয়ে যাইতেছি। ইহা শুনিয়া পাটনী কহিলেক মা তুমি মজুমদার মহাশয়ের কন্যা নহ তাহার কন্যা হইলে এই বেশে একাকিনী কেন যাইবা কিন্তু আমার অন্তঃকরণে উদয় হইতেছে তুমি লক্ষ্মী মজুমদারকে কৃতার্থ করিতে গমন করিয়াছ আমি অতি দুঃখিনী আমাকে আত্ম পরিচয় দিউন। তাহাতে লক্ষ্মী হাস্য করিলেন ঈশ্বরী পাটরী পরম আহ্লাদে নৌকা শীঘ্র আনিয়া কহিলেক মা নৌকায় বৈশ। লক্ষ্মী নৌকায় বসিয়া দুই খানি পদ জলে রাখিলেন। ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক মা গো জলে নানা হিংস্রক জন্তু আছে কি জানি পাছি পদে দংশন করে পা দুই খানি তুলিয়া বৈশ। তাহাতে লক্ষ্মী কহিলেন পদ কোথায় রাখিব। ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক প্া দুই খানি জল সেচনির উপরে রাখ। বিশ্বমাতা ইহা শুনিয়া জল সেচনিতে পদ রাখিলেন জল সেচনিতে পদ স্পর্শ হইতেই সৈচনি স্বর্ণ হইল। ঈশ্বরী পাটনী দেখে সেচনি সোনা হইল তথন অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলেক ইনি সামান্যা নন জগৎ জননী ছল করিয়া আমার নিকট আসিয়াছেন ঈশ্বরী পাটনী লক্ষ্মীর পদানত হইয়া প্রণাম করিয়া বহুবিধ স্তব করিলেক তথন লক্ষ্মী হাস্য করিয়া কহিলেন ঈশ্বরী পাটনী তুমি আমার অনেক তপস্যা করিয়াছ আমি বড় বাধ্য আছি বর যাচ্ঞা কর। ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক মা গো তোমার কৃপায় আমার সকল পূর্ণ হইল যদি বর দিবেন তবে এই বর দেওন যে আমার সন্তান যাবত্ থাকিবেক কেহ দুঃখ না পায় এবং দুগ্ধ ভাত খাউক। তথাস্তু বলিয়া লক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান হইলেন।

পশ্চাৎ ঈশ্বরী পাটনী আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া ভবানন্দ মজুমদারের বাটীতে যাইয়া মজুমদারের গৃহিণীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলেক। মজুমদারের বনিতা আনন্দার্ণবে মগনা হইয়া ঈশ্বরী পাটনীকে দিব্য বস্ত্র আভরণে সন্তুষ্ট করিয়া পশ্চাৎ পুরবাসিনীরা সকলে আসিয়া জয় জয় ধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত আহ্লাদের সীমা নাই। রজনী যোগে ভবানন্দ মজুমদারের স্ত্রী স্বপ্নে দেখেন অপূর্ব্বা এক কন্যা কহিতেছেন আমি তোমার বাটীতে আসিয়াছি এবং আমার একটি ঝাঁপী তোমার ঘরে রাখিয়াছি তুমি সর্ব্বদা আমার পূজা করিবা এবং ঝাঁপাটি খুলিবা না। রায় মজুমদারের স্ত্রী প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখেন ঘরের মধ্য স্থলে ঝাঁপী স্নান করিয়া ঝাঁপী মস্তকে লইয়া অপূর্ব্ব এক স্থানে রাখিয়া নানা বিধ আয়োজন করিয়া লক্ষ্মীর পূজা করিলেন। অদ্যাপি সেই ঝাঁপী আছে॥

ভবানন্দরায় মজুমদার রাজা মানসিংহের সহিত ঢাকায় উপস্থিত হইলেন। পরে এক দিবস রাজা মানসিংহের সহিত জহানগীরসা বাদসাহের নিকট গমন করিলেন। বাদসাহের নিকট সংবাদ বিস্তারিত রাজা মানসিংহ নিবেদন করিলেন গমন এবং আগমন পর্য্যন্ত কিন্তু ভবানন্দমজুমদারের বিস্তর বিস্তর প্রশংসা বাদশাহের নিকট করণে বাদসা আজ্ঞা করিলেন তাহাকে আমার নিকটে আন। রাজা মানসিংহ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া

আহ্বান করিলেন। রায় মজুমদার বিস্তর বিস্তর নমস্কার করিয়া করপুটে সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বাদসা ভবানন্দ মজুমদারকে দেখিয়া তুষ্ট হইয়া কহিলেন উপযুক্ত মনুষ্য বটে পশ্চাত্‌, মানসিংহকে নানা প্রকার রাজপ্রসাদ সামগ্রী দিয়া আজ্ঞা করিলেন তোমার কোন বাসনা থাকে আমাকে কহ আমি তাহা পূর্ণ করিব। তখন রাজা মানসিংহ নিবেদন করিলেন রাজা প্রতাপাদিত্যকে শাসিত করণের মূল ভবানন্দ মজুমদার যদি আজ্ঞা হয় তবে মজুমদারকে রাজপ্রসাদ কিছু দিউন। বাদসা হাস্য করিয়া কহিলেন উহার নিবেদন কি তখন রাজা মানসিংহ করপুটে কহিলেন বাঙ্গালার মধ্যে বাগুয়ান নামে এক পরগণা আছে সেই পরগণা ইহার জমিদারি হউক। বাদসা হাস্য করিয়া কহিলেন জমিদারির লিপি করিয়া দেহ। আজ্ঞা পাইয়া রাজা মানসিংহ বাগুয়ান পরগণার জমিদারির লিপি বাদসাহের স্বাক্ষর করিয়া মজুমদারকে দিয়া সংভ্রান্ত করিলেন। রায় মজুমদার জমিদারির লিপি লইয়া বাদসাহের নিকট হইতে বিদায় হইয়া রাজা মানসিংহের বাটীতে গেলেন। রাজা মানসিংহ কিঞ্চিৎ গৌণে রাজদরবার হইতে বিদায় হইয়া বাটীতে আসিলেন দেখেন ভবানন্দ মজুমদার বসিয়া রহিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি কার্য্যে এখন এখানে আসিয়াছ। তাহাতে মজুমদার কহিলেন মহারাজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন কিছুকালের জন্যে বিদায় করুন। ইহাতেই রাজা মানসিংহ কহিলেন মজুমদার নিজ বাটীতে যাইবা। মজুমদার নিবেদন করিলেন যেমন আজ্ঞা হয়। রাজা মানসিংহ বহুবিধ রাজপ্রসাদ দিয়া যথেষ্ট তুষ্ট করিয়া মজুমদারকে বাটীতে বিদায় করিলেন।

ভবানন্দ মজুমদার রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া মনের আনন্দে শুভালগ্নে তরণি যোগে বাটী প্রস্থান করিলেন।

ভবানন্দ মজুমদার বাটীর নিকট আসিয়া নিজালয়ে দূত প্রেরণ করিয়া সংবাদ দিয়া পশ্চাৎ আপনি উপস্থিত হইলেন। যাবদীয় লোক শ্রবণ করিলেন যে রায় মজুমদার বাগুয়ান পরগণা জমিদারি করিয়া আসিয়াছেন ইহাতে যাবদীয় মনুষ্য হর্ষ হইয়া ভেটের সামগ্রী লইয়া সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেক সকলের মহা আনন্দ হইল। রায় মজুমদার যে যেমন মনুষ্য তাহাকে তেমনি সমাদর করিয়া শিষ্টাচার করিলেন এবং প্রজারদিগকে যথেষ্ট আশ্বাস করিয়া সকল মনুষ্যকে জমিদারির পত্র দেখাইলেন পশ্চাৎ আত্ম গৃহে গমন করিয়া পুর মধ্যে উত্তম স্থানে কিঞ্চিৎকাল বসিয়া অন্তঃপুরে গমন করিয়া মধুর বাক্যে নিজ পরিবারের তোষ জন্মাইয়া দিব্য আসনে বসিলেন। রায় মজুমদারের পত্নী লক্ষ্মীর আগমনের যাবদীয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সকল সমাচার জ্ঞাত হইয়া রায় মজুমদার বিবেচনা করিলেন লক্ষ্মীর কৃপায় আমার সকল সম্পত্তি মহানন্দে গাত্রোত্থান করিয়া ঝাঁপী দর্শন করিয়া প্রণামানন্তর বহুবিধ স্তব করিলেন এবং সহস্র মুদ্রা ব্যায় করিয়া জ্ঞাতি কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিয়া লক্ষ্মীর পূজা করিলেন এবং রাজকীয় ব্যাপার করিতে প্রবর্ত্ত সকল প্রজা মনের হর্ষে রাজকর যোগাইতে লাগিল। কিছু কালানন্তরে ভবানন্দ রায় মজুমদারের তিন পুত্র হইল জ্যেষ্ঠের নাম রাখিলেন গোপাল মধ্যমের নাম গোবিন্দ কণিষ্ঠের নাম শ্রীকৃষ্ণ। ইহাদিগের মধ্যে গোপাল রায় সর্ব্ব শাস্ত্রে উত্তম পণ্ডিত। কতক কালানন্তরে রায় মজুমদার তিন পুত্রের বিবাহ দিলেন। কালক্রমে গোপাল রায়ের পুত্র হইল নাম রাখিলেন রাঘব রায়। ভবানন্দ রায় পৌত্র দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন এ পৌত্র অতি প্রধান মনুষ্য হইবেক, সর্ব্ব লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত। পৌত্রোত্‌সবে মহতী ঘটা করিয়া পশ্চাৎ ভ্রাতা সুবুদ্ধি রায় ও হরিভল্লব রায়কে কিঞ্চিৎ জমিদারি দিয়া সংসার হইতে বিরত হইলেন। পরে গোপাল রায় সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া কাল জাপন করেন। কিছু কাল পরে গোপাল রায় ভ্রাতা গোবিন্দ রায় ও ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ রায়কে কিঞ্চিৎ জমিদারি দিয়া ঈশ্বর ভজন কারণ বিষয়ত্যাগী হইলেন। পরে রাঘব রায় সর্ব্ব শাস্ত্রে গুণবান অতি বড়দাতা সর্ব্বদা যাবদীয় প্রজার প্রতিপালনে মতিমান সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত দান ধ্যান যোগ সদালাপ বিশিষ্ট লোকের সমাদর রাজ্য

সুদ্ধ সকল লোকের নিকট মহৎ সুখ্যাত্যাপন্ন জমিদারির বাহুল্য হইলে লাগিল। মনে মনে বিচার করিয়া স্থির করিলেন আমি রাজধানিতে গমন করিব। শুভ দিন স্থির করিয়া রাজধানিতে গমন করিলেন। সম্রাটের রাজার সহিত সাক্ষাত্ করিয়া আত্মমানের গৌরব যথেষ্ট জন্মাইলেন। সম্রাটের রাজা রাঘব রায়ের সহিত আলাপ করিয়া দেখিলেন এ বড় মনুষ্য ইহাকে রাজা করি। পরে অনেক ভূমির কর্ত্তা করিয়া রাজপ্রসাদ দিয়া উপাধি রাখিলেন রাঘব রায় মহারাজ সেই অবধি খ্যাতি হইল মহারাজ। পরে মহারাজ আত্ম রাজধানিতে আগমন করিয়া রাজত্বের বাহুল্য করিয়া কাল জাপন করেন। সময় ক্রমে এক পুত্র হইল যাহার নাম রাখিলেন রুদ্র রায়। পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ কালানন্তরে রুদ্র রায়কে রাজ্য দিয়া ঈশ্বরে মনোর্পণ করিলেন।

রুদ্র রায় মহারাজ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মহানন্দে কালজাপন করেন। এক দিবস পাত্র মিত্র সকলকে আজ্ঞা করিলেন যে তোমরা সকলে মাটীয়ারি পরগণায় যাইয়া অপূর্ব্বা এক পুরী প্রস্তুতা করহ আমি সেই স্থানে বাস করিব। সকলেই কহিলেন উপযুক্ত স্থান বটে। এই পরামর্শ স্থির করিয়া প্রধান প্রধান চাকর অগ্রে গমন করিয়া বাটী নির্ম্মাণ করিলেন। পরে রুদ্র রায় মহা রাজ সপরিবারে মাটীয়ারির বাটী যাইয়া বসতি করিলেন। অদ্যাপি এ সকল স্থান বর্ত্তমান আছে। পরে সময় ক্রমে রুদ্র রায় মহারাজার তিন পুত্র হইল জ্যেষ্ঠের নাম রামচন্দ্র মধ্যম রামকৃষ্ণ কনিষ্ঠ রামজীবন। রামচন্দ্র মহারাজ অতি বড় বলবান রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া বলক্রমে অনেক ক্ষুদ্র জমিদারের ভূমি লইয়া আপন রাজ্য অধিক করিলেন। রামচন্দ্র মহারাজ অবর্ত্তমানে রামকৃষ্ণ রাজা হইলেন। এই কালীন ঢাকায় সুবা হইলেন মুরসদালি খান ইতি ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া আত্ম নামে এক অপূর্ব্ব নগর বসাইয়া নাম রাখিলেন মুরসদাবাদ এই নগরে রাজধানি করিলেন। রামকৃষ্ণ মহারাজ পরম ধার্ম্মিক এবং সুবার নিকট যথেষ্ট মর্য্যাদান্বিত যে রাজকর পূর্ব্বে নিয়মিত ছিল তাহা অপেক্ষা কিছু অল্প করিয়া যথেষ্ট সৈন্য রাখিয়া রাজ্যের বাহুল্য করিলেন। রামকৃষ্ণ মহারাজ বাইশ লক্ষের জমিদারি করিয়া পরম সুখে কালজাপন করেন। তাহার অবর্ত্তমানে রামজীবন রায় রাজা হইলেন।

রামজীবন রায় মহারাজ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাজা রামকৃষ্ণ কৃষ্ণনগর নামে যে এক নগর করিয়াছিলেন, সেই স্থানে রাজধানি করিলেন। [illegible]জীবন রায় মহারাজ অত্যন্ত প্রতাপান্বিত রাজ্য অতিশয় শাসিত করিয়া এইরূপে কালক্ষেপণ করেন। সময় ক্রমে মহারাজার দুই পুত্র হইল। জ্যেষ্ঠ রঘুরাম কণিষ্ঠ রামগোপাল। কিছু কালানন্তরে রঘুরাম রায় রাজা হইলেন। রঘুরাম রায় মহারাজ অতি বড় দাতা পুণ্যবান পরম সুখে কালজাপন করেন? রাজা রাণীর অধিক বয়ঃক্রম হইল পুত্র না হওয়াতে সর্ব্বদা ক্ষেদিত থাকেন। এক দিবস ঈশ্বরের আরাধনা ব্যাতিরেকে উত্তম রত্ন লাভ হয় না অতএব আমরা দুই জনে কঠোর তপস্যা করি তবে ঈশ্বর অবশ্য পুত্র দিবেন। রাজা রাণী ইহাই স্থির করিয়া আরাধনার নিয়ম করিলেন। অতি প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানানন্তর ঈশ্বরের মহতী পূজা করিয়া সূর্য্যদৃষ্টি করিয়া রাজা রাণী প্রত্যেহ ঈশ্বরের তপস্যা করেন। এইরূপে এক বৎসর গত হইল রাজা রাণীর তপস্যাতে সকল লোকের চমৎকার বোধ হইয়া বিস্তর বিস্তর প্রশংসা করিলেক। আরাধনার নিয়ম এক বৎসর তাহা পূর্ণ হইলে মহামতী করিয়া যজ্ঞ করিলেন। কিঞ্চিত্ কাল পরে দিবস রাত্রে রাজা রঘুরাম রাণীর সহিত অন্তঃপুরে শয়ন করিয়াছেন, রজনী শেষে রাণী অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়া চৈতন্য হইয়া রাজাকে গাত্রোত্থান করাইলেন রাজার চৈতন্য হইলে পরে নিবেদন করিবেন হে মহারাজ আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম। রাজা কহিলেন কি স্বপ্ন দেখিয়াছ। রাণী কহিলেন আমি নিদ্রাগত ছিলাম একজন অপূর্ব্ব পুরুষ আসিয়া আমাকে কহিলেন আমি তোমার পুত্র হইব আমা হইতে তোমরা অনেক সুখী হইবা এবং যাবদীয় লোক

তোমাকে সুবর্ণগর্ভা কহিবেক যেহেতু আমাকে প্রসব হইবা আমি কহিলাম আপনিকে তাহাতে কহিলেন তোমরা যাহার আরাধনা করিয়াছিলা আমি তাহার অনুগৃহিত তোমার পুত্র হইতে আমাকে আজ্ঞা হইয়াছে ইহা বলিয়া অতিক্ষুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার মুখ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা রঘুরাম রায় স্বপ্নের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহা আনন্দার্ণবে মগ্ন হইয়া রাণীকে কহিলেন তোমার অপূর্ব্ব বালক হইবেক অগ্য তোমার গর্ত্তাধান হইল এই কথা অন্যকে কহিবা না। কিঞ্চিৎকাল পরে রাণীর গর্ত্ত প্রচার হওনে পাত্র মিত্র আত্মীয়বর্গের সমূহ আনন্দ হইল দিনে দিনে নানা প্রকার উৎসাহ হইতেছে। সময় ক্রমে রাণীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল এই সম্বাদ রাজা শুনিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় এমত পণ্ডিতগণকে লইয়া রাজা অন্তঃপুরের নিকটে বসিলেন যাবদীয় প্রধান প্রধান ভৃত্যেরা সদা সাবধানে আছে যখন যাহাকে যে আজ্ঞা হবেক তত্ক্ষণেতে সে কার্য্য করিবেক ইতি মধ্যে শুভক্ষণে শুভ লগ্নে অপূর্ব্ব এক পুত্র হইল। পুত্রের রূপে পুরী চন্দ্রের ন্যায় আলো করিল। রাজপুরে জয় জয় ধ্বনি হইবা মাত্র অট্টালিকার উপরে বাদ্যোদ্যম শঙ্খ ঘণ্টা ঘড়ি তূরী ভেরী ঝাঁঝরী রাম সিঙ্গা ঢক্কা ঢোল দামামা এবং বীণা মৃদঙ্গ কাংস্য করতাল রামবেণী প্রভৃতি নানা যন্ত্রের বাদ্যে কোলাহল শব্দ নগরস্থ রমণীরা রাজপুরে আসিয়া হুলু হুলু ধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত হইল। রাজা পরমাহ্লাদে শত শত সুবর্ণ এক এক ব্রাহ্মণকে এবং উদাসীনকে ও অন্ধ অতুরে এবং খঞ্জকে প্রদান করিতে লাগিলেন। যাবদীয় নগরস্থ লোকদিগের সন্তোষের সীমা নাই। কিঞ্চিত্ কাল পরে পাত্রের প্রতি রাজা আজ্ঞা করিলেন যাবদীয় নগরের লোকের বাটীতে মত্স্য ও দধি এবং সন্দেশ ভারে ভারে প্রদান কর। পাত্র রাজাজ্ঞানুসারে সকলের বাটীতে প্রদান করিয়া পশ্চাৎ রাজার নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ অন্তঃপুরে যাইয়া পুত্র দর্শন করুন এবং ভৃত্যবর্গের দিগেরও বাসনা রাজপুত্র দেখে। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন কর্ত্তব্য বটে রাজা অগ্রে পুরমধ্যে গমন করিয়া পুত্র দর্শন করিলেন পশ্চাৎ দাসীরদিগের প্রতি আজ্ঞা করিলেন পাত্র প্রভৃতি যাবদীয় ভৃত্যেরা রাজপুত্র দর্শন করিতে আসিতেছে সকলকে দেখাও। দাসীরা রাজপুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া যাবদীয় প্রধান প্রধান ভৃত্যেরদিগকে দেখাইল পরে সকলেই অন্তঃপুর হইতে আগমন করিয়া রাজ সভাতে বসিলেন সমস্ত ব্রাহ্মণেরা বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন পরে জ্যোতিষ ভট্টাচার্য্যেরা নানা শাস্ত্র বিচার করিয়া দেখিলেন অপূর্ব্ব বালক হইয়াছে। রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন মহারাজ এই যে রাজ পুত্র হইয়াছেন ইহার দীর্ঘ পরমায়ু হইবেক সর্ব্ব শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং ধর্ম্মাত্মা হইবেন সকল লোক ইহার অতিশয় যশ ঘুষিবেক মহারাজ চক্রবর্ত্তী হইয়া বহুকাল রাজ্য করিবেন মহারাজ ইহার গুণে কুল-উজ্জ্বল হইবেক। রাজা জ্যোতিষি ভট্টাচার্য্যেরদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হর্ষ যুক্ত হইলেন। কিছু কালানন্তরে নর্ত্তকীরা আসিয়া রজনীতে রাজার সম্মুখে নৃত্য করিতে প্রবর্ত্ত হইল দিবা রাত্রি সর্ব্বদাই নগরস্থ লোকেরদিগের আনন্দের সীমা নাই। এইরূপে কাল ক্ষেপণ করেন রাজপুত্র দিনে দিনে চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছেন নাম রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র কালক্রমে বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন শ্রুতিধর যখন যাহা শুনেন তৎক্ষণাৎ অভ্যাস হয় সকল শাস্ত্রেই পণ্ডিত হইলেন। পরে বাঙ্গালা ও ফারসি শাস্ত্রেও পণ্ডিত হইয়া অস্ত্র বিদ্যাতে প্রবর্ত্ত হইয়া অল্প দিনেই শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া রাজকীয় ব্যাপার শিক্ষা করিতে লাগিলেন রাজারদিগের যেমন নীতি বর্ত্ম আছে তাহা শিক্ষা করিলেন অল্প কালের মধ্যে সকল বিষয়ের পারগ হইলেন।

ক্রমশঃ।

উৎকল-দুর্ভিক্ষ।

স্বদেশ আমাদের জীবনের সুখ-স্বপ্ন—এই স্বদেশের সেবা একমাত্র জীবনের ব্রত। কিন্তু বার্দ্ধক্যের তাড়নায় বুঝিবা জীবনের ব্রত প্রতিপালিত হয় না! শরীর ক্রমেই অপটু হইতেছে, এই মনোদুঃখে বড়ই অস্থির আছি। বিধাতা সহায় হউন।

এবার চতুর্দ্দিকে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেশকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। এই দারুণ দুর্দ্দিনে মাতৃভক্ত সন্তানগণ ব্রত গ্রহণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া কৃতার্থ হইতেছি। শ্রীযুক্ত লাজপত রায়, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগী, শ্রীযুক্তা মিস্ গিলবার্ট, অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের ভ্রাতৃগণ এবার সেবা-ব্রতে প্রবৃত্ত হওয়ায় দেশের ঘোরতর দুর্দ্দিনে আশার স্বপ্ন দেখা যাইতেছে। সেবার ন্যায় ধর্ম্ম নাই। পৃথিবীতে কোন সৎ কাজে টাকার অভাব হয় না;—এ দেশেও কখনও হয় নাই। সেবকের অভাবই এদেশের প্রধান অভাব ছিল। এবার এত লোক কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন, দেখিয়া বড়ই আশান্বিত হইয়াছি। আশা করি, এদেশে প্রকৃত সেবকের দল দিন দিন বর্দ্ধিত হইবে এবং দেশের দুর্দ্দিন ঘুচিবে।

জোরহাট বঙ্গবান্ধব সমিতির সভ্যগণ উৎকল দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য আমাদের হস্তে ৫০৲ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। এই টাকা এবং নিজ তহবিল হইতে কতক টাকা লইয়া ২৯শে বৈশাখ (১৩১৫) কটক যাত্রা করি। আল (Aul) থানায় থাকিয়া মাতৃভক্ত সাধু শ্রীযুক্ত শশীভূষণ রায় চৌধুরী সেবা-কার্য্য করিতেছিলেন। টাকা নিঃশেষ হওয়ায় তিনি কার্য্যস্থল পরিত্যাগ করিয়া এই সময়ে কটকে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কটকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। সেবিকা শ্রীযুক্তা মিস্ গিলবার্টও, জেনাপুর—মধুপুরের সেবার কার্য্য সেই স্থানের রাজা গ্রহণ করায়, এই সময়ে কটকে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার সহিতও কটকে সাক্ষাৎ হয়। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত কণিকার রাজা বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবগত হই যে, রাজনগর থানায় কোন দান-সাহায্য প্রদত্ত হইতেছে না। এজন্য আমরা সকলে তাঁহার এলাকায় রাজনগর গমন করিব, এইরূপ প্রস্তাব ধার্য্য হয়। ২রা জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার আমরা কেন্দ্রাপাড়া কেনাল-ষ্টিমারে যাত্রা করিব, স্থির হয়। এই দিনের ষ্টিমারই শেষ ষ্টিমার, খাল পরিষ্কৃত করিবার জন্য,ইহার পর, একমাস ষ্টিমারচলাচল বন্ধ থাকিবে। আমি যথাসময়ে জোব্রা ষ্টিমার-ঘাটে পেঁৗছিলাম। জোব্রার সব-এজেণ্ট শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের সহৃদয় ব্যবহার জীবনে ভুলিবার নয়। ষ্টিমার ছাড়ার সময় শ্রীযুক্ত শশী বাবু, উৎকলের সেবক শ্রীমান্ রঘুনাথ মহাপাত্রকে লইয়া পৌঁছিলেন। কণিকার রাজা একজন পেয়াদা পাঠাইলেন। কিন্তু মিস্ গিলবার্ট যথা সময়ে পৌঁছিতে পারিলেন না। এজন্য তিনি যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, ভাষায় তাহা ব্যক্ত হয় না। আমাদিগের ইচ্ছা ছিল, রাজনগর থানার গ্রাম সকল আমরা পরিদর্শন করিব, আল (Aul) থানায় শ্রীযুক্তা মিস্ গিলবার্ট থাকিবেন। রাজনগর দেখিয়া আমরা চাঁদবালী হইয়া বিঞ্চারপুর, জাজপুর, জেনাপুর যাইব, বাসনা ছিল। ঘটনাচক্রে তাহা হইল না। আমরা ৩রা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে কেরারাগড়ে পেঁৗছিলাম। সেদিন কেরারাগড়ের হাট ছিল। হাটে অনেক জীর্ণ শীর্ণ বালক দেখিলাম। তাহাতেই বুঝিলাম, স্থানের অবস্থা ভাল নয়। রাজার বাঙ্গালায় যাইয়া দেখিলাম, রাজার টেলিগ্রাম পাইয়া শ্রীযুক্ত ইন্দ্রমণি মাহান্তি মহাশয় রাজকণিকা হইতে

আমাদিগকে গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজার সহৃদয় ব্যবহার জীবনে ভুলিবার নয়। ইন্দ্রমণি বাবু প্রথমে বলিয়াছিলেন যে, রাজনগর থানায় দুর্ভিক্ষ নাই। কিন্তু রাত্রে রাজনগরের তহশিলদার শ্রীযুক্ত বাণাম্বর মাহান্তি মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিলেন যে, "গ্রাম সকল পরিদর্শন করুন,—অনেক অভাবগ্রস্ত লোক আছে।" আমরা পরদিন প্রত্যূষে তিন বন্ধু মিলিয়া গ্রামের অবস্থা দেখিতে বহির্গত হইলাম। শ্রীযুক্ত তহশীলদার-বাবুও সঙ্গে গিয়াছিলেন। তহশিলদার বাবু এক আশ্চর্য্য প্রকৃতির লোক;—তিনি দরিদ্রের বন্ধু এবং রাজার হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি। সে দিন ১৪ মাইল পরিভ্রমণ করিয়া আমরা অপরাহ্নে ৩ টার সময় প্রত্যাগত হই। দেখিলাম, বহু গ্রামের বহু লোক কেবল "মুটি" নামক শাক খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। মাঠে উৎপন্ন এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা-বিশিষ্ট শাকের নাম "মুটি শাক"। বহু গ্রামের বহু বাড়ী পরিদর্শন করিয়া দেখিয়াছি—অনেক গৃহে কোন আসবাব নাই, কেবল দুই একটী মৃণ্ময় হাঁড়ি আছে,—আর সকল ঘরেই কেবল সংগৃহীত "মুটিশাক!" কোন ঘরে এক মুষ্টি তণ্ডুল বা ক্ষুত দেখি নাই। আমরা অবস্থা বিবেচনায় সর্ব্বত্রই আট আনা, এক টাকা, দুই টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছিলাম। অপরাহ্নে কেরারাগড়ে বহুলোককে তণ্ডুল দিয়াছিলাম। পরদিন আবার গ্রাম পরিদর্শনে যাত্রা করি। সেদিনও, পূর্ব্ব দিনের ন্যায়, অবস্থা বিবেচনায় কিছু কিছু দিয়াছিলাম। পরদিন আমরা গ্রাম পরিদর্শন করিতে করিতে রাজনগর যাই। ভাটপাড়ার শ্রীযুক্ত চিন্তামণি সামন্তরাও,আমাদিগের জন্য অনেক দ্রব্য লইয়া, অপরাহ্নে, রাজনগর ডাক-বাঙ্গালায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দয়া এবং সহৃদয়তা অনুকরণ-যোগ্য। আমরা শ্রীযুক্ত বাণাম্বর বাবুর অতুল স্নেহে রাজনগর ডাক-বাঙ্গালায় আশ্রয় পাইয়াছিলাম। কিন্তু অপরাহ্নে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয় ডাকবাঙ্গালা অধিকার করিলে আমরা এক প্রকার বিতাড়িত হই। সে সকল অপ্রিয় কথা এবং স্বদেশী বন্ধুর নির্ম্মম ব্যবহার এখানে লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না। আমরা ৩ বন্ধু নিরুপায় হইয়া, রাজকাছারীর সংলগ্ন একটী সংকীর্ণ বারেন্দায় রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। রাত্রে কিঞ্চিৎ জলযোগ ভিন্ন আর কিছু যুটিল না। কি কারণে জানিনা, শশী বাবু রাত্রে একটু অসুস্থ হইলেন। আমি ও রঘুনাথ পরদিন প্রত্যূষে এই থানার অবশিষ্ট গ্রাম পরিদর্শনে বাহির হইলাম। এই দিন রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ২৬ মাইল পথ পরিভ্রমণ করিয়া সাহায্য প্রদান করা হইয়াছিল। রাজনগরের শেষ সীমায় বঙ্গোপসাগর-কূলে হাতিমা গ্রাম। এ দিন সাগর পর্য্যন্ত যাওয়া হইয়াছিল এবং সমস্ত গ্রামে সাহায্য প্রদান করা হইয়াছিল। তৎপর দিন রাজনগরের আর কয়েকটী বাকী গ্রাম পরিদর্শন করিয়া সাহায্য প্রদান করা হয়। তৎপর আবার কেরারাগড়ে প্রত্যাগত হই। রাজনগর থানার কাজ শেষ করিয়া আমরা ১০ মাইল হাঁটিয়া বিবরণ সংগ্রহ করিতে২ আল-থানায় গমন করি। "আল" খরস্রোতা নদীর কূলে অবস্থিত। আল-থানার সবইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ নিয়োগী মহাশয় আমাদিগকে একটু স্থান না দিলে বড় কষ্টে পড়িতে হইত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, সবডেপুটী মহাশয়, আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিবেন, কটকে ক্ষীরোদ বাবু বলিয়াছিলেন,কিন্তু সাহায্য দূরে থাকুক, তিনি ভাল করিয়া আমাদের সহিত কথাও বলিলেন না। উৎকল-দীপিকায় তাঁহাদের কার্য্য সম্বন্ধে কে কি নাকি লিখিয়াছিল, তাহাতে বিরক্ত হইয়াই এরূপ নির্ম্মম ব্যবহার করিলেন! ঘটনা পরম্পরায় বুঝিয়াছিলাম, সব-ইনস্পেক্টর বাবু আমাদিগকে স্থান না দেন, সে জন্যও তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন! আমরা আল থানার অনেক স্থান পরিদর্শন করিয়া ৮৷৯ মাইল হাঁটিয়া রাজকণিকায় যাই। রাজ-কণিকাকে রাজা অপূর্ব্বসাজে সজ্জিত করিতেছেন; তাহার একদিকে খরস্রোতার একটী শাখা নদীঃও অন্য দিকে বৈতরণী নদী। সেখানে যাইয়া শুনিলাম, ম্যানেজার ক্ষিতীশ বাবু বালেশ্বর গিয়াছেন, ইন্দ্রমণি বাবু তখনও

রাজনগর হইতে প্রত্যাগত হন নাই। আমরা অগত্যা চাঁদবালীতে যাইয়া এক মুদীর দোকানে আশ্রয় লইলাম। আমার হাতের টাকা নিঃশেষ হওয়ায়, কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়কে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিতে লিখিয়াছিলাম। দুই দিন চাঁদবালীতে অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু টাকা পৌছিল না। শুনিয়াছি, আমরা স্থানান্তরে যাওয়ার পর টেলি-মণিতে এক শত টাকা প্রেরিত হইয়াছিল ও তাহা ফেরত গিয়াছিল। চাঁদবালী হইতে বিঞ্চারপুর যাওয়ার জন্য চেষ্টা করিলাম, কিন্তু উপায় করিতে পারিলাম না। শশী বাবুর সহিত একটী বড় বাক্স ছিল, তাহা মুটে ভিন্ন স্থানান্তরিত করার উপায় ছিল না। খুব বাতাস উঠিয়াছিল, নৌকারও সুবিধা হইল না। ভদ্রকে যাওয়ার গরুর গাড়ীও পাওয়া দুষ্কর। কেনেল ষ্টিমার বন্ধ—কটকে ফিরিবারও উপায় নাই। দুই দিন চেষ্টার পর ভদ্রক যাওয়ার জন্য দুই খানি গরুর গাড়ী পাওয়া গেল। আমরা অতিকষ্টে গ্রামের বিবরণ সংগ্রহ করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। ডোলসাহীতে সেটেলমেণ্ট আফিসার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাদিগের প্রতি বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমরা অতি কষ্টে ভদ্রক পৌছি। সেখান হইতে শশীবাবু মেদিনীপুর গমন করেন, রঘুনাথ ভুবনেশ্বরে এবং আমি পুরী হইয়া শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেহে কলিকাতায় প্রত্যাগত হই। কলিকাতায় পৌছিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়কে এবং তৎপর শ্রীযুক্ত কণিকার রাজা বাহাদুরকে পত্র লিখিয়া সবিশেষ অবগত করি। রাজা বাহাদুরকে লিখিয়াছিলাম যে, যদি তিনি রাজনগরের প্রজাদিগের জন্য চেষ্টা করেন, তবে বড় সুখের বিষয় হয়, যদি চেষ্টা না করেন এবং যদি দয়া করিয়া আমাদিগকে একটু আশ্রয় স্থান দেন, তবে আমরা যাইয়া রীতিমত কার্য্য আরম্ভ করিব; কিন্তু তাহাতে তাঁহার দুর্নাম হইবে। পুনঃ যাওয়ার জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত রাজা বাহাদুর পত্রের কোন উত্তর দেন নাই। রাজা স্থান না দিলে রাজনগরে কাজ করিবার আর আশ্রয় পওয়ার উপায় নাই। কলিকাতা পৌছার কয়েকদিন পরেই আমার বাম-পায়ে একটী কারবঙ্কাল হয়। এক মাসের অধিক ভুগিয়া এখন আরোগ্য হইয়াছি।

আমরা উড়িষ্যার নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বুঝিয়াছি, উড়িষ্যার মত দরিদ্র স্থান ভারতে আর নাই। আমরা ১৯৫ গ্রামের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি এবং প্রায় দুই সহস্র লোককে সাহায্য দিয়াছি। জোরহাটের ৫০৲ বাদে আর সমস্তই নিজে দিয়াছি বলিয়া টাকার কথা উল্লেখ করিলাম না। আমরা জানিয়াছি, অনেক লোক ওলাউঠায় মরিতেছে, তাহার কারণ আর কিছুই নয়,—অখাদ্য ভক্ষণই তাহার কারণ। রাজনগরের অধিকাংশ স্থলে কেবল একফসল অর্থাৎ ধান্য উৎপন্ন হয়; কখনও ব্রাহ্মণীর ও খরস্রোতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্লাবনে তাহা নষ্ট হয়, কখনও সমুদ্রের লোনা জলের প্লাবনে নষ্ট হয়। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী অধিকাংশ গ্রামে দুই চারিটী অশ্বথবৃক্ষ ও দুই চারিটী গলাগাছ ভিন্ন আর কোন গাছ দেখা যায় না। কোন ফল খাইয়া যে লোকেরা প্রাণ ধারণ করিবে, সে সম্ভাবনাও নাই, কেবল শাক আর শাক,—কেবল মুটি শাক; জমী চাষ হওয়ায় তাহাও নির্ম্মূল হইতেছে। বাঁধ মেরামতের কাজ হইতেছে বটে, কিন্তু সমস্ত দিনে কেবল /১০ মেলে। হায়, উদর পুরিয়া না খাইতে পাইলে কি মাটী কাটা যায়? অনেক লোক কাঁদিয়া বলিয়াছে, "বাবু, এই জীর্ণ শীর্ণ শরীরে অনাহারে থাকিয়া কিরূপে মাটী কাটিতে পারি?" বাণাম্বর বাবু দেবতার ন্যায় লোক—সপ্তাহে ২ দিন ১৫০ কি ২০০ লোককে রাজ-ষ্টেট হইতে কিছু কিছু চাউল দিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতে কিছুই হইতেছে না। এক রাজনগর থানায় চারি হইতে পাঁচ হাজার লোককে সাহায্য প্রদান করা উচিত; কিন্তু একেত্রে কে অগ্রসর হইবে? আশ্রয়ই বা কে দিবে?

রাজনগর থানায় এমন কোন স্থান নাই, যেখানে আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে। সামান্য ঘরে লোকেরা বাস করে, ধনী-লোক নাই বলিলেই হয়। ভাটপাড়ার চিন্তামণি বাবুর অবস্থা একটু ভাল, কিন্তু তাঁহার বাড়ীতেও অন্যকে আশ্রয় দিবার ঘর নাই। কণিকার রাজকাছারীতেও আশ্রয় পাওয়ার স্থান নাই; আশ্রয় কেবল কেরারাগড় ও রাজনগরের ডাক-বাঙ্গালায় পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু রাজা বাহাদুর সেখানে আশ্রয় না দিলে আর উপায় নাই। কি জানি কেন, তিনি পত্রের উত্তর দিলেন না। তিনি বুদ্ধিমান লোক—এ ব্যবহার তাঁহার অযোগ্য। ঐ ডাক-বাঙ্গলা দুইটী তাঁহার। সেখানেও গবর্ণমেণ্টের লোকের অত্যাচার। স্বদেশী লোকই হউক বা সাহেবই হউক—গবর্ণমেণ্টের বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কর্ম্মচারীগণ প্রায়ই এক অবস্থাপন্ন—তাঁহারা আর কাহাকেও মানুষ বলিয়া গণ্য করেন না। এই অবস্থায়—রাজার সহানুভূতি ভিন্ন সেখানে কার্য্য করিবার আর উপায় নাই। পূর্ব্ব বাঙ্গালার অনেক স্থলে নৌকায় বাস করা যায়, পশ্চিম বাঙ্গালার অনেক স্থলে হাট বাজারে ঘর পাওয়া যায়; কিন্তু উৎকলে সে সুবিধাও নাই। দরিদ্রতার দারুণ নিষ্পেষণে সকলে অবসন্ন এবং ম্রিয়মান। অতিরিক্ত খাজনার দায়, জলসিঞ্চনের করের দায় এবং আরো বহু প্রকার করের দায়ে তাঁহারা অস্থির। জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালময় মূর্ত্তি দেখিলে পাষাণও ফাটিয়া যায়। দলে দলে শিশুসহ কঙ্কালময় স্ত্রীলোকেরা চাঁদবালীতে হাঁড়ি হাতে করিয়া ভাতের মাড়ের জন্য ঘুরিতেছে, দেখিলে পাষাণও ফাটিয়া যায়। পরিত্যক্ত আম্রের আঠী তুলিয়া চুষিতেছে, দেখিলে কে স্থির থাকিতে পারে? দুই তিনি মাইল দূরে "মুটিশাক" তুলিতে যাইতেছে, দেখিলে কে ঠিক থাকিতে পারে? কোন গ্রামে ভিক্ষাও মিলে না! কাহারও অবস্থা এমন নাই যে, এক মুষ্টি চাউল দিতে পারে, যেন সকলেই এক অবস্থাপন্ন। আমরা এক দিন ১২ মাইলের মধ্যে একবিন্দু জল পাই নাই। বাঙ্গালার জলকষ্টের কথা অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু রাজনগর যে জল-কষ্ট দেখিয়াছি, কেহ তাহা কল্পনাও করিতে পারিবেন না। নদী ও সমুদ্রের জল লবণাক্ত—আর জল নাই;—দুই এক গ্রামে দুই একটী শুষ্ক পুকুর দেখিয়াছি মাত্র! সামান্য কুয়ার কর্দ্দমাক্ত জলে অসংখ্য অসংখ্য লোক প্রাণ ধারণ করিতেছে, এ চিত্র দেখিলে কে ঠিক থাকিতে পারে? হায় উৎকল, তোমার ন্যায় দরিদ্র দেশ, বোধ হয়, পৃথিবীতে আর কোথাও নাই! এইরূপ অবস্থা, কিন্তু কটকের শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু বাবু ভিন্ন আর কোন সহৃদয় লোক দেখি নাই, যিনি একবিন্দু চক্ষের জলও দরিদ্রদের জন্য ফেলিতেছেন!! উৎকল যেন মহাশ্মশান,—সহানুভূতি নাই, ভালবাসা নাই, দয়া নাই, যেন কিছুই নাই! গবর্ণমেণ্টের কাজে অবাধ চুরি চলিতেছে, কটকের কমিটী অল্প দরে চাউল বিক্রয় করিতেছেন। যাহাদের কিছুই নাই, তাহারা কোথায় চাউল কিনিবার পয়সা পাইবে? গড়জাত হইতে অসংখ্য লোক কটকে ভিক্ষার জন্য আসিয়াছিল; সংবাদ পত্রে পড়িয়াছি, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন! এমন লোক নাই যে, এই অবৈধ নিক্রমণ প্রতিরোধ করে। হায় উৎকল, হায় রাজনগর, এই দারুণ দুর্দ্দিনে তোমাদের ভাগ্যে কি আছে কে জানে?

গীতাতত্ত্ব। (১)

(ক) অবতরণিকা।

সমুদ্র মন্থন করিয়া যেমন অমৃত উদ্ভূত হইয়াছিল, সেইরূপ, অনন্ত হিন্দু শাস্ত্র মন্থন করিয়া গীতা রূপ দুর্ল্লভ রত্ন উদ্ভূত হইয়াছে। মন্থন-কর্ত্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সংগ্রহ-কর্ত্তা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। যুগের পর যুগ এবং সভ্যতার (civilization) পর সভ্যতা, এইরূপে কত যুগ এবং সভ্যতা যে কাটিয়া গিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বর্ত্তমান সভ্যতার নাম আর্য্যসভ্যতা। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ এই সভ্যতার চরম লক্ষ্য। পুরাতন ঋষিগণ এই সভ্যতার স্থাপয়িতা। এই সভ্যতার মহান্ আদর্শ প্রাচীনকালে আর্য্যজাতির সম্মুখে তাঁহারা স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন মনুষ্য জাতির শৈশব অবস্থা। সেই শৈশব অবস্থায় তাঁহারা প্রথমে হস্ত ধরিয়া মনুষ্যগণকে উক্ত মহান্ আদর্শের দিকে চালিত করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বীয় পদের উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইতে শিক্ষা করিতে পারিবে বলিয়া, মাতা যেমন শিশু সন্তানের হস্ত ছাড়িয়া দিয়া দূর হইতে তাহার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন, সেইরূপ, শিশুমানব যাহাতে বলিষ্ঠ হইয়া কৈশোরে পদার্পণ করিতে পারে, ক্রমবিকশিত হইয়া যাহাতে আর্য্য সভ্যতার চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে, তজ্জন্য আর্য্য সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা ঋষিগণ শিশুমানবের হস্ত ছাড়িয়া দিয়া, দূর হইতে তাহার ভাগ্য-পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ব্বল মনুষ্যগণ ঋষিগণের প্রতিভা ও সামর্থ্য কোথায় পাইবে? তাহারা প্রতি পদে পদে বিচলিত হইতে লাগিল এবং অবশেষে আর্য্যসভ্যতার চরম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সেই মহান্ আদর্শ হারাইয়া ফেলিল। তখন ধর্ম্মের পতন ও অধর্ম্মের ঘোরতর অভ্যুত্থান হইয়া উঠিল এবং ভারত রাহুগ্রস্ত শশীর ন্যায় দুষ্কৃতকারীদের করকবলিত হইয়া পড়িল। দুষ্কৃতকারীদের দমন পূর্ব্বক আর্য্যসভ্যতার চরম লক্ষ্য পুন প্রতিষ্ঠা এবং সনাতন ধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপনের জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঋষিগণ ধর্ম্মের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যুগধর্ম্মে শিশুমানব সেই আদর্শ হইতে চ্যুত হওয়াতে, শ্রীকৃষ্ণ তাহার পুনর্প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার অতুলনীয় ধর্ম্মতত্ত্ব সকল ব্যাসদেব কর্ত্তৃক গীতাকারে গ্রথিত হইয়াছে। সমুদয় বেদ, পুরাণ, দর্শন ও উপনিষদ আলোড়ন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই গীতাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে,—

> "সর্ব্বোপনিষদোগাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
> পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধঃ গীতামৃতংমহৎ॥"

অর্থাৎ, সমুদয় উপনিষদ গাভীগণের ন্যায়, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের দোগ্ধা, অর্জ্জুন বৎসের ন্যায়, সুধীগণ ভোক্তা সদৃশ এবং গীতা রূপ মহান্ অমৃত দুগ্ধের সদৃশ। এই জন্য গীতাকে উপনিষদ্ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে; এই জন্য গীতাকে হিন্দুশাস্ত্র সমূহের সার অংশ বলা হয়। এই জন্যই গীতা হিন্দুদিগের নিকট এত আদরের বস্তু।

ক্রমশঃ

শ্রীআশুতোষ দেব।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। সয়রুল মোতাখরীণ—নমুনা। ৺গৌরসুন্দর মৈত্র কর্ত্তৃক মূল পারস্য পুস্তক হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত। প্রকাশক শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র। এই নমুনা পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। যোগীন্দ্র বাবু এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করিতে পারিলে বাঙ্গালা ভাষার প্রভূত উপকার হইবে।

২। এড়ি পোকার চাষ। (বিনা মূল ধনে ব্যবসায়।) শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায়; মূল্য ৵০। রেশম পোকার সবিশেষ বিবরণ এই পুস্তকে সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

৩। কোরক—প্রথম খণ্ড। ছাত্রজীবনে লিখিত অপ্রকাশিত রচনার উৎকৃষ্টাংশ। উদ্দেশ্য এবং উদ্যম প্রশংসনীয়। লেখাও সুন্দর।

৪। কিরাতার্জ্জুন। ভারবি কৃত। বঙ্গানুবাদ। প্রথম ভাগ। প্রথম ৫ সর্গ। শ্রীনবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকর, এম-এ, বি-এল পদ্যানুদিত। টীকা সহ। নবীন বাবু একজন অসাধারণ কবি। তাঁহাকে নূতন উপাধি-ভূষিত করা হইয়াছে, ইহাতে গৌরবান্বিত হইলাম। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি গুণগ্রাহী লোকের ইহা অনুরাগের অক্ষয় চিহ্ন। এমন বিশুদ্ধ, বিশদ এবং সরস অনুবাদ দুর্ল্লভ জিনিষ। আমরা পড়িয়া সুখী হইলাম। আশা করি, সর্ব্বত্র এই পুস্তকের আদর হইবে।

৫। গন্ধপুষ্প। শ্রীমতিলাল দাস, বি-এ প্রণীত; মূল্য ১০। শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ এই পুস্তকের এক পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

এই ভূমিকায় পুস্তকের গৌরব বাড়িয়াছে কিনা, জানি না। এই ভূমিকায় "ইঙ্গিত-বোধিত", "হৃদয়িক", "ঘ্রাণ-তর্পণ"—প্রভৃতি নূতন পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভাষাকে দুর্ব্বোধ্য করিবার জন্য কেন যে এরূপ চেষ্টা হয়, বুঝি না। বিশ্বাস ভক্তির কথা যত সরল ভাবে ব্যক্ত করা যায়, ততই ভাল, কিন্তু বিশ্বাসী এবং ভক্ত ভিন্ন সে কথা কে বুঝিবে?

গন্ধপুষ্প গীতি-কবিতা। বিশ্বাস এবং ভক্তির অস্ফুট ভাব প্রতি কবিতায় বিজড়িত। এহেন পুস্তক আমরা পড়িয়া বিমুগ্ধ হইতে পারি, কিন্তু সাধারণের নিকট পরিচিত করিয়া দিতে পারি, এমন শক্তি আমাদিগের নাই। তাঁহার

(মোরা) ভবপুরের এমন ধনে
ভুলতে কি আর পারি?
(তাই) মাঝে মাঝে দিয়ে যাই গো
নীল সমুদ্র পাড়ী।
নিশার আগমে
ধরণী যখন
ঘুম ঘোরে পড়ে লুটিয়া,
অসীমের বুকে
প্রেমের কুহকে
কোটি চন্দ্র উঠে ফুটিয়া!
অমৃত লহরে
দূর দূরান্তে
জ্যোস্না গড়িয়ে যায়,
কতই উষ্ক!
দলে দলে, আহা,
মহা শূন্য পথে ধায়;—
অমনি পুলকে
আঁখির পলকে
ধরণীর পানে ছুটি,
ঐ নীল সমুদ্র
পাড়ী দিয়া মোরা
মাতৃ-হারা দুটি!

পড়িতে পড়িতে আমরা জগতের সৌন্দর্য্য-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাই;—মনে হয়, কি, সুন্দর, কি সুন্দর!!

সৌন্দর্য্যের কথা যদি তুলিলাম—আর একটু স্থান উদ্ধৃত করি—

সুনীল গগন তলে
সোণার চন্দ্রমা দোলে,
প্রেমের বিজলি জলে
'শঙ্কা' সলিলে!
হাসেরে স্বপন-রাণি
তুলিয়ে ঘোমটা খানি,—
কত মুক্তা হীরা মণি
ধরা-প্রাণে ফলে!
নদী করে কুলু কুলু
বায়ু বলে ঢুলু ঢুলু,
শ্যামা গাহে 'উলু উলু'
শ্যামল শাখায়;

কনক-লহরী মালা
পুলকে করেরে খেলা,—
বিহ্বলা তারকা-বালা
আঁখি মেলি চায়!
সোণামুখী সোণ ফুল,
ছে'য়ে আছে দুটিকুল,
দলে দলে অলিকুল
মধু চুরি করে,
ছোট ছোট টুনি পাখি
প্রেমে উঠে ডাকি ডাকি,
তৃণদল থাকি থাকি
ঘুমাইয়া পড়ে!
অদূরে কৃষক-নারী
শিশুটিকে বুকে ধরি,
বার বার ফিরি ফিরি
নদী পানে চায়;—
তটিনী বুঝিল ভাষা,
—জননীর ভালবাসা,—
এত স্নেহে এত আশা
কোথায় লুকায়!
মধুর মধুর নিশি!
আহ্লাদে গড়ায় শশি!
চারি দিকে হাসাহাসি
বৃন্দাবনে ঢেউ!
ভাবে ভোলা হরি-বোলা,
হরি নিয়ে করে খেলা,
পুর্ণিমার প্রেম-লীলা,
দেখেনারে কেউ!

এরূপ বিমল-সৌন্দর্য্য-বোধ যে সে লেখকের ভাগ্যে ঘটে না। লেখক ভক্ত;—ভক্তির একটী উচ্ছাস তুলিয়া আমাদের মন্তব্য শেষ করিতেছি। এরূপ ভক্তি-মাখা পুস্তক ঘরে ঘরে আদৃত হউক।

এবিজন পুরে
তোমারি লাগিয়া
একলাটী আছি পড়িয়া;
নয়নের জল
মজিছে নয়নে
তোমার নামটী স্মরিয়া।
নিখিল বিশ্ব
লুটিয়ে পড়িছে
বিঘোর নিদ্রাবেশে;
এ হৃদয় শুধু
জেগে আছে, প্রিয়,
তোমার মিলন আশে।
(মোর) বড়ই বাসনা
মানস-মাঝারে,
বসা'য়ে তোমারে যতনে;
প্রাণের সোহাগে
সাজা'য়ে দিবগো
বিমল-ভক্তি-রতনে!
(আমি) কুঞ্জ-কুটীরে
প্রেমের দীপটী
রেখেছি গোপনে জ্বালিয়া।
দুয়ারের পানে
চেয়ে আছি সদা
তুমি আস আস ভাবিয়া।
একে একে ঐ
দেখা দিল সব
আকাশে তারকাকুল;
একে একে, আহা!
ফুটিয়া গেল রে
কত ছিল বনে ফুল।
(ওগো) তবু তুমি সাড়া দিলে না,
হৃদি-নিকুঞ্জে এলে না!
এ অধান জনে
দয়াটী করিয়া
চরণে টানিয়া নিলেনা।
তবু, প্রাণনাথ!
এই ভোলামন
তোমাকেই শুধু চায়;
নিমেষে-নিমেষে
তব উদ্দেশে
অনন্তের পথে ধায়।
তব প্রেম তরে
সঁপিয়াছি সব
কি আর বলিব আমি?
পরাণের কথা
মরমের ব্যথা
সকলি জানগো তুমি।
করিয়াছি পণ
তোমারি সাধনে
এ ছার জীবন খোয়াব;
বসি আপনার
সমাধি-মন্দিরে,
তব রূপ নিত্য ধেয়াব।

গীতাতত্ত্ব। (২)

(খ) প্রশ্নোৎপত্তি।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যখন কুরু ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ সমর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন অর্জ্জুনের মনে বিষাদ উপস্থিত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ স্থলে অর্জ্জুনকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই গীতাকারে ছন্দোবদ্ধ হইয়াছে। এই যুদ্ধ সংঘটনের কারণ নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনের সাহস এবং বিক্রমে সমস্ত ভারতের একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে দুর্য্যোধনের মনে ঈর্ষাবহ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কুটীল বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ণ দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করেন। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় বাধ্য হন; কিন্তু তিনি এই ক্রীড়ায় যথা সর্ব্বস্ব হারিয়া যান। দ্যূতক্রীড়ার পণ অনুসারে তিনি রাজ্যাদি যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশ বৎসর সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহার স্ত্রী ও ভ্রাতৃগণের সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং অপর এক বৎসরকাল বিরাট রাজগৃহে অজ্ঞাতসারে বাস করেন। পণের এইরূপ নিয়ম ছিল যে, যদি তাঁহারা উহা রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাদিগের রাজত্ব পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন।

পণের নিয়ম রক্ষা করিয়া অজ্ঞাতবাসের পর যখন যুধিষ্ঠির প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন দুর্য্যোধন রাজ্য প্রত্যাবর্ত্তন হইলেন। পাণ্ডবেরা তাঁহার নিকট কেবল মাত্র পঞ্চ গ্রাম যাচ্ঞা করিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন তাঁহাদের সেই প্রস্তাব ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিলেন। এই বিতণ্ডা মিটাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কৌরব সভায় দুর্য্যোধনের নিকট গিয়া তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন যে, ন্যায়মতে সমস্ত রাজত্বই যুধিষ্ঠিরের প্রাপ্তব্য। দুর্য্যোধন যদি সমস্ত রাজত্ব যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যার্পণ নাও করেন, তবে অর্দ্ধেক রাজত্ব দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করুন। শ্রীকৃষ্ণের এই দৌত্য-কার্য্য মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বের মধ্যে 'ভগবদ্‌যান' নামক পর্ব্বাধ্যায়ে সবিশেষ বর্ণিত আছে। 'ভগবদ্‌যান' পর্ব্বাধ্যায়ই গীতার ভূমিকা। শ্রীকৃষ্ণ কৌরব সভায় যাইবার পূর্ব্বে বিদুরের সহিত এ বিষয়ে যাহা কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"হে বিদুর! আমি দুর্য্যোধনের দৌরাত্ম্য ও ক্ষত্রিয়গণের শত্রুতা অবগত হইয়াই এখানে আগমন করিয়াছি। যিনি অশ্বকুঞ্জররথসমবেত বিপর্য্যস্ত সমুদয় পৃথিবী মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হন, তাঁহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ হয়। কর্ণ ও দুর্য্যোধনের অপরাধে কুরুকুলে ঘোরতর আপৎ সমুপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে যাহাতে সংগ্রামে বিনাশোন্মুখ কৌরব ও সৃঞ্জয়গণের শান্তি হয়, তৎ সম্পাদনে আমি যথাসাধ্য যত্ন করিব।"

"হে বিদুর! যে ব্যক্তি ব্যসনগ্রস্ত বান্ধবকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্নবান না হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে নৃশংস বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আমি ধার্ত্তরাষ্ট্র, পাণ্ডব ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের হিতার্থে যে সকল কথা কহিব, তৎসমুদায় গ্রহণ করা দুর্য্যোধনের

অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি তিনি আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার প্রতি শঙ্কা করেন, তাহাতে আমার কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। আমি কুরুপাণ্ডবগণের শান্তির নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য না হইলেও অধার্ম্মিক মূঢ়গণ বা আত্মীয়গণ কখনই বলিতে পারিবে না যে, কৃষ্ণ সমর্থ হইয়াও ক্রোধ-বিমূঢ় কুরুপাণ্ডবগণকে নিবারণ করিল না। আমি উভয় পক্ষের অর্থ সাধন করিবার নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছি; অতএব উভয় পক্ষেরই অর্থসাধনে প্রাণপনে যত্ন করিয়া জনসমাজে অনিন্দনীয় হইব। যদি দুর্য্যোধন বালস্বভাব প্রযুক্ত আমার ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতকর বাক্য গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে।"

"হে মহাত্মন্! আমি যদি পাণ্ডবগণের অর্থের অবিঘাতে কৌরবগণের সহিত তাঁহাদের সন্ধি সংস্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার পুণ্য লাভ ও কৌরবগণের মৃত্যু পাশ হইতে মুক্তি হইবে। ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ কি আমার ধর্ম্মার্থযুক্ত নির্দ্দোষ বাক্য শ্রবণ করিবে? আমি কুরুসভায় গমন করিলে কৌরবগণ কি আমার সম্মান করিবে? যাহা হউক, সিংহ যেমন অন্যান্য পশুগণকে অনায়াসে বিনাশ করিতে পারে, তদ্রূপ আমি সমুদায় কৌরবপক্ষীয় ভূপতিদিগকে অবলীলাক্রমে সংহার করিতে পারি।" *

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৌরব সভায় উপস্থিত হইলে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণাদি ও সহস্র সহস্র ভূপতিগণ সহ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। সেই সভাতে নারদাদি ঋষিগণও তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি বলিলেন;—

"দুর্য্যোধন! তোমার ও তোমার বংশের সবিশেষ শান্তিকর বাক্য শ্রবণ কর। তুমি মহাপ্রাজ্ঞকুলে সমুৎপন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ এবং সদাচার প্রভৃতি সমুদয় সংগুণে অলঙ্কৃত হইয়াছ, অতএব সন্ধি সংস্থাপন করাই তোমার সমুচিত কর্ম্ম। তোমার যেরূপ সংকল্প, দুষ্কুলজাত নৃশংস নির্লজ্জ ব্যক্তিরাই তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। সাধু ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি ধর্ম্মার্থের অনুগত, অসাধুরাই বিপরীত ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু তোমাতে সেই বিপরীত ব্যবহার বারম্বার নয়নগোচর হইতেছে। ঈদৃশ ব্যবহারে ঘোরতর অধর্ম্ম, প্রাণনাশের কারণ, অনিষ্ট ও অপ্রতিবিধেয় দুর্নিমিত্ত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি সেই অনর্থ পরিহার পূর্ব্বক আপনার ভ্রাতৃগণের, ভৃত্যগণের ও মিত্রগণের শ্রেয় সাধন কর; তাহা হইলে তুমি অধর্ম্মজনক এবং অবশস্কর কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইবে। আর এক্ষণে প্রাজ্ঞ, শূর, মহোৎসাহসম্পন্ন, মহানুভব এবং শাস্ত্রজ্ঞ পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর। তাহা হইলে ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণ, মহামতি বিদুর, কৃপ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, অশ্বত্থমা, বিকর্ণ, সঞ্জয়, বিবিংশতি, জ্ঞাতিগণ ও জ্ঞানসম্পন্ন অন্যান্য মিত্রগণ সাতিশয় সুখী হইবেন। ফলতঃ সন্ধিস্থাপন হইলে, সমস্ত জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি লজ্জাশীল, সৎকুল-জাত, শাস্ত্রজ্ঞ ও সদয় স্বভাব, অতএব পিতামাতার শাসনে অবস্থান কর।"

"ভ্রাত! পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করা তোমার পিতার ও অমাত্যগণের নিতান্ত অভিপ্রেত; এক্ষণে তাহা তোমারও অনুমোদিত হউক। যে ব্যক্তি সুহৃদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া গ্রাহ্য না করে, যেমন মহাকাল ফল ভক্ষণ করিলে পরিণামে পরিতাপিত হইতে হয়, তদ্রূপ সেই ব্যক্তিকে পরিশেষে সাতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যে দীর্ঘসূত্রী মোহ বশতঃ কল্যাণকর বাক্য পরিত্যাগ করে, তাহাকে পুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট ও পশ্চাত্তাপে পরিতাপিত হইতে হয়। যে ব্যক্তি অর্থকাম ব্যক্তিদিগের মত বিরোধী বাক্য সহ্য না করে, কিন্তু বাস্তবিক প্রতিকূল বাক্য গ্রহণ করে, সে অরাতিগণের বশবর্ত্তী হয়। যে ব্যক্তি অসাধুগণের সেবা, অনর্থ কার্য্যের অনুষ্ঠান, সাধু সুহৃদগণের

* ৺ কালিসিংহের মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব ৯২ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত।

বাক্যে উপেক্ষা, অনাত্মীয়ের সমাদর ও আত্মীয়গণের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে, পৃথিবী তাহারে পরিত্যাগ করেন। অতএব তুমি কি নিমিত্ত মহাবীর পাণ্ডবগণের সহিত বিরোধ করিয়া অশিষ্ট, অসমর্থ মূঢ়গণের সাহায্যে পরিত্রাণ লাভের অভিলাষ করিতেছ? এই মেদিনীমণ্ডলে তোমা ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি ইন্দ্র সদৃশ মহারথ ভূপতিগণকে অতিক্রম করিয়া অন্য হইতে পরিত্রাণের প্রত্যাশা করে? পাণ্ডবগণ এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ যে, তুমি তাঁহাদিগকে জন্মাবধি প্রতিনিয়ত নিগৃহীত করিয়াছ, তথাপি তাঁহারা কখন জাতক্রোধ হন নাই। তুমি জন্মাবধি সেই পাণ্ডবগণের প্রতি মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছ, তথাপি তাঁহারা তোমার প্রতি সম্যক্ সন্তুষ্ট আছেন। অতএব তাঁহাদের প্রতি সম্যক্ পরিতুষ্ট হওয়া তোমারও কর্ত্তব্য। প্রকৃত বন্ধুগণের প্রতি কদাচ জাতক্রোধ হইও না।"

"হে দুর্য্যোধন! তুমি হীন উপায় অবলম্বন করিয়া সকল রাজবিখ্যাত অতি বিস্তীর্ণ আধিরাজ্য লাভে সমৎসুক হইয়াছ। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণদিগের প্রতি মিথ্যা ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তি পরশু দ্বারা বনচ্ছেদনের ন্যায় আপনারে ছেদন করে। হে ভারত! অসাধু সংসর্গ অপেক্ষা পাণ্ডবগণের সহিত সমাগম তোমার নিতান্ত শ্রেয়স্কর। তাঁহারা তোমার প্রতি পরিতুষ্ট থাকিলে তোমার সকল কামনা পরিপূর্ণ হইবে। তুমি যে দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া ঐশ্বর্য্যাভিলাষী হইয়াছ, তাহারা কি জ্ঞানে, কি ধর্ম্মে, কি অর্থে, কি বিক্রমে কিছুতেই পাণ্ডবগণের সমকক্ষ নয়। কেবল উহারা নয়, এই সমুদায় রাজা একত্র হইলেও যুদ্ধকালে কুপিত বৃকোদরের মুখ সন্দর্শনে সমর্থ হইবে না। এই সন্নিহিত সেনাগণ এবং ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, ভূরিশ্রবা, সৌমদত্ত, অশ্বত্থমা ও জয়দ্রথ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইবেন। কি সুর, কি অসুর, কি মনুষ্য, কি গন্ধর্ব্ব, কেহই ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিতে পারেন না। অতএব তুমি যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ কর।"

"অথবা সমুদায় পার্থিব সেনার মধ্যে এমন এক বীরকে অনুসন্ধান কর, যে ব্যক্তি ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া সুমঙ্গলে গৃহে প্রত্যাগত হইতে সমর্থ হন। অনর্থক লোক ক্ষয়ে প্রয়োজন নাই; যিনি জয়লাভ করিলে তোমার জয়লাভ হইবে, ঈদৃশ কোন পুরুষকে আনয়ন কর। কিন্তু যে ধনঞ্জয় খাণ্ডবপ্রস্থে দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও পন্নগগণকে পরাভূত করিয়াছেন, কে তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিবে? আর, একজন যে বহু ব্যক্তিকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়, বিরাট নগরে ইহার আশ্চর্য্য নিদর্শন অবলোকন করিয়াছি। যিনি সমরে আদিদেব ভগবান্ মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন, তুমি কি সেই অজেয়, অধৃষ্য বীরবর তেজস্বী অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ কর? আমি সাহায্য করিলে কে তাঁহার সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করিবে? যদি ধনঞ্জয় যুদ্ধে আগমন করেন, সাক্ষাৎ দেবরাজ কি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন? যে ব্যক্তি বাহু দ্বারা ধরা ধারণে সমর্থ হয়, যে ব্যক্তি অমর্ষ পরবশ হইয়া এই সমুদায় প্রজাকে দগ্ধ করিতে পারে এবং যে ব্যক্তি দেবগণকে স্বর্গ ভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয়, সেই ব্যক্তিই ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিতে পারে। পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও সম্বন্ধিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এই সকল ভারতশ্রেষ্ঠগণ যেন তোমার নিমিত্ত বিনাশ প্রাপ্ত না হয়। যেন কৌরবগণের শেষ বিদ্যমান থাকে; সমুদয় কুল উচ্ছিন্ন করিও না। তুমি যেন নষ্ট কীর্ত্তি ও কুলঘ্ন বলিয়া বিখ্যাত না হও। মহারথ পাণ্ডবগণ তোমারে যৌবরাজ্যে ও তোমার পিতাকে মহারাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। অতএব এই আগমনোন্মুখী রাজ্যলক্ষ্মীরে অবমাননা করিও না। সুহৃদ্‌গণের বাক্য রক্ষা, পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি সংস্থাপন ও তাঁহাদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিয়া মহতী শ্রীলাভ কর এবং মিত্রগণের প্রীতিভাজন হইয়া চিরকাল কুশলে অবস্থান কর।"*

* ৺কালিসিংহের মহাভারত হইতে উদ্ধৃত। উদ্যোগপর্ব্ব, ভগবদ্যান পর্ব্বাধ্যায়, ১২৩ অধ্যায়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সকল সদ্যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়াও দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন না। তিনি বলিলেন যে,—

"সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ ভিদ্যতে যা চ মেদিনী।
তদৰ্দ্ধং নৈব দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব॥"

অর্থাৎ, সূচ্যগ্র পরিমাণ মেদিনীও তিনি পাণ্ডবদিগকে বিনাযুদ্ধে দিবেন না। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। কৌরব ও পাণ্ডবেরা, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের সহিত সসৈন্যে কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন। ভারতের প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গ সসৈন্যে এক পক্ষে না হয় আর এক পক্ষে যোগ দিলেন। পাণ্ডব পক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিণী এবং দুর্য্যোধন পক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগৃহীত হইয়া বিশাল সমুদ্রের ন্যায় কুরু পাণ্ডবের সৈন্যব্যূহ সজ্জিত হইল। রণোন্মুখ কুরু পাণ্ডবের শঙ্খনাদে যখন সমর প্রাঙ্গণ কম্পিত হইতেছিল, তখনই গীতার সূত্রপাত হইয়াছে।

মহাভারতের যাঁহারা প্রধান নায়ক, তাঁহারাই গীতার নায়ক। শ্রীকৃষ্ণ এই ভীষণ সমরে সারথি মাত্র। ঐতিহাসিক ভাবে যদিও এই যুদ্ধ কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বলিয়া খ্যাত কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ইহা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের যুদ্ধ,—একদিকে মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির এবং অপর দিকে মূর্ত্তিমান অধর্ম্ম দুর্য্যোধন। মহাভারতেও উল্লিখিত হইয়াছে যে, দুর্য্যোধন ক্রোধময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি শাখাস্বরূপ, দুঃশাসন ফল ও পুষ্প, মনস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জ্জুন স্কন্ধ, ভীমসেন তাহার শাখা, মাদ্রীসুত নকুল সহদেব তাহার পুষ্প ও ফল এবং কৃষ্ণ, ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের যুদ্ধ ধর্ম্মক্ষেত্র ভিন্ন আর কোথায় হইবে? আধ্যাত্মিক জগতে এই যুদ্ধ অহর্নিশি চলিতেছে এবং অবশেষে ধর্ম্মেরই জয় দৃষ্ট হইতেছে।

কুরুক্ষেত্রে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইবার বিশেষত্ব আছে। কুরুক্ষেত্র একটী জনপদ বা চক্র—থানেশ্বর এবং পাণিপথের নিকটবর্ত্তী। মহাভারতের বনপর্ব্বে ইহাকে ত্রিলোকীর মধ্যে প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত করা হইয়াছে। কৌরবগণের আদি পুরুষ কুরুরাজা এখানে বরলাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া ইহা পুণ্যতীর্থ রূপে পরিগণিত হইয়া কুরুক্ষেত্র নামে প্রচলিত হইয়াছে। শতপথ ও তৈত্তেরেয় উপনিষদে কুরুক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্র আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। সেই পুরাতন চিরপ্রসিদ্ধ পবিত্র মহাক্ষেত্র ভিন্ন আর কোথায় এই যুগ-বিপ্লবকারী যুদ্ধ সংঘটিত হইবে? সেই ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবগণ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনাসহ একত্রে সমবেত হইয়াছিলেন।

এই যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তখন হস্তিনাপুরে ছিলেন। কিন্তু জন্মান্ধ বলিয়া যুদ্ধ দর্শনে বঞ্চিত হওয়ায় অস্থির হইয়াছিলেন। ব্যাসদেব তাঁহাকে যুদ্ধদর্শন করিবার জন্য দিব্যচক্ষু প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, তিনি অস্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন যে তিনি জ্ঞাতিবধ দর্শন করিতে ইচ্ছুক নহেন। তখন ব্যাসদেব তাঁহার মন্ত্রী সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেন। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে থাকিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবৃত্তান্ত দিব্যচক্ষে দেখিতে লাগিলেন—এবং আনুপূর্ব্বিক ধৃতরাষ্ট্রকে

বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সঞ্জয় যখন বলিলেন যে, উভয়পক্ষীয় সৈন্য সকলে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছে, তখন ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে উভয় পক্ষ কি করিলেন? এই স্থলেই গীতা আরম্ভ হইয়াছে।

(গ) গীতার কাব্যাংশ।

গীতার কাব্যাংশ অতি উৎকৃষ্ট। "ভূতভাবন ভগবান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইহার বক্তা, শত্রুনিসূদন, বিশ্ববিজেতা, শিবপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্রতনয় ধনঞ্জয় ইহার শ্রোতা। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমরাঙ্গণ যে কুরুক্ষেত্র, তাহাই ইহার স্থল, আর যখন রণোন্মুখ কুরুপাণ্ডবের শঙ্খনাদে পৃথিবী তুমুল কলরবে পরিপূরিত হইতেছে, তাহাই ইহার সময়। স্থান কাল পাত্র সম্বন্ধে এরূপ সমৃদ্ধ কাব্য আর কোথায় দেখিতে পাইবে?"*

বঙ্গীয় সাহিত্য জগতের রাজা বঙ্কিমচন্দ্র গীতার কাব্যাংশের সুখ্যাতি করিয়া লিখিয়াছেন,—"কুরুক্ষেত্রে উভয় সেনা সুসজ্জিত হইয়া পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে। পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা ব্যূহবদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন, পরম রণপণ্ডিত আপনার আচার্য্যকে দেখাইলেন। একটু ভীত হইয়া আচার্য্যকে বলিলেন, 'আপনারা আমার সেনাপতি ভীষ্মকে রক্ষা করিবেন।' কিন্তু সেই বৃদ্ধ ভীষ্ম যুবার অপেক্ষাও উদ্যমশীল—তিনি সেই সময়ে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন—(শঙ্খ তখনকার bugle)। তাঁহার শঙ্খধ্বনি শুনিয়া উৎসাহে বা প্রত্যুত্তরে উভয় সৈন্যস্থ যোদ্ধ্‌গণ সকলেই শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন উভয়দলে নানাবিধ রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল—শঙ্খে, ভেরীতে, অন্যান্য বাদ্যের কোলাহলে, গগন বিদীর্ণ হইল—আকাশ পৃথিবী তুমুল হইয়া উঠিল। সেই মহোৎসাহের সময়ে স্থিরচিত্ত অর্জ্জুন—যাঁহার উপরে কৌরবজয়ের ভার—আপনার সারথি কৃষ্ণকে বলিলেন—'একবার উভয়সেনার মধ্যে রথ রাখ দেখি—দেখি কাহার সঙ্গে আমার যুদ্ধ করিতে হইবে।' কৃষ্ণ, শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথ উভয়সেনার মধ্যে স্থাপিত করিলেন,—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা বলিলেন, 'এই দেখ।' অর্জ্জুন দেখিলেন, দুই দিকেই ত আপনার জন,—পিতৃব্য, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক, সুহৃৎ, সখা—তাঁহার গা কাঁপিয়া উঠিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল, মুখ শুকাইল, দেহ অবসন্ন হইল, মাথা ঘুরিল, হাত হইতে সেই মহাধনু গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল। বলিলেন 'কৃষ্ণ! রাজ্য যাদের জন্য, তাদের মারিয়া কি ফল?—আমি যুদ্ধ করিব না।' এই সংগ্রাম-ক্ষেত্রে দুইদিকে দুই মহতীসেনা, এই তুমুল কোলাহল, রণবাদ্য এবং ঘোরতর উৎসাহ—সেই সময়ে এই মহাবীরের প্রথমে স্থৈর্য্য, তারপর তাঁহার হৃদয়ে সেই করুণ এবং মহান্ প্রশান্ত ভাব—এরূপ মহচ্চিত্র সাহিত্যজগতে দুর্ল্লভ। 'ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ'—ঈদৃশী অমৃতময়ী বাণী আর কে কোথায় শুনিয়াছে?*"

গীতার কাব্যাংশ যেমন সুন্দর, দর্শনাংশ তেমনি মনোহর। বেদে যেমন তিনটী কাণ্ড আছে—কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড, গীতাতেও সেইরূপ তিনটী কাণ্ড আছে। গীতা সম্বন্ধে নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে,—

"ভারতে সর্ব্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্ব্বশাস্ত্রময়ীমতা॥
ইয়মষ্টাদশাধ্যায়ী ক্রমাৎ ষট্‌কত্রয়েণহি।
কর্ম্মোপাস্তি জ্ঞানকাণ্ড ত্রিতয়াত্মানিগদ্যতে॥"

* গীতারহস্য, ৭ পৃষ্ঠা।

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১ অধ্যায়।

সকল বেদের মত সকল শাস্ত্রের মত গীতায় নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্মকাণ্ড, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে উপাসনাকাণ্ড এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানকাণ্ড আলোচিত হইয়াছে।

(ঘ) গীতা ভগবানের বাক্য।

গীতা সম্বন্ধে অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, কৃষ্ণার্জ্জুন রথে বসিয়া অনুষ্টুপ ইন্দ্রবজ্রা প্রভৃতি ছন্দে কথোপকথন করেন নাই। সুতরাং গীতা ভগবানের বাক্য নহে, ইহা গীতাকারেরই উক্তি। কিন্তু এইরূপ ভয় করিবার কোন কারণ নাই; কারণ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন, ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস সেই ধর্ম্ম সাত শত শ্লোকাকারে নিবদ্ধ করিয়া গীতা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এইজন্য শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে,—"তং ধর্ম্মং ভগবতো যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্ব্বজ্ঞ ভগবান গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ।" শ্রীধর স্বামীও বলিয়াছেন যে,—"তমেব ভগবদুপদিষ্টমর্থং কৃষ্ণদ্বৈপায়ণঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ। তত্রচ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাদ্বিনিঃসৃতানেব শ্লোকানলিখৎ কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ঞ্চ ব্যরচয়েৎ। যাথোক্তং গীতামাহাত্ম্যে—, 'গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃত॥'"

অর্থাৎ, ভগবদুপদিষ্ট সেই ধর্ম্মকে ভগবান্ বেদব্যাস সপ্তশত শ্লোক দ্বারা নিবদ্ধ করিয়াছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ইহাতে প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখ নিঃসৃত শ্লোকই নিবদ্ধ করিয়াছেন। ভগবদ্বাক্য সঙ্গতির জন্য কোন কোন শ্লোক স্বয়ংও রচনা করিয়াছেন। গীতামাহাত্ম্যে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যাহা পদ্মনাভের মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, সেই গীতা শাস্ত্র উত্তমরূপে অভ্যাস করা উচিত, অন্য বিস্তৃত শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? সুতরাং যাঁহারা আশঙ্কা করেন যে, গীতা বেদব্যাস কর্ত্তৃক রচিত হওয়াতে উহাতে যে সকল বিষয় আছে, তাহা তাঁহারই কৃত, তাঁহাদের এই আশঙ্কা পরিহারের জন্য শ্রীধরস্বামী পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলি বলিয়াছেন এবং শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন যে, মহর্ষি বেদব্যাস সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ যথাযথ নিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শাস্ত্রেও উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং স্বয়ম্।
কোহন্য পুণ্ডরীকাক্ষান্মহাভারতকৃদ্‌ভবেৎ॥"

অর্থাৎ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানিবে। পুণ্ডরীকাক্ষ ভিন্ন এমন কে আছেন, যিনি মহাভারত রচনা করিতে সমর্থ? ব্যাসদেব ঈশ্বরের অংশসম্ভূত এবং সর্ব্বজ্ঞ ঋষি ছিলেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ যথাযথ্য ভাবে গীতাতে নিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, গীতা ঠিক শ্রীকৃষ্ণের মুখের কথা নহে বলিয়া গীতা যে তাঁহার শিক্ষা নহে—এইরূপ যুক্তির সারবত্তা নাই। কিন্তু তাহা হইলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, গীতা যদি ঠিক শ্রীকৃষ্ণের মুখের কথা নহে, তবে গ্রন্থ মধ্যে "শ্রীভগবানুবাচ", "অর্জ্জুনউবাচ", "সঞ্জয় উবাচ"—এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে কেন? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ব্যাস সর্ব্বজ্ঞ ঋষি ছিলেন, তিনি স্বয়ং নারায়ণ, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সহিত একাত্মক ছিলেন—যোগ প্রভাবে তিনি কৃষ্ণভাবময়তা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং যদিও তিনি কৃষ্ণকথা শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন, তথাপি তাহাতে অনুমাত্র ভ্রংশদোষ

হয় নাই। গীতার কথা ব্যাসদেব যেরূপ লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ উহার লেখক হইলে ঐরূপই লিখিতেন। এই জন্যই ছন্দোবদ্ধ গীতা "কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ" নামে চিরকাল পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

(ঙ) গীতার শ্লোক সংখ্যা।

গীতা মহাভারতের অংশ, ভীষ্ম পর্ব্বের অন্তর্গত ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায়ে ন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহাভারতে অনেক বিষয় প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু গীতাতে কিছুই প্রক্ষিপ্ত হয় নাই। গীতার শ্লোকের পাঠান্তর অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত শ্লেগেলের (Schelegel) মত এইরূপ যে, গীতাকার ইচ্ছা করিয়াই গীতাতে সাত শত শ্লোক নিবদ্ধ করিয়াছেন। সাত শতের অধিক আর একটীও শ্লোক রচিত না হইবার কারণ আর কিছুই নহে, বোধ হয় তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাহা হইলে পরে আরও শ্লোক উহাতে প্রক্ষিপ্ত হইবে। এই জন্য তিনি ইচ্ছা করিয়াই সাত শত সংখ্যা নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যও গীতার ভাষ্যেতে লিখিয়াছেন যে, ৭০০ শ্লোকে গীতা রচিত হইয়াছে।

আমরাও গীতাতে শ্লোক সংখ্যা ৭০০ দেখিতে পাই। কিন্তু গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের পর ভীষ্ম পর্ব্বে যে অধ্যায় আছে, তাহাতে আমরা গীতার শ্লোক সংখ্যা অন্য প্রকার দেখিতে পাই। যথা,—

'ষট্‌শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহকেশবঃ
অর্জ্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিং তু সঞ্জয়ঃ ॥ ৪
ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়ামানমুচ্যতে ॥৫"
(৪৩ অধ্যায়)

অর্থাৎ, কেশব ৬২০ শ্লোক, অর্জ্জুন ৫৭ শ্লোক, সঞ্জয় ৬৭ শ্লোক এবং ধৃতরাষ্ট্র কেবল একটী শ্লোক গীতাতে বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের সমষ্টি ৭০০ পরিবর্ত্তে ৭৪৫ হইতেছে ; তাহা হইলে আর ৪৫ শ্লোক কোথায় গেল ? মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন যে, গৌড়ে প্রচলিত মহাভারতে তিনি পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ দেখিতে পান নাই। তাঁহার মতে এই শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত।

আবার কেহ কেহ বলেন যে "কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে" ৭৪৫ সংখ্যা শ্লোকই আছে। তাঁহাদের মতে গীতায় ৭০০ শ্লোক ভিন্ন ভীষ্ম পর্ব্বান্তর্গত ২২শ ও ২৩শ অধ্যায়ের শ্লোক গুলিও "কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদের" মধ্যে নিবিষ্ট। ২২শ অধ্যায়ে সঞ্জয়োক্ত ১৪টী এবং কৃষ্ণোক্ত ২টী শ্লোক আছে এবং ২৩ অধ্যায়ে সঞ্জয়োক্ত ৩টী, কৃষ্ণোক্ত ৩টি, অর্জ্জুনোক্ত ১৩টী এবং দেব্যুক্ত ১২টী—এই সর্ব্বশুদ্ধ ৪৫টী শ্লোক দৃষ্ট হয়। সুতরাং কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে যে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৪৫ শ্লোকের উল্লেখ আছে, তাহা মিথ্যা নহে।

যাহা হউক, শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক উল্লিখিত সাত শত শ্লোকময়ী কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদই যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, তাহাতে আর কাহারও দ্বিমত নাই।

(চ) গীতোক্ত ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম কি না ?

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে কিনা, তাহা পরে বিবেচ্য, কিন্তু যাঁহারা গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে বঙ্কিম বাবু অন্যতম। বঙ্কিম বাবু বলেন যে, গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু গীতা যে কৃষ্ণের ধর্ম্ম মতের সঙ্কলন, সে বিষয়ে আর

সন্দেহ নাই। যাহা হউক, গীতাকে যদি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও ইহাকে আমরা শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মমতের সঙ্কলন বলিতে বাধ্য। বঙ্কিম বাবু গীতা সম্বন্ধে "কৃষ্ণচরিত্রে" যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"যাহা আমরা ভগবদ্গীতা বলিয়া পাঠ করি, তাহা কৃষ্ণ প্রণীত নহে। উহা ব্যাস প্রণীত বলিয়া খ্যাত—"বৈয়াসিকী সংহিতা" নামে পরিচিত। উহার প্রণেতা ব্যাসই হউন আর যেই হউন, তিনি ঠিক কৃষ্ণের মুখের কথাগুলি নোট করিয়া রাখিয়া ঐ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন নাই। উহাকে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াও আমার বোধ হয় না। কিন্তু গীতা কৃষ্ণের ধর্ম্মমতের সঙ্কলন, ইহা আমার বিশ্বাস। তাঁহার মতাবলম্বী কোন মনীষী কর্ত্তৃক উহা এই আকারে সঙ্কলিত এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এখন বলিবার কথা এই যে, গীতোক্ত ধর্ম্ম যাঁহার প্রণীত, তিনি স্পষ্টতই অদ্বিতীয় বেদবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তিনি বেদকে সর্ব্বোচ্চ স্থানে বসাইতেন না—কখনও বা বেদের একটু আধটু নিন্দা করিতেন। কিন্তু তথাপি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ ব্যতীত অন্যের দ্বারা গীতোক্ত ধর্ম্ম প্রণীত হয় নাই। ইহা যে গীতা ও বেদ উভয়ই অধ্যয়ন করে, সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে।"

"আমরা বলিয়াছি, তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) জীবনের কাজ দুইটী, ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন এবং ধর্ম্মপ্রচার। মহাভারতে তাঁহার কৃত ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের কথা প্রধানতঃ ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত গীতা পর্ব্বাধ্যায়েই আছে। এখন বিচার উঠিতেছে যে, গীতার যে ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহা গীতাকার কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন বটে, কিন্তু সে ধর্ম্ম যে কৃষ্ণ প্রচারিত, কি গীতাকার প্রণীত, তাহার স্থিরতা কি? সৌভাগ্যক্রমে আমরা গীতা পর্ব্বাধ্যায় ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অংশেও কৃষ্ণদত্ত ধর্ম্মোপদেশ দেখিতে পাই। যদি আমরা দেখি যে, গীতায় যে অভিনব ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আর মহাভারতের অন্যান্য অংশে কৃষ্ণ যে ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত করিতেছেন, ইহার মধ্যে একতা আছে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, এই ধর্ম্ম কৃষ্ণ প্রণীত এবং কৃষ্ণপ্রচারিতই বটে। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা যদি স্বীকার করি, আর যদি দেখি যে মহাভারতকার যে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা স্থানে স্থানে কৃষ্ণে আরোপ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র এক প্রকৃতির ধর্ম্ম। যদি পুনশ্চ দেখি যে, সেই ধর্ম্ম প্রচলিত ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন প্রকৃতির ধর্ম্ম, তবে বলিব এই ধর্ম্ম কৃষ্ণেরই প্রচারিত। আবার যদি দেখি, গীতায় যে ধর্ম্ম সবিস্তারে এবং পূর্ণতার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সহিত ঐ কৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্ম্মের সঙ্গে ঐক্য আছে, উহা তাহারই আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র, তবে বলিব যে গীতোক্ত ধর্ম্ম যথার্থই কৃষ্ণ প্রণীত বটে।"

"এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণ এখানে (সঞ্জয়যান পর্ব্বে) কি বলিতেছেন।"

"শুচি ও কুটুম্বপরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করতঃ জীবন যাপন করিবে,এইরূপ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানাপ্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ কর্ম্মবশতঃ, কেহবা কর্ম্মপরিত্যাগ করিয়া এক মাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষ লাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যাদ্বারা কর্ম্ম সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল। অতএব যেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির জলপান করিবামাত্র পিপাসা-শান্তি হয়, তদ্রূপ ইহকালে যে সকল কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। হে সঞ্জয়! কর্ম্মবশতঃই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে, সুতরাং কর্ম্মই সর্ব্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম্ম অপেক্ষা অন্য কোন বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে,তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয়।"

"দেখ দেবগণ কর্ম্মবলে প্রভাব সম্পন্ন হইয়াছেন; সমীরণ কর্ম্মবলে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন; দিবাকর কর্ম্মবলে আলস্য শূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্দ্রমা কর্ম্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া মাসার্দ্ধ উদিত হইতেছেন; হুতাশন কর্ম্মবলে প্রজাগণের কর্ম্ম সংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; পৃথিবী কর্ম্মবলে নিতান্ত দুর্ভর ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন; স্রোতস্বতী সকল কর্ম্মবলে প্রাণিগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছেন; অমিত বলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্ম্মবলে দশদিক্ ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমত্ত-চিত্তে ভোগবিলাস বিসর্জ্জন ও প্রিয়বস্তু সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয় নিরোধ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিত্য যম, কুবের, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সরা, বিশ্বাবসু ও নক্ষত্রগণ কর্ম্ম প্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন; মহর্ষিগণ ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।"

"কর্ম্মবাদ কৃষ্ণের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে প্রচলিত মতানুসারে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডই কর্ম্ম। মনুষ্য জীবনের সমস্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, যাহাকে পাশ্চাত্যেরা Duty বলেন—সে অর্থে সে প্রচলিত ধর্ম্মে "কর্ম্ম" শব্দ ব্যবহৃত হইত না। গীতাতেই আমরা দেখি, কর্ম্মশব্দের পূর্ব্বপ্রচলিত অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া, যাহা কর্ত্তব্য, যাহা অনুষ্ঠেয়, যাহা Duty, সাধারণতঃ তাহাই কর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আর এইখানে হইতেছে। ভাষাগত বিশেষ প্রভেদ আছে—কিন্তু মর্ম্মার্থ এক। এখানে যিনি বক্তা, গীতাতেও তিনিই প্রকৃত বক্তা, একথা স্বীকার করা যাইতে পারে।"

"অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের যথাবিহিত নির্ব্বাহের অর্থাৎ (ডিউটির সম্পাদনের) নামান্তর স্বধর্ম্ম পালন। গীতার প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্ম্ম পালনে অর্জ্জুনকে উপদিষ্ট করিতেছেন। এখানেও কৃষ্ণ সেই স্বধর্ম্ম পালনের উপদেশ দিতেছেন। যথা,

'হে সঞ্জয়! তুমি কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি সকল লোকের ধর্ম্ম সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াও কৌরবগণের হিতসাধন মানসে পাণ্ডবদিগের নিগ্রহ চেষ্টা করিতেছ? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদজ্ঞ, অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এবং হস্ত্যশ্বরথচালনে সুনিপুণ। এক্ষণে যদি পাণ্ডবেরা কৌরবগণের প্রাণহিংসা না করিয়া ভীমসেনকে সান্ত্বনা করতঃ রাজ্যলাভের অন্য কোন উপায় অবধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে ধর্ম্মরক্ষা ও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়। অথবা ইহাঁরা যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক স্বকর্ম্ম সংসাধন করিয়া দুরদৃষ্টবশতঃ মৃত্যুমুখে নিপতিত হন, তাহাও প্রশস্ত। বোধ হয়, তুমি সন্ধিসংস্থাপনই শ্রেয়ঃ সাধন বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে ধর্ম্মরক্ষা হয়, কি যুদ্ধ না করিলে ধর্ম্মরক্ষা হয়? ইহার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিবে, আমি তাহাই অনুষ্ঠান করিব।'

"তার পর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্মকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের যেরূপ ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে—এখানেও ঠিক সেইরূপ। এইরূপ মহাভারতে অন্যত্র ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে গীতোক্ত ধর্ম্ম এবং মহাভারতের অন্যত্র কথিত কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম এক। অতএব গীতোক্ত ধর্ম্ম যে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম—সে ধর্ম্ম যে কেবল কৃষ্ণের নামে পরিচিত, এমন নহে—যথার্থই কৃষ্ণ প্রণীত ধর্ম্ম, ইহা একপ্রকার সিদ্ধ।"

বঙ্কিম বাবু এই প্রকার আলোচনার দ্বারা গীতোক্ত ধর্ম্ম যে যথার্থ শ্রীকৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা তাঁহার ন্যায় গীতাকে প্রক্ষিপ্ত ভাবেন, তাঁহাদেরও গীতোক্তধর্ম্ম যে শ্রীকৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীআশুতোষ দেব।

বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অধ্যায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রাজা রঘুরাম রায় দেখিলেন পুত্র সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত হইলেন অতএব পুত্রের বিবাহ দিয়া রাজা করিয়া আমি ঈশ্বর স্থানে যাইয়া নিজ কর্ম্মের সাধন করি ইহাই মনোমধ্যে স্থির করিয়া সকল সভাসদ জনেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে বিবেচনা করিয়া উত্তম বংশে পরম সুন্দরী কন্যা স্থির করহ আমি রাজপুত্রের বিবাহ ত্বরায় দিব। সকলেই যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিল পরে অনেকে কন্যার অন্বেষণ করিতে লাগিল শত শত স্থানে মনুষ্য প্রেরিত হইল পরে সকলের বিবেচনায় উত্তম বংশে পরম সুন্দরী কন্যার সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় হইয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন রাঢ় গৌড় বঙ্গ নিবাসী যাবদীয় রাজগণ এবং পণ্ডিতগণ ও প্রধান প্রধান মনুষ্য নিমন্ত্রণ করিলেন বিবাহের দিবস ফাগুণ মাসে স্থির হইল যাবদীয় মনুষ্যের কারণ নানা স্থানে ভাণ্ডার হইল প্রতি ভাণ্ডারে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চারি প্রকার সামিগ্রী পরিপূর্ণ এবং যে যেমন মনুষ্য তাহারি মত থাকনের স্থান নির্ম্মাণ হইল রাজধানিতে যাবত্ দেশীয় লোক আগমন করিতে লাগিল রাজা আত্ম জনেরদিগের প্রতি আজ্ঞা করিয়া দিলেন তোমরা সর্ব্বদা তত্ত্ব করিবা বিস্তর লোকের আগমন হইতেছে যেন কেহ অভুক্ত থাকে না যে যত লয় তাহাই দিবা। রাজাজ্ঞানুসারে স্ব স্ব কার্য্যে সর্ব্বদা সাবধানে আছে। পরে রাজাগণের আগমন শ্রবণ করিয়া রাজা আপনি প্রত্যেক রাজার নিকটস্থ হইয়া সমাদর পূর্ব্বক উত্তম আলয়ে থাকনের স্থান নিরূপিত করিয়া দিলেন এবং উপযুক্ত মনুষ্য রাজগণের নিকটে নিয়োজিত করিলেন যে যেমন রাজা সেইরূপ সমাদর করেন এবং সামগ্রীর আয়োজন করিয়া প্রেরিত করিলেন পরে রাজা রঘুরাম নগর ভ্রমণ করিয়া মনুষ্য দেখিলেন দেখেন অতিবিস্তর লোক আসিয়াছে এত লোকের খাদ্য সামিগ্রী কি প্রকারে ভৃত্যেরা দিতে পারিবেক অতএব নগরস্থ যাবতীয় খাদ্য সামিগ্রীর দোকান আছে ইহাই আমি ক্রয় করিয়া সকলকে অনুমতি করি যত লয় তাহা দেয় ইহা মনে স্থির করিয়া পাত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে রূপ মনুষ্য আসিয়াছে ইহাতে কেহ খাদ্য সামিগ্রী প্রদান করিয়া যশ লইতে পারিবে না কিন্তু যদি কেহ উপবাসী থাকে তবে বড় অখ্যাতি অতএব নগরে যত আহারের দ্রব্যের মহাজন লোক আছে তাহারদিগকে কহ যে যত চাহে তাহাকে তত দেয় এবং যে আপনি লয় তাহাকে বারণ না করে লোক সকল আপন আপন স্বেচ্ছার মত দ্রব্য লউক পরে মহাজনেরদিগের লিপি মত টাকা দিয়া যাইবেক আর ভাণ্ডারের নিয়োজিত লোককে কহ যে যত চাহে তাহার দশ গুণ করিয়া সামিগ্রী দেয় এবং তুমি সর্ব্বত্রে ভ্রমণ করিবা যেন কেহ দুঃখ

না পায়। পাত্র যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিলেন। অসংখ্য মনুষ্যের আগমন হইয়াছে কোলাহলে নগরের লোক বধির হইল নগরের শোভার সীমা নাই সহস্র সহস্র পতাকা রক্ত পীত শুভ্র নীল ইত্যাদি উড্ডীয়মানা নানা জাতীয় বাদ্যোদ্যম রাজপুরে মহামহোৎসব অস্ত রাজগণ দর্শন করিয়া ধন্য ধন্য করিতেছেন। আর অনেক পণ্ডিত লোক আগমন করিয়া নিজ নিজ স্থানে কাল ক্ষেপণ করিতেছেন। রাজপুরে প্রত্যহ অপূর্ব্ব সভা হয় যাবদীয় রাজগণ এবং পণ্ডিতগণ এবং প্রধান মনুষ্য সকলেই রাজ সভায় গমন করিয়া স্ব স্ব স্থানে বৈশেন নর্ত্তক নর্ত্তকী শত শত আসিয়া নৃত্য গীত বাদ্য শ্রবণ করায়। এই রূপে প্রত্যহ লগ্ন ক্রমে রাজপুত্রের বিবাহ মহতী ঘটা পূর্ব্বক হইল। পরে মহারাজ রঘু রাম রায় অনাহূত যে সকল লোক আসিয়াছিল তাহারদিগকে মনোনিত ধন দিয়া বিদায় করিলেন সকলে সুখ্যাদি করিয়া আপন আপন দেশে গমন করিল। পরে রাজগণেরদিগকে উপযুক্ত মর্য্যাতা করিয়া বিদায় করিলেন। পণ্ডিতেরদিগকে এবং প্রধান প্রধান মনুষ্যেরদিগকে যে যেমন পাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক মর্য্যাদা করিয়া বিদায় করিলেন। সকলেই সুখ্যাতি করিলেক যশে দিগ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। এই প্রকার মহতী ঘটা করিয়া রাজা রঘুরাম কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিবাহ দিলেন। রাজা রাণী পুত্র এবং পুত্রবধূ প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদে কাল জাপন করিতে লাগিলেন এই রূপে কিঞ্চিত্ কাল যায় পরে মহারাজ রঘু রাম রায় কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে রাজ্যে নিযুক্ত করিয়া আপনি ঈশ্বর ভজনে প্রবর্ত্ত হইলেন॥

পরে কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র মত প্রজা পালন করিতে আরম্ভ করিলেন রাজ্যের লোকেরদিগের কোন ব্যামোহ নাই ভৃত্যবর্গেরা নিজ নিজ কার্য্যে প্রাধান্য করিয়া কাল ক্ষেপণ করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুখ্যাতির সীমা নাই। তখন রাজধানি মুরসিদাবাদে নবাব সাহেবের নিকট মহারাজার অত্যন্ত সংভ্রম সর্ব্ব প্রকারে মহারাজ চক্রবর্ত্তির ন্যায় ব্যবহার॥

এক দিবস মহারাজ পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পূর্ব্বে এ বংশে যে সকল রাজগণ হইয়াছিলেন তাহারা কেহ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে পাত্র নিবেদন করিল মহারাজ আমরা পুরুষানুক্রমে এ রাজ্যের পাত্র কিন্তু যে সকল মহারাজারা গিয়াছেন আর আর প্রকার সুখ্যাতি করিয়াছেন কিন্তু যজ্ঞ কেহ করেন নাই। মহারাজ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাত্রকে কহিলেন আমি অতি বৃহদ্ যজ্ঞ করিব তুমি আয়োজন কর। পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরদিগকে আহ্বান করিয়া কি যজ্ঞ করিবেন তাহা স্থির করুন পশ্চাৎ যেমন যেমন আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব। পাত্রের বাক্যে রাজা সর্ব্বত্রে লিপি প্রেরিত করিলেন। ভট্টাচার্য্যেরদিগের আসিতে রাজপুত্র প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা প্রাপ্ত হইয়া মহা হর্ষে রাজধানি কৃষ্ণনগরে আগমন করিলেন।

পরে রাজা শ্রবণ করিলেন যে প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা আমার আজ্ঞানুসারে আগমন করিয়াছেন। পাত্রের প্রতি রাজা আজ্ঞা করিলেন অনেক অনেক পণ্ডিতের আগমন হইয়াছে অতএব তাহারদিগকে উত্তম স্থানে বাসা দেহ এবং উত্তম খাদ্য সামিগ্রীও দেহ যেন কোন মতে ব্যামোহ না পান। পাত্র

রাজাজ্ঞামতে যাবদীয় পণ্ডিতেরদিগকে উত্তম স্থান দিয়া খাদ্য সামগ্রী যথেষ্টরূপ দিলেন। পর দিবস রাজা সভা করিয়া পণ্ডিতেরদিগকে আহ্বান করিলেন। পণ্ডিতেরা রাজার বিদ্যমানে আসিয়া মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজ সভাতে বসিয়া নানা শাস্ত্রের বিচার করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। বিচারানন্তরে পণ্ডিতেরা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে নিবেদন করিলেন আমারদিগের প্রতি রাজলিপি কি কারণ গিয়াছিল তাহাতে রাজা আজ্ঞা করিলেন আমি মনোমধ্যে কামনা করিয়াছি যজ্ঞ করিব অতএব আপনারা বিচার করিয়া আজ্ঞা করুন কি যজ্ঞ করিব আর কি রূপ করিলে সর্ব্বত্র সুখ্যাতি হইবেক। এই বাক্য ধীরবর্গেরা শ্রবণ করিয়া মহারাজকে নিবেদন করিলেন এ অপূর্ব্ব পরামর্শ করিয়াছেন অদ্য আমরা বাসায় প্রস্থান করি কল্য আসিয়া নিবেদন করিব।

পর দিবস পণ্ডিতেরা আগমন করিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজসভায় সকলে বসিলেন। পরে রাজা পণ্ডিতেরদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন আপনারা কি স্থির করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা কহিলেন মহারাজ অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী যজ্ঞ করুন। রাজা উত্তর করিলেন দুই যজ্ঞ এককালীন করিব কি পৃথক্ পৃথক্ করিব ইহা বিবেচনা করিয়া আপনারা আমাকে আজ্ঞা করুন এবং কত তঙ্কা হইলে যজ্ঞ সাঙ্গ হইবেক তাহাও আজ্ঞা করুন। পণ্ডিতেরা কহিলেন মহারাজ রাজযজ্ঞ ইহার বিবেচনা মহারাজ করিবেন যজ্ঞের যে যে সামিগ্রীর আবশ্যক তাহার যায় করিয়া দিই। রাজা কহিলেন ভাল তাহাই দিউন। পরে পণ্ডিতেরা রাজসভা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পাত্রের নিকট যাইয়া যজ্ঞের সামিগ্রীর যায় করিয়া দিলেন এবং কহিলেন যে দ্রব্য যজ্ঞেতে লাগিবেক তাহাই আমরা লিখিয়া দিলাম পরে পাত্র সামুদায়িক বরার্দ্ধ করিয়া দেখিলেন বিংশতি লক্ষ তঙ্কা হইলে যজ্ঞ সাঙ্গ হইবেক। মহারাজার নিকটে পাত্র গমন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন আয়োজন করহ পরে পাত্র যজ্ঞের দ্রব্য সকল আয়োজন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন॥

পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ রাঢ় গৌড় কাশী দ্রাবিড় উৎকল কাশ্মীর প্রভৃতি দেশস্থ যাবদীয় পণ্ডিতেরদিগের প্রতি নিমন্ত্রনের লিপি পাঠাইলেন। যজ্ঞের কাল উপস্থিত হইলেই সকল দেশীয় ধীরবর্গেরা আসিলেন। রাজা অতিশয় ঘটাপূর্ব্বক যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিলেন এবং সকল লোককে যথেষ্ট ধন দিয়া পরিতোষ জন্মাইলেন। রাজার সুখ্যাতির সীমা নাই যাবদীয় পণ্ডিতেরা রাজার নাম রাখিলেন অগ্নিহোত্রী রাজপেয়ী শ্রীমন্মহা রাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই নাম মহারাজ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন। পশ্চাৎ যাবদ্দেশীয় পণ্ডিতেরদিগকে বহুবিধ ধন দিয়া বিদায় করিয়া মনের হর্ষে রাজ্য করেন। রাজ্য শাসিত হইলে সর্ব্বত্র সুখ্যাতি পাইলেন। প্রজা সকলের যথেষ্ট আহ্লাদ কোন রূপে ব্যামোহ নাই। এইরূপে কাল ক্ষেপণ করেন।

এক দিবস অন্তঃকরণে হইল শিকারে যাইব পরে ভৃত্যবর্গেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন আমি মৃগয়া করিতে যাইব তোমরা সকলে সসজ্য হও আজ্ঞা প্রমাণে সকলে

প্রস্তুত হইল। রাজা অশ্বারোহণে গমন করিয়া নিবিড় বনে মৃগয়া করেন। ইতি-মধ্যে এক স্থানে উপনীত হইয়া দেখেন অতিরম্য স্থান চারিদিগে নদী মধ্যে এক ক্ষুদ্রদ্বীপ এবং স্থানে স্থানে অনেক পশু পক্ষী আছে নানা প্রকার শব্দ হইতেছে। রাজা স্থান নিরীক্ষণ করিলেন এ অপূর্ব্ব স্থান আমি এইখানে কিছু দিন বিশ্রাম করিব। রাজাজ্ঞা ক্রমে ভৃত্যবর্গেরা রাজার থাকিবার উপযুক্ত স্থান করিয়া দিয়া পশ্চাৎ আপনারদিগের স্থান করিয়া সকলেই সেই স্থানে বাস করেন। পরে রাজা আজ্ঞা করিলেন আমি এই স্থানে পুরী নির্ম্মাণ করিব পাত্রকে শীঘ্র আনয়ন কর। রাজা-জ্ঞানুসারে দূত গিয়া পাত্র আনিল পাত্রকে দেখিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তুমি এই স্থানে অপূর্ব্বা এক পুরী প্রস্তুতা কর যেন কোন রূপে কেহ নিন্দা না করে। পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ আপনি রাজধানিতে গমন করুন আমি পুরী নির্ম্মাণ করাই পশ্চাৎ প্রস্তুতা হইলে মহারাজ আসিয়া দেখিবেন। পাত্রের বাক্যে রাজা রাজধানিতে আগমন করিলেন পাত্র সেই স্থানে থাকিয়া পুরী নির্ম্মাণ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। চারি দিগে যে নদী আছে সেই গড় হইল। দক্ষিণ দিগের নদী বন্ধন করিয়া প্রধান পথ করিলেন এবং সৈন্যের থাকনের স্থান করিলেন বড় বড় কামান দুই পার্শ্বে রাখিলেন হটাৎ পুর মধ্যে শত্রু প্রবেশ করিতে না পারে তৎপরে অপূর্ব্ব অট্টালিকা তৎপরে বাদ্যো-দ্যম তার পরে অতি উচ্চ অট্টালিকা তাতে ঘড়ি তদূর্দ্ধে ঘণ্টা তার পর চারি দরজা মধ্যে সদাগরেরদিগের থাকনের স্থান এবং

হইবেক তন্মধ্যে বিস্তারিত পথ কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া এক অট্টালিকা তাতে নানা জাতীয় যন্ত্র লইয়া যন্ত্রীরা বাদ্যোদ্যম করি-বেক পরে রাজবাটী প্রথম এক চতুঃসীমা দক্ষিণ দ্বারী এক অট্টালিকা তাহাতে রাজ-কীয় ব্যাপার হইবেক। তিন পার্শ্বে অট্টালিকা তাতে ভৃত্যেরা থাকিবে। পরে এক চতুঃসীমা তাতে ঈশ্বরের আলয় অপূর্ব্ব রম্য স্থান সহস্র সহস্র লোকে দর্শন করিতে পারে। পরে একখান পুরী তাতে মহা-রাজার বিরাজ করণের স্থান। চারি দিগে অট্টালিকা পরে অন্তঃপুর অতি বৃহৎ বাটী নানা স্থানে নানা প্রকার অট্টালিকা। অন্তঃপুরের কিঞ্চিৎ দূরে এক পুষ্পোদ্যান চতুর্দ্দিগে প্রাচীর মহারাণী প্রভৃতি পুষ্পো-দ্যানে গমন করিতে পারেন পুষ্পোদ্যানে নানা জাতীয় পুষ্প তন্মধ্য স্থানে এক অট্টালিকা তাহাতে বসিয়া রাণী নৃত্যকীর-দিগের নৃত্য দর্শন করেন এবং গীত বাদ্য শ্রবণ করেন। পশ্চিম দিগের যে পথ সেই পথ দিয়া কিঞ্চিৎ গমন করিলে এক ধর্ম্মশালা সেখানে অন্ধ অতুর পঙ্গু এবং উদাসীন যে কেহ উপনীত হইবেক যার যে স্বেচ্ছা আহারের দ্রব্য পাইবেক ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া দ্রব্য রাখি-লেন॥

পূর্ব্বদিগে এক অপূর্ব্ব পুষ্পোদ্যান তার মধ্য স্থানে অট্টালিকা এবং নানা জাতীয় বৃক্ষ ও পুষ্প এই পুষ্পোদ্যানের পর যাবদীয় মহা-রাজার জ্ঞাতি এবং কুটুম্বদিগের পৃথক পৃথক অট্টালিকাময়ী বাটী প্রত্যেক বাটীতে দেবা-লয়, এইরূপ অনেক প্রকার বাহুল্য করিয়া বাটী প্রস্তুত করিলেন। পরে পাত্র বাটী

নির্ম্মাণ করাইয়া মহারাজাকে সংবাদ দিলেন যে বাটী প্রস্তুতা হইয়াছে। মহারাজ সপরিবারে নূতন বাটীতে আগমন করিয়া সকল পুরী দেখিয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া পাত্রকে রাজপ্রসাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন অধ্যাপকেরদিগের স্থান করিয়াছ। পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজার যে পুষ্পের বাগান হইয়াছে তাহার নিকট স্থান আছে আজ্ঞা করিলে সেই স্থানে প্রস্তুত করি। রাজা কহিলেন অতি শীঘ্র প্রস্তুত করহ। রাজাজ্ঞানুসারে পৃথক পৃথক পাঠশালা প্রস্তুত করাইলেন। সেই সকল পাঠশালায় প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা বসতি করিয়া অধ্যাপনা করাইতে লাগিলেন এবং নানা দেশীয় গুণবান লোক আসিয়া গুণ শিক্ষা করান এবং করে। রাজা শুভক্ষণে পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আহ্লাদের সীমা নাই। পুরীর নাম শিবনিবাস নদীর নাম কঙ্কনা রাখিলেন। পুরবাসী যাবদীয় মনুষ্যেরা মহা সুখে সর্ব্বদা হাস্য পরিহাস্যতে কালক্ষেপণ এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান ঈশ্বরের আরাধনা করেন। এইরূপে মহারাজ বসতি করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। মধ্যে মধ্যে রাজা মুরসিদাবাদে গমন করিয়া নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথেষ্ট শিষ্টাচার করেন এবং নানা জাতীয় ভেটের দ্রব্য নবাবকে দেন। তখন নবাব আলাবৃদ্ধি খান অতিবড় ধর্ম্মাত্মা সকলের প্রতি দয়ালু পুণ্যশীল সকল রাজারা রাজকর নবাবকে দিয়া সুখেতে কালক্ষেপণ করিতেছেন। রাজ্যোৎপাত কাহার নাই যে যেমন মনুষ্য তাহাকে সেইরূপ নবাবের কৃপা কিন্তু নবাব সাহেবের পুত্র নাই এক কন্যা কন্যার প্রতি নবাব সাহেবের অতিশয় স্নেহ। কিছু কালান্তরে নবাব সাহেবের এক দৌহিত্র হইল নাম রাখিলেন স্রাজেরদৌলা নবাব সাহেবের বাসনা দৌহিত্র সর্ব্বদাই নিকটে থাকে এইরূপে কিছুকাল যায় স্রাজেরদৌলা অতি বড় দুর্ব্বৃত্ত হইলেন যাহা মনে আইসে তাহাই করেন কেহ বারণ করিতে পারে না। নবাব সাহেবের পাত্র মহারাজ মহেন্দ্র এবং আর আর প্রধান প্রধান চাকর অনেক আছে সকলেই ঐক্য হইয়া নবাব সাহেবকে নিবেদন করিলেন স্রাজেরদৌলার অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতেছেন ইহার আপনি উপায়ান্তর করুন তার পর নবাব সাহেব স্রাজেরদৌলাকে ডাকাইয়া কহিলেন তুমি যাবদীয় লোকের উপর দৌরাত্ম্য করহ এ অতি মন্দ কর্ম্ম সাবধান কদাচ মন্দ ক্রিয়া করিও না। এইরূপ শাসিত করনে স্রাজেরদৌলা প্রধান পাত্রগণেরদিগকে আহ্বান করিয়া দমন করিলেক আমি যে কার্য্য করি তাহা যদি নবাব সাহেবের কর্ণগোচর হয় তবে তোমারদিগের যথেষ্ট দণ্ড করিব এবং একথা নবাব সাহেবের নিকট তোমরা কহিয়াছ যদি আমার নবাবি হয় তবে ইহার প্রতিফল সুন্দরমতে দিব যত প্রধান প্রধান ভৃত্যেরা মহাসঙ্কান্বিত হইয়া নীরব হইলেন। তারপর স্রাজেরদৌলা নানা প্রকারে দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিলেক নদী দিয়া নৌকা যায় সে নৌকা ডুবায় মনুষ্য সকল ডুবে মরে ইহাই দেখে এবং যাহার আলয়েতে শুনে পরম সুন্দরী কন্যা আছে বলক্রমে সে কন্যা হরণ করে ও গর্ব্বিণী স্ত্রী আনিয়া উদর চিরিয়া দেখে কোন খানে সন্তান থাকে এইরূপ অতিশয় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। সকল লোক বিবেচনা করিতে প্রবর্ত্ত হইল পরস্পর বিবেচনা করিলেন এ দেশে আর থাকা পরামর্শ নহ নগরস্থ লোক সকল মুরসিদা-

বাদ ত্যাগ করিয়া পলায়ন পর হইল হাহাকার শব্দ উঠিল সকল লোকেই ঈশ্বরের স্থানে আরাধনা করিতে প্রবর্ত্ত হইল যেন এ দেশে জবন অধিকারী না থাকে। কিছু দিন যায় নবাব আলাবৃদ্ধির লোকান্তর হইলে স্রাজেরদৌলা নবাব হইলেন। যাবদীয় প্রধান প্রধান ভৃত্যবর্গেরা ভেট দিয়া করপুটে নিবেদন করিলেন আপনি এখন এ দেশের কর্ত্তা হইলেন যাহাতে রাজ্যের লোক সুখী হয় তাহা করিবেন ঈশ্বর আপনকারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিলেন এ দেশের লোককে সুখে রাখিলে বহুকাল রাজ্য করিতে পারিবেন। এই প্রকার পাত্র মিত্র লোকে সর্ব্বদা বুঝান কিন্তু তিনি দুষ্ট প্রকৃতি ত্যাগ ও উত্তম বাক্য শ্রবণ করেন না সকল লোক এবং প্রধান প্রধান চাকরেরা বিবেচনা করিলেন স্রাজেরদৌলা নবাব থাকিলে কাহাঁরো কল্যাণ নাই অতএব কি হইবে কোথা যাব ইহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না পরে যাবত্ দেশীয় রাজা ঐক্য হইয়া নবাবের প্রধান পাত্র মহারাজ মহেন্দ্রকে নিবেদন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। রাজা সকলের নাম বর্দ্ধমানের রাজা ও নবদ্বীপের রাজা দিনাজপুরের রাজা বিষ্ণুপুরের রাজা মেদনীপুরের রাজা বীরভূমের রাজা ইত্যাদি করিয়া সকল রাজগণ প্রধান পাত্রের নিকট যাত্রা করিয়া স্রাজেরদৌলার দৌরাত্ম্য নিবেদন করিলেন। মহারাজ মহেন্দ্র সকলকে আশ্বাস দিয়া স্ব স্ব রাজ্যে প্রেরিত করিলেন।

পরে যাবদীয় মন্ত্রীরা নবাব স্রাজেরদৌলায় নীতি শিক্ষা করান যত উত্তম কথা কহেন স্রাজেরদৌলা ততোধিক মন্দ করে। পরে মহারাজ মহেন্দ্র এবং রাজারাম নারায়ণ রাজা রাজবল্লভ রাজা কৃষ্ণদাস ও মীর জাফরালি খান এই সকল লোক ঐক্য হইয়া এক দিবস জগত্ সেট মহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়া জগৎ সেটের সহিত বিরলে বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মহারাজ মহেন্দ্র অগ্রে কহিলেন আমি যাহা কহি তাহা তোমরা শ্রবণ করহ আমরা এদেশে অনেক কালাবধি আছি এবং নবাব সাহেবদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া প্রাধান্য রূপে পুরুষানুক্রমে কালক্ষেপণ করিতেছি এখন যিনি নবাব হইলেন ইহার নিকট মানের লঘুতা দিন দিন হইতে লাগিল আর সকল লোকের উপর অতিশয় দৌরাত্ম্য কত রূপে বিষেধ করিলাম এবং বুঝাইলাম তাহা কদাচ শুনে না আর দৌরাত্ম্য করে অতএব ইহার উপায় কি সকলে বিবেচনা করহ। রাজা রামনারায়ণ কহিলেন ইহার উপায় হস্তিনাপুরে জনেক গমন করিয়া এ নবাবকে তগির করিয়া অন্য এক নবাব না আনিলে এ রাজ্যের কল্যাণ নাই। রাজা রাজবল্লভ কহিলেন এ পরামর্শ কিছু নয় হস্তিনাপুরের বাসনা জবন তিনি আর একজন নবাব দিবেন সেও জবন অতএব জবন অধিকারী থাকিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকিবেক না। এইরূপ কথোপকথন স্থির কিছুই হয় না শেষে এই পরামর্শ হইল যাহাতে জবন দুর হয় তাহার চেষ্টা করহ ইহাতে জগৎসেট কহিলেন এক কার্য্য করহ নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অতি বড় বুদ্ধিমান তাহাকে আনিতে দূত পাঠাও তিনি আইলেই যে পরামর্শ হয় তাহাই করিবে। সকলে সত্য কহিয়া দূত প্রেরণ করিয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমশঃ।

বৈতালিক।

১

জাগ জাগ জননী আমার !
দীপক রাগেতে কুঞ্জে বিহঙ্গ,
নিভিছে তারা, নিভিছে চন্দ্র
মুছায়ে অন্ধকার।
এনেছি গাঁথিয়া পরাতে চরণে
নবীন পুষ্পহার,
জাগ জাগ জননী আমার !

২

জাগ জাগ জননী আমার !
ভেঙ্গেছিল তব নিদ্রা নিশীথে,
হেরেছ আঁধার মাগো, চারিভিতে,
পোহায় নি ভাবি' রজনী তখনো
জড়ায়ে স্বপন ভার,—
মুদেছ নয়ন আবেশ-কাতর
পুনঃ পুনঃ কতবার।
জাগ জাগ জননী আমার !

৩

জাগ জাগ জননী আমার !
অরুণ কিরণ মণ্ডিত শিরে,
হীরক কীরীটী তুলে পর ধীরে ;
বোধন-তূর্য্যধ্বনি মুহুর্মুহু,
কাঁপে বিশ্ব পারাবার !
পুলক-পূরিত বিজয়-নিনাদে
ছুঁয়েছে আকাশ ধার !
জাগ জাগ জননী আমার !

৪

জাগ জাগ জননী আমার !
শত প্রার্থনা, সহস্র কর্ম্মে
ভরে বসে আছে মর্ম্মে মর্ম্মে
হেম সিংহাসন বেরি' রাজসভা
প্রতীক্ষায় মা তোমার,—
ভক্ত প্রজার আসন্ন গতি,
অগণিত উপহার !
জাগ জাগ জননী আমার !

৫

জাগ জাগ জননী আমার !
স্নেহ-স্তন্য-অন্ন-লালিত
বিদ্রোহী প্রাণ ছিল অবিনীত,
এতদিন তাই এ উপদ্রবে
হইয়াছি ছার খার !
অরাজক দেশে রাণী শুধু তুমি,
প্রজা মোরা মা তোমার !
জাগ জাগ জননী আমার !

৬

জাগ জাগ জননী আমার !
তব প্রাপ্য দিয়েছি অপরে,
না জানি কে রাজা, আজি তোর তরে,
এ শতাব্দীর বাকী রাজকর,—
আনিয়াছি সবাকার,—
সভার মাঝারে সবার প্রাণের
ভকতি ও অশ্রুধার—
জাগ জাগ জননী আমার।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী।

যোগী রামানন্দ।

এই জগদরণ্যের কত স্থানে যে কত দেববাঞ্ছিত কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া স্বকীয় পবিত্র পরিমলে কাননের এক প্রান্তমাত্র সুবাসিত করিতে না করিতেই কালের তীব্র নিঃশ্বাসে বিশীর্ণ লইয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান কর, জানিতে পারিবে; ঈদৃশ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

আমরা যে মহাপুরুষের পরিচয় দানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি প্রকৃতপক্ষেই নন্দনচ্যুত পারিজাত ছিলেন। তাঁহার স্বর্গীয় সৌরভে, অল্পদিনের জন্য নিতান্ত পূতিগন্ধময় নরকও আমোদিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার মধুর ভাবের যাদুমন্ত্রে পাষাণ খণ্ডেও পঙ্কজ বিকসিত হইয়াছিল, এবং সাহারার মরুময় প্রদেশেও শান্তিময়ী শৈবলিনী প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের নাম ৺ অন্নদাচরণ চৌধুরী, ইনি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালীপাড়ার মদনপাড় গ্রামে প্রসিদ্ধ সাড়ে আট আনী বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইঁহার পিতার নাম গোপীমোহন চৌধুরী, অন্নদাচরণ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র। বাল্যেই ইনি পিতৃহীন হইয়া জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতার তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। প্রথমে গুরুর পাঠশালায়, তৎপরে চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ব্যাকরণের ধাতু রূপ পর্য্যন্ত পাঠেই তাঁহার শিক্ষা পর্য্যবসিত হইয়াছিল। উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে কিম্বা কুসংসর্গ প্রভাবে, অন্নদাচরণের যৌবনের প্রথমাবস্থা নিতান্ত কলুষিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তথাপি পরহিতৈষণা, বদান্যতা, মাতৃভক্তি ও পুরুষোচিত উৎসাহ ও তেজস্বিতায় তিনি আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। তিনি কঠোর কর্ত্তব্য প্রতিপালনে ও প্রতিজ্ঞা পরিরক্ষণে বজ্রাপেক্ষাও কঠিন এবং পরদুঃখ দর্শনে কুসুমাপেক্ষাও সুকোমল ছিলেন। যৌবনাবসানের পূর্ব্বেই তাঁহার হৃদয়ের মসীময়ী যবনিকা উত্তোলিত হইল, তিনি আপাতমধুর ও পরিণামতাপী বিষয়-ভোগ ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অন্নদাচরণের চিত্ত পরিবর্ত্তনের অল্প দিন পূর্ব্বে একটী লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইল। সেই ঘটনার সূত্রাবলম্বনেই অন্নদাচরণের হৃদয়ে স্বর্গীয় জ্যোতি প্রতিফলিত হয়। ভগবান যে কোন সূত্রে কাহার প্রতি করুণাময়ী পীযূষ-ধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন, তাহা মানব-বুদ্ধির অগোচর।

১২৯১ সালের মাঘ মাসে মদনপাড়ের সংলগ্ন সোনাটিয়া গ্রামের কোনও মুসলমান, তাহার মাতৃ-কৃত্যোপলক্ষে গোহত্যা করিতে কৃত-নিশ্চয় হইল। স্থানীয় জমীদারগণ এই সংবাদ অবগত হইয়া, দল বলসহ, গোহত্যা নিবারণোদ্দেশে সোনাটিয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য যে, অন্নদাচরণও তাহাদের অন্যতম ছিলেন। রজনী যোগে, মুসলমান বাড়ী আক্রমণ পূর্ব্বক হত্যার্থ আনীত গো সমূহের উদ্ধার সাধন হইল। মুসলমানগণ ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া, ক্রোধান্ধ হইল এবং ভীষণ লড়াই আরম্ভ করিল। হিন্দু মুসলমান উভয় দলের ২।৩ জন আহত হইল। অন্নদাচরণও মুসলমান কর্ত্তৃক বিশেষরূপে

লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, জমীদারগণ, মুসলমান-শাসনে বদ্ধ-পরিকর হইয়া নানাবিধ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। বহু সংখ্যক মুসলমান বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। কয়েক মাস যাবৎ এই প্রকার চলিল, পরে অর্থ দণ্ড দানে মুসলমানগণ জমীদারগণের ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করিল, কিন্তু তদবধি অন্নদাচরণের হৃদয়ে, কি যেন, এক ভীষণ অনল প্রজ্বলিত হইয়া, তাঁহাকে অহরহ দগ্ধ করিতে লাগিল। কোনও প্রকার পার্থিব সান্ত্বনায় তাহার নির্ব্বাণ হইল না। নিরন্তর মুর্ম্মুর দাহে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল, এ অনল ক্রোধ বা প্রতিহিংসা-সম্ভূত নহে যে সত্বর শান্তি লাভ করিবে, ইহা পূর্ব্বানুষ্ঠিত জুগুপ্সিত কার্য্যের পশ্চাত্তাপ-সম্ভূত। যবন হস্তে তাদৃশ লাঞ্ছনা ভোগ, তিনি সেই সকল যৌবন-কৃত পাপের পরিণাম ফল মনে করিয়া, নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাদৃশ অনুতাপানলের ভীমদাহে, অন্তরের অনবরত অশ্রুধারা সিঞ্চনে আবর্জ্জনা রাশি ভস্মীভূত হইল এবং অল্পে অল্পে সেই উর্ব্বরক্ষেত্রে, বিবেক-বীজ অঙ্কুরিত হইল। মাটীর অন্নদাচরণ ক্রমে ক্রমে দেবত্বে উন্নীত হইতে লাগিলেন। কিন্তু অন্নদাচরণের সেই প্রফুল্ল মুখশ্রী, নিদাঘ-তাপ-বিশীর্ণ কুসুমের ন্যায়, ম্লান ভাব ধারণ করিল, অনবরত অশ্রুপাতে তাহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। তিনি বালকের ন্যায় রোদনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের নিকট স্বকৃত পাপকাহিনী বিবৃত করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

যে সকল মুসলমানগণ, অন্নদাচরণের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি তিনি কোনও প্রকার প্রতিহিংসা করেন নাই। বরং দয়া ও ক্ষমাগুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "মুসলমানগণ, অত্যাচারচ্ছলে, আমার পরমোপকার সাধন করিয়াছে, উহারা আমার পরম বন্ধু, তাই আমাকে মোহময়ী নিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়াছে। সর্ব্বমঙ্গলময়ী জননী অবশ্যই উহাদের মঙ্গল বিধান করিবেন।" একদিন অত্যাচারকারী কোনও মুসলমান অন্নদাচরণকে সহসা সম্মুখে দেখিতে পাইয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছিল, অন্নদাচরণ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া সজলনেত্রে বলিলেন, "ভাই! লজ্জা কি? মনুষ্য আপন ইচ্ছায় কোনও কার্য্য সম্পাদন করে না, দুনিয়া-দারির সকলেই একমাত্র খোদা তালার হুকুম তামিল করিয়া থাকে, ইহাতে তোমাদের লজ্জা বা ভয়ের কোনও কারণ নাই। ভাই! একবার "আল্লা আল্লা" বলিয়া আমাকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন কর। অমি সম্বল-বিহীন কাঙ্গাল, কাঙ্গালের কাতর প্রাণে ব্যাথা দিয়া তোদের ফল কি?"

মহাপুরুষ অন্নদাচরণের, ঈদৃশ অলৌকিক উদার ভাব ও প্রেম-পরতন্ত্রতা কেবল সম্প্রদায় বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁহার প্রেম, সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বসুলভ ছিল। পূর্ব্বোক্ত আশ্চর্য্যকর ঘটনাই তাঁহার দেবোচিত মধুর ভাবের প্রথম নিদর্শন।

প্রহ্লাদ ও মহাপ্রভু চৈতন্য প্রভৃতি কতিপয় প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের জীবনে ব্যতীত ঈদৃশ ক্ষমা ও মধুর ভাব প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয় না। ধন্য অন্নদাচরণ, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার প্রেম, তুমি মাটীর মানুষ হইয়াও আজ স্বর্গীয় দেবতা, তোমার পূত পদধূলি অঙ্গে ধারণ

করিতে পারিলে, না জানি কত পুণ্য সঞ্চয় হইত।

অন্নদাচরণের ঈদৃশ ভাব দর্শনে, কেহ কেহ তাহাকে নিন্দা করিতে লাগিল, কেহ বা বাতুল বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে ও অশ্রুপ্লাবিত কপোলে, সকলের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন "ভগবান সর্ব্ব-ভূতস্থ, তাঁহার মহাশক্তিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রী, সর্ব্বভূতেই তাঁহার অধিষ্ঠান সমানরূপে অবস্থিত, সুতরাং সকলেই, আমার নমস্য পূজার্হ। যদি অজ্ঞানতাবশতঃ কাহারও প্রতি অবজ্ঞা বা কাহারও প্রাণে কোনও ব্যথা দিয়া থাকি, তবে এই দীনহীন কাঙ্গালকে পদধূলি দানে, সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন।"

"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

মহাপ্রভুর এই বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম, অন্নদাচরণ, সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাই আজ তিনি, বিষয়-সম্পন্ন লোক হইয়াও কাঙ্গাল, এবং তৃণ অপেক্ষাও নিজকে লঘু মনে করিতে লাগিলেন। জাত্যভিমান, কুলাভিমান প্রভৃতি সমস্ত অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া, সকলকে নমস্য ও পূজার্হ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তত্রাবস্থায় তিনি যদি হরিনামের প্রকৃত অধিকারী না হন, তবে আর কে হইতে পারে?

অন্নদাচরণের দুঃখ-দুর্দ্দিনাচ্ছন্ন হৃদয়ে অল্পে অল্পে সুধাংশুর সুধাময় কিরণজাল নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি ক্রমে ক্রমে সাংসারিক সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া চিত্ত পরিশুদ্ধি কামনায়, গুরুর উপদেশ ক্রমে, কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। সাধারণের শ্রদ্ধাদত্ত মুষ্টিমেয় অন্নই তাঁহার এক মাত্র জীবনোপায় হইল। বেদ-বিহিত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠানে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য কাল অতিবাহিত হইত। সম্বৎসরস্থায়ী ব্রহ্মচর্য্যের অবসানে, বাঞ্ছিত ফলের প্রত্যাশায়, অন্নদাচরণ ৺ কাশীধামে যাত্রা করিলেন। তথায় কোনও মহাপুরুষের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া কোনও গিরিগহ্বরে মহাসাধনায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার চিত্ত সংযম ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পরীক্ষার্থ নানা প্রকার পাপময় প্রলোভন প্রদর্শিত হইল, তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে ধ্যান নিমগ্ন রহিয়া ভীষণ অগ্নিময়ী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

"বেকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে।
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ॥

যোগী অন্নদাচরণ মহাকবি কালিদাসের এই মহাবাক্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইলেন। পার্ব্বতীয় দংশ ও মশকগণের দংশন, বৃশ্চিক ও মূষিকগণের উপদ্রব এবং দীর্ঘকাল অনশন, ইহার কিছুতেই যোগী অন্নদাচরণের মহাযোগ ভঙ্গ করিতে পারিল না।

"আত্মেশ্বরাণাম নহি জাতু বিঘ্না,
সমাধি ভঙ্গ প্রভবো ভবন্তি"

এই বাক্যের চরম সত্যতা, যোগী অন্নদাচরণের মহাযোগে অধিকতর পরিস্ফুট হইল। অন্নদাচরণ, ঈদৃশ চিত্ত সংযম ও কর্ম্মসহিষ্ণুতায় গুরুর নিতান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, এবং ভগবানের কৃপায় কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি নানা প্রকার যোগ-কৌশল শিক্ষা করিয়া, গুরুর উপদেশ ক্রমে, স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময়েই গুরু তাঁহাকে "রামানন্দ" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। জন্মান্তরীন সুকৃত ফলে অন্নদাচরণ, অতি অল্প দিনের মধ্যেই, বাঞ্ছিত ফল লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

সাড়ে আট আনী জমীদার বংশের পূর্ব্ব পুরুষ প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক ৺ কৃষ্ণরাম চক্রবর্ত্তীর তপোমন্দিরের ভগ্নাবশেষ প্রকাণ্ড অশ্বত্থ-পাদপ-গ্রস্ত ও নানাবিধ গুল্ম লতা সমাচ্ছন্ন ছিল। অন্নদাচরণ, স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া,বহু পরিশ্রমে সেই পবিত্র স্থান পরিষ্কৃত করিলেন, এবং অশ্বত্থ মূলে একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তথায় স্বকীয় নৈশ সাধনার স্থান নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি দিবা যোগে, প্রায়ই প্রখর মার্ত্তণ্ড-কর-সন্তপ্ত-প্রান্তরে কখনও বা জল মধ্যে বসিয়া মহাযোগে নিমগ্ন হইতেন। নিদাঘের ভীষণ সন্তাপ, বর্ষার বারিধারা কিম্বা শীতের প্রবল আক্রমণ, ইহার কিছু-তেই অন্নদাচরণের যোগ ভঙ্গ করিতে পারে নাই।

"যংহি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে, পুরুষং পুরুষর্ষভ,
সম দুঃখ সুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে।

অন্নদাচরণ, আজ দ্বন্দ্বাতীত, সুখদুঃখ তাঁহার সমান এবং তিনি সংযত-চিত্ত ও ধীরভাবে মহা সাধনায় নিমগ্ন, ভগবদ্গীতার বাক্যানুসারে তিনি যে মোক্ষলাভের সম্পূর্ণ উপযোগী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অত্রাবস্থায় রামানন্দের আচার ব্যবহার বা খাদ্যাদির বিশেষ কোনও নিয়ম ছিল না, কিম্বা কোনও জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যেও আবদ্ধ ছিল না, যজ্ঞসূত্রও যথাবিধি বহন করিতেন না। সাধারণে তাঁহাকে শাক্ত বলিয়া জানিত, কিন্তু তাঁহার সাধনা প্রথমে তন্ত্র বিহিত পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদিত হই-লেও পরে তন্ত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া-ছিল, সমস্ত ধর্ম্মেই তাঁহার সমানুরাগ দৃষ্ট হইত। কখন বা 'আল্লাহ' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন। আবার কোনও সময়ে বা যীশুর নামে উন্মত্ত হইতেন। তিনি নানা সম্প্রদায়ের নানা প্রকার সঙ্গীতেই আনন্দিত হইতেন। নিজে কোনও গানই সম্পূর্ণ রূপে গাহিতে বা সুস্থ চিত্তে শ্রবণ করিতে পারিতেন না, ভগ-বৎসঙ্গীতে তিনি প্রায়ই আত্মহারা হইয়া মহাভাবে নিমগ্ন হইতেন, এই পদ কয়েটী তাঁহার মুখে প্রায়ই পরিশ্রুত হইত—

"ধর্ত্তে পাল্লেনা পাগলের বুলি,
বৃথা কেন পাগল হলি"
"ভেবে মরি কি সম্পর্ক তোমার সনে
তত্ত্ব তার না পাই বেদ পুরাণে"
ইত্যাদি।

অন্নদাচরণ, প্রতিদিন, সায়ংকালে তাঁহার সেই নৈশ সাধনা স্থানের সংলগ্ন শীতলাতলায় নানাবিধ স্তোত্র পাঠ করিতেন, এবং ধর্ম্ম বিষয়ক নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করি-তেন। তথায় গ্রামবাসী বহু লোক সমবেত লইয়া, তাহার উপদেশ শ্রবণ করিত। তিনি বলিতেন "এই সংসার ভগবানের রঙ্গালয়, জীব মাত্র তাহার অভিনেতা, তিনি যে ভাবে যাহাকে সাজাইয়াছেন, সে সেই ভাবে সাজিয়াছে। তুমি, আমি, নিজের প্রতি কর্ত্তৃত্ব চাপাইয়া কেবল দুঃখের ভার বহন করিয়া থাকি। তাঁহার রাজ্য,কার্য্যও তাঁহার, তুমি আমি "আমার আমার" বলিতে কে? সকলেই এক মহাজননীর সন্তান, সকলেই পরস্পর ভ্রাতৃভাবে সম্পর্কিত, বৃথা কেন দ্বেষ, অভিমান ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া জন-নীর আদেশ লঙ্ঘন কর? নীচ বলিয়া কাহা-কেও অবজ্ঞা করা মহাপাপ, সংসারে কেহই নীচ নয়, সকলেই এক মাতার গর্ভজাত। স্ত্রী জাতির প্রতি, কখনও অন্যায় বা অবি-চার করিও না। উহারা মা, এবং দয়া, দাক্ষিণ্য ও বাৎসল্য প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি। জগ-জ্জননী মহাশক্তির পূততম অংশ, যে স্থানে

স্ত্রী জাতি লাঞ্ছিত বা নিগৃহীত হয়, সে স্থান মহাশ্মশান, সেখানে সুখ বা শান্তির কুসুম কখনও প্রস্ফুটিত হয় না। বৎসভাব অবলম্বন কর, শিং উঠিয়া থাকে, উহা ভাঙ্গিয়া বাছুর হও, "মা, মা", বা হাম্বারবে আকুল প্রাণে ডাকিতে থাক, অবশ্যই মায়ের সাক্ষাৎ পাইবে। মা শব্দ সাধনার সার। মা বলিয়া আকুল প্রাণে রোদন ব্যতীত অন্য সাধনা নাই, মন্ত্র নাই, যাগ, যজ্ঞ, জপ, তপ কিছুই নাই। ধ্যান ধারণা যাহা কিছু বল, সকলই 'মা', পাপ পুণ্য, সত্য মিথ্যা, সুখ দুঃখ প্রভৃতি মায়ের পবিত্র পদে উৎসর্গ করিয়া দাও, তাঁহার রাজ্য, তাঁহার কার্য্য, পলকের জন্যেও একথা বিস্মৃত হইও না।

আপিঙ্গল জটাজুটধারী, বিভূতি-বিভূষিত-গাত্র, কৌপীন-পরিহিত, শালপ্রাংশু যোগী রামানন্দ, যে সময়ে অভ্রভেদী ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া ভক্তি গদগদ কণ্ঠে উপদেশ প্রদান করিতেন, সে সময়ে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের হৃদয়ে কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় মধুর ভাবের আবির্ভাব হইত। অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামবাসী অনেক লোকের শুষ্ক হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল, বৃথা পরনিন্দা ও কুকথার প্রসঙ্গ ছাড়িয়া অনেকেই সৎপথে ও সাধুভাবে চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহা বেশী দিন স্থায়ী হইল না,—অন্নদাচরণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা স্মৃতি মাত্রে পর্য্যবসিত হইল।

মদনপাঁড়ে ও তৎনিকটবর্ত্তী গ্রামে চৈত্র মাসে বিসূচিকা (কলেরা) রোগের আবির্ভাব হইল, বহুলোক কালগ্রাসে নিপতিত হইল, গ্রামের সর্ব্বত্রই হাহাকার, সকলের প্রাণেই নিরতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইল। গ্রামের বহির্ভাগে প্রায় সর্ব্বদাই শ্মশানানল প্রজ্বলিত থাকিত, সকল ঘরেই রোগী, কেহ কাহারও খবর লইতে অবকাশ পায় না, এই দুর্দ্দিনে যোগী রামানন্দ প্রত্যেক ঘরে গিয়া, রোগীগণের শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনশন, রাত্রিজাগরণ এবং গুরুতর পরিশ্রমেও অন্নদাচরণের নৈসর্গিক প্রীতিপ্রফুল্ল মুখমণ্ডলে অবসাদের লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই, তিনি স্বর্গীয় দূতের ন্যায়, বা ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত সর্ব্বত্র সমভাবে ও জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে রোগীর শুশ্রূষা করিয়া বেড়াইতে এবং দলবল সহ নগরকীর্ত্তন করিয়া নৈশভীতি বিদূরিত করিতে লাগিলেন। দুর্দ্দিনের বন্ধু, যোগী রামানন্দ প্রায় পক্ষাধিক কাল যাবৎ অদম্য উৎসাহ সহকারে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করতঃ যেরূপ কঠোর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহা স্মৃতিগোচর হইলেও বিস্ময়ে শরীর রোমাঞ্চিত ও ভক্তিরসে হৃদয় অভিষিক্ত হইতে থাকে।

কয়েক মাস পরে ৮ অন্নদাচরণ আবার তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন এবং পুত্রমুখ দর্শন পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার সাংসারিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে গুরুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেন। কয়েক মাস পরে সন্ন্যাসিবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্নদাচরণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

বৈরাগ্য-সঞ্চারের পূর্ব্বে অন্নদাচরণের একমাত্র শিশু পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল। কেহ কেহ এই ঘটনাও তাঁহার সংসার বৈরাগ্যের অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সে যাহা হউক, অন্নদাচরণ পুনর্ব্বার পুত্রলাভ পর্য্যন্ত, সাংসারিক ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। এ সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, জ্বর ও উদরাময়ে নিতান্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। সুতরাং বাহ্যিক সাধনাদি প্রায় পরিত্যক্ত

হইয়াছিল। তাঁহার ঈদৃশ ভাবে, নিন্দুক সম্প্রদায়ের মুখ প্রসন্ন হইল, তাঁহারা প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে, অন্নদাচরণের নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। তিনি নিন্দুকগণের তাদৃশ বাক্য, বিকারগ্রস্ত রোগী বা বাতুলের প্রলাপের স্থায় মনে করিতেন। প্রায় এক বৎসর গত হইল, ভগবানের কৃপায়, অন্নদাচরণের একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। অন্নদাচরণের হৃদয় আবার আকুল হইয়া উঠিল, অপত্য-স্নেহে তাহার উন্মুক্তহৃদয় আবদ্ধ হইল না, যে বিহঙ্গ পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া একবার আকাশে উত্তীর্ণ হইয়াছে, সে কি কখনও আবার পিঞ্জর প্রবিষ্ট হইয়া থাকে? পবিত্র মলয় মারুতে যাঁহার হৃদয় সুশীতল হইয়াছে, সে বৃথা তালবৃন্ত সঞ্চালন করিবে কেন? পূততম মন্দাকিনী সলিলে যাঁহার পিপাসার শান্তি হইয়াছে, কূপজলে কি তাহার পরিতৃপ্তির সম্ভব? প্রফুল্ল-পঙ্কজানুরক্ত ভ্রমর কি কখনও গন্ধহীন কিংশুকে সন্তুষ্ট হইতে পারে? সেই নিত্য সত্য বিশুদ্ধ আনন্দলাভের জন্য যে লালায়িত, আপাত মধুর পরিণামে বিষসদৃশ সাংসারিক ভোগসুখে সে আবদ্ধ থাকিবে কেন? তাই যোগী অন্নদাচরণ আবার সংসার ছাড়িয়া বহির্গত হইলেন, আত্মীয়-স্বজনগণ হাহাকার করিতে লাগিল, কিছুতেই তিনি বিরত হইলেন না, কয়েক মাস কাটিয়া গেল। ১২৯৭ সালের আষাঢ় মাসে, আসামের অন্তর্গত ভবানীপুর হইতে পোষ্টকার্ডে সংবাদ আসিল যে, অন্নদাচরণ, ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়গণ এ সংবাদে আপাতত বিশ্বাস করিলেন না। তথায় বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া তত্ত্ব জানিলেন, কিন্তু এই সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে কোনও সংশয় রহিল না। কয়েক মাস পরে এইরূপ একটী কিম্বদন্তী শ্রুতিগোচর হইল যে, অন্নদাচরণ মরেন নাই, তিনি কামাখ্যার নিকটবর্ত্তী কোনও পর্ব্বতগুহায় যোগে নিমগ্ন রহিয়াছেন। কতিপয় যাত্রিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু এ সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বিভূতি-ভূষিতাঙ্গ ত্রিপুণ্ড্রধারী বহুযোগী আমাদের নেত্রগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু অন্নদাচরণের মত ভক্তিপ্রবণ, মধুর ভাবাপন্ন, বিশ্বপ্রেমিক সাধু প্রায়ই দর্শন করি নাই। ঈদৃশ মহাপুরুষের স্মৃতি যাহাতে বিলুপ্ত না হইয়া যায়, তাঁহার বংশধর ও আত্মীয় স্বজনের তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য॥*

শ্রীঅনঙ্গমোহন কাব্যতীর্থ।

আত্মরক্ষা।

বোধ হয় সকল জীবেরই, বিশেষতঃ উচ্চ-শ্রেণীস্থ জীব মাত্রেরই আত্মরক্ষা বৃত্তি আছে। অদ্য এই বৃত্তির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সম্ভবতঃ উদ্ভিদই এই পৃথিবীর আদিম অধিবাসী। উহারা ধরাতলে বংশবৃদ্ধি করতঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল; এবং সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছিল। ইতি মধ্যে কোথা

* যোগী রামানন্দ স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা লেখক স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং কাশীধামের ক্রিয়া কলাপের কথা রামানন্দ নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। (লেখক)

হইতে জন্তু অসিয়া উপস্থিত হইল। জন্তুগণ আসিয়া উহাদিগের মূল, কাণ্ড, ফল, পত্র সকলই আহার করিতে আরম্ভ করিল। প্রাথমিক জন্তুগণ উহাদিগের বিশেষ অনিষ্ট করে নাই। পরে জন্তুগণ যখন বংশ পর-ম্পরায় ধরাতল ছাইয়া ফেলিল, তখন ক্রমেই উদ্ভিদের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিল। ক্রমে উহারা উদ্ভিদের সকলই খাইতে আরম্ভ করিল। কেবল তাহাই নহে, কাজে অ-কাজে উহাদিগকে কাটিয়া ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া—নানাবিধ রূপে উৎপীড়িত করিয়া তুলিল। এরূপ অবস্থায় উদ্ভিদের আত্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিত; উহারা আগন্তুক জন্তুগণের অত্যাচারে নির্ব্বংশ হইয়া যাইত, ধরাতলে উহাদিগের নাম মাত্রও থাকিত না। কিন্তু বিধাতার বিস্তীর্ণ জগতে উহা-দিগের আবশ্যকতা আছে। তাই উহারা বিনষ্ট হইবে কেন?

উহাদিগের আত্মরক্ষা বৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। জন্তুর অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করা আবশ্যক হইল। যেখানেই আত্মরক্ষার চেষ্টা, তাহার মূলে অল্পাধিক অত্যাচার থাকিবেই। অপরে অত্যাচার না করিলে জীবের আত্মরক্ষা করিবার প্রবৃত্তি বিশেষ রূপে জাগ্রত হয় না। তাই সে আত্মশক্তি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতেও পায় না; আপনাকে পূর্ণ মাত্রায় চিনিতে পায় না। আর আপ-নাকে চিনিতে না পারিলে জীবের মুক্তি নাই, বন্ধচ্ছেদ অসম্ভব। "তজ্জলানিতি" * যাহাতে উদ্ভব, আবার তাহাতেই লয়। জীব ব্রহ্মে লীন হইবে। সুতরাং আপনাকে চিনিবেই। আত্মানং বিদ্ধি * এই মহো-পদেশ সফল হইবেই। সকল জীবই আপ-নাকে চিনিবে, বদ্ধমুক্ত হইবে; দু'দিন অগ্রপশ্চাৎ, এই মাত্র প্রভেদ।

আপনাকে প্রকৃত রূপে চিনিবার প্রধান—বোধ হয় এক মাত্র আত্মরক্ষা বৃত্তি। সকল জীবেরই আত্মরক্ষাবৃত্তির ইহাই মূল।

উদ্ভিদ যখন বুঝিল, সে জন্তুগণ কর্ত্তৃক অশেষ প্রকারে নির্ম্মূল হইতে চলিল, তখন সে কি করিল? আত্মরক্ষার নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল, কেহবা কণ্টকাবৃত হইতে লাগিল; কেহ বা তিক্তরস উৎপাদন করিল, কেহ বিষ প্রস্তুত করিয়া তুলিল। এইরূপে বিবিধ উপায়ে উহারা আত্মরক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। বিবর্ত্তনবাদিগণ জীবকোষের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন স্বীকার করেন। জীবকোষ, তাঁহাদিগের মতে চিরা-তীত কাল হইতে স্বভাবতঃই অল্পাধিক পরি-বর্ত্তিত হইতেছে। এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে যাহা অবস্থানুসারে উপকারজনক, তাহাই বংশানুক্রমে রক্ষিত হয়; অন্যবিধ পরিবর্ত্তন রক্ষিত হয় না। যে জীব, অবস্থার উপযোগী পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইল, সে বংশবৃদ্ধি করতঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িল; আর যে জীব, ঐরূপ পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইলনা, সে ক্রমে ক্রমে জীবন-ব্যাপারের অনুপযোগী হইয়া পড়িল; অবশেষে মরিয়া নির্ম্মূল হইয়া গেল। সংক্ষে-পতঃ ইহাই বিবর্ত্তনবাদ। এই বাদ অনু-সারে দেখা যাইতেছে যে, উদ্ভিদদিগের মধ্যে যাহারা জন্তু হইতে আত্মরক্ষার উপযোগী-রূপে পরিবর্ত্তিত হইল এবং দেশকালের যোগ্য হইল, তাহারাই জীবিত থাকিয়া বংশ বিস্তার করিতেছে; যাহারা তদ্রূপ হইতে পারে নাই, তাহারা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে সকল উদ্ভিদের দেহ-কোষে তিক্তরস,

---
* ছান্দোগ্য।

অথবা বিষ, কিম্বা প্রদাহ উৎপাদক পদার্থ সঞ্চিত হইতে লাগিল, তাহাদিগকে জন্তুগণ আর উদরস্থ করিতে পারিল না। জন্তুগণের মধ্যে যাহারা অল্প বয়স্ক, অনভিজ্ঞ ও বিচার-হীন, তাহারা ঐরূপ উদ্ভিদ আহার করিয়া মরিতে আরম্ভ করিল, অথবা অন্য প্রকারে কষ্ট পাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া অপর জন্তুগণের শিক্ষা হইল। উহারা আর উদ্ভিদকে উৎপীড়িত করিতে সাহসী হইল না। তাই উদ্ভিদ নিরাপদে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইল। মিঠা বিষ, কুচিলা, মান, কচু, ওল, ব্যাঙ্গের ছাতা প্রভৃতি উদ্ভিদ বিষ, অথবা বিষবৎ পদার্থ উৎপন্ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে। ইহারা অতি নিরীহ ছিল; এখনও মান, কচু, ওল, ব্যাঙ্গের ছাতা দিগের মধ্যে কোন কোন শ্রেণীস্থ উদ্ভিদ নিরীহই আছে। তাহারা বিষ প্রস্তুত করিতে শিক্ষাই করে নাই; সুতরাং জন্তুগণ তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিতেছে। উদ্ভিদের শিশুদিগকেই অধিক উৎপীড়ন করে, তাহাদিগকেই অধিক ভক্ষণ করে। আর তাহারাই আত্মরক্ষার নিমিত্ত বিষ, অথবা বিষবৎ পদার্থ অধিক প্রস্তুতঃ করত নিজের এবং অপরের রক্ষা বিধান করে। উদ্ভিদ শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে, অর্থাৎ বংশবৃদ্ধি করিবার উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইলেই এই সকল মারাত্মক পদার্থ সঞ্চয় করতঃ আত্মরক্ষা করিতে উন্মত হয়। * অধিকাংশ উদ্ভিদই পত্রে, ফলে অথবা অন্য প্রকাশ্য স্থানে এই সকল পদার্থ সঞ্চয় করে; কিন্তু আলু, ওল প্রভৃতি নিরীহ ও উপকারী উদ্ভিদ সকল নিভৃতে মাটীর নীচে বিষবৎ পদার্থ সঞ্চয় করতঃ তদ্দ্বারা বংশবৃদ্ধি সাধন ও আত্মরক্ষা, উভয় কার্য্যই করে।

কিন্তু উদ্ভিদের ও ইতর জন্তুগণের দৈহিক পরিবর্ত্তন দ্বারাই আত্মরক্ষা সিদ্ধ হয়। উচ্চ শ্রেণীস্থ জন্তুগণ দৈহিক ও মানসিক, উভয় বিধ পরিবর্ত্তন দ্বারাই আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। উদ্ভিদের দেহ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী না হইলে উহারা জীবিত থাকিতেই পারে না; ইতর জন্তুদিগেরও তাহাই। বিছা, বোল্‌তা, মধুমাছি, মাকোড়সা, সর্প প্রভৃতি জন্তুগণ নানাবিধ বিষ অথবা বিষবৎ পদার্থ দেহ মধ্যে উৎপন্ন করে, তদ্দ্বারাই তাহাদিগের আত্মরক্ষা হয়। ইহাদিগের মধ্যে কোন শ্রেণীস্থ জীব, নিরীহ; তাহাদিগকে অপরে মারিয়া ফেলে। কিন্তু কোন কোন শ্রেণী বিষযুক্ত, তাহাদিগকে অপরে সহজে কিছুই করিতে পারে না। এমন যে বিষধর সর্প, তাহারাও সহজে এবং সকলে বিষ সঞ্চয় করে নাই। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই বিষহীন; কিন্তু তাহারাও বিষযুক্ত সর্পের জ্ঞাতি বিধায় অত্যাচারের হস্ত হইতে প্রায় নিরাপদ হইয়াছে। ইহাদিগের প্রথমে বিষ ছিল না বলিয়াই অনুমান হয়; পরে ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন শ্রেণীতে বিষ-পদার্থ জাত হইলে তাহাদিগের আত্মরক্ষার অধিক সম্ভাবনা হইয়াছে। মানবের প্রায় নিকটবর্ত্তী জন্তু বানর; সে বুদ্ধিবৃত্তিতে অপরাপর জন্তু হইতে উন্নত। সুতরাং সে অস্ত্র ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিয়াছে। অন্যের দৈহিক পরিবর্ত্তনই আত্মরক্ষার একমাত্র সম্বল; কিন্তু ইহারা যে পরিমাণে হীন

* These objectionable substances are found most abundant in adult plants, so that they must have reference to flowering and seeding. * * They also indicate that such poisonous defences have been acquired. Cattle often partake of objectionable young plants.—Sagacity and Morality of plants, p 122.

বীর্য্য হইয়াছে, সেই পরিমাণেই অস্ত্র ব্যবহারে পটু হইতেছে। ঢিল, লাঠী, বৃক্ষশাখা প্রভৃতি অস্ত্র সাহায্যে ইহারা আত্মরক্ষা করিয়া থাকে।

কিন্তু উদ্ভিদের ও জন্তুর আত্মরক্ষা বৃত্তির মূল কারণ এক নহে। উদ্ভিদ প্রথমতঃ অত্যাচার ও উৎপীড়ন নিবারণ নিমিত্তই আত্মরক্ষার উপযোগী হইয়াছে। কিন্তু জন্তুগণ ক্ষুধার তাড়নায় বিষ অথবা বিষবৎ পদার্থ প্রথমে সঞ্চয় করে; পরে তাহা আত্মরক্ষা কার্য্যে ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিয়াছে। সর্প সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, ইহারা শিকার পাইলে দংশন করতঃ তাহাদিগকে অজ্ঞান ও নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলে; পরে অবসর মত ভক্ষণ করে। অজ্ঞান করিবার উপায় বিষ প্রয়োগ। উহারা আহারের নিমিত্তই চেষ্টিত হয়, পরে আত্মরক্ষার আবশ্যক হইলে তদ্রূপ কার্য্যে বিষ ব্যবহার করে।* উদ্ভিদের আত্মরক্ষার মূল প্রবর্ত্তক কারণ, অত্যাচার; জন্তুগণের ক্ষুন্নিবৃত্তি।

যখন আহারের অনাটন উপস্থিত হয়, তখন জন্তুগণ আহারের চেষ্টা করে। আহার দুষ্প্রাপ্য হইলে অথবা অন্য কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে উহারা মরিয়া যাইবে। এইরূপ সংকটে আত্মরক্ষার বৃত্তির পরিচালন করিতে বাধ্য হইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় জন্তুগণ বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োগ করে। উহাদিগের মধ্যে যাহারা অল্পবুদ্ধি, তাহারা স্বভাবজ দৈহিক পরিবর্ত্তনের সাহায্যেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে; আর যাহারা বুদ্ধিবৃত্তিতে উন্নত, তাহারা নানারূপ কৌশলে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। কেহ প্রকাশ্যে, কেহ বা অপ্রকাশ্যে এইরূপ করিবেই। কার্য্য মাত্রেরই কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। এক জীব অপর জীবকে বধ করা স্বাভাবিক ক্রিয়া নহে। আক্রমণ আত্মরক্ষার উপায় মাত্র। আত্মরক্ষা-বৃত্তির কারণ কি? অপরের অত্যাচার অথবা ক্ষুন্নিবৃত্তি। আক্রমণের কারণ কি? অত্যাচার অথবা ক্ষুন্নিবৃত্তি। সুতরাং মূলতঃ ইহাদিগকেই কারণ বলিতে হয়।

উদ্ভিদ এবং ইতর জন্তুর পর এক্ষণে মানবের কথা সংক্ষেপে বিবেচনা করা আবশ্যক। জীবতত্ত্বের আলোচনায় ঐ সকলকে এবং মানবকে এক চক্ষুতেই দেখিতে হয়। মানব উক্ত তিন কারণকে একত্রিত করিয়া লইয়াছে। মানবের আত্মরক্ষা বৃত্তির মূলে অত্যাচার ও ক্ষুন্নিবৃত্তি, দুই-ই আছে। যখন অন্য জন্তু অথবা অপর মানব কর্ত্তৃক ইহারা উৎপীড়িত হয়, এবং বিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার আর কোন উপায় দেখিতে সক্ষম হয় না, তখন মানব বুদ্ধিবলে অস্ত্র উদ্ভাবন করতঃ আত্মরক্ষা করে। মানবের দৈহিক পরিবর্ত্তনে আত্মরক্ষার বিশেষ সুবিধা নাই; তাই, বুদ্ধির আশ্রয় লইতে হয়। মানব প্রধানতঃ অথবা সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিবলেই আত্মরক্ষা করে। তাহাতে অপর জন্তু অথবা অন্য মানবকে সময় সময় আক্রমণ ও বধ করা আবশ্যক হয়। ইহা দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। মানুষে মানুষ বধ করে, দয়াময়ের রাজ্যে ইহা অপেক্ষা নিষ্ঠুর কর্ম্ম আর নাই। কিন্তু মানব এখনও উচ্চ শ্রেণীস্থ জন্তু মাত্র; তাহার উপরে উঠিতে এখনও সক্ষম নাই। সুতরাং এ অবস্থায় এই সকল হৃদয়বিদারক ঘটনা অত্যাচারের সঙ্গী রূপে বর্ত্ত-

* The primary function of poison apparatus in the economy of snakes is without doubt to serve as the means of procuring their food. But like the weapons of other carnivorous animals, it has assumed the secondary function of an organ of defence. Ency. Brit. vol 22 p 191.

স্থান থাকিবেই। মানবকে এ নিমিত্ত দোষী করা যায় না। যদি কাহাকেও করা যায়, তবে সে অত্যাচারীকে। অত্যাচারই আক্রমণের মূল; আক্রমণ আত্মরক্ষার উপায় মাত্র। যেখানে অত্যাচার নাই, যেখানে ক্ষুন্নিবৃত্তির ইচ্ছা প্রবল নহে, সেখানে আত্মরক্ষা বৃত্তি, বিশেষতঃ আক্রমণ-স্পৃহা, বিশেষ ভাবে জাগ্রত হয় না।

কিন্তু মানব সমাজের নেতৃগণ এ জন্য সর্ব্বদাই অবহেলা করিতেছেন। সে তথ্য জীব মাত্রেই প্রযোজ্য, তাহা মানবসমাজের পক্ষে নেতৃগণ বিস্মৃত হইয়া যান। মানবকে চিনিতে হইলে জীবতত্ত্ব যেরূপ ভাবে অবগত হওয়া উচিত, প্রায় সর্ব্ব সমাজেই নেতৃগণ তাহা জানেন না। তাই পদে পদে ভ্রমে পতিত হইয়া সমাজকে পথভ্রষ্ট করেন। অধ্যাপক রে ল্যাঙ্কেষ্টার মানব সমাজের নেতৃগণের ব্যবহার দৃষ্টে ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি তাহাদিগকে 'মূর্খ, বেউকুফ্, কেরানির দাস' বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। * তিনি ইংলণ্ডীয় রাজ কর্ম্মচারিগণকেও ঐরূপ আখ্যা হইতে বাদ দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। যদি ইংলণ্ডের সম্বন্ধেই এই কথা সত্য হয়, তবে অন্যান্য দেশেও হইবে। এতদ্দেশে ত বিশেষরূপেই হইবে, কারণ এখানে ইংলণ্ডীয় উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকের রাজকীয় কর্ম্মে প্রায় অসদ্ভাব বলিলেই হয়। সকল দেশেই নেতৃগণ † জানেন না যে, অত্যাচারই আক্রমণের নিমিত্ত-কারণ। এই জ্ঞান থাকিলে আক্রমনকারীদিগকে দয়ার চক্ষে দেখিতেন; তাহা ত দেখেনই না, বরং তাহাদিগকে পদ-দলিত করিবার জন্য সতত চেষ্টা করেন। ইহাই মূর্খতা। বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ টম্‌সন্ বলিতেছেন, Are not criminals mere anachronisms, people out of time or out of place, who require not incarceration or worse, but only transplanting. ‡ Transplanting শব্দে উত্তম সংসর্গ যুক্ত দেশ ও কালকে লক্ষ্য করে। তিনি অন্যত্র ইহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দিতেছেন। আক্রমণকারিগণকে ক্ষমা করা অসম্ভব হইলে, অন্ততঃ তাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করা উচিত। ¶ ইহারা কে? ইহারা অত্যচার হইতে আত্মরক্ষা-প্রয়াসী। যে বৃত্তি সমস্ত জীবমণ্ডলীতে ক্রিয়া করিতেছে, ইহারা তদ্দারাই অনুপ্রাণিত। ইহারা উপায় বিষয়ে কখন কখন ভ্রমে পতিত হয়, সন্দেহ নাই, মনুষ্য মাত্রেই ভ্রমের আধার। কিন্তু ইহারা কৃপার পাত্র। যে অত্যাচার হইতে জীব আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত আক্রমণ অবলম্বন করে, তাহাই সংযত করা বিজ্ঞানানুমোদিত। কিন্তু যত দিন অধ্যাপক ল্যাঙ্কেষ্টারের উক্তি সত্য থাকিবে, ততদিন নেতৃগণ তাহা বুঝিবেন না।

যোগ্যতমের জয়—এই বিধি আত্মরক্ষায় জনক। আত্মরক্ষা বৃত্তিই জীবকে উত্তরোত্তর উন্নত করিয়াছে; নচেৎ জীব এতদিন

* A body of clerks without any pretence to an education in the knowledge of nature, headed by gentlemen of title equally ignorant. Kingdom of Man p 48.

† যাঁহারা রাজ্য পরিপালন করেন, তাঁহাদিগকেই এই শব্দে অভিহিত করিতেছি।

‡ Heredity p 531.

¶ যাহাকে Reactionary কিম্বা "of the restless type" বলা হয়, if he cannot be pardoned when we know all, can at least be better dealt with the better he is understood. Ibid p 524.

ধরাতলে থাকিতেই পারিত না। এই বৃত্তি বিবিধ সদ্‌গুণের আধার। ইহা হইতেই সমাজ ও সামাজিক ধর্ম্ম উদ্ভব হইয়াছে। পরস্পরের রক্ষার নিমিত্তেই জীব সমাজবদ্ধ হয়; এবং তাহা হইতেই সমাজ ধর্ম্মের আবির্ভাব। এই সামাজিক বৃত্তি যিনি দলিত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি জীবের শত্রু। এই বৃত্তিই জীবকে উত্তরোত্তর দেব ভাবে পূর্ণ করিবে; ইহাই জীবের মুক্তির কারণ, বন্ধ-চ্ছেদের উপায়। নেতৃগণ যত শীঘ্র এই তথ্য হৃদয়ঙ্গম করেন, ততই জগতের মঙ্গল, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

শ্রীশশধর রায়।

মহর্ষি সুদাসের যুদ্ধ-যাত্রা।

[ঋগ্বেদ ৭।১৩৩।১—৭]*

সুদাস—

যাঁহার পূজ্য পুণ্য প্রতাপ রণপুরোভাগে বিদ্যমান,
যাঁহার অমোঘ শক্তি প্রভাবে শত্রুর ব্যূহ ভিদ্যমান,
যাঁহার প্রসাদে উপজে সমরে দৃপ্ত হৃদয়ে অমর বল,—
স্বয়ং ইন্দ্র সৈন্যশীর্ষে,—চল, মথি গিয়া শত্রুদল!
বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ভক্তি, তীক্ষ্ণ সায়কে পূর্ণ তূণ,—

সৈন্যগণ—

ছিন্ন হউক্ কুশ্রী অরির ঘৃণ্য তুচ্ছ ধনুর্গুণ! (১)

সুদাস—

দেবতা ইন্দ্র! মেঘের বক্ষ বজ্রে বিদারি, ঝরায়ে জল,
বহায়েছ নদী নিম্নগামিনী, উর্ব্বর বাহে এ মহীতল,
ধরণীর যত বরণীয় ধন তোমারি কৃপায় বৃদ্ধি পায়,
ঋদ্ধির মম তুমিই জনক,সাধ্য কাহার হরিবে তায়?
তোমারি চরণ বক্ষে ধরিয়ে চলিনু সমরে হৃষ্ট মন,—

সৈন্যগণ—

কুৎসিত-ধনু-সমেত ছিন্ন হউক্ ঘৃণ্য শত্রুগণ! (২)

সুদাস—

দেবতা ইন্দ্র! তোমারি ইচ্ছা হউক্ মোদের ধ্রুব নিশান,
করুক্ মোদের চিত্ত তোমারে অবিরত-ধারে ভক্তিমান,
ঈপ্সিত বর মোদের শীর্ষে বর্ষুক তব উদার কর,
অস্ত্রদীপ্ত হস্ত তোমার হানুক্ মৃত্যু অরাতি'পর,—
হানুক মৃত্যু শত্রুর মাথে, আমাদিগে যারা বধিতে চায়,

সৈন্যগণ—

ছিন্ন হউক্ ঘৃণ্য অরির কুৎসিত ধনু, কুশ্রী কায়! (৩)

সুদাস—

দেবতা ইন্দ্র! দুর্ম্মতি যত বৃকের সদৃশ দস্যুগণ,
ঘেরি চারিধার বরষে অস্ত্র মোদের নিধনে ব্যগ্র মন,
নিক্ষেপ কর সুদাস-সেনার চরণের তলে তাদের শির,
বিশ্বে রোধে তোমার শাসন কে আছে এহেন শত্রুবীর?
অদ্ভুত তব শক্তির কাছে পরাভূত যত অরাতিদল,—

সৈন্যগণ—

ছিন্ন হউক্ ঘৃণ্য অরির কুৎসিত জ্যার পিন্ন বল! (৪)

সুদাস—

দেবতা ইন্দ্র! সমানজন্মা কি বা নিকৃষ্ট শত্রু আর,—
হোক্‌না বিশাল আকাশের সম তাহাদের সেনা সুবিস্তার,
মোদের বিনাশে যাহাদের আশা,ধ্বংস তাদের সুনিশ্চয়!
আমরা কি যুঝি সমর-ক্ষেত্রে? তোমারি যুদ্ধ, তোমারি জয়!
তোমারি শক্তি এ দৃঢ় বাহুতে, তোমারি প্রেরণা হৃদয়ে বল,—

সৈন্যগণ—

কুৎসিত-ধনু-সমেত ছিন্ন হোক্ নগণ্য শত্রুদল! (৫)

সুদাস—

দেবতা ইন্দ্র! সর্ব্বতোভাবে আমরা তোমারি; তুমিই সার,
সুখে বা বিপদে চরম বন্ধু, পরম দেবতা উপাসনার!
বিদূরিত কর সকল দুরিত, প্রার্থনা এই, এ মনোরথ,
যেন প্রাণান্তে কখন না ছাড়ি তব নিয়মের নিত্য পথ,
বিজয়-গর্ব্ব কখন না যেন ঋতের বাহিরে টলায় মন,

সৈন্যগণ—

হউক্ স-ধনু নিধন-প্রাপ্ত দুর্ম্মতি যত শত্রুগণ! (৬)

* অবিকল অনুবাদ নহে; যাহা সৈন্যগণের উক্তি করা হইয়াছে, তাহা মূলে সুদাসেরই উক্তি ছিল। শব্দার্থ প্রায়শঃ রক্ষিত হইলেও, ভাবার্থ লইয়া কবিতা-রচনারই প্রয়াসী হইয়াছি। সায়ণাচার্য্যের টীকার সহিত মিলাইয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। যদি কেহ দেখেন, কোন কোন স্থানে পার্থক্যের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। ভাবার্থের জন্য ৺ উমেশচন্দ্র বটব্যালের অনুবাদের সাহায্য লইয়াছি। ব, চ, মি।

সুদাস—

দেবতা ইন্দ্র! জয়লাভ সনে উপাসনা-কারী চায় এ বর,
দাও সে বিদ্যা ঋদ্ধি-সাধন যাহে লভে ধন শ্রেষ্ঠতর,—
আমার পালনে ধরিত্রী-ধেনু বিশাল-আপীন-শালিনী হোক্,
সহস্র-ধারে দুগ্ধ-ক্ষরণ প্রজা অজস্র করুক্ ভোগ!
অপাপবিদ্ধ রাজ্য আমার হউক্ মর্ত্তে অমর-ধাম,—

সৈন্যগণ—

পূর্ণ হউক্ সুদাসরাজার কল্যাণময় মনস্কাম! (৭)

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

নব সমাগম। (২)

এই সকল কথা বলা যত সহজ, কার্য্যে পরিণত করা তেমন নহে। বুঝিলাম, নব সমাগমের ফল অতীব শোচনীয়; কিন্তু চীনের ন্যায় সমস্ত দেশ প্রাচীর-বেষ্টিত করিয়া রাখিলেও ত দূরবর্ত্তী বিভিন্ন জাতীয় মানবগণের আগমন প্রতিরোধ করিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান যুগে মানবগণ দেশ দেশান্তরে গতায়াত করিবেই, ইহা নিবৃত্ত হইবার নহে। শিক্ষা, বাণিজ্য অথবা রাজ্যলোভ ইত্যাদি মানবকে ধরাতলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা কাহারও নিবারণ করিবার সাধ্য নাই। দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, আফগানস্থান, তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি দেশবাসিগণ অপর জাতীয় মানবকে স্ব স্ব দেশ মধ্যে প্রবেশাধিকার দিতেছেন না, সত্য। কিন্তু তাঁহারা দীর্ঘকাল ঐরূপ করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া বোধ হয় না। যদি প্রকৃতই তাঁহারা সক্ষম হন, তাহা হইলেও বহু আয়াস ব্যতীত কৃতকার্য্য হইবেন না। তাঁহারা স্বাধীন, তাঁহাদিগেরই যদি এত আয়াস-আবশ্যক হয়, তবে পরাধীন জাতিগণের সম্বন্ধে কি বলা যাইতে পারে? ইহারা নব সমাগম রোধ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। যতদিন ইহারা অপরের অধীন থাকিবে, ততদিন তাহাদিগের গতায়াত নিবারণ করিতে কখনই পারিবে না; সুতরাং নব সমাগমের বিষময় ফল হইতে সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করিবার কোনই উপায় ইহাদিগের নাই। তথাপি এরূপ স্থলেও আত্মরক্ষা একবারে অসম্ভব নহে। আমরা দেখিয়াছি, নব সমাগম-জনিত শোচনীয় পরিণামের মূল কারণ কি? মূল কারণ পীড়া ও জনন-হীনতা। ইহারা কিরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা এখনও বুঝা যায় নাই। কিন্তু ইহারা উপস্থিত হইলেই বুঝিতে হইবে যে, আক্রান্ত জাতির পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং বাঁচিতে চাহিলে ইহাদিগকে রোধ করিতে হইবে। পীড়া ও জনন-হীনতার কারণ সম্যক্‌রূপে আলোচিত হয় নাই; বিজ্ঞান এখনও এই বিষয় যথোচিত ভাবে অনুশীলন করিতে সমর্থ নহে। তথাপি ইহা একরূপ বুঝা যাইতে পারে যে, সংমিশ্রণই কোনরূপে ঐ কারণদ্বয়কে আনয়ন করে। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ হইতে পীড়ার উদ্ভব হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু ইহা হইতে কিরূপে জনন-হীনতা উৎপন্ন হয়, তাহা এখনও বুঝা যায় নাই। ডারুইন স্বয়ং ইহাকে mysterious অর্থাৎ অবোধগম্য বলিয়াছেন। যাহা হউক, সংমিশ্রণকেই

ইহাদিগের কারণ বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়। বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন।

যদি তাহাই হইল, যদি বিভিন্ন জাতীয় মানবের সংমিশ্রণই পীড়া ও জনন-হীনতার কারণ বলিয়া বিবেচিত হইল, যদি উহারাই জাতীয় বিলোপের অন্যতর কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তবে বিলোপের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায় চিন্তা করা কঠিন নহে। সংমিশ্রণ ত্যাগ কর, তাহা হইলেই কারণের অভাব হইল; সুতরাং কার্য্যোৎপত্তিও অসম্ভব। অপর জাতীয়ের সহিত সংমিশ্রণ ত্যাগ করিলেই পীড়া ও জনন-হীনতা নিবৃত্ত হইল; সুতরাং জাতীয় বিলোপও সিদ্ধ হইল না। নব সমাগম যে উপায়ে ধ্বংসক্রিয়া সাধন করে, সেই উপায় রহিত হইলেই ক্রিয়াও রহিত হইবে। কিন্তু বিভিন্ন জাতীয়গণের সমাগম হইবে, অথচ সংস্রব কিম্বা সংমিশ্রণ হইবে না,—ইহা কি সম্ভব? আমি বলি, সম্পূর্ণ সম্ভব না হইলেও ইচ্ছা থাকিলে একবারে অসম্ভব নহে।

নবাগতগণের সহিত সংস্রব প্রধানতঃ কি কি কারণে হইয়া থাকে? বাণিজ্য, দাস্য ও শিক্ষা। যদি নবাগতগণ রাজপদ লাভ করে, তাহা হইলে তদুপলক্ষেও আদিমবাসীদিগের সহিত সংস্রব হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত হেতু, অর্থাৎ বাণিজ্য, দাস্য ও শিক্ষা, সহজেই প্রতিরোধ করা যায়। ঐ সকল হেতুমূলক সংস্রব ত্যাগ করা কঠিন নহে। উহা জাতীয় ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে। জাতীয় ইচ্ছা হিতাহিত বিবেচনা দ্বারা নিয়মিত হয়। সুতরাং যথোপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা হিতাহিত-বোধ জাত হইলেই এই শ্রেণীর সংস্রব ত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইতে পারে। নব সমাগমের কু-ফল সকল হৃদয়ঙ্গম হইলে এ সংস্রব ত্যাগ করা কঠিন হয় না। ইহা নবাগতগণের প্রতি বিদ্বেষমূলক ভাব নহে। ইহা কেবল উক্ত কুফল হইতে আত্মরক্ষা মাত্র। কিন্তু যে সংস্রব রাজা-প্রজা সম্বন্ধ মূলক, তাহা ত্যাগ করা সহজ নহে; সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা অসম্ভব; অর্থাৎ যতদিন ঐ সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন অসম্ভব। তথাপি ঐ সম্বন্ধের অপলাপ না করিয়াও এ পক্ষে আংশিক চেষ্টা করা যাইতে পারে। তাহাতে রাজবিধি লঙ্ঘন করা আবশ্যক হয় না। সকল মানব সমাজের পক্ষেই এ কথা প্রযোজ্য; বিশেষতঃ সেরূপ সমাজে রাজা কেবল দেশরক্ষক মাত্র, তদ্রূপ সমাজে এ কথা বিশেষ ভাবে সত্য। এস্থলে আর্য্যজাতির কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। আর্য্যগণের রাজা বিধি প্রণয়নে অক্ষম। জন সাধারণের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যাবান ও বুদ্ধিমান, তাঁহারাই বিধিপ্রণেতা। রাজা প্রজা উভয়েই তাহা নতশিরে পালন করিতে বাধ্য। জাতীয় শিক্ষা ও বিদ্বৎমণ্ডলীর হস্তে, রাজার সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই। দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার ন্যায় গুরুতর কার্য্য ও আর্য্য জনসমাজের স্বায়ত্ত, রাজাকে তন্নিমিত্ত কোন প্রয়াস স্বীকার করিতে হয় না। দেশীয় সমাজে পরস্পরের মধ্যে শান্তিরক্ষার কার্য্যও দেশবাসিগণের; রাজকীয় সৈন্যগণের উপর সে ভার ন্যস্ত নহে। অর্থী প্রত্যর্থীদিগের বাদ প্রতিবাদের মীমাংসা করা যদিও বিধি অনুসারে রাজার কর্ত্তব্য, তথাপি ঐ কার্য্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দেশীয় প্রধানবর্গের হস্তেই ন্যস্ত। কারণ অসংখ্য বাদ-প্রতিবাদ মীমাংসা করা রাজার

সাধ্যাতীত। সর্ব্বকালেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সর্ব্বকালেই রাজকর্ম্মচারিগণ যে সংখ্যক বাদ প্রতিবাদ মীমাংসা করিয়া থাকেন, দেশীয় জনসাধারণ তাহার শত গুণ অধিক মীমাংসা করিয়া থাকেন। সুতরাং বিধি প্রণয়ন, শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্য ও শান্তিরক্ষা, মীমাংসা প্রভৃতি সকল কার্য্যই জনসাধারণের আয়ত্ত; রাজার তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই। ইহাই আর্য্য সমাজের রাজা-প্রজা সম্বন্ধের বিশেষত্ব। অপর সমাজের আদর্শ ভিন্ন রূপ। তাহাদিগের মধ্যে রাজাই সব; জনসাধারণের প্রায় কিছুই নহে। রাজ সম্মতি অথবা রাজাজ্ঞা না হইলে উল্লিখিত কোন কার্য্যই ঐ সকল সমাজে সিদ্ধ হয় না। কিন্তু আর্য্য সমাজে উহা প্রায় রাজার নিরপেক্ষ ভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাই যদি আর্য্য সমাজের আদর্শ হইল, তবে কর গ্রহণ ও দেশ রক্ষা, অর্থাৎ বিভিন্ন সমাজস্থ জনগণের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করা, —এই উভয় কার্য্যই রাজার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। অপরাপর কার্য্যের সহিত রাজার বিশেষ কোন সম্বন্ধ থাকিতেছে না। এই সনাতন আদর্শ অঙ্গীকার করিলে, রাজা প্রজা সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও অপরাপর বিষয়ে রাজ-সংশ্রব ত্যাগ করা অসম্ভব নহে। কেবল মাত্র কর প্রদান ও দেশ রক্ষার সহায়তা করিলেই প্রজাভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। তদ্ভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্ত কার্য্যই রাজার নিরপেক্ষ ভাবে অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে; এবং তদ্রূপ করাই সঙ্গত। নতুবা জনসাধারণ ক্রমে রাজপ্রত্যাশী হইতে হইতে স্বাবলম্বন শূন্য হইয়া অধঃপাতে যাইবার বিশেষ আশঙ্কা উপস্থিত হয়। এই হেতু নবাগতগণ রাজপদ প্রাপ্ত হইলেও আদিমবাসিগণ উল্লিখিত দ্বিবিধ প্রজার ধর্ম্ম পালন করিলেই যথেষ্ট হয়; অন্যান্য বিষয়ে তাহাদিগের সংশ্রব ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ কল্প। নবসমাগমের শোচনীয় ফল হইতে আত্মরক্ষা করিবার একমাত্র উপায়ই, সংশ্রব-ত্যাগ। সুতরাং যতদূর সম্ভব, নবাগতগণের সংশ্রব ত্যাগ করাই প্রশস্ত। ইহা রাজা প্রজা সম্বন্ধের বিরোধী নহে; ইহা বিদ্বেষমূলকও নহে; কর দান ও দেশ রক্ষার সহায়তা করিলেই প্রজাধর্ম্ম স্থির থাকিল; অন্য বিষয়ে সংশ্রব ত্যাগ করা কেবল জাতীয় বিলোপ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা মাত্র। সেই সকল বিষয় স্বায়ত্ত থাকিলেই যে রাজসংশ্রব ত্যাগ করা হইল, তাহা নহে; অপরের নিয়োগ মত অর্থাৎ জনসাধারণ ব্যতীত অন্যের বিধানানুসারে ঐ সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলেই সংশ্রব রহিয়া গেল। তাহা হইলেই আত্মরক্ষা হইল না। সুতরাং অন্যান্য কার্য্য জনসাধারণের নিয়োগানুসারে জনসাধারণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক; অথবা ঐ ভাবেই তাহাদিগের মধ্য হইতে নির্দ্দিষ্ট জনগণ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য।

এইরূপে বাণিজ্য দাও, (বৈতনিক হউক অথবা অবৈতনিক হউক) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শান্তিরক্ষা, মীমাংসা বিধি প্রণয়ন ইত্যাদি সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্য্যে নবাগতগণের সংশ্রব পরিত্যাগ করাই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়। নচেৎ পীড়া ও জননহীনত্ব হইতে, নিরুদ্যম ও অবসাদের গ্রাস হইতে, অবশেষে জাতীয় বিলোপের যমদণ্ড হইতে, আত্মরক্ষা করা অতীব অসম্ভব। নানা দেশীয়, নানা জাতীয় মানব সমাজ এই বৈজ্ঞানিক তথ্য যত শীঘ্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, ততই মঙ্গল। ইহাকে যে নাম দিতে হয় দাও; কিন্তু ইহা মানবের মঙ্গল বিধান, মানবের অনিষ্ট সাধন নহে।

শ্রীশশধর রায়।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ও চণ্ডীকাব্য। (১)

এই প্রাচীন কবি ও তাঁহার কাব্য লইয়া দেশী ও বিদেশী অনেকেই নাড়াচাড়া করিয়াছেন। তবে আবার স্বর্গীয় কবির আত্মাকে জ্বালাতন করিবার এ নূতন প্রয়াস কেন? উত্তর—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ ইত্যাদি দ্বারাই আমাদের জাতীয় সাহিত্য গঠিত হইয়াছে—তাঁহাদের কাব্য প্রত্যেক বঙ্গসন্তানের সম্পত্তি, প্রত্যেকেরই তাহা লইয়া একটু ঘাঁটাঘাঁটি করিবার অধিকার আছে। কবিকঙ্কণের কাব্য ও তাহা হইতে তাৎকালিক বঙ্গসমাজের অবস্থা আলোচনা করিতে গিয়া যদি পাঠককে কোন নূতন কথা বুঝাইতে পারি, কিম্বা তাঁহার মনে কোন নূতন কৌতূহল জন্মাইতে পারি, ভালই। না পারিলেও বিশেষ অপরাধী হইব বলিয়া মনে হয় না। এই কৈফিয়তে হয়ত অনেকে সন্তুষ্ট হইবেন না। না হইলে লেখক নাচার।

প্রাচীন অনেক বঙ্গকবিই স্বকৃত গ্রন্থে নিজের কিছু না কিছু পরিচয় দিয়া পরবর্ত্তী প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের পরিশ্রমের লাঘব করিয়া গিয়াছেন। কবিকঙ্কণের কাব্যেও তাঁহার আত্ম-পরিচয় আছে। বটতলার অনুগ্রহে কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় অনেক দিন লুক্কায়িত ছিল। ফুলিয়ার এই কুলীন ব্রাহ্মণের জাতি লইয়া এক সময়ে বিষম সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি "মুরারি ওঝার নাতি" এইটুকু মাত্র জানিয়া কেহ কেহ হয়ত মালবৈদ্যদিগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টায় ছিলেন। এখন বঙ্গের কৃতী সন্তানগণের চেষ্টায় তাঁহার আত্মবিবরণ অন্ধকারের গহ্বর হইতে বাহির হইয়াছে। এখন ঘটকঠাকুরগণের সাহায্যে আমরা সৃষ্টিকারক ব্রহ্মা হইতে তাঁহার বংশাবলীর তালিকা প্রস্তুত করিতে সমর্থ। কবিকঙ্কণকে কখন এতদূর দুর্ভাগ্যে পড়িতে হয় নাই। কিন্তু তিনি যে এই জাতীয় দুর্ভাগ্য একেবারে অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন, তাহাও নহে। প্রচলিত ছাপার চণ্ডীকাব্যে (আমরা প্রচলিত নিয়মানুসারে তাঁহার কাব্যকে "চণ্ডীকাব্যই" বলিলাম) তিনি "কুয়াড়ী কুলেতে জাত মহামিশ্র জগন্নাথ" এর পৌত্র এবং হৃদয় মিশ্রের পুত্র, এই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কবির হস্তলিখিত বলিয়া পরিচিত যে পুঁথি অল্প দিন হইল তাঁহার জন্মভূমি দামুন্যা গ্রাম হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে "কয়ড়ি কুলের রাজা সুকৃতী তপন ওঝা তস্য সুত উমাপতি নাম" ইত্যাদি আরও পূর্ব্ব পুরুষগণের উল্লেখ আছে। মুকুন্দরামের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান। সুতরাং তপন ওঝা হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তাঁহার একটী বংশ বিবরণ সহজেই সংগৃহীত হইয়াছে। কুয়ারী গাঁইএর আদি পুরুষ বাচস্পতি মিশ্রের উল্লিখিত জন হইতে তপন ওঝা পর্য্যন্ত একটী বংশ তালিকা সংগ্রহ ততটা সহজ নহে, কারণ মুকুন্দরাম কুলীন ছিলেন না। বঙ্গের ঘটকগণ কেবল কুলীনদিগেরই ধারাবাহিক বংশ

বিবরণ লিখিতেন। মুকুন্দরামের কুয়ারী বা কয়ড়া কুল শ্রোত্রিয়বংশীয় এবং কাশ্যপ গোত্রীয়। ইহা বিশুদ্ধ শ্রোত্রিয় কিনা, তাহারও এপর্য্যন্ত স্থির মীমাংসা হয় নাই। কাহারও কাহারও মতে সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হইতে এই গাঁ.ইএর উৎপত্তি এবং কালক্রমে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের শ্রোত্রিয় শ্রেণীতে প্রবেশ।

মুকুন্দরাম কান্যকুব্জাগত দক্ষের সন্ততি হউন অথবা প্রাচীন বঙ্গদেশীয় সপ্তশতী ব্রাহ্মণ বংশীয়ই হউন, তাঁহার গ্রন্থ বা কীর্ত্তির তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ব্রাহ্মণ সমাজে তাঁহার আসন যে স্তরেই হউক, তাঁহার পৌরুষ চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। চণ্ডীকাব্য হইতে জানা যায়, মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম বা উপাধি কবিচন্দ্র, পুত্রের নাম শিবরাম, কন্যার নাম যশোদা, পুত্রবধূর নাম চিত্রলেখা এবং জামাতার নাম মহেশ। এই সকল নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায়, চণ্ডীকাব্যে কবির যৌবনের উদ্দাম লেখনী-প্রসূত নহে। পূর্ব্বে শ্রোত্রিয় ও বংশজের বিবাহ সাধারণতঃ বিলম্বে ঘটিত। এ অবস্থায় বিবাহিত পুত্রকন্যার পিতা মুকুন্দরাম যে পরিণত বয়সে তাঁহার এই কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। কাব্যের এক স্থানেও কবি পরিহাসচ্ছলে লিখিয়াছেন "বুড়াকে না করে গুণ মোহন ঔষধ"।

কবিকঙ্কণের জন্মভূমি দামুন্যা গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার সেলিমাবাদ পরগণার অন্তর্গত। এখানে তাঁহার "নিবাস পুরুষ ছয় সাত"। দামুন্যা হইতে কয়ড়া গ্রাম অধিক দূরবর্ত্তী নহে; সুতরাং ছয় সাত পুরুষের পূর্ব্বেও যে এই বংশীয়েরা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বাস করিতেন, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ উপাধি কোথা হইতে আসিল, তাহা জানা যায় না, তবে তাঁহার কাব্য হইতে জানা যায় যে, কবিত্বশক্তি তাঁহার পিতামহের আমল হইতে পারিবারিক সম্পত্তি রূপে গণ্য ছিল।

কবি রাজপুরুষের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্ভাগ্যের নানা ভ্রুকুটি সহ্য করিয়া বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল থানার অধীন আড়রা গ্রামে গুণগ্রাহী ব্রাহ্মণ জমীদার বাঁকুড়া রায় ও তাঁহার পুত্র রঘুনাথ রায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া কাব্য প্রণয়ন করেন। এই পলায়নের যে করুণরসাত্মক বিবরণ কবি স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই মর্ম্মস্পর্শী। দুর্বৃত্ত ডিহিদার মামুদ সরিফ কবির অনুগ্রহে বা নিগ্রহে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত চণ্ডীকাব্যে দেখিতে পাই "ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ, গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ, সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে, ডিহিদার মামুদ সরিফ" ইত্যাদি। দামুন্যায় আবিষ্কৃত হস্তলিখিত পুঁথিতে নাকি "ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজ-ভৃঙ্গ, গৌড়-বঙ্গ উৎকল-অধিপ,-অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে, খিলাৎ পায় মামুদ সরিফ" এইরূপ পাঠ আছে। এই পাঠই সুসঙ্গত মনে হয়। এই পলায়নের সময়েই পথে কবি গীত রচনার জন্য চণ্ডীর আদেশ প্রাপ্ত হন বলিয়া লিখিয়াছেন।

"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥"

অর্থাৎ ১৪৯৯ শকে বা ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কবি কাব্য রচনার আদেশ প্রাপ্ত হন।

মানসিংহ ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন। সুতরাং গ্রন্থ প্রণয়নের সময় সম্বন্ধে উদ্ধৃত শ্লোকের কোন মূল্য থাকিলে কবিবর্ণিত মামুদসরিফের অত্যাচার কখন রাজা মানসিংহের সময়ে হইতে পারে না। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন কুলি খাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা। কবি পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তা হোসেন কুলি খাঁর সময়ের সহিত পরবর্ত্তী শাসনকালের তুলনা করিয়াছেন, এই মতই যুক্তিযুক্ত।

চণ্ডীকাব্য যে যুগে রচিত হইয়াছে, তাহা ভারতে মুসলমান রাজত্বের উজ্জ্বল যুগ। বিলাতে তাহা স্পেনিষ আরমাদার পরাভব, ইংলণ্ডের নৌবলের প্রভাববৃদ্ধি এবং সেক্ষপি য়র ও বেন্‌জন্‌সনের অমৃতবর্ষিণী কবিতার যুগ। তখন প্রতীচ্য ভারতে মহামান্য প্রতাপসিংহ স্বাধীনভাবের উদ্দীপনায় দুর্জ্জয় মোগলবাহিনীর প্রতিকূলে বদ্ধপরিকর। বঙ্গদেশে তখন মামুদ সরিফের ন্যায় রাজকর্ম্মচারীর ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হইয়া প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান কয়েক জন সামন্ত দিল্লীশ্বরের প্রতাপকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতে প্রস্তুত। নিরীহ বঙ্গকবি এই সময়ে নৃমুণ্ডমালিনী শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে গিয়া কতদূর সফলকাম হইয়াছেন, আমরা ৩০০ বৎসরের অধিককাল পরে বৈদেশিক-শাসনলব্ধ শান্তির ছায়ায় বসিয়া, সমুদ্রের অপরপারবর্ত্তী গুরুগণের নিকট প্রাপ্ত সমালোচনার মানদণ্ড দ্বারা একবার তাহার পরিমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। পাঠককে একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কাব্যবর্ণিত চরিত্রগুলির অনুসরণ করিতে হইবে। কবির নিন্দা বা স্তুতি এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে—তাঁহাকে বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

আমাদের কবি বঙ্গদেশের পূর্ব্ব-প্রচলিত প্রথানুসারে গণেশাদি অনেক দেবতার বন্দনা করিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি চণ্ডী কাব্য লিখিতেছেন বলিয়া বৈষ্ণববিদ্বেষী নহেন। গ্রন্থের প্রথম ভাগেই চৈতন্যদেবকে হরির অবতার স্বীকার করিয়া তাঁহার বন্দনা করিয়াছেন। বাস্তবিক মীনমাংসত্যাগী হরিপদসেবী জগন্নাথের পৌত্র মুকুন্দরাম হরিকে তাঁহার কাব্যের দেবতা চণ্ডী অপেক্ষা নিম্নতর আসন দিয়াছেন বলিয়া বিবেচনা হয় না। একস্থানে দেখিতে পাই, শ্রীমন্ত দেবীকে স্তব করিবার সময়ে বলিতেছেন—

"হরিহর বিধি হইয়া অবধি
হৈমবতী সবে সেবে"।

অন্যত্র শ্রীমন্ত তাঁহার পিতাকে বলিতেছেন—

"আদ্যাশক্তি নারায়ণী ইন্দ্র আদি পূজে
ব্রহ্মা হরিহর শুক চরণের রজে।"

অন্যত্র আবার কবি দেবীকে দিয়া নারায়ণকে প্রভু বলাইয়া লইয়া ছাড়িয়াছেন—

"সলিলে ডুবিলে মহী, আশ্রয় করিল অহি,
শয়ন করিলা নারায়ণ,
সেই অবসান কালে প্রভুর শ্রবণ মলে,
দুই দৈত্যে কৈল মহারণ।"

কবি মালাধরের জন্মের বন্দোবস্ত করিবার সময়ে লিখিয়াছেন—

"গৌরী সঙ্গে ত্রিপুরারি, গঙ্গায় ভাসায়ে তরী,
কৃষ্ণকথায় কুতূহল মন।"

ইহার কিছু পরে মহাদেব মালাধরকে বলিতেছেন—

"আমি অবধূত জন, হরিভক্তি মোর ধন,
স্বর্ণ রৌপ্য নাহি আভরণ।"

ধনপতির নৌকা পবননন্দনের সাহায্যে

মৃগয়ায় ডুবাইয়া অনুতপ্ত ও শঙ্কিত দেবী বলিতেছেন—

"যেই সেবে হরিহর তারে মোর লাগে ডর,
ব্রহ্মবধ সম তার বধ।"

ফুল্লরার গৃহে বিশ্বকর্ম্মা দেবীর
"কাঁচুলীর মধ্য ভাগে লেখে বৃন্দাবন" ॥

গ্রন্থের শেষ ভাগে ভগবতী স্বয়ং খুল্লনাকে উপদেশ দিতেছেন—

"কলিকাল গরলে ঔষধ নারায়ণ।
বদনে করিলে পান না দেখে শমন॥"

এই সমস্ত আলোচনা করিলে মুকুন্দরাম স্বয়ং শাক্ত কি বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন হয়। কিন্তু গ্রন্থের নানা অংশে মনোযোগ দিলেই প্রতীতি জন্মে যে, যদিও তিনি কাব্যে অনেক দেবতা অপেক্ষা চণ্ডী দেবীর মাহাত্ম্য বা শক্তির আধিক্য বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তথাপি কবি প্রকৃতপক্ষে তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজক। জল, স্থল, অন্তরীক্ষে যেখানে কোন দেবতার মূর্ত্তি বা অবস্থিতি তাঁহার চর্ম্মচক্ষু বা মানস চক্ষুর বিষয়ীভূত, সেইখানেই তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে প্রস্তুত। গ্রন্থের প্রথম ভাগে তিনি কেবল কয়েকটী দেবতার মামুলি বন্দনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। দিগ্বন্দনার মধ্যে নিরাকার ধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া দামুন্যা এবং তন্নিকটবর্ত্তী বিবিধ গ্রামের বিবিধ স্থাপিত দেবতার বন্দনা গাইয়াছেন। ইন্দিপুরের রঙ্কিণী, চণ্ডীপুরের বারাহী, পাড়ামুরার কামারবুড়ী প্রভৃতি বহু দেবতাই তাঁহার ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিদের পথ প্রদর্শকগণ ভক্তির সহিত বন্দিত হইয়াছেন। গীতপথের পরিচয়দাতা মাণিকদত্ত বিনয় পাইয়াছেন। —তিনি ব্রাহ্মণ নহেন, সুতরাং ব্রাহ্মণ কবির বন্দনা পাইতে পারেন না। শেষ কালে কবি বলিয়া ফেলিয়াছেন,

"ডাকিনী যোগিনী বন্দোঁ শ্রীধর্ম্মের পা।
লবধ হইয়া যে মোর আসরে করে ঘা ॥
তিনি মোর ভগিনী আমি তার ভাই।
আসরেতে করে ঘা চণ্ডীর দোহাই ॥"

এই আঁটাআঁটি বাঁধাবাঁধির "চণ্ডীর দোহাই" এর মধ্যে যেমন এক দিকে কবির ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় পাই, অপর দিকে তেমনি দেবচরিত্রের সঙ্কীর্ণতা জাজ্জ্বল্যমান ভাবে ফুটিয়া উঠে।

চণ্ডীকাব্য আড়রাপতির সভায় গীত হইবার জন্য রচিত হইয়াছিল। ইহার মোটামুটী তিনটী অংশ ধরা হইতে পারে। (১) উপক্রমণিকা—ইহাতে সৃষ্টিপ্রকরণ, দক্ষযজ্ঞ, হরপার্ব্বতীর বিবাহ, মদনভস্ম, হরপার্ব্বতীর কোন্দল, মর্ত্ত্যে দেবীর পূজা লইবার কল্পনা; (২) দ্বিতীয় অংশে ভগবতীর চক্রান্তে মহাদেবের শাপে পৃথিবীতে কালকেতুব্যাধরূপে জাত ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরের উপাখ্যান; (৩) তৃতীয় অংশে ভগবতীর চক্রান্তে শাপগ্রস্ত হইয়া খুল্লনারূপে জাত রত্নমালার, খুল্লনার স্বামী ধনপতির এবং পুত্র শ্রীমন্তরূপে জাত শাপগ্রস্ত ইন্দ্রপুত্র মালাধরের উপাখ্যান। কবিকঙ্কণ অনেক পুরাণ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন, একথা নিজেই বলিয়াছেন। দ্বিজ জনার্দ্দনের মঙ্গলচণ্ডী এবং বলরাম কবিকঙ্কণের ও মাধবাচার্য্যের চণ্ডী তাঁহার কাব্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। অপর কোন ফুল তাঁহার মধুচক্র নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াছে কিনা, ঠিক জানা যায় না।

উপাখ্যানাংশ কবিকঙ্কণের কল্পনা-প্রসূত না হইলেও যখন তাহা অবলম্বন করিয়া তিনি

কাব্য লিখিয়াছেন, তখন কাব্যোল্লিখিত চরিত্রগুলির বিকাশের জন্য তিনি দায়ী। এই দায়িত্ব মুকুন্দরাম তাঁহার অনেক চরিত্রেই প্রশংসার সহিত পূরণ করিয়াছেন। কালকেতু ও ফুল্লরা, ধনপতি, খুল্লনা ও লহনা দেবীর সহচরী পদ্মা এবং ধনপতির পরিচারিকা দুর্ব্বলা দাসীকে যেন পাঠকের সম্মুখে সজীব ভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে। কালকেতু ব্যাধের পাশব বল বা অতিপাশব বল জ্বলদক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে; এখানে আমরা উত্তপ্তজলবায়ু-জনিত অতিশয়োক্তির ভিতর দিয়া স্বাভাবিকত্ব দেখিতে পাই। কালকেতুর বাল্যজীবন বর্ণনা করিতে গিয়া কবি তাঁহাকে শাপভ্রষ্ট ইন্দ্রপুত্র বলিয়া রাজপুত্রের ন্যায় চিত্রিত করেন নাই—বিক্রান্ত ব্যাধপুত্রের ন্যায়ই চিত্রিত করিয়াছেন। কাল কেতুর

"দুই বাহু লোহার সাবল।
গুণশীল রূপ বাড়া, যেন সে শালের কোঁড়া,
জিনি শ্যাম-চামর কুন্তল॥
বিচিত্র কপালতটী, গলায় জালের কাঁঠী,
করযুগে লোহার শিকলী।
বুকে শোভে বাঘনখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে,
তনুমাঝে শোভিছে ত্রিবলী॥
কপাট-বিশাল বুক, নিন্দি ইন্দীবর মুখ
আকর্ণ দীঘল বিলোচন।
গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ.
মোতি-পাঁতি জিনিয়া দশন॥
দুই চক্ষু জিনি নাটা, ঘুরে যেন কড়ি-ভাঁটা,
কাণে শোভে ফটিক-কুণ্ডল।
পরিধান বীরধড়ী, মাথায় জালের দড়ী,
শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল॥
লইয়া কাউড়া ভেলা যার সঙ্গে করে খেলা,
তার হয় জীবন সংশয়।
যে জনে আঁকড়ি করে পড়য়ে ধরণী-পরে,
ভয়ে কেহ নিয়ড়ে না রয়॥" ইত্যাদি।

শুভদিনে পণ্ডিত আনিয়া কালকেতুর হাতে ধনুক দেওয়া হইল। ধনুর্ব্বাণ পাইয়া "চামের টোপর" মাথায় দিয়া কালকেতু শোভা পাইতে লাগিলেন। তাড়াইয়া হরিণ ধরিতে লাগিলেন—তাহাতে ধনুর্ব্বাণের প্রয়োজন হয় না। পিতা এই পুত্রের বিবাহের জন্য চিন্তিত হইলেন। সোমাই পণ্ডিত সঞ্জয়-সুতা ফুল্লরার সহিত সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন। বিবাহের সম্বন্ধের সময় ফুল্লরার পরিচয়চ্ছলে তাঁহার পিতা সঞ্জয়কেতু বলিতেছেন—

"এই কন্যা রূপে গুণে নামেতে ফুল্লরা।
কিনিতে বেচিতে ভাল জানয়ে পসরা॥
রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে।
যত বন্ধু আইসে তারা কন্যাকে বাখানে॥"

সোমাই পণ্ডিত কন্যার পিতার নিকট কালকেতুর গুণগ্রাম বর্ণন করিয়া উপসংহারে বলিলেন—

"খুঁজিয়া পাইল যেন হাঁড়ির মত সরা।"

অবশেষে—

"পণের নিয়ম কৈল দ্বাদশ কাহণ।
ঘটকালি তাতে ওঝা পাবে বার পোণ॥
পাঁচ গণ্ডা গুয়া দিব গুড় তিন সের।
ইহা দিলে আর কিছু না করিবে ফের॥"

শুভক্ষণ দেখিয়া কালকেতুর সহিত ফুল্লরার বিবাহ দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য, কালকেতু ক্রমে মৃগয়ায় সিদ্ধহস্ত হইলেন। মৃগয়ার নমুনা এইরূপ—

"শুণ্ডে ধরি মাতঙ্গেরে আছাড়িয়া মারে।
দন্ত উপাড়িয়া বীর আনে বোঝা ভারে।"

এরূপস্থলে কাজেই

"চুপড়ি মুলা'য়ে দন্ত বেচেন ফুল্লরা।
কৃষাণে যেমন বেচে মুলার পসরা॥"

কালকেতুর মৃগয়ার তেজে ফুল্লরা বাজারে মহিষের শৃঙ্গ, সন্ন্যাসীর বাঘছাল, একপণ দরে গণ্ডারের খড়্গ প্রভৃতি বেচিতে লাগিল। কালকেতু মৃগয়া হইতে আসিয়া ফুল্লরা-প্রদত্ত "হরিণের ছড়া"য় বসিয়া মোকা নারিকেল ভরা জলের সদ্ব্যবহার করিয়া ভোজনের ব্যাপারটা কেমনে সমাধা করিতেন, ক্ষুদ্রপ্রাণ বাঙ্গালী পাঠক, একবার শুন।

"সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিয়া পাথরা।
ব্যঞ্জনের তরে দিল নৌতুন খাপরা॥
মোচড়িয়া গোঁফ দুটা বাঁধে নিয়া ঘাড়ে।
এক শ্বাসে তিন হাঁড়ি আমানি উজাড়ে॥
চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ।
দালি থাল্য ছয় হাঁড়ি মিশাইয়া লাউ॥
ঝুড়ি দুই তিন থাল্য বনওল পোড়া।
বনপুঁই ভার দুই কলমী কাঁচড়া॥
ফুল্লরা রন্ধন করে জালে গোটাবাঁশ।
ঝোল রান্ধি দিল দুটা হরিণের মাস॥
দশ গণ্ডা মহাবীর খায় নকুল পোড়া।
সার কচুর ঘণ্ট খায় মিশায়্যা আমড়া॥
অম্বল খাইয়া বীর জায়ারে জিজ্ঞাসে।
রন্ধন ক'রেছ ভাল আর কিছু আছে॥
আন্যাছি হরিণ দিয়া দধি এক হাঁড়ি।
তাহা দিয়া খায় ভাত আর তিন হাঁড়ি॥
শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিট্‌কাল।
ছোটগ্রাস তোলে যেন তেআঁঠিয়া তাল॥
ভোজন করিতে গলা ডাকে ঘড় ঘড়।
কাপড় উসাস্ করে যেন মড়ায়ের বড়॥"

দুঃখের বিষয়, কবি কালকেতুর উদরের পরিমাণটা দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমাদিগকেও পাঠকের কৌতূহল অতৃপ্ত রাখিতে হইল। এই অতিশয়োক্তির ভিতর স্বাভাবিকতার এমন একটী মূল আছে, যাহাতে পাঠকের বিরক্তি জন্মিতে দেয় না।

কালকেতুর অত্যাচারে বনের পশু অস্থির হইয়া উঠিল। দন্তহীন হস্তী, রুধিরাক্ত মহিষ, লাঙ্গুলশূন্য চমরী, বিধবা হরিণী প্রভৃতি সকলে রাজার দ্বারে গিয়া নালিশ জানাইল। পশু-রাজ রাজপ্রথানুসারে কোটালকে ভর্ৎসনা করিয়া যুদ্ধসজ্জা করিলেন এবং যথাকালে চণ্ডীর নিকটে গিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। পশুগণের সহিত চণ্ডীর উত্তর প্রত্যুত্তরে মনস্বী সমালোচকগণ কোন গভীর রাজ-নৈতিক আলোচনার রূপক দেখিতে পান, ভালই। আমাদের কিন্তু সমগ্র চণ্ডীকাব্য পড়িয়া মনে হয়, দামুন্যার সরলপ্রাণ, নিরীহ ব্রাহ্মণ কবি রাজনীতি বা এখন যাহাকে দেশহিতৈষিতা বলে, তাহার বড় একটা ধার ধারিতেন না। তিনি তাৎকালিক সাধা-রণ মানবসমাজের চিত্র এবং দেবীর মাহাত্ম্য সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিবারই প্রয়াস পাইয়াছেন। যাহা হউক, পশুগণের আবে-দনে কালকেতুর পক্ষে শাপে বর হইল। পশুগণকে অভয় দিয়া দেবী স্বয়ং স্বর্গ-গোধিকা রূপ ধারণ করিলেন। কালকেতু অনেকক্ষণ মৃগীরূপধারিণী দেবীর বৃথা অনু-সরণ করিয়া অবশেষে গোধিকারূপ-ধারিণী দেবীকে গৃহে লইয়া আসিলেন। ভগব-তীকে ফুল্লরা শিকপোড়া দিবার পূর্ব্বেই তিনি নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ষোড়শী যুবতী হইয়া ফুল্লরার সহিত ছলনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কালকেতু কেবল দৈহিক বলে বলীয়ান্ নহেন, তিনি জিতেন্দ্রিয়। ষোড়শী যুবতীকে গৃহ ছাড়িয়া যাইবার জন্য তিনি অনেক অনুরোধ করিলেন, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, অবশেষে ধনুকে শর যোজনা করিলেন। দেবীর উদ্দেশ্য পূজা খাওয়া; তিনি নিজের পরিচয় দিয়া কেলি-

লেন, গুজরাট বনে ব্যাধকে রাজ্য বসাইতে পরামর্শ দিলেন এবং মাণিক অঙ্গুরী ও সাত ঘড়া ধন দান করিলেন। কালকেতু মুরারি শীলের নিকট অঙ্গুরী ভাঙ্গাইয়া "বলদ শকটে" করিয়া বাড়ীতে ধন লইয়া আসিলেন এবং পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী নানা দ্রব্য কিনিয়া ফেলিলেন। বন কাটা হইল—দেবীর আদেশে বিশ্বকর্ম্মা ও হনুমান গুজরাট নগর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ব্যাধকালকেতু রাজা কালকেতু হইলেন। বুলান মণ্ডল, ভাঁড়ু দত্ত প্রভৃতি কালকেতুর নগরে আসিয়া হাজির হইল। নানা জাতীয় লোক আসিয়া বসতি করিল—পশ্চিম দিকে নমাজের ব্যবস্থাও থাকিল। দালান, মস্‌জিদ কিছুরই অভাব থাকিল না। কালকেতু হীনাবস্থা হইতে উন্নতি-লাভ করিলেও প্রজারঞ্জক রাজা হইলেন। প্রজার প্রতি অত্যাচারের জন্য ভাঁড়ুদত্তকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিলেন। ভাঁড়ু কালকেতুর নিকট পূর্ব্বে উপকার পাইয়াছিল; এখন অপরাধের জন্য দূরীকৃত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া গেল—

"পুনরপি হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা।"

সে কলিঙ্গরাজের নিকট কালকেতুর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন করিল। কলিঙ্গরাজ কোটালের উপর যথারীতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া গুজরাটরাজের খবর আনিতে আদেশ দিলেন। ক্রমে রাজপুত্র গুজরাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কালকেতু তেজস্বী বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু কবি এ পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্র যে তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছিলেন, জানি না কি দুরদৃষ্টক্রমে সে তুলিকা হারাইয়া ফেলিলেন। বাঙ্গালীর ঘরের আদর্শ তুলিকা লইয়া কালকেতুর উজ্জ্বল বর্ণের উপর কালীর লেপ দিয়া ফেলিলেন। দ্বিতীয়বার যুদ্ধসজ্জা করিবার সময়ে কালকেতু ফুল্লরার কথায় সাহস বিসর্জ্জন দিয়া ধান্যের গৃহে গিয়া লুকাইলেন। ভাঁড়ুদত্তের কপটতায় তাঁহার সে গৃহও বেষ্টিত হইল। বাধ্য হইয়া কালকেতুকে আবার একাকী যুদ্ধ করিতে হইল। কিন্তু কালকেতু শাপভ্রষ্ট দেবকুমার; তাঁহার শাপের কাল ফুরাইয়া আসিল, দেবী তাঁহার বল হরণ করিলেন। কালকেতু বন্দী হইয়া কলিঙ্গের রাজসভায় নীত হইলেন। কাল- তাঁহার তেজ আবার ক্ষণেকের জন্য ফিরিয়া আসিল। কবি আবার যথাসাধ্য কালীটুকু পুঁছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রাজা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কালকেতু উত্তর করিলেন—

"গুজরাট নিবাসী নবাস চণ্ডীপুর।
আমার রাজ্যের রাজা মহেশ ঠাকুর॥
আমি বটি মহাপাত্র চণ্ডী অধিকারী।
তাঁর আজ্ঞা ধরি আমি তাঁর আজ্ঞাকারী॥

* * * *

বেচিয়াছি আপন তনু চণ্ডিকার পায়।
তোমার তাড়নে কালকেতু না ডরায়॥

কলিঙ্গরাজের কারাগার কালকেতুর বাসভূমি হইল। তিনি আবার অনেক খেদ করিয়া চণ্ডিকার স্তুতি করিলেন। কলিঙ্গরাজ দেবীর স্বপ্নাদেশ পাইয়া কালকেতুকে বন্ধনমুক্ত করতঃ গুজরাটের রাজা করিয়া দিলেন। ইহার পর ভাঁড়ুদত্তের মস্তকমুণ্ডন এবং কালকেতুর শাপান্ত ও স্বর্গারোহণ।

ফুল্লরার চরিত্রও সুনিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত ফুল্লরা ব্যাধপত্নী। কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরের স্ত্রীলোক। তাহার চরিত্রের উজ্জ্বল ও অন্ধকার দুই দিকই কবি দেখাইয়াছেন। সে

দুই দিকেই ষোড়শ শতাব্দীর দেশীয় নিম্ন-শ্রেণীস্থ স্ত্রীলোকের আদর্শ দেদীপ্যমান্।

ফুল্লরা বাল্যকাল হইতেই পসরা ও রন্ধন করিতে সুদক্ষ। বিবাহের পর তাহার শাশুড়ী "বৈসে খাটে," আর সে শাশুড়ীর আদেশমত পসরা করে, হাট হইতে জিনিষ-পত্র কিনিয়া আনে, শাশুড়ীর নিকট তাহার বিবরণ বলে, তাঁহার আদেশ মত রন্ধন করে এবং শ্বশুরকে আগে ভোজন করায়। শ্বশুর শাশুড়ী শেষ বয়সে "বারাণসী করিল পয়ান", কাজেই তখন ফুল্লরা গৃহিণী হইল। এই অবস্থায় তাহার সাংসারিক কার্য্যে পটুতা, তাহার পতিসেবা, তাহার সখীর সঙ্গে সদ্ভাব, মাথার উকুন দেখা প্রভৃতির কবি যেমন সুদৃশ্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,সেইরূপ তাহার দারিদ্র্যের জন্য অদৃষ্টকে ধিক্কার, দরিদ্রপতির হস্তে সমর্পণের জন্য পিতার উপর অভিমান, সপত্নী-ভীতি-স্বাভাবিক ভীরুতা প্রভৃতিরও সুন্দর আলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছেন।

ষোড়শী যুবতীর মূর্ত্তিধারিণী দেবীকে কুটীরের দ্বারে দেখিয়া এবং তাঁহার এই কুটীরে কিছুদিন বাস করিবার ইচ্ছা শ্রবণ করিয়া ফুল্লরার যে কি অবস্থা হইয়াছিল, ফুল্ল-রার সহিত দেবীর কথোপকথনে কবি তাহার পরিচয় দিয়াছেন। এই কথোপকথনের ছত্রে ছত্রে যেন ফুল্লরার অন্তঃকরণ প্রতি-ফলিত হইয়াছে। ফুল্লরা দারিদ্র্যের জন্য অভিমানের অনেক কথা কহিয়া শেষে এক সখীর নিকট কিছু খুদ ধার করিয়া রাঁধি-বার জন্য বাড়ী আসিয়াছে, কিন্তু দেবীকে দেখিয়া—

"হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা।
দূর হইল ক্ষুধা তৃষা রন্ধনের ত্বরা॥"

অনেক ধর্ম্মবাক্য, অনেক প্রলোভন, অনেক ভয় দেখাইয়া ফুল্লরা দেবীকে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিল—গরজ বড় বালাই। দেবীকে নাছোড়বান্দা দেখিয়া বারমাসের দুঃখ বর্ণনা করিল এবং অবশেষে অভিমান ভরে সখীর নিকট গিয়া অনেক কথা বলিয়া ফেলিল। যখন দেবী কালকেতুকে মাণিক অঙ্গুরী দান করিলেন, তখন——

"এই অঙ্গুরীর মূল্য সাত কোটী টাকা।
ফুল্লরা শুনিয়া মূল্য মুখ করে বাঁকা॥
ফুল্লরার অভিলাষ বুঝিয়া পার্ব্বতী।
আর কিছু ধন দিতে কৈল অনুমতি॥"

সুযোগ বুঝিলে এখনও কি বাঙ্গালী-রমণী টাকা আদায় করিতে জানেন না? ফুল্লরার প্রধান অপযশের কার্য্য পতিকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া ধান্যের ঘরে প্রবেশের পরামর্শ দেওয়া। ফুল্লরা রামায়ণ হইতে বালী রাজার দোহাই দিয়া মহাবীর কাল-কেতুকে ধান্যের ঘরে পাঠাইল। কবি এই-খানে বাঙ্গালী-রমণী-চরিত্রের যে আদর্শ অঙ্কিত করিয়াছেন, পাঠক, বিংশ শতাব্দীতেও তাহা দেখিতে পান না কি? পতিকে লুকাইয়া রাখিয়াও ফুল্লরা ভাঁড়ুদত্তের কপ-টতার নিকট পরাস্ত হইল। চতুর ভাঁড়ু দত্ত ফুল্লরার ভাবগতিক দেখিয়াই আসল অবস্থা বুঝিয়া লইল। তাহার পর পতির উপর অত্যাচার দেখিয়া ফুল্লরা কোটালের নিকট যে কাকুতিমিনতি করিল, তাহার হৃদয়স্পর্শী বর্ণনাও কবি খাঁটি বাঙ্গালীর ঘর হইতেই লইয়াছেন। কোটালকে ফুল্লরা গলার শতেশ্বরী হার ছিঁড়িয়া দিতে উদ্যত হইল এবং কহিল—

"চুরী নাহি করি কোটাল ডাকা নাহি দিয়ে।
ধন দিয়া গেল দুর্গা হেমন্তের ঝি॥

গো মহিষ রাজ্য লহ অমূল্য ভাণ্ডার।
নফর করিয়া রাখ স্বামীকে আমার॥

* * * * *
* * * * *

কারু নহি লই রাজ্য কারু এক পণ।
তৌলিয়া গণিয়া রাজা লউক যত ধন॥
নিশ্চয় বধিবে যদি বীরের পরাণ।
এক অসি ঘায়ে আগে ফুল্লরারে হান॥"

কালকেতু খণ্ডের আর দুইটী উল্লেখ-যোগ্য চরিত্র মুরারি শীল ও ভাঁড়ু দত্ত। মুরারি শীলের নিকট কালকেতু যখন অঙ্গুরী ভাঙ্গাইতে গেলেন, তখন একের কপটতা ও অপরের সরলতার যে ছবি কবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সুদক্ষ চিত্রকর ব্যতীত কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ভাঁড়ু দত্ত ধূর্ত্ততা ও খলতার একটী জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি। কালকেতুর সম্পদের সময়ে সে কাঁচকলা ভেট লইয়া আপন শ্যালককে পশ্চাতে রাখিয়া 'কলম খরশান' কর্ণে গুঁজিয়া ব্যাধরাজের নিকটে হাজির হইল এবং প্রণাম করিয়া বীরের সহিত খুড়া সম্বন্ধ পাতাইল। 'যতেক কায়স্থ দেখ, ভাঁড়ুর পশ্চাতে লিখ' ইত্যাদি বলিয়া এই আমলহাড়ার দত্ত আপনার কুলগরিমা কীর্ত্তন করিল এবং রাজার পাত্র হইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিল। প্রজার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে রাজাকে অনেক উপদেশ দিল এবং রাজার অধীনে থাকিয়া সপুত্র প্রজার উপর নানা অত্যাচার আরম্ভ করিল। কালকেতু অগত্যা তাহাকে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইলেন। ভাঁড়ু দত্ত কলিঙ্গরাজের নিকট গিয়া কালকেতুর বিরুদ্ধে রাজাকে উত্তেজিত করিবার জন্য অনেক বক্তৃতা করিল এবং অবশেষে বলিল—

"ম্লেচ্ছরিপু তোমার গুণ শুধিতে আইলাম লোণ
বারতা জানাইবার তরে॥"

নুণ শোধা লোকই বটে! যখন যুদ্ধে কালকেতু জয়লাভ করিলেন, তখন ভাঁড়ু মহাচিন্তায় পড়িল—

"পরিবার রহিল মোর পাপ গুজরাটে।
কহিতে কাঁকড়ি যেন বুক মোর ফাটে॥"

যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত কোটালকে তাহার বিরুদ্ধে রাজার নিকট লাগাইবে বলিয়া ভয় দেখাইয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইল, অবশেষে তাহার ব্রহ্মাস্ত্র কপটতা দ্বারা পূর্ব্বপ্রভু কালকেতুর বন্ধনের বন্দোবস্ত করিয়া দিল। কে অস্বীকার করিবে যে, এই হতভাগিনী বঙ্গভূমিতে অনেক ভাঁড়ু দত্ত জন্মিয়াছে? নতুবা বক্তিয়ার খিলিজিও তাঁহার সপ্তদশ জন অশ্বারোহীর কথা আমরা শুনিব কেন?

কাব্যের তৃতীয় খণ্ডে ধনপতিকে কেন্দ্র করিয়া অনেক চরিত্র বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। ধনপতি গন্ধবণিক জাতীয়—অর্থশালী ব্যবসায়ী লোক। তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী খুল্লনা শাপভ্রষ্ট ইন্দ্রের নর্ত্তকী রত্নমালা। এই খুল্লনা দ্বারাই দেবী স্ত্রীমহলে পূজা প্রচলনের প্রয়াসী। ধনপতি শিবপূজক এবং 'মাইয়া দেবতার' বিরোধী। পারাবতের অনুসরণ করিতে গিয়া ধনপতি কুমারী খুল্লনার নিকট পৌঁছিলেন—খুল্লনা তাঁহার সাধের পায়রা বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি সম্বন্ধে ধনপতির শ্যালিকা, তাঁহার প্রথম স্ত্রী লহনার পিতৃব্যকন্যা, সুতরাং পরিহাস করিবার তাঁহার অধিকার ছিল। কিন্তু পারাবত চাহিতে চাহিতে ধনপতির লোভ কিছু উচ্চদরের হইয়া গেল। শেষে আর পারাবতে তৃপ্তি হইল না, পারাবতধারিণী খুল্লনাকে

পর্য্যন্ত চাহিয়া বসিলেন। জনাই ওঝার ঘটকালীতে শীঘ্রই সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। ধনপতি লহনাকে পাটসাড়ী ও চুড়ি গড়াইবার জন্য পাঁচ পল সোণা দিয়া তাঁহার আপত্তি খণ্ডন করিলেন। যথাকালে খুল্লনা ধনপতির দ্বিতীয়া স্ত্রী রূপে তাঁহার গৃহ উজ্জল করিলেন। কিন্তু বিধাতার প্রাণে এ সুখ সহিল না। শীঘ্রই এক আশ্চর্য্য শারীশুক আসিয়া উজানীর রাজা বিক্রমকেশরীর আতিথ্য স্বীকার করিল। তাহাদের উপযুক্ত পিঞ্জর নির্ম্মাণের জন্য ধনপতি নৃপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া গৌড় নগরে গমন করিলেন। এই অবসরে দুর্ব্বলা দাসীর প্ররোচনায় লীলাবতী সখীর সাহায্যে লহনা খুল্লনাকে ছাগরক্ষণে নিযুক্ত করিলেন। লহনা ধনপতির যে আদেশপত্র খুল্লনার নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন, খুল্লনা তাহা বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধে বয়োধিকা লহনার নিকট পরাস্ত হইয়া ছাগরক্ষণ কার্য্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই ছাগরক্ষণের বিবরণ স্থানে স্থানে কিছু অস্বাভাবিকতাদুষ্ট হইলেও মোটের উপর গভীর করুণরসাত্মক ও মর্ম্মস্পর্শী। খুল্লনা ছাগচারণ করিতে গিয়া প্রভূত কষ্ট ভোগ করিল। একদিন যখন খুল্লনা শ্রান্তকলেবরে পল্লবশয়নে তরুতলে নিদ্রা দেবীর অঙ্কে শান্তিলাভ করিতেছেন, তখন দৈবযোগে দেবী সেই স্থান দিয়া "আকাশ গমনে" যাইতেছিলেন। খুল্লনাকে দেখিয়া দেবীর কৌতূহল জন্মিল। রত্নমালার কথা দেবীর স্মরণ না থাকা পাঠকের নিকট বিস্ময়জনক হইতে পারে, কিন্তু মুকুন্দরাম যে দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবার জন্য কাব্য লিখিয়াছেন, তাঁহার স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা পাঠক গ্রন্থের অনেক স্থলেই অনুভব করিবেন। দেবী বাধ্য হইয়া চতুরা পদ্মাবতীর শরণাপন্না হইলেন। পদ্মাবতী খুল্লনার পরিচয় দিলেন এবং দেবীকে রত্নমালা সংক্রান্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিলেন। পূজালাভের এই উপযুক্ত অবসর। দেবী খুল্লনার মাতার মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার শিয়রে বসিয়া স্বপ্নে ছলনা করিলেন—খুল্লনার ছাগী স্থানান্তরে লুক্কায়িত রাখিলেন, দেবকন্যাগণ দ্বারা সরোবরতীরে পূজার বন্দোবস্ত করা হইল—উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তই শ্রেয়ঃ। খুল্লনা দেবকন্যাগণের নিকট পরিচয় দিয়া এবং তাঁহাদের পরিচয় লইয়া পূজার পদ্ধতি শিখিয়া ফেলিলেন। দেবী ব্রাহ্মণীবেশে খুল্লনার একটু পরীক্ষা লইয়া অবশেষে বর দান করিলেন। লহনাকে স্বপ্নাদেশ দিলেন। খুল্লনার কপাল ফিরিল--সপত্নীর নিকটে অত্যাচারের পরিবর্ত্তে আদর পাইলেন। এদিকে ধনপতিও গৌড় নগরে স্বপ্নাদেশ পাইয়া সুবর্ণ পিঞ্জরসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তার পর দুই সপত্নীতে প্রতিযোগিতা চলিল। দুর্ব্বলাদাসী সুযোগমত লহনাকে পতিবশীকরণের ঔষধ দান করিতে ও খুল্লনাকে লহনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। ধনপতির গৃহে আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল। দেবীর প্রসাদে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় বিবিধ দ্রব্য ধনপতির রসনার তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিল। কবি আহার, নিদ্রা, সপত্নী-বিদ্বেষ ও বিলাসিতার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আমরা অনেক দূরবর্ত্তী সময়ে থাকিয়াও তাহা উপভোগ করিবার অধিকারী।

ক্রমে খুল্লনার গর্ভসঞ্চার হইল। ইন্দ্রপুত্র মালাধর শাপগ্রস্ত হইয়া সেই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। তার পর ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে আর একটী করুণরসাত্মক

ব্যাপার। কবি নিপুণ হস্তে এই ব্যাপারের আলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছেন। গ্রাম্য দলাদলির যে ফটোগ্রাফ তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে যেন সেই চান্দবেণে, নীলাম্বর, রামরায় প্রভৃতি সজীব ভাবে আমাদের মানসচক্ষুর বিষয়ীভূত হইয়াছে। ধনপতি চাঁদ বেণেকে প্রথম মালাচন্দন দেওয়াতে গন্ধবণিক সমাজের নেতৃগণের মধ্যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কেহ রামায়ণ,কেহ হরিবংশ হইতে অংশ বিশেষ শুনিবার ভাণ করিয়া খুল্লনার চরিত্রের উপর সন্দেহ ও শ্লেষের বিষবাণ বর্ষণ করিতে লাগিল, খুল্লনার হস্তে খাওয়া হইবে না। ধনপতি ফাঁফরে পড়িলেন, কিন্তু দেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশের এই উপযুক্ত সময়। খুল্লনা চণ্ডীর কৃপায় বিবিধ ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আপনার সতীত্বের পরিচয় দিলেন। কাজেই 'কুটুম্ব'গণের ভোজনও 'মধুরেণ' সমাপিত হইল। কিন্তু ধনপতির অদৃষ্টে গৃহসুখ বিধাতার ইচ্ছা নহে। রাজসংসারে চন্দনাদি দ্রব্যের অভাব হইল এবং ধনপতির প্রতি দক্ষিণ পাটনে যাইবার আদেশ হইল। ধনপতি অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া এবং লহনা ও খুল্লনার নবযৌবনের উল্লেখ করিয়াও নিষ্কৃতি পাইলেন না। কবি লহনাকে সাধারণ সপত্নী করিয়াই চিত্রিত করিয়াছেন। স্বামী খুল্লনাকে অধিকতর প্রীতির চক্ষে দেখেন, ইহা তাঁহার সহ্য হয় না। তিনি স্বামীর বিদেশ গমনের সংবাদে হৃষ্ট হইলেন, কারণ তাহাতে 'সুয় দুয় সমান হৈল'। ধনপতি গর্ভবতী খুল্লনাকে জয়পত্র এবং মাণিক অঙ্গুরী প্রভৃতি নিদর্শন দিয়া, গণককে অনিষ্টাশঙ্কা গণনার জন্যে নফর দিয়া ধাক্কা দেওয়াইয়া ভ্রমরার জল হইতে সাতডিঙ্গা উঠাইলেন এবং বিনিময়ের দ্রব্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাহার নমুনা এইরূপ—

কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব।
নারিকেল বদলে শঙ্খ ॥
* * * * *
* * * *
প্লবঙ্গ বদলে মাতঙ্গ পাব।
পায়রা বদলে শুয়া ॥

আকন্দ বদলে মাকন্দ পাব।
হরিতাল বদলে হীরা ॥

ক্রমশঃ

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

[কমল]াকান্ত-কথা-লহরী। (৩)

প্রঃ। যদি বিরক্ত না হন, তবে আজ একটা প্রস্তাব করি।

উঃ। বিরক্ত হইবার কারণ কি? তোমাদের রুচি ও ইচ্ছার অনুযায়ী যেরূপ বলিতে চাও, অনায়াসে বলিতে পার।

প্রঃ। পুরাতন কথা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া যদি বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী কোন কথা পাড়ি, তাহাতে কি আপনার কোন আপত্তি আছে?

উঃ। কিছুমাত্র না; তোমরা যেমন শুনিতে চাও, আমি তেমনি বলিতে প্রস্তুত।

প্রঃ। আপত্তি যদি না থাকে, তবে

শিবাজীর কথা আপাততঃ রাখিয়া আমাদিগকে আধুনিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলুন; পরে তখন শিবাজীর বিষয়ে যাহা কিছু বাকী আছে, শুনিব।

উঃ। ও বাবা! তোমরা বুঝি এই তুমুল তুফানের মধ্যে আমাকে ফেলিতে চাও। এই জরাজীর্ণ শরীর মন লইয়া এবম্বিধ ভীষণ আলোড়নের অভ্যন্তরে পড়িলে কি এই ক্ষুদ্র প্রাণ টিকিবে? এ প্রাণ কোন প্রকারে দেহে থাকিয়া ধুক্ ধুক্ করিতেছে মাত্র, একটু সামান্য ওলট্‌পালট্ খাইলেই অমনি থপ্ করিয়া বিদায় লইব। এ সকল বিট্‌কেল ব্যাপারের নাড়াচাড়া সবল সুস্থ উদ্যমশীল যুবাপুরুষদের কাজ, আমরা হরিনাম জপিতে জপিতে কোন রূপে তালি তুলি দিয়া শেষ কয়টা দিন কাটাইতেছি, আমরা কি এসব ধাক্কা সাম্‌লাইতে পারি?

প্রঃ। সে কি! কথায় বলে "পুরাতন চাউল ভাতে বাড়ে," আপনাদের মুখ হইতে যাহা শুনিব, তাহাতে আমাদের বিশেষ উপকার হইবে।

উঃ। আমাদের কথা কি এখন বাজারে বিকায়? চারি দিকে যেরূপ কোলাহল শুনিতেছি, এ দুর্ব্বল কর্ণের রব কোথায় ভাসিয়া যাইবে। অধুনা যেরূপ ঘটিয়াছে, তাহাতে ত দেখিতেছি, জমীদার জমীদারী ছাড়িয়া, মহাজন তেজারতী ছাড়িয়া, সওদাগর বাণিজ্য ছাড়িয়া, বারিষ্টার চেম্বর ছাড়িয়া, উকীল ওকালতী ছাড়িয়া, ডাক্তার চিকিৎসা ছাড়িয়া, পণ্ডিত শাস্ত্র ছাড়িয়া, ভট্টাচার্য্য টোল ছাড়িয়া, কবি বুলবুলির বর্ণনা ছাড়িয়া, ছাত্র পাঠশালা ছাড়িয়া, কুলবধূ গৃহস্থালী ছাড়িয়া, চাষা লাঙ্গল ছাড়িয়া, তাঁতী তাঁত ছাড়িয়া, কামার হাতুড়ি ছাড়িয়া, ছুতার বাঁশ ছাড়িয়া রাজনীতিক্ষেত্রে আসিয়া হুঙ্কার রবে আপনাপন মতামত ব্যক্ত করিতেছে। এবম্বিধ হুলস্থূল ব্যাপারের মধ্যে আমাদের কথা কে শুনিবে?

প্রঃ। বাজারে না বিকাইলেও আমাদের কাছে খুব বিকাইবে। আপনি বলুন, দেশের আধুনিক আন্দোলন সম্বন্ধে আপনার কি বক্তব্য।

উঃ। কি জান, অধিক দিন জীবিত থাকিলেই অনেক দেখা যায়। যাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, তাহাই ঘটিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়াছি। আগে মনে করিতাম, শীঘ্র শীঘ্র ইহলোক হইতে পলায়ন করিতে পারিলেই ভাল, কিন্তু এখন মনে করি, আরও কিছু দিন বাঁচি, আরও কিছু দেখি। যেমন লঙ্কাবিজয়ের পর রাবণ-জননী নিকষা রামচন্দ্রের নিকট দীর্ঘায়ুর জন্য বর প্রার্থনা করায় তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এরূপ কামনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বৃদ্ধা বলিয়াছিল, "রাম! এ জীবনে লঙ্কেশ্বর দশাননের কত না বৈভব পরাক্রম দেখিলাম; আবার আজ বীর পুত্র পৌত্রগণের শোকে জর্জ্জরিত হইয়া সোণার লঙ্কাপুরী ধ্বংসাবশেষের উপর দাঁড়াইয়া আছি, আর কিছু দিন বাঁচিলে আরও কি না দেখিব!"

প্রঃ। বাস্তবিকই আপনি অনেক দেখিলেন, ভগবানের কৃপায় দীর্ঘজীবী হইয়া আরও দেখিবেন। দেশের অবস্থা এখন কি বুঝিতেছেন?

উঃ। দেশের অবস্থা কুব্যবস্থায় হীন হইয়া পড়িয়াছে। রাজা ও প্রজার ধর্ম্মে অনাস্থাবশতঃ উভয়ে পাশব শক্তি অবলম্বনে প্রয়াসী। একদিকে বস্তা বস্তা আইনের চাপ্ প্রয়োগ, অপর দিকে শাস্তাকে আত্মা-

সাবুদ করিবার অভিপ্রায়ে নানাবিধ চোরা-গোপ্তা উপায় অবলম্বনের উদ্যোগ। এরূপ সস্তায় কাজ সারিতে গিয়া দেশটাকে উৎসন্নের রাস্তায় যে ধাক্কা দিয়া ফেলা হইতেছে, তাহা কাহারও খেয়াল নাই। এ হেন দুর্দ্দিন বুঝি ভারতে আর কখন হয় নাই—রাজা প্রজা উভয়ের পক্ষে আজ বিষম বিভ্রাট উপস্থিত। সাধারণ ভাবে ত এই বলিলাম। এখন বিশেষ কথা কি জানিতে চাও, প্রশ্ন কর, উত্তর দিতেছি। দেশের ছোট বড় নেতৃপুরুষগণ কে কিরূপ মতামত প্রচার করিতেছেন, রাজপুরুষদিগের মধ্যেই বা কিরূপ জল্পনা চলিতেছে, শুনিলে যথাযথ মন্তব্য প্রকাশ করিব।

প্রঃ। প্রথমে মোটা কথা পাশব শক্তি প্রয়োগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, অবস্থানুযায়ী উহার ফলাফল কিরূপ সম্ভবে শুনাইয়া কৃতার্থ করুন।

উঃ। কেবলমাত্র আসুরিক বলের দ্বারা কখন কোথাও কোন কাজ সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় নাই, যদি হইয়া থাকে, দুই দিনের জন্য। দশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া যে অবস্থা আনা হয়, তাহা কোন প্রকারে স্থায়ী হইতে পারে না। সাংসারিক লোকে সাধারণতঃ বলিয়া থাকে বটে :—"বলং বলং বাহুবলং," পরন্তু তদুপরি উচ্চ কথা :—"বলং বলং ব্রহ্মবলং।" ঈশ্বর কৃপা ব্যতীত কোন দেশে কোন কালে কোন রূপ কল্যাণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এখন দেখিতে হইবে, ঈশ্বর-কৃপার অর্থ কি। ভগবানের দয়া যখন-তখন যাহার-তাহার প্রতি হয় না কেন? ভগবদনুগ্রহ লাভ করা সাধন-সাপেক্ষ, সাধনা ভিন্ন তাঁহার প্রসাদে কোন বিষয়ে সিদ্ধি সম্ভবে না। যাহা হউক, ও সকল সূক্ষ্ম কথা রাখিয়া স্থূল দৃষ্টিতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, এখন তাহারই আলোচনা করা যাউক। আমি জানিনা, কিন্তু যদি তোমাদের মধ্যে কোনরূপ মার্‌কাট্‌পন্থীর দল থাকে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, মার্‌কাট্‌ করিবার উদ্যোগে যে সকল আন্তরিক ও বাহিক উপকরণের দরকার, তাহার যোগাড় কৈ? শুনিতেছি "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া মুখে ও কলমে নানা সুরে বিস্তর ফাঁকা আওয়াজ হইতেছে এবং "রণনীতি" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়া কতকগুলি যুবকের হস্তে শোভা পাইতেছে। "মাথা নাই তা'র মাথাব্যথা"—রণ কোথায়? কাহার সঙ্গে রণ যে, তজ্জন্য যুদ্ধের প্রণালী শিখিবার এত তাড়াতাড়ি পড়িয়াছে? সুদূর বিদেশে কোথাও যুদ্ধ বাধিয়াছে, সংবাদপত্রে পড়িতে ভাল, কোন একপক্ষ অবলম্বন করিয়া বা নিরপেক্ষ ভাবে ঘটনাবলীর সমালোচনা করিতে বেশ; নিকটে কোথাও সংগ্রাম ঘটিলে নিরাপদে কোন সু-উচ্চ স্থান হইতে দর্শনলাভের সুযোগ যদি পাওয়া যায়, নিতান্ত মন্দ নয়, কিন্তু সমরের হাঙ্গামা পোহাইতে পারা দূরে থাকুক, উহার আঁচ গায়ে লাগিলেও ত তাত্‌ সহিবে না। একটা ঘটনা মনে পড়িয়া হাস আসিতেছে :—পঁয়ত্রিশ বৎসর হইল কলিকাতা মেডিকেল কলেজের দেশীয় ও ফিরিঙ্গি ছাত্রদের মধ্যে একটা মারামারি হয়,—মারামারি বলিলে দোষ হয়, কারণ এক পক্ষই বিশেষ রূপে প্রহৃত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে একজন বাঙ্গালী ছাত্রকে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে দেখিয়া জনৈক পথিক কৌতূহলবশাৎ তদবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, পলায়মান যুবক দৌড়িতে দৌড়িতে উত্তর করিলেন,

"আমি এখন ডেস্পারেট্" (মরিয়া) হইয়াছি।" তাই ভাবি, রণের সম্মুখে উপস্থিত হইলে আমাদিগের প্রায় সকলকেই ঐরূপ ভাবে "ডেস্পারেট্" হইতে হইবে। এই ত আমাদের কার্দানি! বাক্‌যুদ্ধে, মসিযুদ্ধে আমরা সিদ্ধহস্ত বটে, ঐ দুই রকম যুদ্ধে আমাদিগকে হটায় এমন কেহ আজও জন্মে নাই, কিন্তু আসল যুদ্ধের উপযোগী মানসিক, দৈহিক ও বাহ্যিক সম্বল আমাদের কি আছে, বলিতে পার কি? হৃদয়ের বল, শরীরের বল, লোকের বল ও অস্ত্রশস্ত্রের বল, এতগুলি বলের উপর সুশৃঙ্খলা, সুপ্রণালী ও সুব্যবস্থা চাই, তবে যুদ্ধ হয়; যুদ্ধ ত ফলার নয় যে চিড়া, দই,চিনি, মর্ত্তমান রম্ভা একত্রে মাখিয়া সপাসপ গলাধঃকরণ করা হইবে। শুধু নুন লেবু যোগাড় করিয়াই যদি আহারের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে, মনে করি, সেটা মন্দ কথা নয়; কিন্তু উহাতে ত ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি হয় না। কথায় বলে,—"বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছি, তবে যাহা কিছু কষ্ট অন্নবস্ত্রের।" আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাও সকল দিকে তদ্রূপ দাঁড়াইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে রণের কথা মনে মনে ভাবাও ঘোরতর বাতুলতা, মুখে আনা দূরে থাকুক। যদি বল, যুদ্ধ ব্যতীত এ নিগড় খসাইবার উপায় কি? তবে কি কল্পান্ত পর্য্যন্ত আমাদিগকে এই শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় কাটাইতে হইবে? উহা ত অসম্ভব; প্রকৃতির সনাতন নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ওরূপ বিশ্বাস কি প্রকারে করি? সুতরাং স্বাধীনতা-লাভোদ্দেশে রণনীতির আলোচনা আবশ্যক হইয়াছে। তদুত্তরে আমাকে প্রশ্ন করিতে হয়, নিজ বাহুবলে পরাধীনতাপাশ মোচন করিবার সময় কি অদূরবর্ত্তী? ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ত একবার গা-নাড়া দিয়া চেষ্টা করা হইয়াছিল, ফলে কি দাঁড়াইল? বরং সে সময় কতক আশার কথা ছিল, কারণ তখন এতটা শিকড় বসে নাই; কিন্তু বিধাতার পঞ্জিকায় কেবলমাত্র বিফল বিপ্লবই লেখা ছিল, কাজেই সব ফাঁসিয়া গেল। সিপাহী যুদ্ধের কথা আমাদের মধ্যে বৃদ্ধদিগের বিলক্ষণ স্মরণ আছে, মনে পড়িলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। অবশ্য তাহাতে রাজা প্রজা উভয়েরই অনেক শিক্ষা লাভ হইয়াছে। উক্ত ব্যাপারের বিষয় এখানে কিছু আলোচনা করিলে ক্ষতি নাই। বাঙ্গালা মুলুকে বেশী উৎপাত হয় নাই, অরাজকতা, অত্যাচার, যুদ্ধাদি বিহার প্রদেশের পশ্চিমাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া দিল্লী পর্য্যন্ত প্রবল প্রকোপের সহিত চলিয়াছিল। অনন্যগতি দুর্ব্বল ভীরু বাঙ্গালীরা বরাবর কোম্পানির পক্ষে থাকিয়া রাজশক্তির বিশেষ সাহায্য করিতে ত্রুটি করে নাই। এ কারণ পশ্চিম-প্রবাসী বাঙ্গালীর দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। আমাদের দুইজন আত্মীয় (স্ত্রী পুরুষ) বিবস্ত্র অবস্থায় জঙ্গলে শালপাতা সেলাই করিয়া লজ্জা নিবারণ করতঃ ভিক্ষা করিতে করিতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ভোলানাথ চন্দ্র নামক এক ব্যক্তি তাঁহার পর্য্যটন-গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন—

"The Bengalees at Allahabad cowered in fear, and awaited within closed doors to have their throats cut. The women raised a dolorous cry at the near prospect of death."—Travels of a Hindoo.

অর্থাৎ এলাহাবাদের বাঙ্গালীরা ভয়ে জড়সড় অবস্থায় বাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া জপিতেছিল, কখন্ বিদ্রোহীর দল আসিয়া তাহাদের গলা কাটিয়া যায়; স্ত্রীলোকেরা

আসন্ন মৃত্যু ভাবিয়া গভীর দুঃখব্যঞ্জক স্বরে রোদন আরম্ভ করিয়াছিল। বাস্তবিক এলাহাবাদ, মিরাট প্রভৃতি স্থানে তখন ভয়ানক অরাজকতা, বিদ্রোহী সিপাহীগণের সঙ্গে দেশের দুর্বৃত্ত পিশাচপ্রবৃত্তি দস্যুরা যোগ দিয়া অকুতোভয়ে উদ্দাম নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছিল, গৃহদাহ, নরহত্যা, লুণ্ঠন, রমণীর প্রতি পাশব ব্যবহার, শিশুবধ তাহাদের নখাগ্রে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ১৮৫৭ সালের মে মাসে কোম্পানির অধীনে ৪৫০০০ গোরা ও ২৪৪০০০ কালাসৈন্য এবং ৮০০০০ মিলিটারি পুলিস ছিল, এই ৩২৪০০০ দেশীয় সিপাহীর মধ্যে মোটে ৬০০০০ বশে থাকে, বাকী সমস্ত বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। নামকাটা ও পেন্সনপ্রাপ্ত সিপাহীগণের মধ্যেও অনেকে কোম্পানির বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করে, সুতরাং ন্যূনাধিক আড়াই লক্ষ শিক্ষিত সেনার সঙ্গে ইংরাজকে যুদ্ধ করিতে হয়। তবে সুবিধার বিষয় এই যে, পঞ্জাব হইতে ৯০০০০ শিখসৈন্য আসিয়া বিপ্লবক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, ৪০০০০ গোরাও বিলাত হইতে পঁহুছে এবং নেপাল হইতে স্বয়ং জঙ্গ বাহাদুর কয়েক সহস্র গুর্খা পদাতিক সহ অবতরণ করেন; এতদ্ব্যতীত দেশীয় নৃপতি-বৃন্দ সকলেই আপনাপন ফৌজ দিয়া ইংরাজকে যথাশক্তি সাহায্য করিয়াছিলেন। সর্ব্বোপরি সাম্রাজ্যের সাধারণ প্রকৃতিবর্গ হৃদয়ের সহিত বৃটিশসিংহের জয় কামনা করতঃ যাহার যেমন সাধ্য সহায়তা করিতে ত্রুটি করে নাই; শ্বেতাঙ্গের ন্যায়বিচারের প্রতি তাহাদের এরূপ গভীর আস্থা ছিল। কলিকাতার কালীঘাটে, কাশীর বিশ্বনাথ-মন্দিরে, এইরূপে নানা স্থানের দেবালয়-সমূহে ইংরাজরাজের মঙ্গলোদ্দেশে নিয়ত পূজার্চ্চনা হইয়াছিল।

আর একটা কথা, তোমরা হয় ত বিশ্বাস করিবে না যে, যে সকল জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ মানবসমাজের কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হইয়া হিমালয়-প্রদেশে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারা বিশেষ যত্নসহকারে বৃটিশপক্ষে আনুকূল্য করিয়াছিলেন। ইহা আমার কথা নয়, সিনেট নামক জনৈক ভারত-ফেরত ইংরাজ তাঁহার একখানি গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন :—

"Many old Indians, and some books about the Indian Mutiny, take note of the perfectly incomprehensible way news of events transpiring at a distance would sometimes be found to have penetrated the native bazaars before it had reached the Europeans at such places by the quickest means of communication at their disposal. The explanation, I have been informed, is that the Adept Brothers who were anxious to save the British power at that time, regarding it as a better government for India than any system of native rule that could take its place, were quick to distribute information by their own methods when this could operate to quiet popular excitement and discourage new risings."

—The Occult World by A, P. Sinnet, Eighth Edition, page 103.

অর্থাৎ দূরদেশে ইংরাজের অনুকূল কোন ঘটনা ঘটিলে কয়েক ক্ষেত্রে তাহার সংবাদ স্থানীয় শ্বেতাঙ্গগণের কর্ণগোচর হইবার পূর্ব্বেই বাজারে প্রচারিত হয়। সিনেট সাহেব জানিতে পারিয়াছেন যে, বর্ত্তমান উপদ্রবের প্রশমন ও নূতন উৎপাত নিবারণ উদ্দেশে উক্ত অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন মহাত্মাদের দ্বারা ঐরূপ কার্য্য সম্পাদিত হইত। তাঁহারা জানিতেন যে, তৎকালে ইংরাজহস্তে রাজ্যের ভার থাকাই শ্রেয় ছিল।

বেনারস বিভাগের তখনকার কমিশনর

টাকার সাহেব সরকারী রিপোর্টেও প্রকাশ করেন :—"I do firmly believe that there is a special divine influence at work on men's minds to keep them quiet."—তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস যে, ঈশ্বর বিশেষভাবে প্রজাকুলের চিত্তের উপর ক্রিয়া-দ্বারা তাহাদিগকে শান্ত রাখিয়াছেন। সিপাহীযুদ্ধ-প্রণেতা কে সাহেবও লিখিয়াছেন,—"The good Providence battled for us on our side."—J. W. Kaye.—মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদের দিকে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন।

বিপ্লবকালে যেমন অশিক্ষিত অসভ্য বর্ব্বর জ্ঞানধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত সমাজের নিম্নস্তরস্থ হিন্দেনগণ শ্বেতাঙ্গ নরনারীর প্রাণনাশ করতঃ আনন্দ অনুভব করিয়াছিল, তদবসানে সুসভ্য সুশিক্ষিত জ্ঞানী ধার্ম্মিক মানব-সমাজের ভূষণ স্বরূপ মহাত্মাগণ কেবলমাত্র প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করণোদ্দেশে দোষীর সহিত বিস্তর নিরীহ বৃদ্ধরমণী ও শিশু বধ করিয়া প্রীতি সম্ভোগ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। কেবলমাত্র এলাহাবাদে তিন মাস কাল ক্রমাগত নরবলি দিয়া ছয় হাজার প্রজাকে শুধু সন্দেহের উপর যমালয়ে প্রেরণ করা হয়। যাঁহারা এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, তাঁহারা সগৌরবে প্রকাশ করিয়াছেন,—"spared no one." "peppering away at niggers enjoyed amazingly."

কর্ণেল নিকলসন অন্য একজন কর্ণেলকে তৎকালে যে পত্র লিখেন, তাহাতে প্রকাশ করেন :—"Let us propose a Bill for the flaying alive, impalement or burning of the murderers of our women and children. The idea of simply hanging the perpetrators of such atrocities is maddening."

ইহাকেই বলে ব্যাঘ্রবৃত্তি!

প্রঃ। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এই লোমহর্ষণ কাণ্ডের মূলীভূত কারণ কি কেবল দাঁতে টোটা কাটাইবার হুকুমের আশঙ্কা?

উঃ। এতৎসম্বন্ধে একটা মোটা কথার খেয়াল করা হয় নাই। অনেকেরই ধারণা যে, উহা ঐ সামান্য কাল্পনিক কারণ ধরিয়া সংঘটিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা ঠিক নয়। সম্যক আলোচনার এখানে প্রয়োজন নাই, কেবল একটা কথা দেখা যাউক। ভোজপুর অঞ্চলের জগদীশপুর নামক স্থানের জমীদার বিখ্যাত কুঙর সিংহ অস্ত্রধারণ করিয়া প্রথমটা একটু কারদানী প্রকাশ করায় উক্ত প্রদেশে এই ছড়াটী প্রচলিত হয় :—

"রাজা ভৈলে ঝিঙ্গুলী দিওয়ান ভৈলে ধুনিয়া।
মারেলে কুঙর সিংহ দলকলে ছুনিয়া॥"

অর্থাৎ রাজা ও তাঁহার মন্ত্রীবর্গ হীন-প্রকৃতির না হইলে রাজ্যে বিভ্রাট ঘটিতে পারে না, এইরূপ ঘটায় কুঙর সিংহের প্রহারের চোটে ছুনিয়া কম্পমানা। বাস্তবিক রাজপুরুষগণের নৈতিক-বল যতদিন সতেজ থাকে, ততদিন সহস্র উপদ্রবকারী একত্র হইলেও কিছুই করিতে পারে না। সাধারণ কথায় বলে, রাজার পাপ না হইলে রাজ্যে অঙ্গল ঘটিতে পারে না। রাজা যদি নিষ্পাপ থাকিয়া লোভশূন্য হৃদয়ে নিক্তির তৌলে ন্যায়-বিচার দ্বারা রাজ্য শাসন করেন, কেবলমাত্র দুরভিসন্ধি চরিতার্থ হেতু কেহ তাঁহার কোনরূপ অতি সামান্য ক্ষতিও করিতে পারে না; আর অপর পক্ষে রাজার ধর্ম্মবলের যদি অভাব হইয়া পড়ে, বজ্রদণ্ডেও বিপ্লব আটকাইয়া রাখা যায় না। ইতিহাস ত এ বিষয়ে বারম্বার সাক্ষ্য দিয়াছে।

যাহা হউক, অনেক রক্তারক্তির পর

বিধাতার মঙ্গল-বিধানে দেশে পুনরায় শান্তি সংস্থাপিত হইল। কোম্পানির হাত হইতে সাম্রাজ্যের শাসনভার খোদ ইংলণ্ডেশ্বরী গ্রহণ করিলেন। সওদাগর সম্প্রদায়ের কার্য্যকলাপের তদারক মাত্র এতদিন বৃটিশ পার্লামেণ্টের হস্তে ন্যস্ত ছিল; এখন হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহারাই ভারতের রাজ-রাজেশ্বর হইলেন। সব গোল মিটিল, কিন্তু ফলে কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা এই অর্দ্ধ শতাব্দীকাল সাক্ষ্য দিবে।

সিপাহীযুদ্ধে বেশ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের দ্বারা ওভাবে স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব বলিলে সত্যের কিছুমাত্র অপলাপ করা হয় না। তবে ইহাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, রাজা প্রজা উভয়কে আক্কেল দিবার জন্য ঐ বিভীষণ ব্যাপারের অভিনয় আবশ্যক হইয়াছিল। সংসারে যাহা কিছু ঘটিতেছে, সমস্তই মঙ্গলের জন্য, মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কি প্রকারে সম্ভবে? কোম্পানির অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া সিপাহীরা ক্ষেপিয়াছিল, তাহাও ঠিক, সাম্রাজ্যময় ঘোর বিপ্লব ঘটিল, তাহাও ঠিক, আবার তুমুল সংগ্রামের পর শান্তি পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাও ঠিক। নানা শ্রেণীর কত দোষী নির্দ্দোষী শ্বেতাঙ্গের ও কৃষ্ণাঙ্গের শোণিতে ধরণী কলঙ্কিত হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু মোটের উপর সংসারের কল্যাণ বৈ অকল্যাণ হয় নাই, ইহা নিশ্চয়। সমগ্র বিশ্বের ইষ্টের দিকে সকলে ধাবিত। আমা-দের দৃষ্টি অতি ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ, তাই একদেশদর্শিতা হেতু আমরা বিশেষ বিশেষ স্থলে অশুভের লক্ষণ দেখিয়া ক্ষুণ্ণ ও চিন্তিত হৃদয়ে নানারূপ বিলাপ করিয়া থাকি। আবার ওটাও আমাদের ব্যক্তিগত বিকাশা-ক, কুত্রাপি অসঙ্গতি নাই। সুবি-খ্যাত ফরাসীবিপ্লবের কথা বোধ হয় জান, কি ভয়ঙ্কর ঘটনাবলী দ্বারা উহার কলেবর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, ভাবিলে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে! ঐ শ্রেণীর লোমহর্ষণ কাণ্ড সংসার আর একটী দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। কি ভয়ানক রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়া ফরাসী রাজ্য ভাসাইয়া দেয়! সমসাময়িক কত মনীষী উহার তীব্র সমালোচনা করিয়া গিয়া-ছেন। পরন্তু এখন লোকে বিলক্ষণ বুঝি-তেছে, উহা দ্বারা সমস্ত ইউরোপের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সভ্য জগতের কি পরিমাণে উপকার সাধিত হইয়াছে। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে উহার শতবার্ষিক উৎসবোপলক্ষে পারিস নগরে একটী বিরাট প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার অন্তর্গত সহস্র সহস্র দৃশ্যের মধ্যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাস্তীলধ্বংসের * জীবন্ত অভিনয় অন্যতম। সেই সময়ের সর্ব্ববিধ অবস্থায় অনুরূপ রাস্তা পথ, ঘর দুয়ার, দোকান পাট প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত একটী নকল পল্লী ও তন্মধ্যস্থ বাস্তীলগৃহ এবং তাৎকালিক আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ ঠিকঠাক বজায় রাখিয়া অন্যান্য ব্যাপার প্রদর্শিত হইয়া-ছিল। তথায় প্রত্যহ বৈকালে কারাগার ধ্বংসকালীন যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত পর্য্যায়-ক্রমে প্রত্যক্ষ কার্য্য দ্বারা অভিনয় করা হইত। একদিন আমাদের সঙ্গে দুইটী ফরাসী মহিলা ছিলেন, অভিনয়ান্তে একটু দুঃখের সহিত হৃদ্বিদারক দৃশ্য সমূহের কথা উল্লেখ করায় তাঁহারা একটু বিস্মিত হইয়া, অথচ আহ্লাদের সহিত, বারম্বার বলিতে লাগিলেন।—"ঐ বিপ্লব না ঘটিলে আমরা কখনই এত উন্নতি লাভে সক্ষম হইতাম না,

* Bastille নামক রাজনৈতিক কারাগার।

এবং আজ এখানে আপনার মত সুদূর দেশ-বাসী প্রাচ্য ভদ্রলোকের সহিত একত্রে দাঁড়াইয়া এই আমোদ উপভোগ করিতে পাইতাম না।"

কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। সংক্ষেপে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, "সুপ্রতিষ্ঠ ধাতার বিধান," যখন যেখানে যাহা ঘটিতেছে, বাহ্যিক ভাব যেমনই হউক, তাহাই উত্তম ও নিতান্ত উপযোগী, অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের এ বিশ্বে আদৌ স্থান নাই। তোমার একটী পুত্র হইল, তুমি আনন্দে বিভোর, অতি সুন্দর; আবার সেই পুত্র কিছু দিন পরে তোমাকে অকুল শোক-সাগরে ভাসাইয়া কালের গ্রাসে পড়িল, তাহাও অতি সুন্দর। আগুনে পুড়িয়া সোণার যেমন নির্ম্মল-কান্তি উজ্জ্বল বর্ণ হয়, আমরা, তেমনি, ঘোর দুঃখ বিপদের ভিতর দিয়া আসিয়া পবিত্রতা লাভ করতঃ সকল কল্যাণের আকর ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইয়া থাকি। অধুনা এই যে রাজ্যময় ঘোর অশান্তি উপদ্রবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, কত লোকের কারাবাস দ্বীপান্তর ইত্যাদি হইতেছে, ইহাও নিশ্চয় আমাদের কল্যাণের নিমিত্ত; ভবিষ্যতে সুফল প্রদান করিবার জন্যই এবম্বিধ আপাত দুঃখজনক ব্যাপার সমূহের অবতারণা। সুকোমল পুষ্প শয্যায় সুখে ঘুমাইতে ঘুমাইতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারা বিধাতার ব্যবস্থায় লেখা নাই। উন্নতির পথ চিরকাল কণ্টকাকীর্ণ।

প্রঃ। এই যে মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী নামে দুই দল হইয়াছে, ইহাদের সম্বন্ধে কি বলেন?

উঃ। উহারা উভয়েই ভাঙ্গা গাঁয়ের মোড়লীর জন্য বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত। একটা গল্প শুনা যায়, বড়বাজারের পথে দুই ব্যক্তি "হীরালাল শীলের টাকা বেশী, কি শ্যাম মল্লিকের টাকা বেশী?"—এই তর্কে উপনীত হইয়া শেষে ঘোর বিতণ্ডা, মারামারি, ঘুসাঘুসি, রক্তারক্তি; তার পর উভয়ে গেরেপ্তার হইয়া পুলিশ কোর্টে হাজির। ইহাদেরও দশা তাই হইবে;—"এলো শ্রাদ্ধের গুতো দক্ষিণা।" এক পক্ষ বলিতেছেন, "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন" লাভের জন্য চেষ্টা করাই উচিত; অপরের দাবী "নির্ভেজ স্বরাজ।" এই দুইয়ের কোন্‌টা যে কে দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহা ত জানিনা। উভয়েরই উদ্দেশ্যের সরল ব্যাখ্যা;—বৃটিশ সিংহকে রম্ভা প্রদর্শন। আমরা শশক হইয়া পশুরাজকে একদম্ বোকা বুঝাইয়া তাঁহার হাত হইতে কাননের প্রভুত্ব কাড়িয়া লইব, এ কিরূপ দুরাশা! তবে—

'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য অবোধস্য কুতোবলং
পশ্যসিংহ বনে রাজা শশকেন নিপাতিতঃ।"

পঞ্চতন্ত্রের ক্ষুদ্রকায় হীনশক্তি শশক যেমন ভীমপরাক্রম বিশালবপু মৃগেন্দ্রকে কেবলমাত্র বুদ্ধিবলে পরাভব করতঃ অনায়াসে সমনসদনে প্রেরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তেমনটী পারিলে মন্দ নয়। কিন্তু সে ক্ষেত্র কোথায়?

মধ্যপন্থীরা বলেন, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতির মত নামে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকিয়া আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী আপনাদের দেশ আপনারা শাসন করিব; অপর দলের কথা,—ওটুকু সংশ্রব আবার কিসের জন্য? আমেরিকার মত স্বাধীনতা না পাইলে চলিবে না;—একদম্ আঙুল ফুলে কলাগাছ! ইহাঁদের পায়ে ধরিয়া বলি,—আরে ভাই!

একটা কথার মারপেঁচ লইয়া আপনাদের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া বৃথা বলক্ষয় কর কেন? এই শক্তি সঞ্চয়ের সময় এক কাঁচ্চা বলই বা কি জন্য অনর্থক নষ্ট হয়? কোন প্রকারে যদি কানাডাদির মত স্বাতন্ত্র্য হাসিল করিতে পার, তার পর বাকীটুকু খসাইতে মোটেই বেগ পাইতে হইবে না। লক্ষ টাকা জমা করিতে পারা বড়ই দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু একবার একলাখ্ টাকা হাতে হইলে তখন সামান্য যত্নেই হুহু করিয়া দশ বিশ লক্ষ আসিয়া পড়ে। চরমপন্থীদের আর এক কথা বিবেচনা করা উচিত যে, মধ্যপন্থীদের মনে কি আদৌ সাধ হয় না যে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমরা পৃথিবীর মধ্যে একটা গণ্য মান্য জাতি হইয়া একবার বুক ফুলাইয়া দাঁড়াই? কুব্জের কি ইচ্ছা হয় না যে, চিৎ হইয়া শয়ন করে? কিন্তু কি করিবে, কুঁজে যে ঠেকে।

প্রঃ। কোন গণ্য মান্য ব্যক্তি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের আয়োজন চলিতেছে; সে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বচ্ছন্দতা, স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা দোষের, উহা আত্মবিস্মৃতিজনিত আত্মহত্যা।

উঃ। গার্হস্থ্য, সামাজিক, রাজনৈতিক, মানসিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ স্বাধীনতার মধ্যে কোন একটা বাদ দিয়া যে মনুষ্যত্বের পথে দাঁড়াইতে পারা যায়, ইহা এই প্রথম শুনিলাম। শাস্ত্রে প্রচারিত,—"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং; সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।" কোন না কোন প্রকার পরাধীনতা পরবশতা ভিন্ন অশান্তি দুঃখ আসিতে পারে না। আন্তরিক ষড়রিপুর অধীনতায় মানুষ যেমন কষ্ট পাইয়া ক্রমে হীন হইয়া পড়ে, বাহিরের লোকের অত্যাচার উৎপীড়নের চাপেও দুঃখ ভোগ করিতে করিতে তেমনি অপদার্থ হইতে থাকে। কোন ব্যক্তির দাপটে নিজের ঘরে নিজে চোরের মত থাকা যেমন নরক ভোগ, নিজের দেশে তেমনি পরাধীনতার পেষণে কালাতিপাত দারুণ যন্ত্রণার কারণ। কোন হেতুতে সর্ব্বদা ভয়াকুল অবস্থায় জড়সড় থাকিলে যে সঙ্কোচন বৈ প্রসারণের আশা নাই; ইহা ত অতি পুরাতন সত্য।

"ধীরে ধীরে যাই ফিরে ফিরে চাই,
গৌরাঙ্গ দেখিলে ভুমেতে লুটাই।"

ভাবটা কি মনুষ্যত্ব বিকাশের পূর্ব্বভাস? মুখ ফুটিয়া প্রাণের গভীর বেদনা জানাইতে যাওয়া যেখানে ঘোরতর অপরাধের মধ্যে গণ্য, সেখানে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ত দূরের কথা, উহার বীজ পর্য্যন্ত যে মারা যাইতে বসিয়াছে, ইহাও কি এখন বুঝাইয়া বলিতে হইবে? পিষ্টপেষিত অবস্থায় কোণ্‌ঠেশা হইয়া ভিজাবিড়ালের মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকাকে "আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মহত্যা" করা বলে না। উহার প্রতিকার চেষ্টাকে উক্ত আখ্যা দেওয়া যায়, ইহার মীমাংসা তোমরা কর, আমি আর কি বলিব! অক্ষমতা হেতু পড়িয়া মা'র খাইতেছি, মুখে রা নাই, অথচ মনে মনে প্রহারকের চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ করিতেছি, অপরদিকে প্রকৃত শক্তি থাকা সত্ত্বেও অত্যাচারীর প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহার অপরাধ উপেক্ষা করিতেছি, উপরান্ত তাহার আত্মার কল্যাণকামনায় ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিতেছি। জিজ্ঞাসা করি, ইহার কোন্‌টী সহিষ্ণুতা নামের যোগ্য। যে সদ্‌গুণ মনুষ্যত্ববিকাশের একটা প্রধান উপকরণ, ঐ দুই শ্রেণীর কোন্‌টায় আমাদের স্থান, বল দেখি?

এই দুর্দ্দিনে যাঁহারা উক্তরূপ বাক্যবিন্যাস দ্বারা সকল দিক বজায় রাখিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহারা সুখের পায়রা, দুঃখের ধার দিয়া যাইতে পারেন না। জনকতক মুষ্টিমেয় সম্পন্ন ভাগ্যবান ব্যক্তি ব্যতীত ভারতের আপামর-সাধারণ যে বর্ত্তমান শাসন-নীতির অধীনে খাবি খাইতেছে, প্রাণপাখী অন্নাভাবে কখন্ দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া পলায়, তাহার ঠিক নাই, এ সংবাদ তাঁহারা রাখিয়াও রাখেন না। মহাত্মা কবীর গাইয়াছেন :—

"দুঃখী পড়ে পাহাড়তল কোই না খবর লিন্।
সুখীকো যো কাঁটগড়ে সবকোই হায় হায় কি।"

গরিব পাহাড়চাপা পড়িলেও কেহ তাহার খোজখবর লয় না, আর ধনীর অঙ্গে একটা সামান্য কাঁটা ফুটিলেই দেশশুদ্ধ লোক "হায়! হায়! করিয়া ছুটিয়া বেড়ায়; সংসারের এই নিয়ম।

সাম্রাজ্যের সর্ব্ববিধ দুর্দ্দশার বিষয় যাঁহারা প্রাণের সহিত নিয়ত চিন্তা করিয়া থাকেন, এবং তজ্জন্য বিরলে বসিয়া শোকাশ্রু বিসর্জ্জন

যারা অন্তরিন্দ্রিয়ের ভার কমাইতে চেষ্টা পান, হৃদয়ের তপ্ত শোণিত দিয়া যাঁহারা মায়ের পায়ে আল্‌তা পরাইতে সর্ব্বদা প্রস্তুত, কেবল মাত্র সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণ এই তুমুল তুফানে হা'লে বসিবার অধিকারী; আর যাঁহারা কেবল ভে'টেল গাঙ্গে সুবাতাসে পা'লতোলা নৌকায় আগ্রহসহকারে কর্ণধারের পদগ্রহণে অগ্রসর, ঝড়ঝাপটের সময় তীরে দাঁড়াইয়া ঢেউ গণিতে বাহাদুর, জলের ধারেও যাইতে সাহস করেন না, তাঁহাদের ডাঙ্গার মাঝিগিরি এ সময়ে বিকায় না।

প্রঃ। ভাবের মত্ততায় কি কোন কাজ হইয়া থাকে?

উঃ। নিশ্চয়! নিশ্চয়! নিশ্চয়! ভাবের তেজ ভিন্ন কোথাও কোন বড় কাজ হয় নাই। ভাব ত চিন্তাপ্রসূত, তীব্রচিন্তাদ্বারাই গভীর ভাবের জন্ম হইয়া থাকে। আগে ভাব না থাকিলে কাজ কিসের উপর হইবে? ঈশ্বরের কল্পনা বা ভাবাইত সৃষ্টিকার্য্যের মূলে একমাত্র কারণরূপে বিদ্যমান। বহুজন দ্বারা কোন কাজ করাইতে হইলে আগে তাহাদের মধ্যে ভাব ছড়াইয়া দেওয়া নিতান্ত দরকার। ভাবই ত আসল জিনিস। চিন্তাশক্তির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, এখন একটু ভাল করিয়া বলা যাউক। ইংরাজী দলীল দেখাইলে হয়ত ভাল বুঝিতে পারিবে। আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কি বলিতেছেন, শুন;—

'Thought is not, as is many times supposed, a mere indefinite abstraction, or something of a like nature. It is, on the contrary, a vital, living force, the most vital, subtle and irresistible force there is in the universe. In our very laboratory experiments we are demonstrating the fact that thoughts are forces. They have form, and quality, and substance, and power, and we are beginning to find that there is what we may term a science of thought. We are beginning also to find that through the instrumentality of our thought-forces we have creative power, not merely in a figurative sense, but creative power in reality"—R. W. Trine.

অর্থাৎ চিন্তা একটা অনিবার্য্য সূক্ষ্ম জীবন্ত শক্তি, যাহার নিকট বিশ্বের আর সব শক্তি নতশির। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াগারে পরীক্ষিত হইয়াছে যে, উহার মূর্ত্তি আছে এবং সূক্ষ্মজগতের বিপুলশক্তি উহাতে বিদ্যমান, ইহাও ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে যে, বাস্তবিক উহার সৃষ্টিশক্তি আছে।

'প্রাগুক্ত সিনেট সাহেবও একস্থলে বলিয়াছেন—'The human brain is an exhaustless generator of the most refined quality of cosmic force out of the low, brute energy of Nature." A. P. Sinnet.

অর্থাৎ প্রকৃতির স্থূল জড় পরাক্রম হইতে অতি উচ্চশ্রেণীর বৈশ্বশক্তি উদ্ভব করিবার জন্য মানবমস্তিষ্ক একটী অনন্ত প্রস্রবণ।

এখন "ভাবের মত্ততা" কথাটা দেখা যাউক। যাঁহারা বলেন, "ভাবের মত্ততায় কোন কাজ হয় না" তাঁহারা যদি উহাকে কৃত্রিম একটা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র বোধ করেন, সে স্বতন্ত্র কথা; পরন্তু প্রকৃত ভাবের খাঁটি মত্ততা বড় শক্ত জিনিস। হৃদয়ের সরল প্রেমাবেগের একটু বেশী মাত্রাকে যদি ভাবের মত্ততা বলা যায়, তাহা হইলে উহা ত স্বর্গের সামগ্রী। পৃথিবীর ইতিহাসখানার পাতা উল্টাইয়া দেখিলেই জানিতে পারা যায় যে, প্রত্যেক বড় কাজ যাহার দ্বারা অসাধ্যসাধন হইয়া জগৎকে চমকিত করিয়াছে, তাহার মূলে ভাবের মত্ততা। তবে কি জান, যে মত্ততা হইতে অসমসাহসিকতা জন্মগ্রহণ করতঃ দুরূহ কার্য্যসমূহ সম্পাদন দ্বারা সংসারের কল্যাণ-সাধন করে, তাহাকে লোকে অসাধারণ বীরত্ব নাম দিয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত তাহার পূজা করিয়া থাকে; আবার তাহাই বিফলপ্রদ হইলে অবিবেচনা, হঠকারিতা, কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-শূন্যতা বলিয়া তীব্রনিন্দার বিষয় হয়। পদার্থ একই, কেবল ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনানুযায়ী কখন কিরীটশোভিত শিরে সিংহাসনাভিষিক্ত, কখন ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, পদদলিত, বা চরমক্ষেত্রে পৃথিবী হইতে নরহত্যার ন্যায় অপসারিত। একটা সাধারণ উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করি,

—গৃহদাহে হুহু করিয়া চারিদিকে বেড়া-আগুন জ্বলিতেছে, তন্মধ্যস্থ একটী পিতৃমাতৃহীন শিশুকে বাহির করিতে হইবে। কাতারে-কাতার দাঁড়াইয়া শিশুর আসন্ন-মৃত্যুর বিষয় আলোচনা করতঃ আহা! আহা! করিতেছে, পরন্তু কাহারও সাহসে কুলায় না, অগ্নি হইতে তাহাকে বাহির করিবার চেষ্টা করে। ভিড়ের ভিতর জনৈক যুবা চকিতের ন্যায় ভাবিল—বিপন্ন শিশুর পিতামাতা এখানে বর্ত্তমান থাকিলে, তাহারা নিশ্চয় স্নেহের দুর্দ্দমনীয় আবেগে নিজজীবন আহুতি দিয়াও সন্তানকে বাঁচাইবার জন্য ছুটিত, কিন্তু তদভাবে আমরা এত লোক থাকিতে কি শিশুটী বেঘোরে মারা যাইবে? এই ভাবের মত্ততায় যুবক আপনাকে ভুলিল, শিশুর বিপদে নিজে ডুবিল, প্রেমের অনিবার্য্য ব্যাকুলতায় অনল-শিখার পরাক্রম তুচ্ছ গণিয়া হুতাশনে ঝাঁপ দিতে তিলমাত্র দ্বিধা করিল না। এখনও উপস্থিত দর্শকবৃন্দ উহার দুর্জ্জয় সাহসের কোনরূপ সমালোচনা করে নাই, তাহার কাণ্ড দেখিয়া হতবুদ্ধি অবস্থায় নিষ্পন্দভাবে দণ্ডায়মান, কেবল অবাক্ হইয়া ভাবিতেছে, লোকটা করিল কি! পরে ফলাফল অনুসারে উক্ত কার্য্যের স্তুতিনিন্দা হইবে। যদি জীবিত-শিশুসহ অক্ষতশরীরে এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হয়, ধন্য! ধন্য! যশ তাহার ভাগ্যে; যদি নিজে দগ্ধ হইয়া শিশুকে বাঁচাইয়া থাকে, প্রতিষ্ঠা ততোধিক; যদি শিশুকে রক্ষা করিয়া আপনি অগ্নিক্ষতে মারা যায়, বহুকালের জন্য তাহার গুণকীর্ত্তন চলিবে; আর যদি হুতাশন উভয়কেই গ্রাস করিয়া ফেলে, তখন সাধারণ লোকে একমুখে বলিবে,—লোকটার কাজ ভাল হয় নাই, দিক্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হইয়া গোঁয়ারের মত প্রাণটা হারাইয়া ঘোর মূর্খতা প্রকাশ করিয়াছে। পরন্তু বিধাতার খাতার অন্যরূপ হিসাব, তাহাতে ফলাফলের বিচার না করিয়া কেবলমাত্র উদ্দেশ্যের পবিত্রানুযায়ী জমাখরচ হইবে। সাংসারিক ব্যবস্থা স্বতন্ত্র, লাভালাভ ফলাফল গণনা করিয়া যে কাজ করা হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বারা শাসিত দুনিয়া তাহাকেই হিসাবী কাজ বিবেচনার কাজ বলিয়া প্রশংসা করে; অর্থাৎ গড্ডলিকাপ্রবাহে যাহারা কলুর বলদের মত চক্ষু বুজিয়া চলিয়া থাকে, তাহাদিগকেই আসল কাজের লোক বলে, আর যাহারা কোনরূপ উচ্চ আশায় সাধারণের অনুমোদিত চিরাগত প্রণালীর বাহিরে গিয়া পড়ে, বিফলমনোরথ হইলে তাহাদিগকে বেকুব, বেহেড, মত্ত, পাগল বলিয়া নিন্দা করিতে ছাড়ে না।

প্রঃ। যদি কেহ বলেন যে, ফল অনিশ্চিত হইলে লোক সমষ্টিকে বিপদে ফেলিবার কোন ব্যক্তিবিশেষের অধিকার নাই; সুতরাং ধীর স্থিরভাবে বিধাতার বিধানের অপেক্ষায় থাকা উচিত। এ কথার কি কোন উত্তর আছে?

উঃ। কোন্‌টা বিপদ কোন্‌টা সম্পদ, তাহার বিচার করা আমাদের পক্ষে কঠিন। যাহাকে আমরা বিপদ বলি, তাহা যে ঈশ্বরের চক্ষে সম্পদের কারণ নহে, তাহা কি মানুষ বলিতে পারে? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিপদ সম্পদ বলিয়া কোন জিনিস বিধাতার তালিকায় নাই, সবই শুভ ফলপ্রদ বলিয়া জানিতে হইবে। সুতরাং বিপদের বিভীষিকা ভাবিয়া এত ব্যাকুলতা কেন? ওরূপ প্রলাপবাক্য দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত ভোগবিলাসীর বিকারের ফল বুঝিতে হইবে। পাছে তাঁহার ও তাঁহার দলের লোকের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইয়া তথাকথিত আরামের ব্যাঘাত হয়, একারণ দেশ রসাতলে গেলেও সকলের হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকাই কর্ত্তব্য! দুনিয়া ডুবিলে ইহাঁদের একহাঁটু জল। ইহার পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই এ প্রশ্নের সমীচীন উত্তর হইয়া গিয়াছে। এবম্বিধ ঘোর দুর্দ্দিনের মধ্যেও যাঁহারা দাসদাসী-পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইতে সক্ষম, তাঁহারা আপন সম্পদের নেশায় মাতোয়ারা হইয়া আছেন, পরের দুঃখ ক্লেশের কথা ভাবিবার তাঁহাদের শক্তি বা অবকাশ কোথায়? আর থাকিলেই বা কেন অনর্থক সে কথা লইয়া মাথা বকাইবেন? কি গরজ পড়িয়াছে? তবে সস্তায় দু'চারিটা লম্বা বাত্ বাতলাইতে ছাড়েন না, ইহাতেই দুঃখ হয়। চারিদিকের দীনদুঃখী কৃষ্ণের জীবগণ মরিলে তাঁহাদের ক্ষতি কিসের, যদি প্রত্যহ ক্ষীরের বাটি নিয়মিতরূপে তাঁহাদের সুকোমল বদনে পঁহুছিবার কোন বিঘ্ন না ঘটে?

কোন ঝুঁকিতে না গিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া বিধাতার বিধানের অপেক্ষায় থাকা বা থাকিতে বলা অলস নিরুদ্যম ব্যক্তির কাজ। তজ্জন্য এতদিন প্রতীক্ষা করিয়া যে বিধান নামিয়াছে, তাহার জ্বালায় যে আমরা অস্থির, এ কথার জবাব কি? বাবুরা ত বেশ স্ফূর্ত্তিতে জুড়ি হাঁকাইয়া গড়ের মাঠে হাওয়া খাইয়া ফিরিতেছেন, কিন্তু আমরা যে প্লেগে, দুর্ভিক্ষে, জলকষ্টে, ম্যালেরিয়াতে ছট্‌ফট্ করিয়া কণ্ঠাগত-প্রাণ হইয়াছি, তাহার করি কি? ইহা অপেক্ষা যে তোপে উড়িয়া যাওয়া সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয়। এ বিপদের অপেক্ষা কি বিশ্বে আর কোন বিপদ আছে যে, তাহার জন্য বাবুদের এত ভাবনা? ধন্য! এরূপ মহাত্মাগণের "স্বদেশ-প্রেম," ধন্য! ইহাঁদের "তত্ত্ব প্রচার।" ক্ষুৎপিপাসার তাড়নায়, রোগের যন্ত্রণায় এ যাবত কত না চীৎকার করিলাম, কেহ শুনিল না। হায়! হায়! এমন বিপদ কি পৃথিবীতে কখন কাহারও হইয়াছে বা হইতে পারে যে এতদপেক্ষা বিপদের আশঙ্কায় বাবুরা বিচলিত।

এইখানে মহাত্মা বাল গঙ্গাধর তিলকের শেষ উক্তির আলোচনা করিলে দোষের হয় না, বরং বিপদ-সম্পদের কথা খুলিবে। জজ ডাবার কর্ত্তৃক দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে তিলক যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের সকলেরই সাধনার মন্ত্র হওয়া উচিত। যেহেতুক ওরূপ বিষম বিপদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি যেরূপ অকুতোভয়ে নিজের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সাধারণ জীবের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, সে সময় তাঁহার হৃদয়ে সাক্ষাৎ ভগবান আবির্ভূত হইয়া তাহাতে বল সঞ্চার না করিলে ওরূপ ক্ষেত্রে অমন মহাবীরোচিত বাক্য তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতে পারিত না। প্রত্যেক শব্দ হইতে যেন মুক্তা ঝরিতেছে :—

"There are higher powers that rule the destinies of men and nations and it may be that the cause I represent may be benefited more by my sufferings than by my freedom."

অর্থাৎ মানব শক্তি অপেক্ষা মহোচ্চতর শক্তি সমূহ (দেবতারা) ব্যক্তিবর্গ ও জাতি সমূহের ভাগ্যবিধাতা, সুতরাং ইহা সম্ভব যে, আমার স্বাধীনতা অপেক্ষা কারা-যন্ত্রণা দ্বারা দেশের কল্যাণ সুন্দরতর রূপে সাধিত হইবে।

আমাদের সকলেরই দোষ ত্রুটি আছে, তিলকেরও আছে, পরন্তু তিলকে যে বিস্তর মহাপুরুষোচিত লক্ষণ বিদ্যমান, শত্রুমিত্র সবাই দেখিতেছেন। ধন্য ভাই তিলক! তোমাকে বারম্বার প্রণাম।

প্রঃ। রাজার দ্বারা কি আমাদের দুঃখ ঘুচিতে পারে না?

উঃ। নিশ্চয়! কিন্তু এ যুগের রাজারা ত সব ঢোঁড়া, তাঁহাদিগকে এক একটা সঙের মত সিংহাসনে বসাইয়া রাখিয়া মন্ত্রী মহাশয়েরাই সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। সচিববর্গ আবার তাঁহাদের দলের প্রজাবর্গের মুখাপেক্ষী; কাজেই ঐ সকল ক্ষমতাপন্ন প্রজারা না মনে করিলে রাজ্যের কোন প্রকার উন্নতি সম্ভবে না। ইংলণ্ডের প্রজাকুল প্রকৃত ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত অধীশ্বর, তাঁহাদের কৃপা ভিন্ন আমাদের কল্যাণের আশা কোথায়? এখন কথা হইতেছে এই যে, ইউরোপীয় সভ্যতাতে ঘোর স্বার্থপরতা দোষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইউরোপীয়গণ ভয়ানক ইহসর্ব্বস্ববাদী হইয়াছে, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করাই উহাদের পরম পুরুষার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শাস্ত্রে বলে :—

> কুরঙ্গ মাতঙ্গ পতঙ্গ ভৃঙ্গ,
> মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
> একঃ প্রমাথী স কথং ন হন্যতে,
> যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥

—শব্দ বা সুরের দ্বারা কর্ণসুখ সম্পাদন করিতে গিয়া হরিণ মারা যায়; স্পর্শ-সুখ দ্বারা ত্বগিন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হেতু গজরাজ বন্দী হইয়া থাকে, রূপের মোহে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গের প্রাণ বিনষ্ট হয়, কেতকীর গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমর কণ্টকবিদ্ধ হয়; আহারের লোভে মৎস্য জীবন হারায়। যখন একটা ইন্দ্রিয়ের বশ্যতা এক এক জন্তুর সমূহ বিপদের কারণ হইয়া থাকে, তখন পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস মানুষের কি না দুর্দ্দশার কথা। আবার তদপেক্ষা ভয়ঙ্কর অবস্থা ইউরোপীয় সুসভ্য জীবগণের, কারণ তাঁহারা অধুনা এক সময়ে

সব কয়টী ইন্দ্রিয়ের সেবা করিতে তৎপর হইয়াছেন। অন্যান্য দেশের লোকে পৃথক্ পৃথক্ সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দাসত্বে নিযুক্ত থাকেন, কিন্তু ইউরোপীয়গণ, বিশেষ ইংরাজ জাতি, এক ভোজের সময় সব ইন্দ্রিয় গুলির শৃঙ্খল গলায় পরিয়া মোহানন্দ উপভোগে যত্নবান। এক দিকে স্ত্রীপুরুষের সংঘর্ষণ-সুখঅনুভব করা হইতেছে; অপর দিকে ব্যাণ্ডবাদ্যে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছেন, তৃতীয়ে ভোজন প্রকোষ্ঠের ও টেবিলের সাজ সজ্জাদির সহিত লেডিদের বদনকমলের রূপমাধুরীর ও অঙ্গসৌষ্ঠবের রমণীয়তার এবং পোষাকপরিচ্ছদের পারিপাট্যের বাহার সন্দর্শনে নয়নযুগল প্রীতিলাভ করিতেছে; চতুর্থে টেবিলোপরি শোভামান পুষ্পগুচ্ছ-সমূহ-নিঃসৃত সৌরভ সহ সাহেব-মেমের সুগন্ধিসিক্ত রুমালাদির সুঘ্রাণ লইয়া নাসিকা উৎফুল্ল হইতেছে; অবশেষে পঞ্চমে উঠিয়া চরম ব্যাপার, প্রহরেক কাল ধরিয়া শতাবধি প্রকারের ভোজ্যপানীয় গলাধঃকরণ দ্বারা রসনা আহ্লাদে আটখানা হইয়া নৃত্য করিতেছে। বুঝিয়া দেখ, কি কারখানা! সাক্ষাৎ কলিপ্রভুর খাশ রাজত্ব আর কোথায়! যাহাদের দেহাত্মবোধ এত প্রবল, তাহাদের নিকট জ্ঞানধর্ম্মের আশা করা কি বাতুলতা নয়? আর জ্ঞানধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত বিবেকবিহীন জীবের হৃদয়ে দয়াদাক্ষিণ্যাদি কি প্রকারে তিষ্ঠিতে পারে? এরূপক্ষেত্রে পাপজনক লোভ ও পাপজননী হিংসার সেবক হইয়া ইহারা যে পরস্বাপহরণ ও পরপীড়নে সুখানুভব করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? এবম্বিধ শ্রেণীর নরাকার জীব রাজাই হউন, রাজপুরুষই হউন, আর রাজজাতীয় সাধারণ মনুষ্যই হউন্, সব এক ক্ষুরে মস্তক-মুণ্ডিত এক একটী স্বার্থপরতার অবতাররূপে বিরাজমান।

প্রাচীন ভারতের রামচন্দ্র প্রমুখ নৃপতিগণ যেরূপ ধর্ম্মের, ন্যায়ের, প্রজারঞ্জনের মূর্ত্তিস্বরূপ হইয়া অষ্টপ্রহর প্রকৃতিবর্গের হিতচিন্তা ও কল্যাণ-সাধনে রত থাকিতেন, তদ্রূপ কি পৃথিবী আবার কখন দেখিবে? ভগবানই জানেন। ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মোহমদের অদম্য প্রভাব বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়, স্বয়ং বেদব্যাস পারেন কি না সন্দেহ। সর্ব্বসংহারক কালের প্রতাপে কোথায় আজ হিরণ্যকশিপু-রাবণ-কংস, কৌরব-পাণ্ডব-যাদব, মিসর-গ্রীস-রোম, ফেরো-আলেকজাণ্ডর-সিজার ভাসিয়া গিয়াছেন, এ কথা তাঁহাদের মাথায় কুড়া'ল মারিয়াও বসান কঠিন। রাজশক্তির মূল যে কেবলমাত্র প্রজাকুলের সম্যক্‌রূপ লালনপালন, ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত বিধাতা কর্ত্তৃক নিয়োজিত, প্রজা যে রাজার যথেচ্ছ ব্যবহারের সামগ্রী নয়, রাজার বা রাজপুরুষদের সুখস্বচ্ছন্দতার উপকরণাদি জোগাইবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই, এই সনাতন তথ্য তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত; নতুবা—আজ অমুক রাজ্যের নরপতি উৎপীড়িত প্রজা কর্ত্তৃক নিহত, কা'ল অমুক রাজমহিষী আততায়ী হস্তে নিধনপ্রাপ্ত, পরশ্ব বিদ্রোহী দ্বারা অমুক দেশের শাসনকর্ত্তার প্রাণ বিনষ্ট,—এবম্বিধ হৃদ্বিদারক সংবাদে পাশ্চাত্য জগৎ বিপর্য্যস্ত হইত না। যতদিন না রাজশক্তি কর্ত্তৃক নীতিবন্ধন লঙ্ঘিত না হয়, নির্ব্বিশেষে সকল জাতীয় সর্ব্বশ্রেণীর প্রজার প্রতি ন্যায়দণ্ড প্রসারিত থাকে, অন্নবস্ত্রের অনাটনে দরিদ্রগণের দারুণ কষ্ট না হয় এবং যদি কখন হয়, রাজপুরুষগণ তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকারের সম্যক প্রয়াস পা'ন, ততদিন কিছুতেই রাজ্যমধ্যে অসন্তোষ অশান্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে না, ইহা নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়! ভূতপূর্ব্ব বড় লাট লিটন বাহাদুর যথার্থই বলিয়াছিলেন;—

"A single act of injustice in India is more damaging to the British Raj than a terrible defeat in a battlefield in Asia."—ভারতে একটী অবিচারের কার্য্য হইতে বৃটিশরাজের যত ক্ষতি হয়, এশিয়া খণ্ডের সমরক্ষেত্রে কোন যুদ্ধে ভয়ঙ্কর পরাভব দ্বারা তত ক্ষতি হয় না। বাস্তবিক পুরুষের পুরুষত্ব, নারীর সতীত্ব ও রাজার ন্যায়, তিন জনের এই তিনটী গুণ অগ্নির দাহিকাশক্তির মত সঙ্গে সঙ্গে গাঁথা, তদভাবে প্রত্যেকের কোনই মূল্য নাই।

এখন বিচার করিয়া দেখা যাউক যে, ইংলণ্ডের প্রজাশক্তি যাহা বর্ত্তমানে সম্রাটশক্তির প্রাণ বলিলেই চলে, তদ্দ্বারা আমাদের কোন উপকারের সম্ভাবনা আছে কিনা। প্রজাসাধারণ বলে যে, ভারতের রুক্ষ-

শোষণে তাহাদের ত কোনই লাভ নাই। কেবলমাত্র ইংলণ্ডের ধনীদিগেরই ধন বাড়িতেছে। যে কার্য্যে তাহাদের স্বার্থ নাই, তাহা নিবারণ করিতে তাহারা একদিন বদ্ধপরিকর হইতে পারে, যদি তাহাদিগকে কেহ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে। ধনবানদিগের নিকট, পদস্থ ব্যক্তিগণের নিকট, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের নিকট আমি ত কোন আশা দেখি না। তবে ঐ এক আশায় বুক বাঁধিয়া যদি ভারতবাসী আরও কিছুদিন জীবিত থাকিতে পারে।

প্রঃ। ইংলণ্ডের শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়ে কি এখন ভাল লোকের একেবারেই অভাব হইয়াছে?

উঃ। উহা কখন কোন দেশে হইতে পারে না, তাহা হইলে সেখানে আর চন্দ্রসূর্য্য উঠিবে না। "সর্ব্বত্র ত্রিবিধা লোকাঃ উত্তমাধমমধ্যমাঃ।" তবে কি না ভাল লোকের সংখ্যা কোথাও কম, কোথাও বেশী। ইংলণ্ডে আগে বিস্তর ভাল লোক ছিলেন, এখন তত নাই। ধনবানগণ সর্ব্বত্রই অধিকাংশ হীনমতি, পদস্থ ব্যক্তিরা সকল দেশেই সর্ব্বদা একটা বিশেষ স্বার্থ সম্মুখে রাখিয়া সব কাজ করেন, কেবল স্বাধীনচেতা নিরপেক্ষ কতকগুলি পণ্ডিত ব্যক্তিই ভরসাস্থল হইয়া সাধারণের স্বার্থ রক্ষা করিতে যত্নবান থাকেন, তাঁহাদের দ্বারা দশের যাহা কিছু উপকার হয়। ইংলণ্ডে এই শেষোক্ত শ্রেণীর সংখ্যা ক্রমে হ্রাস পাইতেছে।

মনুষ্য ইতরজন্তু উদ্ভিদাদির মত, রাজ্য, সমাজ, জাতি প্রভৃতির একটা নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু আছে। প্রত্যেক জীব যেমন জরাজীর্ণ হইয়া বা কোন সাংঘাতিক পীড়ার দরুন কালগ্রাসে পতিত হয়, সমাজ রাজ্যাদিও সেই নিয়মের অধীন। জীবজন্তুর ন্যায় জাতি বা সমাজ যদিও একেবারে অন্তর্হিত না হয়, কিন্তু এরূপ পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তি ধারণ করতঃ তাহাদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান থাকে যে, তাহাকে আর সে মানুষ বলিয়া চেনা যায় না,—যেমন আমাদের দশা ঘটিয়াছে। দেশকালপাত্র বিবেচনা না করিয়া যিনি প্রাকৃতিক বিধানাদির বিপরীত দিকে চলিতে যাইবেন, তাঁহাকে পদে পদে বিপদে পড়িতেই হইবে। সংসারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যিনি ছুটিতে অক্ষম নিশ্চয় জানিতে হইবে, তাঁহার আর উপযোগিতা নাই। উন্মুক্ত স্বাধীন বায়ু মধ্যে লালিতপালিত ইংরাজের আজ যতদূর উন্নত হওয়া উচিত ছিল, ততদূর যেন হইতে পারেন নাই; অর্থাৎ বর্ত্তমানে উঁহাদের মধ্যে যে সংখ্যক উদারচেতা বিশ্বপ্রেমিক লোক আশা করা সঙ্গত, তাহা নাই। ইংলণ্ডের যেন এখন থম্‌থমে ভাব, পূর্ণ জোয়ারের পরে ভাটা পড়িবার একটু আগে গঙ্গার যে ভাঁব। তাহাতেই আশঙ্কা হয়, বেশী ভাল লোক ইংলণ্ডে শীঘ্র আর পাওয়া যাইবে না। লণ্ডনের বিশপ গোর সাহেবের মত লোক হয়ত ক্রমেই কমিয়া যাইবে। তিনি সেদিন কোন প্রকাশ্য স্থানে বলিয়াছেন:—"India exists, not in order that she may be part of England's Empire but in order that she may realise herself"—Bishop Gore. অর্থাৎ ইংরাজ-সাম্রাজ্যের একটা অংশ হইয়া চিরকাল থাকিবার জন্য ভারতবর্ষের অস্তিত্ব নয়, নিজেকে নিজে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া উন্নত হওয়াই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য।

প্রঃ। এত শীঘ্র ইংলণ্ডের এরূপ অবনতি হইবার কারণ কিছু বলিতে পারেন কি?

উঃ। ইহার একমাত্র অনিবার্য্য কারণ, ভারতবর্ষের সহিত সংস্রব। মুসলমানেরা কিরূপ তেজের সহিত ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আর আজ তাঁহাদের কি দুর্দ্দশা! যথেচ্ছাচার উৎপীড়নের অশুভ ফল যে শুধু উৎপীড়ককেই ভোগ করিতে হয়, এমন নহে, উৎপীড়ক উৎপীড়িত উভয়কেই উহা আক্রমণ করিয়া থাকে। উহাতে উভয়পক্ষেরই অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। তার পর, একটা সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম, যাহা সবাই জানে, যে শীতল ও উষ্ণ পদার্থ কাছাকাছি থাকিলে ক্রমে পরস্পরের ভাব বিনিময় দ্বারা উভয়ে সমপ্রকৃতি-সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুদীর্ঘকালের দাসত্বে আমরা হীন, সেইরূপ কালের স্বাধীনতায় উহারা মহৎ, এই দুই বিপরীতভাবাপন্ন দুই জাতির ঘাত প্রতিঘাত সঙ্ঘাতে দোষেগুণে দুই জনকেই সমান অবস্থায় পঁহুছিতে হইবে। গোলাম ও প্রভু, পরস্পরের হাওয়াতে উভয়কেই নীচ হইতে হয়, তবে হিসাব খতাইলে গোলামের লাভ

দাঁড়ায় বলিতে হইবে। ইংরাজ আমাদের দেশে রাজত্ব করার ফলে ধনরত্ন সঞ্চয়ে, বিলাসব্যসনে কৃতার্থ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; পরন্তু দুর্ব্বল অসহায় পতিত ভারতবাসীর উপর অবাধপ্রভুত্বের বাহাদুরী চালাইতে চালাইতে ক্রমে মনুষ্যত্ব হারাইয়া নৈতিক হিসাবে নিম্নগামী হইতেছেন। যাহার চক্ষু আছে সে ইহা বেশ দেখিতেছে। বর্ত্তমান ইংরাজজাতির আদর্শ পুরুষ লর্ড কর্জ্জনকে সম্মুখে রাখিলেই সব সন্দেহ মিটিয়া যায়। বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন দুর্জ্জনকে যে মণিভূষিত বিষধরের ন্যায় পরিহার করা উচিত, তাহার বিশিষ্ট উদাহরণ উক্ত মহাপ্রভু। আর অধিক কি বলিব!!!

হাঁ, আর একটা কথা—উঁহারা বড় চালাক, এক কল খাটাইয়াছেন যে, মুসলমানদের মত এ দেশে বাস করেন না, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল দাঁড়াইতেছে। এক দল যাইতেছেন, এক দল আসিতেছেন, ইহা দ্বারা ক্রমে এত অধিক সংখ্যক নীচাশয়তাগ্রস্ত ভারত-ফেরত জীব ইংলণ্ডে জমিতেছেন যে, তাঁহাদের সংক্রমণ দোষে ঐ ক্ষুদ্র দেশ অচিরে উৎসন্নের দ্বারে পঁহুছিবে। একা লর্ড কর্জ্জন সহস্র সহস্র ইংরাজকে অপ্রেমের পথে, অসত্যের পথে, অবনতির পথে সবলে টানিয়া লইতে সক্ষম; তারপর কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্জ্জন যে আমরা তৈয়ার করিয়া পাঠাইয়াছি ও প্রতি বৎসর পাঠাইতেছি, তাহার গণনা করে কে!

প্রঃ। যাহা হউক, আমরা এভাবে কত কাল পড়িয়া থাকিব?

উঃ। শুধু যে আমরাই এইরূপে পতিত হইয়াছি, এমন নয়। অনেককেই উঠিতে পড়িতে হইয়াছে। তবে কি জান, যে যত উচ্চস্থান হইতে পড়িয়াছে, তাহার তত উঠিতে বিলম্ব লাগিবেই। এক তালার ছাদ হইতে পড়িলে একটা পা হয়ত সামান্য জখম হয়, সে ক্ষেত্রে শীঘ্র সারিয়া উঠিতে পারা যায়। দোতোলা হইতে যে পড়ে, তাহার পা ভাঙ্গিবার কথা, তেতোলা হইতে পতনে অনেক জায়গায় বিষম চোট্ খাইতে হয়; সুতরাং উহাদের আরোগ্য লাভে বহু বিলম্ব হইয়া থাকে। আমরা হিমালয়ের মত উচ্চস্থানে উঠিয়া সেখান হইতে ডিগুবাজী খাইয়া পড়িয়াছি, তাই আমাদিগকে আজও শয্যাগত অবস্থায় দিন কাটাইতে হইতেছে। পরম সৌভাগ্যের বিষয়, কোন প্রকারে জীবনটা রক্ষা পাইয়াছে। আর কতকাল পড়িয়া থাকিব? যখন প্রাণটা আছে, তখন প্রকৃতি-দেবী কোন রকমে একদিন খাড়া করিয়া তুলিবেনই। পরন্তু আর শুইয়া থাকা উচিত নয়, এখন কর্ত্তব্য, পায়ে ভর দিয়া একটু একটু চলিতে আরম্ভ করা। চাঙ্গা হইয়া ঘর সাম্‌লাইয়া লওয়া বড়ই দরকার হইয়াছে। ঘর সাম্‌লাও! ঘর সাম্‌লাও! ঘর সাম্‌লাও! অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হও, বিঘ্ন বিপদ-মৃত্যু তুচ্ছজ্ঞান করিতে শিখ, স্বার্থ ও রিপু সমূহ মা জগদম্বার চরণে বলি দাও, তাহাদের ছিন্নশির মাতৃচরণে লুটাইলে তবে সিদ্ধ লাভ হইবে। মোট কথা, আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রাণটুকু দিয়া তদ্বিনিময়ে মহাপ্রাণ লাভ না করিলে মনুষ্য পদবাচ্য হওয়া যায় না।

প্রঃ। রাজপুরুষগণ যে আমাদিগকে এখন বিদ্রোহের অপবাদ দিতেছেন, সে সম্বন্ধে আপনার কি মত?

উঃ। ইহা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অকারণে ভারতবাসী অশান্তি আনয়ন করিতেই পারে না, এমন উদরে তাহাদের জন্মই নয়। দুটা মিষ্ট কথা, দুটা পিঠ্‌চাপ্‌ড়ানি পাইলেই যাহারা কৃতজ্ঞতায় গলিয়া যায়, এমন কি, নিজেদের সমূহ ক্ষতি করিতেও প্রস্তুত হয়, এরূপ ভালমানুষ বা নির্ব্বোধ জাতি কখন সহজে বিরক্ত হইবে না। প্রজা কর্তৃক রাজকার্য্যের সমালোচনার স্বাধীনতা যদি এখন এই ভাবে হরণ করাই প্রয়োজনীয় বোধ হইল, তাহা হইলে আগেই বিবেচনা করিয়া এবম্প্রকার শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল না। যখন তাহা দেওয়া হইয়াছে, তখন ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক, বিভীষিকা না দেখিয়া, তথ্য নির্ণয়ে যত্নবান হওয়াই বুদ্ধিমান সদ্বিবেচক রাজপুরুষদের কাজ। রাজ্যশাসন, বিশেষ ভারতবর্ষের মত বিশাল সাম্রাজ্যের সুশাসন বড় সোজা কথা নয়। পাশববলে এই গোলযোগ থামাইয়া শান্তির পুনঃস্থাপনের আশা বাতুলতা মাত্র। কলম বন্ধ হইল, মুখ বন্ধ হইল, কিন্তু মন বন্ধ করে কে? এমন সাধ্য এই বিশ্বে কাহার আছে? প্রাগুক্ত আমেরিকান তত্ত্বদর্শী এক স্থানে বলিয়াছিলেন, :—

"Those who live by hate will die by hate: that is 'those who live by the sword will die by the sword'. Every evil thought is a sword drawn on the person to whom it is directed. If a sword is drawn in return, so much the worse for both."

অর্থাৎ বিদ্বেষ যাহাদের জীবনের বল বিদ্বেষই তাহাদের মৃত্যুর কারণ হইবে।

প্রবল পরাক্রমশালী রাজপুরুষগণ যদি লোভপরবশ হইয়া রক্তপিপাসু বিদ্বেষ-বুদ্ধি সহকারে অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করেন, নিঃসম্বল অসহায় মেষবৎ প্রকৃতিবর্গ হাতে হাতে তাহার প্রতিশোধ লইতে পারিবে না সত্য, পরন্তু তাঁহাদের হৃদয়ের গভীর বেদনা ভগবানের চরণ-প্রান্তে উপনীত হইয়া তাঁহার সিংহাসন নিশ্চয় টলাইবে, নচেৎ জানিতে হইবে, ঈশ্বরের রাজ্য লুপ্ত। হরি-কোপানল বড় শক্ত জিনিস, সাতসমুদ্রের জলেও সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবার নহে; সমস্ত অন্যায় অপ্রেম ভস্মীভূত করিয়া তবে তাহা নিশ্চিন্ত হইবে। স্থূল দৃষ্টি ইহসর্ব্বস্ববাদী মহাপ্রভুরা অজ্ঞানান্ধতা বশতঃ এ কথা হুট্ করিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন; কিন্তু ইংরাজীতে বলে, "Ignorance of law is no excuse,"—বিশ্বেশ্বরের আইন তাঁহাদিগকে ছাড়িবে না, শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক, অপরাধের দণ্ড কড়ায় কড়ায় ভোগ করিতেই হইবে।

প্রঃ। কোন দেশপূজ্য স্বনামধন্য মনীষী ব্যক্তি সাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন, পৃথিবীতে পূর্ণ মনুষ্যত্ব গঠন করিবার উদ্দেশে মহাপুরুষগণ নিভৃতে তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। গোলমাল করিয়া তাঁহাদের তপোভঙ্গ করা ভাল নয়। এ কিরূপ সংবাদ?

উঃ। হাঁ, এ কথা সহস্রবার মানি এবং হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করি। তপোবল ভিন্ন সংসারে কিছুই হয় নাই। ব্রহ্মাকেও সৃষ্টিকার্য্যের পূর্ব্বে তপস্যা করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের ব্যাকুল আহ্বানে ভগবানকে নামিতেই হইবে, কারণ দুর্ব্বলের একমাত্র বল তিনি, এখন তিনি না নামিলে সংসার রাখে কে? পাপ-কংসাসুর যে পৃথিবীকে ছারখার করিল; পৃথিবীময় অপ্রেম, অসত্য, অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন দুর্দ্দিনে জগদীশ্বর স্বয়ং না দেহধারণ করিলে আমাদিগকে আর কে রক্ষা করিবে? এরূপ আশা করা অসঙ্গত নয় যে, সমগ্র জগতে সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিমল প্রেমের রাজ্য সংস্থাপিত হইবে। খ্রীষ্টানগণ বলেন, সে জন্য যিশু পুনরায় আসিতেছেন, মুসলমানদের বিশ্বাস মির্জ্জামেহেদী আসিয়া সে কার্য্য সম্পাদন করিবেন। যাহা হউক, মহাপ্রভাবশালী ঐশীশক্তি-সম্পন্ন একজন যে শীঘ্র আসিতেছেন, তাঁহার প্রতীক্ষায় অনেকেই সতৃষ্ণনয়নে পথপানে চাহিয়া আছেন। তাঁহারা বলেন, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায় ভেদ আর থাকিবে না; ফরাসী, ইংরাজ, জর্ম্মাণ, ওলন্দাজ, জাপানী চীনা, পার্সি, তুর্কী, ইউরোপীয়, এশিয়াটিক, আফ্রিকান, আমেরিকানাদি জাতিসমূহ এক মানবজাতিতে পরিণত হইবে। প্রত্যেক দেশে স্বতন্ত্র ভাষা থাকিলেও সর্ব্বসাধারণের জন্য একটা ভাষা হইবে, যাহা সকলকেই শিখিতে হইবে। ভারতীয় দর্শনবিজ্ঞান পৃথিবীর পূজ্য বিদ্যা হইবে, সুতরাং ভারতবাসী আর্য্যগণ সকলের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিবে। ইহার কতক কতক আভাস ত এইনই দেখা যাইতেছে। বেদান্ত ও গীতার আলোচনা সভ্যজগতের কোথায় না চলিতেছে? আরও অনেক গুরুতর গুহ্য কথা আছে, যাহা এখন প্রকাশযোগ্য নয়, ক্রমে সকলেই দেখিবে।

অনেক দিন হইতে ঐ শুভ সংবাদ শুনিতেছি, কিন্তু কাহাকেও বলিতে সাহস হয় নাই। এই বিরাট ব্যাপারের সূচনা প্রিয়বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা স্বর্গ হইতে "বন্দেমাতরম" মহামন্ত্রের আনয়ন, কারণ বাঙ্গালীকে এই যজ্ঞের হোতা হইতে হইবে। এই মহাবাক্য বোমা নির্ম্মাণের জন্য আসে নাই, সংসারে বিপ্লব ঘটাইবার জন্য অবতীর্ণ হয় নাই; পক্ষান্তরে সত্য, প্রেম ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ইহা আসিয়াছে, ইহা স্বয়ং ভগবান বঙ্কিমের মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন। এই বীজমন্ত্র তোপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠিত হইও না, কামানের উদ্গীরিত অনল তজ্জন্য কাহাকেও ভস্মীভূত করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার স্বর্গলাভ হইবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ও চণ্ডীকাব্য। (২)

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

মুকুতার বদলে মুকুতা পাব
ভেড়ার বদলে ঘোড়া।”

বলা বাহুল্য, কবির পণ্যদ্রব্যের জ্ঞান অপেক্ষা অনুপ্রাস-প্রীতিই অধিক, নতুবা তিনি বর্দ্ধমান জেলা হইতে সিংহলে নারিকেল রপ্তানী করিতে প্রস্তুত হইতেন না। রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র সমুদ্রপারে প্লবঙ্গদিগের যে ক্রীড়া দেখাইয়া গিয়াছেন,তাহাতে সিংহলবাসীরা মাতঙ্গের পরিবর্ত্তে কতকগুলি প্লবঙ্গ লইতে স্বীকার করিবে কিনা, তাহাও কবির বিবেচনার বিষয় ছিল। বুদ্ধিমান্ বণিক ধনপতি যদি সিংহল হইতে মাকন্দ আনিবার জন্য আকন্দ অপেক্ষা অন্য কোন মূল্যবান্ দ্রব্য গ্রহণ করা আবশ্যক মনে না করিয়া থাকেন, তবে হয়ত কোন অনুপ্রাস-প্রিয় ব্রাহ্মণের পরামর্শ তাঁহার কার্য্যাবলী নিয়মিত করিয়াছিল। সিংহলে যাত্রার সময়ে ধনপতি লহনার পরামর্শে একটী ভীষণ কার্য্য করিয়া ফেলিলেন। খুল্লনা দেবীর পূজা করিতেছিলেন, ধনপতি দেবীর ঘটে পদাঘাত করিলেন এবং খুল্লনার কেশাকর্ষণ করতঃ তাঁহার প্রতি অনেক কটূক্তি প্রয়োগ করিলেন। দেবীর ক্রোধের সীমা রহিল না, তিনি ধনপতিকে ধনেপ্রাণে বিনাশ করিতে হুকুম দিলেন এবং স্পর্দ্ধা করিয়া বলিলেন ‘কেমনে রাখিবে পশুপতি’। কিন্তু বুদ্ধিমতী পদ্মাবতী আবার দেবীর বুদ্ধির বাতি একটু উজ্জ্বল করিয়া দিলেন।

“বিচারেতে কার্য্যসিদ্ধি অবিচারে নাশ।
কোপ কর দূর হউক পূজার প্রকাশ॥”

খুল্লনা আবার স্তব করিয়া দেবীকে সন্তুষ্ট করিলেন।

ধনপতির সিংহলযাত্রার পথ বর্ণনা করিতে গিয়া কবি পরিচিতস্থলে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন এবং অপরিচিতস্থলে আরব্য উপন্যাসের সিন্ধবাদ নাবিকের ভ্রমণবৃত্তান্তকেও হারাইয়া দিয়াছেন। এই বর্ণনায় আমরা সপ্তগ্রামের বাণিজ্যের মহত্ত্ব এবং ইউরোপীয় জলদস্যুদিগের অত্যাচারের আভাস পাই। ধনপতিকে কষ্টে ফেলিয়া দেবীর পূজা প্রচার করা উদ্দেশ্য। মগরায় তিনি ভীষণ ঝড় বাধাইয়া দিলেন, হনুমান্ ও বরুণের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। ধনপতির ৭ খানি ডিঙ্গার মধ্যে ৬ খানি জলমগ্ন হইল। এই উপলক্ষে কবি বাঙ্গাল মাঝিদিগকে কান্দাইবার সময়ে বেশ একটু রসিকতা করিয়া লইয়াছেন—

“আর বাঙ্গাল কান্দে শোকে শিরে দিয়া হাথ।
হলদিগুঁড়া হারাইল শুকুতার পাত॥
আর বাঙ্গাল বলে বড় মায়া মো।
বিদেশে রহিলুঁ না দেখিলুঁ মাগু পো॥
আর বাঙ্গাল বলে আমি অই তাপে মৈগ।
কালী গুরী দুটী মাগু সেই কোথা গেল॥”

ইত্যাদি

কিন্তু ধনপতি "নিত্য পূজে পশুপতি"—দেবীর মনে ভয় হইল। ধনপতি তাঁহার অবশিষ্ট ডিঙ্গাখানি লইয়া আবার চলিতে লাগিলেন। বাঙ্গাল মাঝি রাঢ়দেশীয় কবির উপহাসের সামগ্রী হইলেও কুম্ভীরিয়া দহ, কাঁকড়াদহ প্রভৃতি উত্তীর্ণ হইবার সময় একমাত্র বন্ধু। কবি বাঙ্গাল মাঝিকে এই ন্যায্য প্রশংসা হইতে বঞ্চিত করেন নাই। যখন সেই অস্বাভাবিক কাঁকড়ার দল সদাগরের ডিঙ্গার গতি বন্ধ করিল, তখন—

"বড়ই সেয়ান সব উত্তর্যা বাঙ্গাল।
নৌকায় পড়িয়া ডাকে যেমন শৃগাল ॥
শৃগালের বোল তারা জল হৈতে শুনে।
অমনি প্রবেশ করে পাতাল ভুবনে ॥"

যেখানে মাঝিরা এতদূর চতুর ও কর্ম্মঠ, সেখানে আর ভয়ের কারণ কি? সদাগর বহুসংখ্যক অকথ্য দহ পার হইয়া কালীদহে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে দেবীর ছলনায় কমলেকামিনী দর্শন করিলেন। ক্রমে ধনপতি সিংহলে উপস্থিত হইলেন এবং কোটালের সহিত দ্বন্দ্বের পর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যদিও বর্দ্ধমান হইতে সিংহলে পৌঁছিতে অল্পদিন লাগে নাই, তথাপি বর্ত্তমান কলা, আম্র, পনস প্রভৃতি উপঢৌকনস্বরূপ রাজার নিকটে পাঠাইতে ত্রুটী হইল না। যদিও সাধুর ছয়ডিঙ্গা মগরার জলে ডুবিয়া রহিল এবং এক ডিঙ্গা লইয়া সাধু প্রাণে সিংহলে উপস্থিত হইলেন, প্রাণে তথাপি বিবিধ রণবাদ্য এবং পাইকের অভাব রহিল না। উপঢৌকনের মধ্যে "সিংহ ব্যাঘ্র, শিকারী কুকুর" "যুঝারিয়া ভেড়া" ইত্যাদিও থাকিল! কবি ডিঙ্গাখানির পরিমাণ দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আমরাও বর্ত্তমান কালের অর্ণবপোতের সহিত তুলনার সুযোগ পাইলাম না। যথাসময়ে রাজা ধূমধাম করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে কমলেকামিনী দর্শন করিতে চলিলেন। সঙ্গে "খোরাসানী মোগল পাঠান" পর্য্যন্ত চলিল। সাধু রাজাকে কমলেকামিনী দর্শন করাইতে না পারিয়া কারাগারে বন্দী হইলেন। কবি এই সময়ে সাধুর মনের দৃঢ়তার একটু সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। দেবী ধনপতির শিয়রে বসিয়া স্বপ্নে জানাইলেন—

"স্মরণ করহ যদি ভবানী ভবানী।
কালীদহে দেখাইব কমলে কামিনী ॥
তুলি দিব মগরায় ডুবা ছয় নায়।
ভরা দিয়া দিব ধন যত লাগে তায় ॥
মণি-মুক্তা প্রবাল পূরিয়া মধুকর।
কিঙ্কর করিয়া দিব সিংহল ঈশ্বর ॥
তোরে আমি বলি সাধু করিয়া দঢ়ান।
চণ্ডী না পূজিলে তোর না হবে ছাড়ান ॥
হাটে সূতা বেচিবেক লক্ষপতির ঝি।
সংক্ষেপে কহিনু সাধু আর কব কি ॥"

কিন্তু ধনপতি আপন ইষ্ট দেবতার প্রতিভক্তি হইতে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হইলেন না।

"যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।
মহেশ ঠাকুর বিনা অন্য নাহি জানি ॥
জীবন ত্যজিব যদি নৃপ-কারাগারে।
ঠাকুর মহেশ বিনা না স্মরি কাহারে ॥"

এদিকে যথাসময়ে শ্রীমন্তের জন্ম হইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের বর্ণনায় এবং পারিবারিক সুখ দুঃখের চিত্র অঙ্কিত করিতেই কবিকঙ্কণের সমধিক কৃতিত্ব। শ্রীমন্তের জন্ম এবং বাল্যাবস্থার বর্ণনা হৃদয়-গ্রাহিণী।

কবির ঘুম পাড়ানের গানটী কি মনোহর, পাঠক একবার শুন এবং নিজে পুত্রের পিতা হইলে সাধ মিটাইয়া অনুভব করিয়া লও—

"আয় রে আয় রে বাছা আয়
কি লাগিয়া কান্দ বাছা, কি ধন চায়॥
তুলিয়া আনিব গগন ফুল।
এক এক ফুলের লক্ষেক মূল॥
সে ফুলে গাঁথিয়া দিব যে হার।
প্রাণের বাছা মোর না কান্দ আর॥
গগনমণ্ডলে পাতিব ফাঁদ।
ধরিয়া আনিব গগন-চান্দ॥
সে চান্দ আনি তোরে পরাব ফোটা।
কালি গড়ায়্যা দেব সোণার ভেটা॥
খাওয়াব ক্ষীর-খণ্ড মাখাব চুয়া।
কর্পূর পাকা পান সরস গুয়া॥
রথ, গজ, ঘোড়া যৌতুক দিয়া।
দুই রাজার কন্যা করাব বিয়া॥
শ্রীমন্ত চাপে মোর সোণার নায়।
কুঙ্কুম কস্তূরী মাখাব গায়॥
খাটে নিদ্রা যাবে যামরের বায়।
অম্বিকা মঙ্গল মুকুন্দে গায়॥"

শ্রীমন্ত ক্রমে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিলেন। গুরু জনার্দ্দন ওঝা বুদ্ধিমান্ বালকের পৌরাণিক প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পারিয়া খুল্লনাকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কটূক্তি করিলেন। শ্রীমন্তের অভিমান হইল। এই অভিমানের ফল শ্রীমন্তের পিত্রান্বেষণের নিমিত্ত সিংহলে গমন। ডিঙ্গার জন্য অধিক কষ্ট পাইতে হইল না—চণ্ডীর আদেশে স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মাই সংক্ষেপে নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা করিলেন। শ্রীমন্তের বিনিময় দ্রব্য সংগ্রহ ও রাস্তার বর্ণনা অনেকটা ধনপতির সিংহল যাত্রার পুনরাবৃত্তি; কোন কোন স্থানে কবি আনুষঙ্গিক রূপে অন্যান্য পৌরাণিক উপাখ্যানও বিবৃত করিয়াছেন। তবে শ্রীমন্ত খুল্লনার পুত্র, তাঁহাকে ছলিবার জন্য যখন দেবী মগরায়, নদ নদী আনিয়া ফেলিলেন, এবার ঝড় বৃষ্টির সৃষ্টি করিলেন, তখন তিনি চণ্ডীরই স্তব করিলেন; দৈবদুর্ব্বিপাকেরও সহজেই উপশম হইল।

যথাসময়ে শ্রীমন্ত সিংহলে উপনীত হইয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন ও রণবাদ্য বাজাইলেন। কোটাল যথারীতি নৃপতি কর্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া শ্রীমন্তের সহিত কলহ করিল। ক্রমে শ্রীমন্ত রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং রাজাকে কমলেকামিনী দর্শন করাইতে ও তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করাইতে অসমর্থ হইয়া বন্দী হইলেন। ধনপতিকে বন্ধন করিবার সময় বাঙ্গাল মাঝিরা কান্দিয়াছিল; এবারও বাঙ্গাল মাঝিরা কান্দিল। কেহবা কান্দিবার সময়ে বলিয়া ফেলিল "পুত্র সাতের মুঞি হারালুঁ কাসন্দ," কেহবা বলিল "সর্ব্ব ধন গেল মোর হুকুতার পাত"। শ্রীমন্ত বালক কিন্তু বুদ্ধিমান্ বালক। কবি তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু তেজস্বিতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। শ্রীমন্ত আপন প্রতিজ্ঞা অনুসারেই মশানে নিহত হইবার জন্য বন্দী হইলেন। কিন্তু বন্দী হইয়া তিনি রাজার নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন। 'প্রাণদান দেহ দাসে', 'হইয়া কিঙ্কর, ঢুলাব চামর' ইত্যাদি কাকুতিবাক্য গৃহসুখান্বেষী বাঙ্গালী বালকেরই উপযুক্ত—সমুদ্রগামী পিতৃসন্ধানেচ্ছু বালকের উপযুক্ত নহে। কোটালেরা সর্ব্বত্রই সমান। শ্রীমন্তকেও মশানে সামান্য একটু উপকারের জন্য "কিছু ধন" দিয়া কোটালের পরিতোষ সাধন করিতে হইল। বস্ত্র পরিবর্ত্তনের সময়ে পাগড়ীতে বান্ধা দেবী পূজার তণ্ডুল ও দুর্ব্বা মাটিতে পড়ায় শ্রীমন্তের মাতৃ-উপদেশ মনে পড়িয়া গেল—তিনি চণ্ডিকার স্তুতি আরম্ভ করিলেন। তাহার পর চণ্ডী যে কাণ্ড করিলেন,

তাহা পরে আলোচিত হইবে। সিংহলরাজের যুদ্ধযাত্রায় আমরা "বিচিত্র কামান" ও রাঙ্গা লাঠির বিচিত্র সমাবেশ দেখিতে পাই। শ্রীমন্তের অভয়াকে সমরাঙ্গন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পরামর্শ দেওয়া কবির আর একটী অস্বাভাবিক কল্পনা। দেবীগণের যুদ্ধে আগমন, শোণিতের নদী, প্রেতের হাট, হনুমানের ঔষধ আনয়ন প্রভৃতি ভক্তের লেখনী-প্রসূত সুতরাং তৎসম্বন্ধে অধিক না লেখাই ভাল। হনুমানের ঔষধে যে সকল সৈন্যের পুনরায় জীবনপ্রাপ্তি ঘটিল, তাহাদের মধ্যে 'নয় কাহন বাগ্‌দী', 'সাত কাহন হাড়ি পাইক' এবং'বার কাহন ডোম'ও ছিল। এই বাগ্‌দী প্রভৃতি বর্দ্ধমান কি মেদিনীপুর জেলা হইতে সিংহলরাজ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কবি তাহার উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, সিংহলরাজের প্রতি দেবতার দয়া হইল। ধনপতি কারাগার হইতে আনীত হইলেন। দেবীর আদেশে রাজকন্যা সুশীলার সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ হইল। দ্বাদশবর্ষীয় বালক শ্রীমন্তের বিবাহের বা ফুলশয্যার রাত্রে স্ত্রী সুশীলার নিকট বারমাসিয়া শ্রবণ কিছু অস্বাভাবিক বলিয়া পাঠকের বোধ হইতে পারে, কিন্তু এই ভক্ত কবির রচনার অনেক স্থলেই অনুপাতরাহিত্য বা দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বর্ণনার তারতম্যের অভাব পাঠককে সহ্য করিয়া লইতে হইবে। রাঢ় দেশীয় কবি সিংহলের রাজকন্যার মুখ হইতে "ফুলঘরে" স্বামীর প্রতি এইরূপ প্রলোভন বাক্য বাহির করিয়াছেন—

"রাজারে কহিয়া দিব শতেক খামার।
ধান্য চালু সরিষাতে পূরিবে হানার।"

শ্রীমন্ত প্রবোধ না মানায় অর্থাৎ স্বদেশে যাইতে কৃতসংকল্প হওয়ায় বালিকা সুশীলা "মায়ে বার্ত্তা দিতে যায় আউদর চুলি।" শ্রীমন্তের বয়স্থ ব্যক্তির ন্যায় শ্যালকপত্নীর সহিত সম্ভাষণ সম্ভবতঃ কোন পরবর্ত্তী কবির উৎকট কল্পনার ফল। শ্বশুর,শাশুড়ীর প্রবোধ শ্রীমন্তকে সিংহলে আবদ্ধ রাখিতে অক্ষম হইল। পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত দেশে ফিরিবার সময় মগরার জল দেখিয়া ধনপতির শোক বাড়িয়া উঠিল। তিনি সলিলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে ধনপতি পুত্রের প্রতি যে করুণ উপদেশ দিয়াছেন, তাহা কবিকঙ্কণের লেখনারই উপযুক্ত।

"মৈল ছয় ভাইপো, তারে বড় মায়া মো,
কত মৈল কাণ্ডার বাঙ্গাল।
কাণ্ডার বাঙ্গাল যত, সকলি হইল হত,
রহিল হৃদয়ে শোক শাল॥
শুন পুত্র মম বাণী, তুমি যাহ উজানী,
আমি আর না যাইব দেশ।
লহনা খুল্লনা জনে, দেশে আছে দুইজনে,
সমভাবে দেখিবে বিশেষ॥
লহনা খুল্লনা কাছে, পুরাতন চেড়ী আছে,
দুর্ব্বলা রাখিও গৃহ কাজে।
সম্ভাষা করিহ রাজা, শিবের করিহ পূজা,
খ্যাতি হবে উজানী সমাজে॥
শুন পুত্র বলি আর, সবিনয়ে পরিহার,
জানাইহ নৃপতির পায়।
বিধি প্রতিকূল সাথে, আসিতে আসিতে পথে
পিতা মোর মৈল মগরায়॥

যাহা হউক, চণ্ডীর কৃপা লইল, ধনপতি জলে ঝাঁপ দিয়াও মরিলেন না। তাঁহার জলমগ্ন ছয় ডিঙ্গা পূর্ব্বাবস্থায় বাঙ্গালমাঝি সমেত ফিরিয়া পাইলেন। ধনপতি উজানী নগরে ফিরিয়া আসিলেন। এই প্রত্যাগমন কালে কবি পথের বর্ণনায় কালীপাড়া ও

কলিকাতার উল্লেখ করিয়াছেন। গৃহে আসিয়া পিতা পুত্রে রাজসকাশে গমন করিলেন। এখানে আবার শ্রীমন্তের কমলেকামিনী উল্লেখের পর সিংহলের কাণ্ডের কতকটা পুনরভিনয় হইল। সিংহলরাজ শ্রীমন্তকে বলি দেওয়ার জন্য দক্ষিণ মশানে পাঠাইয়া দিলেন, বিক্রমকেশরী উত্তর মশানে পাঠাইলেন। আবার দেবীর সসৈন্যে আগমন, পরিশেষে রাজার কমলে কামিনী দর্শন ও রাজকন্যার সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ হইল। ধনপতির শেষে দিব্যজ্ঞান জন্মিল, হরগৌরী একত্র দেখিতে পাইলেন, "যাইয়া দেবতা"র প্রতি বিদ্বেষ দূরীভূত হইল। সপত্নী দেখিয়া সুশীলার যে কিছু হিংসা না জন্মিল, তাহা নহে। শ্রীমন্ত তাহাকে চলিত রীতি মত প্রবোধ দিলেন। যথাকালে শ্রীমন্ত, শ্রীমন্তের পত্নীদ্বয় ও খুল্লনা ধনপতি ও লহনাকে মর্ত্ত্যে রাখিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

পরিতাপের বিষয়, কবি মানবের মানবত্ব অঙ্কিত করিতে গিয়া যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, দেবতার দেবত্ব অঙ্কিত করিতে গিয়া ততদূর হইতে পারেন নাই। যেখানে তিনি বৃহৎ ব্যাপারে হাত দিয়াছেন, সেইখানেই অস্বাভাবিকতা ও অনুপাত-রাহিত্য আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়—চণ্ডীর মাহাত্ম্য—অঙ্কিত করিতে গিয়া মুকুন্দরাম একেবারেই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। দেবী আদ্যাশক্তি বা জগতের মূল প্রকৃতি স্বরূপ চিত্রিত হন নাই। সে গাম্ভীর্য্য, সে মহত্ত্ব, সে শক্তি কবিকঙ্কণের "শক্তি"তে নাই। কবিকঙ্কণ তাঁহার চণ্ডীর যে আলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা ইতর প্রকৃতি, ক্ষমতাপ্রিয় স্ত্রীলোকের। অন্যান্য দেবপ্রকৃতিও কবিকঙ্কণের হস্তে দেবতার ন্যায় উচ্চভাব প্রাপ্ত হয় নাই। মহাযোগী মহাদেব সাধারণ ক্ষুধিত ভিক্ষুকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছেন। কবি মহাদেবকে অনাবৃতবক্ষা কুচনিদিগের সহিত পরিহাস করাইয়া লইয়াছেন, গৌরীর প্রতি নানা সখের দ্রব্য রান্ধিবার ফরমাস দেওয়াইয়াছেন, ইতর স্ত্রীপুরুষের ন্যায় হরপার্ব্বতীর কোন্দল বর্ণনা করিয়াছেন। এই কোন্দলের ফলই দেবীর পৃথিবীতে পূজা খাইবার ইচ্ছা। সেই পূজার জন্য নীলাম্বর ও রত্নমালাকে পৃথিবীতে পাঠাইতে দেবী পদ্মার পরামর্শে যে চক্রান্ত করিয়াছেন, তাহা দেবীর পক্ষে অমার্জ্জনীয়। কবিকঙ্কণের দেবী কথায় কথায় বর্ত্তমান বা ভাবী ভক্তের নিকট সশরীরে উপস্থিত হন, সামান্য গোলযোগে চারিদিক অন্ধকার দেখেন এবং বুদ্ধিমতী সহচরী পদ্মার মন্ত্রিত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেন। গোধিকারূপ ধারণ করার পর কালকেতু ব্যাধের হস্তে বন্দী হইয়া—

"ধনুকে চিন্তেন মাতা হয়ে লম্বমান।
ব্যাধকে আইলাম ভাল দিতে বর দান"॥

তাঁহার হৃদয় কষ্টে বিচলিত হইল, কংসের হাতে যে অপমান পাইয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল, ব্যাধের হাতে অপমান শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইল। তাহার উপর আবার—

"কিন্তু এক হৃদয়ে লাগয়ে মোর ডর।
অপমান কথা পাছে শুনেন শঙ্কর॥

* * * * *
* * * * *

কি কহিবে আমারে শুনিলে শূলপাণি।
লজ্জাযুত হয়্যা চণ্ডী শিরে পাণি হানি॥
আপন অপেক্ষা কাজ করিলুঁ আপনি।
কি করিব ব্যাধ মোরে না জানে ভবানী॥
কোন্ কাজে রইলাম, আমি হইয়া গোধিকা।
মরণ অধিক লজ্জা ভালে ছিল লেখা॥

ব্রহ্মা আদি দেবগণ যাঁরে স্তুতি করে।
সেই চণ্ডী বন্দী হইল আখেটীর করে॥
সুরপতি যারে নিতি পূজে বিধিমতে।
হেন জন বন্দী হৈল আখেটীর হাথে॥
গোধিকা হইয়া আমি কৈনু কোন্ কাজ।
দুঃখের উপরে দুখ বড় পাইলুঁ লাজ॥"

চণ্ডীর এই কষ্টের দশা মুকুন্দরামের সমকালে কাহারও লোচন বাষ্পাকুল করিয়াছিল কিনা, জানিনা,কিন্তু আজকাল যে ইহা করুণ রসের পরিবর্ত্তে হাস্যরসের উদ্রেক করে, আমরা সে বিষয়ে হলফ লইয়া জবানবন্দী দিতে প্রস্তুত। চণ্ডী ক্রমে ষোড়শী রমণীর রূপ গ্রহণ করিলেন, ব্যাধের ও ব্যাধপত্নীর সহিত অনেক বাক্য ব্যয় করিয়া অবশেষে বেগতিক দেখিয়া আপনার পরিচয় দিলেন ও মহিষমর্দ্দিনী রূপ দেখাইলেন। তাহার পর ব্যাধকে আপনার শত নাম শুনাইয়া মাণিক অঙ্গুরী ও সাত ঘড়া ধন দান করিলেন। ব্যাধ শেষ বিযোড় ঘড়া স্বয়ং বহন করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় অগত্যা মহামায়া ঘড়াটী নিজের কাঁখেই তুলিয়া লইলেন। তখন ব্যাধের ভয় হইল—

"মনে মনে মহাবীর করয়ে যুকতি।
ধন ঘড়া লয়্যা পাছে পালায় পার্ব্বতী॥"

এই বর্ণনায় ব্যাধের সরলতা, বর্ব্বরতা কি অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পাইয়াছে,দীনেশবাবু তাহার বিচার করিবেন; কিন্তু দেবী যে বন্ধন ছিন্ন করিয়া, নানা মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া, শত নাম শুনাইয়া এবং দরিদ্র ব্যাধকে স্বপ্নাতীত অর্থ দান করিয়াও তাহার হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক করাইতে পারেন নাই, তাহা নিশ্চিত। অতঃপর দেবী সুখে দুঃখে ব্যাধের সহায় হইয়া, তাহার পক্ষে যুদ্ধ করিয়া এবং তাহার বন্দীদশায় কলিঙ্গরাজকে স্বপ্ন দেখাইয়া ভক্তের উপকার করিলেন।

কিন্তু ইহাতে ত কেবল পুরুষের নিকট পূজা খাইবার বন্দোবস্ত না হইল? স্ত্রীলোকের পূজা পাইবার কি বন্দোবস্ত করা যায়? দেবী আবার পদ্মাবতী মন্ত্রিনীর সাহায্য গ্রহণ করিলেন এবং রত্নমালা নাম্নী পরম রূপসী ইন্দ্রের নর্ত্তকীর মাথা খাইবার জন্য তাহাকে মহাদেবের সভায় নৃত্য করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। মহাদেব যোগ ছাড়িয়া দেবতাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া রত্নমালার নাচ দেখিতে বসিলেন। "তাতিনী তাতিনী তিনি" মৃদঙ্গ-মন্দিরার ধ্বনি হইতে লাগিল। নারদ তাঁহার বীণা লইয়া "গান্ধার নিষাদ" গাইতে লাগিলেন। যথাকালে দেবীর আদেশে মীনকেতু তাঁহার অমোঘ সম্মোহন বাণ সন্ধান করিলেন। রত্নমালা বেচারী আর যায় কোথা? তাহার তালভঙ্গ হইল। দেবী তাহাকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিবার অভিশাপ দিলেন। রত্নমালা অনেক কান্নাকাটির পর পৃথিবীতে আসিয়া লক্ষপতি সওদাগরের কন্যা খুল্লনা রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। দেবচরিত্রের কি উজ্জ্বল ভক্তি-আকর্ষক চিত্র!

দেবী ভক্তের সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু তিনি যদি সকল সময়েই মানুষের মত সাহায্য করেন,তবে আর তাঁহার দেবত্ব কি? খুল্লনা যখন রান্ধিতে আরম্ভ করিলেন, তখন দেবী কি ভাবে তাঁহার সাহায্য করিতে আসিলেন, পাঠক, একবার শুন—

"সুমেরু উপর আছে কুমুদ ভূধর।
তাহার উপরে আছে বট তরুবর॥
এগার যোজন সেই তরুবর বট।
তার মুখে হর নাহি ছাড়েন নিকট॥

তাহার কোটরে আছে পাঁচখানি নদী।
তাহে বহে খণ্ড ক্ষীর ঘৃত মধু দধি॥
তাহে ঝুলি খেলে চণ্ডী মেলি সখীগণে।
হেনকালে খুল্লনা পড়িয়া গেল মনে॥
পঞ্চখানি নদী লয়্যা দেবীর গমন।
রন্ধনশালাতে গিয়া দিল দরশন॥
পাঁচ নদী চণ্ডিকা রাখিলা তার পাশে।
ব্যঞ্জন অমৃত যার রসের পরশে॥
চণ্ডিকা দেখিয়া রামা মুখে নাহি বোল।
শিরে হস্ত দিয়া চণ্ডী তারে দিল কোল॥"

এই মশা মারিতে কামান পাতার বিবরণ গোপীচন্দ্র রাজার গানকেও হারাইয়াছে। শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রার সময়ে খুল্লনার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবী স্বয়ং নেতের আঁচলে তাঁহার চক্ষুর জল মুছাইয়া দিলেন, আর বলিলেন—

"সিংহলে যাইতে পুত্রে দেহ অনুমতি।
বিপদে তোমার পোয়ের থাকিব সংহতি॥"

ইহার পর যখন শ্রীমন্ত সিংহলে কোটালের কথায় সোণার টোপর জলে ফেলিয়া দিলেন, তখন সেই অপচয় দেবীর প্রাণে বড় বাজিল—

লক্ষ তঙ্কা ধন, নষ্ট হৈবে অকারণ,
ইহা চক্ষে দেখিব কেমনে॥

* * * *
* * * *

ক্ষেমঙ্করী রূপ ধরি, অধরে টোপর করি,
ভগবতী চলিলা উড়িয়া।
পদ্মাবতী করি সঙ্গে, যান মাতা লীলারঙ্গে,
উজানীতে উত্তরিলা গিয়া॥"

তাহার পর দেবী খুল্লনাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন—

"আমি সিংহলেতে যায়্যা, রাজকন্যা বিভা দিয়া,
আনি দিব তোর ছিরা ঘরে।
* * * * * * * *
* * * * * * * *
ঝিএগো প্রবোধ হও, রহিতে শকতি নও,
সেই ছিরা আছয়ে একেলা।
নাহি জানি কোন্ থানে, বাদ করে কার সনে,
রাখিতে চাহিয়ে সেই বেলা॥"

কিন্তু এত অঙ্গীকার ও উৎকণ্ঠার পরও দেবী শ্রীমন্তকে ভুলিয়া গেলেন। সিংহল রাজের আদেশে বধ্য ভূমিতে নীত হইয়া যখন শ্রীমন্ত নানাপ্রকারে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন, যখন কৈলাসে দেবীর আসন টলিয়া উঠিল, মুখ হইতে পান খসিয়া পড়িল, মন প্রাণ অস্থির হইল, কপালে টনক পড়িল, দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিতে লাগিল, খাইতে জিহ্বায় দন্ত বাজিতে লাগিল, চলিতে নখে উঁছট লাগিল, কালপেঁচা সম্মুখে ডাকিল, তখন চণ্ডী ভাবিয়া আকুল হইলেন—কে তাঁহাকে স্মরণ করে? দেবী অগত্যা পদ্মাবতীর স্মরণাপন্ন হইলেন। পদ্মাবতী জ্যোতিষের নানা পুঁথির সাহায্যে খড়ি পাতিয়া অনেক গণিয়া গাঁথিয়া স্থির করিলেন, মশানে বিপদে পড়িয়া শ্রীমন্ত দেবীকে স্মরণ করিতেছে। ভাগ্যে শ্রীমন্তের বস্ত্র পরিবর্ত্তনের সময় পাগড়ীর মধ্য হইতে তণ্ডুল ও দূর্ব্বা মাটিতে পড়িয়াছিল এবং তাহাতে পরিত্রাণকারিণী চণ্ডীর কথা মনে পড়িয়া গিয়াছিল, নতুবা বোধ হয় দেবীর এত ক্রোধ ও অঙ্গীকার সত্ত্বেও কেবল শ্রীমন্তের ছিন্নমস্তক দর্শনই তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিত। যাহা হউক, অবশেষে পদ্মাবতীর অনুগ্রহে দেবীর দিব্য জ্ঞান জন্মিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্য-সজ্জার আদেশ দিলেন—

"রাজারে বধিয়া আজি, ছিরারে করার ছাতি,
ঝাটকর সেনার সাজন।"

রাজাকে 'ছিরার' শ্বশুর করার অঙ্গীকারটা বোধ হয় তখনও মনে পড়িয়াছিল

না। এই যুদ্ধযাত্রায় দেবতারা যে যেখানে ছিলেন, সাহায্যের জন্য আপন আপন অস্ত্র আনিয়া দিলেন। ধাতা কমণ্ডলু পর্য্যন্ত আনিয়া যোগাইলেন। সামান্য শালবান্‌কে বধ করিবার জন্য আদ্যাশক্তির এত বিরাট আয়োজনে যে তাঁহার মাহাত্ম্যের বৃদ্ধি পায়না, কবির বোধ হয় সে ভাব মনে উঠে নাই। দেবতারা দেখিলেন, মহাপ্রমাদ— শালবানের বধ উপলক্ষে কি একটা কাণ্ডই হইতে চলিল। ইন্দ্র নারদকে ডাকাইয়া ব্যাপারখানা কি, জানিবার জন্য চণ্ডিকার নিকট পাঠাইলেন। নারদ দেবীর নিকট গিয়া সমস্ত জানিয়া হাসিয়া ফেলিলেন—

"গরুড়ের রণ কিবা মশকের সনে।"

নারদের পরামর্শে চণ্ডী জরতীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক কোটালের নিকট গিয়া শ্রীমন্তকে নাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহাকে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাহাতে কুলাইল না, শেষে যুদ্ধই বাধিল। সিংহলেশ্বর শালবান রাজার দলবলের সহিত যুদ্ধে মহামায়ার কতদূর বাহাদুরী হইতে পারে, তাহা, পাঠক, সহজেই বুঝিতে পার। কিন্তু কেবল মহামায়াই নহেন, অন্যান্য কয়েকজন দেবীও তাঁহার সাহায্যকারিণী হইয়া এই যুদ্ধে যোগদান করিলেন। কবি এই যুদ্ধের বর্ণনা করিয়া শোণিতের নদী, স্রোতের হাট প্রভৃতি লিখিয়া মহাশক্তির শক্তিতে পাঠকের বিস্ময় জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশেষে হনুমান কর্ত্তৃক ঔষধ আনয়ন ও মৃত সৈন্যের জীবন-প্রাপ্তি।

বিক্রমকেশরী রাজার মশানে যে সিংহলের ব্যাপারের পুনরভিনয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে বরং মনুষ্যত্ব একটু কম আছে।

সে কালে দেবতা, কি দানব, কি অপর যে কেহ বড় হইত, তাহাকেই একবার যমের সহিত পাল্লা লড়িতে হইত। লঙ্কেশ্বর রাবণের নিকট যমরাজকে যে কি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা রামায়ণের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। বিষ্ণুর ও মহাদেবের অনুচরের সহিত যমদূতের অনেকবার বল পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আমাদের কবিও যমদূতকে বীরাঙ্গনা পদ্মাবতীর আদেশ প্রাপ্ত শিবদূতের নিকট হারাইয়া দিয়াছেন। স্বয়ং যমরাজের সহিতও যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু এখানে কবির সুবুদ্ধিতে সেটুকু আর ঘটিয়া উঠে নাই। গ্রন্থের শেষভাগে কবি মহাযোগী মহাদেবকে আর একবার সাধারণ নেশাখোরের মূর্ত্তিতে পাঠকের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। দেবী স্বামীর নিকট বসিয়া কি প্রকারে মর্ত্ত্যলোকে অশেষ পূজা ও সম্মান পাইয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিয়া বাহাদুরী দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। শিবভক্ত ধনপতির সিংহলে কারাগারে গমনের কথা শুনিয়া মহাদেবের আর ধৈর্য্য রহিল না— তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন, চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, দেবীকে পূর্ব্বকালীন আরও অনেক অযথা ব্যবহারের কথা শুনাইয়া দিয়া বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন, শূল হাতে করিয়া বলদের উপর গিয়া চড়িলেন পর্য্যন্ত। কিন্তু দেবী ধনপতিকে কারাগারে বন্দী দশায় রাখিয়া তাহার কাহিনী মহাদেবকে শুনাইতে বসেন নাই। তিনি ধনপতিকে পুত্র দিয়াছিলেন, ঐশ্বর্য্য দিয়াছিলেন, প্রথমে কষ্ট দিলেও পরে কারামুক্ত করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার কৈফিয়ৎ অতি সহজই ছিল—মহাদেবের রৌদ্ররসও শীঘ্রই হাস্যরসে পরিণত হইল।

দেব-প্রকৃতির এই প্রকার উচ্চভাবের

অভাব কবিকঙ্কণের যুগের দোষ। হিন্দু-ধর্ম্মের উচ্চভাব যে মুসলমান রাজত্বে পৌত্তলিকতায় পরিণত হইয়াছিল, তাহা নানা পুরাণে এবং এই কাব্যে প্রতিফলিত। কবিকঙ্কণের দেবতা সাধারণ মানবের মনোবৃত্তিতে পূর্ণ, ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী চরিত্রের আদর্শে গঠিত। কলিঙ্গরাজের রাজ্য অনর্থক জলপ্লাবনে নষ্ট করিতে অনিচ্ছুক গঙ্গার সহিত দেবীর যে কলহ কবি বর্ণনা করিয়াছেন,তাহা সাধারণ স্ত্রীলোকেরই উপযুক্ত। কবি যে এই পৌরাণিকতা পরিপ্লুত বাঙ্গালী সমাজের ধর্ম্মভাবের যথার্থ চিত্র আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার জন্যই তিনি ধন্যবাদের পাত্র।

আমরা কবির অনেক ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছি। এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও মুকুন্দরাম মহাকবি। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শঙ্করসেবী ধনপতি, বুদ্ধিমান্ পিতৃভক্ত বালক শ্রীমন্ত, চণ্ডীর সেবিকা স্থিরবুদ্ধি খুল্লনা, সাধারণ সপত্নী লহনা প্রভৃতি চরিত্রগুলি স্থানে স্থানে অসামঞ্জস্যের মধ্যেও পরিস্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবিকঙ্কণের দৃষ্টি অধিকদূর বিস্তৃত না হইলেও, দামুন্যা, আড়রা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি যে মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বঙ্গভাষার উপবনে তাহার তুল্য আর কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস গগনবিহারী কবি। কবিকঙ্কণ আমাদিগকে সুজলা ও সুফলা মাতৃভূমি ও তাহার সন্তানগণের গৃহচিত্র দেখাইয়াছেন। চণ্ডীকাব্যে কেবল রথে আরোহণ, দৈবশক্তি-সম্পন্ন বাণ বর্ষণ, স্বর্গে ভ্রমণ প্রভৃতির উল্লেখ নহে, 'ক্যাষ্টর অইল' সেবনের ন্যায় গার্হস্থ জীবনের কষ্টের ছবিও আছে। পাঠক, এক বার ব্যাধপত্নী নিদয়ার সাধ ভক্ষণের ফরমাইসটী শুন—

গর্ভের দেখিয়া ভর, মনে মোর লাগে ডর,
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই দিন দশ।
আপনার মত পাই, তবে গ্রাস কত খাই,
পোড়া মাছে জামীরের রস॥
নিধানী করিয়া খই, তাহাতে মহিষ দই,
কুল করঞ্জা প্রাণ হেন বাসি।
যদি পাই মিঠা ঘোল, পাকা চালিতার ঝোল,
প্রাণ পাই পাইলে আমসী॥
আমার সাধের সীমা, হেলঞ্চা কলমী গিমা,
বোদালি আনিয়া কর পাক।
ঘন কাটি খর জ্বালে, সাঁতলিবে কটু তেলে,
দিবে তাতে পলতার শাক॥
পুই ডগা, মুখী কচু, ফুলবড়ী তাহে কিছু,
তাতে দিবে মরিচের ঝাল।
হরিদ্রা রঞ্জিত কাঞ্জী, উদর পূরিয়া ভুঞ্জি,
প্রাণ পাই পাইলে পাঁকাল॥
লোণ দিয়া কিছু বাড়া,নকুল গোধিকা পোড়া,
হংস ডিমে কিছু তোল বড়া।
কিছু ভাজ রাইখড়া, চিঙ্গড়ির তোল বড়া,
শজাক করহ শীকপোড়া॥
সদাই ন্যাকার উঠে, দিনে দিনে বল টুটে,
বদনে সদাই উঠে জল।
মূলা বাগ্যাণ শীম, তাহে দিয়া রান্ধ নীম,
আর দিও উড়ুম্বর ফল॥"

নিদয়ার গর্ভ-যন্ত্রণার একটু বিবরণ শুন—

"প্রাণনাথ! হেঁঠে হল্যা ধরে মোর কেশ।
কেশমূলে টান পড়ে, রাত্রি হইলে পেট বাড়ে,
কহিবে উহার উপদেশ॥
হইল উদর ভারী, বসিলে উঠিতে নারি,
শুইলে ফিরিতে নারি পাশ।
চাহিতে না পারি হেঁঠে, সূচে যেন বিন্ধে পেট,
দূরে গেল জীবনের আশ॥

সংশয় জীবন-আশা, হইল মরণ দশা,
বুকে পিঠে বিন্ধে যেন বাণ।"

বণিকপত্নী খুল্লনার সাধের ফরমাইসটী নিম্নলিখিতরূপ—

"কহি নিজ সাধ শুন লো দাসি।
পান্ত ওদন ব্যঞ্জন বাসি॥
বাথুয়া ঠন্‌ঠনি তেলেতে পাক।
ডগি ডগি তোল ছোলার শাক॥
মীন চড়চড়ি কুসুম বড়ি।
সরল সফরী ভাজা চিঙ্গড়ি॥
যদি ভাল পাই মহিষা দই।
ফেলি চিনি তাহে মিশায়ে খই॥
পাকা চাঁপা কলা করিয়া জড়।
খেতে মনে সাধ করেছি বড়॥
কনক থালেতে ওদন শালি।
কাঁজির সহিত করিয়া মেলি॥
হেন কাঁজি ভুঞ্জি মনেতে ভায়।
চাকা চাকা মূলা বাগুন তায়॥
আমড়া নোয়াড়ি পাকা চালিতা।
আমসি কাসন্দি কুল করঞ্জা॥
থোর উড়ুম্বর ইচলি মাছে।
খাইলে মুখের অরুচি ঘুচে॥
হিয়া দগদগী অন্তরে ভোক।
মুখে নাহি রুচে এ বড় শোক॥
মনে করি সাধ খাইতে মিঠা।
ক্ষীর নারিকেল ছাঞ্চির পিঠা॥
বসিতে উঠিতে ফিরয়ে মাথা।
ঘন উঠে হাই কহিতে কথা॥
সখী সাথে যদি বাড়াই পা।
আলুইয়া পড়ে সকল গা॥
দুগ্ধে তিলের গুঁড়ি মিশায়ে লাউ।
দধির সহিত খুদের যাউ॥
চিড়া পাকা কলা দুগ্ধের সর।
কহি দুয়া এই শুন গো আর॥
ঝুনা নারিকেল চিনির গুঁড়া।
করি আপনার সাধের চূড়া॥
পতি পরবাসে সতিনী ঘরে।
কে সাধিবে মান কহিব কারে॥"

ষোড়শ শতাব্দীতে কি কি ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা বাঙ্গালী গৃহিণীরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের রসনার তৃপ্তি-সাধন করিবার প্রয়াস পাইতেন, পাঠক, একবার শুন। সমুদ্রের অপর পার হইতে বিবিধ দ্বিপদ এবং চতুষ্পদ জন্তুর শরীরের সদ্ব্যবহার করিতে শিখিয়াছ, কিন্তু এই সকল ফর্দ্দে এমন কিছু পাইবে, যাহা এখনও উপেক্ষা করিবার সামগ্রী হয় নাই, অথবা বিদেশে যাহার স্থানীয় কিছু যুটিবে না। যোগীশ্বর মহাদেবের পার্ব্বতীর প্রতি খাদ্যদ্রব্যের ফরমাইসটী কিছু অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে কিন্তু ইহাতে দরিদ্র ভিক্ষুকের কি কি দ্রব্যে মনস্তুষ্টি ঘটিবার কথা, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে—

* * *

"নিমে সিমে বেগুণে রান্ধিয়া দিবে তিত॥
সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।
কুমড়াতে বাগ্যণেতে রান্ধিবে প্রচুর॥
রান্ধিবে ছোলার দালি তথি দিবে খণ্ড।
আলস্য ঘুচায়ে জ্বাল দিবে দুই দণ্ড॥
বেশম মাখিয়া রান্ধ সরিষার শাক।
কটু তৈলে বেথুয়া করিবে দৃঢ় পাক॥
ঘৃতে ভাজি খর করি রান্ধিবে ফুলবড়ি।
চৌয়া চৌয়া করি ভাজ পলতা কাঁকড়ি॥
রান্ধিবে মসুর-ডালি দিয়া টাবাজল।
খাঁড় মিশাইয়া রান্ধ করঞ্জার ফল॥
নটিয়া কাঁটালবীচি সারি গোটা দশ।
ঘৃতে সম্বরিয়া তায় দিবে আদার রস॥
আমড়া সংযোগে গৌরি রান্ধিবে পালঙ্ক।
ঝাট স্নান কর গৌরি না কর বিলম্ব॥

খণ্ডে মুগের সূপ উত্তার ডাবরে।
আচ্ছাদন থালাথালি তাহার উপরে॥
কুরুনীতে কুরিয়া আনিবে নারিকেল।
পিঠালি মিশায়্যা তথি দিবে কিছু জল॥
ঘনকাটি খরজালে রান্ধিবে ভাল ঘণ্ট।
তবে সে পুরিবে মোর উদর আকণ্ঠ॥
গোটা কাসুন্দিতে দিবে জম্বীরের রস।
এবেলার মত এই রান্ধ ব্যঞ্জন দশ॥"

ইহার পর ধনীর গৃহে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়ের কিরূপ বন্দোবস্ত ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাঠককে দিতেছি।

"বাইগুণ কুমড়া কড়া, কাঁচকলা দিয়া শাড়া,
বেসার পিঠালী ঘনকাঠি।
ঘৃতে সন্তোলিল তথি, হিঙ্গু জীরা দিয়া মেথি,
শুক্তা রন্ধন পরিপাটী॥
ঘৃতে ভাজে পলাকড়ি, নৈটা শাকে ফুলবড়ি,
চিঙ্গড়ি কাঁটাল-বীচি দিয়া।
ঘৃতে নালিতার শাক, তৈলে বাস্তূক পাক,
খণ্ডে বড়ি ফেলিল ভাজিয়া॥
দুধে লাউ দিয়া খণ্ড, জ্বাল দিল দুই দণ্ড,
সন্তোলিল মহুরীর বাসে।
মুগসূপে ইক্ষুরস, কৈ ভাজে পণ দশ,
মরিচ গুঁড়িয়া আদারসে॥
মসুরি মিশ্রিত মাস, সূপ রান্ধে রসবাস,
হিঙ্গু জীরা বাসে সুবাসিত।
ভাজে চিথলের কোল, রোহিত মৎস্যের ঝোল
মান-বড়ি মরিচে ভূষিত॥
বোদালি হেলঞ্চা শাক, কাঠিদিয়া কৈল পাক,
ঘন বেসার সন্তোলন তৈলে।
কিছু ভাজে রাইখড়া, চিঙ্গুড়ির তোলে বড়া,
খরসোলা পুঞ্জী দশ তোলে॥
করিয়া কণ্টকহীন, আম্রে শকুল মীন,
খরলোণ দিয়া ঘনকাঠি।
রান্ধিল পাঁকাল ঝষ, দিয়া তেঁতুলের রস,
ক্ষীর রান্ধে জ্বাল করি ভাঁটি॥
কলা-বড়া মুগসাউলি, ক্ষীর-মোনমা ক্ষীর-পুলি,
নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে।
অন্ন রান্ধে অবশেষে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে,
পাণ্ডিত রন্ধন উপদেশে॥"

ইলিশ, চাইং প্রভৃতি অধিকতর সুস্বাদু মৎস্যের যে উল্লেখ নাই, তাহার জন্য কবি দায়ী হইতে পারেন না, কেননা ভ্রমরা বা অজয়ের জলে তাহার অস্তিত্ব সম্ভবে না এবং তখনও বাষ্পীয় যানের আবির্ভাব হয় নাই। তবে মাংস রন্ধনের প্রক্রিয়াটী লিপিবদ্ধ করিলে বর্ণনাটীর মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইত।

তার পর ভোজনের ব্যবস্থা এইরূপ—

"প্রথমে শুকুতা ঝোল দিল ঘণ্ট শাক।
প্রশংসা করয়ে সাধু ব্যঞ্জনের পাক॥
ভাজা মীন ঝোল ঘণ্ট মাংসের ব্যঞ্জন।
ভোজন করয়ে সাধু আনন্দিত মন॥
ঘৃতে জর জর খায় মীন মাংস বড়ি।
বাদ করি কৈ ভাজা খায় দেড়বুড়ি॥
আম্র খাইল পিঠা জল ঘটী ঘটী।
দধি খায় ফেনা তথি করে মটমটী॥
দধি পিঠা খাইল সাধু মধুর পায়স।
ভোজন করিয়া সাধু কামে হৈল বশ॥"

বলা বাহুল্য, তখনও বেহার ও উৎকল দেশীয় পাচক ব্রাহ্মণে বঙ্গদেশ প্লাবিত হয় নাই; রাঢ়দেশীয় ধনী বণিকের গৃহে নিত্য ও নৈমিত্তিক সকল প্রকার রন্ধনেই গৃহলক্ষ্মী-দিগের নিপুণতা প্রদর্শিত হইয়াছে। ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে যখন ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের কোলাহলে গৃহ মুখরিত, তখনও গৃহকর্ত্রীরাই রন্ধনশালার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং 'খুল্লনা কনক থালে যোগায় 'ওদন' ও 'সুবর্ণের গাড়ুতে লহনা দেয় ঘি।' কনকের থালা এবং সুবর্ণের

গাঢ়, হতভাগ্য বঙ্গবাসীর গৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাঁহার রসনাও এক্ষণে গৃহের স্ত্রীকন্যার যত্ন ও নিপুণতা দ্বারা প্রস্তুত ভোজ্য দ্রব্যের সুস্বাদ হইতে বঞ্চিত। গৃহলক্ষ্মীরা এক্ষণে রন্ধনশালার উত্তাপ সহ্য করিতে অক্ষম এবং দুগ্ধফেননিভ শয্যার ও বটতলার উপন্যাসের সদ্ব্যবহার করিতেই অধিক পটু।

উচ্চশ্রেণীস্থ স্ত্রীলোকের স্বহস্তে রন্ধন কেবল যে সামাজিক সরলতার পরিচায়ক, তাহাও নহে। জাতিভেদের গণ্ডী তখনও সম্পূর্ণ প্রভাবশালী। ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত অজ্ঞাতব্যক্তির হস্তে অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতীয় লোকও তখন আহার গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। কারাগারমুক্ত বুভুক্ষু গন্ধবণিক ধনপতি বিদেশেও যে কোন ব্রাহ্মণের হস্তে অন্ন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। যখন শ্রীমন্ত (তখনও পিতার নিকট অপরিচিত) তাঁহাকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন, তখন সেই বিপদ্ মালায় পরিবেষ্টিত অবস্থায়ও ধনপতির আপত্তি

"পরিচয় নাহিক কেমন দ্বিজবর।"

অগত্যা শ্রীমন্তকে তাঁহার সংশয়চ্ছেদ করিতে হইল।

"মাধব আচার্য্য সুত আমার সংহতি।
চিন দেখি যদি বট উজ্জাবনী স্থিতি॥
মহাকুল বন্দ্যঘটী উত্তম ব্রাহ্মণ।
বন্দিশালে নাহি দোষ করহ ভোজন॥"

ধনপতি তখন আহার করিতে সম্মত হইলেন। উদ্ধৃত অংশটুকু প্রক্ষিপ্ত হইলেও প্রাচীন, সুতরাং ইহাতে কবিকঙ্কণের সমসাময়িক কিম্বা তাঁহার কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী সামাজিক অবস্থারই প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইয়াছে।

ধনীর গৃহে গৃহলক্ষ্মীরা রন্ধন করিতেন বলিয়া বর্ণজ্ঞানশূন্য ছিলেন না। যখন লহনা খুল্লনার দুর্গতি সাধনের জন্য প্রিয়সখী লীলাবতীর শরণাপন্ন, তখন লীলাবতী খুল্লনাকে প্রতারণা করিবার জন্য পত্র লিখিতে বসিলেন। লীলাবতীর পত্র লিখন যে শুকশারীর কথোপকথন বা পশুগণের আবেদন নিবেদনের ন্যায় ব্রাহ্মণ কবির অস্বাভাবিক কল্পনা, তাহা স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। কবি এই পত্র-লিখন উপলক্ষে লিখিবার যে প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা স্বাভাবিক। তিনি এই স্থলে স্বাভাবিকতা অঙ্কিত করিতে এমন একটু প্রয়াস পাইয়াছেন, যাহাতে ইহাকে অস্বাভাবিকতার সীমা হইতে পৃথগবস্থিত বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। লহনা এই পত্র লইয়া যখন খুল্লনার সম্মুখে ধরিলেন, তখন খুল্লনা কেবল যে পত্র পড়িতে পারিলেন, এমত নহে, তিনি অক্ষরের ছাঁদ দেখিয়া সমস্ত চাতুরী ভেদ করিয়া ফেলিলেন। যে সমাজে গন্ধবণিক জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের লেখা পড়ার চর্চ্চা স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইত, সে সমাজে অধিকতর শিক্ষিত জাতির মধ্যে উহার প্রচলন সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়াই অনুমান করা যায়।

আমরা স্ত্রীলোকদিগের রন্ধন ও বিদ্যা শিক্ষার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিলাম। তাঁহাদের বসনভূষণ ও গতিবিধিরও কবি একটী সুন্দর আলেখ্য প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। বিংশশতাব্দীর সুন্দরীগণ একবার মনের সুখে তাঁহাদের অলঙ্কারগুলির সহিত আপনাদের অলঙ্কার তুলনা করিয়া মানসিক গর্ব্ব অনুভব করিয়া লউন। খুল্লনার কিশোর বয়সে বিবাহের পূর্ব্বে

"গলে শতেশ্বরী হার, শোভে নানা অলঙ্কার,
করে শঙ্খ শোভে তাড়বালা"।

এবং ইহা ব্যতীত

'চরণে নূপুর রাজে।'

খুল্লনার অভিসারের সময়—

"অবধানে আল্যাইলা দৃঢ় বন্ধন দড়ি।
দোছুটী করিয়া পরে তসরের সাড়ী॥
দুর্ব্বলা মার্জ্জন করে লয়ে প্রসাধনী।
বাম করে হেম দন্ত রসাল দর্পণী॥
কবরী বাঁধিয়া দিল কুসুমের গাভা।
আষাঢ়িয়া মেঘে যেন বিদ্যুতের শোভা॥
বাহুযুগে আরোপিল কনক কেয়ূর।
পদযুগে আরোপিল কনক নূপুর॥
কবরী আরোপি রামা মল্লিকার মালে।"

ধনপতি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে লহনা আপনার সপত্নী-প্রেমের আতিশয্য প্রতিপন্ন করিতে গিয়া বলিতেছেন—

"অঙ্গদ কঙ্কণ হার, আর যত অলঙ্কার,
আপনি পড়াই কর্ণপুর"

নূপুরের উল্লেখ অনেক স্থানেই দৃষ্ট হয়। যখন শ্রীমন্ত পিতাকে উদ্ধার করিয়া গৃহে ফিরিলেন, কৌতূহলাক্রান্ত রমণীগণ তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য ছুটাছুটী করিতে লাগিল, কবি বলেন, তখন "কাহারও নূপুর হাথে।" বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগের নয়ন হইতে তখনও অঞ্জনি বিদায় গ্রহণ করে নাই।

'ধায় কোন শশিমুখী, অঞ্জনিয়া এক আঁখি।'

কবিকঙ্কণের অলঙ্কারের তালিকা বিশেষ দীর্ঘ নহে দেখিয়া আধুনিক সুন্দরীগণের বিমর্ষ হইবার কারণ নাই। দামুন্যার দরিদ্র কবি হয় ত এইরূপ অলঙ্কারশাস্ত্রের চর্চ্চা করিবার অধিক অবসর পান নাই। খুল্লনাকে ছাগল চরাইতে বাধ্য করিবার পূর্ব্বে যখন খুল্লনা ও লহনাতে ঘোর সংগ্রাম, তখন লহনা অবশ্যই খুল্লনাকে অলঙ্কারগুলির ভার হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই উপলক্ষে সম্ভবতঃ কোন প্রক্ষেপকারী কবির লেখনীর অনুগ্রহে আমরা যে অলঙ্কারের তালিকাটী পাইয়াছি, বর্ত্তমান যুগের গৃহলক্ষ্মীগণের কৌতূহল নিবারণার্থ তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

"বলে নিল শিরোমণি কর্ণের কনক।
ললাটিকা সিঁতী নিল গলার পদক॥
নাকের বেসর নিল পায়ের পাশুলি।
অঙ্গদ কঙ্কণ নিল দিয়া গালাগালি॥
খুঞা পরাইয়া পাটসাড়ী কৈল দুর।
বলেতে কাড়িয়া নিল মণি কর্ণপুর॥
লইল কাড়িয়া শঙ্খ হেমময় কড়ি।
শতেশ্বরীহার নিল কলধৌত চুড়ি॥
আভরণ লয্যা কৈল শুধু দুই হাথ।
বাম হাতে লোহা মাত্র রাখিল আয়াত॥"

পদক, বেসর, পাশুলি প্রভৃতির নামে সুন্দরীগণের যেন হুঙ্কার না হয়; এমন এক দিন আসিবে, যখন আপনাদিগের বহুযত্নের রত্নালঙ্কার গুলির নামেও আপনাদের পরবর্ত্তী সীমন্তিনীগণ হুঙ্কার করিতে উদ্যত হইবেন। এই পদক, পাশুলির দিনেও বণিক নন্দিনী লহনা পাটসাড়ী এবং চুড়ী গড়াইবার জন্য 'পাঁচপল' সোণা পাইয়া স্বামীকে পত্ন্যন্তর গ্রহণের অনুমতি দিয়াছিলেন বলিয়া কবি লিখিয়াছেন। এখনকার কবির তুলিকায় বঙ্গের সীমন্তিনীগণের চরিত্র ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইবার দাবী আছে বলিয়া আমরা মনে করি।

কবিকঙ্কণের কাব্যে গৃহস্থের স্ত্রীলোকগণ অবরোধ প্রথা বর্জ্জিত না হইলেও মুক্ত বায়ু সেবনে এককালে বঞ্চিত নহেন। লহনা খুল্লনাকে ছাগ-রক্ষণে নিযুক্ত করিয়া বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পাঠশালা হইতে পুত্রকে প্রত্যাগত না দেখিয়া

খুল্লনা যে দ্বারে দ্বারে পুত্রের অন্বেষণে ঘুরিতে লাগিলেন, তাহা নিশ্চয়ই কবিকঙ্কণের সময়ে অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ধনপতি যখন বররূপে লক্ষপতির গৃহে সমাগত অথবা যখন তিনি পুত্রের সহিত সিংহল হইতে প্রত্যাগত, তখন কবি যে স্ত্রীলোকগণের উৎকণ্ঠা ও সমাগমের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে স্বাধীনতারই পরিচায়ক। তবে মুসলমান রাজত্বের এই পূর্ণ বিকাশের সময়ে অবরোধ প্রথাও যে কতকটা বল সঞ্চয় করিয়াছে, তাহা কবির লেখনী হইতে বুঝিতে পারা যায়। তাই আমরা স্ত্রীলোকের দ্রুত পাদচালনার মধ্যে—

"অবরোধে কোন নারী, বাহির হইতে নারি,
গবাক্ষে করয়ে সচকিত।"

এরূপ বর্ণনারও সমাবেশ দেখিতে পাই।

কবিকঙ্কণের যুগে যেমন একদিকে পৌরাণিক দেবতার আধিপত্য, তেমনি অপর দিকে স্ত্রীলোকের কুসংস্কার ও তন্ত্রমন্ত্রের বিজাতীয় প্রাদুর্ভাব। কবির অনুগ্রহে আমরা গ্রন্থের অনেক স্থলেই স্ত্রীলোকগণের বশীকরণ-ঔষধ সংগ্রহের পরিচয় পাইয়াছি। খুল্লনার বিবাহোপলক্ষে তাঁহার মাতা তাঁহার মঙ্গল কামনায় যে বশীকরণের ঔষধ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, কবিকঙ্কণ তাহার সবিস্তার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মার্জ্জিতরুচি নবীনাগণের এবং তাঁহাদের অলক্তক-রঞ্জিত চরণের সেবাপ্রয়াসী বিনা ঔষধে বশীভূত নবীনগণের কৌতূহল নিবারণার্থ আমরা সেই স্থানটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"ঔষধ করিয়া রম্ভা ফিরে বাড়ী বাড়ী।
হোছট করিয়া পরে বার হাথ সাড়ী॥
কাটা মহিষের আনে নাসিকার দড়ি।
দুর্গার প্রদীপ খুঁজি রাখ্যাছিল চেড়ী॥
সাধুর কপালে যবে দিব পুনর্ব্বসু।
খুল্লনার হবে সাধু নাকবিন্ধা পশু॥
আনিল পাকড়ি ডাল হাই আমলাতি।
আকুল কুন্তল করি আনে অর্দ্ধরাতি॥
সাপের আঁটুলি আনে খুজি বাস্তাঘরে।
রোহিত মৎস্যের পিত্ত মঙ্গল বাসরে॥
কাপাসের বাড়ী হৈতে আনিল গোমুণ্ড।
দাণ্ডাইয়া সাধু তায় রবে দুই দণ্ড॥
খুল্লনা করিবে যদি সাধুর অপমান।
মৌনে রহিবে সাধু গোমুণ্ড সমান॥
বিমলা ব্রাহ্মণী হয় রম্ভাবতীর সই।
আমা সন্ধায় করিয়া আনিল সাপের দই॥"

যখন লহনা খুল্লনাকে নির্য্যাতন করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত, তখন তাঁহার প্রিয়সখী ব্রাহ্মণকন্যা লীলাবতী ঔষধের যে দীর্ঘ ব্যবস্থাপত্র দিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ—

"পত্রিকার কলাগাছ রোপিবে অঙ্গনে।
ঘৃতের প্রদীপ তায় দিবে প্রতিদিনে॥
নিরামিষ্য অন্ন খাবে তার পত্র পাড়ি।
সাধু হবে কিঙ্কর খুল্লনা হবে চেড়ী॥
শ্মশানের ক্ষীরা আর কবর বিছাতি।
বসন ত্যজিয়া আনিবে শেষ রাতি॥
ইহা বাটি দিবে সাধু খুল্লনা বসনে।
যেন খুল্লনা পড়ে সাধুর বিষনয়নে॥
চুণ পান খয়েরে করিহ তার ক্ষার।
কাল গরুর গাঁজ আন্য ঔষধের সার॥
দুর্গার মুখের আনিহ হরিতাল।
উপরাগ সময়ে আনিবে বেড়াজাল॥
দুই বস্তু কপালে ধরিহ সাবধানে।
সোহাগ বাড়িবে তোর দুর্গার সমানে॥
আনিবে আঠুলি কীট ফণিফণা হৈতে।
তাবিজ গড়াইয়া রাখিবে বাম হাতে॥
বসুদেব-সুতা দেবী কৃষ্ণের ভগিনী।
দ্রৌপদীর হইল যবে প্রবল সতিনী॥

ইহা ধরি দ্রৌপদী বশ কৈল নাথ।
পতিছাড়ি গেল ভদ্রা যথা জগন্নাথ॥
যতনে আনিবে জোড়া অশ্বথের দল।
দুর্গার প্রদীপ-তৈলে পাড়িবে কাজল॥
লোচনে অঞ্জন দিয়া চাহিবে একবার।
সাধুকে করিয়া দিব যেন কণ্ঠহার॥
গাড়রের গালের গুয়া বকুলের পাত।
পিরীতি করিয়া দিব তোর প্রাণনাথ॥
একছত্রি গাছ আন হাই আমলাতি।
শনি মঙ্গলবারে জাগাইবে নিশারাতি॥
কাভরের কামিঙ্কে মুখে বাটিহ প্রভাতে।
ললাটে তিলক দিলে প্রীত নানা মতে॥
ত্রিশূল্যার পত্রেতে পাড়িয়া আন কালি।
কালিয়া বিড়াল আনি দ্বারে দিহ বলি॥
যতন করিয়া আন গুগুকের তেলে।
ঘৃতের প্রদীপ জ্বালি ভুঞ্জ কুতুহলে॥
শূকর শকুনির হাড় আনিহ যতনে।
আইবড় চুলের পানি আঁইষ হাড়ির লোণে॥
ভুজঙ্গের ছাল আর নকুলের মুণ্ড।
কেশরী স্মরণ ক'রে আন গজমুণ্ড॥
পত্রিকা ভাসায়্যা আন্য হরিদ্রার মূল।
যতনে আনিবে শ্মশানের তিলফুল॥
ইহা করি সত্যভামা বশ কৈল নাথ।
যার প্রেমে গোবিন্দ আনিল পারিজাত॥
লহনা ঔষধ করে লীলার সংহতি।
সতীনীরে বঞ্চিয়া ভুঞ্জিবে নিজপতি॥
ছিনাজোক আর শ্বেতকাকের শোণিত।
কালিয়া কুকুর মারি আন তার পিত্ত॥
কচ্ছপের নখ আন কুম্ভীরের দাঁত।
কোঠরের পেঁচা আন গোধিকার আঁত॥
বাছুড়ের পাখা আন শজারুর কাঁটা।
তেমাথার পোড়ায়ে ললাটে লিহ ফোঁটা॥
শঙ্খের মুখুটী জেঠী মূষিকের মুণ্ড।
জোকা গায়ড়ের শিং চাতকের তুণ্ড॥
দিগম্বরী হইয়া কাঙরি মুখে বাটে।
অগ্নিকিতে পায় স্বামী শয়নের খাটে॥
মালীর মালঞ্চে ফুল আনিবে গুলাল।
শিরীষ কুসুম কুন্দ পদ্মের মৃণাল॥
পঞ্চফুল সমতুল করিয়া আধান।
মন্ত্র পড়ি স্বামারে হানিবে পঞ্চবাণ॥
পঞ্চপতি এক নারী দ্রুপদনন্দিনী।
ইহাতে বঞ্চিত কৈল সকল সতীনী॥
স্বামীর সম্ভোগ চান্দ রাখিবে যতনে।
বাঘতেল সনে রামা মাখিবে বদনে॥"

উদ্ধৃতাংশটী বড় হইল, কিন্তু পাঠকগণের মধ্যে যদি কাহারও ঔষধের ভয় থাকে, তালিকাটী পড়িয়া সাবধান হইতে পারিবেন। যখন ধনপতি গৌড় হইতে প্রত্যাগত ও রাজা কর্ত্তৃক পুরস্কৃত, তখন লহনা নবযৌবনা খুল্লনার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আপনার অক্ষমতা বুঝিতে পারিয়া অগত্যা ঔষধের জন্য দুর্ব্বলা দাসীর শরণাপন্ন হইলেন—

"আমার লাগুক কড়ি তোমার হকু যশ।
ঔষধ করিয়া মোর স্বামী কর বশ॥
লহনার চরণে প্রণাম করে চেড়ী।
মাণিক ভাণ্ডারে আনে ঔষধের পেড়ী॥
অবধানে আলুয়ায় দৃঢ়-বন্ধন দড়ি।
লহনার হাথে দিল ঔষধ সাঁপুড়ি॥"

বশীকরণ বিদ্যা অভ্যাস করিবার কারণও যথেষ্ট ছিল। তখন বল্লালীর পূর্ণপ্রভাব; ঔষধ না শিখিলে বহুবিবাহের মধ্যে গুণবতীর মান থাকে কোথায়? লীলাবতী ফুলিয়ার মুখটীর কন্যা বন্দ্যঘটী বংশে পড়িয়াছেন, ছয় সতীন লইয়া ঘর করেন, তবুও

"ঔষধের গুণে, স্বামী বোল শুনে,
যেন পিঞ্জরের শুয়া।
নিদ্রা গেলে আমি, চিয়াইয়া স্বামী,
মুখে তুলে দেই গুয়া॥"

ঔষধের বশে, প্রকার বিশেষে,
স্বামী ধূলা ঝাড়ে মুখে।
গেলে পিতৃবাস, করে উপবাস,
যাবত মোরে না দেখে॥"

এখনও তন্ত্র-মন্ত্র-ঔষধাদিতে প্রাপ্তযৌবনা অনূঢ়া কুলীন কন্যার সমান কে? কবি কৌলীন্যমর্য্যাদার অপব্যবহার দেখিয়া ব্যঙ্গোক্তি করিতে ছাড়েন নাই; বণিজ্‌পুত্র শ্রীমন্ত যখন ব্রাহ্মণগুরুর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত, তখন তাহার মুখ হইতে এই তেজো-গর্ভ বাক্য বাহির করিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণের মত নহি বল্লালসেন্যা।"

চণ্ডীকাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তখনও বাঁড়রি ওঝা প্রভৃতি অমার্জ্জিত উপাধিতে কুলীন ব্রাহ্মণগণ ভূষিত।

বিবাহের পদ্ধতি, স্ত্রী-আচার প্রভৃতির কবি যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ষোড়শ শতাব্দীর একখানি সামাজিক চিত্রপট যেন আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পুনর্বিবাহের উৎসব এখন পশ্চিম বাঙ্গালা হইতে এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু কবিকঙ্কণের সময় উহা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। খুল্লনার পুনর্বিবাহের সময়ে পোয়ালে জড়ান কাদা জলের সদ্ব্যবহার হইল,কুলসীমন্তিনীগণ 'রন্ধন ভোজন ছাড়িয়া', লজ্জাদেবীকে বিদায় দিয়া জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন, লহনাকে ধরিয়া আনিয়া কাদাজল দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইল, লীলাবতী পলাইয়া নিস্তার পাইলেন না, ধৃত হইয়া যুবতীগণের কৌতুকের সামগ্রী হইলেন; মদন-মঙ্গল গীত চলিতে লাগিল, লজ্জাদেবী তাড়িত হইয়া অগত্যা পুরুষের স্কন্ধে আরোহণ করিলেন। কবি লিখিয়াছেন, 'লাজ পায়্যা পুরুষ পলায়।' আর সেই দুর্ব্বলা দাসী?

"সাত পাঁচ সখী বেঢ়ি, ধরিয়া দুর্ব্বলা চেড়ী,
বিবেসন করিয়া নাচায়।"

এই কৌতুক এতই সংক্রামক যে স্বয়ং "নগেন্দ্র নন্দিনী" সহচরীগণের সহিত মিলিত হইয়া "বণিক্‌ বধূর বেশে" যোগদান করি-লেন এবং "গায়ে পানী" ঢালিতে লাগিলেন। পশ্চিম বাঙ্গালার পাঠকের যদি একবার উঁকি মারিয়া এই সুন্দরীগণের বীভৎস আনন্দের অংশভাগী হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে পূর্ব্ব বাঙ্গালার কোন পল্লীগ্রামে এই উৎসবের সময় যেন একবার পদার্পণ করিবেন।

আমরা প্রাচীন বঙ্গললনাগণের সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিলাম। পুরুষদিগেরও বেশভূষা ও সামাজিক পদ্ধতির পরিচয় স্থানে স্থানে মেঘাবৃত গগনে চপলার ক্ষণবিকাশের ন্যায় কবিকঙ্কণের কাব্য মধ্যে ফুটিয়া উঠি-য়াছে। বাঙ্গালী তখনও উষ্ণীষ পরিত্যাগ করে নাই। শ্রীমন্ত যখন সিংহলে কোটা-লের নিকট বস্ত্রান্তরপ্রার্থী, তখন তাঁহার নিজের পাগড়ীই পরিধেয় রূপে প্রদত্ত হইল। যখন সিংহলেশ্বর কারাগার হইতে বন্দী-দিগকে মুক্তি প্রদান করিলেন, তখন বন্দীগণ কেবল "পথের সম্বল" চাউল, 'কাহনেক কড়ি' ও 'ধূতি একখান' মাত্র পাইল না, 'মস্তকের পাগ'ও পাইল। পাগের বিশেষ-রূপ চলন না থাকিলে এই কাঙ্গালী বিদায়ের মধ্যে তাহার ব্যবস্থা থাকিবে কেন? বলা বাহুল্য, আমাদের কবি সিংহল দেশে গিয়াও বাঙ্গালীরই বর্ণনা করিয়াছেন। এখনও যেমন উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যে অনেক পুরুষ-জাতীয় আর্য্যসন্তান মস্তকে কবরী বিন্যাস করিয়া আনন্দ অনুভব করেন, আমাদের বঙ্গ-ভূমিতেও পূর্ব্বে সেইরূপ ছিল। কাশীরাম তাঁহার মহাভারতে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়িত

রাজন্যবর্গের অসংযত দীর্ঘ কুন্তলের পরিচয় দিয়াছেন; আমাদের কাব্যের ধনপতিও মঙ্গলচণ্ডীর পূজার বৃত্তান্ত লহনার মুখে শুনিয়া ক্রোধে "না করয়ে কুন্তল বন্ধন।"

অলঙ্কারগুলি তখনও সুন্দরীগণের এক-চেটিয়া হয় নাই—

"অঙ্গদ অঙ্গুরী হার ভূষণ চন্দন।
দিয়া লক্ষপতি কৈল বরের বরণ।"

বণিক সম্প্রদায় তখনও সমাজে অনাদৃত নহে। আমরা ঠাকুরমার উপকথায় রাজার পুত্র ও মন্ত্রীর পুত্রের সহিত সদাগর-পুত্রের বন্ধুত্বের বিবরণ অনেক শুনিয়াছি। চণ্ডী কাব্যে ধনপতি বিক্রমকেশরী রাজার আজ্ঞা-বহ হইলেও ক্রীড়া-সহচর। যখন ধনপতি পিঞ্জর নির্ম্মাণার্থ গৌড়ে অবস্থিত, তখন সেখানেও তিনি রাজার অক্ষক্রীড়ার সহচর হইলেন, বিদায় লইয়া আসিবার সময়ে "দুই জনে কোলাকুলি পরম সাদরে।" ধনপতি ও শ্রীমন্তের সিংহল-গমন বর্ণনায় কবি বণিক সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও প্রাধান্যের উজ্জ্বল ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন—ধনপতির গৃহে নিমন্ত্রণের সময়েও তাহার সুন্দর আভাষ দিয়াছেন। গন্ধবণিক বংশীয় শ্রীমন্তের সহিত কবি 'ক্ষেত্রি' শালবান রাজার কন্যার বিবাহ পর্য্যন্ত দিয়া ফেলিয়াছেন। অবশ্য ইহা দেবীর আদেশ, কিন্তু শ্রীমন্ত চণ্ডাল কিম্বা ডোম হইলে হয় ত এ আদেশ খাটিত না। বণিক সম্প্রদায়ে গন্ধেশ্বরী দেবীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল, এখনও যে একেবারে গিয়াছে, তাহা বলা যায় না। ধনপতির গৃহে বণিক সভায় গৃহগমনোদ্যত জ্ঞাতিগণ রাজার দোহাই শুনিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইল, কিন্তু গন্ধেশ্বরীর দোহাই উপেক্ষা করিতে পারিল না।

পক্ষান্তরে 'কাণে কলম হাথে দোত' কায়স্থসুতের কবি যে বর্ণনা করিয়াছেন এবং কায়স্থ ভাঁড়ুদত্তের যে চিত্র পাঠকের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, অনেক কায়স্থ হয় ত তাহাতে তৃপ্তি অনুভব করিবেন না। অবশ্য কবি ভাঁড়ুদত্তকে আদর্শ কায়স্থ স্বরূপ পাঠ-কের নিকট উপস্থিত করেন নাই। ভাঁড়ু কায়স্থকুল-কলঙ্ক অথবা সে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক কোন নিম্নতর জাতি। কালকেতু তাহার মস্তকমুণ্ডনের পূর্ব্বে ভাঁড়ুকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন—

"হয়্যা তুই রাজপুত, বলাসি কায়স্থ সুত,
নীচ হয়্যা উচ্চ অভিলাষ।"

এই রাজপুত রাজপুতানার ক্ষত্রিয় রাজ-পুত নহে, পশ্চিম বাঙ্গালায় রাজপুত বলিয়া পরিচিত এক নীচ জাতি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কবি কালকেতুর নগরে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরে কায়স্থদিগের স্থান সমাবেশ করিয়াছেন, ইহা উল্লেখযোগ্য এবং কালকেতুর বড়লোক হইয়া পণ্যদ্রব্য কিনি-বার সময় কায়স্থ আসিয়া "মহাবীরে নত কৈল মাথা" এরূপও লিখিয়াছেন। অবশ্য কায়স্থদিগের কার্য্য ছিল কাগজপত্র লেখা। মহাবীরের দ্রব্য ক্রয়ের সময়ে এ কার্য্যটী কায়স্থ দ্বারাই সম্পাদিত হইল।

মুসলমান আমলে জমীদারগণ অনে-কাংশে স্বাধীন ছিলেন—তাঁহাদের সৈন্য ছিল, দুর্গ ছিল। কবিকঙ্কণের কলিঙ্গরাজ, কালকেতু বা সিংহলরাজ মুসলমানের অধীন না হইলেও তাঁহাদের সৈন্য-বর্ণনায় আমরা যেন এই অর্দ্ধস্বাধীন হিন্দু রাজন্যবর্গের সৈন্যেরই পরিচয় পাই। অবশ্য সৈন্যের পরিমাণ ও ঐশ্বর্য্য কবি কতকটা বাড়াইয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু যে বাস্তব পদার্থের

উপর তাঁহার কল্পনা খেলিয়াছে, তাহা ঐ প্রকার সৈন্য। নিরস্ত্র বাঙ্গালীর এখন এই সৈন্যবর্ণনা শুনিতে একটু কৌতুহল জন্মিতে পারে। আমরা সিংহলেশ্বরের যুদ্ধসজ্জার বর্ণনার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"বিষম তরল আগে আরোপিয়া কাটি।
বরুজ কামান হাথে শেলপাট জাঠি॥
যবনিয়া অশ্বোপর যবন আসোয়ার।
ঘোর রূপ যবন সব বলে মার মার॥
পার্ব্বতীয়া অশ্ব সব সোণার বিম্বকী।
কণ্ঠে ঝিলিমিলি হার করে ধিকি ধিকি॥
ঢালী পাইক সাজে কত হাথে খাঁড়া ঢাল।
ডানি বামে অস্ত্র সাজে বিক্রমে বিশাল॥
ধানুকী পাইক সাজে হাথে ধনুঃশর।
কটিদেশে তরবার চলিল সত্বর॥
চৌকনিয়া পাইক চৌকন হাথে করে।
হাড়িয়া চামর বান্ধে বাঁশের উপরে॥
বিচিত্র পামরী গায় পারিজাত মালা।
বৈরিবেশে ধায় পাইক জানে যুদ্ধকলা॥
ভীম, অর্জ্জুন, কর্ণ কোটাল দুর্ব্বার।
ভিড়নে চলিল চঙ্গ বাইশ হাজার॥
রাজার বেটা যুবরাজ ঠাটে আগুয়ান।
শগড়ে তুলিয়া নিল বিচিত্র কামান॥
বারুই বোরজে যেন ঘন দেয় কাটি।
খোজা মিঞা রণে চলে হাথে রাঙ্গা লাঠি॥
লহ লহ করে যত হস্তীকের শুণ্ড।
পিপীলিকা সারি যেন পাইকের মুণ্ড॥
বরজেরা বোরজে নিছিয়া ফেলে পাণ।
পাথরিয়া ঘোড়া সাজে কাহণে কাহণ॥
ডানি দিকে সাজিল কোটাল ভীমমল্ল।
রাজার জামাতা সাজে নামে বীরশল্ল॥
সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
আগুদলে সাজে যত পাখড়িয়া ঘোড়া॥
তবক বেলক কাছে কামান কৃপাণ।
পৃষ্ঠদেশে পূর্ণিত তুণেতে যত বাণ॥
রণসিংহ রণভীম ধায় রণঝাটা।
তিন ভাই তীর বিন্ধে দিয়া চুণের ফোঁটা॥"

কামানের উল্লেখ থাকায় পাঠকের মনে হইতে পারে, ইহা কিছু বড় রকমের যুদ্ধ-সজ্জা। কলিঙ্গরাজের যুদ্ধ-যাত্রার মধ্যে পাওয়া যায়—

শত শত মত্তহাথী, লৈয়া আইসে সেনাপতি,
শুণ্ডে বান্ধা লোহার মুদ্গরে।
মাহুত হাথীর পীঠে, শেল সাবল জাঠে,
গগন পূরয়ে আড়ম্বরে॥
চারি চারি মহারয়, রথেতে জুড়িয়া হয়,
মহারথী যায় সারি সারি।
ভিন্দিপাল খরশান, তবক বেলক বাণ,
ভুষণ্ডী ডাঙ্গশ গদাধারী॥
নব লক্ষ ফিরে কাল, সাজিল মদনপাল,
ঘন ঘন ফেলে খাণ্ডা লোফে।
দুঃসহ সেনার ভারে, ক্ষিতি টলমল করে,
ফণিপতি আদি নাগ কাঁপে॥
আশীগণ্ডা বাজে ঢোল, তেরকাহন সাজে কোল,
কাঁড় ধরে তিন তিন কোটী।
পরিধান বীরধড়ি, মাথায় জালের দড়ি,
অঙ্গে মাথয়ে রাঙ্গামাটী॥
বাজন নূপুর পায়, বীরঘটা পাইক ধায়,
রায়বাঁশ ধরে খরশাণ।
সোণার টোপর শিরে, ঘন সিংহনাদ পূরে,
বাঁশে দোলে চামর নিশান॥

ইহাতেও কিছু পরে কামানের উল্লেখ আছে।

এই বর্ণনা হইতে কবিসুলভ অতিশয়োক্তি বাদ দিলে কিরূপ সৈন্য লইয়া মুসলমান আমলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজচক্রবর্ত্তীগণ পরস্পরের সম্মুখীন হইতেন, আমরা তাহার আভাষ পাই।

"রাজপুরোহিত যায় বিষম করাল।
হয় বলে আগুদলে রাঘব ঘোষাল॥"

এই বর্ণনা হইতে দেখা যায়, যুদ্ধকার্য্যে আবশ্যক হইলে 'রাজপুরোহিত' এবং "রাঘব ঘোষাল"ও যোগদান করিতেন।

হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পরের প্রতি প্রীতি এবং ধর্ম্মবিদ্বেষের অভাব আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই। সিংহলরাজের সৈন্যবর্ণনায় যবনযোদ্ধার উল্লেখ পাঠক দেখিয়াছ—কালকেতুর নগরনির্ম্মাণে মুসলমানদিগের জন্য সমুচিত ব্যবস্থা এই প্রীতির একটী প্রধান নিদর্শন। দেবীর অনুগৃহীত কালকেতুর জন্য যখন স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা গুজরাট নগর নির্ম্মাণ করিলেন, তখন শুধু হিন্দুর জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহাতেই তাঁহার তৃপ্তি জন্মিল না।

"পশ্চিম দিকেতে সেহ, তুলিলা নমাজ গৃহ,
দালান মহজিদ নানা ছান্দে।"

মহাবীরের আশ্রয়ে থাকিয়া মুসলমানগণ আপন অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে লাগিল এবং জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য আপন আপন বৃত্তি অনুসরণ করিতে লাগিল।

"গোমাংস বেচিয়া নাম বোলায় কসাই।"

হিন্দু রাজার নগরে ইহা পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল। কবি কসাইকে যমরাজের ভয় দেখাইয়াছেন, কিন্তু ব্যাধ রাজের ভয় দেখান নাই। কয়েক শতাব্দীর একত্র বাস যে হিন্দু ও মুসলমানকে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভুলিয়া যাইতে শিক্ষা দিয়াছিল, ইহা তাহার একটী বিশিষ্ট প্রমাণ। কালকেতুর সহিত কলিঙ্গরাজের সংগ্রাম বাধিয়া গেলে—

"পশ্চিম দুয়ারে রহে সৈদ উমর গাজী।
যাহার ভিড়নে রহে ষোল শত তাজী॥
উত্তর দুয়ারে রহে বলাগন খান।
রণে ভঙ্গ দেয় সেনা দেখি তার বাণ॥"

এইরূপে হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়া নগর রক্ষা করিতে লাগিল। ধনপতির কথায় যখন সিংহলরাজ কালীদহে কমলেকামিনী দর্শন করিতে চলিলেন, তখন তিনি কেবল মাত্র হিন্দুসঙ্গী লইয়া যাত্রা করেন নাই—'খেরোসানী মোগল পাঠান'ও তাঁহার সঙ্গী হইয়া চলিল।

আনুষঙ্গিক রূপে কবিকঙ্কণের কাব্যে দেশের রীতিনীতির যে উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি—

অক্ষক্রীড়া—চণ্ডীকাব্য পড়িয়া বোধহয় উচ্চ নীচ সকল জাতির মধ্যেই যেন বিলাসপ্রিয় বাঙ্গালীর এই প্রিয় ক্রীড়া সংক্রামক রূপে প্রবেশ করিয়াছিল। যখন কলিঙ্গরাজ গুজরাট আক্রমণ করিলেন, চর 'মহাবীরকে' কলিঙ্গরাজের আগমন বার্ত্তা জানাইতে আসিল, তখন এই দারিদ্র্যের ক্রোড়ে লালিত দেবীর অনুগৃহীত মহাবীর কি করিতেছিলেন ?

"সভাতে বসিয়া, দশ দশ বলিয়া,
মহাবীর পাশা খেলে।"

কবি আপন যুগে সম্পন্ন বাঙ্গালীর যে আদর্শ চারিদিকে দেখিয়াছিলেন, তাহারই আলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছেন। ধনপতি গৌড় নগরে যখন প্রবাসী, তখন গৌড়রাজ তাঁহার সহিত পাশা খেলিয়া সময় কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ধনপতি গৌড় হইতে দেশে ফিরিয়া আসিলে রাজা বিক্রমকেশরী তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—

'দূরে গেল পাশার কৌতুক।'

আবার দেখিতে পাই—

"একদিন পাটশালে, সখা সঙ্গে পাশা খেলে,
হাস্য পরিহাসে ধনপতি।" ইত্যাদি

এইত গেল পুরুষের খেলা। ধনীর গৃহের কুলবধূগণও এই সংক্রামকতা হইতে নিস্তার পান নাই। যখন খুল্লনা জাল পত্র দেখিয়া তাহা ধনপতির পত্র বলিয়া বিশ্বাস করিলেন না এবং বলিলেন যে তাঁহার স্বামীর পত্র হইলে অবশ্যই কোন লোক ইহা সঙ্গে লইয়া আসিত,তখন লহনা তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, যে কয়েক জন লোক আসিয়াছিল, তাহারা সুবর্ণ লইয়া তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং খুল্লনার তাহা লক্ষ্য না করিবার কারণ স্বরূপ বলিলেন—

"তখন আছিলে পাশার খেলে।"

অবশ্য খুল্লনা স্বকার্য্য স্মরণ করিয়া ইহা বিশ্বাস করিবেন,লহনা এরূপ মনে না করিলে খুল্লনাকে এমন কথা কহেন নাই। ধনপতি গৃহে ফিরিয়া আসিলে লহনা তাহার নিকট খুল্লনার কথা বলিতেছেন—

"চারি পাঁচ সখী মিলে,
রাত্রি দিবা পাশা খেলে।"

সিংহল হইতে যখন দেবী ক্ষেমঙ্করী রূপ ধরিয়া শ্রীমন্তের টোপর মুখে করিয়া উজ্জয়িনীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন—

"পাশা খেলে সহচরী, লইয়া খুল্লনা নারী।"

ধনপতি বিলাসগৃহে খুল্লনার সহিত পাশা খেলাই পরম প্রীতিকর মনে করিলেন। কোন কোন পুস্তকে হরগৌরীর পাশক্রীড়ার বর্ণনাও আছে। ইহার জন্য হয় ত আমাদের কবি দায়ী নহেন, কিন্তু এই প্রক্ষেপকারীর হস্ত চিহ্নেও কবিকঙ্কণের যুগের না হউক, তাহার কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী যুগের বিকৃত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

বলা বাহুল্য, তখন খাজনা আদায়ের পদ্ধতি কিছু অন্যরূপ ছিল। জমীদারগণ নবাবগণের প্রাপ্য কর দিতে ক্রটী করিলে কারাগারের সাক্ষাৎকার লাভ করিতেন। প্রজা জমীদারকে খাজনা দিতে না পারিলে কিরূপ ব্যবহার আশা করিত, পাঠক দেখ।

"বুলান মণ্ডল বলে শুন মোর ভাই।
হাজিল খেতের শস্য তাহে না ডরাই॥
মসীল করিবে রাজা দিয়া হাথে দড়ি।
প্রথম মাসেতে চাহি এক তেহাই কড়ি॥"

এই 'মসীল' যে তখনও একেবারে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। তবে ইংরাজের আইন বেসরকারী ভূম্যধিকারীর স্বহস্তে মসীল করার উপর খড়্গাহস্ত।

দাসদাসী ক্রয়বিক্রয় মুসলমান রাজত্বের পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত আইনের অনুমোদন ক্রমে প্রচলিত ছিল। কালকেতু যখন দেবীর অনুগ্রহে ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা পাত্র হইলেন, তখন কেবল 'খাট, পালঙ্ক' নহে, 'দাসীও' কিনিয়া ফেলিলেন।

আজ কাল যাঁহারা মাঞ্চেষ্টারকে অন্নচ্যুত করিবার চেষ্টায় আছেন,তাঁহারা শুনিয়া সুখী হইবেন, যোড়শ শতাব্দীতে বর্দ্ধমান মেদিনীপুর অঞ্চলে কার্পাসের চাষ অবিদিত ছিলনা। যখন দেবীর চেষ্টায় নদনদীগণের প্রতাপে কলিঙ্গ রাজ্য প্লাবিত, তখন—

"দেশমুখ বলে ভাই শুন মোর বোল।
স্রোতে ভাসি গেল মোর কাপাসের ডোল।"

এই আবাদ বিস্তৃতরূপে প্রচলিত না থাকিলে, দেবীর কৃপায় প্রজার 'কাপাসের ডোল' এর কিরূপ সদ্গতি হইল, তাহা বর্ণনা করিতে কবি এত উৎসুক হইতেন না।

ইংরাজের আইনের প্রসাদে হিন্দুপত্নীর সহমরণ বা অনুমরণ অতীতের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কবিকঙ্কণের সময়ে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। মালাধরের দুই পত্নীর

অনুমরণ বর্ণনা করিতে গিয়া কবি লিখিয়াছেন—

"দুই জায়া তার সঙ্গে, অনুমৃতা হৈলা রঙ্গে,
ত্যজিয়া আপন নিজ পুরী।
শোকে উনমত বেশ, উদ্দাম করিয়া কেশ,
আম্র পল্লব করে ধরি॥
অবশেষে নৃত্য গায়, অগৌর চন্দন কায়,
দুই সতী করে চারু বেশ।
স্বর্গ-গঙ্গার নীরে, স্নান করিয়া তীরে,
অনলে করিল পরবেশ॥"

অলঙ্কার গ্রহণ বা বর্জ্জনে কিছু আসে যায় না, কিন্তু আম্রপল্লবটা সহমরণাভিলাষিণী সতীর অবশ্য গ্রহণীয় ছিল। নীলাম্বর-পত্নী ছায়া সহমরণ-কালে—

"আলাল্য কুন্তল-ভার, ত্যজে যত অলঙ্কার,"
কিন্তু "সঘনে নাড়য়ে আম্রডাল।"

আর একটী জঘন্য সামাজিক ব্যবহারের উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না—পুনর্ব্বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রীসহবাস। এটী অবশ্য বাল্য বিবাহের আনুষঙ্গিক কুফল। ধনপতির গৌড় হইতে গৃহে প্রত্যাগমনের পর খুল্লনার সহিত এই অসময়ে রসরঙ্গে কবি যে পঞ্চম রাগে সঙ্গীত গাহিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে আমরা তাহার পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই। বলা বাহুল্য, এই সকল বর্ণনায় দেশের সামাজিক চিত্রই প্রতিফলিত হইয়াছে।

কবিকঙ্কণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কাব্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের সময়োপযোগী সদ্ব্যবহারের বহুল নিদর্শন লক্ষিত হয়। পরবর্ত্তী সময়ে যে অপূর্ব্ব যাদুমন্ত্রদ্বারা ভারতচন্দ্র বীণায় ঝঙ্কার দিয়াছিলেন, কবিকঙ্কণই তাহার শিক্ষাগুরু। কোন স্থানে দেখিতে পাই—

"নয়নের কোণে, আছে কত গুণে,
অসুরনাশিনী ইষু।
কুটিল কুন্তলে, মালতীর মালে,
ভ্রময়ে ভ্রমর শিশু॥"

কোথাও দেখি—

"কালীকপালিনী কান্তি কপালকুণ্ডলা।
কালরাত্রি কুরঙ্গাক্ষী কত জান কলা॥"

আবার কোথাও দেখি

"কুল শীল রূপে বাঢ়া।
যেন সে শালের কোঁড়া॥"

কোথাও দেবীর স্তব পড়িবার সময়ে অভিধান খুঁজিয়া অর্থ স্থির করিতে গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হয়, আবার কোথাও গ্রাম্য শব্দের মর্ম্মগ্রহণ করিবার জন্য রাঢ়দেশে গিয়া বাগ্দী ও হাড়ির শরণাপন্ন হইবার প্রবৃত্তি জন্মে। কোথাও 'দড়ভাতার' আবার কোথাও 'মলয়জপঙ্ক' প্রভৃতি জয়দেবাদির আহৃত রত্নের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কবি পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়ের ভাণ্ডার হইতেই যথেচ্ছ শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও বিসদৃশ ভাবে বিভিন্ন জাতীয় শব্দ একত্র গাঁথিয়া পাঠকের কর্ণজ্বালা উৎপাদন করেন নাই। গ্রন্থের অনেকস্থলেই যেমন স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বের বিকাশ দৃষ্ট হয়, তেমনি আবার কবির পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে আনুষঙ্গিকরূপে অনেক পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থান হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, জ্যোতিষ-শাস্ত্রও কবির অপরিচিত ছিল না। ধনপতি ও শ্রীমন্তের সিংহল গমনের পূর্ব্বে, শ্রীমন্ত দেবীকে স্মরণ করিলে পদ্মাবতীর গণনা উপলক্ষে এবং আরও কোন কোন স্থানে, এই পাণ্ডিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। কবি-

কঙ্কণ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষার পুরাণ হইতেই উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। চণ্ডীকাব্যে শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান প্রক্ষিপ্ত কিন্তু রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার প্রসঙ্গ আছে, অথচ ব্রহ্মাস্ত্রে রাবণ বধের কথা দেখিতে পাওয়া যায়—মৃত্যু-বাণের উল্লেখ নাই।

মুকুন্দরাম স্বদেশের বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, ফলমূল, পশুপক্ষী প্রভৃতির সহিত বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। এরূপ পরিচয় না থাকিলে তিনি স্বভাবের বড় কবি হইতে পারিতেন না। দুঃখের বিষয়, তাঁহার ভৌগোলিক জ্ঞান অধিকদূর বিস্তৃত ছিল না, এইজন্য যে স্বভাবোক্তিতে কালিদাস এতদূর নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন, মুকুন্দরামের দেশ-বর্ণনায় তাহার পরিবর্ত্তে অনেক স্থানেই বীভৎস কল্পনা ও অতিশয়োক্তির সমাবেশ দেখিতে পাই। কালিদাসের মেঘদূতে অথবা রঘুবংশের একাদশ সর্গে যেরূপ ভৌগোলিক-চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে চিংড়িদহ, কাঁকড়াদহ প্রভৃতি কবিসুলভ-উর্ব্বর-মস্তিষ্ক-প্রসূত কতকগুলি দহের সহিত চণ্ডীকাব্যে পাঠকের পরিচয় হয়। তবে যে স্থান কবির বাসস্থানের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী, তাহার কতকটা স্বরূপ বর্ণনাও দেখিতে পাই। ধনপতির উজানী নগর হইতে গৌড়ে গমনের সময় এবং 'কোথাও রন্ধন কোথা চিড়া খণ্ড কলা'র উপর নির্ভর করিয়া সিংহল-প্রয়াণের সময় প্রথম ভাগে এইরূপ কতকগুলি পরিচিত স্থানের নাম আছে। তাহার মধ্যে 'ভাওসিংহের ঘাট' 'চণ্ডীগাছা' প্রভৃতি সাধারণ পাঠকের নিকট কৌতূহলোদ্দীপক না হইলেও সপ্তগ্রামের বর্ণনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম একটী সমৃদ্ধ বন্দর—বোধ হয়, বাঙ্গালার প্রধান বন্দর। 'কলিঙ্গ ত্রৈলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ বরেন্দ্র বন্দর বিন্ধ্য' প্রভৃতি বহুবিধ বহু স্থানের নাম করিয়া কবি বলিতেছেন—

"এসব সহরে যত সদাগর বৈসে।
তরণী সাজায়ে তারা বাণিজ্যেতে আইসে॥
সপ্তগ্রামের বণিক্ কোথাও না যায়।
ঘরে বসি থাকে সুখে নানা ধন পায়॥"

নবদ্বীপ, শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, উলা, হালিসহর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রামের নামও ধনপতি ও শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রার বিবরণের মধ্যে পাওয়া যায়। কলিকাতা তখনও অরণ্যের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করে নাই, কিন্তু চণ্ডীকাব্যে কালীপাড়া ও কালীঘাটের বিশেষ উল্লেখ এবং কলিকাতার নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। মুকুন্দরামের মতে সিংহল ও লঙ্কা বিভিন্ন। শ্রীমন্ত যখন সিংহলে পিতার জন্য ব্যাকুল, তখন দেবী তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে বলিলেন—

"একে একে দ্বীপ সাত, ভ্রমিয়া খুঁজিব তাত,
অবশেষে প্রবেশিব লঙ্কা।
বিচারিয়া নানা তন্ত্র, লইব রামের মন্ত্র,
নিশাচরে না করিব শঙ্কা॥"

মুকুন্দরামের লঙ্কা কোথায় এবং সিংহলইবা কোথা, তাহা নিরূপণ করা আমাদের সাধ্যাতীত। তবে সিংহলের অধিবাসী উজ্জয়িনীর ন্যায়—সেখানে বাগদী আছে, খামার আছে—আর লঙ্কার অধিবাসী রাক্ষস।

ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক জ্ঞান অথবা সমালোচনা শক্তির জন্য কবিকঙ্কণ বড় নহেন। তিনি স্বভাবের কবি, আপনার চারিপার্শ্বে যাহা দেখিয়াছেন, তাহা হইতে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। স্থানে স্থানে অসামঞ্জস্য বাদ দিলে

তিনি যে সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা প্রথম শ্রেণীর—বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের সুখদুঃখের অনেক চিত্রই তাঁহার লেখনীতে মনোহর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে তিনি অল্প কথায় যে সুন্দর ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সাধারণ কবির অসাধ্য। বিরহিনী খুল্লনা কোকিলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"আর যদি কাড় রা, মদনের মাথা খা,
বসন্তের শতেক দোহাই।"

সুশীলা সপত্নী দর্শনে অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া স্বামীকে বলিতেছেন—

"খলের বচন কিবা, যেমন কূর্ম্মের গ্রীবা,
প্রবেশয়ে ভিতর বাহিরে।
সুকৃতি জনের অন্ত, যেমনে কুঞ্জর-দন্ত,
বারি হৈলে না যায় অন্তরে॥"

সত্যের মহিমা অনেক কবিই গাহিয়াছেন। মুকুন্দরাম বলিয়াছেন—

"অবনী বলেন আমি সব ভার বহি।
যেই মিথ্যা বলে তার ভার নাহি সহি॥"

মুকুন্দরামের প্রধান অনুকারক ভারতচন্দ্র। আড়রারাজের সন্তোষের জন্য মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্য লিখিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগর রাজের সন্তোষের জন্য তাঁহার অনুসরণে অন্নদামঙ্গল লিখিয়া গিয়াছেন। ভাষা ও ভাব উভয়েরই অনুকরণ জাজ্জ্বল্যমান। চণ্ডীকাব্য ও অন্নদামঙ্গলের প্রথম ভাগ একই রকমের। দেবদেবীর বন্দনা সেকালে গ্রন্থকারদিগের মধ্যে প্রচলিত পদ্ধতি ছিল, সুতরাং ইহার জন্য ভারতচন্দ্র কোন নির্দ্দিষ্ট কবির অনুকরণ করিয়াছেন, এরূপ না বলিলেও হয়, অসঙ্গত হয় না, কিন্তু সেই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, দক্ষযজ্ঞ-নাশ, শিবের বিবাহ, হরপার্ব্বতীর কোন্দল, দেবীর নরলোকে পূজা খাওয়ার ইচ্ছা ও তজ্জন্য উচ্চতর লোকের অধিবাসীকে অভিশাপ দ্বারা মর্ত্ত্যলোকে প্রেরণ, উভয় কাব্যেই বর্ণিত হইয়াছে।

প্রতিভাশালী ব্যক্তিমাত্রই পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের সৃষ্টি হইতে উপকরণ-সংগ্রহে অধিকারী কিন্তু এই উপকরণ-সংগ্রহ যদি চৌর্য্যবৃত্তি স্বরূপ পাঠকের স্থূল দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা হইলে তাহাকে ততদূর কৌশল-সম্পন্ন বলা যায় না। ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবিও এই অভিযোগ হইতে সকল স্থানেই আপনাকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক কবির অনুকরণ করিয়াছেন, কিন্তু কবিকঙ্কণের অনুকরণ স্পষ্ট ধরা পড়িতেছে। ঈশ্বরী পাটনীর নিকট অন্নদার পরিচয় প্রদান স্থলে দ্ব্যর্থযুক্ত শব্দ বিন্যাসের জন্য ভারতচন্দ্র অনেক দিন হইতে পাদ্যঅর্ঘ্য পাইয়া আসিতেছেন। পাঠক নিম্নলিখিত দুইটী স্থল তুলনা করিয়া দেখ।

কবিকঙ্কণ

রামা গো, এতক্ষণে পরিচয় করি।
আমার করম দোষী, বসিগুপ্ত বারাণসী,
স্বামী মোর জনম ভিখারী॥
কি কব দুঃখের কথা, গঙ্গা নামে মোর সতা,
স্বামী যারে ধরয়ে মস্তকে।
বরঞ্চ গরল খায়, আমা পানে নাহি চায়,
ভবন ত্যজিলুঁ সেই পাকে॥

* * * * *
* * * * *

বিষকণ্ঠ মোর স্বামী, সহিতে না পারি আমি,
পঞ্চমুখে দেয় গালাগালি।"

ভারতচন্দ্র

"ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।"

"গঙ্গা নামে সত্য তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
"কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥"

পাঠক দেখিবে, ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণের ভাণ্ডার হইতে অপহৃত অলঙ্কারের উপর নিজের কারুকার্য্য খোদিত করিয়াছেন, তাহাকে ঘর্ষিয়া মার্জ্জিত করিয়াছেন, কিন্তু রূপান্তরিত করিতে পারেন নাই— কঙ্কণ হারে পরিণত হয় নাই।

ভারতচন্দ্রের গঙ্গা ও ব্যাসের কলহ কবিকঙ্কণের গঙ্গার সহিত ভগবতীর কলহেরই অনুকরণ। এখানে ভারতচন্দ্র অধিকতর মৌলিকতা প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মন্ত্র লইয়াছেন বৃদ্ধ মুকুন্দরামের নিকট। জহ্নুমুনিকৃতগণ্ডূষ পানের উল্লেখ উভয় কলহেই দৃষ্ট হয়।

কবিকঙ্কণ দুই স্থানে নারীগণ দ্বারা আপন আপন পতির নিন্দা করাইয়া লইয়াছেন। ইহার অনুকরণে বিদ্যাসুন্দরে নারীগণের পতি নিন্দা; এখানেও ভারতচন্দ্রের শিল্পত্বের পূর্ণ বিকাশ। স্থানে স্থানে অপহৃত ভাবগুলি স্পষ্টরূপে চেহারা বজায় রাখিয়াছে; যথা—

কবিকঙ্কণ

"আর যুবতী বলে সই আমার পতিকালা।
আনের সংসার সুখ মোরে বিষম জ্বালা।
ঠারে ঠোরে কহি কথা দিনে পতির সনে।
রাত্রি হৈলে নিদ্রা যাই গরুড় শয়নে॥"

ভারতচন্দ্র

"এক রামা বলে সই শুন মোর দুখ।
আমার মিলিল পতি কালা কালামুখ॥
সাধ করি শিখিলাম কাব্য রস যত।
কালার কপালে পড়ি সব হৈল হত॥
বুঝাই চোরের মত চুপ করি ঠারে।
আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল প্রমাদ আঁধারে॥
নৈলে নয় তেঁই করি কষ্টেতে শয়ন।
রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন॥"

অন্ধ ও বৃদ্ধ পতির নিন্দা উভয় কাব্যই আছে। বলা বাহুল্য, ভারতচন্দ্র অপহরণ সূত্রে প্রাপ্ত এই নিন্দার সম্পত্তি টুকুর অনেক বৃদ্ধি ও উন্নতি করিয়াছেন। তারপর দুর্ব্বলা দাসীর ও হীরা মালিনীর বেসাতি ও হিসাব। শেষটী যে পূর্ব্বটীর অনুকরণ, তাহা বুঝিতে অধিক আয়াসের আবশ্যকতা হয় না। দুর্ব্বলাকে দেখিয়া "যার আছে ভয় লাজ, ভাল দ্রব্য রাখিল লুকাই"। হীরাকে দেখিয়াও 'দোকানি দোকান ঢাকে ডরে'। ভারতচন্দ্র পণ্যদ্রব্যের নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু দুর্ব্বলার চাতুরী যে ছাঁচে ঢালা, হীরার চাতুরীও সেই ছাঁচে। ভারতচন্দ্র শব্দের কারুকার্য্য অধিক দেখাইয়াছেন, কিন্তু দুর্ব্বলার চাতুরীতে স্বাভাবিকতা অধিক।

কবিকঙ্কণ যে উপাদান লইয়া ধনপতি ও খুল্লনার বিলাস বর্ণনা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র তাহার উপর মাত্রা চড়াইয়া বিদ্যা ও সুন্দরের অশ্রাব্য বিহার-বর্ণনা দ্বারা কৃষ্ণনগরের রাজসভার বীভৎস রুচির সন্তোষ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

মশানে শ্রীমন্তের ও সুন্দরের দেবীকে স্তুতি একই জাতীয়। কবিকঙ্কণ বর্ণমালা অনুসারে চৌত্রিশা স্তুতি রচনা করিয়া পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রও সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। এইরূপ চৌত্রিশা স্তুতি বোধ হয় সেকালকার কবিদের পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের সাধারণ ক্ষেত্র ছিল।

কমলেকামিনীর রূপ বর্ণনায় যে অতি-

শয়োক্তির প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতচন্দ্র অন্নদা ও বিদ্যার রূপ বর্ণনায় তাহার উপরে মাত্রা চড়াইয়া দিয়াছেন কবিকঙ্কণের কমলেকামিনীর 'বদন শারদ-ইন্দু' এবং "দশ নখে দশ চান্দ ভাসে।" ভারতচন্দ্র এই "শারদইন্দু' ও 'চান্দ' হস্তের নখের সহিত ও তুলনায় অযোগ্য মনে করিয়া একেবারে বলিয়া ফেলিয়াছেন—

"কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পদ-নখে পড়ে তার আছে কত গুলা॥"

আবার—

"অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে।
পদ নখে রহিয়াছে দশ রূপ হয়ে॥"

কমলে কামিনীর—

"বদন-কমল-গন্ধে, পরিহরি মকরন্দে,
কত কত শত ধায় অলি।"

ভারতচন্দ্রের মোহিনীরূপধারিণী অন্নদার—

"কথায় পঞ্চমস্বর শিখিবার আশে।
দলে ২ কোকিল কোকিলা চারি পাশে॥
কঙ্কণ ঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার।
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার॥
চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনী।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী॥"

গৌরীর রূপ বর্ণনায় মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন—

"গৌরীর বদন শোভা, লিখিতে না পারি কিবা,
দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা।
মলিন চান্দ সেই শোকে, না বিচারি সর্ব্বলোকে,
মিথ্যা বলে কলঙ্কের রেখা॥
গৌরীর দশন-রুচি, দেখিয়া দাড়িম্ব বীচি,
মলিন হইল লজ্জা ভরে।
অনুমান করি মনে, ওই শোকের কারণে,
পক্ক-কালে দাড়িম্ব বিদরে॥"

ভারতচন্দ্র বিদ্যার রূপ বর্ণনায় দাড়িম্ব-ফলের বিদীর্ণ হইবার কারণান্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সুর নিয়াছেন কবিকঙ্কণের নিকট।

সিংহলে পিতা পুত্রে পরিচয় স্থলে—

"শুন রাজার জামাই, শুন রাজার জামাই,
কথা অবশেষ হল আর কিছু নাই।"

প্রভৃতি কবিতা বর্দ্ধমান-রাজের প্রশ্ন ও তাঁহার নিকট সুন্দরের পরিচয় স্মরণ করাইয়া দেয়।

এইরূপ স্থল বিশেষ উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। অন্নদামঙ্গল কাব্যই চণ্ডী বা "অম্বিকামঙ্গল" কাব্যের অনুকরণ। অন্নদামঙ্গল অধিক মার্জ্জিত কিন্তু চণ্ডীকাব্যের সহিত প্রকৃতি দেবীর সংশ্রব অধিক।

পূর্ব্বেই আভাষ দেওয়া গিয়াছে, চণ্ডীকাব্য হইতে যেরূপ কবির সমসাময়িক সমাজের একটী প্রতিকৃতি গ্রহণ করা যায়, বোধ হয় অন্য কোন প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্য হইতে সেরূপ পারা যায় না। কাব্যখানি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, কেন বাঙ্গালী সাত শত বৎসর পরের পাদুকা মস্তকে বহন করিতেছে। এক শ্রেণীর কবি মানব জীবনের বা জাতীয় জীবনের উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া দেশের নৈতিক জীবন উচ্চতর পথে পরিচালনের জন্য সচেষ্ট হন, অপর শ্রেণী চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার যথাযথ চিত্র অঙ্কিত করিতে সচেষ্ট। কবিকঙ্কণ ভক্ত কবি—দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণন ও প্রচার তাঁহার কাব্যের মূল লক্ষ্য। এই পথ জাতীয় জীবনের উন্নতি-সাধন তাঁহার উদ্দেশ্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার কৃতকার্য্যতা এদিকে নহে। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালীর গৃহস্থালী, বাঙ্গালীর সুখ দুঃখের যে ছবি পাঠকের নিকট উপস্থিত

করিয়াছেন, সে ছবি স্বভাবকবির তুলিকায় অঙ্কিত, অতিরঞ্জন সত্বেও প্রকৃত। এই ছবির অঙ্কণেই তাঁহার মাহাত্ম্য। কবিকঙ্কণের দৃষ্টি রাঢ়দেশ অতিক্রম করে নাই। মুসলমান সম্রাটের বলদর্পিত আত্ম-নির্ভর ও বিজয়তূর্য্যের উত্তেজক ধ্বনি, প্রতাপসিংহের জ্বলন্ত স্বদেশ-প্রীতি, যশোহর-রাজের অদম্য সাহস ও অধ্যবসায় ইহার কিছুই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। তিনি পুরোহিত-পীড়িত নিরীহ বাঙ্গালীর সমাজ হইতে চরিত্র সংগ্রহ করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে কোকিলের কুহুরব, চক্রবাকের করুণ কাকুতি, শুকের অভ্যস্ত স্তোত্র, এ সকলই আছে, কিন্তু গরুড়ের ইন্দ্রবিজয়ের প্রয়াস নাই। কালকেতুর বীরত্বে বাহুর শক্তি যথেষ্ট আছে, কিন্তু মনের শক্তি অল্প। কবি যে সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, নবদ্বিপাধিপতি লক্ষ্মণ সেনের সমাজ হইতে তাহার জন্ম। যেখানে দৈবশক্তির উপর এত নির্ভর, সেখানে আত্ম-নির্ভরের স্থান কোথায়? যেখানে দেবদেবীর চরিত্র এরূপ জঘন্য উপাদানে চিত্রিত, সেখানে মানবের আদর্শ কোথা হইতে উচ্চ হইবে?

পৌরাণিক যুগ দেশের যে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে, এই স্বভাব-কবির গৃহীত ফটো খানি দেখিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। মকুন্দরামের দেবতা সম্প্রদায় বিশেষের দলপতি হইবার জন্য লালায়িত, স্তবে তুষ্ট, হেলায় রুষ্ট, পূজা খাইবার জন্য পরস্পরের প্রতিযোগী এবং সেই উদ্দেশ্যে গর্হিত উপায় অবলম্বনেও প্রস্তুত। তাঁহারা ডিহিদার মামুদ সরিফ জাতীয় অথবা তাঁহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক ক্ষমতাবান্। কবিকঙ্কণের বীর এই রূপ দেবতারই অনুগ্রহ-প্রার্থী। তাঁহার কাব্যে এইরূপ দেব-ভক্তের সাক্ষাৎকার পাই, কিন্তু তেজস্বী দেশভক্তের কোথাও দেখা পাই না। যে সময়ে ক্ষত্রিয় যোদ্ধা দেশের জন্য না হউক, মানের জন্য, ধর্ম্মের জন্য হাস্যমুখে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল, মুকুন্দরাম কাব্য লিখিতে গিয়া সে সময় হইতে উপকরণ সংগ্রহ করেন নাই। যে যুগে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণদান স্বর্গারোহণের অন্যতম উপায় বলিয়া পরিগণিত হইত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ইহলোকে নিন্দনীয় ও পরলোকে যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল, সে যুগ হইতে মুকুন্দরামের উপাদান সংগৃহীত নহে। স্বদেশ-প্রেম বাঙ্গালীর দেশে বিদেশীয় আমদানী কি না, জানি না। তবে ইহা বলিতে পারি, প্রতাপাদিত্য বা কেদার রায় এদেশের মাটীতে অধিক জন্মে নাই। যে দুই একটী জন্মিয়াছে, তাহাদের প্রভাবও অধিক দূর বিস্তৃত হইতে পারে নাই। যখন কলিঙ্গরাজ গুজরাট আক্রমণ করিলেন, তখন দূত আসিয়া শত্রু-সৈন্যের গুরুত্ব বর্ণনা করিয়া কালকেতুকে বলিতেছে—

"মমতা করি দূর, ছাড় হে এই পুর,
শরণ করহ সানু।"

যে দেশে কবি-কল্পনাতেও ভৃত্য আসিয়া রাজার নিকট এরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে পারে, সে দেশের রাজনৈতিক গগন তমসাচ্ছন্ন থাকিবে না ত কি? কালকেতুর বীরত্ব ছিল, সামর্থ্য ছিল, তিনি যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু গৃহিণী ফুল্লরা আবার বাঙ্গালীর ঘরের চিরাভ্যস্ত নীতি তাঁহার কর্ণে বর্ষণ করিল, বীরও ধান্যের ঘরে লুকাইলেন। ধনপতি ও শ্রীমন্ত যোদ্ধা নহেন, কিন্তু যে তেজস্বী বালক পিতার অন্বেষণ জন্য বর্দ্ধমান জেলা হইতে নানাবিপদ অতিক্রম করিয়া সিংহলে গিয়াছে, তাহার মুখে—

"হইয়া কিঙ্কর, ঢুলাব চামর,
দয়া কর কৃপাময়।"

ইত্যাদি বাক্য অন্যদেশের কবির লেখনী হইতে বাহির হইলে বড়ই বিসদৃশ শুনাইত। কবি যে বাঙ্গালী-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানযুগে আদর্শ হইতে পারে না—তবে আদর্শে উপনীত হইতে হইলে অগ্রে দেখিতে হয়, ত্রুটী কোথায়, বর্জ্জন করিতে হইবে কি? চণ্ডীকাব্য পাঠে এই ত্রুটী বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়, কারণ উহা অধঃপতিত জাতির অধঃপতিত চরিত্র লইয়া লিখিত।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

কারাবাসে শ্রীমন্ত।*

উদ্দীপিত চন্দ্রতারা উদার আকাশে,
মৃদুল হিল্লোলে বায়,
দিগন্তে বহিয়া যায়,
রজত-জ্যোছনা-ধারা দশ দিকে ভাসে;
এমন সুন্দর ধরা,
কার এ আদর ভরা,
নশ্বর মানব হেথা কি করিতে আসে?
আমি বা কি পাপে আজি বন্দী কারাবাসে?

২

অভাগার শেষ নিশা অই যায় যায়—
নহি দস্যু নহি চোর,
অদৃষ্ট-নিয়তি মোর,
রাজ-রোষে প্রাণদণ্ড দীন অসহায়!
ললাটে বিধির লেখা,
প্রবাসে মরিব একা,
বান্ধব স্বজন স্নেহে দিবে না বিদায়—
অভাগার শেষ নিশা অই যে পোহায়!

৩

কোথা সেই মাতৃকোল আরামের ঠাঁই?
জগতের যত পাপ,
নারি-হত্যা, ব্রহ্মশাপ,
পরশে পলায় সব, বিনাশে বালাই!
শুভ, সিদ্ধি, ঋদ্ধি-সীমা,
কি পবিত্র কি মহিমা,
সেখানে যে ত্রিতাপের অধিকার নাই,
কোথা সে অমৃত মাখা আরামের ঠাঁই!

৪

কোথা চির পরিচিত স্নেহের ভবন—
যে প্রাঙ্গণে সন্ধ্যাবেলা,
খেলিতাম শিশু-খেলা,
সোণার শৈশবে সেই মিলি সাথীগণ;
পাতিয়া স্নেহের ফাঁদ,
মা' দিতেন ধরি চাঁদ,
সোহাগে আমারে দিয়া সহস্র চুম্বন;
কোথা সে আজন্ম-স্মৃতি সে স্নেহ-ভবন!

৫

কোথা সেই বিদ্যালয় সহপাঠী দল,
অধ্যয়ন এক সনে,
একীভূত প্রাণ মনে,
অপরাধে নিত্য ক্ষমা, আনন্দে চঞ্চল;
প্রীতি মান রাশি রাশি,
তুচ্ছ কাজে উচ্চ হাসি,
সরল পরাণে সেই উদ্যম প্রবল,
কোথা সেই বিদ্যালয় সতীর্থ সকল!

* অমর কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীগ্রন্থোক্ত "শ্রীমন্তের মশান" অবলম্বনে লিখিত। স্থানে স্থানে মূলের সহিত অনৈক্য হইয়াছে। ভরসা করি, এ দোষ মার্জ্জনীয়। লেখিকা।

কোথায় জনমভূমি, বন, পথ, নদী,
সেই পশু পাখিকুল,
তরু, লতা, ফল, ফুল,
সে চিত্র যে চিত্তপটে আঁকা নিরবধি ;
দেবের করুণা সমা,
সেই যে স্বদেশ-রমা,
আজি মা তোমার যেন পাই না অবধি,
কি অমৃত মাখা তব ধূলি বালি নদী!

৭

আমি তো মায়ের "শিশু" কিছুই বুঝি না,
বিমাতা সে নিরমমা,
কুপিতা ভুজঙ্গী সমা,
মা আমার অশ্রুমুখী দীনা পরাধীনা,
পিতা নিরুদ্দিষ্ট বলি,
সিংহলে আসিনু চলি,
অমনি বাজিল বুঝি মরণের বীণা,
অবোধ বালক আমি কিছুই বুঝি না!

৮

দেখিলাম কালিদহে "কমলেকামিনী"
কে জানে নিয়তি লীলা,
কি প্রপঞ্চ দেখাইলা,
মরু মাঝে মরীচিকা—তেমতি কাহিনী!
কহিতে ভূপতি ঠাঁই,
আর তার চিহ্ন নাই,
কি লাজ—সে "উন্মত্ততা" বুঝাতে পারিনি—
কি বলিতে কি বলিনু, অদ্ভুত কাহিনী!

৯

তাই "প্রবঞ্চক শঠে" বধিবে রাজন—
মরিতে জনমে সবে,
আমারো মরিতে হবে,
মশানে করিছে মম মৃত্যু আয়োজন,
কিন্তু এ কলঙ্ক মম,
ভীষণ ভীষণ-তম,
আমি কি বঞ্চক শঠ আমি কি দুর্জ্জন ?
সাক্ষী তুমি বিশ্বচক্ষু সাক্ষী ত্রিলোচন!

১০

অভাগার শেষ নিশা যায় পোহাইয়া—
রবি শশী গ্রহ তারা,
জনমের সাথী যারা,
শ্রীমন্ত বিদায় মাগে মিনতি করিয়া ;
তোমরা দেখিও কালি,
অভাগার স্থান খালি,
রয়েছে এ দেহ-শেষ মশানে মিশিয়া,
অভাগার শেষ নিশা যায় পোহাইয়া।

১১

এস অন্তিমের সখা ভাই কর্ণধার!—
এস কাছে জন্মশোধ,
না হ'তে এ কণ্ঠরোধ,
বলে যাই যাহা কিছু আছে বলিবার ;
আজিকার নিশা শেষে,
যাও তুমি ফিরি দেশে,
এ হেন অরুরপুরে রহিও না আর ;
নাহি হেথা দয়া মায়া,
নাহি শান্তি নাহি ছায়া,
নাহি ক্ষমা, নাহি হৃদি, নাহি সুবিচার,
এ দারুণ মরুভূমি,
চরণে দলিয়া তুমি,
যাও দেশে—স্বর্গপুরী সে যে এ ধরার,
স্নেহ প্রেম দয়া ক্ষমা সবি আছে তার।

১২

বলিও মায়েরে মোর শেষ নিবেদন,
যদিও হতেছি হত,
তথাপি বীরের মত,
হাসিয়া কিশোর প্রাণ দিব বিসর্জ্জন ;
মুক্ত হবে কারাক্লেশ,
সকল লাঞ্ছনা শেষ,
চির সুষুপ্তির পরে শুভ জাগরণ ;

মা সর্ব্বমঙ্গলা শিবে,
এ সন্তানে কোলে নিবে,
অসীম করুণা ক্ষমা করি বিতরণ!
মানবে দেখিবে চাহি,
আর সে শ্রীমন্ত নাহি,
প্রতিহিংসা করায়েছে শোণিত তর্পণ!

বিশ্বদেবে নমস্কার—
দেখ দেখ কর্ণধার!
আসিছে কনকাচলে উদার মরণ,
দিবে সে অভয় বর অমর জীবন।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

গীতার ঐতিহাসিকতা।

(ক) গীতা প্রক্ষিপ্ত কিনা?

গীতা অমূল্য রত্নের খনি। ইহা সাধকের সাধনা, দার্শনিকের দর্শন এবং কাব্যানুরাগীর প্রিয় কাব্য। সমুদয় ধর্ম্মমত মন্থন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে এক অপূর্ব্ব মতের স্থাপনা করিয়াছেন,—জ্ঞান, ধর্ম্ম, ও ভক্তির অদ্ভুত সমন্বয় করিয়াছেন। ইহাতে সাম্প্রদায়িকত্বের লেশ মাত্র নাই। কি জ্ঞানী, কি কর্ম্মী, কি যোগী, কি ভক্ত, সকলের পক্ষে গীতা তুল্য উপাদেয়। এইরূপ দুর্লভ রত্ন পৃথিবীর আর কোন ধর্ম্মে নাই। গীতা যে কেবল হিন্দুদিগের আদরের জিনিষ, তাহা নহে; সমুদয় সভ্য জগৎ ইহার আদর করিয়া থাকেন। প্রায় সমুদয় ভাষাতে ইহা অনূদিত হইয়াছে। এমন কি, সুদূর ল্যাপল্যাণ্ডবাসীরাও এই গীতা আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন।

গীতার এইরূপ আদর দেখিয়া জন কয়েক খ্রীষ্টধর্ম্মানুরাগী মিসনারিগণের ঈর্ষাবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা গীতার আদর খর্ব্ব করিবার জন্য এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা জনসমাজে এইরূপ প্রচারিত করিতেছেন যে, প্রথমতঃ, গীতা একখানি আধুনিক পুস্তক—খ্রীষ্টজন্মের বহু পরে রচিত হইয়াছে; মহাভারত খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে হয় ত রচিত হইতে পারে, কিন্তু গীতা খ্রীষ্ট জন্মের পরে রচিত হইয়া মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ঐতিহাসিক কোন পুরুষ ছিলেন না; এবং তৃতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন; এক মাত্র যীশু খ্রীষ্টই অবতার; হিন্দুরা অবতারবাদ খ্রীষ্টানের নিকট পাইয়াছেন, অবতারবাদ হিন্দুধর্ম্মে পূর্ব্বে ছিল না; ইহা বিদেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছে মাত্র। অপর্য্যাপ্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া যে সকল পুরাতত্ত্ববিৎ ইংরাজ পণ্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্যাদির সময় নির্দ্ধারিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহাদের সেই সকল অপর্য্যাপ্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ঐ সকল মিশনারিগণ গীতাকে উপলক্ষ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের উপর আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, হিন্দুধর্ম্মের উপর দিয়া এইরূপ অনেক বাত্যা প্রবাহিত হইয়াছে; কিন্তু সেই পুরাতন ঋষিগণ-প্রতিষ্ঠিত সনাতন হিন্দুধর্ম্ম তখনও অটুট রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে।

আমরা প্রথমে গীতা ও শ্রীকৃষ্ণ-সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, ঐ সকল ইংরাজগণ কতদূর ভ্রান্ত হইয়াছেন এবং পরে অবতার-তত্ত্ব সম্বন্ধে

আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, অবতারবাদ কেবল হিন্দুদিগেরই নিজস্ব এবং উহা বৈদিক যুগ হইতে প্রচলিত রহিয়াছে।

যে সকল ইংরাজ পণ্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে Macdonell, Weber, Fraser এবং Max Muller অন্যতর। এই সকল পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, বেদ, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ্ সমূহ অতি প্রাচীন কিন্তু গীতা প্রাচীন নহে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অনেক পরে গীতা রচিত হইয়াছে। আমাদের স্বদেশীয় পণ্ডিত ভাণ্ডারকারও (R. G. Bhandarkar) বলিয়াছেন যে, গীতা একখানি আধুনিক পুস্তক। এই সকল পণ্ডিতদের মত সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, প্রচীনতারও স্তর আছে। আমরা যদি বেদাদি শাস্ত্রের ন্যায় গীতাকে অতি প্রচীন বলিয়া স্বীকার নাও করি, তাহা হইলেও যে গীতা বহু প্রাচীন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গীতা প্রাচীন কি আধুনিক ? এই প্রশ্নের উত্তর করিতে গিয়া ঐ সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস ভারতসংহিতা নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। উক্ত ভারতসংহিতা তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান মহাভারতের আকার ধারণ করিয়াছে। উক্ত ভারত-সংহিতায় গীতা খ্রীষ্টজন্মের বহু পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

গীতায় প্রক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত মূল মহাভারত কোন্ খানি, তাহা অবগত হওয়া উচিত। বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্প
শুদ্ধিভিঃ।
পুরাণ সংহিতাং চক্রে পুরাণার্থ বিশারদঃ॥"
(বিষ্ণু—৩-৬-১৬)

অর্থাৎ, পুরাণার্থ বিশারদ ব্যাসদেব আখ্যান উপাখ্যান প্রভৃতির সহিত পুরাণ সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। আখ্যান উপাখ্যান প্রভৃতি কাহাকে বলে, তৎ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার লিখিয়াছেন যে,—

"স্বয়ং দৃষ্টার্থকথনং প্রাহুরাখ্যানকং বুধাঃ।
শ্রুতস্যার্থস্য কথনমুপাখ্যানং প্রচক্ষতে॥
গাথাস্তু পিতৃ পৃথ্বি প্রভৃতি গীতয়ঃ।
কল্পশুদ্ধিঃ শ্রাদ্ধ কল্পাদি নির্ণয়ঃ॥"

যে বিষয় স্বচক্ষে দেখা যায়, তাহার বিবরণকে আখ্যান বলে এবং যে বিষয় শ্রুত হয়, তাহার বিবরণকে উপাখ্যান বলে। সুতরাং ব্যাসদেব যে পুরাণ-সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার বিষয় তিনি কতক স্বচক্ষে (Eye witness) দেখিয়াছিলেন, এবং কতক সমসাময়িক লোকের (Contem-porary Historians) নিকট হইতে অবগত হইয়াছিলেন। অতএব, পুরাণ-সংহিতাতে, স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এমন লোকের কতক বর্ণনা আছে এবং সমাসাময়িক ইতিহাসিজ্ঞ ব্যক্তিদের কতক বর্ণনা আছে। পুরাণ সংহিতার ইহাই বিশেষত্ব। ব্যাসদেব এই বিশেষত্বের সহিত ইহা রচনা করিয়াছেন।

মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"উপাখ্যানৈঃ সহ জ্ঞেয়মাদ্যং ভারতমুত্তমম্।
চতুর্ব্বিংশতি সাহস্রীং চক্রে ভারত
সংহিতাম॥১০২
উপাখ্যানৈর্ব্বিনা তাবদ্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
ততোঽধ্যর্দ্ধ শতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃত-
বানৃষিঃ॥১০৩
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্ব্বণাম্।
ইদং দ্বৈপায়নঃ পূর্ব্বং পুত্র মধ্যাপয়চ্ছুকম॥১০৪

ততোঽন্যেভ্যোঽনুরূপেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ বিভুঃ।১০৫

(আদি—১ম অধ্যায়)

অর্থাৎ, ভারতসংহিতা প্রথমতঃ চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে বিরচিত হয়। তাহাতে উপাখ্যান ভাগ এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পরিশেষে মহর্ষি সার্দ্ধশত শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকায় ভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করিলেন। বেদব্যাস এই মহাভারত প্রস্তুত করিয়াই সর্ব্বাগ্রে স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। পরে অন্যান্য অনুরূপ শিষ্যমণ্ডলীতে তাহা বিতরণ করেন।

মহাভারতে অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারত পঞ্চমান্।
সুমন্তুং জৈমিনিং পৈলং শুকঞ্চৈব স্বমাত্মজম্॥
প্রভুর্বরিষ্ঠো বরদো বৈশম্পায়নমেবচ।
সংহিতাস্তৈঃ পৃথকত্বেন ভারতস্য প্রকাশিতাঃ"॥

(আদি—৬৩ অধ্যায়)

অর্থাৎ ব্যাসদেব বেদ এবং পঞ্চম বেদ মহাভারত সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, স্বীয় পুত্র শুক এবং বৈশম্পায়নকে শিখাইলেন। তাঁহারা পৃথক পৃথক ভারত-সংহিতা প্রকাশিত করিলেন।

আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে,—

"সুমন্তু জৈমিনি বৈশম্পায়ন-পৈল-সূত্র-ভারত মহাভারত ধর্ম্মাচর্য্যোঃ।" (৩।৪)

অর্থাৎ সুমন্তু সূত্রকার, জৈমিনি ভারতকার, বৈশম্পায়ন মহাভারতকার এবং পৈল ধর্ম্মশাস্ত্রকার। মহাভারত বলিয়া যাহা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা বৈশম্পায়ন প্রণীত ভারত-সংহিতা। জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রোক্ত মহাভারতীয় কথা বৈশম্পায়ন প্রথম প্রচারিত করেন। কিন্তু আমরা যে আধুনিক মহাভারত পাইতেছি, তাহা যে প্রত্যক্ষ ভাবে বৈশম্পায়নের নিকট পাইতেছি, তাহা নহে। আমরা উহা এমন একজন ব্যক্তির নিকট পাইতেছি, যিনি লিখিতেছেন যে, উগ্রশ্রবাঃ সৌতি এই এই কথা বলিয়াছেন। উগ্রশ্রবাঃ আবার বলিতেছেন যে, তিনি ইহা বৈশম্পায়নের নিকট পাইয়াছেন।* সুতরাং প্রচলিত মহাভারত মূল ব্যাসোক্ত সংহিতা নহে। ইহা বৈশম্পায়ন-সংহিতা বলিয়া প্রচলিত। কিন্তু আমরা যথার্থ বৈশম্পায়ন-সংহিতা পাইয়াছি কিনা, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে।

উগ্রশ্রবাঃ একজন সৌতি ছিলেন। সূতের কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। সূত সম্বন্ধে আমার কূর্ম্ম পুরাণে নিম্নলিখিত শ্লোকটী দেখিতে পাই। যথা,—

"সদন্বয়ে চ যে সূতাঃ সম্ভূতা বেদবর্জ্জিতাঃ।
তেষাং পুরাণ বক্তৃত্বং বৃত্তিরাসীদ জাজ্ঞয়া॥"

(কূর্ম্ম—১২—২৯)

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পুরাণ বক্তৃত্বই সূতের কার্য্য। স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এমন লোকের নিকট হইতে অথবা সমসাময়িক উপাখ্যান (chronicles) হইতে সংগৃহীত রাজাদিগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা, রাজন্যবর্গের এবং তাঁহাদের বংশের ঘটনা সকল বিবৃত করা এবং মহাপুরুষদের জীবনী বর্ণনা করাই সূতের কার্য্য ছিল। বেদাদি প্রাচীন শাস্ত্রেও সূতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের বর্ণনা

* অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে যে, উগ্রশ্রবাঃ সৌতি তাঁহার পিতার কাছেই বৈশম্পায়ন-সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

সকল পুরাণ এবং ইতিহাস নামে প্রচলিত হইত। মহাভারতও একখানি ইতিহাস, ইহাও সূত কর্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহাভারত যখন নৈমিষারণ্যে ঋষিদিগের নিকট উগ্রশ্রবাঃ নামক সূত কর্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছিল, তখন ইহা ইতঃপূর্ব্বেই চার বার হস্তান্তরিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত আকার গ্রহণ করিয়াছিল। প্রথমতঃ ব্যাসদেব ইহাকে ভারতসংহিতা আকারে বৈশম্পায়নকে পাঠ করান, দ্বিতীয়তঃ বৈশম্পায়ন ইহা লোমহর্ষকে শিক্ষা দেন; তৃতীয়তঃ লোমহর্ষ তাঁহার পুত্র উগ্রশ্রবাকে ইহা পাঠ করান। চতুর্থতঃ উগ্রশ্রবার নিকট ইহা শ্রবণ করিয়াছেন, এমন একজন ব্যক্তি, যাঁহার নাম উল্লিখিত হয় নাই—ইহা নৈমিষারণ্যে ঋষিদিগের নিকট কীর্ত্তন করেন। এই প্রকারে ব্যক্তি পরম্পরায় কীর্ত্তিত হওয়াতে মূল ভারতসংহিতার পরিবর্ত্তন ঘটে। ঋষিদিগের নিকট নৈমিষারণ্যে যখন ইহা কীর্ত্তিত হইয়াছিল, তখন যে ইহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল এবং ইহা যে বহু পাঠান্তর গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা আদি পর্ব্বের প্রথম অধ্যায়ের ৫৩ শ্লোক হইতেই অবগত হওয়া যায়। সুতরাং নৈমিষারণ্যে কীর্ত্তিত হইবার পর হইতেই এখন পর্য্যন্ত যে ইহার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা ইহার বর্ত্তমান আকার হইতে অনুমান করা কঠিন নহে।

আমরা মহাভারত হইতে অবগত হই যে, ব্যাসদেব চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকাত্মক ভারত-সংহিতা রচিত করিয়া তাঁহার পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। পরে শুকদেবের নিকট বৈশম্পায়ন উহা শিক্ষা করেন। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে যে মহাভারত পঠিত হইয়াছিল, তাহা এই আদিম চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকাত্মক মহাভারত। পরে ইহা যত শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে প্রচারিত হইতে লাগিল, তত ইহাতে নানা ব্যক্তির রচনা প্রক্ষিপ্ত হইল।

মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, মহাভারতে লক্ষ শ্লোক আছে। কিন্তু কোন্ পর্ব্বে কত শ্লোক আছে, তাহা উক্ত অধ্যায়ে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তাহাদের সমষ্টি করিলে মোট ৮৪,৮৩৬ সংখ্যা হয়। কিন্তু বর্ত্তমান মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা ১০৭৩৯০। শ্লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার কারণ আর কিছুই নহে, মহাভারতে অনেক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কোথায় ব্যাসদেবের চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক, আর কোথায় আধুনিক কালের এক লক্ষের উপর শ্লোক? মূল ভারত-সংহিতায় প্রায় তিন গুণ অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মহাভারতের আলোচনা করিয়া তিনটী স্তর বাহির করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণচরিত্রে লিখিয়াছেন যে,—"প্রথম স্তরটী একটী আদিম কঙ্কাল মাত্র। ইহাতে পণ্ডিতদিগের জীবনবৃত্তান্ত এবং আনুষঙ্গিক কৃষ্ণ কথা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহা বড় সংক্ষিপ্ত। বোধ হয়, ইহাই সেই চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকাত্মিকা ভারত-সংহিতা।" এই ভারত-সংহিতাই ব্যাসদেব তাঁহার পুত্র শুকদেবকে এবং বৈশম্পায়নাদি শিষ্যবর্গকে শিখাইয়াছিলেন। বৈশম্পায়ন ইহা জনমেজয়ের সভায় প্রথম প্রচার করেন। লোমহর্ষণ সৌতি, নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের নিকট বৈশম্পায়নোক্ত ভারত-সংহিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। বৈয়াসিকী ভারত-সংহিতার প্রথম আবৃত্তিকার বৈশম্পায়ন এবং দ্বিতীয় আবৃত্তিকার লোমহর্ষণ। বৈয়াসিকী মূল

ভারত-সংহিতার অংশ বিশেষ, আধুনিক মহাভারতের মধ্যে লক্ষিত হইয়া থাকে,—বিশেষতঃ যে সকল অধ্যায়ের প্রথমে ঘটনাগুলির আভাস দেওয়া হইয়াছে এবং পরে সবিস্তারে সেই সকল ঘটনার বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই সকল অধ্যায়ের অভিাসের মধ্যে ভারত-সংহিতার অংশবিশেষ—যাহাকে মহাভারতের প্রথম স্তর বলা হয়, তাহা লক্ষিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় স্তর ভারতসংহিতার আবৃত্তিকারে বৈশম্পায়ন সৌতি কর্ত্তৃক গঠিত হইয়াছে। এই স্তর সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন যে, "তাহা প্রথম স্তর হইতে ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। আমরা দেখিব যে, মহাভারতের কোন কোন অংশের রচনা অতি উদার, বিকৃতিশূন্য, অতি উচ্চ কবিত্বপূর্ণ। অন্য অংশ অনুদার, কিন্তু পারমার্থিক দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধযুক্ত, সুতরাং কাব্যাংশে কিছু বিকৃতিপ্রাপ্ত; কবিত্ব-শূন্য নহে, কিন্তু যে কবিত্ব আছে, সে কবিত্বের প্রধান অংশ অঘটন ঘটন কৌশল, তদ্বিষয়ে সৃষ্টিচাতুর্য্য। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত যে সকল অংশ, সেগুলি এক জনের রচনা, দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণ বিশিষ্ট যে সকল রচনা, তাহা দ্বিতীয় ব্যক্তির রচনা বলিয়া বোধ হয়। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণ বিশিষ্ট অংশই প্রাথমিক বা আদিম; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণযুক্ত অংশগুলি পরে রচিত হইয়া তাহার উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। কেননা, প্রথম-কথিত অংশ উঠাইয়া লইলে মহাভারত থাকে না; যাহা থাকে, তাহা কঙ্কালবিচ্যুত মাংসপিণ্ডের ন্যায়, বন্ধন শূন্য এবং প্রয়োজন শূন্য নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণ বিশিষ্ট যাহা, তাহা উঠাইয়া লইলে, মহাভারতের কিছু ক্ষতি হয় না, কেবল কতকগুলি নিষ্প্রয়োজন অলঙ্কার বাদ যায়; পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত অখণ্ড থাকে।"

ইহা ভিন্ন আরও একটী স্তর আছে। পণ্ডিতেরা বলেন যে, ইহা অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির পরে, যখন হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়, তখন তৃতীয় স্তরটী গঠিত হইয়াছে। যখন যে ব্যক্তি যাহা ভাল রচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা মহাভারতে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। এই তিনটী স্তরের সংমিশ্রণে আধুনিক মহাভারত গঠিত হইয়াছে।

কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য যে, গীতা মূল ভারত-সংহিতার অংশ বিশেষ কিনা, অথবা গীতা মূল ভারত-সংহিতায় প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে কিনা? প্রথমতঃ, ভাষা এবং বিষয় লইয়া যদি আমরা আলোচনা করি, তাহা হইলে কোন সৎসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। কারণ, যখন আমরা গীতার ভাষার (style) সহিত মহাভারতের (style) ভাষার তুলনা করি, তখন আমরা উভয়ের কোন প্রকার বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাই না। এবং দ্বিতীয়তঃ গীতায় যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে এবং যে সকল মতের পোষণ করা হইয়াছে, তাহা মহাভারতের বহু স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিষয় অথবা মতের দ্বৈধ দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু গীতা মূল ভারত-সংহিতার অংশ কিনা, তাহা অবগত হইবার অন্যান্য উপায় আছে। বিশেষ পর্য্যাবেক্ষণ করিয়া মহাভারত পাঠ করিলে প্রক্ষিপ্ত অংশ গুলি ধরিতে পারা যায়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহাভারতের পর্ব্ব-সংগ্রহ অধ্যায়ে ভারত-সংহিতার কোন্ পর্ব্বে কত শ্লোক

ছিল, তাহার বিবরণ দৃষ্টিগোচর হয়। গীতা ভীষ্ম-পর্ব্বের অন্তর্গত এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। এই পর্ব্ব সম্বন্ধে ভারত-পর্ব্ব সংগ্রহ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে,—

"পঞ্চ শ্লোক সহস্রাণি সংখ্যায়াঽষ্টৌশতমিচ।
শ্লোকাশ্চ চতুরাশীতিরস্মিন্ পর্ব্বাণি কীর্ত্তিতাঃ॥"

(আদি—২-২৫৩)

অর্থাৎ, ভারত-সংহিতার অন্তর্গত ভীষ্ম-পর্ব্বে ৫৮৮৪ সংখ্যা শ্লোক লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু আধুনিক মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্ম-পর্ব্বে আমরা ৫৮৫৬ সংখ্যক শ্লোক দেখিতে পাই! গীতা যদি প্রক্ষিপ্ত হইত, তাহা হইলে অন্যান্য পর্ব্বের ন্যায় ভীষ্ম পর্ব্বের কলেবরও বর্দ্ধিত হইত। শ্লোক সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়া দূরে থাকুক, মোটের উপর মূলের তালিকা অপেক্ষা ন্যূন সংখ্যক শ্লোক দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সুতরাং গীতা যে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহা সহজে অনুমেয়।

অনেকে হয় ত বলিতে পারেন যে, 'বৈয়াসিকী চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকাত্মক ভারত-সংহিতার যখন কলেবর যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল, তখন হয় ত কেহ ভবিষ্যতে যাহাতে আর উহার কলেবর বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হয়, তাহার নিবারণের জন্য উহাতে পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় সংকলিত হইবার পূর্ব্বেও যে অনেক অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।' ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, আমরা এমন কোন প্রমাণ পাইতেছি না, যাহা হইতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে গীতা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। বরঞ্চ গীতা যে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহার একটী সুন্দর প্রমাণ আছে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহর্ষি বেদব্যাস সার্দ্ধশত শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকায় ভারত-সংহিতার নিখিল বৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করিয়াছিলেন (আদি—১ম অধ্যায়—১০৩) মহাভারতের আদিপর্ব্বের উক্ত অনুক্রমণিকাধ্যায়ে সার্দ্ধশত শ্লোকের মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোকটী দেখিতে পাই। যথা,—

"যদা শ্রৌষং কশ্মলে নাভিপন্নে
রথোপস্থে সীদমানেঽর্জ্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥" ১৮২

ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ করিয়া সঞ্জয়কে বলিতেছেন যে, হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম যে অর্জ্জুন বিষন্ন ও মোহাচ্ছন্ন হইলে, কৃষ্ণ রথোপস্থিত হইয়া স্বশরীরে চতুর্দ্দশ ভুবন দর্শন করাইয়াছেন, তখন আর জয় আশা করি নাই।

এই শ্লোকটীতে আমরা গীতোক্ত বিশ্বরূপ-দর্শন নামক একটী প্রধান বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি। গীতা যদি প্রক্ষিপ্ত হইত, তাহা হইলে আমরা এই শ্লোকটী দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু এই শ্লোকটীকেই যদি কেহ প্রক্ষিপ্ত ভাবেন, তাহা হইলে তাহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা সুধিগণের বিবেচ্য।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সকল হইতে ইহাই অনুমিত হইয়া থাকে যে, গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, উহা মূল ভারত-সংহিতারই অন্তর্গত।

(খ) গীতার ঐতিহাসিকতা।

গীতা মহাভারতের অংশ, সুতরাং মহাভারতের সময় নির্দ্ধারিত হইলে গীতারও সময় হইবে। কিন্তু আমরা এখানে মহাভারতের আলোচনা না করিয়া কেবল গীতা সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব যে

এমন কোন আভ্যন্তরিক অথবা বাহ্যিক প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা, যাহা হইতে আমরা গীতার সময় নির্দ্ধারণ করিতে পারি। যদি এইরূপ কোন প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে, যাঁহারা গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাঁহারাও গীতার প্রণয়নের সময় নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন।

প্রথমে দেখা যাউক যে, গীতার প্রণয়ন কর্ত্তা কে? এ সম্বন্ধে গীতার শঙ্কর ভাষ্যে, বৃহদারণ্যকোপনিষদে (p. 848 Bib. Indica.) এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে (p.271.Bib. Indica.) উল্লিখিত হইয়াছে যে,ব্যাসদেবই গীতা-প্রণেতা। কিন্তু অনেকে এই প্রকার আপত্তি করিয়া থাকেন যে, ব্যাসই যদি গীতা প্রণয়ন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিজের নাম কেমন করিয়া গীতায় উল্লেখ করিলেন? যথা—

'আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষিনারদস্তথা।
আসিতোদেবলোব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষিমে ॥"
(গীতা—১০-১৩)

অর্থাৎ, সকল ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, দেবল এবং ব্যাস সকলেই তোমারে উক্ত রূপ বলিয়া থাকেন এবং স্বয়ং তুমিও ঐরূপ বলিতেছ। অন্যত্র গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে—"মুনীনামপ্যহং ব্যাসং" (১০।৩৭)— অর্থাৎ মুনিদিগের মধ্যে আমি ব্যাস। এই প্রকারে ব্যাসের নাম গীতায় উল্লেখ থাকাতে অনেকে আপত্তি করিরা বলেন যে, গীতা ব্যাস কর্ত্তৃক রচিত হয় নাই। কিন্তু 'ব্যাস' এই কথাটীর উল্লেখ থাকিলেও যে, ব্যাসের গীতা প্রণয়নের কিছু হানি হয় না, তাহা সুধিগণ পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক দুইটী পাঠ করিলেই অবগত হইবেন। আধুনিক কালেও আমরা নিজের নাম নিজের পুস্তকাদিতে দেখিতে পাই। বিশেষতঃ সংবাদ পত্রের ছত্রে ছত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সম্পাদক মহাশয় নিজের কীর্ত্তিকাহিনী উদ্ধৃত করিয়া লিখিতেছেন যে, অমুক (অর্থাৎ, নিজের নাম সেই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন) এই কথা বলিয়াছেন,অথবা অমুক এই বক্তৃতা দিয়াছেন। যদি তাঁহার নিজেরই সম্পাদিত পত্রিকার ভিতর সম্পাদকের নাম দেখা যায়, তাহা হইলে কি আমরা বলিতে পারি যে, যে নাম আমরা দেখিতে পাইতেছি, সেই নামের ব্যক্তি ঐ পত্রিকা সম্পাদিত করেন নাই? সেই প্রকার ব্যাসের গীতা প্রণয়নের সম্বন্ধে যাঁহারা আপত্তি করেন, তাঁহাদের আপত্তিও অন্তঃসার-শূন্য। পুনশ্চ ব্যাস যে কেবল এক জনের নাম তাহা নহে, 'ব্যাস' একটী পদবী। পুরাকালে অনেক ব্যাস হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে (১১।১৬। ২৯) বলিয়াছেন যে—"দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাম্"—অর্থাৎ, ব্যাসগণের মধ্যে আমি দ্বৈপায়ন। যে ব্যাস গীতা রচিত করিয়াছেন, তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস নামে বিখ্যাত।

শারীরক ভাষ্যে (১।১।২৬) গীতাকে স্মৃতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই জন্য অনেকে বলেন যে, স্মৃতি সকল আধুনিক, সুতরাং গীতাও আধুনিক। কিন্তু স্মৃতির অর্থ এই—স্মরন্তি বেদমনয়া—অর্থাৎ যাহা বেদকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহাই স্মৃতি। অন্যত্র কথিত হইয়াছে যে—মহর্ষিভির্ব্বেদার্থ স্মরণং স্মৃতিঃ—অর্থাৎ বেদের অর্থ স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য মহর্ষিগণ স্মৃতি প্রস্তুত করিয়াছেন। সুতরাং স্মৃতি আধুনিক নহে। উহা আবহমান কাল বিদ্যমান রহিয়াছে। গীতা বেদের অর্থ স্মরণ করাইয়া দেয়, এই জন্য ইহাকে স্মৃতি বলা হইয়াছে। বেদান্ত-

দর্শন শ্রুতি ভিন্ন শাস্ত্র সমূহকে সামান্যতঃ 'স্মৃতি' এই নাম দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। তৈত্তিরীয়আরণ্যক বেদবাক্যকে 'প্রত্যক্ষ' এবং শ্রুতি মূল মন্বাদি শাস্ত্রকে 'স্মৃতি' বলিয়াছেন। শারীরক সূত্রেও শ্রুতি বুঝাইতে 'প্রত্যক্ষ' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রুতি ভিন্ন শ্রুতিমূল-শাস্ত্রসমূহ "স্মৃতির' অন্তর্গত। সাধারণতঃ 'স্মৃতি' এই কথাটী যদর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বেদান্তদর্শনে তাহা হইতে ভিন্নাকারে ব্যবহৃত হইয়াছে।

গীতা প্রণয়নের সময় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে দুই প্রকার প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ আভ্যন্তরিক প্রমাণ এবং দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক প্রমাণ। এখন আমাদের দেখিতে হইবে যে, এই দুই প্রকার প্রমাণ হইতে গীতা প্রণয়নের সময় সম্বন্ধে কোন প্রকার সাহায্য পাওয়া যায় কি না।

প্রথম, আভ্যন্তরিক প্রমাণ, অর্থাৎ যদি বিশেষ মনোযোগের সহিত গীতা পাঠ করা যায়, তাহা হইলে উহার ভিতর হইতে এমন কোন প্রমাণ সংগ্রহ করা যায় কি না, যাহা হইতে উহার প্রণয়নের সময় নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায়। আমাদিগকে এখন সেই বিষয়েরই অনুসন্ধান করিতে হইবে। পণ্ডিত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গ মহাশয় স্বকৃত গীতার ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকায় (Sacred Books of the East Series) এতদ্ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়া এই প্রকার মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন যে, উপনিষদ্ সকল রচিত হইবার পূর্ব্বেও গীতা রচিত হইয়াছে। তাঁহার যুক্তিগুলি নিম্নে উল্লিখিত হইল।

প্রথমে তিনি গীতার ভাষা (style) এবং ছন্দ (versification) লইয়া দেখাইয়াছেন যে, উহারা অতি প্রাচীন। প্রাচীনতা সম্বন্ধে বেদের ভাষা এবং ছন্দের পরই গীতার ভাষা এবং ছন্দ উল্লেখযোগ্য। তৎপরে তিনি বিষয় লইয়া দেখাইয়াছেন যে, 'সূত্র-যুগের' পূর্ব্বে গীতা রচিত হইয়াছে। সংস্কৃত দর্শন সকল অতি প্রাচীন; উহাদের মত সকল বহু পূর্ব্বাবধি চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এখন আমরা উহাদিগকে যে আকারে পাইতেছি, পূর্ব্বে সেই আকারে বর্ত্তমান ছিল না। উহা বহু শতাব্দী ধরিয়া দর্শন আলোচনার ফল। যে সময় উহারা সূত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে, সেই সময়কে সূত্রযুগ বা ইংরাজীতে System-making Age of Sanskrit Philosopy বলে। পূর্ব্বে ঐ সকল দার্শনিক মত বিক্ষিপ্ত আকারে বর্ত্তমান ছিল, সূত্রযুগ হইতেই উহাদিগকে নিয়ম পূর্ব্বক শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের অনেক স্থলে আমরা সূত্র-সাহিত্যের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা,—"অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাস পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রানি * * * " (২-৪-১০)। অন্যত্রও (৪।১।২ ও ৪।৫।১১) 'সূত্রানি'কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই 'সূত্রানি' দর্শনসূত্র সমূহের পূর্ব্বরূপ কিনা, তাহা বলা দুরূহ। কিন্তু পাশ্চাত্যদিগের যে ধারণা আছে যে, সূত্রযুগের পরে গীতা রচিত হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। কারণ, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সূত্রে নিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে দার্শনিক মত সকল প্রচলিত ছিল। গীতাতে আমরা দার্শনিক মত সকল বিক্ষিপ্ত আকারে দেখিতে পাই। সাংখ্য মত বলিয়া গীতাতে যাহা পোষণ করা হইয়াছে, তাহা

সূত্রযুগের সাংখ্য দর্শনের সহিত মিলে না। পাতঞ্জল দর্শন সম্বন্ধেও ঐরূপ বক্তব্য। নিম্নে দুই একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলিতেছেন যে, মনুষ্যের মন অত্যন্ত চঞ্চল, সুতরাং তাহাকে নিগৃহীত করিয়া যোগ অভ্যাস করা অতীব দুরূহ। মনকে কেমন করিয়া নিগৃহীত করা যায়? ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে নিগৃহীত করা যায়। কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য যে কেমন করিয়া হয়, তাহা তিনি কিছুই বলেন নাই। পতঞ্জলি কিন্তু এ বিষয়ে সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনিও শ্রীকৃষ্ণের মত পোষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম 'যোগ' (পা ১।২) এবং অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয় (পা ১।১২)। পতঞ্জলি অভ্যাস ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে সমাধি পাদের ১৩—১৬ সূত্র সমূহে সম্যক আলোচনা করিয়াছেন। পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণ গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু যোগের যে বিশেষ বিশেষ অঙ্গ আছে, সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই। পতঞ্জলি কিন্তু যোগের অষ্ট অঙ্গ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত এবং অন্যান্য প্রমাণ হইতে তেলাঙ্গ মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, সূত্র যুগের পূর্ব্বে অর্থাৎ যখন দার্শনিক মত সকল শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সবিশেষ আলোচিত হইয়া সূত্রাকারে নিবদ্ধ হয় নাই, সেই সময়ে গীতা রচিত হইয়াছে। গীতা যদি সেই সময়ের পরে রচিত হইত, তাহা হইলে সূত্রাকারে দার্শনিক মত সকলের যেরূপ সবিশেষ আলোচনা হইয়াছে, সেইরূপ আলোচনা দৃষ্ট হইত এবং ঐ সকল মতের সহিত গীতা-রও মতের সম্যক মিল দেখিতে পাওয়া যাইত।

আরও কতকগুলি যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া তেলাঙ্গ মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, বেদের উপাসনা কাণ্ড প্রথমে সংকলিত হয়, তৎপরে জ্ঞান কাণ্ড সংকলিত হইয়াছে। জ্ঞানকাণ্ড সংকলিত হইবার পূর্ব্বে গীতা রচিত হইয়াছে। কিন্তু উপনিষদ্‌গুলি জ্ঞান কাণ্ডের অন্তর্গত, সুতরাং উপনিষদ্‌গুলি সংক-লিত হইবার পূর্ব্বে গীতা রচিত হইয়াছে। তেলাঙ্গ মহাশয়ের যুক্তিগুলি এইরূপ। প্রথ-মতঃ গীতার অনেক স্থলে বেদের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। যথা,—(১) 'ত্রৈগুণ্য বিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন' (গীতা ২-৪৫) অর্থাৎ বেদের বিষয় সকল ত্রৈগুণ্য, হে অর্জ্জুন! তুমি ত্রিগুণের অতীত হও। (২) "জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে", (গীতা ৬-৪৪)—অর্থাৎ তিনি যোগ জিজ্ঞাসু হইয়া বেদোক্ত কর্ম্ম প্রতিপাদক বিষয় অতি-ক্রম করিয়া থাকেন, অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্ম ফলাপেক্ষা সমধিক ফল লাভ করিয়া থাকেন, এইরূপে গীতায় বেদের নিন্দা করা হইয়াছে। কিন্তু এই সকল কটাক্ষ যে বেদের কর্ম্ম কাণ্ডেরই উপর করা হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র; কারণ বেদের জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষদ্‌গুলি যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং সে গুলিকে কেহ নিন্দা করিতে পারেন না। গীতায় যে বেদের নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা এই কর্ম্মকাণ্ডকেই লক্ষ্য করিতেছে, জ্ঞান কাণ্ডকে লক্ষ্য করে নাই। সুতরাং গীতা রচিত হইবার সময় কর্ম্মকাণ্ডই বর্ত্তমান ছিল, জ্ঞানকাণ্ড হয় তখন বর্ত্তমান ছিল না, না হয়

যদি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে কর্ম্মকাণ্ডের ন্যায় আদৃত হয় নাই। তেলাঙ্গ মহাশয়ের মত এইরূপ যে তখন উপনিষদও রচিত হয় নাই; গীতাতে যদিও "বেদান্তের" নামোল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন "বেদান্তকৃৎ" (গীতা ১৫।১৫)—উহা বোধ হয় আরণ্যককে লক্ষ্য করিতেছে। তিনি তাঁহার মত সমর্থনার্থ লিখিয়াছেন যে, গীতার কতকগুলি শ্লোক উপনিষদে পাওয়া যায়। এইরূপ পাইবার আর কোন কারণ নাই, কেবল উপনিষদ গীতার পরে রচিত হওয়াতে, উহা গীতা হইতে ঐ সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছে। ব্যাসদেবও গীতাকে উপনিষদ্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে গীতা একখানি উপনিষদ্। মহাভারতের মধ্যে নিবদ্ধ হইলেও কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ চিরকাল একখানি পৃথক্ উপনিষদ্ বলিয়া আদৃত হইয়া আসিতেছে। গীতার নবম অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোকে ঋক, সাম ও যজুর্ব্বেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, অথর্ব্ববেদের কোন প্রকার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ইহা হইতে তেলাঙ্গ মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, অথর্ব্ববেদ সংকলনের পূর্ব্বে, অথবা অথর্ব্ববেদ বেদ বলিয়া পরিচিত হইবার পূর্ব্বে গীতা প্রণীত হইয়াছে। তিনি গীতার একটী শ্লোক মনুসংহিতায় দেখিয়া এইরূপ বিবেচনা করেন যে, মনুসংহিতা রচিত হইবার পূর্ব্বে গীতা রচিত হইয়াছে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'উপনিষদের' উল্লেখ আছে। সুতরাং পতঞ্জলির পূর্ব্বে উপনিষদ্ গুলি বর্ত্তমান ছিল এবং উপনিষদের পূর্ব্বে গীতা বর্ত্তমান ছিল।

পণ্ডিত তেলাঙ্গের মতের সহিত অনেক স্থলে অনেকের মতের মিল না হইলেও আভ্যন্তরিক প্রমাণ গুলি হইতে এইরূপ দৃষ্ট হইতেছে যে, গীতা অতি প্রাচীন; উহা আধুনিক কালে রচিত হয় নাই। গীতা কবে রচিত হইয়াছে? সে সম্বন্ধে গীতা হইতে আভ্যন্তরিক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া পণ্ডিত রমাপ্রসাদ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা পরে আলোচিত হইতেছে।

এইবার বাহ্যিক প্রমাণ গুলির আলোচনা করিয়া দেখা যাউক যে, গীতার সময় নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায় কিনা।

আমরা গীতার উল্লেখ কাদম্বরীতে দেখিতে পাই। যথা,—"অনন্তগীতাকর্ণনানন্দিত নরম্"—এস্থলে রাজপ্রসাদকে মহাভারতের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মহাভারতে যেমন অনন্তরূপ গীতা অর্জ্জুনকে আনন্দ প্রদান করিয়াছিল, সেইরূপ রাজপ্রসাদে নানা প্রকার সংগীত হওয়াতে মনুষ্যগণকে আনন্দ প্রদান করিত। এই স্থলে 'অনন্তগীতা' ভগবদ্গীতাকেই লক্ষ্য করিতেছে। কাদম্বরী-প্রণেতা বাণভট্টের সময় গীতার যে কেবলমাত্র অস্তিত্ব ছিল, তাহা নহে, উহা তখনও মহাভারতের অংশ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। এখনও যেমন আমরা মহাভারতের আদর দেখিতে পাই, এখনও যেমন কথকগণ উহা পাঠ করিয়া থাকেন, বাণভট্টের সময়ও মহাভারতের সেইরূপ আদর ছিল এবং কথকগণও সেইরূপ পাঠ করিতেন। এইজন্য তিনি কাদম্বরীতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাজ্ঞী বিলাসবতী মহাভারত পাঠ শ্রবণ করিতেন। পাশ্চাত্য মতে খ্রীষ্টজন্মের কিছু পরে বাণভট্ট আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তাহা হইলে বাণভট্টের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টজন্মেরও বহু পূর্ব্বে যে মহাভারত ও তদন্তর্গত গীতা প্রচলিত ছিল, তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে। বাণ-

ভট্টের হর্ষচরিতে কালিদাসের উল্লেখ আছে। সুতরাং তিনি বাণভট্টকে সমসাময়িক অথবা তাঁহার পূর্ব্বকার লোক হইতে পারেন। আমরা কালিদাসের গ্রন্থে গীতার আভাস দেখিতে পাই। রঘুবংশের দশম সর্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাইয়া থাকি ;—

"অনবাপ্তমবাপ্তব্যং নতে কিঞ্চন বিদ্যতে।
লোকানুগ্রহ এবৈকঃ হেতুস্তে জন্মকর্ম্মণোঃ॥"
(৩২ শ্লোক)

ইহার প্রথম পাদটী গীতার ৩ অধ্যায় ২২ শ্লোকের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে ;—

"নমে পর্য্যাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কঞ্চন।
নানাবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এবচ কর্ম্মণি॥"

এবং 'জন্ম' ও 'কর্ম্ম' কথা দুইটী গীতার "জন্ম কর্ম্মচমে দিব্যং"—(গীতা ৪-৯) হইতে অবিকল লওয়া হইয়াছে এবং লোকনুগ্রহের ভাবটী গীতার ৩ অধ্যায় ২০ হইতে ২৩ শ্লোকের সারাংশ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

পুনশ্চ কুমারসম্ভবের ৬ অধ্যায়ের ৬৭ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"স্থানেত্বাং স্থাবরাত্মানাং বিষ্ণুমাহুস্তবাহি তে।
চরাচরাণাং ভূতানাং কুক্ষিরাধারতাং গতঃ"॥

টীকাকার মল্লিনাথ লিখিয়াছেন যে, কালিদাস যখন ঐ শ্লোকটী রচনা করেন, তখন গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটীকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন ;—

"মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরং।
যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥
(১১।২৫)

এমন কি 'স্থাবর' কথাটী উভয় স্থলে দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং ইহা হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, গীতা কালিদাসেরও পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে।

কালিদাসের সময় ঠিক করিয়া নির্দ্ধারণ করিবার উপায় আছে। কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক। বিক্রমাদিত্যের জন্মসময় ধরিয়া আমাদের দেশে সংবৎ নামে একটী অব্দ গণনা প্রচলিত আছে। এখন ২৯৬৫।৬৬ সংবৎ এবং ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দ। সুতরাং উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টজন্মের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন আরও অন্যান্য প্রমাণ* আছে, যাহা হইতে আমরা স্থির নির্দ্ধারণ করিয়া বলিতে পারি যে, অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে কালিদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর পূর্ব্বেও গীতা প্রচলিত ছিল।

আর একটী প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত হইতেছে। কালিদাস "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" নামক একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ রচিত করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাইয়া থাকি। যথা,—

"বর্ষে সিন্ধুর দর্শনাম্বর গুণৈর্যাতে কলৌসম্মিতে।
মাসে মাধবসংজ্ঞিতেহত্র বিহিতো গ্রন্থ
ক্রিয়োপক্রমঃ॥

অর্থাৎ কলিযুগের ৩১৩৮ বৎসর অতীত হইলে চৈত্র মাসে এই গ্রন্থ প্রণয়ন আরম্ভ করা হইয়াছে। এখন কলিযুগের ৫০০৮ বৎসর অতীত হইয়াছে, সুতরাং বর্ত্তমান সময় হইতে ১৯৭০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ পুস্তক রচিত হইয়াছে। তাহা হইলে কালিদাস খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

শারীরক ভাষ্যে (২।১।১৮, ২।১।১৫) শঙ্করাচার্য্য গীতাকে "ঈশ্বগীতা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অনেকের মতে শঙ্করাচার্য্য খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং খ্রীষ্টজন্মের অনেক পূর্ব্বে গীতা রচিত হইয়াছে। কোন কোন বহু

প্রাচীন ভাষানুবাদে ইহাকে অর্জ্জুনগীতা বলা হইয়াছে। আকবরের সময় গীতা যাবনিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল এবং এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আকবরের সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও গীতা প্রচলিত ছিল। গীতা এত প্রাচীন যে তৈলাঙ্গ মহাশয় 'ব্রহ্মসূত্র গীতার পরবর্ত্তী'—এই মতের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, নিম্নোদ্ধৃত ব্রহ্মসূত্রগুলিতে গীতার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'অপি চ স্মর্য্যতে (২।৩।৪৫) স্মরন্তি চ (৪।১।১০), নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ দেহ ভাবিত্বাদ্ দর্শয়তি চ (৪।২।২৯)। প্রথমতঃ, অপি চ স্মর্য্যতে' (২।৩।৩৫)'—এই সূত্রটীর বিভিন্ন প্রকার ভাষ্য লিখিতে গিয়া শঙ্কর, রামানুজ, মাধ্ব ও বল্লভ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, ইহা গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটীকে লক্ষ্য করিতেছে:—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥
(১৫।৭)

দ্বিতীয়তঃ, স্মরন্তিচ (৪।১।১০) সূত্রটীর ভাষ্য লিখিতে গিয়া বিভিন্ন আচার্য্যগণ— যথা, শঙ্কর, রামানুজ এবং মাধ্ব—বলিয়াছেন যে, ইহা গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটীকে লক্ষ্য করিতেছে;—

"শুচৌদেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিন কুশোত্তরং॥
(৬।১১)

তৃতীয়তঃ, "নিশিনেতি চেন্ন সম্বন্ধস্যযাবদ্ দেহ ভাবিত্বাদ্ দর্শয়তিচ" (৪।২।১৯)—এই সূত্রটী গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটীকে লক্ষ্য করিতেছে,—

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষন্মাসা উত্তরায়ণং।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদোজনাঃ॥"
(৮।২৪)

পূর্ব্বোক্ত চার জন আচার্য্যই এই কথা লিয়াছেন।

পূর্ব্বোদ্ধৃত তিনটী প্রমাণ হইতে তেলাঙ্গ মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, গীতা ব্রহ্মসূত্রের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। গীতাতে আমরা কিন্তু "ব্রহ্মসূত্র" এই কথাটী পাইয়া থাকি। যথা,—"ব্রহ্মসূত্র পদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্ব্বিনিশ্চিতৈঃ" (১৩।৪)। এখানে ব্রহ্মসূত্র পদ মানে বেদান্ত-সূত্রের পদ নহে। (১) যাহার দ্বারা ব্রহ্ম "সূত্র্যতে" অর্থাৎ সূচিত বা নিরূপিত হন (তটস্থ লক্ষণ)—যেমন "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে", অর্থাৎ যাহা হইতে ভূত সকল জন্মে,—এইরূপ উপনিষদ বাক্য সকলকে এবং (২) যাহার দ্বারা ব্রহ্মকে "পশ্যতে" অর্থাৎ সাক্ষাৎ জ্ঞান করা যায় (স্বরূপ লক্ষণ)—যেমন "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান এবং অনন্ত স্বরূপ—এইরূপ উপনিষদ বাক্য সকলকে ব্রহ্মসূত্রপদ বলে। সুতরাং গীতার পূর্ব্বোক্ত "ব্রহ্মসূত্র" কথাটীর দ্বারা বেদান্ত-সূত্রকে লক্ষ্য করা হয় নাই।

পাণিনির চতুর্থ অধ্যায়ে, ৩য় পদে ১১০ সূত্রে "পারাশর্য্য" এবং "ভিক্ষুসূত্র" পাওয়া যায়। ভট্টজিদীক্ষিৎ, নাগোজি ভট্ট এবং জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতীকে অনুসরণ করিয়া স্বর্গীয় পণ্ডিত তারানাথ বাচস্পতি বলিয়াছেন যে, এই দুইটী কথা ব্যাস ও বেদান্তসূত্রকে লক্ষ্য করিতেছে। সুতরাং পাণিনির পূর্ব্বে বেদান্ত-সূত্র বর্ত্তমান ছিল এবং বেদান্ত সূত্রের পূর্ব্বেও গীতা বর্ত্তমান ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মার্টিন হোগের মত এইরূপ যে খ্রীঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে পাণিনি বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বহুপূর্ব্বে বেদান্তসূত্র বর্ত্তমান ছিল এবং

তাহারও পূর্ব্বে গীতাও বর্ত্তমান ছিল।

আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, পারাশার্য্য বেদের ব্যাস অর্থাৎ সংকলয়িতা (compiler) অর্থাৎ তাঁহার সময়ে প্রচলিত বেদের বিভিন্ন অংশ গুলিকে তিনি একসঙ্গে গ্রথিত করিয়াছিলেন। তিনি আবার গীতা ও ব্রহ্মসূত্র প্রণেতা। পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা অবগত হইয়াছি যে, গীতা ব্রহ্মসূত্রের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। যদি পণ্ডিত তেলাঙ্গের মত গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, বেদব্যাস বেদকে সংকলন করিবার পূর্ব্বে গীতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়াও কেবলমাত্র গীতার ঐতিহাসিকতার আলোচনা করিয়া আমরা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকি।

ক্রমশঃ

শ্রীআশুতোষ দেব।

হিন্দুজাতির বয়কট।

যাঁহারা ভারতের প্রতিষ্ঠিত বয়কটকে ইংরেজবিদ্বেষ-মূলক বলিয়া পরিহার করিতে চান, তাঁহারা গোড়ায়ই নিতান্ত ভুল বুঝিয়াছেন। বহু যুগযুগান্তরের সাধনা—ভারতের এই বয়কট, বয়কট্ সাহেবের জন্মের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে, যুগধর্ম্মরূপে এদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর সমাজ, হিন্দুর বাণিজ্য—সকলই এই যুগধর্ম্মের সহায়তায় রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান বয়কট্ ব্যাপারটাও হিন্দুজাতির সনাতন ধর্ম্মরক্ষার একতম উপায়। যাঁহারা ইহাকে সাময়িক প্রেরণা বা প্রতীচ্যের অনুকরণ বলিয়া উপেক্ষা করিবেন, ইতিহাসের সত্য কখনই তাঁহাদের প্রতি বৎসল হইতে পারিবে না।

হিন্দুজাতিটা বড় "একেলে" জাতি নহে। যুগে যুগে এই জাতিটার উপর দিয়া অনেক ঝঞ্ঝা, অনেক ঝটিকা, অনেক বজ্রবিভীষিকা চলিয়া যাইতেছে। তত্রাচ যে হিন্দুগণ আজও এ জগতে টিকিয়া আছে, তাহার মূল কারণ—ঐ বয়কট্। ঋষিগণ এই বয়কটের মধ্যেই আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বীজ দেখিতে পাইয়া ইহাকে সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন। ব্যাপকভাবে বিষয়টীর আলোচনার সৌকর্য্যার্থ কয়েকটী ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত ধরা যাক্। আমরা এ প্রবন্ধে বিষয়টীকে (১) হিন্দুধর্ম্ম, (২) হিন্দুসমাজ ও (৩) হিন্দুবাণিজ্য—এই তিনটী দিক দিয়া দেখিতে চেষ্টা পাইব।

প্রথমতঃ সমাজের কথা। প্রাচীন মহাভারতীয় যুগে হিন্দুসমাজের অবস্থা যে অত্যন্ত সমুন্নত ছিল, এ কথা, বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিবেন না। হিন্দুসমাজের উন্নতি বলিতে আমি হিন্দুদের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, পূজা, অর্চ্চনা প্রভৃতির উপর একটা সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী টানিয়া দিতেছি না। পক্ষান্তরে, তখনকার সমাজ বিপুলবিখোদার ভাবের সংমিশ্রণেই পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল, ইতিহাসেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পাচকের পর্য্যায় নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া

মহাভারতকার বলিয়াছেন,—ভারতীয় সূপকারগণের মধ্যে নাপিত-সম্প্রদায়ভুক্তগণই শ্রেষ্ঠতম। তখনকার ভোগবিলাসিগণ সাধারণতঃ এই নাপিতগণকেই পাচকরূপে নিযুক্ত করিতেন। ক্ষৌরকার ব্যতীত সমাজের ইতরশ্রেণীর অপরাপর বহুসম্প্রদায়ের নামও পাচকপর্য্যায়ে উল্লিখিত আছে। শ্রীরামচন্দ্র চণ্ডালিনী শবরীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়াছিলেন, কিম্বা সশিষ্য দুর্ব্বাসা ঋষি দ্রৌপদীর হস্তস্পৃষ্ট হাঁড়ির অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন—এই সকল ঘটনার মধ্যে কেহ কেহ ভগবানের ভক্তিভাগ-গ্রহণরূপ রূপকার্থ দেখিতে পাইয়া ইহাকে সামাজিক হিসাবের বাহিরে স্থান দিতে পারেন বটে; কিন্তু চাক্ষুষভাবে ইহার মধ্যে আমরা যে একটা অবিসংবাদী ছোঁয়াছোঁয়ী ভাবের পরিচয় পাই, কাহারই পক্ষে তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। গেল—ছোঁয়াছোঁয়ীর কথা,—তারপর খাদ্যাখাদ্যের বিচার। যে গোমাংসের নাম শুনিলে গোঁড়ার দল আজকাল কর্ণপটাহে অঙ্গুলি-সংযোজন পূর্ব্বক বিংশতি গজ দূরে সরিয়া যান, একদিন এই পবিত্র ভারতভূমে তাহাই অতিথিসৎকারের পক্ষে অত্যাবশ্যক উপকরণ বলিয়া গণ্য হইত। উইল্‌সনের প্রসাদে আজকাল বন্যকুক্কুট বা শ্বেতবরাহ যতই সুলভ হইয়া লোকের রসনার পক্ষে সুগম হইয়া উঠুক্ না কেন, একদিন আর্য্যাবর্ত্ত ইহাদের দুর্লভতা স্বীকার করিয়া রসনা-রস উদ্গীরণের সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিল না। আজকাল যে খাদ্যের গোপনাস্বাদ লইয়াও আমরা হুঙ্কার তুলিয়া বলি—'শ্রীবিষ্ণু! আমি কি ম্লেচ্ছাচারী হইব!'—এক সময়ে তাহাই উদর পোষণের সারভূত পদার্থ বলিয়া এদেশের ঋষিগণ প্রকাশ্য বিধি দিয়াছিলেন। বিবাহ-বাণিজ্যাদির অবস্থাও এইরূপই। এক সময়ে অসবর্ণ বিবাহ এদেশে শাস্ত্রানুমোদিত ছিল। সমুদ্রযাত্রা নিষেধ বলিয়া যে সকল ব্যক্তি শাস্ত্রের দোহাই দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, একটু শ্রম স্বীকার করিলে সেই শাস্ত্রের মধ্যেই তাঁহারা সমুদ্র-যাত্রার বিধি এবং তদ্‌প্রসঙ্গে সমুদ্রপথে গমনশীল বণিক ব্যবসায়ীর সহস্র কাহিনীর উল্লেখ দেখিতে পাইবেন।

এখন কথা হইতেছে,—যদি সবই ছিল, তবে আবার তাহা গেল কেন? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে, বয়কটই ইহার মূল কারণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীনকালে ভারতীয় সমাজ ছোঁয়াছোঁয়ী, খাদ্যাখাদ্য, বিবাহ, বাণিজ্য প্রভৃতির উপরে কৃপণ-সুলভ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে স্বতঃই কুণ্ঠিত হইত—পক্ষান্তরে, তখনকার সমাজের মধ্যে একটামাত্র পরিবারের ক্রিয়া-কলাপ, রীতি-নীতি যেন হাত-ধরাধরি, গা-ঘেষাঘেষি করিয়া বর্ত্তমান ছিল। কালধর্ম্মবশে সে সব আচার আচরণ একরূপ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেন যে লুপ্ত হইয়াছে—তাহার কারণ বাহির করিতে হইলে আমাদিগকে বৌদ্ধযুগের ইতিহাসের প্রতি নেত্রপাত করিতে হইবে।

বৌদ্ধযুগে ভারতে 'সহজিয়া' নামক এক প্রকার তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রচলন হয়। বৌদ্ধগণ এই তন্ত্রের উদ্ভব করেন। এদেশে ভৈরবী চক্র-সাধন নামে তন্ত্রাচারের যে পরিচয় পাওয়া যায়, সহজিয়া তাহারই প্রকারভেদ। এই তন্ত্রমতে সাধকগণকে যৌবনসম্পন্না রজকিনী, নাপিতিনী, বারবিলাসিনী প্রভৃতি কই প্রকার রমণীর মধ্যে যে কোন একটীকে

লইয়া বামাচার প্রণালীতে ধর্ম্মাচরণ করিতে হয়। একে যুনীসাহচর্য্য, তদুপরি তন্ত্রাচার —অল্পদিনের মধ্যেই সহজিয়া দেশের জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হইল। একদিকে হিন্দুধর্ম্মের কঠোর ব্রহ্মচর্য্য, অপরদিকে ভৈরবচক্রের সরস তন্ত্রাচার—একদিকে নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মসাধনের উগ্র তপস্যা, অন্যদিকে বামাচারীমতের বিলাস-ব্যভিচার, সহজদুর্ব্বল জনসাধারণের মতি সহজেই সহজিয়ার দিকে আকৃষ্ট হইল। দলে দলে লোক সহজিয়া ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়া উঠিল। ধর্ম্মের নামে দেশে দেশে ভীষণ ব্যভিচারের অনল জ্বলিয়া উঠিল। তখন কোথায় পড়িয়া রহিল ধর্ম্ম, আর কোথায় বা রহিল আচার, সকলেই ধর্ম্মের নামে অভিপ্রেত যুবতীলাভের আশায় সহজিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিল। এ পর্য্যন্ত ছোঁয়াছোঁয়ী, খাদ্যাখাদ্যের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা না থাকিলেও, ধর্ম্মের মধ্যে সজীবতা না থাকিলেও, ব্যভিচার ছিল না। এখন সেই ব্যভিচারই শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়া ছোঁয়াছোঁয়ী, খাদ্যাখাদ্য প্রভৃতিকে নিয়মিত করিতে চাহিল। যুনীর অঙ্গভেদ স্পর্শ করাইয়া খাদ্য গ্রহণ না করিলে ধর্ম্মসাধন হয় না—বেশ্যা ব্রাহ্মণকে, ব্রাহ্মণী চণ্ডালকে মুখের উচ্ছিষ্ট না খাইতে দিলে তন্ত্রাচারের বিশুদ্ধি রক্ষা হয় না—সহজিয়ামতাবলম্বী এই ভাব অন্তরে পোষণ করিয়া খাদ্যাখাদ্য, ছোঁয়াছোঁয়ী, রীতিনীতি প্রভৃতির মধ্যে একটা স্বাস্থ্যহানিমূলক উচ্ছৃঙ্খলতার প্রচলন করিতে চেষ্টা পাইল। ভাবাত্মক ধর্ম্মকে (positiveness) নষ্ট করিয়া অভাবাত্মক ধর্ম্ম (negativeness) প্রাধান্য লাভ করিল—সমস্ত সমাজটা যেন মত্ত মাতালের উদ্দাম নৃত্য তরঙ্গে হেলিতে দুলিতে লাগিল! 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'—এ বাক্য এতদিনে সার্থকতা লাভ করিল! স্থূল কথা, সহজিয়ার মধ্য দিয়া পাশ্চাত্য মেটিরিয়ালিজম্ রূপ পাপ আসিয়া এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

বিবাহবন্ধন ব্যাপারটা আরো কিছু গুরুতর হইয়া উঠিল। বামাচারীর আত্মীয়-অনাত্মীয় বিচার নাই—যে কোন প্রকারে ধর্ম্মসাধনার অঙ্গপূরণ হইলেই হয়! অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও, অপমৃত্যুর আশঙ্কায় যে হিন্দু সমাজ আত্মীয়-স্বজন, ভ্রাতা-ভগিনীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বিবাহ পদ্ধতি প্রচলন করিয়াছিলেন, তন্ত্রাচারীর হাতে পড়িয়া সে পদ্ধতি চূরমার হইয়া গেল। ভ্রাতা ভগিনী, লঘু-গুরু বিচার নাই,—বিবাহ বন্ধনটা যেন তখন যে-কোন-পুরুষ ও যে কোন-স্ত্রীলোককে লইয়া হইলেই হইত!—যেন ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার চালানো ভগবৎ-তপস্যারই অঙ্গ বিশেষ!! ভ্রাতা-ভগিনী, মাতা-পুত্রের পবিত্র সম্বন্ধের গুরুত্ব রক্ষা করিতে না পারায় যে পাপে মৈশরীয় ক্লিওপেট্রাবংশ অল্প দিনের মধ্যে নির্ব্বংশ হইয়া গেল, সেই পাপ ভারতে আসিয়া ঢুকিল। ভারতের বিবাহ-বিধি ঋষিদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয়—অসবর্ণ বিবাহের মধ্যে নিয়মিত ভাবে সেই বিজ্ঞানতত্ত্বই উপলব্ধি করা যায়। জীব-তত্ত্ববিদ্ জগতের জনসংখ্যার আদমসুমারী দেখাইয়া এখনো সাক্ষ্য দিবেন, দম্পতীযুগলের মধ্যে জাতিহিসাবে স্বামী স্ত্রীর নিম্ন শ্রেণীস্থ হইলে বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনা অত্যল্প—রক্তের সম্পর্কাধীন পুরুষ ও স্ত্রী দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হইলে সে পরিবারের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।* এই সকল বৈজ্ঞানিক কারণ

* য়ুরোপ এ বিজ্ঞানতত্ত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। সেদিন পত্রিকায় দেখিলাম, জর্ম্মণদেশীয় এক

থাকা সত্ত্বেও যখন বামাচারিগণ বিবাহের মধ্যে বিধি মানিতে প্রস্তুত হইলেন না, তখন ঋষিরা জনসংখ্যা লোপের আশঙ্কায় প্রমাদ গণিলেন।

বাণিজ্যক্ষেত্রেও এইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল। ভগবানের আশীর্ব্বাদে স্বদেশীর কৃপায় আজকাল কিছু কমিয়াছে—নহিলে কয়েক বৎসর আগে আমরাই, যে সকল বাঙ্গালী একবার শ্বেতদ্বীপে পদার্পণ করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই, বাঙ্গালী সমাজে ধরা দেওয়াটাই যেন অসভ্যতা মনে করিয়া, নেকটাইটা একটু কসিয়া বাঁধিয়া, চলিবার কালে পা দুখানি একটু ফাঁক করিয়া লইয়া হাসিতে-কাঁদিতে রুমাল উড়াইয়া বা চক্ষে দিয়া, সর্ব্বোপরি মাতৃভাষার 'ত' বর্গের দ্বীপান্তর দিয়া, আপনাকে 'স্বদেশ' হইতে একটু বিচ্ছিন্ন, একটু স্বতন্ত্র, একটু পৃথক করিয়া রাখিতে ভালবাসিতেন। রবিবাবু "নকলের নাকাল" প্রবন্ধে এই সকল 'বাঙ্গালী-সাহেব'দের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে সব কথা লিখিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। ভারতবাসী ভিন্ন দেশে যাইয়া বিকৃত-রুচি হইয়া এদেশে ফিরিয়া আসিবে—দৃশ্যটা ভারতের বসিন্দাদের চক্ষে বড় নয়নাভিরাম হয় বলিয়া, বোধ হয়, কেহই স্বীকার করিবেন না। (ভারতে পেট্রিয়টীজম্ ছিল না, অনেকে এ বাক্যের পোষকতা করিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ বিলাতফেরত স্বদেশবাসীর বিকৃত রুচি দেখিয়া আমরা—আমরা কেন, 'পেট্রিয়টীজম্' শব্দ শুনেন নাই, এমনতর আমাদের ঠাকুর দাদারা কি ইহাদিগকে দেশবন্ধু আখ্যা দিতে সম্মত হইতেন?—তাহা যদি না হয়, তবে পেট্রিয়টীজমের অভাব আমরা কিরূপে স্বীকার করিব?) প্রাচীন সময়েও যাঁহারা বাণিজ্য-যাত্রা করিতেন, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাইয়া তত্তৎ দেশের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি মজ্জাগত করিয়া লইয়া এদেশে ফিরিতেন। কিন্তু সেই মজ্জাগত আচার ব্যবহারের সমতা রক্ষা করিয়াও যে তাঁহারা চলিতে পারিতেন, এমন সম্ভাবনা ছিল না। কেননা, স্বার্থবাহিগণ কখনই একস্থানে বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। বাণিজ্য ব্যপদেশে এবৎসর এস্থানে, আর বৎসর সেস্থানে—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পর্য্যটন করা তাঁহাদের আবশ্যক হইত। ফলে, এক এক বৎসর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রীতিনীতি অনুকরণ করিতে যাইয়া ইঁহারা একটা খিচুড়ভাব লইয়া গৃহে ফিরিতেন। তাহাতে স্বার্থবাহী-দের আচার আচরণ স্বভাবতঃই ভারতের স্থায়ী বাসিন্দার রীতিনীতির প্রতিকূল হইয়া উঠিল। সেই সঙ্গে সমাজের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার উপক্রম হওয়ায়, ভারতবর্ষের খাঁটি সত্য-টুকু লোপ পাইবার সম্ভাবনা হইল। এবারও হিন্দুঋষিগণ ভবিষ্যবিপ্লবের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।

হিন্দুসমাজের অবস্থা যখন এইরূপ সঙ্কটা-কুল—যখন সহজিয়া তন্ত্রাচারীর অনাচারে, সমুদ্রযাত্রী স্বার্থবাহীদের প্রতিকূল আচরণে, ভারতীয় সমাজ, ভারতের বিশেষত্বটুকু হারাইয়া ফেলিতেছিল—অক্ষয় কবচের মত দেশীয় রীতিনীতি যে সমাজকে রক্ষা করিতেছিল, তাহা যখন বিজাতীয় ব্যভিচার রূপ শক্তি-শেলের আঘাতে সমাজের দেহচ্যুত হইয়া পড়িল, তখন আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য ঋষিগণ বিষ্ণুরূপ

ব্যক্তি ভ্রমক্রমে স্বীয় কন্যাকে বিবাহ করার রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছে—(ষ্টেটস্‌ম্যান, ২৮।৮।০৮)।

বয়কটকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া শক্তিশেল তাহারই অঙ্গে মিলাইয়া দেওয়ার উপায় বিধান করিয়াছিলেন। তখনই ব্যবস্থা হইল —খাদ্যাখাদ্য, ছোঁয়াছোঁয়ী, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, রীতিনীতি প্রভৃতির মধ্যে একটা বিধিবদ্ধ সঙ্কীর্ণতা প্রচলন করিয়া সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে—অন্যথা, আসন্ন প্রলয়ের আবর্ত্তমুখে পড়িয়া সকল প্রতিষ্ঠা—সকল বিধি অনিবার্য্য ভাবে লয়-প্রাপ্ত হইবে। ঋষিগণ দেশে দেশে ব্যবস্থা-পত্র জারি করিলেন—অমুক ক্রিয়া, অমুক আচার, অমুক রীতি এখন হইতে হিন্দুসমাজের বর্জ্জনীয় বলিয়া গণ্য হইবে—এই বর্জ্জনের দোহাই যিনি না মানিবেন, তাঁহার ঠাঁই এ সমাজে হইবে না। বৌদ্ধযুগ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে খাদ্যাখাদ্য, ছোঁয়াছোঁয়ী, রীতিনীতি, বিবাহ, সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতির মধ্যে যে বাঁধাবাঁধি নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে, তাহা এই বয়কটেরই ফল।*

বৌদ্ধ যুগে বিজাতীয় ব্যভিচার হইতে সমাজ-রক্ষাকল্পে হিন্দু মনীষিগণকে যে প্রচেষ্টা করিতে হইয়াছিল, সেই প্রচেষ্টারই দ্বিতীয় বারের অভিনয় ভারতে মুসলমান সম্রাটের রাজত্ব কালে হিন্দু ধর্ম্মক্ষেত্রে অভিনীত হইয়াছিল। মুসলমান সম্রাটগণের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু ধর্ম্মের উপর কিরূপ অত্যাচার করিতেন, ইতিহাসজ্ঞ মাত্রই তাহা জ্ঞাত আছেন। হিন্দু দেবতার নাক কাণ কাটা, শালগ্রাম শিলা দ্বারা বিলাস-কাননে পাদপীঠ রচনা করা, দেবমন্দিরের ইট খসাইয়া নৃত্যশালা তৈয়ার করা প্রভৃতি অবিচারমূলক কার্য্য করিতে অধিকাংশ মুসলমান সম্রাটই দ্বিধা বোধ করিতেন না, একথা এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলে, বোধ হয়, সত্যের অপলাপ করা হইবে না। মুসলমান রাজত্বকালে যে সকল "কালাপাহাড়' হিন্দু ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপের চিহ্ন আজও কিছু কিছু মক্কা বা কাশী হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে। যাউক্, এই মুসলমান যুগে হিন্দুধর্ম্মের অবস্থাটা যখন অসহনীয় ভাবে অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল, তখন আবার ঋষিগণ বয়কটের শরণাপন্ন হইয়া ধর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বলা বাহুল্য, সেইবারের বয়কটের ফলে আজও হিন্দুর পক্ষে মুসলমানের ছায়া মাড়ানো অশুচির হেতু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এইবার ঋষিগণ ঘোষণা করিলেন—এই সকল ধর্ম্ম-দ্বেষী উৎপীড়কগণ দেশের শত্রু, তাহাদিগকে তোমরা বর্জ্জন কর—সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন কর—এমন কি, তাহাদের ছায়া মাড়াইলেও স্নান করিয়া শুদ্ধ হওয়ার অপেক্ষা রাখিত। তৎসময়ের ঋষি-প্রচারিত বয়কটের ফলে তাই মুসলমান আজও হিন্দুর অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। (১) বৌদ্ধযুগে যে বয়কট

* এস্থলে অবশ্য দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, এই বয়কটের জের এই বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়া আমরা লাভবান হই নাই। সমাজরক্ষাকল্পে ঋষিগণ যাহা যুগধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাকে সনাতনধর্ম্ম ভাবিয়া কার্য্য করা আমাদেরই ভুল। লেখক।

(১) মুসলমান সম্প্রদায়ের নিন্দা করা আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। শুধু বয়কটের ইতিহাস অনুসরণ করিতে যাইয়া আমাকে এস্থলে এই সকল অপ্রিয় সত্য বলিতে হইতেছে। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মুসলমানগণ ভারত সম্পর্কে বৈদেশিক রাজা ছিলেন। সুতরাং তখন স্বার্থসাধন জন্য তাঁহাদের পক্ষে এদেশের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা স্বাভা-

সমাজ রক্ষা করিয়াছিল; মুসলমান যুগে তাহা পুনরায় ধর্ম্মরক্ষায় মুখ্য কারণ হইল।

বার বার তিনবার—এবার আমাদের বাণিজ্য লইয়া কথা। বাণিজ্যের হিসাব আগেও কিছু কিছু হইয়াছে—কিন্তু সে তো প্রলয়ের আশঙ্কায় অবিমিশ্র ভাবে রক্ষার উদ্দেশ্যে হয় নাই। বর্ত্তমানের—এই খ্রীষ্টীয় যুগের বয়কটের আরো একটু বিশেষত্ব এই যে, এবার ইহা জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ভারতীয় ব্যক্তিমাত্রেরই স্বার্থের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বয়কট-ইতিহাসের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ৩ই অধ্যায়ে আমরা দেখাইয়াছি যে, ইহাতে শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান ইহা অনেক ব্যাপাকভাবে ক্রিয়া করিবার জন্যই যেন প্রস্তুত হইয়া আসরে নামিয়াছে। ঘরে ভাত না থাকিলে মৃত্যুটা কেবল মাত্র হিন্দু কিংবা কেবলমাত্র মুসলমানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিবে না;—কাজেই এবারে বয়কট রক্ষা করিলে, আমাদের সকলকেই রক্ষা করিবে—ইহার মধ্যে ভারতের কীট-পতঙ্গেরও আত্মরক্ষার বীজ বর্ত্তমান রহিয়াছে। বৌদ্ধ ও মুসলমানযুগে সমাজ ও ধর্ম্মরক্ষাকল্পে একমাত্র হিন্দু যাহা করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টীয় যুগে এবার হিন্দু মুসলমান, পার্শী, জৈন, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকলে মিলিয়া তাহাকে কি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব না? যে অমোঘাস্ত্র আমরা আমাদের পিতৃপুরুষের নিকট হইতে উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার শক্তি সাধারণ নহে—একমাত্র হিন্দু যে শক্তি বলে এক সময়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, ভারতের সমবায় শক্তি মিলিত হইয়া সে শক্তি গ্রহণ করিলে প্রলয় উপস্থিত করিতে পারিবেন। তাই বলি, নিরাশার কারণ নাই,—বার বার তিনবার—এবার নিশ্চিত মন্ত্রের সাধন।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত।

প্রজাশক্তির অভ্যুত্থান।

আজকাল আমাদের দেশে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কেন্দ্রে কেন্দ্রে একটা বৈদ্যুতিক শক্তি স্ফুরিত হইয়া বহু দিনের নিদ্রিত জাতিকে নব চেতনায় উদ্বোধিত করিয়া তুলিয়াছে। অন্ধ তমসাচ্ছন্ন গগনে এক উজ্জল আলোকের দীপ্ত কিরণ-কণিকা প্রকাশিত হইয়া নির্জ্জীব ভারতবাসীকে কর্ম্মবীর করিতেছে। এই যে শক্তি, যে শক্তির বলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণ এক লক্ষ্যে, এক শক্তিতে আপনাদিগকে গ্রথিত করিয়া তুলিবার জন্য ব্যগ্র, তাহাকেই প্রজাশক্তি নামে অভিহিত করিলাম।

বিকই হইয়াছিল। রাজা প্রজার স্বার্থ বিভিন্নমুখী হইলে এরূপ সংঘাত উপস্থিত হইবেই। যাহা হউক, তখন ধর্ম্মরক্ষা কল্পে ঋষিগণ বিদেশী মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি যে বয়কট প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহা যুগ ধর্ম্মের ক্রিয়া মাত্র। অধুনা মুসলমান ভ্রাতাগণ ভারতের হিন্দুদের সহিত সমকার্য্যে, সম-উদ্দেশ্যে অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং এখনও তাঁহাদের প্রতি বৈদেশিকোচিত কঠোর ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে একান্ত অন্যায়। যুগধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্মের সহিত মিশাইয়া লইয়া অবিকৃতভাবে পূর্ব্বপুরুষের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলাই হিন্দু-সমাজের প্রধান গরজ। লেখক।

'প্রজাশক্তি' কথাটাকে যাঁহারা ভারতবর্ষে অসম্ভব এবং নূতন মনে করেন, তাঁহাদিগকে একবার প্রাচীন ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। প্রাচীন ভারতে রাজা ও প্রজায় অতিশয় ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল, সেকালে প্রজা যেমন রাজাকে জগদীশ্বরের অংশ বলিয়া মনে করিত, রাজাও তদ্রূপ প্রকৃতিপুঞ্জের মনস্তুষ্টির জন্য সর্ব্বতোভাবে তাহাদের অভাব অভিযোগ শুনিয়া, তাহাদের অভিপ্রায়ানুযায়ী রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কাজেই উভয়ের মধ্যে এক পবিত্র ভাব বিদ্যমান ছিল, সে সময়ে বর্ত্তমান কালের ন্যায় রাজা ও প্রজার খাদ্য খাদক সম্বন্ধ ছিল না। এক দিকে যেমন প্রজাশক্তি রাজশক্তির নিকট অবনত ছিল, অপর দিকে আবার রাজশক্তিও প্রজাশক্তির নিকট অবনত ছিল; এতদুভয়ের এই মধুর সামঞ্জস্যের সহায়তায় রাজকার্য্য সম্পাদিত হইত বলিয়াই প্রাচীন ভারতে অত্যাচার তিষ্ঠিতে পারিত না। সেকালের রাজন্যবর্গের প্রজাগতপ্রাণ ছিল, তাঁহারা, প্রজার মনস্তুষ্টির জন্য, প্রজার সুখ স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত, কোনরূপ স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতেই কুণ্ঠিত হইতেন না। রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রের সাধ্বীসতী জনকনন্দিনী সীতাকে বনবাস দেওয়া একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতের প্রজাশক্তির ক্ষমতার পরিচয়, অপর দিকে আবার তেমনি শ্রীরামচন্দ্রের প্রজা-বৎসলতার জলন্ত দৃষ্টান্ত। জগতের ইতিহাসে প্রজারঞ্জনের এইরূপ মহাদৃষ্টান্ত অতি বিরল।

রাজশক্তি চিরদিনই প্রজাশক্তির অধীন বা প্রতিনিধি মাত্র। রাজা কে? প্রজাবর্গ যাহাকে মনোনীত করিয়া নিজ নিজ ধন প্রাণ রক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছে, তিনিই কি রাজা নন্? প্রজাশক্তির সহায়তা ব্যতীত রাজশক্তির কখনই ভিন্ন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যিনি প্রজার অর্থে, প্রজার সাহায্যে আপনাকে পুষ্ট করিয়া, স্বার্থ ও প্রবৃত্তির বশে প্রকৃতিপুঞ্জের অভাব ও অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, নিজের স্বার্থপরতার দিকে অগ্রসর হন, উৎপীড়িত প্রজার অন্তর্নিহিত ক্রোধ-বহ্নি তাঁহাকেই ধ্বংস করিয়া ফেলে। বিধাতা মঙ্গলময়, তিনিও একজনের ব্যক্তিগত সুখ শান্তি অপেক্ষা কোটী কোটী নরনারীর অশ্রুবারিতে বিগলিত না হইয়া থাকিতে পারেন না, কাজেই ন্যায়ের প্রবল দণ্ডাঘাতে অত্যাচারী নৃপতির ছিন্ন মুণ্ড ধরা চুম্বন করে।

প্রাচীন ভারতের শাসন-নীতির আলোচনা করিলেও, সেকালে যে প্রজাশক্তির প্রাধান্য ছিল, তাহা অনুমিত হয়। তখনও বর্ত্তমান মন্ত্রী-সভার মতই একটা শাসন সভা বিদ্যমান ছিল। রাজ্যের প্রধান প্রধান জ্ঞানীবর্গ যে ব্যবহার-শাস্ত্র প্রণয়ন করিতেন, রাজাকে তাহারই সাহায্যে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে হইত। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে সেকালের রাজ্যশাসন-প্রণালী সম্বন্ধে যেরূপ লিখিত আছে, তাহা হইতে, অতি সহজেই, প্রাচীন ভারতের প্রজাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারা যায় এবং "প্রজাশক্তি" একথাটার উদ্ভব যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে আসে নাই, তাহাও সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। উহা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সেকালেও প্রজা শ্রেণীর সর্ব্ব সম্প্রদায়-ভুক্ত প্রতিনিধিবর্গ মন্ত্রীসভায় সমবেত হইয়া রাজার নিকট নিজ নিজ অভাব ও অভিযোগ প্রকাশ করিতেন,

কাজেই প্রজাশক্তির অভিপ্রায়ানুযায়ী রাজকার্য্য পরিচালিত হওয়ায় কোনও রূপ শাসন-বৈগুণ্য হইত না। সুদূর প্রাচীন কাল হইতে যে দুর্দ্দমনীয় প্রজাশক্তি ভারতে স্বীয় গৌরব-ধ্বজা চির উড্ডীন করিয়া আসিয়াছে, তাহা কি বর্ত্তমান ঝড়ঝঞ্ঝার অভ্যন্তর দিয়া পুনরায় আপন মহিমাময় গৌরব-আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না? পূর্ব্ব গগনে যে রক্তিম রশ্মি দেখা দিয়াছে, সেই তেজশক্তি একদিন যে প্রখরতায় ও পূর্ণতায় জয়যুক্ত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

বর্ত্তমান ভারতে, বহুদিনের পর, বাঙ্গালা দেশেই প্রজাশক্তির আবির্ভাব দেখিতে পাইতেছি। ভারতবাসী এতদিন পর্য্যন্ত নীরবে ইংরেজরাজের শত অত্যাচার অবিচার হজম করিয়া আসিতেছিল, ব্রিটিশ-সিংহের অপূর্ব্ব সম্মোহন গুণ প্রভাবে সম্মোহিত হইয়া তাহারা আপনাদের স্বীয় শক্তি এবং অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিল, তাহারা যে একটা ক্ষমতাশালী জাতির বংশধর, একথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতেও তাহারা কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু যে দিন লর্ড কর্জ্জন সমগ্র বঙ্গবাসীর কাতর ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বাঙ্গালা ভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিল, সেদিন সেই অশুভ মুহূর্ত্তে শোণিত-সিক্ত জননীর ব্যথিত বদনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, হতভাগ্য সন্তানগণের হৃদয়ে এক ঘৃণা ও প্রতিহিংসার প্রবল কালাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। পল্লী-জননীর স্নেহাঞ্চলাচ্ছাদিত ভদ্র ও চাষী হইতে আরম্ভ করিয়া, নগরের সৌধবাসী ধনাঢ্যের বিলাস-সুখ-পুষ্ট হৃদয়ে পর্য্যন্ত একটা ধিক্কার; একটা ঘৃণা, একটা দ্বেষ, একটা ক্ষীণ প্রতিহিংসা-বহ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিল। সেই শুভদিনে বাঙ্গালী জানিল ও বুঝিল, কবি যাথার্থই গাহিয়াছেন, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" কোটী কোটী কণ্ঠে যে আনন্দোল্লাস জাগিয়া উঠিল, একতার যে সুমহান্ শক্তি পুঞ্জীভূত হইল, তাহারি অদম্য তেজ প্রভাবে আজ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে কোটী কোটী নরনারীর হৃদয়ে একই সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। এই অভিনব প্রজাশক্তির অভ্যুত্থানে বাঙ্গালা দেশে যে একপ্রাণতা জাগিয়া উঠিয়াছে, আজ তাহা কেবল মাত্র বিশাল ভারতের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র বঙ্গদেশে আবদ্ধ নাই, তাহার মহান্ শক্তির ভৈরব-আহ্বান বাণী সুদূর পাঞ্জাব হইতে পৌরুষ কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে, শিবাজীর মাতৃভূমির অধিবাসীবৃন্দও তাহার সাড়া দিতে ছাড়েন নাই। মোট কথা, একই রাগিণী আজ সমগ্র ভারতের কুটীরে কুটীরে, পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে, দেশে দেশে জাগরিত হইয়া ভারতবাসীর নব সাধনায় মঙ্গলময় সিদ্ধির সূচনা করিতেছে। নির্জীব বলিয়া যাহারা ঘৃণিত ছিল, এখন তাহারা বুঝিতে পারিতেছে যে, আমরা ত সামান্য নই, আমাদের শক্তি ত কম নহে, আমাদের বাহু বলহীন নহে—আমরা মৃত্যুতে ভীত নহি, 'জুজুর' ভয় এখন পাঁচ বছরের ছেলের ভিতরও আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই যে একপ্রাণতা—এই যে সজীবতা, ইহার মূল কি? হে পাঠক! একবার আপনার মনকে জিজ্ঞাসা কর, উত্তর পাইবে। কি শুনিলে? অই শোন, হৃদয়-যন্ত্র তোমার সুর লয়ে গাহিতেছে, প্রজাশক্তি, প্রজাশক্তি, একতা একতা।

বঙ্গ ভঙ্গের দিন হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রজাশক্তির অভি-

নব উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বজ্রশক্তির পরিচয় পাইতেছি। আহিতাগ্নিক ঋষির ন্যায় যে প্রবল বহ্নি জলিয়া উঠিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট নানারূপ কঠোরতার সাহায্যে তাহা নির্ব্বাপিত করিতে যাইয়াও কৃতকার্য্য হইতেছেন না, বরং উহা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। শুভ মুহূর্ত্তে যে মঙ্গল বীজ রোপিত হইয়াছিল, এখন তাহা পুষ্ট রূপে অঙ্কুরিত হইয়াছে।

সাধারণত প্রজাশক্তি, রাজশক্তির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে, অভ্যুত্থিত হয়। যখন রাজশক্তি প্রজার মঙ্গল সাধনে বিমুখ হন, যখন প্রজার কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া, প্রজার হৃদয় কুলীশ-কঠোর-রূঢ় বচন-বাণে বিদ্ধ করিয়া, পাশবিক শক্তির সাহায্যে স্বকীয় প্রভুত্ব জাহির করিতে অগ্রসর হন, সে সময়ে, সেই অরাজকতার সময়ে, প্রজা আত্মরক্ষার জন্য আপনার সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারে না। সে সময়ে প্রজা আপনিই আত্মরক্ষার ভার গ্রহণ করেন, তখন সেই সমবেত শক্তিরূপ প্রলয়ের ভীষণ বহ্নি কামান-ভেরীর ভয় রাখে না, কাহারও সাহায্য চাহে না, আপনার তেজে আপনি জলিয়া সমুদয় অত্যাচার অবিচার ভস্মীভূত করিয়া আপনার গৌরব-সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এই যে তেজ, এই যে শক্তি, এই যে বহ্নি, এই যে বাতাস, তাহার শক্তি অপরিমেয়, কেহ বলিতে পারে না যে, কোন্ মহাশক্তি দ্বারা ইহা অলক্ষ্যে পরিচালিত হইয়া সমুদয় বাধা বিঘ্ন চরণে দলিত করতঃ আপনার স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাপ্ত করিয়া দেয়।

এক দিনে কি ইহা জাগিয়াছে? তাহা কখনই নহে। যে দিন হইতে বয়কটের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সিংহ কেশর ফুলাইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন, যে দিন হইতে হিন্দু মুসলমানে ভেদ-বুদ্ধি ঘটাইয়া মুসলমান গুণ্ডা কর্ত্তৃক হিন্দু রমণীর সতীত্ব হরণ করাইয়া, নিরীহ হিন্দুর বাসা লুণ্ঠন করাইয়া হিন্দুকে বিপন্ন করাইতে আরম্ভ করিলেন, উৎপীড়িতদের জন্য সাহায্য প্রেরণ করিবার পরিবর্ত্তে শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ এবং প্রতিমা চুর্ণের পরিবর্ত্তে দ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, সেদিন হইতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রজাশক্তি মিলনের যে শুভ আহ্বানে জাগরিত হইয়া উঠিল, আজ কেন্দ্রে কেন্দ্রে তাহাই দেদীপ্যমান—এখন প্রজাশক্তির প্রতিনিধিরা রাজশক্তির চোখ রাঙানিতে ভয় পায় না। এখন তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহাদেরও পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইবার শক্তি আছে, তাই আজ শ্বেত-দ্বীপবাসিগণের স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত পড়ায় মহা কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে, বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে, কাহার সাধ্য তাহা না শুনিয়া থাকিতে পারে? পাঞ্জাবের জলকরের নির্য্যাতনে শিখ-প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়-নিহিত শক্তির যে চঞ্চল বিদ্যুৎ খেলা ঝলকিত হইয়াছিল, তাহার ভাবী বিপদাশঙ্কায় সর্দ্দার অজিত ও লাজপতরায় নির্ব্বাসিত হইয়া কিছু দিন যন্ত্রণা ভোগ করিলেও, প্রজাশক্তিরই জয় হইয়াছে, ব্রিটিশ সিংহের সাধ্য হয় নাই যে, পঞ্জাববাসীর প্রার্থনা উপেক্ষা করেন। তাই সেখানকার জলকর উঠিয়া গিয়াছে। এই যে প্রজাশক্তির প্রথম বিজয়-দুন্দুভি বীরভূমি পঞ্চনদ হইতে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, ইহা যে একদিন সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, ইহা কি তাহার প্রথম সূচনা নহে? ট্রান্সভালে মিঃ গান্ধি সমগ্র ভারতীয় প্রজার

মুখপাত্র রূপে যে অকপট স্বদেশ-প্রেম ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও কি প্রজাশক্তির বিজয়-কাহিনীর অন্ততম নিদর্শন নহে?

যাঁহারা মনে করেন, ভারতের ন্যায় বিভিন্ন-দেশবাসী, বিভিন্নভাষী ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে কখনও একতা হইতে পারে না, যদি একতাই না হয়, তবে প্রজাশক্তি কিরূপে বিকাশ পাইবে? একথা যাঁহারা ভাবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভুল বুঝিয়াছেন। এখন লোকে জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ প্রভৃতি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহে না। মহান্ আদর্শের নিকট ক্ষুদ্র আদর্শ, ক্ষুদ্র চিন্তা লয় পাইয়া গিয়াছে, তাই রাজশক্তির সম্মোহন-শক্তি প্রভাবে সম্মোহিত হইয়াও,হিন্দু-মুসলমান-শিখ-মারাঠি বাঙ্গালী-বেহারী-দ্রাবিড়ী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ট্রান্সভালে গবর্ণমেণ্ট যখন হুকুম করিলেন যে, ভারতবাসীদিগকেও দাগি বদমায়েসের মত অঙ্গুলির ছাপ দিয়া প্রত্যেকের নাম রেজেষ্টরী করিতে হইবে, সে দিন সেখানকার সমগ্র ভারতবাসী উক্ত আইনের বিরোধী হইলেন, এবং সমুদয় প্রজাশক্তির মূল কেন্দ্র রূপে আইন অমান্য করিয়া পণ্ডিত রামসুন্দর জেলে গমন করতঃ যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কি আমাদের বিজয়ের শুভ ঘোষণা নহে? অত্যাচার উৎপীড়ন হইতেছে বলিয়াই,প্রজাশক্তির সঙ্গে সঙ্গে, শত শত রামসুন্দরেরও বিকাশ হইতেছে। মাতৃভূমির প্রতি প্রীতি ও সুখ দুঃখের সহচর সহোদর প্রজাবৃন্দের শক্তির ঐন্দ্রজালিক তেজে পরিচালিত হইয়াই ৬৪ বৎসরের বৃদ্ধ মৌলবী লিয়াকৎ কার্গীল জজের সমক্ষে বীরদর্পে বলিয়াছেন "আমার মত ভাগ্যবান কে? কারণ আজি দেশের কাজে জেলে যাইতেছি।" এই যে পৌরুষবাণী, এই যে জলদ মন্ত্র, ইহার মধ্যে কি কোটী কোটী হৃদয়ের প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠে নাই? এই বাণী কি একা বৃদ্ধ মৌলবীর? কখন নহে—কখন নহে। উহার সহিত সমগ্র ভারতবাসীর গভীর স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। পূর্ব্বে কি, এমন কি, দশ বৎসর আগে কি কেহ এমন বীরদর্পে ফিরিঙ্গী জজের সমক্ষে নির্ভীক হৃদয়ে কিছু বলিতে পারিয়াছে? একজনের হৃদয়ে কি এত শক্তি জাগে?

পূর্ব্বে যেমন ভারতবাসী ঘুষি খাইয়া ঘুষি হজম করিত, তাহার কারণ এই ছিল যে, একজনের মর্ম্মবেদনায় অপরের হৃদয় কাঁদিত না, একের নয়নজলে অপরের হৃদয় গলিত না। কাজেই উৎপীড়িত ব্যক্তি মরমে মরিয়া আপনা আপনি নিজ নিজ অত্যাচার হজম করিত। তখন—

ঘুষি খেয়ে ঘুষি হজম ক'রে থাকা,
শালা ড্যাম শুনে ঘন সেলাম ঠুকা।—

রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেদিন এখন চলিয়া গিয়াছে, এখন একজনের অত্যাচারে সমগ্র ভারতবাসী মর্ম্মবেদনা অনুভব করে, তাই অজিত সিংহ ও লাজপত রায়ের নির্ব্বাসনে, সুশীলের বেত্রাঘাতে,সমগ্র ভারতবাসী যেমন মর্ম্মাহত হইয়াছে, আবার তেমনি, ভূপেন্দ্রনাথের ও বিপিনচন্দ্রের নির্ভীকতায় গৌরব অনুভব করিয়াছে। ব্যক্তিগত সংকীর্ণতা ও জাতিগত ক্ষুদ্রত্বের বাঁধ যতই দূর হইতেছে, ততই এক মহান একপ্রাণতার সহিত, জাতীয় জীবনে বৈদ্যুতিক প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজনীন প্রেম জাগিয়া উঠিতেছে।

ভারতে প্রজাশক্তির যে ক্ষীণ-জীবনী-

শক্তি প্রকাশিত হইতেছে, তাহা পূর্ণাবয়বে সফলতার দিকে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে এখন বহু বাধা বিদ্যমান। বহুদিনের পরাধীন জাতির মধ্যে কোনও শক্তি বিদ্যমান থাকিলেও, সহসা তাহা প্রকাশিত হইতে পারে না, বিশেষতঃ এরূপ ক্ষীণশক্তি যে অল্পসময়ের মধ্যেই, ভাগীরথীর প্রবল স্রোতাভিঘাতে মত্ত ঐরাবতকে যেরূপ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, তদ্রূপ, প্রবল রাজশক্তিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে,এইরূপ কল্পনা করাও বাতুলতা মাত্র। আমরা যাহা চাই, তাহা পাইতে হইলে যে কত অত্যাচার ও অবিচার শির পাতিয়া লইতে হইবে, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ভারতবাসী জনসাধারণ তাহা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। ভারতে প্রজাশক্তি বল সঞ্চয় করিতে পারিলে যে প্রকৃতিপুঞ্জের একমাত্র অভিপ্রেত স্বায়ত্ব শাসন-প্রণালী লাভ করিতে পারিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতে কত অন্তরায়! প্রথমতঃ একথা ঠিক্ যে, ইংরাজ কথনই নিজ স্বার্থে কুঠারাঘাত করিয়া প্রজাশক্তির অভিপ্রেত স্বরাজ বা স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী প্রদান করিবে না, কারণ, তাহারা পাশবশক্তির প্রভাবে যে বিশাল সাম্রাজ্য ও তাহার সুখ সমৃদ্ধির অধিকারী হইয়াছে,পাছে তাহা কোনও রূপে হস্তান্তরিত হয়,এই আশঙ্কাই তাহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরুক আছে। তাই প্রজাশক্তির ক্ষীণ-অভ্যুত্থানের শুভ সূত্রপাতেই ইংরেজ অত্যাচার-নীতির অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কারণ ইংরেজ ইহা জানে যে, প্রজাশক্তি যদি আপনার বাহুবলে একবার মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে রাজশক্তি আর বেশীদিন তিষ্টিতে সক্ষম হইবে না। প্রজাশক্তির ব্যাপক মহিমার প্রকৃত গভীরতা উপলব্ধি করা বৈদেশিক নরপতির পক্ষে সহজ হইবে না বলিয়াই,জাগ্রত প্রজাশক্তির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ-সিংহের এত তর্জ্জন ও গর্জ্জন। কিন্তু তাঁহারা ইহা ভুল বুঝিয়াছেন। পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর ভীষণ জলবেগ কয়দিন উপলখণ্ড রোধ করিতে পারে? শক্তি জাগ্রত হইলে তাহার রোধ অসম্ভব। তেমনি, যে প্রজাশক্তি মাথা তুলিতেছে, তাহার তীব্রগতি কঠোর শাসনে নিবারিত হইবে না। গবর্ণমেণ্ট দিন দিন যতই কঠোর শাসন-নীতির প্রচলন করিতেছেন—প্রজাশক্তি ততই জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। এবং এইরূপ জাগ্রত হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু এখন কথা হইতেছে যে, এই জাগরণকে আমরা কিরূপে দৃঢ় করিতে পারি? এবং কিরূপে সর্ব্বত্র ইহা ব্যাপৃত হইতে পারে? সে চিন্তাই আমাদের এখন সর্ব্বপ্রধান হওয়া উচিত। এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের আন্দোলন ও আলোচনা কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই বদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু এইরূপ ভাবে উহা বদ্ধ থাকায় চারিদিকে একটা গভীর আন্দোলনের সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। শিক্ষিত সম্প্রদায় যে "স্বরাজের" আলোচনায় মাথা ঘামাইতেছেন, জিজ্ঞাসা করি,তাহা কি তাঁহাদের প্রতিবেশী দীনুমণ্ডল বা হামির সেখ বুঝিতে পারে? যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা সুদূর পল্লীপ্রান্তস্থিত কৃষক ভাইটীর সহিত আমাদের শিক্ষালব্ধ জীবনের গভীর জ্ঞান বিজ্ঞানের একত্র সমাবেশের পথটাকে প্রশস্ত করিতে পারিব—ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের এই প্রজাশক্তির অভ্যুত্থানটাকে মঙ্গলের চক্ষে দেখিলেও, উহার পূর্ণব্যাপকতায় প্রকৃতশক্তির মহিমা ও গৌরব যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব না।

দেশের শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে এবং কৃষক শ্রেণীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবার দীর্ঘকাল সঞ্জাত হীন-প্রবৃত্তিটাকে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিয়া, যেদিন হইতে উদার সহৃদয়তার সহিত ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে শিখিব, সেদিন হইতে প্রকৃত স্বরাজের মঙ্গল উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার আশা স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে। ছোট বলিয়া কাহাকেও মনে করা উচিত নহে। এখনও যে দেশের চারিদিক হইতে একপ্রাণতার মঙ্গল-কোলাহল পূর্ণ-রূপে উত্থিত হইতেছে না, তাহার কারণ এই যে, দেশের নিম্নশ্রেণীস্থ জন-সম্প্রদায় এখন পর্য্যন্ত আমাদিগের উপর পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছে না। যাহাদিগকে চিরদিন ঘৃণার কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়াছি, সহসা তাহাদের প্রতি প্রীতির ভাষা প্রয়োগে তাহারা ভাবিতেছে, নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে আমাদের কোনও স্বার্থ নিহিত আছে, নতুবা এতদিন পরে এই প্রীতির ভাব কেন? তাহা-দের এই অন্ধবিশ্বাসটাকে দূর করিতে হইলে, মৌখিক মধুর ভাষার পরিবর্ত্তে, প্রকৃত কর্ম্ম-নিষ্ঠার ন্যায়, প্রত্যেক বিষয়ে সহানুভূতি দ্বারা ও কার্য্যদ্বারা আপনার করিয়া লইতে হইবে। কর্ম্মজ্ঞান-বিহীন যাঁহারা,তাঁহাদের মনে স্বাভা-বিক একটা একগুঁয়েমি ভাব থাকে,সেই বেগ টাকে যেদিকে চালনা করা যায়, তাহাতেই মঙ্গল ফল ফলে। তাহাদিগকে দেশের শুভাশুভের ভাবটা যদি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারা যায়, তবে যে শুভ ফল ফলিবে, একথা নিশ্চিত। জাতীয় উন্নতির প্রকৃত মূল, শিক্ষা। যে জাতি যত উন্নত, তাহার শিক্ষার প্রসারতাও তত বেশী। এই যে জাপান আজ উন্নতির চরমশিখরে আরোহণ করিয়াছে, ইহার মূলও কি শিক্ষা নহে? জাপানে শতকরা ৮০.৯০ জন শিক্ষিত, আর আমাদের দেশে শতকরা দশ পনের জন মাত্র শিক্ষিত। কাজেই আশানুরূপ প্রজাশক্তির অভ্যুত্থান হইতেছে না বলিয়া আক্ষেপ করি-বার কোনও কারণ নাই। দেশটাকে প্রকৃত উন্নতির দিকে উত্থিত করিতে হইলে, দেশের ছোট বড় সকলের প্রাণ একসুরে বাঁধিতে হইবে। দীর্ঘকাল-সঞ্জাত অলসতা ও কুপ্রথা গুলিকে দূর করিয়া নবতন্ত্রের নবশিক্ষায় ও দীক্ষায় চারিদিকে জাগরণের শুভবন্দনা-গীতি না গাহিলে চলিবে কেন? যাহা প্রাচীন তাহাই শুভ, এ কথাটাকে ভুলিতে হইবে। দেশ-কাল পাত্রভেদে নানাবিধ পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, একথা অস্বীকার করিবার কি কোন কারণ আছে? আমাদের মনে হয় যে, নিম্নলিখিত পন্থানুসরণ করিলে প্রকৃত স্বরাজের শুভ অনুষ্ঠানের মঙ্গল ভেরী শীঘ্রই বাজিয়া উঠিবে। (১) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তৃতির উপায়,(২) গ্রামে গ্রামে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া কৃষকদিগের শিক্ষা প্রদান। (ক) কৃষির বিবিধ নূতন তথ্য বিবৃতি, আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন, পাট অপেক্ষা ধান চাষের আবশ্যকতার বিষয় যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া ইত্যাদি। (খ) সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্ম জ্ঞাত করান। (৩) প্রতি গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন এবং নানাবিধ শিল্প শিক্ষার বন্দোবস্ত করা। (৪) যাহাতে সর্ব্বশ্রেণীর বালকগণ প্রতি গ্রামে অন্ততঃ প্রাইমারী শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে বিদ্যালয় স্থাপন (৫) জাতি-ভেদের সংকীর্ণতা ভুলিবার চেষ্টা। অন্ততঃ নমঃশূদ্র এবং অন্যান্য নিম্নশ্রেণীস্থ জাতিগণ, যাহারা হিন্দু সমাজ কর্তৃক লাঞ্ছিত হইতেছে, তাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করা সঙ্গত

হইলে, তাহাদিগকে জলাচরণীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা কর্ত্তব্য। যদি মুসলমানের সহিত বংশ পরম্পরায় সম্বন্ধযুক্ত রাজপুতগণকে পুনরায় হিন্দু-প্রাধান্য-পূর্ণ রাজপুতনার ক্ষত্রিয়গণ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সমাজে তুলিতে পারেন, তবে নমঃশূদ্রবৃন্দকে একটু উন্নতির দিকে টানিয়া আনিলে সমাজের হিত ব্যতীত কোনও প্রকার অহিতই হইবে না। দেশের মঙ্গলের জন্য হৃদয়কে প্রশস্ত করাই কর্ত্তব্য, সংকীর্ণতা শ্রেয়ঃ নহে। মোট কথা

"যাহা শুভ যাহা ধ্রুব
তাহাতেই কর দেহপাত।"

(৬) প্রতি গ্রামে গ্রামে সালিসি-মণ্ডপ স্থাপন করিয়া মোকদ্দমা হ্রাসের চেষ্টা। আমার মনে হয়, যে সকল উপায়ের কথা আমরা বিবৃত করিলাম, এ সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে আর্থিক কিম্বা অন্য কোনও বিষয়ের বাঁধাই থাকিতে পারে না। আর এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত স্বাবলম্বনেই সম্পাদিত হইতে পারে, সে সব কথা ভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

যদি এইরূপ ভাবে, শুধু বক্তৃতা ও কাগজে লম্বা লম্বা প্রবন্ধ লিখার পরিবর্ত্তে, প্রকৃত কর্ম্মের দিকে আমরা অগ্রসর হই, তবে প্রজাশক্তির অপ্রতিহত গতি রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও হইবে না। বর্ত্তমানে আমরা দলিত হইতেছি বটে, কিন্তু চিরদিন যে দলিত হইব, এইরূপ কল্পনা করাও বাতুলতা মাত্র। ঐ দেখ, যে তুরস্ক-সুলতান একদিন রাজন্য শক্তির প্রভাবে প্রজাবৃন্দকে লাঞ্ছিত করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না, এখন তিনিই আবার সমবেত প্রজাশক্তির দুর্দ্দমনীয় শক্তি ও তেজের নিকট পরাভূত হইয়া আপনার গর্ব্বিত শির নত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যে রাজন্য শক্তি এখন আপনাকে অপ্রতিহত ভাবে পরিচালিত করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে আমিদিগকে লাঞ্ছিত ও দলিত করিতেছে, একথা নিশ্চয় যে, একদিন সেই রাজশক্তির বিজয় পতাকা প্রজাশক্তির শুভ অভ্যুত্থানে ধরণীতে লুণ্ঠিত হইবেই হইবে। আমার মনে হয় যে, খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া ইংরেজকে গালি দেওয়া ও বৃথা আস্ফালনের পরিবর্ত্তে, ধীর ও সংযত ভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া শক্তি সঞ্চয় করিলেই আমাদের সফলতার কণ্টকাকীর্ণ পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসিবে। নিরাশার অন্ধকার বর্ত্তমান সময়ে চতুর্দ্দিকে ঘনীভূত হইয়া আসিলেও, উহার অন্তরালে যে নব গৌরবে গর্ব্বিত প্রভান্বিত দীপ্ত সূর্য্য বিরাজিত আছে, সেকথা ভুলিয়া যাওয়া অন্যায়। আমাদের তরী সাগর বক্ষে যখন ভাসিয়া চলিয়াছে, তখন আর ঝটিকার প্রবল আক্রমণ ও তরঙ্গ-পীড়নের ভয় করিলে চলিবে কেন? পাড়ি জমাইয়া তুলিয়া এখন ফিরাইবার চেষ্টা করা ধৃষ্টতা নয় কি? তৎপরিবর্ত্তে কর্ণধার যাহাতে ঠিক থাকে এবং নৌকা যাহাতে একলক্ষ্যে মোক্ষ পথ ধরিয়া ধীর গমনে প্রকৃত স্থানে পঁহুছে, সে বিষয়ে যত্ন করাই কর্ত্তব্য। ধীরতাই কৃতকার্য্যতার মূল, একথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই, ইহা সর্ব্বদা আমাদের স্মৃতি-পথে জাগরুক রাখা কর্ত্তব্য। দুর্ব্বলের সহায় ভগবান, ভয় কি? আর নিষ্ঠার সহিত সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ হইবেই হইবে। কবির কথায় বলিতে গেলে,

"যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে।
বারেক নিরাশ হ'য়ে কে কোথায় পড়ে॥
তুফানে পড়েছি কিন্তু ছাড়িব না হাল।
আজিকে বিফল হ'লে হ'তে পারে কাল॥"

ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

কামরূপ।(১)

পরিভ্রমণের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পদব্রজে ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য। গৌহাটি হইতে তুরঙ্গযুগল দ্বারা আকৃষ্ট গিরি-যানে কায়ক্লেশে উপবেশন করিয়া তিলশৈল অভিমুখে ধাবিত হইলাম, রক্তিম পথ ক্রমে উচ্চে প্রসারিত। বঙ্কিম নহে। ভূধরের বিশেষ বৈচিত্র্য দৃষ্টি হইল না, পথ সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত গারোজাতীয় নরনারীর মলিন বর্ণে আসামের কালাজ্বরের প্রকোপ চিত্রিত,বোধ হইল। তৃতীয় প্রহরে শিলং রাজধানী সন্নিহিত হইলে হিমশৈল-পরিচায়ক সূত্রবৎ পত্রগুচ্ছে মণ্ডিত বহুশাখা-সমাচ্ছন্ন দীর্ঘ সরল বৃক্ষের প্রাচুর্য্যসহ গ্রীষ্ম ঋতুতে শৈত্য সমুপস্থিত। সিমলা যেমন কেলুবৃক্ষ-প্রধান, তিলশৈল তেমনি সরলতরু প্রধান স্থান। সমুদ্রতল হইতে ৪০০০ চার হাজার ফিট ঊর্দ্ধে জয়ন্তি পর্ব্বত মধ্যে এই নগর স্থাপিত। খস জাতি এখানকার দর্শনীয় বিষয়।

সত্যশ্রবা কহিয়াছেন, 'আসাম প্রকৃতির কাম্যকানন।" শেট সাহেব কহেন, "তদ্ভিন্ন এই দেশ বিবিধ কারণে চিত্তাকর্ষক।" ভারতবর্ষের দক্ষিণ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পশ্চিম সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত, উত্তর দিক হিমালয় কর্ত্তৃক সুরক্ষিত; এসিয়ার অপর ভাগ হইতে উপনিবেশী দলের প্রবেশ-পথ কেবল উত্তর পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব্ব সীমা গিরিসঙ্কটে বিদ্যমান আছে। আর্য্য, গ্রীক, হুন, পাঠান, মোগল পশ্চিমের পথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছেন। পূর্ব্ব হইতে কামরূপের পথে পশ্চিম চীনের মঙ্গোলিয় জাতি প্রবিষ্ট হইয়াছে। দ্রাবিড় জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া মঙ্গোলিয়গণ পূর্ব্বতন দেহ,ভাষা ও ধর্ম্মে ভিন্নভাব প্রাপ্ত হওয়ায় আহোমিয়া ও বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান জাতি নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছে। সেই মঙ্গোলিয়দিগের কিয়দংশ অমিশ্রভাবে খস ও জয়ন্তি পর্ব্বতে জাতিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহারা পূর্ব্বভাষা ও ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছে, বর্ত্তমান কোন ভাষার সহিত উহার একতা নাই। খস জাতির ন্যায় অমিশ্র মঙ্গোলিয় শোণিত কামরূপে স্থল বিশেষে হিন্দুর মধ্যে বিদ্যমান থাকার প্রমাণ মুখাকৃতিতে ব্যক্ত দেখিলাম। ভারতে ইতিহাস রক্ষার পদ্ধতি নাই বলিলেই হয়, কিন্তু আহোমজাতি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে রাজকথা সুন্দর রূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছে। আসামে মুসলমান অর্দ্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত পতাকা প্রোথিত করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। বঙ্গ সমতট নামে খ্যাত থাকায়, পর্ব্বত-সঙ্কুল প্রাগ্‌জ্যোতিষ অসমপদবাচ্য হইয়া থাকিবে, এরূপ অনুমান এখন আর কেহ করেন না। আহোম শব্দ হইতে আসাম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

পথে বহির্গত হইয়া বাঙ্গালী ও আসামিতে ভেদ কি, লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। বৈচিত্র্যের মধ্যে কেবল তাম্বুল-চর্ব্বণকারিণী দিব্যবসনা পৃষ্ঠন্যস্ত-ভারাবরোহিণী-বিশিষ্টা খস নারীকুল দৃষ্ট হইতেছিল। তাহাদের স্বাভাবিক বর্ণ পীত হইলেও, প্রায়সঃ কিঞ্চিৎ মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, মুখশ্রীতে সৌন্দর্য্য বস্তুটা অবশ্য আছে, কটিবস্ত্রের উপর দুইখানি রঞ্জিত উত্তরীয় গ্রীবা হইতে পাদ পর্য্যন্ত বক্ষঃ-

পৃষ্ঠ আবৃত করিয়া বিপরীতদিকে আনত। শিরোরুহ আচ্ছাদনে অন্য এক খণ্ড বস্ত্র প্রয়োজনীয় হইয়াছে। নরপুঙ্গবেরা ধুতি ও কোট ভিন্ন বস্ত্র কুঞ্চিত করিয়া বঙ্কিমভাবে উষ্ণীষ ধারণ করেন। রাবণ রায়, বুদ্ধদেব বাবু প্রভৃতি যাঁহার নাম, তিনি খাসি ভাষায় লিখিবার সময় রোমান অক্ষর ব্যবহার করিবেন। আত্মশক্তি প্রকাশের অবসর পাইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের বর্ণমালাকে অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় যাজকদিগের প্রভাব আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বিশ্বপ্রেমে উন্মুখীন করিয়াছে। স্বর্গীয় একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বিহারী রায়, তাঁহার স্বজাতীয় খসগণ যাহাতে হিন্দু বা খ্রীষ্টান না হন, তজ্জন্য প্রয়াসী ছিলেন। প্রেতগণ খাসিদিগের বিশেষ দেবতা। দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য খসনেতা খাসিদিগকে শিক্ষিতের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন।

বিশ্বাসকে মূলভিত্তি না করিলে ঐহিক বা পারমার্থিক কোন কার্য্য চলে না, এবিষয়ে বন্য ও সভ্য ব্যক্তিকে এক শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে হয়। অশিক্ষিত ও শিক্ষিতে ভেদ আছে; অশিক্ষিত ব্যক্তি সহসা একটী সামান্য বিশ্বাসে উত্তীর্ণ হইবে, শিক্ষিত লোক তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করতঃ শেষ কালে নিজের বিশ্বাসানুযায়ী কোন স্থানে উপনীত হইবেন, তাহা যে অসত্য হইতে পারে, তাহা অন্যে বুঝিবে, তিনি বুঝিবেন না। ফলে উভয় শ্রেণীর প্রত্যয়ের মূলে এক বিশ্বাস বিদ্যমান। বলবানের নিকট দুর্ব্বল, জ্ঞানীর নিকট মূর্খ যে জন্য নত হয়, তদধিক ক্ষমতাপন্ন প্রকৃতির সন্নিধানে মনুষ্য, সেই কারণে, অনন্যোপায় হইয়া নির্ভরশীল হয়। যে অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতার নিকট পরাভূত হইতে হইল, তাহার প্রকার ভেদকে পৃথক বোধ করিয়া সামান্য লোকে নানা দেবদেবী, গুরু, মহাপুরুষ ও অবতারের স্মরণ লয়। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ নানার পরিবর্ত্তে এক সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরমেশ্বরকে স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করেন, তাঁহাদের বিবেচনায় যাহা কিছু ভাল, সমস্তই তাঁহাতেই আরোপ করা হয়, জ্ঞানী ও সামান্য লোকে এইমাত্র প্রভেদ। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অস্থিত্ব সম্বন্ধে পর্য্যন্ত মতভেদ আছে, এক শ্রেণীর লোক জগৎ-নাস্তিক, আর এক শ্রেণীর লোক জগৎ-আস্তিক; জগৎ-নাস্তিককে মায়াবাদী ও জগৎ-আস্তিককে জড়বাদী বলিতে পারা যায়। উভয়েই অদ্বৈতবাদী। জগৎনাস্তিক কহেন, বাহ্য ও অন্তর্জ্জগত দুই এক, কতকগুলি খণ্ড প্রত্যয়ের সমষ্টি; ক্ষণিক অনুভূতি মাত্র, তাহার প্রকৃত সত্বা নাই। জগৎ-আস্তিক বিবেচনা করেন, জড়জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ বিভিন্ন নহে; অঙ্গারকণিকা গতিযুক্ত হইলে তাপ জন্মে, মস্তিষ্ককণিকা গতিযুক্ত হইলে হর্ষ বিষাদ উপস্থিত হয়। পরমাণুর প্রকৃত সত্বা আছে। আস্তিক ও নাস্তিক উভয়েই চেতনাকে একই সামগ্রী, তাহা সত্য বা মিথ্যা হউক, বিভিন্ন আকার জ্ঞান করে। আকাশ চিৎ বা জড় হউক, তাহার প্রকৃত সত্বা থাকুক বা না থাকুক, উহাকে সর্ব্বব্যাপী বোধ হইতেছে। মনুষ্য একোন্মুখী চিন্তা দ্বারা যোগবলে আকাশে তরঙ্গ উৎপাদন করাইয়া, এক মস্তিষ্ক হইতে অন্য মস্তিষ্কে চিন্তা চালাইতে পারে, সর্ব্বজ্ঞ হয়, অন্যকে অভিভূত করিয়া স্বেচ্ছামত কার্য্য করাইয়া লয়, ইহা সাধনা সাপেক্ষ। ইথার যখন সর্ব্বত্র আছে, তাহাতে কম্পন উৎপাদন করিলে সহস্র যোজন দূরে সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাইবে, অনুভূতিকে সম্প্র-

ধারণ করিবে, ইহা সম্ভব। আকাশ যখন সর্ব্বব্যাপী, মানুষেও উহা আছে, অন্য স্থানেও তাহা আছে, অতএব তরঙ্গ অনুভূতি বহন করিতে সক্ষম। বিষয়টী গুহ্য, যিনি ইহাতে পারদর্শী হইয়াছেন, লোকে তাঁহার নিকট অবনত হইবে। বলবানের নিকট দুর্ব্বল বশ্যতা স্বীকার করিবে, ইহা নিশ্চিত। গুরু যাহা বলেন, অবিচারিত চিত্তে শিষ্য তাহা গ্রহণ করে, কারণ তাঁহাকে উহার বিশ্বাস হইয়াছে, কাজেই নির্ভরশীল হইয়াছে। বিশ্বাসী হওয়া, নির্ভরশীল হওয়া, মানুষের স্বভাব। শঙ্করাচার্য্য জগৎনাস্তিক হইলেও দেবদেবী মানিতেন। শাক্যসিংহ ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী হইলেও কর্ম্ম মানিতেন, ইহাতে তাঁহারা অসামঞ্জস্য দেখিতেন না কেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে যাহার অতিরিক্ত জানে না বা বিশ্বাস করে না, তাহার নিকট উহাই সত্য। ব্রহ্ম নির্গুণ বা সগুণ, সুতরাং দুই হইতে পারে। দেবতা সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য "সর্ব্বে সত্ত্বা সুখিতাহোন্তু" পার্থিব ধর্ম্মবীজ হইলেও প্রথমে আপনার, তাহার পর দেশের, তদনন্তর বিশ্বের হিত প্রার্থনীয়। এই কারণে অনেক স্থানে স্বধর্ম্ম রক্ষা করা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে, নতুবা জাতীয়তা লোপ পায়, দেশের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারা যায় না।

এক বাঙ্গালীর জোরহাটনাম্নী এক দাসী ছিল, সে পীড়িতা হইলে প্রভু ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করেন। তাহাতে বিশ্বাস-পরায়ণা দাসী উত্তর করিল, বিধাতা রাজি নহেন, তজ্জন্য পীড়া হইয়াছে, প্রতিকার করিতে গেলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন। অখ্রীষ্টান খাসি মিথ্যা ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে নাই; বালকের সরলতা যুবার নিকট দুষ্প্রাপ্য। এই জাতির মধ্যে ভাগিনেয়ের উত্তরাধিকার রীতি প্রচলিত, তাহাতে বোধ হয়, ইহাদের মধ্যে দাম্পত্য বন্ধনের দৃঢ়তা নাই, প্রতিবেশী নাগা জাতিতে কিন্তু পুত্রাধিকার প্রচলিত আছে। ইংরাজের খসনারী-গর্ভজাত পুত্রের ফিরিঙ্গিত্ব প্রাপ্ত না হইয়া খাসি থাকিতে আপত্তি নাই। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, এই জাতি অমিশ্র, অথচ তাহাদের এই ব্যবহার ও বর্ণের মলিনতা, সেই কথার প্রতিবাদ করিতেছে।

ফল মূল বিক্রয়ের জন্য সপ্তাহে দুই স্থানে ভিন্ন দিনে হট্টের অধিবেশন হয়। শ্রীহট্ট অপেক্ষা এখানকার নানা জাতীয় কমলা শ্রেণীর জম্বির মিষ্টতায় ন্যূন। পরিচিত ও অপরিচিত দুই একটী ফল গ্রহণান্তে জঠর সেবার জন্য আমাকে কপিশাকের প্রতি আকৃষ্ট হইতে হইয়াছিল। কাসন্দির মত স্তুপাকার এক বস্তু দেখিলাম, ক্রয় করিতে সাহস হইল না। খাসি নারীর কৃষিজাত, বাঙ্গালী মারোয়ারী পুরুষের বস্ত্র তণ্ডুল প্রভৃতির বীথি-সজ্জায় স্থান সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ নিম্নে নানাবিধ মাংস, চুল্লী প্রজ্বলিত করিবার জন্য সরল বৃক্ষের নির্য্যাসপূর্ণ ধূপকাষ্ঠে, গৃহ প্রস্তুতের উপকরণ প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত আছে।

অনাবৃত স্থানে ক্রয় বিক্রয়ের কষ্ট নিরাকরণ মানসে খসরাজ বড়হাটের জন্য বহুদূরব্যাপী প্রাঙ্গণে গৃহাবলি নির্ম্মাণ করাইতেছেন। মধ্যে মধ্যে শিখরদেশ উচ্চ করিয়া শ্বেত লৌহ পত্রে মণ্ডিত করতঃ শোভা সম্পাদন হইয়াছে। নবাগতের পক্ষে দূর হইতে দৃষ্ট হয় বলিয়া ইহা দিগ্‌দর্শনের কার্য্য করিবে। ফুলার মহোদয় হট্টের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে আসিতেছেন দেখিয়া, বোধ করি,

অন্তরীক্ষে দেবগণ ক্রন্দন করায় প্রবল ভাবে বৃষ্টিপাত হইল। রক্তবর্ণ বস্ত্রে শ্বেত ইংরাজি অক্ষরে খাসি-সম্ভাষণ-লিপি পত্রবিতানে সজ্জিত তোরণ-গাত্রে আলম্বিত হইয়া সিক্ত হইতেছে; চন্দ্রাতপতলে সম্বর্দ্ধনাকারিগণ গত্যন্তরহীন গুরখালি সৈনিকের মত নীরবে বারিপাত সহ্য করিতেছেন। তিল পর্ব্বতের নির্ব্বাচিত খসশাসনকর্ত্তাগণ সভার একপার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের কৌষেয়বস্ত্র ও কৌষেয় উষ্ণীষ-পরিহিত দেহে অঙ্গরক্ষার উপর রজতময় চন্দ্রহার উপবীতের ন্যায় দুই প্রস্থ এক একটী অপর দিক হইতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। আমলকবৎ পদ্মরাগমণি-সংযুক্ত কাঞ্চনমালা গলে দোলাইয়া গুম্ফাভ্যন্তরে তাম্বুলচর্ব্বণে নিরত আছেন, মধ্যাহ্নে সভার অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবী বিভিন্ন পথে অথচ এককালে অতিদ্রুত তুরঙ্গম-চালিত রথে অতি সজ্জিত অধিত্যকাস্থ পটমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন। সহৃদয় ইংলণ্ডীয় শাসনকর্ত্তা নগর-শোভা-বর্দ্ধনকারিণী সভার সদস্যগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের রৌপ্যাধার সম্বন্ধে কহিয়াছিলেন, ইহা "স্বদেশী" না করিয়া কলিকাতা হইতে কেন আনীত হইল?

খসরাজের সহিত প্রজার বিশেষ সম্বন্ধ নাই; ভূমির কর দিতে হয় না, খসরাজ্য পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত, পঞ্চদশ প্রদেশে যদিও এক পরিবার হইতে সিয়ম্ বা রাজা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, তথাপি প্রজা-সাধারণের দ্বারা ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। একস্থানে ওহদেদার নিযুক্ত হন, সর্দারের দ্বারা পাঁচটী ও লিঙডো কর্ত্তৃক চারটী প্রদেশ শাসিত হয়, ইহারা সকলেই নির্ব্বাচন দ্বারা গৃহীত। এক্ষণে এই নির্ব্বাচন ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তা দ্বারা স্বীকৃত করাইয়া লইতে হয়। ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধিদিগের নিকট হইতে খনিজ দ্রব্য, হস্তি, বনকর হইতে উৎপন্ন সামগ্রীর অর্দ্ধাংশ পাইলে স্বীকার করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন না। প্রজাপ্রতিনিধিগণ বিচার, বিধি নিজেরাই করেন। হত্যা প্রভৃতি গুরুতর ব্যাপারে ইংরাজের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। বাঙ্গালায় শ্রীহট্টের চুণ যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই খাসিদের আকরে উৎপন্ন।

কাশ্মীর, সিমলা, দারজিলিং ও শিলং শৈলের অধিবাসিনীদের মস্তকের বস্ত্র-খণ্ড-বন্ধনের ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে। ভারতের বহির্ভাগে ইহার মূল নিহিত আছে, অনুমিত হইতেছে। সে প্রদেশ আমার গন্তব্য স্থানের বহির্ভূত। নেপালী, টিপ্রা, মণিপুরী ও আহোমিয়া ললনার বক্ষ্যবেষ্টনের সাদৃশ্যের মূল বহির্গত করিতে হইলে ভারত-ভূমি ত্যাগ করিতে হইবে। আরাকাণের মগনারীর পরিচ্ছদে তাহা দৃষ্ট হইবে; আসামের চাদর গায়ে দিবার প্রণালী আরাকাণের প্রণালী হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন মাত্র। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী সুদূর কেরলের সহ পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী কামরূপের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। ইহাতে এক মঙ্গোলিয় প্রভাব পরিব্যক্ত করে। খাসিগণ তাম্বুল সেবনে খদিরের পরিবর্ত্তে এক প্রকার মূল ব্যবহার দ্বারা মগদিগের মত ওষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া থাকে।

বহু শৈলাবাসে অবস্থান করিয়াছি। দারজিলিং লাউস স্বাস্থ্য-নিবাসের মত আমার উপযোগী দ্বিতীয় স্থান মিলিল না, তথায় গৃহ কর্ম্মে চিত্তবিক্ষেপ হয় না। স্নায়ুদৌর্ব্বল্য প্রশমনের জন্য নিরালম্বং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিৎ ভাবয়েৎসুধীঃ এই পথ্য গ্রহণ করা যাইতে

পারে। কাঞ্চন-জঙ্ঘার ন্যায় মহান হিমশৃঙ্গ দর্শন, মেঘমণ্ডলে বাস অন্যত্র হইবার নহে। সংক্ষুব্ধ কার্পাসরাশির ন্যায় স্বচ্ছ মেঘের হিল্লোল এই আসিল,অমনি গেল। অম্লযানের গন্ধ অনুভব করিতে লাগিলাম। এমন নৈসর্গিক কৌতুকাবহ দৃশ্য আর কোথায় আছে?

সিমলার প্রান্তরে ভ্রমণ কালে ধূলির জন্য অস্থির হইতে হয়। এক পক্ষে একবার মাত্র বৃষ্টি পাইয়াছিলাম। এখানে কিন্তু দেখিবার বিষয় অন্য রূপ। দারজিলিং বা শিলং পর্ব্বতে অধিবাসিরা অনার্য্য, সিমালায় তাহা নহে। প্রাচীন ভাবের হিমালয়বাসী আর্য্য কৃষক তথায় পাইয়াছিলাম। এক দিব্যাঙ্গ ভারবাহী প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছিল, সে ব্রাহ্মণ। তাহার অগ্রজের প্রবাসে থাকিবার আবশ্যক হয় না, তাঁহার যজ্ঞোপবীত আছে। নিষ্ঠাবান হইতে না পারিলে উপনয়ন সংস্কার বৃথা,তজ্জন্য আমি যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করি নাই। প্রস্তরকুন্তনকারী ক্ষত্রিয়ের সহিত আলাপ করিয়া কিছু তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হই। অর্থাভাব বশতঃ কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিয়া থাকেন, কনিষ্টগণের তাহাতেই সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহ হয়। প্রত্যেকের পৃথক পত্নী হইলে পরিবার বৃহৎ হইয়া উঠে, নির্দ্দিষ্ট পৈতৃক ভূমি হইতে উৎপন্ন শস্যে সংকুলান হইতে পারে না। এক্ষণে ইংরাজ সিমলায় বসতি স্থাপন করায়, তাহাদের অর্থাভাব দূর হইয়াছে। এক ব্যক্তিকে তিন স্ত্রীর ভর্ত্তা হইতে দেখা যায়। ভিন্ন জাতির অন্নগ্রহণ সমাজে নিষিদ্ধ নহে, শিপ্রর মেলায় কনেৎ সুন্দরীর রক্তিমাভ গৌরকান্তি ও পরিচ্ছদ দর্শনে কাশ্মীরের পণ্ডিতানিদিগকে স্মরণ হইয়াছিল, সে কৃষক-রমণীর অসঙ্কুচিত ভাব যেন মর্ত্ত্যলোকের মত নহে। মুসলমান অধিকার গিরিপল্লীতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। আচার ব্যবহারে বৈদেশিকতার বা হিন্দুসভ্যতার সুসংস্কৃত ব্যবস্থা হইতে সরলপ্রাণ বনচরগণ দূরে রহিয়াছেন। পর্ব্বতাভ্যন্তরে অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজন্য আছেন, তাঁহারা জাতিবিশেষকে উন্নত বা অধঃপতিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা পূর্ব্বকালের মত দেশ ও সমাজ, উভয়ের রাজা।

সিমলা হইতে উত্তরাখণ্ডের পর্ব্বতমালা অধিক দূরবর্ত্তী নহে, কেদারসন্নিহিত স্থান উত্তরাখণ্ড নামে পরিচিত। সত্য ও অস্তেয়ের জন্য তথাকার অধিবাসীরা প্রসিদ্ধ। স্থানের দুর্গমতা জন্য হরিদ্বারে আরম্ভ করিয়াই আমি নিবৃত্ত হওয়া উচিত মনে করিয়াছিলাম। মায়াপুরীতে গঙ্গা ও গঙ্গাতট অতি রমণীয়। ব্রহ্মকুণ্ডের প্রশস্ত চত্বরে বসিয়া গোধূলীতে ভাগীরথীর কল্লোলধ্বনি যৎকালে কর্ণপটহে প্রবেশ করিতে থাকে, তাহাতে ভাষার যোগ না থাকিলেও, বোধ হয়,"শ্রবণে আসিয়া কথা মরমে পশিলগো আকুল করিল প্রাণ।" আবার যখন পরপারে চণ্ডীপর্ব্বতের দিকে নয়ন ফিরাইলাম "নবরে নব নিতই নব, যখনই হেরি তখনই নব" জ্ঞান হইল। জলের স্বাদ হিমানিমিশ্রবৎ। গাড়োয়ালের সন্ন্যাসিনীদিগের কুটীর হইতে পাটিয়ালার রাজভবন পর্য্যন্ত নগরী সুরধনীতীরে বিন্যস্ত। শিবালিক পর্ব্বতের প্রান্ত হইতে দর্শন করিলে সমস্ত পর্ব্বতময় বোধ হয়; ক্ষুদ্র জনপদ তন্মধ্যে লুক্কায়িত রহে। পর্ব্বতগহ্বরে যেমন জনপদ প্রচ্ছন্ন আছে, সন্ন্যাসীর হৃদয়ে তেমনি সংসার লুকায়িত, ভাবের উচ্ছ্বাস থামিয়া গেলে তাহা প্রকটিত হয়। সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা হরিদ্বারে আসিয়া বৃহৎ মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা কি

সাংসারিকতা নহে ? তাঁহারা বিষয়কর্ম্মে প্রতিযোগিতা ত্যাগ করিয়া, প্রজ্ঞা বৃদ্ধিতে ক্ষান্ত থাকিয়া আমাদের মঙ্গল করিয়াছেন ; ইহা ভিন্ন উদর মহাশয়ের জন্য, স্বকীয় পরমার্থের জন্য তথাকথিত সাধুকে ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। বিবেকানন্দের চিকিৎসা-মঠে ও দয়ানন্দের গুরুকুলে তাহার ব্যতিক্রম দেখিলাম।* গাড়োয়ালিরা গঙ্গোত্তরী হইতে ভূর্য্যপত্রমণ্ডিত জলপাত্রের ভার লইয়া সমভূমিতে গমন করিতেছে। তাহাদের আকৃতি নেপালবাসীদের ন্যায়। তীর্থে তীর্থে জলপ্রদান করিয়া বসন্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। ইহাতে লব্ধ বেতন হইতে ও কৃষিকার্য্যে উৎপন্ন দ্রব্য হইতে তাহাদের পরিবারের ভরণপোষণ চলে। কম্বলের পরিধেয় ও উত্তরীয় শৈত্য নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। পল্লীবাসিনী অবলারা বদরিকাশ্রমগামী যাত্রী দেখিলে টিকুলি ছুঁচসুতা চাহিয়া মাত্র আপনার সামান্য অভাব বা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে চাহে।

সাদৃশ্যের লীলা অপার। শিলং হইতে সম্প্রসারণ করিয়া দারজিলিং শিবালিক হইয়া আসিল, চিন্তার সাহায্যে অনার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া আর্য্যে গিয়াছিলাম ; পুনরায় অনার্য্যে প্রত্যাগমন করিতেছি। ইতিহাস রক্ষায় পূর্ব্বগৌরবের স্মৃতি জাগরুক থাকে, স্থলবিশেষে তদ্দ্বারা অনিষ্টপাত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত আনন্দরাম গোঁহারি একজন আহোম, তিনি অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে আমাকে কহিয়াছিলেন, আমরা অধুনা ক্ষমতাচ্যুত, যজনকার্য্যে সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ মিলে না, ইহাতে পূর্ব্বমতে প্রতিগমন করিতে বাঞ্ছা হয়, অসম্মানিত অবস্থায় কালযাপন করা দুঃসাধ্য। আপনি কলিকাতায় যাইয়া হিন্দুধর্ম্মের রক্ষকদিগকে ইহার প্রতীকার করিতে কহিবেন। ইতিহাস না থাকিলে এ বিপত্তি ঘটিত না। আর্য্যীকরণে গৃহীত জাতিমালায় অতর্কিতভাবে এই জাতি স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারিতেন।

শ্রীদুর্গাচরণ ভূতি।

* একজনের ভ্রম অপর জনের লক্ষ্য হয়, বৈদান্তিক সব মিথ্যা বিবেচনা করেন, কিন্তু তিনি যাহা বলিতেছেন, উহা মিথ্যা হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিবেন না। মানুষের দোষ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য, সতর্ক হইবার জন্য। দোষ সকলেরই আছে। সতর্ক হইলে দোষের প্রতি ঘৃণা হইবে।

সাংখ্যে ও বেদান্তে বিরোধ কোথায় ? (১)

সাংখ্য ও বেদান্ত, উভয়ই জগতের সৃষ্টি এবং শক্তির বিকাশের প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। শক্তির কিরূপে বিকাশ হয়, এবং কিরূপে এ জগৎ রচিত হইয়াছে, যিনিই এ বিষয়ের তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে যাইবেন, তাঁহাকে একই প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে, ইহা স্বাভাবিক। কেমনা, শক্তির বিকাশের প্রণালী এক প্রকার ব্যতীত দশ প্রকার হইতে পারে না। ভারতের ঋষিরা কি এমনই অহম্মুখ যে, তাঁহারা যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তদনুসারে সৃষ্টির বিবরণ প্রদান করিবেন !! বিজ্ঞানানুমোদিত সৃষ্টিতত্ত্ব একই পথ অবলম্বন করিবে। সুতরাং এই অংশে, সাংখ্যের বিবরণ এবং

বেদান্তের বিবরণ একই রূপ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। বাস্তবিক পক্ষে, কথায় ভিন্নতা থাকিলেও, প্রণালীতে কোনরূপ ভিন্নতা সাংখ্য ও বেদান্তে নাই। তথাপি অনেক অল্পধী ব্যক্তি মনে করেন যে, সাংখ্য ও বেদান্তে প্রকৃতই বিরোধ আছে।* আমরা এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে উভয়ের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব।

পাঠক অবশ্যই জানেন যে সাংখ্যকার, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের বিকাশ হয়, এই কথা বলিয়াছেন। অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও এই মহত্তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এই মহত্তত্ত্বের নাম রাখিয়াছেন "হিরণ্যগর্ভ"। এবং এই হিরণ্যগর্ভ যে অব্যক্তশক্তির প্রথম বিকাশ, তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। পাঠক আমরা শঙ্করোক্তির একটী অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"অব্যাকৃতাৎ ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থাতোঽস্মাৎ প্রাণো হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মণো জ্ঞানবিক্রিয়াশক্ত্যধিষ্ঠিত জগৎসাধারণোঽবিদ্যাকামকর্ম্মভূত সমুদায় বীজাঙ্কুরো জগদাত্মায়ত" (মুণ্ডকোপনিষদ্, ১।৮—৯)।

অর্থাৎ বীজ হইতে যেমন অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, অব্যাকৃত শক্তি হইতেও তদ্রূপ সর্ব্ব প্রথমে হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি হইল। জগতে যতপ্রকার জ্ঞান ও ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, এই হিরণ্যগর্ভ তাহাদের মূলবীজ। এই হিরণ্যগর্ভ যে মহত্তত্ত্ব এবং ইহা যে জড়ীয় শক্তির বিকাশ এবং জড়, তাহাও শঙ্করাচার্য্য অন্যত্র বলিয়া দিয়াছেন। কঠোপনিষদের (৩।১০) ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন :—

'হিরণ্যগর্ভই অব্যক্তশক্তির প্রথম বিকাশ। ইহাকেই "মহত্তত্ত্ব" বলা যায়। ইহা জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্ট; ইহা চেতনাত্মক ও জড়াত্মক।"

এখন আমরা দেখিব যে, এই মহত্তত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভ পদার্থটা কি? পাঠক উপরে দেখিয়াছেন যে, হিরণ্যগর্ভকে 'প্রাণ' নামেও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রুতির অনেক স্থলে ইহাকে 'সূত্রাত্মা' বলিয়াও কথিত হইয়াছে। এই সূত্রাত্মা বা প্রাণ,—অব্যক্তশক্তির প্রথম বিকাশ। মাণ্ডুক্য উপনিষদে গৌড়পাদকৃত দ্বিতীয় শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, এই জগৎ বিকাশিত হইবার পূর্ব্বে ইহা অব্যাকৃত শক্তিরূপে অবস্থিত ছিল। এই অব্যক্তশক্তিকে প্রাণশক্তি বলা যায়। এই অব্যক্ত প্রাণশক্তিই সর্ব্বপ্রথমে অভিব্যক্ত হয়। তবেই শঙ্কর-মতে, প্রাণশক্তির দুই অবস্থা। এক, অব্যক্তাবস্থা; অপর, ব্যক্তাবস্থা। অব্যক্ত প্রাণশক্তিই বল রূপে, শক্তিরূপে, বায়ুরূপে, সূত্ররূপে প্রথম অভিব্যক্ত হয়। ইহারই নাম মহত্তত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভ। জগতে যতপ্রকার জ্ঞান ও ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, এই হিরণ্যগর্ভই তাহাদের সাধারণ বীজ। সাংখ্যের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা-কর্ত্তা বিজ্ঞানভিক্ষুও এ তত্ত্ব তৎপ্রণীত বেদান্ত ভাষ্যে বলিয়া দিয়াছেন :—

"মহানুৎপদ্যতে ; স চ ক্রিয়াশক্ত্যা প্রাণঃ, নিশ্চয়শক্ত্যা চ বুদ্ধিঃ." (২।৪।১৩)। এই মহত্তত্ত্ব,—ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তির সাধারণ বীজ।

কিরূপে শক্তির বিকাশ হয়? শক্তির বিকাশ সম্বন্ধে হিন্দু দর্শনের মত কি? শ্রুতিতে প্রাণশক্তিকে ও বায়ুকে পৃথক্ গণনা করা হয় নাই। "সংবর্গবিদ্যায়" আমরা

* "উপনিষদের উপদেশ" প্রথম খণ্ড, নামক গ্রন্থে আমরা সাংখ্য ও বেদান্তের সমন্বয় ও বিরোধ পরিহারের চেষ্টা করিয়াছি।

দেখিতে পাই যে, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্ন্যাদি পদার্থ বায়ুতে লীন হয় এবং দৈহিক ইন্দ্রিয়াদি ক্রিয়া ও প্রাণে (বায়ুতে) লীন হয়। এই জন্যই শঙ্কর বায়ু ও প্রাণকে ক্রিয়াত্মক বা স্পন্দনাত্মক বলিয়াছেন। "বায়োশ্চপ্রাণস্য চ পরিস্পন্দাত্মকত্বম্।" জ্ঞানামৃত যতি তৈত্তিরীয়-ভাষ্যের টীকায় বায়ুকেই সূত্রাত্ম শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় ভাষ্যে (৩।১—১০) শঙ্কর বলিয়াছেন—

"পরিম্রিয়ন্তেঽস্মিন্নগ্নে দেবা ইতি পরিমরঃ বায়ুঃ। ব্রহ্মণঃ সংহত্বৃত্বং বায়ুদ্বারকং। বায়ুরাকাশেন অনন্য ইতি আকাশং বায়্বাত্মানং ব্রহ্মণঃ পরিমরমিত্যুপাসীত।"

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, আকাশেরই এক দেশে প্রাণশক্তি সর্ব্ব প্রথমে বায়ুরূপে—স্পন্দনরূপে বিকাশিত হয়। এই বায়ু বা স্পর্শ তন্মাত্রার দুই অবস্থা;—উষ্ণস্পর্শ (তেজ) এবং শৈত্য) জল)। বায়ু—তেজ ও জলের সহিত অনুগত রূপে অভিব্যক্ত হয়। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, প্রাণশক্তি ভূতের সহিত প্রকাশিত হয়। "প্রাণঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি।" তবেই দেখা যাইতেছে, শক্তি প্রথমে তেজরূপে বিকাশিত হয়। শঙ্করাচার্য্যও তাহাই বলেন :—

"বায়ুনা হি দীপ্তং তেজঃ অন্নমত্তুং সমর্থং ভবতি" (ঐতরেয় আরণ্যক ভাষ্য)। শঙ্করের "উপদেশ সাহস্রী" গ্রন্থের টীকাকারও এই জন্যই বলিয়াছেন যে; "জ্বালারূপস্য চ বহ্নের্বায়্বাধীন প্রবৃত্তিদর্শনাৎ।"

কিন্তু এস্থলে আর একটী তত্ত্ব দেখিতে হইবে। শক্তি যতই তেজ ও আলোকাদির আকারে বিকীর্ণ হইতে থাকে, ততই উহার আধার বা কার্য্যাংশ (matter) ঘনীভূত হইতে থাকে। এই ঘনীভবনের প্রথম অবস্থা জল (তরল) এবং দ্বিতীয়াবস্থা পৃথিবী (কঠিন)। শঙ্কর এই জন্যই বলিয়াছেন যে, জলীয় বা পার্থিব ধাতুকে আশ্রয় না করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে অগ্নির বিকাশ হইতে পারে না।

"অগ্নেঃ আপ্যং বা পার্থিবং বা ধাতুমনাশ্রিত্য স্বাতন্ত্র্যেন আত্মলাভো নাস্তি।"

পাঠক বোধ করি বুঝিতে পারিতেছেন যে, শ্রুতিমতে বা শঙ্কর-মতে ক্রিয়াশক্তির দুইরূপ;—করণাংশ (force) এবং কার্য্যাংশ (matter)। করণাংশ যতই তেজাদির আকারে বিকীর্ণ হইতে থাকে, ততই উহার কার্য্যাংশও ঘনীভূত (Integrated) হইতে থাকে। এইরূপে ঘনীভূত বা সংহত হইয়া জল ও পৃথিবীরূপে পরিণত হয়। "তেজসা বাহ্যান্তঃপচ্যমানো যোঽপাংশরঃ স সমহন্যত, সা পৃথিব্যভবৎ"। "সংহতিশ্চ অপ্‌কার্য্যা মৃৎপিণ্ডাদিষু দৃষ্টা" (শঙ্কর ভাষ্য) এইরূপে অব্যক্তশক্তিতন্মাত্ররূপে দেখা দেয়।

আমরা উপরে দেখিয়াছি যে, মহত্তত্ত্বকে ক্রিয়াশক্তির বীজ বলা হইয়াছে। কিরূপে এই ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হয়, তাহা দেখা হইল। এখন, আর একটী অংশ দ্রষ্টব্য। মহত্তত্ত্বকে জ্ঞানশক্তিরও বীজ বলা হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিলাম, ক্রিয়াশক্তি ত জড়। এইজন্যই শঙ্কর মহত্তত্ত্বকে কঠভাষ্যে "অবোধাত্মক" বা জড়াত্মক বলিয়াছেন। জড়ে জ্ঞান আসিল কিরূপে? কঠ-ভাষ্যের টীকায় আনন্দগিরি ইহার মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পুরুষ-চৈতন্যের অধিষ্ঠান আছে বলিয়াই মহত্তত্ত্বকে "বোধাত্মক ও" বলা যায়। "অধিকারি পুরুষাভিপ্রায়েণ বোধাত্মকত্বমব্যক্তস্য আস্তঃ পরিণামঃ।

কথাটা এই যে, বেদান্তমতে কেহই

চেতন-শূন্য নহে। মূলে প্রাণশক্তি জ্ঞানেরই সংকল্প হইতে অভিব্যক্ত। সুতরাং শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চেতন রহিয়াই যাইতেছেন। শক্তির প্রত্যেক বিকাশ দ্বারা চেতনেরও অবস্থান্তর প্রতীত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে নিরবয়ব চেতনের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন নাই। কিন্তু শক্তির পরিণতির অনুগতরূপে চেতনেরও অবস্থান্তর প্রতীত হয় মাত্র। এই দিকে লক্ষ্য করিয়াই মহত্তত্বকে জ্ঞানের বীজ বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে সাংখ্যকারেরও সম্মতি আছে। এখন আমরা তাহাই দেখিব।

সাংখ্যকার মহত্তত্বকে—সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন। সাত্বিক অংশের নাম বুদ্ধি (জ্ঞানশক্তি), রাজসিক অংশের নাম অহঙ্কার (ক্রিয়াশক্তি) এবং তামসিক অংশ হইতে বিষয় উৎপন্ন হয়।

আমরা পূর্ব্বে যাহাকে ক্রিয়াশক্তির করণাংশ (Force) এবং কার্য্যাংশ (Matter) বলিয়াছি, সাংখ্যের ভাষায় তাহাই রাজসিক ও তামসিক অংশ। এবং সাংখ্যকার সত্বাংশ দ্বারা চেতনকেই লক্ষ্য করিতেছেন।* শক্তি ক্রিয়াশীল হইলেই, তাহা বোধের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। "Energy is the unknown entity and its existence is recognised only during its state of change." বৈজ্ঞানিকের এই তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সাংখ্যকার প্রকৃতির সাত্বিক অংশের উল্লেখ করিয়াছেন।

তবেই আমরা দেখিতেছি যে, শক্তির বিকাশ সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্ত একই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তথাপি, লোকে ভুল করিয়া মনে করে যে, সাংখ্যে ও বেদান্তে বিরোধ আছে। যাঁহারা এই প্রবন্ধটী পড়িবেন, তাঁহারা বোধ করি ইহাও স্বীকার করিবেন যে, এই সৃষ্টিতত্ব বিজ্ঞানানুমোদিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেহ কেহ ঋষিদিগের কথা বিজ্ঞানসিদ্ধ বলিলে, রাগ করিয়া উঠেন। "কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্"। তবে কি সাংখ্যে ও বেদান্তে বিরোধ নাই। বিরোধ আছে। সে বিরোধ শক্তির স্বতন্ত্রতা লইয়া। কিন্তু তাহাও নামে মাত্র বিরোধ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

* প্রাণীরাজ্যেও, এই করণাংশই ইন্দ্রিয়াদিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং কার্য্যাংশ—দেহ ও দেহাবয়ব রূপে ঘনীভূত হইয়াছে। ফলতঃ force এবং matter এক সঙ্গে অভিব্যক্ত হয়, একসঙ্গে ক্রিয়া করে। শ্রুতিতে এই 'কার্য্যাংশ'ই 'অন্ন' নামে পরিচিত। "অন্নে দেহাকারে পরিণতে, তদনুসারিণ্যশ্চ বাগাদয়ঃ স্থিতিভাজঃ" এবং তামসিক অংশ হইতেই স্নেহ জন্মিয়াছে। এবিষয়ে "উপনিষদের উপদেশ" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, সৃষ্টিতত্ব দেখুন।

স্বদেশ-প্রেম।

(১) বিদেশী-বিদ্বেষ—বর্জ্জন এবং

(২) "নীলামী-বিবাহ"—বর্জ্জন।

Economic and social progress
—wedded are they ;
They never can be divorced —
—say what you may.

রামধন বন্দ্য—ধনী ব্যক্তি।

নীলমণি মিত্র—৫০৲ বেতনের কেরাণী।

কেদার মুখো—২০৲ বেতনের কেরাণী।

ধীরেন্দ্র—কেদারের পুত্র।

বিজয়—রামধন বাবুর পুত্র।

হরগোবিন্দ—রামনাথ,রমানাথ,ছাত্রগণ।

রামধন বাবুর স্ত্রী।

মনোরমা—রামধন বাবুর কন্যা।

সুনীতি—কেদার বাবুর কন্যা।

(১) দৃশ্য।

(স্থান—রামধন বাবুর বৈঠকখানা। আসীন রামধন বাবু, আরাম-চৌকীতে আলবোলায় তামাক খাইতেছেন। প্রবেশ,নীলমণি মিত্র।)

রামধন। আসুন—নীলমণি বাবু, বসুন, ভাল আছেন?

নীলমণি। ভাল আর কেমন কোরে? মাসে ৫০টী টাকা মাইনে বইত না। আর চা'ল হলো ৯৲, ১০৲ মণ। এতে সংসার চলে কি রকমে বলুন দেখি মহাশয়।

রামধন। তা বটেইত।

নীলমণি। তা বটেইত নহে মহাশয়। আপনারা বড় মানুষ লোক, গরিবের দুঃখ বুঝ্‌বেন কেমন ক'রে?—আচ্ছা মহাশয়, আপনি ত পণ্ডিত মানুষ, একটা কথা আমাকে বলতে পারেন—?

রামধন বাবু। কথাটা কি?

নীলমণি। আমার মাথা—কথাটা এই, ১৫ বৎসর পূর্ব্বে যে চা'লের দাম ৩৲ বা ৪৲ মণ ছিল, তাই এক্ষণ হলো ৯৲ বা ১০৲ মণ, আচ্ছা আর দশ পনর বৎসর পরে দর ঐ রকমে আবার ক্রমে তিন গুণ বেড়ে যাবে কি? —৩০৲ বা ৪০৲ হবে কি?

রামধন। কি জানি।

নীলমণি। আপনারা যদি না জানেন, তবে কে জানে? মহাশয় চল্লাম এখন—

রামধন। আরে, বসুন নীলমণি বাবু, তামাক খান। এত তাড়াতাড়ি কেন?

নীলমণি। না মহাশয়; ও কথা কাজের নয়। এখানে হবে না। আর কারো কাছে যাই।

রামধন বাবু। কি হলো না?

নীলমণি। আমার কথা এই,আর দশ পনর বছরে চা'লের দর ৩০৲ বা ৪০৲ মণ হতে পারে কি না? এ কথাটার জবাব পাবার জন্য আমি আজ রবিবার, খেয়ে বেলা ৯টা হতে এখন প্রায় সন্ধ্যা—বাড়ী বাড়ী ঘুরছি,এ সহরে এখন আরও অনেক পণ্ডিত লোক আছে। দেখি আমার প্রশ্নের উত্তরটা যদি কেউ দিতে পারে। (উত্থান)

রামধন বাবু। আরে নীলমণি খুড়ো, পাগল হলে নাকি?

নীলমণি। পাগল এক্ষণও হই নাই। বোধ হয়, হবো—

(এই বলিয়া নীলমণি মিত্র চটী জুতা চটাস চটাস করিতে করিতে চলিয়া গেলেন)

(২) দৃশ্য।

কেদার মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ।

রামধন বাবু। কেদার কি মনে ক'রে?

কেদার। মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে এসেছি। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

রামধন বাবু। বাটীর সব মঙ্গল ত?

কেদার। হুঁ।—(কেদারের চোখ ছল ছল করিতে লাগিল। কেদার একটা ঢোক গিলিল।)

রামধন বাবু। ব্যাপারখানা কি?

কেদার। শুনিবেন? বলিতে যে বড় লজ্জা হয়। আজ আমাদের উননে হাঁড়ি চড়ে নাই।

রামধন বাবু। হাঁড়ি চড়ে নাই কেন?

কেদার। জানেনত মহাশয় আমি মাসে ২০৲ মাত্র পাই। চাল ৮৲ মণ দরে কিনিতে হইতেছে। গিন্নীর যা কিছু গহনা ছিল, তা প্রথমে বন্দক—তারপর বেচা—মুদিত আর ধারে চা'ল দিচ্ছেনা, তাকে আজ অনেক কাকুতি কল্লাম, সে কোন মতে শুনলো না —সুতরাং ছেলে না খেয়ে স্কুলে গেল, দু বছরের মেয়েটা না খেতে পেয়ে ককাচ্ছে, গিন্নী ও সুনীতি চুপ করে কেবল চোখের জল মুচছে।

রামধন। তুমি ও বেলা আমার কাছে আসনি কেন?

কেদার। রবিবার, তবু কাছারী যেতে হইছিল। সেরেস্তাদার মহাশয় ডেকেছিলেন, যদি না যাই কাজটুক যাবে। কিন্তু কাছারীতে কোন কাজ কর্ত্তে পারিনি। বেলা ৩টার সময় পরিবারের অনাহারের বিষয় শুনে প্রাণ বড় ছটফট কর্ত্তে লাগলো। অসুখ হয়েছে বোলে সেরেস্তাদার মহাশয়ের নিকট ছুটী নিয়ে এলাম।

রামধন বাবু। এসে দেখ্‌লে হাঁড়ি চড়েনি?

কেদার। এসে দেখ্‌লাম ছেলে স্কুল থেকে এসে শুখান মুখে চুপ করে বসে—খুকী ক্ষিদেতে ভাঙ্গা গলায় ককাচ্ছে—তার মা তাকে কোলে করে এ ঘরে ও ঘরে নিয়ে বেড়াচ্ছে,মার আঁচল দিয়ে চোখ মুচ্ছে—সুনীতি তার দাদার কাছে বসে—দাদার কাঁধে হাত দিয়ে কানৃছে।

রামধন বাবু। আর না, আর বলতে হবে না। আমার শুনে বড় কষ্ট হচ্ছে। মধো? বাক্সটা দে। (রামধন বাবু কেদার মুখোপাধ্যায়কে একটী টাকা দিলেন) কেদার যাও, খাওয়া দাওয়া করগে ব্রাহ্মণ। কালকে প্রাতে এসো। কোন উপায় দেখা যাবে।

কেদার। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

(কেদারের প্রস্থান)

(৩য়) দৃশ্য।

স্থান ঐ, বিজয়ের পাঠ-কক্ষ—আসীন রামধন বাবু ও বিজয়।

পুত্র। বাবা, কেদার বাবুদের আজ সমুদিন খাওয়া হইনি।

রামধন বাবু। তুমি কেমন কোরে জান্‌লে?

বিজয়। কেদারবাবুর ছেলে যে আমাদের ক্লাসে পড়ে। তার মুখখানা দেখে আমার বোধ হলো তার কি হয়েছে। কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসা কল্লাম। বল্‌ল না।

রামধন। তবে জানলে কেমন কোরে?

বিজয় (পুত্র)। একটা ছেলে আমায় বল্‌লো।

রামধন (পিতা)। তার পর?

পুত্র। আমি তাকে বল্লাম, মা সকলের

খাবার, জল খাবার, খুকীর দুধ, আর একটা বড় সিধে ঝী দিয়ে ধীরেন্দ্রের মার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রামধন। কখন?

বিজয়। ঝী কখন কেদার বাবুর বাড়ী হ'তে ফিরে এল, তখন কেদার বাবু যে এখানে বসে।

রামধন। ভালই হয়েছে।

বিজয়। ওদের এখন এত কষ্ট হয়েছে কেন?

পিতা। আয় অতি অল্প। চা'ল অতি আক্রা।

পুত্র। চা'লের দর এত বাড়ছে কেন? এক্ষণ বিদেশে চা'ল না যেতে দিলে কি ভাল হয় না?

পিতা। বিষয়টা অতি জটিল। তোমাকে Economics (ধনতত্ত্ব) ভাল কোরে পড়্‌তে বলেছি।

পুত্র। আমি পড়তে আরম্ভ কোরেছি। সেদিন Henry George এর বহি পড়লাম, Free Trade ও Protection সম্বন্ধে।

পিতা। তিনি Free Trader, গরিবদিগের বন্ধু। তাঁর Progress and Poverty বিখ্যাত পুস্তক।

পুত্র। কিন্তু Free Trade এর পক্ষে তাঁর যুক্তি গুলি যেন এদেশে একবারেই লাগে না।

পিতা। সব দিক্ দেখা ভাল। রক্ষিত বাণিজ্যেরও দোষ আছে। তবে ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ব্যবস্থা। List লিখিত National System of Political Economy খানা পড়া বিশেষ আবশ্যক, তা আমি মানি। তিনি বলেন, সামাজিক বিকাশের জন্য Protection আবশ্যক। Economic Basis of Protection by Paten—

(মনোরমার প্রবেশ)

(মনোরমা নয় বৎসরের সুন্দরী কন্যা)

মনোরমা। বাবা, ভুদো আবার আজ বিলাতী কাপড় এনেছে। মা ও দাদা এত কোরে বলে দিলেন, "স্বদেশী কাপড় আনিস, বিলাতী কাপড় আনিসনে যেন।" দেখুন দিনি ভুদো তবু বিলাতী কাপড় এনেছে।

রামধন বাবু (পিতা)। (পুত্রের দিকে তাকিয়া) যখন এনে ফেলেছে, তখন থাক, কি বল?

মনোরমা। না, বাবা! দাদা বিলাতী কাপড় মোটেই পরেন না। আর আমরা পর্‌লে বড় দুঃখ করেন। তাই আমি আর মা ও আর বিলাতী কাপড় পরিনে।

রামধন। (পুত্রের প্রতি তাকিয়ে) তুমি বিলাতী কাপড় মোটেই পরো না?

বিজয়। (করযোড়ে) ওরূপ আজ্ঞা কর্ব্বেন না। আমি ভগবানের নাম নিয়ে শপথ করেছি—বিলাতী কাপড় পরবো না।

রামধন। (পিতা) কেন? তোমার কি সাহেবদের উপর বিদ্বেষ আছে? সাহেবদের উপর বিদ্বেষ করা আমি ভাল মনে করি নে। সাহেব-বিদ্বেষ বর্জ্জন করা উচিত। True patriotismএর জন্য সাহেব-বিদ্বেষ আবশ্যক নহে।

বিজয়। সাহেবদের উপর বিদ্বেষ করবো কেন, বাবা? আমরা ইংরাজি পড়ে অনেক ভাল কথা জানতে পেরেছি।—সেত Government আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন, তারি জন্য।

রামধন। তবে—?

বিজয় (পুত্র)। আমাদের এই পাড়া-

তেই যে দ্র ঘর তাঁতি ছিল, তাদের কষ্টত আপনি পূর্ব্বে দেখেছেন। তারা খেতে পেত না। কত সময় আপনার কাছেই ভিক্ষা কোরে খেত। এখন —

রামধন (পিতা)। এখন কি তারা রাজা হয়েছে?

বিজয় (পুত্র)। এখন আমরা স্বদেশী কাপড় পরি বোলেই তারা খেতে পাচ্ছে।

রামধন (পিতা)। তারা যাতে খেতে পায়, তা করাতে আমার আপত্তি নাই, গবর্ণমেণ্টেরও তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু বিদেশী জিনিষ বর্জ্জনে একটা বিদ্বেষ-ভাব কেন?

বিজয় (পুত্র)। কেন বিদ্বেষ ভাব বল্‌ছেন? আপনি ও আমি আমাদের নিজের পরিবারের খাবার যোগাড় আগে দেখি— তাতে কি অন্য পরিবারের উপর আমাদের বিদ্বেষ ভাব বুঝায়? অন্য পরিবারের উপর বিদ্বেষ ভাব থাক্‌লে, কেদার বাবুর পরিবারের আহারের জন্য কি আপনি আজ কেদার বাবুকে টাকা দিতেন, মা কি তাদের জন্য সিধে পাঠিয়ে দিতেন?

রামধন (পিতা)। তুমি বল্‌ছ, প্রত্যেক পরিবার যেমন নিজের খাবারের আগে যোগাড় করে, তাতে অন্য কোন পরিবারের উপর বিদ্বেষ বুঝায় না, তা স্বাভাবিক ও সঙ্গত; তেমনি, প্রত্যেক দেশ আপনার দেশের লোকের খাবার যোগাড় করে। এই তো তোমাদের কথা?

বিজয়। হাঁ, তাই। বাবা, আমার একটা কথা মনে হয়। আপনি নিজের ছেলে পিলের খাবার জন্য যে যোগাড় করেন, তাতে ত কেউ আপনাকে নিন্দা করে না। তবে আমরা যদি নিজের দেশের লোকের খাওয়ার জন্য চেষ্টা করি, তাতে কেন আমাদের নিন্দা হবে? তাতে কেন আমাদের মাঝে মাঝে কষ্ট পেতে হয়?

পিতা। তোমরা দাঙ্গা হাঙ্গাম কর কেন? তাতেই ত তোমাদের একটা বিদ্বেষ ভাব যেন ফুটে বেরোয়।

পুত্র। আমি কখন দাঙ্গা হাঙ্গাম করিনে। দাঙ্গা হাঙ্গাম হোলে আমার দুঃখ হয়।

রামধন (পিতা)। তবে তুমি যেখানে দাঙ্গা হাঙ্গাম হোচ্ছিল, সেখানে ছিলে কেন?

বিজয় (পুত্র)। ভয়টা মোটেই আর হয় না। আগে দাঙ্গা হাঙ্গামের নাম শুনিলেই পালাতাম। তখন ভয় হতো। এখন আর ভয় নেই।

রামধন (পিতা)। ভয় না থাকুক, বাছা দাঙ্গা হাঙ্গামায় থেকো না। দেশের সুশিক্ষা বিস্তার, কৃষিকার্য্যের উন্নতি, স্বাস্থ্যের উন্নতি ইত্যাদি অনেক ভাল আর নিতান্ত কর্ত্তব্য কাজ দাঙ্গা হাঙ্গাম না কোরে করা যায়। এই সকল কাজ অতি গুরুতর, অশেষ মঙ্গলজনক। অবিলম্বে এসকল আরম্ভ করা আবশ্যক। দাঙ্গা হাঙ্গাম কর্লে এসকল ভারি ভারি কাজের বিঘ্ন হবে। তুমি যদি মনে করো, "পাছে নিজের ছেলে দাঙ্গা হাঙ্গাম কোরে বিপদে পড়ে, তাই বাবা আমাকে দাঙ্গা হাঙ্গাম কর্ত্তে নিষেধ কচ্ছেন" তাই মহাপুরুষ দাদাভাই নারোজি মহাশয় যা বলেছেন, তা তোমাকে লক্ষ্য কর্ত্তে বলছি, "Bengalee"তে তাঁর "Advice" পড়েছ কি? তিনি বলেন :—

"I take this opportunity to entreat that all resort to violence should be avoided. Our grievances are many and they are just. Maintain the struggle for essential reforms with unceasing endeavour and self-

sacrifice peacefully, patiently and perseveringly and appeal without fear or faltering to the conscience and righteousness of the British Nation."

বেশ করে লক্ষ্য কর, তিনি বলেন, "all resort to violence should be avoided"—তিনি বলেন, "peacefully" দেশের কাজ করো।

বিজয়। মহাপুরুষ নারোজির কথা আমি স্বীকার করি। আপনার কথাও স্বীকার করি। বাবা, মনোরমা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, বিলিতী কাপড় ফিরিয়ে দিতে ভুদোকে হুকুম করুন,এই আমাদের প্রার্থনা।

রামধন। ওরে ভুদো, যা বিলিতী কাপড় ফিরিয়ে দিয়ে আয়। তোকে যখন স্বদেশী কাপড় আন্‌তে বলা হইয়াছিল, তখন বিলিতী কাপড় এনেছিস কেন ?

(ভুদোর প্রবেশ মাথা— চুলকাইতে চুলকাইতে।)

ভুদো। আজ্ঞে ও কথা আমি বুঝ্‌তে পারি নি। আর দাদাবাবু কাপড়ও ভাল চান, আর স্বদেশীও চান। আমি তো "স্বদেশী" দোকানে শিগ্‌গির খুজে পাই নে।

বিজয়। (ভুদোর প্রতি) তোকে কি কখনও বলেছি যে ভাল স্বদেশী কাপড় না পেলে বিলিতী কাপড় আনিস ?

রামধন। ভুদো, যা ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

(ভুদো নিস্ক্রান্ত)

মনোরমা। বাবা এবার পূজার সময় আমাকে কি রকম স্বদেশী কাপড় দেবেন ?

রামধন। (হাসিয়া) তোকে বাণারসী দিলে হবে ত ?

মনোরমা। (হাসিয়া) হবে, হবে—

(মনোরমার আনন্দে নিস্ক্রান্ত)

বিজয়। বাবা, আপনাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা কোর্কো ?

পিতা। বল।

পুত্র। এই বিলাতী কাপড়ের কথা। অনেক সাহেব বলেন, কোন বাঙ্গালীও নাকি বলেন যে, এদেশে বিলাতী কাপড় সস্তা দরে বিক্রী হওয়ায়, মোটের ওপর নাকি এদেশের উপকার হচ্ছে।

পিতা। হাঁ। Consumersদের অর্থাৎ যারা কাপড় পড়ে, তাদের উপকার হচ্ছে।

পুত্র। আর তাদের সংখ্যা—অর্থাৎ যারা কাপড় পরে, তাদের সংখ্যা তাঁতির সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী।

পিতা। বটেই ত।

পুত্র। তা'হলে, বিলিতী কাপড় চলিত হওয়ায় তাঁতিদের কষ্ট হলেও, অধিক লোকের উপকার হচ্ছে ?*

পিতা। তা নয় কি ? তুমি কি বলো ?

পুত্র। আমি যখন স্বদেশী কাপড় ভিন্ন পরি নে, তখন আমার মত ত বুঝ্‌তেই পাচ্ছেন ?

পিতা। তাহলে তুমি কি Protection ভাল বলিতে চাহ ?

পুত্র। অবশ্য যদি গবর্ণমেণ্ট সম্মত হতেন।

পিতা। সে দিন Bengaleeতে Bryan এর Speech পড়লে ত ? Americaর পক্ষে Protection কত অনিষ্টজনক, তিনি দেখিয়েছেন।

পুত্র। তবুত Americaতে Protection রয়েছে—কিন্তু ওসব জিজ্ঞাসা কর্ত্তে চাচ্ছি না। অনেক বড় সাহেবের ত ঐ মত। আমি আপনার কাছে জান্‌তে চাচ্ছি, আমাদের দেশে "স্বদেশী" ভক্তেরা যা বলেন,

---

* যখন দেশী কারবার মাটী হয়, তখন সে বিদেশী জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি হয়, তাহা কে না জানে ? ইংলণ্ডেও এখন চেম্বারলেন-প্রমুখ ব্যক্তিগণ Protection এর পক্ষপাতী। মহা পালোয়ানের সহিত দুগ্ধপোষ্য শিশুর যুদ্ধ মৃত্যুর কারণ। ন, স

কোন বড় ইংরাজ পণ্ডিত তা বলেন কি?

রামধন। অর্থাৎ, অনেক লোক কোন জিনিষ সস্তা পেলেও, যদি তাতে কোন ব্যবসা মাটী হয়ে যায় তা দেশের পক্ষে অমঙ্গল—এই কথাটা কোন বড় সাহেব বলেন কি না, এই তোমার প্রশ্ন?

বিজয় (পুত্র) আজ্ঞে হাঁ।

রামধন। নিকল্‌সন (Nicholson)* সাহেব ঐ কথা বলেন,—

"If a number of people lose their regular employment, or are converted from skilled to unskilled labourers, there may be little real compensation in the fact that a far greater number obtain some kind of commodities a little cheaper."

বিজয়। আর কোন্ লোক?

রামধন। হাঁ, জগন্মান্য গ্লাডষ্টোন।

বিজয়। তিনি কি বলেছেন?

রামধন (পিতা)। তিনি বলেছেন—

"It is a mistake to suppose that the best mode of giving benefit to the labouring classes is simply to operate on the articles which gave them a maximum of employment."

বিজয়। বাবা, এ বিষয় Adam Smith কি বলেন?

রামধন। তিনিও প্রকারান্তরে ঐ কথাই বলে গিয়েছেন।

পুত্র। তা হলে ত দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশের পণ্ডিতরা যা বলেন, অনেক বড় বড় ইংরেজও সেই কথা বলেন। আমরাও ত তাই বুঝি, যাতে দেশের অনেক লোকের ব্যবসা চলে ও অন্ন জুটে, তাই ভাল। তাই বুঝেই ত আমরা বিলাতী কাপড় বর্জ্জন করে, নিজের ক্ষতি স্বীকার করে, দেশের গরিব তাঁতিদের এক মুটা অন্ন দেবার চেষ্টা কর্চ্ছি। এতেত আমাদের সাহেব-বিদ্বেষ নাই। যে কর্ত্তব্য জ্ঞানে, লোকে নিজ পরিবারের জন্য খাবার জুটায়, সেই কর্ত্তব্য-জ্ঞান আরও একটু উন্নত হলে, দেশের গরিব লোকের খাবার জুটোবার চেষ্টা করে। নয়?

পিতা। ঠিক। আর সেই কর্ত্তব্য-জ্ঞান আরও উন্নত হলে, সকল দেশের লোকেরই উপকার করে। তাই, দেখ, সাহেবরা, দুর্ভিক্ষ হলে, ঐ দুর্ভিক্ষের কষ্ট নিবারণ কর্‌বার জন্য কত চেষ্টা করেন।

পুত্র। সাহেবরা দুর্ভিক্ষ হলে উদাসীন হয়ে বসে থাকেন না, অনাহারে যাতে লোক না মরে, তার নানা প্রকার চেষ্টা করেন—সেটা নিশ্চয়ই খুব ভাল, আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমরা আমাদের দেশের গরিব লোকের আহারের সংস্থানের জন্য, ক্ষতি স্বীকার করে, "স্বদেশী" দ্রব্য যে কিন্‌ছি, সেত প্রকারান্তরে গবর্ণমেণ্টকে দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা পক্ষে সাহায্য কর্চ্ছি, বই ত আর কিছু নয়। গবর্ণমেণ্টের যা উদ্দেশ্য, আমাদেরও তাই উদ্দেশ্য—দেশের গরিব যাতে অনাহারে না মরে।

রামধন। তুমি যে রকম কথা বলছো, তোমরা যদি সেই রকম ধীর ভাবে কজে কর, যদি তোমাদের ভিতর সাহেব-বিদ্বেষ না থাকে, এবং এদেশের গরিব লোকদের পতিত ব্যবসা উদ্ধার করবার জন্য স্বদেশী জিনিষ কেনো, তা হলে গবর্ণমেণ্ট কখনই ছাত্রমণ্ডলীকে গবর্ণমেণ্টের বিরোধী মনে কর্বেন না। বরং ক্রমে তোমাদের শান্তিময়

---

* Professor of Political Economy in the University of Edinburgh—Element of Political Economy.

ক্ষতি স্বীকার দেখে, প্রশংসা কর্ব্বেন।

(মনোরমার প্রবেশ)

মনোরমা। "বাবা, ভুদো বিলাতী কাপড় দোকানে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছে না। বল্‌ছে, ফিরিয়ে নেবে না।"

রামধন। হরিপদ, তুমি ভুদোর সঙ্গে যাও। বিলাতী কাপড় ফিরিয়ে দিয়ে স্বদেশী কাপড় কিনে নিয়ে এস।

হরিপদ সরকার। আজ্ঞে চল্লাম। হরিপদ ও ভুদো বাজারে বিলাতী কাপড় ফিরিয়ে দিয়ে স্বদেশী কাপড় ক্রয় করিয়া আনিল। কন্যাটী কাপড় লইয়া ভিতরে গেল।

(কেদারের প্রবেশ)

রামধন বাবু। কি কেদার, খাওয়া দাওয়া না করেই ইরি মধ্যে আবার যে?

কেদার। আজ্ঞে—আমি বাড়ী গিয়ে দেখ্‌লাম, আপনার গৃহলক্ষ্মী আমি আসবার আগেই সিধে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হাঁড়ি চড়েছে। তাই টাকাটী ফেরত দিতে এসেছি।

রামধন বাবু। অমন কথা বল না কেদার। তা'হলে আমি রাগ কর্ব্বো। এখন বাসায় গিয়ে খাওয়া দাওয়া করগে।

(কেদার বাবু নিষ্ক্রান্ত)

৪র্থ দৃশ্য।

(রাত্রি দশটা, রামধন বাবু ও তাহার স্ত্রী আসীন)

স্ত্রী। ছেলের বিয়ে কি কর্চ্ছো?

স্বামী। একটী খুব সুন্দরী পাত্রী পাওয়া গিয়েছে, আমি বলেছি ছ হাজার টাকা।

স্ত্রী। তার পর?

রামধন বাবু। এখন কি হয় দেখা যাক্।

স্ত্রী। এদিকে ছেলে কি বলে তার খবর রাখো কি?

রামধন। ছেলে আবার কি বলে?

স্ত্রী। ছেলে কেদার বাবুর মেয়েকে বিয়ে কর্ত্তে চায়।

স্বামী। হাঁ? কেদার বাবু? কোন্ কেদার বাবু, কেদার মুখুয্যে, ঐ ভিক্ষুক? আমাদের ভিক্ষাতে যার হাঁড়ি চড়ল?

স্ত্রী। হাঁ। ভিক্ষুক বলিতে চাহ, বল। ঐ ভিক্ষুকের কন্যাকে তোমার ছেলে বিয়ে কর্ত্তে চায়।

স্বামী। অবাক করেছে। ছেলেটা অত বড় হোলো, একটু জ্ঞান হলো না। একটু লজ্জা শরম হলো না। নিজের বিয়ের নিজেই কর্ত্তা। বাপ মা এখন ছেলে মেয়ের গোলাম যেন—।

স্ত্রী। তারা যেন নিজেই খুব বুঝে—তবে, কেদার বাবুর মেয়েটী সুন্দরী বটে—নিখুঁত সুন্দরী।

স্বামী। সুন্দরী হলে কি হয়? বাপ যে কাঙ্গাল—কাঙ্গাল ভিক্ষুক। তার কি?

স্ত্রী। তবে, এক কথা, বেয়াই জমীদারই হোক আর কাঙ্গালই হোক, ছেলের তাতে কি? জমীদারির ভাগত আর জামাইকে দেয় না।

রামধন। আরে বকুলপুরের পাত্রীর পিতা যে ৫০০০৲ টাকা নিজে দিতে চেয়েছে। ৭০০০৲ত দেবেই, ৮ আট হাজার হয়ত দিতে পারে। টাকা, টাকা নয় কি? তুড়িতে ৬০০০৲ বা ৮০০০ আসে। নয়?

স্ত্রী। বলি—নারায়ণের ইচ্ছায় আমাদের ত অভাব নাই, আর ৬০০০৲ টাকায় কিছু জমীদারি কেনা যাবে না।

রামধন। তুমিও বুঝি তোমার ছেলের দিকে?

স্ত্রী। ছেলের দিকে আর কি, একটী

সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব, আমার এই সাধ।

রামধন। আর টাকা ?

স্ত্রী। তোমার ছেলে বলেছে, পাত্রীর পক্ষ হতে দস্তুর কোরে এক পয়সা নিলে আমি সে বিয়ে কখনই কর্ব্বো না।

স্বামী। কেন ?

স্ত্রী। সে বলে, টাকা নিয়ে বিয়ে করা মহাপাপ। আর পাপই বা নয় কেমন কোরে ? আমার বাবা তাঁর বাড়ী বন্দক দিয়ে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন, সেই বিয়েতই তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন। বাবার দুঃখ দেখে আমি ভেবেছিলাম যে, টাকা নিয়ে যেন কেউ বিয়ে না করে।

স্বামী। সব ভদ্র লোকেইত তা কচ্ছে।

স্ত্রী। ঘৃণিত কাজ কচ্ছে।

স্বামী। ভাল। ওদিকে ছেলে "স্বদেশী" সম্বন্ধে আমাকে শিক্ষা দিতে আসে। এদিকে বিয়ে সম্বন্ধে তুমি আমার শিক্ষক হয়ে পো'লে। বা! এখন ছেলে বাপের উপদেষ্টা—স্ত্রী স্বামীর শিক্ষক—ভাল।

স্ত্রী। আমি তোমাকে শিক্ষা দেব, একি কথা ? তবে ছেলে বলে,"আমি যেমন ভগবানের নাম নিয়ে স্বদেশী কাপড় ছাড়া আর কোন কাপড় পর্ব্বো না,শপথ কোরেছি, তেমনি, ভগবানের নাম নিয়ে দিব্যি করিছি, আমি বিয়েতে কখনই টাকা নেব না—বরঞ্চ চিরকাল আইবড় থাকবো; তবুও যে বিয়েতে টাকার কথা উঠবে, সে বিয়ে কখনই কর্ব্বো না।" আমার দোষ কি ? তোমার ছেলে তুমি বুঝাও।

রামধন। সাহেবরা যে বলে, ছেলেগুলা লেখা পড়া শিখে একেবারে জাহান্নামে যাচ্ছে, গুরুজনকে ভক্তি করে না, যথেচ্ছা-চারী হচ্ছে, তাত ঠিক কথা। বেশ বেশ, তুমি আর ছেলে একদিকে। বেশ। হয়েছে ভাল। আমি হোলাম ছেলের অহিতকারী। তুমিই কেবল ছেলের হিতকারিণী।

স্ত্রী। রাগ কর্চ্ছো কেন ? ছেলেকে বুঝায়ে রাজি কর্ত্তে পার ভালই, বড় মানুষের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে কি আমার অসাধ আছে। তবে কেদার বাবুর মেয়েটী নিখুঁত সুন্দরী, আর ছেলের এ বিয়েতে মত আছে, তাই বল্‌ছিলাম।

স্বামী। না—না—সে বিয়ে হবে না, কখনই হবে না।

(৫) দৃশ্য।

(স্থান—মেসের বাসা, সময়—প্রাতঃকাল, আসীন রামধন বাবুর পুত্র বিজয়,আর তাহার বন্ধু হরগোবিন্দ।)

হরগোবিন্দ। তুমি কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্ব্বে ?

বিজয়। কখনই না। যেমন স্বদেশীর প্রতিজ্ঞা, বিদেশী কাপড় পর্ব্বো না, তেমনি ভাই জেনো, বিবাহে টাকা নেব না, এই প্রতিজ্ঞা—উভয়েই পবিত্র প্রতিজ্ঞা।

হরগোবিন্দ। তবে বকুলপুরের জমীদারের মেয়েকে তুমি বিয়ে কর্ব্বে না।

বিজয়। কখনই না। দেখ বন্ধু, কেবল বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনে আমাদের দেশের উন্নতি হবে না। সামাজিক উন্নতিও কর্ত্তে হবে! সঙ্গে সঙ্গে সব দিকেই নীচতা ত্যাগ কর্ত্তে হবে। আমাদের দেশটাকে নৈতিক ভিত্তির উপরে স্থাপন কর্ত্তে হবে।

হরগোবিন্দ। তবে কি বাপ মার অবাধ্য হতে হবে ?

বিজয়। স্বদেশীতে যেমন বাপ মার পা ধরে তাঁদের সম্মত করিছি, এতেও তেমনি

কর্ত্তে হবে। নীলামী বিবাহ বর্জ্জন কর্ত্তে হবে।

হরগোবিন্দ। "নীলামী বিবাহ" কি?

বিজয়। টাকা নিয়ে যে বিয়ে, তাকে আমরা "নীলামী বিবাহ" বলি। "নীলামী বিবাহ" ঘৃণিত, অকর্ত্তব্য, ত্যজ্য—যেমন বিদেশী বস্ত্র। ভাই, সেদিন একখানা নূতন Political Novel পড়্‌ছিলেম। নভেল-খানা ইংরাজিতে, গ্রন্থকার একজন ব্যারিষ্টার নাম—Ghamat—বোধ হয় পার্শি। বেশ লিখেছেন, তিনি বলেন,—

"What a vice has crept into our community? It is a shame that young men should offer themselves for sale in the matrimonial market and knock themselves down to the highest bidder. They are marital beggars and educated mendicants".

কেমন ভাই বেশ বলেছেন না কি?

"Highest bidder"-marriage—বিবাহে নীলাম।

"It is a vice"—"a shame" "marital beggars" "educated mendicants"

হরগোবিন্দ। পাপ কিসে বুঝিয়ে দেও।

বিজয়। পাপ কাকে বলে?

হরগোবিন্দ। ও বড় কঠিন প্রশ্ন? তবে শুনেছি, যাতে সমাজের অধিকাংশ লোকের অনিষ্ট হয় বা অসুখ হয়, তাকে পাপ বলে, আর অধিকাংশ লোকের যাতে অধিক সুখ, Greatest happiness of the greatest number—তাই নাকি পুণ্য।

বিজয়। বেশ, অধিকাংশ লোকের যাতে দুঃখ হয়—অসুখ হয়,তাই পাপ। এক্ষণ দেখ, এই যে বিয়েতে টাকা লওয়া, এটাতে মোটের উপর সমাজে কোন লাভ আছে কিনা, মোটের উপর ইঁহাতে অধিকাংশ লোকের অসুখ হচ্ছে কি না। চুরিতে বা ডাকাতিতে যে ব্যক্তি টাকা পায়, তার লাভ, কিন্তু চুরি ও ডাকিতে চলিলে তাতে অধিকাংশ লোকের কষ্ট হয়, তাই চুরি বা ডাকাতি পাপ। তেমনি বিয়েতেও টাকা নেওয়ায় অধিকাংশ লোকের কষ্ট হয়, তাই তা পাপ।

হরগোবিন্দ। বিয়েতে টাকা নেওয়া চুরি বা ডাকাতির সঙ্গে সমান কি? বিয়েতে টাকাত লুকিয়ে বা জোর করে কেহ নেয় না, কন্যাপক্ষ ইচ্ছা করে টাকা দেয়।

বিজয়। সে কেমন ইচ্ছা জান? পথেতে দস্যু দাঁড়িয়ে আছে, পথিককে বল্‌ছে যে, "এ পথে যদি যেতে চাও,আমাকে টাকা দিতে হবে, নতুবা যেতে পাবে না" পথিকের ওদিকে না গেলে নয়, সুতরাং পথিক দস্যুকে টাকা দিল। সে যেমন ইচ্ছাতে টাকা দিল, আজ কাল কন্যাপক্ষত তেমনি "ইচ্ছাতে" পাত্রপক্ষকে টাকা দেন।

হরগোবিন্দ। না ভাই ও কথা ঠিক নয়। মেয়ের বাপ সেধে টাকা দেয়।

বিজয়। Victor Hugoর উপখ্যানে একটা "সেধে দেওয়ার" কথা পড়েছি। সে ভীষণ—!

হরগোবিন্দ। সে কি?

বিজয়। একজন রাজপুরুষ একটী বিদ্রোহীর বাড়ীতে এসেছে, বিদ্রোহীকে নিয়ে গেলেই বিদ্রোহ-অপরাধে ফাঁসী। স্নেহময়ী কুমারীকন্যা দেখল, ধরে নিয়ে গেলেই বাপের ফাঁসী হবে, আরও বুঝলো তার রূপে রাজপুরুষ মুগ্ধ। বুঝিল, বাপকে বাঁচাবার উপায় আছে, নিজের সতীত্বকে বলিদান দিলে পিতার প্রাণরক্ষা হয়। প্রথমে সতীত্বনাশের ভয়ে দেহটা কাঁপিল, কিন্তু দেখিল, ওদিকে বাপের ফাঁসী, এদিকে

নিজের সতীত্বে ফাঁসি। ওদিকে বাপের জীবন, এদিকে নিজের জীবনের অপেক্ষাও যে যাহা মূল্যবান তাহার ফাঁসি!—স্নেহময় কন্যার শরীর কাঁপিতে লাগিল—সময় নাই। মুহূর্ত্তের মধ্যে ঠিক করিতে হইবে, কোন্ পথে যাইবে—কন্যা স্থির করিল, আমার সতীত্বের বলি দিয়া বাপকে বাঁচাইব, তারপর আমি মরিব। সে ইচ্ছা করে তার দেহটা সমর্পণ কর্ত্তে সম্মত হলো। পাছে রাজপুরুষ সন্দেহ করে যে সে ফাঁকি করে তার বাবাকে বাঁচাইবার চেষ্টা কর্চ্ছে। তাই সে নিজের গলা হাড়কাটে বলি দিবার জন্য, রাজপুরুষকে সেধে ডেকে নিয়ে অন্য ঘরে গেল—আর বল্‌তে পারি না—সেই লোমহর্ষণ ব্যাপার! হরগোবিন্দ, সে কি রকম "সেধে দেওয়া?"

হরগোবিন্দ। তুমি কি বল্‌তে চাও সেই কুমারীর আত্মদেহ "সেধে" বলি দেওয়া আর—কন্যাপক্ষ হইতে সেধে টাকা দেওয়া এক রকম?

বিজয়। হাঁ, প্রায় একরকম।

একদিকে কন্যাদায়ে পড়িয়া পিতার জীবনের জন্য,সাধিল আমার সতীত্ব-রত্ন লও, আর একদিকে পিতা কন্যার দায়ে পড়িয়া, সাধিল, আমার সর্ব্বস্ব লও। একদিকে পিতার উপর কন্যার স্নেহ, আর একদিকে কন্যার উপর পিতার স্নেহ। উভয়েরই দায়, উভয়েরই প্রাণগ্রাহকের নিষ্পেষণ—উভয় স্থলেই দান নহে,উভয়স্থলেই most lamentable extortion.

হরগোবিন্দ। অনেকেই যে কন্যার বিবাহে বাধ্য হয়ে; অনিচ্ছা অক্ষমতা সত্ত্বেও টাকা দেয়, তা না হয় আমি স্বীকার কল্লাম। কিন্তু লোকে যা অনিচ্ছা বশতঃ করে, তাই যে পাপ তাত বলা যায় না। বিয়েতে টাকা নেওয়া পাপ, আমি এক্ষণও বুঝতে পাচ্ছিনে।

(রমানাথের প্রবেশ)

রমানাথ। কি কথা হচ্ছে?

বিজয়। হরগোবিন্দ একটা অতি সহজ কথা বুঝতে পাচ্ছে না। বিয়েতে টাকা লওয়া পাপ,এই কথাটা হরগোবিন্দকে বুঝিয়ে দেও।

রমানাথ। শোন ভাই, হর! কথাটা বিজয় যত সহজ বল্‌ছে, তত সহজ না বোধ হতে পারে। আমি বল্‌ছি একটু মন দিয়ে শুনে যেও। আমার বলা হলে তার পর উত্তর কর। প্রথমে বিবাহ পদ্ধতি ছিল না। তখন পুরুষ ও নারীর মধ্যে পশুবৎ ব্যবহার যে পাপ, তা মানুষ সেই অসভ্য অবস্থায় বুঝতে পারেনি। যখন বুঝতে পার্‌লো এই রকম পশুবৎ যথেচ্ছ ব্যবহার সমাজের পক্ষে অনিষ্টজনক, তখন বুঝিল তাহা পাপ; তাহা ত্যাগ করিল, বিবাহের নিয়ম স্থাপন করিল। আবার মানুষ যখন অসভ্য ছিল, তখন সুবিধা পাইলে অন্য জিনিষ চুরি করিত বা কাড়িয়া লইত। তখন তাহাতে লজ্জা বা নিন্দা ছিল না, তাহা পাপ বলিয়া বোধ ছিল না। বরঞ্চ তখন তাহাতে গৌরব ছিল। তখন সকলেই আত্ম-বাহুবলে আপনার ধন রক্ষা কর্ব্বার চেষ্টা কোর্ত্তো। কেহ নীতির দোহাই দিত না। যখন লোকে বুঝল, এইরূপ পরস্ব-হরণ বা লুণ্ঠনে সমাজের অনিষ্ট হয়, অধিকাংশ লোকের অসুবিধা হয়, তখন পরস্ব-হরণ বা লুণ্ঠনকে পাপ বলে বুঝল, তাহাকে নিবারণ কর্ব্বার নিয়ম কর্‌লো। তখন বেশ বুঝলো যে, হরণ বা লুণ্ঠন কল্লাতে, যে ব্যক্তি হরণ করে তাহার লাভ বটে, কিন্তু লোক অনেকে

সদাসর্ব্বদা আত্মধন রক্ষা কর্ব্বার জন্য ব্যতি-ব্যস্ত থাকতে হয়, সদাসর্ব্বদা অশান্তিতে থাকতে হয়। সুতরাং হরণ ত্যাগ কর্‌লো। তখন হরণ করা যে পাপ, লোকের বেশ ধারণা হোল। এখন সভ্যসমাজে এমন ধারণা হয়েছে যে, হরগোবিন্দ, চুরি করা যে পাপ, তা তোমাকে বা কাহাকেও বুঝাতে হয় না। যাতে সমাজের ধনের বৃদ্ধি হয়না, কেবল ধন হস্তান্তর হয় মাত্র, অথচ হস্তান্তর হবার সময়ে এক পক্ষের (বরপক্ষের) উপকারের অপেক্ষা আর এক পক্ষের (কন্যা পক্ষের) অপকার হয়, তা মোটের উপর সমাজের অনিষ্টজনক। বরপক্ষ যত বড় মানুষ, কন্যাপক্ষকে তত অধিক টাকা দিতে হয়। যে যত বড়মানুষ, তার টাকার তত কম দরকার। সুতরাং এই নিয়ম সমাজের ইষ্টজনক নহে। বরপক্ষ জমিদার; তার দুই হাজার পাঁচ হাজার টাকাতে যায় আসে না। কিন্তু কন্যাপক্ষ হয়ত গরিব। তার দুই হাজার বা পাঁচ হাজার দিতে হলে বাড়ী বাঁধা দিতে হবে, টাকা শোধ দিতে হলে, ছোট ছোট ছেলের দুধ পর্য্যন্ত কমাতে হবে।

হরগোবিন্দ। যে গরিব, সে বড়মানুষের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে যায় কেন?

রমানাথ। যায় কেন? যেখানে অবাধ প্রতিযোগিতা, সেখানেই এই রকম। যেখানে প্রাপ্য দ্রব্য কম, গ্রাহক অনেক, সেখানেই (যদি ধর্ম্মজ্ঞান প্রতিযোগিতাকে দমন না করে) সেখানেই সমাজ জাহান্নমে যায়।

হরগোবিন্দ। সাহেবদের বহিতে পড়েছি যে, প্রতিযোগিতাই উন্নতির মূল।

রমানাথ। যে বহিতে ও কথা পড়েছ, তা ঐ ডোবার জলে টান দিয়ে ফেল দেও। কার্লাইল প্রতিযোগিতাকে কি বলেছেন, তা কি জান না?—"Cut-throat competition," "mutual hostility." বিবাহে যে competition, ওটাও cut-throat competition—পাত্রীর পিতা কত সময়ে টাকা দিবার সময় উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলে, "cut my throat and take my daughter."

হরগোবিন্দ। বিবাহে cut-throat competitionটা আমি ভাল বুঝতে পার্‌লাম না এখনও।

রমানাথ। rackrenting কি জান? ঐ cut-throat competition। জমী কম, প্রজা অধিক। একজন প্রজা জমীদারকে বল্‌লো ২৲ বিঘা দেব, আর একজন বল্লো ৪৲, আর একজন বল্লো ৮৲, এই রকমে সব খাজনা এত অধিক হয়ে যায় যে, সেই খাজনা দিতে প্রজার জিভ বেরিয়ে যায়, একবেলা মাত্র খেয়েও সেই জমীর খাজনা শোধ কর্ত্তে পারে না, শেষে জমীদারের খাজনার দায়ে জমাজমি বিক্রি হয়ে বাস্তবাড়ী পর্য্যন্ত বিক্রি হয়ে যায়। তখন যদি প্রজাকে কেউ বলে যে, "বেটা তোর যে টাকা দেবার সামর্থ্য নেই, সেই টাকা খাজনা দিতে কবুল করেছিলি কেন" তার যেমন সহৃদয়তা ও তী প্রকাশ পাবে, তেমনি, যদি কেহ কন্যার বাপকে বলে, "বাপুহে তোমার যে টাকা দেওয়ার সামর্থ্য নেই, সে টাকা দিয়ে বিয়ে দিতে স্বীকার হয়েছিলে কেন?"—সেই ব্যক্তিরও, তেমনি, সহৃদয়তা ও সমাজ-তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পাইবে। বিয়েতে টাকা নেওয়ার বিশেষ একটা অনিষ্ট এই যে, এই cut-throat competition গুণে কন্যার বাপের কতদূর সামর্থ্য, কন্যাদায়ে তার অপেক্ষা অধিক টাকা

দিতে বাধ্য হয়। কন্যাপক্ষের গরজ অধিক, পুত্র যতদিনই অবিবাহিত থাকুক, সমাজে নিন্দা নাই। কিন্তু কন্যা বয়প্রাপ্ত হওয়ার পর অবিবাহিত থাকায়, সমাজে নিন্দা আছে; যতই বয়স অধিক হইবে, তত নিন্দা অধিক। সুতরাং কন্যার পিতা দায়গ্রস্ত, সে বিপন্ন, অবিলম্বে বিবাহ দিতে হইবে। কেহ দায় পড়িলে বা বিপন্ন হোলে তাকে সাহায্য করাই সঙ্গত, কিন্তু এই "নীলাম বিবাহে" কন্যার পিতা বিপন্ন বলেই পাত্রের পিতা তাহাকে নিষ্পেষণ কত্তে সুবিধা পান। হরিণ যখন খাদে পড়ে, তখনি শৃগালের সুবিধা। রায়ত বেটাদের জমী না নিলে চল্‌বে না। জমীদার গড়্ হোয়ে তাকিয়া ঠেস দিয়া বোসে গোফে তা দিচ্ছেন, জমী নীলাম ডাকে বন্দোবস্ত হচ্ছে। খাজনায় নিরিখ বিঘা প্রতি এক টাকা, এক, এক— দো, দো—তিন, তিন—যায়, যায়—তিন রুপেয়া, তিন রুপেয়া—ছ, ছ, ছয় একবার, ছয় ছবার, ছ তিন, ঠক্ ঠক্ (হাতুড়ির শব্দ) জমী বিলি হলে হলধর মণ্ডল মরিল। জমী গেল। হতভাগ্য হলধর! পাত্রীও ডাক নীলামে বিলি হয়—যেমন জমী, ঘোড়া, কুকুর ডাক নীলামে পাওয়া যায়, তেমনি পাত্রও নীলাম ডাকে পাওয়া যায়—

"শ্রীমন্ত ভাদুড়ীর পুত্র নবকান্ত ভাদুড়ী এণ্ট্রাস পাশ, সালিয়ানা আয় ৫০০০ হাজার— ডাকো, কে ডাকুবে? কন্যার পিতাগণ ডাকো—ডাক আরম্ভ—"এক হাজার; এক হাজার,"—"দুই হাজার"—"দু হাজার"— "তিন" "তিন—তিন" "আর কেও ডাকবে" "পাঁচ হাজার"—"পাঁচ হাজার"—"পাঁচ হাজার এক, পাঁচ হাজার দো, পাঁচ হাজার তিন।" একেই বলে cut-throat competition.

হরগোবিন্দ। টাকা যদি না দেওয়া যায়, তা হলে কাল মেয়ে লোকে বিয়ে কর্ব্বে কেন?

বিজয়। এখন যে কাল কুৎসিৎ মেয়ের বাপের টাকা নেই, তাঁর ত বিয়ে হচ্ছে।

হরগোবিন্দ। কিন্তু তার ত ভাল বরের সঙ্গে বিয়ে হয় না।

বিজয়। অর্থাৎ কুৎসিত মেয়ের বিয়েতে খুব টাকা না দিতে পার্লে গরিব ঘরে বিয়ে হয়, এই ত?

হরগোবিন্দ। হাঁ।

বিজয়। প্রথমতঃ গরিবের ঘরে বিয়ে হলেই যে মেয়ে অসুখী হয়, তা নয়। পাত্র যদি সচ্চরিত্র হয়, তা হলে মেয়ে সুখী হবার সম্ভব।

রমানাথ। সে কথা এখন ছেড়ে দাও। কিন্তু যদি গরিব পাত্রটীর সঙ্গে ধনীর কুৎসিৎ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়, তাতে সমাজের উপকার বই হানি নাই।

হরগোবিন্দ কেন?

রমানাথ। বর, টাকা দিতে পার্লে, জমীদারের পুত্র রামের সঙ্গে কামিনীর বিয়ে হোত। কামিনীর বাপ টাকা দিল না, তাতে কামিনীর (গরিব) কেশবের সঙ্গে বিয়ে হল। জমীদারের পুত্র রামের অপর একটী পাত্রী প্রমদার সঙ্গে হয় ত বিয়ে হল। গরিবের মেয়ে অথচ সুন্দরী। ধনী রামের সঙ্গে কামিনীর বিয়ে না হয়ে প্রমদার সঙ্গে বিয়ে হল, সমাজের তাতে কোন ক্ষতি নাই। বরঞ্চ লাভ, ধনীর সঙ্গে ও দরিদ্রের সঙ্গে মিলন হলো। ধনী দরিদ্রের ঘরে আস্‌তে বাধ্য হল। ধনের অহঙ্কার ও দর্প যতই কমে, সমাজের ততই মঙ্গল।

ফল কথা, যদি "নীলামী বিয়ে" উঠে যায়,

আর পাত্র ও পাত্রীর সংখ্যা এখন যেমন আছে,ভবিষ্যতে তেমনি থাকে, তা হলে এখন যেমন সকল মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, তখনও হবে, কেবল লাভ এই যে, সমাজে এখন প্রতিযোগিতা জন্য মেয়ের বাপের যে উদ্বেগ, কষ্ট, লাঞ্ছনা, কণ্ঠগত-প্রাণ হয়, তা আর হবে না; আর পাত্রের পক্ষে যে নীচতা, নৃশংসতা ও বিবাহরূপ পবিত্র সম্বন্ধ স্থাপনের সময়ে অপবিত্র ঘৃণিত বণিক-বৃত্তির আর বিকাশ হবে না। বিয়েতে ছেলে বিক্রয় কোরে টাকা নিয়ে এই পাপের টাকায় কখন কারো সুবিধা হয় নি। মঙ্গল কার্য্যের সময়, তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে পাত্রীর পিতা যে টাকা দেন, তাতে পাত্রের পিতার বা পাত্রের কখন মঙ্গল হ'তে পারে না। ভগবানের নিকট সে বিবাহ অভিশপ্ত। সে বিয়েতে বিয়ের রাত্রিতেই, বিবাহ-প্রাঙ্গণে, ছালনা-তলায় সেই দাম্পত্য জীবন-ক্ষেত্রে পাপ—বিষ-বৃক্ষের বীজ বপন করা হয়। সেই বিবাহের সময় পবিত্র হোমাগ্নিতে নরকের অগ্নি আসিয়া স্পর্শ করে। হা, হরগোবিন্দ,আমি তোমাকে যথার্থই ভগবানকে সাক্ষী কোরে বলছি—সে বিবাহে পবিত্র দাম্পত্য সম্বন্ধ বারাঙ্গনার বণিকবৃত্তিতে দূষিত হয়।

হরগোবিন্দ। কি বল্‌ছো—বিবাহে বারাঙ্গনার ভাব?

রমানাথ। হাঁ, সে বিবাহে বারাঙ্গনার ভাব ফুটিয়া উঠে। কেন? বারাঙ্গনা ও পত্নীতে তফাৎ কি? বারাঙ্গনা টাকার জন্য দেহ বিক্রয় করে। পতি পত্নীর সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু টাকার বেচা কেনা সম্বন্ধ নাই। তাতে ধর্ম্মের মন্ত্রপূত পবিত্র সম্বন্ধ। স্বামী সুখে রাখেন, দুঃখে রাখেন, খেতে দিতে পারেন, না পারেন, পত্নী তাঁর চির সহচরী, চরণের দাসী, বিপদে ও দারিদ্র্যে স্নেহময়ী, পতি-জীবন-তরির ধ্রুবতারা—শোকে দুঃখভাগিনী,রোগে জননী, শ্মশানে সহমরণে অভিলাষিণী। সেই পবিত্র সম্বন্ধে বণিকবৃত্তি কোথাও না থাক্‌লে কি সুন্দর দৃশ্য হ'ত। তাতে বারাঙ্গনার ভাব এসে পড়্‌তো না। বিয়েতে টাকা নিলে, এমন যে পবিত্র সম্বন্ধ, তারপত্তনেই বণিকবৃত্তি-মূলক বারাঙ্গনা ভাব এসে পড়ে। বেশ্যা যেমন বলে "টাকা দাও, তবে তোমার সঙ্গে আমার সহবাস-সম্বন্ধ হবে, তেমনি, যে পাত্র টাকা চায় ও নেয়, সেও প্রকারান্তরে বলে, টাকা দেও তবে তোমার সঙ্গে আমার সহবাস সম্বন্ধ হবে,—ছি! ছি! ছি!

বিজয়। ছি! ছি! ঘৃণার কথা! লজ্জার কথা!

হরগোবিন্দ। হাঁ, লজ্জার কথা, ঘৃণার কথা—ঠিকইত। বেশ বুঝ্‌ছি, নীলামী বিয়ে নারকী বিয়ে।

রমানাথ। নারী বেশ্যা এত দিন শুনেছি। আজ দেখ্‌ছি, ভারতে পুরুষ বেশ্যা accursed monstrosity.—হরগোবিন্দ! হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ বলেছেন, টাকা নিয়ে যে ছেলের বা মেয়ের বিয়ে দেয়, সে ছেলে ব্যাচে বা মেয়ে ব্যাচে, সে বিয়ে নয়—সে ব্যাচা; সেই ব্যক্তি শুক্র-বিক্রেতা, নরকগামী পাষণ্ড হয়! কোথায় আজ আমাদের সে হিন্দু-ধর্ম্ম,আমাদের স্বদেশী সনাতন ধর্ম্ম?

হরগোবিন্দ। আমি নীলামী-বিবাহ-বর্জ্জন-সভার সভ্য হব।

রমানাথ। ভাল, পশ্চিমে কায়স্থ "বিবাহ-ব্যয় সঙ্কোচ" সভাতে মুন্সী অযোধ্যা প্রসাদ গত বৎসর বক্তৃতাতে একটু কি বলেছিলেন, শুন—একটু পড়ি—শুন—শেষ ভাগ—

"Gentlemen, pardom me if my outspokenness gives offence to any one present. But I must speak up, I must tell you the naked truth that the man who contract a mercenary marriage is a despicable creature. He sells himself, and thus pollute the tabernacle of holy matrimony. He perverts the sacred tie of conjugal love into a satanic alliance of grovelling lucre and bestial lust. The man who makes marriage an occasion for extorting money from the father of his future wife is a rancorous vulture, an atrocious plunderer, a disgrace to humanity, a moral plague—a horrible monster in human shape—whom no well-regulalated soul can tolerate for a moment.

বিজয়। Capital. The whole speach is a magnificent one.

হরগোবিন্দ। তোমাদের নীলামী-বিবাহ-বর্জ্জন-সভার সভ্য হতে হলে কি কর্ত্তে হবে?

রমানাথ। শপথ কর্ত্তে হবে, তুমি নিজে নীলামী-বিবাহ কর্ব্বে না, আর অন্যকে যত দূর পার, ঐ মতে আন্‌তে হবে।

হরগোবিন্দ। শপথ কর্ব্বো।

রমানাথ। বেশ, আগামী পূর্ণিমা সূর্য্যোদয়ের আগে প্রাতঃস্নান কোরে আমাদের সভা-মন্দিরে যেও। শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ স্বামী জী তোমাকে দীক্ষিত কর্ব্বেন।

হরগোবিন্দ। সে দিন আর কারো দীক্ষা হবে?

রমানাথ। হবে, এক শত জন ছাত্রের দীক্ষা হবে। (সকলের প্রস্থান)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

মহাযজ্ঞ।

যদি মুনি, ঋষি, সংযমী, সাহসী,
থাক কেহ কোথা আজ মহাবীর,
কুড়াইয়া আন জীর্ণ-নর-অস্থি
বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বিংশতি কোটীর;
উপরি উপরি সাজাও তাদেরে
কুরুক্ষেত্রে ধূ ধূ বালির উপর,
প্রলয় প্রাক্কালে করি গঙ্গা স্নান
নিমন্ত্রিয়া আন বিশ্ব চরাচর।
সাধন-আসনে বস শুচি হয়ে,
বৈদিক যজ্ঞের কর অনুষ্ঠান।
গৈরিক উত্তরী 'পরি' গ্রীবাদেশে,
বীরাচারে কর গায়ত্রী ধেয়ান।
ভকতি-তৈলেতে শকতি-প্রদীপ
জ্বলুক ওধারে উজলি প্রাঙ্গণ,
প্রাণ গুলি নিয়ে পর্ণ-পুটে করি
সাজাওরে অর্ঘ্য যজ্ঞ নিকেতন।
ভৈরবী-প্রতিজ্ঞা-তিল-ধান্য লয়ে,
কার্য্য-হব্যে তাহা মাথ একবার।
খাণ্ডব দাহন করিয়া স্মরণ,
আরম্ভহ যজ্ঞ লয়ে ঘৃতাধার।
হুহুঙ্কার মন্ত্রে প্রতি পলে পলে
উঠুক অনল দিগন্ত ব্যাপিয়া
ধক্ ধক্ জিহ্বা প্রকাশি বিশাল।
সাত শ বর্ষের শুষ্ক আবর্জ্জনা,—
ভীরুতা, দৌর্ব্বল্য করিয়া শোধন,
ছুটুক বিজলি ধমনী ফাটিয়ে,
জীমূত মন্ত্রেতে করুক গর্জ্জন।
যাও শিখা, হিম পাষাণের তলে

উঠ ঊর্দ্ধমুখী সুমেরু চূড়ায় ;
শীত-সুপ্ত রন্ধে রসাতল-অহি
রুদ্র তেজে যেন আসি বাহিরায়।
ছুটুক বিশ্বের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ধ্বনি
জাগুক ত্রিদিবে দেবাসুরগণ,
হ'ক্ ভূমিকম্পে পৃথিবী বিদারি'
আগ্নেয় গিরির অগ্নি বরিষণ।
যেন শত গোলা কামান-অনল
একটী মলিন কঙ্কাল উদ্গারে,
শুভ শঙ্খনাদ তব জয় ভেরি
দূর দুরান্তরে ছুটুক মল্লারে।
যেন সহস্রেক বিগলের তান
তারি মাঝে ধীরে ডুবে ডুবে যায় ;
অশোক অভয় মন্ত্র শব্দে যেন
ড্রামার আরব নীরবে মিশায়।
অগস্ত্য ফিরিয়া এসেছে হেথায়,
কে কে আছ সব জড় বিন্ধ্যাচল,
পূর্ব্ব অহঙ্কারে তোল আজ শির,
ঘুচুক বৈরীর প্রয়াস-নিস্ফল।
জন্মেজয় যথা পিতৃ শত্রুকুল
বীজমন্ত্রে আনি আগুনে পোড়াল ;
মাতৃ শত্রু আজ মহা যজ্ঞ কুণ্ডে
ফেল হোতা, ত্বরা করিয়া বিকল।
ইন্দ্র বজ্র-ছায়ে লভিলে আশ্রয়,
আন মন্ত্র তেজে ইন্দ্র সহ আজ,
নাম ধরে কর পুনঃ পুনঃ হোম
চকিতে পড়ুক হুতাশন মাঝ।
কাঁপুক অশ্রান্ত মহি-সিন্ধু ব্যোম
অগ্নুস্থিত দ্বীপ পড়ুক ভাঙ্গিয়া,
হব্যসিক্ত নব যজ্ঞ-হুতাশন
উতলা বাতাসে উঠুক নাচিয়া।
দ্বেষ হিংসা সব হিংস্র জন্তুদের
কুরুক্ষেত্রে ছিল ক্রীড়ার আলয়,
হেরি যজ্ঞ-বহ্নি পলাইবে দূরে
তথা প্রীতি ভক্তি করিও সঞ্চয়।
অভ্রান্ত ভাষায় কি বারতা বহ্নি,
বলে মুহুর্মুহু ফুকারি বিষাণে—
"কেবা দিতে অস্থি, ব্রহ্মার আহার
নির্ম্মম পাষাণে এস যজ্ঞস্থানে,
এত নহে তব যাত্রা নিরুদ্দেশ,
(এযে) প্রাণ প্রতিদানে পাবে মহাপ্রাণ ;
ঘুচিবে কুযশ কলঙ্ক দাসত্ব
করোনা ছলনা ভারত সন্তান!
স্বর্গে তোমাদের হবে অধিকার,
হইবে অমর ভারত-নিবাসী ;
উঠিবে তোদের বিজয় সংগীত
নব বীর রসে বসুধা উচ্ছ্বাসি'।
তখন নূতন প্রভাত ভাতিবে,
অনুভবে পাবি ভানুর কিরণ,
জড়ের মতন জড় কারাগারে
কদিন সহিবি অসহ্য পীড়ন?"
শেষাহুতি দিয়ে ভস্মময় হলে
ভারত কুরুর ক্ষেত্রে তপোধন,
অগ্নিদেব কাছে করিও প্রার্থনা
জন্মান্তরে পে'তে স্বাধীনতা ধন।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী।

আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র।

মারাঠা-বীর তিলক নির্ব্বাসিত হইলেন। বৎসর কালের জন্য মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্যুত মাতৃভূমির একজন প্রকৃত সেবক দীর্ঘ ছয় হইলেন। আজ সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ের

অন্তস্তল হইতে তাঁহার জন্য দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইতেছে। বোম্বাইয়ের শ্রমজীবিদল মহা-রাষ্ট্রীয়-নেতার জন্য শোক ও সম্মান প্রদর্শ-নার্থে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যাত্রার পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন—

"মানব ও জাতিসমূহের ভাগ্যবিধাতা এক উচ্চতর মহাশক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছেন। হয়তো আমার স্বাধীনতা অপেক্ষা ক্লেশভোগ দ্বারাই আমার উদ্দেশ্য এবং আমার দেশের কল্যাণ অধিকতর সাধিত হইবে।"

—তাই হোক্। আজ ব্যথিত হৃদয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, অত্যাচার নিপী-ড়ন, দুঃখবেদনার মধ্য হইতে দেশের মহত্তর কল্যাণ মাথা তুলিয়া উঠুক। আঘাত যদি আমাদের পক্ষে আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে তাই হোক্; সমস্ত দেশের হৃদয়ে আঘাত দিয়া বিধাতা আমাদিগকে জাগাইয়া তুলুন।

বহু শতাব্দীর জড়তার পর আজ সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ভারতবাসী নরনারী দেশের কথা এমন করিয়া কখনও ভাবেন নাই, দেশ-কল্যাণের ন্যায় বৃহৎ চিন্তা তাঁহাদের হৃদয়-মনকে এমন করিয়া অধিকার করিতে আর কখনও পারে নাই।

জাগরণের প্রথম প্রভাত হইতেই শাসক সম্প্রদায় ভারতের এই নবভাবকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহা স্বভাব-নিয়মের বিরুদ্ধে হয় নাই। সব দেশকেই উত্থানের পূর্ব্বে ভীষণ অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে। পতিতজাতিকে উদ্বোধিত করি-বার জন্য ইহা বুঝি বিধাতার বিধান! চির-দিনই স্বদেশ-সেবককে কারাবাস, নির্ব্বাসন-দণ্ড, মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। এই সংগ্রাম দেশকে শক্তি প্রদান করে। অত্যাচারেই ইটালিতে ম্যাট্‌সিনি "ম্যাট-সিনি" হইয়াছিলেন, রুশিয়াতে সহস্র লাজপত, সহস্র তিলকের অমূল্য জীবন সাইবেরিয়ার জঙ্গলে অতিবাহিত হইয়াছে, স্বদেশ-সেবকের পুণ্যরক্তে অত্যাচার-কলঙ্কিত-ভূমি তীর্থস্থান হইয়াছে—তাহার ফল আজ রুশিয়ার "ডুমা"। রুশিয়ার ভবিষ্যতে আর কোন্ উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, কেহ জানেনা।

আমাদের জাতীয় জীবনকে এই আশাই জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে এবং এই অত্যা-চারই ইহাকে দিন দিন শক্তিদান করিতেছে আজ সমগ্র দেশের মধ্যে স্বাধীনতা-স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে; বাঙ্গালী বালকগণ পর্য্যন্ত মরণ-ভয়কে জয় করিয়াছে।

এই সময়ে পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় জ্যৈষ্ঠের 'বঙ্গদর্শনে' ও আষা-ঢ়ের 'ভারতী'তে "পথ ও পাথেয়" নামক একটী এবং আষাঢ়ের 'বঙ্গদর্শনে' ও আষা-ঢ়ের 'প্রবাসী'তে "সমস্যা" বলিয়া আর একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। "দেশোন্নতির প্রকৃত পথ কি, বঙ্গের ভ্রষ্টবুদ্ধি বিপথগামী নব্য-বালকদিগকে তাহাই দেখাইয়া দেওয়া প্রবন্ধ লেখকের উদ্দেশ্য।"

বলা বাহুল্য, প্রবন্ধদ্বয় সমালোচনা করি-বার মত প্রগল্‌ভতা আমাদের নাই, শুধু বর্ত্তমান জাতীয়-যুগের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রদর্শিত পথ সম্বন্ধে যাহা বুঝিতে পারি নাই, আমরা— অনুযাত্রিগণই সবিনয়ে তাহাই জিজ্ঞাসা করিব। এই ভারতবর্ষের তীর্থে সকল জাতির সকল ধর্ম্মের মহামিলন দ্বারা মনুষ্য-ত্বের পূর্ণবিকাশ হইবে এবং আমরা আমাদের অন্তরের সমস্ত শক্তিকে এই মিলনকার্য্যে প্রবৃত্ত করিব। তাহা না করিয়া ইহাকে

আঘাত করিতে গেলে আমরা নিজেই আহত হইব, তাহার কিছুই করিতে পারিব না। পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে ভাষায়, স্বভাবে আচরণে, ধর্ম্মে বিচিত্র—সেই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একাঙ্গ করিয়া দেখিব।—ইহাই বোধ হয় স্বদেশহিতের প্রকৃত পন্থা।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ এই যে উচ্চ-"ভাব" পাইয়াছেন, তাহাই হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আমরা সমস্তায় পড়িয়াছি। আমরা স্পষ্টভাবে সহজভাষায় জানিতে চাহি, সেই যে মহামিলনের রাজ্য স্থাপিত হইবে, তাহা কিরূপে? ইংরাজ আমাদের স্কন্ধের উপরে চাপিয়া থাকিতেই, না দাসত্ব-কলঙ্ক হইতে আমাদের ললাটকে মুক্ত করিয়া? সোজা কথায় ইহাই কি বুঝিতে হইবে যে, ইংরাজ যেমন আছে তেমনি থাক, দেশমধ্যে স্বাধীনতা-স্পৃহা উদ্দীপ্ত করিয়া কাজ নাই; এমন এক সময় আসিবে, যখন ইংরাজ আপনা হইতে ভারতবাসী হিন্দুমুসলমানকে প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া মহামিলনের যে সুস্পষ্ট আদেশ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ণ করিবে? আমরাও সেই অপেক্ষায় বসিয়া থাকিব, কিম্বা ইংরাজের "রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিব, বারম্বার আঘাত করিব—কোনো আত্মাভিমানের ক্ষুণ্নতায় ফিরিয়া যাইব না," কারণ, "মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়কে চিরদিন কখনই প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না?" কিন্তু কথা হইতেছে যে, ইংরাজ রাজ-সিংহাসনে বসিয়া বিদেশি-পদাঙ্ক-কলঙ্কিত দাস ভারতবাসীকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে সম্মত হইবে কেন? অবস্থার সাম্য-ব্যতিরেকে প্রেম আসিতে পারে না। ইংরাজ মহামিলনের আদেশ পায় নাই; সুতরাং লাঞ্ছনা অত্যাচার থামিবে না, বরং আমাদের পেটার্ণাল গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বগ্রাসী করুণা শত হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক দিন দিন আমাদের সর্ব্ব অধিকার গ্রাস করিতে যেরূপ উদ্যত হইতেছে, তাহাতে ইংরাজের মহা-মিলনের আদেশপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে গেলে আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। তবু

"গবর্ণমেণ্টের শাসননীতি যে পন্থাই অব-লম্বন করুক এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজের ব্যক্তিগত ব্যবহার আমাদের চিত্তকে যেমনি মথিত করিতে থাক্, আমরা আত্মবিস্মৃত হইয়া "আত্মহত্যা না করিয়া" মহামিলনের আশায় ইংরাজের রুদ্ধদ্বারে ঘা মারিতে থাকিব কি? কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ উপদেশ দিয়াছিলেন—

"যে তোমারে অপমান করে অহর্নিশ,
তারি কাছে তারি পরে তোমার নালিশ!
নিজের বিচার যদি নাই নিজ হাতে,
পদাঘাত খেয়ে যদি না পার ফিরাতে,
তবে ঘরে নতশিরে চুপ করে থাক্,
সাপ্তাহিকে দিগ্বিদিকে বাজাসনে ঢাক!
একদিকে অসি আর অবজ্ঞা অটল,
অন্যদিকে মসী আর শুধু অশ্রুজল।"

তখন স্বদেশের লাঞ্ছনা অত্যাচারে একান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উদ্দীপ্ত চক্ষে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ-বাসীকে বলিয়াছিলেন—

"অত্যাচারে মত্তপারা কভু কি হও আত্মহারা?
তপ্তহয়ে রক্তধারা ফুটে কি দেহমাঝে?
অহর্নিশি হেলার হাসি তীব্র অপমান
মর্ম্মতল বিদ্ধ করি বজ্রসম বাজে?"

তবে কেহ কেহ বলেন যে, প্রতিভাশালী ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বহুদিন একমতে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন না; মতপরি-

বর্ত্তন, উন্নতি ও প্রতিভার লক্ষণ। কিন্তু এ দুর্ভাগ্যদেশের পক্ষে ইহা মঙ্গলের না হইয়া অমঙ্গলেরই কারণ হইয়াছে। এখানে প্রথম জীবনে যাঁহারা উদারভাব অবলম্বন করিয়াছেন ও দেশের কুসংস্কার সমূহ উৎপাটনে পরমোৎসাহী হইয়াছেন, উত্তরকালে তাঁহারাই উন্নতির বিরোধী হইয়াছেন। এক সময়ে যিনি অশেষ অকল্যাণের আকর বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সার্দ্ধ দুই ঘণ্টাকাল-ব্যাপী প্রাণময়ী বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছেন, আজ পরিণত বয়সে তিনিই ঐ কুপ্রথা সমর্থন করিতেছেন—শুধু বাক্যে নয়, কার্য্যেও যিনি এক সময়ে স্ত্রীজাতির লজ্জাকর অবরোধ প্রথার বিরোধী ছিলেন, আজ তিনি ধীরে ধীরে সেই প্রাচীন পথে (খুব প্রাচীন নহে) ফিরিয়া যাইতেছেন। বুঝি এই দুর্ভাগ্য দেশেরই দোষ! অন্যদেশে যাহা মঙ্গল, এখানে তাহাই হইয়াছে অমঙ্গলের কারণ।

আমরা গত বৈশাখের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলাম। তাঁহার এই বর্ত্তমান মতের পরিবর্ত্তন বাল্যবিবাহ বা স্ত্রীস্বাধীনতার মতপরিবর্ত্তন অপেক্ষা অতি গুরুতর। আজ যখন সমগ্র ভারত স্বদেশীভাবে অনুপ্রাণিত এবং স্বরাজ আকাঙ্ক্ষায় উদ্বোধিত, এই ভাব ও আকাঙ্ক্ষার মূলে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যুৎমুখী লেখনীর প্রভাব কতখানি বিদ্যমান, দেশবাসী ভ্রাতা ভগ্নীগণ তাহা অজ্ঞাত নহেন—তখন দেশবাসী তাঁহার এই পরিবর্ত্তনকে যে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারিবেন, তাহা মনে হয় না।

আর যদি ইংরাজের সহিত আমাদের প্রভু ও ভৃত্যের এই ঘৃণ্যসম্বন্ধ থাকিতে মহামিলন অসম্ভব হয়, তবে কি ইংরাজ আমাদের সেই পরম ধৈর্য্যশীল প্রেমে পরাস্ত হইয়া সাম্যমৈত্রীর নীতি ঘোষণা পূর্ব্বক আমাদের মাথায় স্বাধীনতার মুকুট পরাইয়া দিবে? তা হইবার নয়। স্বাধীনতা কখনও প্রদত্ত হয় না, তাহাকে জয় করিয়া লইতে হয়। ইংরেজ কখনও করুণা করিয়া কিম্বা ভয় পাইয়া আমাদিগকে স্বাধীনতা দিবে না, স্বাধীনতা আমাদিগকে নিজে লাভ করিতে হইবে।

এই স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের ইংরেজের সহিত এবং সকল জাতি, সকল ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত মিলন সম্ভব হইতে পারে; কারণ তখন আমাদের ললাটের দাসত্ব-কালিমা পুণ্য-স্বাধীনতালোকে বিলুপ্ত এবং ইংরাজের দাম্ভিকতা জগতের সমক্ষে অনেকটা চূর্ণীকৃত।

তাহা হইলেই মহামিলনের পূর্ব্বে সেই স্বাধীনতার ভাব, সেই স্বরাজের মত্ততা আসিয়া পড়িল। কিম্বা এমনও যদি হয় যে, ইংরাজ ভারতের পার্থিব ভাগ্যবিধাতা থাকিয়াই আমাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে, আমাদের অনেকগুলি অধিকার আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে এবং আমরা সকলে মিলিয়া মহামিলনের রাজ্য স্থাপন করিব, তাহা হইলে, এবিষয়েও তো সকলের মত চাই। দেশ সকলের। সকলের মত যে পাওয়া যাইবে তা তো মনে হয়না; বরং সে সম্ভাবনা দিন দিন সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে।

উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ে চিন্তাশীল হৃদয়ের যে মহামূল্য সত্য সকল নিহিত রহিয়াছে, তাহা দেশবাসী অসঙ্কোচ গৌরবে মাথায় তুলিয়া লইবেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু মহামিলনের কথাটা লইয়াই বিশেষ গোল বাধিয়াছে। সুধী পাঠক পাঠিকা তাহার মীমাংসা করিলে

স্বজাতিকে একটা মহা সমস্যা হইতে মুক্ত করা হইবে।

অপমানের আঘাতে সুপ্ত হৃদয় যখন জাগ্রত হইয়া উঠে, তখনকার মনের ভাব কবি নিজের ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

"মর্ম্মে যবে মত্ত আশা সর্প সম ফোঁসে
অদৃষ্টের বন্ধনেতে দাপিয়া বৃথা রোষে,
তখনো ভাল মানুষ সেজে,
বাঁধানো হুকা যতনে মেজে,
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে,
খেলিতে হবে কসে!

* * * *

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন!
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন!
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি,
জীবন স্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি চলেছি নিশিদিন,
বরষা হাতে ভরসা প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ,—
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধাহীন।"

আর তখনকার সেই উদ্দীপনা-কম্পিত হৃদয়ে স্বদেশীয় মহাকবির নিত্যনূতন সঙ্গীতের প্রাণস্পর্শী মূর্চ্ছনা আসিয়া যখন আঘাত করিতে থাকে, তখন আমাদের হৃদয়ের তন্ত্রী গুলা কাঁপিয়া কাঁপিয়া আরও নাচিয়া উঠে। কিন্তু এই হৃদয়াবেগকে কর্ম্মের বাঁধনে বাধিতে না পারিলে, ইহা যে নিতান্তই ব্যর্থ, তাহা অতি সত্য। আমাদের এই কয় বৎসরের আন্দোলন উত্তেজনা যে ব্যর্থ হইয়াছে, একথা বলিতে আমরা সম্মত নহি। এই কয় বৎসর আত্মশক্তি উপলব্ধি করিয়া আমাদের শক্তি যে বাড়িয়া গিয়াছে,সেই শক্তির সাহায্যে আমাদিগকে সম্মুখের বিশাল কর্ম্ম-সমুদ্রে নামিতে হইবে। কি কাজ?—

এই যে লক্ষ লক্ষ পল্লীগ্রাম মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে, উহাদের দেহে নবজীবন সঞ্চার করা। স্বদেশ আমাদের পল্লীগ্রাম গুলিই। স্বদেশ বলিতে শিক্ষিত, সভ্য, মার্জ্জিতরুচি, বিলাস-চাকচিক্য-উত্তপ্ত আধুনিক সহরগুলির কথা আমাদের মনে পড়েনা, শিক্ষাহীন, মূক, শান্তিময় পল্লিচ্ছবিই চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে; সেই দোষগুণে জড়িত পল্লীগ্রামগুলিই আমাদের স্বদেশ—যেখানে কৃত্রিমতার অসহ উত্তাপ প্রবেশ করে নাই।

সমস্ত বাঙ্গলা দেশের ভিতরে সহস্র যুবক যদি মাতৃসেবার পতাকা হস্তে লইয়া পল্লী সংস্কারে ব্রতী হন, তাহা হইলে বঙ্গের দ্বিলক্ষাধিক পল্লীগ্রামগুলির অবস্থা ফিরিয়া যায়। অবশ্য এই কাজ প্রথমেই সহস্র কিম্বা শত ব্যক্তির দ্বারাও আরম্ভ হইবে না। অতি ক্ষুদ্র আকারে ইহার জন্ম হইবে। এই ক্ষুদ্র বীজই ভবিষ্যতে বিরাটকায় মহীরুহের আকার ধারণ করিবে।

প্রথমে অন্ততঃ দশজন সর্ব্বত্যাগী যুবকই এই কাজ আরম্ভ করুন। এই দশ জন পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া পাঁচদিকে চলিয়া যান। প্রত্যেক দুইজন করিয়া যুবক বিভিন্ন পাঁচ খানি গ্রামকে আপনাদের কার্য্যক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থল করিবেন। চারিদিগের বিশখানি গ্রাম প্রত্যেক দলের কার্য্যক্ষেত্র হইবে। এক স্থানে দুই বৎসর কাজ করিয়া গ্রামগুলিকে বিশৃঙ্খলার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহারা স্থানান্তরে যাইয়া বসিবেন। এই সময়ে স্থানীয় ব্যক্তিদের হস্তে সেই গ্রামগুলির ভার থাকিবে। আর শত গ্রাম এই দশজন যুবকের কার্য্যক্ষেত্র হইবে। আবশ্যক হইলে সেবকগণ পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে আসিয়া কাজকর্ম্ম দেখিয়া সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইবেন। পাঠশালা

নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাঁহারা শিক্ষা-হীন পল্লিবাসীকে শিক্ষাদান করিবেন; আপোষে বিবাদ ভঞ্জনের ব্যবস্থা করিয়া মামলা মোকর্দ্দমার হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন; স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন পণ পল্লী মধ্যে ব্যাপ্ত করিবেন; খাদ্য-শস্য বিলাতী বণিকের হস্তে তুলিয়া দিয়া যাহাতে তাহারা দুর্ভিক্ষের কবলে আত্ম-নিক্ষেপ না করে, তাহা করিবেন; স্বাস্থ্যরক্ষা, পানীয় জলের ব্যবস্থা,রোগ নিবারণের উপায় প্রতিষ্ঠা করিবেন; লাঠী খেলা প্রভৃতি ব্যায়াম চর্চ্চার ব্যবস্থা সর্ব্বসাধারণের জন্য করিবেন; সামাজিক দুর্নীতি হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের মধ্যে নৈতিক বল, মনুষ্যত্ব, একতা রোপণ ও বর্দ্ধন করিবেন—যাহাতে তাহারা একপ্রাণ হইয়া অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষের মত দাঁড়াইতে পারে। সেবক-গণ শুধু খবরের কাগজে আপনাদের সেবার রিপোর্ট বাহির করিবেন না। এই সব স্বার্থত্যাগী বীরগণ, আর সমস্ত ত্যাগ করিয়া, পল্লীর মাঝে আপনাদিগকে স্থাপন করিবেন, স্বাধীনতার ভাবকে বিনাশ করিবার জন্য নহে, নীরব পল্লীর সরল হৃদয়কে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার জন্য। অবশ্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, অত্যাচার-পেষিত অশিক্ষা-দুষ্ট ব্যক্তিদের নিকট স্বাধীনতার মন্ত্র ঘোষণা করা হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। আগে তাহাদের মৃতপ্রায় জীবনে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে এবং তাহার প্রধান উপায় বিদেশী বর্জ্জন ও রপ্তানি বন্ধ। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করা আমাদের লক্ষ্য না হইতে পারে—পথ বটে, আর এই স্বদেশী আন্দোলন ইংরাজকে হাতে হাতে আমাদের জাতীয় অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য যতটা, তাহার চেয়ে অনেক বেশী দরিদ্র ভাই বোনদিগকে রক্ষা করিবার জন্য। দেশের দরিদ্র সম্প্রদায়কে "ভাই" বলিলে তাহাদের কাছে নূতন ঠেকিতে পারে, কারণ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও আমরা একথা এমন ভাবে বলি নাই।

আমাদের দেশ যে পতিত,তাহা এতদিন দেশবাসীকে ভাই বলিয়া হৃদয়ে লইতে পারি নাই বলিয়াই। তাহা যদি পারিতাম, তবে দেশের এ অবস্থা থাকিত না। কিন্তু আজ যখন "ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই তোমার রাখাল তোমার চাষী" বুঝিয়া আমরা দরিদ্র ভ্রাতার কুটীরদ্বারে আসিয়া আঘাত করিতেছি, তখন তাহাদের নিকট ইহা নূতন লাগিবেই, আর সন্দেহও হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের এই সন্দেহকে প্রেম দ্বারা জয় করিয়া লইতে হইবে; এবং তাহা "কালাপাহাড়কে গুরু বলিয়া বরণ করিয়া" নহে, "জগতের যে সকল মহাপুরুষ বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে মত প্রচারের জন্য নিজের প্রাণও বিসর্জ্জন করিয়াছেন", তাঁহাদেরই চর-ণের ধূলি মাথায় লইয়া।

সেদিন শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের "সদুপায়" নামক আর একটী প্রবন্ধে শুনিলাম, স্বদেশসেবকগণ দেশবাসীর গৃহে আগুন লাগাইতেছেন, তাঁহাদিগকে পথে ধরিয়া ঠেঙ্গাইয়া দিতেছেন এবং প্রাণ হানির ভয় দেখাইতেছেন। আমরা শুধু ইহাই ভাবিয়া পাইতেছি না যে, আমাদের সংবাদপত্রগুলি কেন এ কথা গোপন করি-তেছেন। শুনিয়াছি, ইংলিশম্যান, পাইও-নিয়র সময় সময় এই রকম ভীষণ অত্যা-চারের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। তাহার মূলে এতটা সত্য থাকিতে পারে, তাহা কেহ

ভাবেন নাই। এখন সুকবি রবীন্দ্রনাথের লেখনী হইতে একথা শুনিয়া কেহ বা চমকিত হইতেছেন, কেহবা ইহাকে কবিকল্পনা মনে করিতেছেন।*

স্বার্থত্যাগ সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় মানব হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়া থাকে। এই জন্যই ত্যাগী মহাপুরুষের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এক জন ত্যাগশীল নরনারীকে দেখিতে পাই। আজ যদি দশজন যুবক দেশমাতার জন্য সর্ব্বত্যাগ করিয়া এই ব্রত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কে বলিতে পারে, আমরা কয়েক বৎসরের মধ্যে শত শত যুবককে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে দেখিব না? এই সেবকদলের বাহুল্য-বর্জ্জিত জীবনের ব্যয়ভার বহন করিবেন দেশ। নেতাগণ সহরে থাকিয়া ইঁহাদিগকে বল, আশা,উৎসাহ দান করিবেন, অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিবেন, আর দলে দলে কর্ম্মীর দল বাহির হইয়া পল্লীতে পল্লীতে আপনাদের কর্ম্মক্ষেত্র স্থাপন করিবেন।

ইহা কি হইতে পারে না? আমরা বিশ্বাস করি—পারে। বঙ্গের হিন্দু এবং মুসলমান সাত কোটি সন্তানের মধ্যে সহস্র জন মাত্র দেশহিতে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়া দিবেন, ইহা কি দুরাশা? কত শতাব্দীর অধীনতার পর এখনও আমাদের যুবকদের মনে যে নির্ভীকতা, স্বাধীনতা-স্পৃহা,আত্মোৎসর্গের ভাব রহিয়াছে,তাহা যে কোন দেশের পক্ষে গৌরবজনক। এই সকল কাজের ভার তাঁহাদেরই উপরে, যাঁহারা মাতৃভূমির বল, ভবিষ্যতের আশা—আজ সমগ্র দেশ যাঁহাদের দিকে আশা নেত্রে প্রার্থনাপূর্ণ অন্তরে চাহিয়া আছে।

ভারতের নবজীবনের পশ্চাতে বিধাতার মঙ্গল-হস্ত রহিয়াছে; এই পতিত জাতিকে তিনিই উদ্বোধিত করিয়াছেন। আজ আমরা যাহা কল্পনা করিতে পারিতেছি না, বিধাতার নির্দ্দেশে তাহাই হইবে। ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আজ আমরা ভয় করিব না, নিরাশ হইব না। ধর্ম্মকে আমাদের মাথায় রাখিয়া, ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া, নির্ভয়ে কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইব। ধর্ম্মকে দলিত করিয়া যে কখনও জয় হয় না, তাহা বলা বাহুল্য; আপাততঃ তাহাকে জয়ের মত দেখাইলেও তাহা গভীরতর পরাজয়। এই ধর্ম্মপথকে যদি আমরা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হই, নেতাগণ অবশ্য আমাদিগকে ফিরাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। কিন্তু "ভেদের লক্ষণই তো চারিদিকে! নিজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাই যখন প্রবল, তখন কোন মতেই আমরা নিজের কর্ত্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিনা; অন্যে আমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেই—আমরা কিছুতেই ঠেকাইতে পারিব না" ইহাই কি শুনিতে হইবে? দেশবাসী সংগ্রামে ক্লান্ত হইয়া নববলের জন্য যখন নেতাদের মুখের দিকে চাহিবেন, তখন এই বাক্যে বল লাভ করিতে পারিবেন কি?

যে উৎসাহ নিজের ত্রুটির প্রতি মানুষকে অন্ধ করিয়া দেয়, তাহা অত্যন্ত ক্ষতিকারক, কিন্তু তাহার চেয়ে অনেক বেশী মারাত্মক—নৈরাশ্যের অবসাদ।

আর আমরা কি সত্যই নিতান্ত বিচ্ছিন্ন? ঐক্যের সুর আমাদের মধ্যে কোথাও কি বাজিয়া উঠে নাই? বিদেশী বার বার আমা-

* কুটিয়ার সাহেবকে গুলি মারার ব্যাপারটাকেও রবিবাবু স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে ফেলিয়াছেন! "ভারতী"—শ্রাবণ,১৭৩পৃঃ। বিচারে আসামীরা খালাস পাইয়াছে—এখন রবিবাবু কি বলেন? ন, স।

দিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলে না যে, আমরা বিচ্ছিন্ন, তুচ্ছ, আমরা কিছুই করিতে পারি না, মহাজাতির কোন তত্বই আমাদের মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে নাই। কিন্তু আজও কি আমরা তাহাকেই আমাদের জপমন্ত্র করিয়া বসিয়া থাকিব? মহাজাতির বীজ আমাদের মধ্যে নিহিত নাই কি? আমাদের কি এক সুখ দুঃখ, এক আশা ভয়, একই সংগ্রাম নয়? একই বেদনার আঘাতে সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠে না? সর্ব্বোপরি, একই মাতার স্নেহকোলে, বিধাতা পঞ্জাবী, মান্দ্রাজী, বাঙ্গালী, বিহারী, মহারাষ্ট্রীয়, আমাদের সকলকে পাঠাইয়া দেন নাই? আজ কাণ পাতিয়া শুনিলে শোনা যাইবে, সমগ্র ভারতের হৃদয় হইতে "আমরা এক, আমরা এক" এই বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। তাই মহারাষ্ট্রীয় শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলকের জন্য আজ বাঙ্গালীর হৃদয় কাঁদিতেছে; তাই আজ মহারাষ্ট্রীয় কেশরী মহারাজ শিবাজীর উদ্দেশে বাঙ্গালী আবেগপূরিত কণ্ঠে বলিতেছে—

"তোমারে চিনেছি আজি, চিনেছি, চিনেছি, হে রাজন
তুমি মহারাজ!
তব রাজকর ল'য়ে আটকোটী বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ!
সে দিন শুনিনি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি' লব!
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্ব্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব!
ধ্বজা করি' উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন
দরিদ্রের বল!
"এক ধর্ম্মরাজ্য হবে এ ভারতে" এ মহাবচন
করিব সম্বল!"

ইহাকে কি "যান্ত্রিক" বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়?

আমরা চিরদিন পরপদ-দলিত থাকিব, ইহা হইতে পারে না। স্বাধীনতা আমাদের লক্ষ্য। "স্বাধীনতা চাই" বলিলেই যে লক্ষ্যস্থানে আসিয়া পৌছিব, তাহা বলিতেছি না; এই লক্ষ্যের পথে যত বৃহৎ এবং অসংখ্য বাধা আছে, তাহাকে জয় করিয়া ধীরে ধীরেই চলিতে হইবে। কবে কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে সেই লক্ষ্যস্থানে পৌছিতে পারিব, জানিনা, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানি—ইংরাজ তাহার বাণিজ্যের দড়াদড়ি দিয়া ভারতবর্ষকে চিরদিন তাহার পশ্চাতে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। একথা বিদ্বেষ করিয়া বলিতেছি না, উত্তেজনার উন্মত্ততায় বলিতেছি না—বুকভরা আশা লইয়া বিশ্বাসের সহিত বলিতেছি।

ভারতমাতার উদার কোলে বাস্তবিকই সকলের স্থান আছে, কিন্তু প্রভু রূপে নহে, তাঁহার সন্তান রূপে—আমাদের ভাই রূপে। সেই সময়ে—মুক্তির সেই শুভ সময়ে, পাশ্চাত্য চরিত্রের অনুকরণে ভারতবাসী নিশ্চয়ই শ্বেতচর্ম্মীকে বিদ্বেষভরে আপনার দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিবে না, তাহা চির-আতিথেয় ভারতীয় চরিত্রের বিরুদ্ধে। তখন পশ্চিমের হিংস্র ব্যবহারের কথা ভুলিয়া গিয়া ভারতবাসী জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকে আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। সে দিনের কথা ভবিষ্যৎ-ইতিহাস-লেখক লিখিবেন। কিন্তু সেই মহামিলনের পূর্ব্বে পল্লীপ্রান্তে, ঘরের কোণে বসিয়া অতি ক্ষুদ্র যে কাজ স্বদেশী-আন্দোলন, তাহাকেই সফল করিয়া তুলিতে হইবে; "আমি পরের ঘরে কিনব না তোর ভূষণ বলে গলার ফাঁসী" মায়ের চরণ ছুঁইয়া এই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া, ইহাই পালন করিতে হইবে। বিদ্বেষ এখনও করিব না। অত্যাচার, অবি-

চার শত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইবে, কিন্তু প্রার্থনা করি, বিদ্বেষ যেন আমাদের মনকে কলুষিত না করে, ধর্ম্ম-প্রাণ ভারতে ধর্ম্মের মহিমা খর্ব্ব করিয়া কোন কাজ করিতে আমরা যেন চেষ্টিত না হই। এ কাজ বড় কঠিন, কিন্তু এই কঠিন কাজই আমাদের। ধর্ম্মের আলোকে পথ দেখিয়া লইয়া আমাদিগকে স্বরাজের বন্দরে পৌঁছিতে হইবে।

আমরা "শিশুর দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে বিচার" বা "উন্মত্তের দেশের উন্নতি সাধনের ভার গ্রহণ" দোষে দোষী হইলাম কিনা, জানিনা; যদি হইয়া থাকি, করযোড়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। কিন্তু অত্যন্ত জ্ঞানবৃদ্ধ এবং খুব-মাথা-ঠাণ্ডা বিজ্ঞের দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে চিন্তার যেমন অধিকার আছে, মাতার দীনতম অক্ষম সন্তানেরও সেইরূপ নাই কি?

মাতৃসেবা করিতে গিয়া বালকগণ কে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা-ইতে খুব বেশী কথার দরকার করে না; কিন্তু দেশ মধ্যে যে স্বাধীনতা-স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে, পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের আশায়, তাহাকে বিনাশ করিতে হইবে কি? এতদূরে আনিয়া একথা বলিলে দেশ তাহা শুনিবে কি? তাহারা কবিগুরু শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথের পুরাতন সুরের সহিত সুর মিলাইয়া বলিবে—

"দেব, এ তব বিফল চেষ্টা, আর কি ফিরিতে পারি?
শিখর-গুহায় আর ফিরে যায় নদীর প্রবল বারি?
জীবনের স্বাদ পেয়েছি যখন, চলেছি যখন কাজে,
কেমনে আবার করিব প্রবেশ মৃত বরষের মাঝে?
ভয় নাই যার কি করিবে তার এই প্রতিকূল স্রোতে!
তোমারি শিক্ষা করিবে রক্ষা তোমারি বাক্য হ'তে!"

এবং তাহাতে ক্ষোভের কোন কারণ নাই।

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর। (১)

"সেতুবন্ধ রামেশ্বর"—কি সুন্দর স্থান, কি সুন্দর তীর্থক্ষেত্র!! পুণ্যময়ী ভারত-ভূমির দক্ষিণ দিকের অন্তঃসীমা অতিক্রম করিয়া, নীলোর্ম্মিমালায় উদ্বেলিত মহাসমুদ্র-বক্ষে সেতুবন্ধ রামেশ্বর কি সুন্দর, কি সুন্দর!! যে সুধাময় পতিতপাবন নামে পাতকীর তারণ হয়, যে দীনবন্ধুর সুপবিত্র সুখময় নামে নারকীগণ অনায়াসে ভবসিন্ধুর পারে যায়, যাহার পূত পদ স্পর্শে পাষাণময়ী পাপিনী অহল্যার পরিত্রাণ হইয়াছিল এবং শ্বপচবংশ-সমুদ্ভূত গুহকের ত্রিদিবধামে অমরস্থান লাভ হইয়াছিল, সেতুবন্ধ মনে হইলে সেই রঘু-কুলতিলক ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নরাকারে ভবলীলাবলী স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে। বনের পশু, অম্বরের পক্ষী, পর্ব্বতের তপস্বী, সাগরের জলচর জীবপুঞ্জ, পাতালের ও পৃথিবীর মানবাদি প্রাণীগণ যাঁহার অপার মহিমা, অবিরাম করুণা এবং দেবোপম চরিত্রে বিমুগ্ধ, সেই পরম পূজনীয় শ্রীরামচন্দ্রের অধিকাংশ লীলা, সুপবিত্র ও সুপ্রাচীন সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ। এই অপূর্ব্ব স্থান দর্শন করিলে, রামের আদর্শ রাজনীতি, ঐশ্বরিক সামর্থ্য, অলৌকিক পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় রূপরাশি এবং তৎসঙ্গে তাঁহার প্রেম, দয়া, প্রজারঞ্জন, পিতৃ-ভক্তি, ভ্রাতৃবৎসলতা প্রভৃতি গুণরাশি স্মৃতি-

পথে জাগ্রত হইয়া উঠে। সেই আদর্শ রাজা, আদর্শ পতি, আদর্শ ভ্রাতা এবং আদর্শ বীর, একাধারে আদর্শ মানব ও আদর্শ দেবতা ছিলেন। আইস, আমরা তাঁহার তপোভূম রামেশ্বর-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া নয়ন, মন, দেহ ও আত্মার চরিতার্থতা সম্পাদন করি।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মানব জীবন এবং এই পুণ্যময় জীবনের অপূর্ব্বলীলা সমূহ চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহার জন্ম হইতে বনবাস প্রথম ভাগ; বনবাস হইতে সীতাহরণ দ্বিতীয় ভাগ; সীতাহরণ হইতে লঙ্কা প্রবেশ তৃতীয় ভাগ; এবং লঙ্কা বিজয় হইতে ভারতে প্রত্যাগমন ও রাজ্যপ্রাপ্তি চতুর্থ বা শেষ অংশ। তৃতীয় ও চতুর্থ অংশের সহিত রামেশ্বর তীর্থের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। রোমান কাথলিক খ্রীষ্টান আচার্য্য রেভরেণ্ড ডাক্তার শিবার্ট সাহেব ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় তীর্থক্ষেত্র বহুবর্ষ কাল ব্যাপিয়া পরিব্রজণ করিয়াছিলেন; তিনি লিখিয়াছেন "এই সুপরিচিত শ্রীরামচন্দ্র নামে যদি কোন জাগতিক বা ঐশ্বরিক মাহাত্ম্য থাকে, তাহা হইলে রামেশ্বর-ক্ষেত্রে তাহা পূর্ণ ভাবে প্রকটিত আছে।" কলিকাতা হইতে সুদূর রামেশ্বর তীর্থে গমন করিবার সময় মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে একটা রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে সার্দ্ধ তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটা প্রাচীন শিবমন্দিরে তদ্দেশীয় তামিল ভাষায় যাহা খোদিত আছে, তাহা এই—"রামকে যদি বুঝিতে চাও, রামেশ্বরে যাও।" বাস্তবিক সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপস্থিত হইলে যেন সেই কোকিলকণ্ঠ অমর কবিবর—যেন সেই রামভক্ত রাম-তন্ময় মহাকবি বাল্মীকির সমস্ত রামায়ণ পাঠ করিতেছি বলিয়া বোধ হয়। যে অমৃতময় প্রাণস্পর্শী নামে, যে পাতকীতারণ নামে বাল্মীকির উদ্ধার হইয়াছিল, বাল্মীকি তাঁহার সমস্ত জীবন সেই মধুর নাম গান করিয়া ভূতলে অপূর্ব্ব কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া গিয়াছেন। দয়াল হরি রাম রূপে বাল্মীকির উদ্ধার-কর্ত্তা এবং অন্য রূপে অন্যান্য অসংখ্য জনগণেরও পরিত্রাতা। শ্রীরামচন্দ্রের অনাথশরণ নাম যেন ভারতের পক্ষে আলোক ও জীবন স্বরূপ। আইস, আমরা একবার সেই সুরম্য ও সুবিশাল ভারতসাগর বক্ষে, সেই কাঙ্গাল-বন্ধুকে দেখিয়া লই। যিনি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়ের রাজ্যস্থাপন ও সত্যের গৌরব ও সৌরভ রক্ষা করিয়া ভারতকে দেবভূম করিয়া গিয়াছেন, সেই রাঘবের মহতী কীর্ত্তি রামেশ্বরে অদ্যাপি অটুট ভাবে বর্ত্তমান।

রামেশ্বর-ক্ষেত্র এবং তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য তীর্থ সমূহ সন্দর্শন করিলে, পথিকের মনোমধ্যে সহসা একটা প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে। "রাম যদি পরমেশ্বর হয়েন, তাহা হইলে নরাকারে এই সব লীলা করিবার কি প্রয়োজন ছিল? ঈশ্বর হইয়া নরাকারে অবতীর্ণ হওয়া এবং নরোচিত দুঃখ, ক্লেশ, ব্যথা, ভয় প্রভৃতির বশবর্ত্তী হওয়া অথবা রাজ্যশাসন, বিদ্রোহ দমন, সমর সংঘটন, পার্থিব সুখভোগ এবং ঈশ্বরের পূজা প্রভৃতি কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার কি প্রয়োজন ছিল?" সভ্য দেশের সমুদয় শাস্ত্র এবং তত্ত্বদর্শী ও ব্রহ্মজ্ঞানী মহানুভবদিগের সৎযুক্তি এই প্রশ্নের বহুকাল পূর্ব্বে অকাট্য সদুত্তর দিয়া রাখিয়াছেন। উত্তর—"লোক শিক্ষা এবং জীবের উদ্ধার।" রঘুকুলতিলক ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নির্গুণ হইয়াও সগুণ, নিরাকার হইয়াও সাবয়ব। তিনি নির্গুণ ঈশ্বর এবং সগুণ মানব, এই উভয় মূর্ত্তিতে এবং তদ্ভিন্ন শত

সহস্রবিধ মূর্ত্তিতে, ইচ্ছা করিলে, অবতীর্ণ হইতে পারেন এবং তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বশক্তিমানত্ব গুণে তিনি সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিতে সমর্থ। তিনি যমুনাতীরে কৃষ্ণ, সরযূ তটে রাম, কৈলাসে শিব এবং ভক্তের হৃদয়ে বিবিধ ভাবে পূজিত ও প্রকটিত। তিনি নিজেই ঈশ্বর, আবার নিজেই মানব হয়েন এবং মানব হইয়া মানবোচিত ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক অপার লীলায় মগ্ন হয়েন। লীলা শেষ হইলেই ব্যক্তভাবে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অব্যক্ত ও অপ্রেমেয় ভাবে পরিণত হয়েন। ভক্ত কবি কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

"আপনিই ভাঙ্গ প্রভু আপনিই গড়।
সর্প হৈয়া দংশ তুমি ওঝা হৈয়া ঝাড়॥"

ভক্তাধিক ভক্ত রামানুজ স্বামী লিখিয়াছেন—

"বেদবেদ্যে পরে পুংসি জাতে দশরথাত্মজে।
বেদঃ প্রাচেতসাদাসীৎ সাক্ষাদ্বারামায়ণাত্মনা"॥

পরমাত্মা নামে যিনি বেদেতে বিদিত।
রামরূপে ভবে তিনি হলেন উদিত—
নব বেদ রামায়ণ ভবের বৈভব,
মহর্ষি বাল্মীকি-কণ্ঠে হইল উদ্ভব।

"বাল্মীকি গিরিসম্ভূতা রাম-সাগর-গামিনী।
পুনাতি ভুবনং কৃৎস্নং রাগায়ণ মহানদী॥"

বাল্মীকি হিমাদ্রি হ'তে হ'য়ে প্রবাহিত
শ্রীরাম-সাগরে তাহা হইল মিলিত,
সুরধুনী-রূপী সেই ত্রিলোক-পাবন—
রামায়ণ বিশ্ববাসী জীবের জীবন।

ঈশ্বরের নরদেহ ধারণ এবং মর্ত্ত্যে লীলা করণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ অতি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন।

রামায়ণের পাঠকের রামচরিত্র পাঠের সময়ে তাহা স্মরণ রাখিলে নিঃসংশয়চিত্ত হইয়া পরমানন্দ ভোগ করিতে পারিবেন। ভাগবতের ঋষি প্রথমে প্রশ্ন করিতেছেন—

কিমুতাখিল সত্ত্বানং তির্য্যংমর্ত্ত্যাদিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ।
যৎপাদপঙ্কজ পরাগ নিষেবতৃপ্তা
যোগ প্রভাব বিধুতাখিল কর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়ো'পি ন নহ্যমানা
স্তস্যে চ্ছয়াত্তব পুষঃ কুতএব বন্ধঃ।
কু লা চরিতা নৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েণ বা'নর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো॥

ভাগবতের মহর্ষি মহোদয় আবার নিজেই উত্তর দিয়া কহিতেছেন "যো'ন্তশ্চরতি সো' ধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহদেহভাক্।" তাহার পরে আরও সুস্পষ্ট রূপে ইহার মীমাংসা জন্য লিখিতেছেন—

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

ফলকথা এই, বিমল রামচরিত্রে, পরম পবিত্র ও পরমাদর্শ রামচরিত্রে যাহাদের আস্থা নাই, "একটা মাগীর জন্য লড়াই আর মাগীর জন্য কেচ্ছা"—এই ভাবে যাহারা রামায়ণকে বিবেচনা করে, আমার অনুরোধ, তাহারা যেন রামেশ্বরে গমন করিয়া পথের ক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ পূর্ব্বক অর্থ ব্যয় না করে। ভক্তি-সুধাসিক্ত তীর্থযাত্রীরা সুপবিত্র রামেশ্বর ধামে গিয়া যে বিমল আনন্দ উপভোগ করেন, অপরের পক্ষে তাহা কল্পনাতেও আইসে না। কেবল ভ্রমণের জন্য যে সকল সৌখীন লোক তীর্থ ক্ষেত্রে যায়, তাহাদের গমন ও আগমন, ভক্ত যাত্রীর গমনাগমন অপেক্ষা সহস্র গুণে হীন; সুতরাং রামেশ্বর তীর্থ ক্ষেত্রে ভ্রমণকারীর আড্ডা নহে, অথবা জলবায়ু পরিবর্ত্তনেচ্ছু দৈহিক

রোগীর সানিটারিয়ম নহে। ইহা আধ্যাত্মিক রোগীর পক্ষে ঔষধালয়। ইহা ভক্তের সাধন ও সম্মিলনের স্থান এবং তাঁহাদেরই দেহ, মন ও আত্মার সুখ সম্পাদনের সুরম্য আনন্দ-আশ্রম।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রামেশ্বর তীর্থে যাইতে হইলে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সুদূর মাদুরা রেলওয়ে ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া বলদ শকটে বা পদব্রজে বহুদূর পর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক, মহাকষ্ট ও অসুবিধায় সমুদ্রতটে পৌঁছিতে হইত, তদনন্তর নৌকা বা বাষ্পীয় তরণী-যোগে মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গ-মালার সহিত ভাসিতে হইত। আমি সর্ব্ব প্রথমে যখন রামেশ্বর গিয়াছিলাম, তখন এই পথই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সে যে কি মহাকষ্ট, তাহা হিন্দু ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারে না। ভক্তপ্রাণ হিন্দু ভিন্ন, প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, অপরিচিতা ভাষার বিভিন্ন প্রকৃতি-সম্পন্ন লোকের দেশে, সুদূর সমুদ্র-তীর্থে আর কেহ সহসা আসিতে সাহসী হয় বলিয়া বিবেচনা করি না। এই দুর্গম, দুঃখদায়ক ও বিপদসঙ্কুল সুদূর তীর্থক্ষেত্রে প্রথমাগমনের কথা ভাবিলে এখনও মনে হয়—

চল্‌তে চল্‌তে ছাতা ছিঁড়ে, আর ছিঁড়ে বস্ত্র।
পথে পথে দস্যু ফিরে হাতে লোয়ে অস্ত্র।
চল্‌তে চল্‌তে পা ফোলে, আর ফোলে গা।
যতই চলিয়া যাও, পথ ফুরায় না।
হিড়িং মিড়িং ভাষা তাদের, নারিকেল তেল খায়।
যাত্রীদের বধিয়া প্রাণে, অরণ্যেতে ধায়॥

যাহা হউক, কয়েক বৎসর অতীত হইল, এই দুর্ঘটনা-সঙ্কুল দুর্গম পথে রেলওয়ে হইয়া গিয়াছে, সুতরাং পথিকের পক্ষে এখন রামেশ্বর যাওয়া সুবিধাজনক হইয়া উঠিয়াছে। রেলওয়ে হইবার পরে বাঙ্গালা ১৩১৪ সালের শরৎ ঋতুতে, আমি দ্বিতীয়বার রামেশ্বর গিয়াছিলাম। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। কলিকাতা হইতে রামেশ্বর গমনের পথে এমন অনেক সুন্দর আশ্চর্য্য ও প্রয়োজনীয় স্থান বিদ্যমান আছে, যাহা দেখিবার জন্য পথিকের মন স্বতঃই লালায়িত হইয়া উঠে, কিন্তু প্রস্তাববাহুল্য ভয়ে আমি এক্ষণে তাহাদের উল্লেখ করিব না। অবান্তর ভাবে দুই একটা স্থানের উল্লেখ করিতে আমি বাধ্য, কারণ এই স্থানগুলির সহিত রামেশ্বর তীর্থ ও তীর্থযাত্রীদলের সম্বন্ধ আছে।

কলিকাতা হইতে রামেশ্বর যাইতে হইলে হাবড়া রেলওয়ে ষ্টেসনে বেঙ্গল নাগপুর লাইনের গাড়ীতে প্রথমে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত যাওয়া আবশ্যক। বলা বাহুল্য, স্নান, আহার ও বিশ্রামাদির জন্য পথিককে মধ্যে মধ্যে অবতরণ করিতে হয়, তাহা সুবিধামত পথিকেরা স্থির করিয়া লইবেন। মান্দ্রাজ ষ্টেশনে বাষ্পীয় শকট হইতে অবতরণ করিয়া যাত্রীরা সাউথ-ইণ্ডিয়া-রেলওয়ে লাইনের গাড়ীতে আরোহণ করিলে, গাড়ী মাদুরা নগরী পর্য্যন্ত পথিককে লইয়া গিয়া বিশ্রাম লাভ করে, পথিককেও এখানে বিশ্রাম লাভ করিতে হয়। অনেক বর্ষ পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, রামেশ্বরের যাত্রিগণ মাদুরা নগরীর ভুবন-বিখ্যাত ভগবতী-মন্দির না দেখিয়া রামেশ্বরাভিমুখে অগ্রসর হইত না; পাণ্ডারাও এই মন্দির না দেখাইয়া যাত্রিগণকে লইয়া যাইত না। এখন এই বাধ্যবাধকতার নিয়ম বর্ত্তমান নাই বটে, কিন্তু গমন কিম্বা আগমনের সময় মাদুরা-মন্দির না দেখিয়াছে, এমন যাত্রী

এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। সেতুবন্ধ রামেশ্বরের মন্দির ভিন্ন এই ভুবন-বিখ্যাত মন্দিরের সমতুল্য দেবালয় পৃথিবীতে কুত্রাপি নাই। ইহ অতীব অপূর্ব্ব মন্দির এবং ইহা স্বচক্ষে না দেখিলে এই পথে গমনাগমনের অর্থব্যয় বৃথ হইয়া যায়। স্বচক্ষে না দেখিলে ইহার ধারণা হওয়া অসম্ভব। দক্ষিণ দেশে, বিশেষতঃ মাদুর জেলায় ভগবতীর নাম "মিনাচী" এবং মন্দিরের নাম কোয়েল; সুতরাং ইহা "মনিচী কোয়েল" নামে প্রসিদ্ধ। সর্ব্বশ্রেণীর ও সর্ব্বপ্রকার রুচির লোকের জন্য মাদুরা নগরীতে স্থান পাওয়া যায়। ইংরাজি ধরণের ও দেশীয় ধরণের হোটেল যথেষ্ট সংখ্যায় আছে, খরচও কম। তদ্ভিন্ন বাসাবাটীও প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ভদ্রলোকেরাও বিদেশীয়গণকে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। এতদ্ব্যতীত রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট ছত্র, আশ্রমাগার, পান্থালয় এবং (রাণী মংগাম্মলের প্রতিষ্ঠিত) পথিকদিগের জন্য কুঠি বিদ্যমান আছে। নগরী অত্যন্ত প্রাচীনা এবং এই নগরীতে দেখিবার যোগ্য অনেক দ্রব্য ও অনেক স্থান আছে। কোন কোন দ্রব্য এবং কোন কোন স্থান ভূতলে অতুল। ভৈ গৈ নদীতীরে এই নগরী অবস্থিতা। সীতাদেবীর উদ্ধার সঙ্কল্পে রঘুবংশ-তিলক শ্রীরামচন্দ্র মাদুরায় মহাশক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন, এই মহাশক্তি ঐ "মনিচী" দেবী।

মাদুরা নগরীতে যাহা কিছু দেখিবার আছে, তাহা দর্শন করিয়া আমি রমানাথপুর নামক স্থানের টিকিট ক্রয় পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রেলওয়ে শকটে আরোহণ করিলাম। রমানাথপুরের ইংরাজি নাম রামনাদ (Ramnad)। বহুবর্ষকাল ব্যাপিয়া এই হিন্দুরাজ্য সম্পূর্ণ ভাবে স্বাধীন ছিল এবং একদা ইহা ধন, সম্ভ্রম, বীরত্ব ও প্রভুত্বের জন্য ভারত-বিখ্যাত ছিল। রামনাদ অতি প্রাচীন ও পবিত্র রাজ্য, এখানকার হিন্দুরাজা "সেতুপতি রামনাথেশ্বর" উপাধিতে ত্রেতাযুগ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত সম্বোধিত হইয়া থাকেন। রামেশ্বর তীর্থ এই রাজার জমীদারী ভুক্ত। এক্ষণে সমুদয় রামনাদ প্রদেশ বৃটিশাধিকৃত; রাজা একজন প্রধান জমীদার। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যখন লঙ্কাভিমুখে গমন করেন, তখন এই সকল স্থান গহন অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। শূদ্র জাতীয় এক ব্যক্তি সে সময়ের বনবাসী অসভ্য জাতিগণের রাজা বা অধিনায়ক ছিলেন। সমুদ্র তট পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত ছিল। শ্রীরামচন্দ্র ভাবিলেন, এই দলপতিকে হস্তগত না করিলে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কা পুরীতে প্রবেশ করা কঠিন হইতে কঠিনতর। বন্যরাজা ভগবান শ্রীরাম চন্দ্রের আনুগত্য স্বীকার করিল এবং বিবিধ প্রকারে সহায়তা করিতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা বিজয় ও দশাননের নিধন সম্পাদন করিয়া যখন ভারতভূমে প্রত্যাগমন করেন, তখন বিভীষণকে লঙ্কা, হনুমানকে রামেশ্বর এবং ঐ শূদ্র নরপতিকে সাগর-তটবর্ত্তী সমুদয় রাজ্য অর্পণ করিয়াছিলেন, এই সঙ্গে ঐ বন্য রাজাকে "সেতুপতি রামনাথেশ্বর" উপাধি প্রদান করিয়া সেতুর রক্ষার ভার সমর্পণ করেন। এখন পর্য্যন্ত ঐ রাজার ঐ প্রাচীন ও সম্মানিত উপাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, রমানাথপুর ও রামেশ্বর তীর্থদ্বয় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নামেই প্রতিষ্ঠিত। কালপ্রভাবে রমানাথপুর বা রামনাদ অত্যন্ত সভ্য ও শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন এখানে স্কুল, ডাকঘর, তারঘর, সুন্দর পথ, রাজপ্রাসাদ, বাজার, হাট, সুরম্য অট্টালিকাদি

দেখিতে পাওয়া যায়। রামনাদের রাজা তদ্দেশে অদ্যাপি "ধর্ম্মাধিকরণ"নামে প্রখ্যাত। বর্ত্তমান রাজবংশ, রামচন্দ্রের সমসাময়িক বন্যরাজবংশ কিনা, জানিনা, কিন্তু ত্রেতাযুগ হইতে এই রাজবংশ বর্ত্তমান আছে, একথা সকলেই কহিয়া থাকেন। এখনকার রমানাথপুর রাজধানীর জলবায়ু উৎকৃষ্ট এবং ইহার শোভাও চিত্তানন্দদায়িনী। ইহা এক প্রকার সুবৃহৎ গ্রাম অথবা উপনগর সমতুল্য। ভারতের শেষ সীমা বলিয়া, এখানে পুলিশের বন্দোবস্ত খুব কড়াকড়ি।

সমুদয় রামনাথ জমীদারীর আয়তন প্রায় বাইশ শত বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ। রজেস্ব ন্যূনাধিক ৮ লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা। হিন্দুর সংখ্যা ৪ লক্ষ, মুসলমান ৫০ সহস্র এবং অবশিষ্ট খ্রীষ্টান। অতি পূর্ব্বকাল হইতে এখানে রোমান কাথলিক পাদ্রিরা খ্রীষ্টান ধর্ম্ম চালাইয়া আসিতেছেন। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত পাদ্রী (ফাদার) জন ডি ব্রিটো হিন্দু প্রজার হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে শিব গঙ্গা নামক স্থানের কপটাচারী ও দুর্ব্বৃত্ত হিন্দু জমীদার খ্রীষ্টানদের সহিত যোগ দিয়া রামনাদের রাজার বিদ্রোহী হয় এবং অনেক জমীদারী বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়; এক্ষণে শিব গঙ্গার জমীদার একজন "রাজা" বলিয়া বিখ্যাত। রামনাদের নরপতি ইংরাজি-শিক্ষিত, তিনি সম্প্রতি বয়োপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। দুর্গের অভ্যন্তরস্থ প্রাসাদে রাজা বাস করেন। রাজধানীর লোক সংখ্যা প্রায় দ্বাদশ সহস্র। রামনাদ নগরে অনেক "চেটি" বণিক ও লব্বাই নামক মুসলমান বাস করে। রামনাদে প্রতি বুধবারে বৃহৎ হাট বসে এবং এখানে রাজার স্কুল ব্যতীত পাদ্রীদের ইংরাজি স্কুল, গির্জ্জা, মিশন আড্ডা, সবরেজেষ্টারি আফীশ, থানা, আসিসটাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কাছারী, মুন্সেফী আদালত, আসিস্টাণ্ট পুলীশ সাহেবের আফিশ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। সমুদ্রতীর হইতে রামনাদ রাজধানী চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী। রাজার নূতন প্রাসাদের উপরে এই কয়েকটী কথা খোদিত আছে—"পণ্ডিথোরী দেবার", ইহার নিম্নে খোদা আছে—"সোম সুন্থর বিলাস।" সর্ব্বত্র নারিকেল ও তাল গাছ। অসংখ্য কোটি গাছ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে অগণ্যবিধ সমুদ্রজ মৎস্য ও কর্কট দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। নগরের ভিতরে বিজ্ঞানেশ্বর দেবতার মন্দির আছে। নগরের সর্ব্ব স্থানেই অগণ্য চম্পক পুষ্পবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। নগরবাসীর অধিকাংশ কুটীর নারিকেল পাতা বা তাল পাতায় সমাচ্ছন্ন। এখানে কাঁচা ও পাকা আম বারমাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, এক পয়সায় ৬টা বড় বড় অপক্ক আম, সকল ঋতুতেই মিলে। মাছ ও মাংস খুব সস্তা; সহর দেখিতে অতি সুন্দর।

রামনাদ রাজ্যে দুইটী প্রধান তীর্থ আছে; রামেশ্বরের যাত্রিগণ রামেশ্বর গমন বা তথা হইতে প্রত্যাগমনের সময় এই তীর্থদ্বয় দর্শন করিতে বাধ্য। প্রবাদ আছে, যাত্রীরা ইহাদিগকে দর্শন না করিলে রামেশ্বর দর্শনের ফল প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং তীর্থযাত্রীরা ইহা দর্শন করিতে বিস্মৃত হয়েন না। একটী তীর্থের নাম "দেবী পত্তন", অপরটীর নাম "দুর্ব্বাশয়নম্।" অনেক বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার এই দুই স্থানে গিয়াছিলাম, পুনরায় তথায় যাইবার ইচ্ছা হওয়ায় গমনের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম।

রামনাদ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে রমানাথ-

পুর রাজধানী প্রায় দেড় মাইল দূরবর্ত্তী। আমি ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া নগরের প্রধান পথের উপরিস্থিত এক মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুর ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

প্রত্যূষে উঠিয়া তদ্দেশীয় জটকাবাণ্ডী নামে এক প্রকার অশ্বযান ভাড়া করিয়া প্রথমে দেবীপত্তন দেখিতে গেলাম। ইহা ১১ মাইল দূরবর্ত্তী। মাদুরা নগরীতে ভগবান রামচন্দ্র লঙ্কা বিজয় সঙ্কল্পে বৈষ্ণব মতে মহাশক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন, এখানে শাক্তমতে তিনি ভগবতীর আরাধনা করেন। এই স্থানের অপর নাম "নবপাষাণ।" নবগ্রহের নয়টী পাষাণ মূর্ত্তি আছে বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। এখানে নবগ্রহের পূজা করিতে হয়। আমি দেবীপত্তন দর্শন করিয়া সেই দিন অপরাহ্নে "দূর্ব্বাশয়ন" তীর্থাভিমুখে প্রয়াণ করিলাম। দেবীপত্তন হইতে দূর্ব্বাশয়ন প্রায় তিন ক্রোশ দূরে। অন্য দিক দিয়া যাইতে হয়। পথিমধ্যে শকটবান কহিল "দূর্ব্বাশয়নে পৌঁছিতে রাত্রি হইবে।" সুতরাং পথের ধারে একটা ক্ষুদ্র গ্রামে আমরা সায়াহ্নে একজনের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সেই লোকের নাম "আপ্পায়া"; তদ্দেশীয় এই লোক আমাদিগকে অত্যন্ত যত্ন ও স্নেহ করিয়া পরম আপ্যায়িত করিয়াছিল।

প্রত্যূষে ঐ গ্রাম হইতে রওয়ানা হইয়া আমি দুর্ব্বাশয়ন তীর্থে পৌঁছিলাম। রাবণ কর্ত্তৃক অপমানিত ও নির্য্যাতিত হইয়া বিভীষণ ভারতাগমন পূর্ব্বক যে স্থানে দূর্ব্বাদলের উপরে শয়ন করিয়া সাশ্রুলোচনে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম দুর্ব্বাশয়নম্। এই স্থান অতীব মনোহর। যে গ্রামে ইহা অবস্থিত, তাহার নাম তিরুপলানী। ভাদ্র মাসে এখানে ধূমধামের সহিত ব্রহ্মোৎসব নামে মেলা হয়; বৈশাখ মাসেতে আর একটী মেলা হইয়া থাকে। এখান হইতে এক ক্রোশ দূরে গেলে ভারতমহাসাগর দৃষ্ট হয়। জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর।

সায়াহ্নের কিছু পূর্ব্বে আমি সেই জটকা বাণ্ডী যোগে পুনরায় রামনাদ নগরে আসিয়া পৌঁছিলাম এবং সেই মহারাষ্ট্রীয় লোকের ঘরেই অবস্থান করিলাম।

রজনী প্রভাত হইলে মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোকের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়া আমি মণ্ডপম্ নামক স্থানের টিকিট ক্রয় করিলাম। ইতিপূর্ব্বে যে মাদুরা ষ্টেশনের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা হইতে কিয়দ্দূর আগমন করিলে আরোহীরা দেখিবেন, ক্রমাগত পর্ব্বত প্রমাণ বালুকা রাশির ভিতর দিয়া সুবুদ্ধির সাগর ও সুকৌশলের নাগর ইংরেজ ইঞ্জিনিয়েরা লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। রামনাদ হইতে মণ্ডপম্ পর্য্যন্ত যে পথ, তাহা আরও বালুকারাশিতে পরিপূর্ণ, তদ্ভিন্ন পথের দুই ধারে অসংখ্যাসংখ্য কাঁটা গাছ ও কাঁটার লতা। দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এত রাশি রাশি বালুকাময় স্থানে এত গাছ কেমনে জন্মে, তাহা ঠিক করা যায় না। রমানাথপুর হইতে মণ্ডপম্ ষ্টেশন এক ঘণ্টার কিঞ্চিৎ অধিক, এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে পৌঁছিতে পারা যায়। মণ্ডপম্ নামক স্থানে ভগবান রামচন্দ্র মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি আয়োজন পূর্ব্বক চারিদিক লক্ষ্য করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের মণ্ডপম্ নাম হইয়াছে। ইহাই তথাকার প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জনপ্রবাদ। ষ্টেশনটী ঠিক সমুদ্র তটে অবস্থিত, সমুদ্রের কূল পর্য্যন্ত রেলওয়ে

লাইন আসিয়া পৌঁছিয়াছে। লাইনের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্রের জল স্পর্শ করা যায় এবং মহাসাগরের তরঙ্গ রাশি দিবা ও রাত্রি কালে ষ্টেশন-প্রাঙ্গণে পৌঁছিয়া লাইনকে প্রধৌত করে। মণ্ডপম্ ষ্টেশন ভারতবর্ষের শেষ সীমা, ইহার পরে অনন্ত ভারত মহাসাগর; আর ভারতবর্ষ নাই। ইহা সমুদ্র (sea) নহে, ভারত মহাসাগর (ocean) বলিয়া বিখ্যাত। মণ্ডপম্ ষ্টেশনের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ভারত-মহাসাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহাকে অত্যন্ত শোভাময় বলিয়া বোধ হয়। কিয়ৎক্ষণ মহাসাগর তটে দণ্ডায়মান হইলে মহাকবি কালিদাসের সেই সুপরিচিত "শ্রীবিশালাং বিশালাং" কবিতাটী স্মৃতি পথে উদিত হয়। কবি কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

তর্জ্জন গর্জ্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গণিল প্রমাদ ॥
তমোময় দেখা যায় গগন মণ্ডল।
হিল্লোল কল্লোল করে সাগরের জল ॥
সিন্ধু জলে জলজন্তু কলরব করে।
জলেতে না নামে কেহ মকরের ডরে ॥
এক এক জলজন্তু পর্ব্বত প্রমাণ।
জগৎ করিবে গ্রাস হেন অনুমান ॥
সাগর দেখিয়া সবে পাইল তরাস।
সবাকারে করিতেছে অঙ্গদ আশ্বাস ॥

বাস্তবিক এই মহাসাগর সন্দর্শন করিলে ভাবুকের হৃদয়ে যেমন অপার কৌতুক ও আনন্দের উদয় হয়, তেমনি বিভিষীকারও সঞ্চার হইয়া থাকে। অনেকে সমুদ্র-তট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, এমন কথাও শ্রবণ করা যায়। এই মহাসাগরের চারিদিকে কেবল অনন্ত জল রাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। পথিকের চারিপার্শ্বেই কেবল মহাসাগর আর মহাসাগর!! এত বড় সাগর-রাজ বনের বানরদিগের হাতে বাধা পড়িয়াছিল দেখিয়া বড় দুঃখে রাক্ষসরাজ রাবণ কহিয়াছিল—

ওহে প্রচেত!! জগদলপতি!
অলঙ্ঘ্য তুমি; এই কি সাজে
তোমারে?———

সেই বিশাল নীলাম্বুরাশি ব্যোমবলয়রেখাস্পর্শী, গভীর কল্লোলকিমিবতত্ত্বভাষী—সেই সুন্দরাদপিসুন্দর তাণ্ডবভক্ত্যাধিক মহাসমুদ্র বিলোকন করিয়া মনে পড়িল—

The ocean with its vastness, its blue green
Its ships, its caves, its hopes, its fears –
Its voice mysterious, which whoso hears,
Must think on what will be, and what has been.

তাহা দেখিতে দেখিতে চিত্ত ভয়-বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া উঠে। উত্তাল তরঙ্গমালার গতি লক্ষ্য করিতে করিতে হৃদয়-সমুদ্রও যেন নানা ভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। বিষ্ণুরূপী ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সীতা দেবীকে এই সমুদ্র দেখাইয়া কহিয়াছিলেন—

তাং তামবস্থাং প্রতিপদ্যমানং
স্থিতং দশ ব্যাপ্য দিশোমহিম্না।
বিষ্ণোরিবাস্যানবধারনীয়ং
ঈদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা ॥

যাহা হউক, ভারত-মহাসাগরের উপরে নানা স্থানে অনেকগুলি ছোট বা বড় দ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের মধ্যে সিংহল দ্বীপ (লঙ্কা) আয়তনে বৃহত্তম, তাহার পরে পবন-দ্বীপ। এই পবন-দ্বীপে রামেশ্বর তীর্থ অবস্থিত। এই দ্বীপের ইংরাজি ও তামিল নাম পম্বেন (Paumben)। আমরা মণ্ডমপ্ ষ্টেশনে মহাসাগর তটে পৌঁছিবা মাত্র দেখিলাম, রেলওয়ে কোম্পানীর বাষ্পীয় তরণী তথায় যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমরা জাহাজে আরোহণ করিবার অল্পক্ষণ পরে মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার সঙ্গে

যুদ্ধ করিতে করিতে জাহাজখানি পবন দ্বীপাভিমুখে তীব্রবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। সমুদ্রের জলে নানা প্রকার মৎস্য ও জলচর জন্তু দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইতে লাগিলাম। অনেকগুলি ছোট ছোট বালক আশ্চর্য্য রূপে সাঁতার দিতে দিতে তরঙ্গের উপর ভাসিয়া ভাসিয়া যাত্রিদিগকে কহিতে লাগিল 'সিকী, দুয়ানী, পয়সা ইত্যাদি যাহা কিছু ইচ্ছা হয়, জলে ফেলিয়া দাও, আমরা কুড়াইয়া লইব।' কেহ কেহ তাহা জলে নিক্ষেপ করিল এবং ঐ বালকেরা অত্যাচর্য্য দক্ষতার সহিত হাতের দ্বারা বা মুখের দ্বারা তাহা উঠাইয়া লইতে লাগিল। জাহাজ তীব্র বেগে ছুটিতে লাগিল, আমরাও বাষ্পীয় তরণীতে বসিয়া সাগরের মনোহারিনী শোভা দেখিতে দেখিতে, হাসিতে হাসিতে তরঙ্গোপরে ভাসিতে লাগিলাম।

প্রায় একাদশ মাইল দূরে গিয়া বাষ্পীয় তরণী যে স্থানে বিশ্রাম লাভ করিল, সেখানে রেলওয়ে কোম্পানীর দুইখানা সুবৃহৎ বোট (নৌকা) ভাসিতেছিল। যাত্রীরা জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক যে দ্বীপতটে উপস্থিত হইল, তাহার নাম পবন দ্বীপ অথবা পম্‌বেন। সমুদ্রের কিনারায় জল অধিক থাকেনা বলিয়া জাহাজ খানি কিনারায় পর্য্যন্ত আসিতে পারেনা এবং এই জন্য নৌকাদ্বারা যাত্রীদিগকে তটে পৌছাইয়া দেয়। নৌকায় আসিতে কুড়ি মিনিট বা অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক সময় লাগে না। পবন দ্বীপে উপস্থিত হইয়া পথিকেরা দেখিবেন, এই দ্বীপের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন বিস্তৃত হইয়াছে। এই দ্বীপের চারিদিকেই মহাসাগর অর্থাৎ ভারতমহাসাগরের অনন্ত জলরাশির উপরে ইহা একটা দ্বীপমাত্র। ইহার আয়তন দীর্ঘে সার্দ্ধ সপ্তক্রোশ এবং প্রস্থে সার্দ্ধ দুই ক্রোশ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা বিজয়, রাবণ বধ ও সীতা সতীর উদ্ধার করিয়া ভারতাগমনের সময়ে এই দ্বীপটী হনুমানকে দান করেন। পবনের পুত্র হনুমান, সেইজন্য পবনের নামে ইহাকে পবনদ্বীপ কহা হইয়া থাকে। ইংরাজি ভাষায় ও তামিল ভাষায় এই দ্বীপকে অপভ্রংশে পম্বেন দ্বীপ বলা হয়। কোন কোন ইউরোপীয় পাদ্রী অনুমান করেন, এই দ্বীপে আসিতে হইলে সাগরের অনেক স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, এঁকিয়া বেঁকিয়া, সর্পের ন্যায় আসিতে হয়, এইজন্য এই দ্বীপের পম্‌বেন নাম হইয়াছে। তামিল ভাষায় পম্‌বেন শব্দের অর্থ সর্প। কিন্তু সাহেবদিগের এই কথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মিকা। ইংরাজি ভাষায় "হোম" নামে একটা শব্দ আছে, সেই শব্দের অর্থ গৃহ বা স্বদেশ। সংস্কৃত ভাষায় এবং ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় হিন্দুভাষায় "হোম" নামে একটা শব্দ আছে, তাহার অর্থ ঘৃতসংযুক্ত অগ্নিহুত ধর্ম্মক্রিয়া বিশেষ। ইংরাজি হোম ও সংস্কৃত হোম সমভাবে উচ্চারিত হয় বলিয়া কি উভয়ের অর্থ এক হইতে পারে? না, তা কখনই না। বিশেষতঃ তামিল পণ্ডিতেরা পাদ্রীদের ঐ অর্থ আদৌ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন না। যাহা হউক, পম্‌বেন্ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কিছুদূরে পদব্রজে গমন করিয়া আমি একটা তীর্থক্ষেত্র দর্শন করিতে গেলাম, উহার নাম "জটায়ু তীর্থ"। দুষ্ট দশানন যখন মা জানকীকে হরণ করিয়া বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক লঙ্কায় পলাইতেছিল, তখন প্রবৃদ্ধ জটায়ু রাবণকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ করেন এবং সেই মহাযুদ্ধে সাংঘাতিক

রূপে আহত হইয়া ধরাতলে যে স্থানে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, ইহা সেই পবিত্র ক্ষেত্র। এই স্থানে ইহার সমাধি ও শ্রাদ্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা সুপবিত্র তীর্থক্ষেত্র মধ্যে গণ্য। এই স্থানে উপস্থিত হইলে সহৃদয় ও চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে নানা প্রকার ভাবের উদয় হয়। বৃদ্ধ জটায়ু রামচন্দ্রের পিতা দশরথের পরম সখা ছিলেন এবং নানা কারণে উভয় মিত্রের মধ্যে বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ ছিল। মিত্রপুত্রের সতী স্ত্রীকে দুষ্ট দশানন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া, উপকারী বন্ধুর পুত্রবধূকে দুশ্চরিত্র রাক্ষস গোপনে লইয়া পালাইতেছে দেখিয়া, কৃতজ্ঞ সখা কেমনে নীরবে থাকিতে পারে? রাবণের সহিত বৃদ্ধ জটায়ুর যুদ্ধ ভূতলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। ন্যায় ও সত্যের, বিশেষতঃ সতীত্বের মর্য্যাদা নাশ করিয়া দুষ্ট রাবণ পরস্ত্রীকে হরণ করিয়া পলাইতেছে দেখিয়া, ধার্ম্মিক জটায়ু (প্রবৃদ্ধ হইলেও) কি নীরবে থাকিতে পারে? হায় ভারতবর্ষ!! তোমার এমন একদিন ছিল, যে সময়ে তোমার অতিবৃদ্ধ সন্তানগণও প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া দুর্ব্বল শরীরে অটুট নির্ভীকতার সহিত কর্ত্তব্য পালনের জন্য, ধর্ম্মরক্ষার জন্য,ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিত।

অতি পবিত্র; জ্ঞানোপদেশের অতি সুন্দর স্থান

রজনী প্রভাত হইলে অনেকগুলি সাধু পুরুষের সঙ্গে পরমানন্দে জটায়ু তীর্থক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমি পুনরায় পবন দ্বীপে আসিয়া পৌছিলাম। পবন (পম্বেন) দ্বীপ মধ্যে যে ক্ষুদ্র রেলওয়ে লাইন বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাতে চারিটী মাত্র রেলওয়ে ষ্টেশন দৃষ্ট হয়। তদ্যথা—পম্বেন বা সাগর তট, পম্বেন নগর, তাংগাচীমদম্ এবং রামেশ্বর। শেষ ষ্টেশনের নাম রামেশ্বর,ইহাই ঐ দ্বীপের শেষ সীমা, ইহার পরেই আবার সেই সুবিশাল ভারত-মহাসাগর। রামেশ্বর মন্দির এই দ্বীপের প্রান্তভাগে, মহাসাগর তটে অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত।

প্রথম ষ্টেশন হইতে শেষ ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। ক্রমাগতঃ শৈলসমতুল্য বিপুলাকার বালুকাস্তূপ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ইংরেজেরা এই রেলওয়ে লাইন বসাইয়াছেন। রামেশ্বর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে রামেশ্বর উপনগর প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। অতি কষ্টে বলদ শকট যাইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ যাত্রী পদব্রজেই গমন করিয়া থাকে। আমিও সমুদ্রতটের বালুকা রাশিকে দুর্ব্বল পদদ্বয় দ্বারা হটাইতে হটাইতে সুপবিত্র রামেশ্বর তীর্থ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

জগন্নাথ দেবের মন্দির।

১ম পরিশিষ্ট :—"ইন্দ্রদ্যুম্নসরঃ সম্বন্ধে মহাভারতীয় আরণ্যক পর্ব্বান্তর্ভূত অষ্টনবত্যাধিকঃ সত পরিমিতাধ্যায় প্রতি দৃষ্টি করিলে প্রমাণসমূহ প্রাপ্ত হইবে।

বৈতরণী নদী সম্বন্ধেও প্রমাণ-সমূহ বিদ্যমান।

২য় পরিশিষ্টঃ—ব্রহ্মপুরাণেও এই প্রমাণ দৃষ্ট হয়ঃ—

ব্রহ্মপুরাণান্তর্গত উৎকলদেশ বর্ণনে যথা ঃ—ব্রহ্মোবাচ,

"বিরজে বিরজা নাম ব্রহ্মণা সংপ্রতিষ্ঠিতা।
যস্যাঃ সন্দর্শনে মর্ত্ত্যঃ পুনাত্যসপ্তমং কুলং॥"

ক্ষেত্র সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে ঃ—

ব্যাস উবাচ,

পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যং সমাসেন শৃণু দ্বিজ,
সম্যগুক্তং জগত্যাস্মিন কঃ শক্তোবিষ্ণুনা সহ
লবণা ম্ভোনিধেস্তারে পুরুষোত্তম
পুরং তদ্ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ স্বর্গাদপি সুদুর্ল্লভং।
স্বয়মস্তি পুরে তস্মিন যতঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ,
পুরুষোত্তমমিত্যুক্তং তস্মাত্তিন্নামকোবিহৈঃ।
ইতিপাদ্মে ক্রিয়া যোগসারে পুরুষোত্তম
মাহাত্মে একাদশশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মপুরাণে উৎকল দেশবর্ণনে ঃ—

সন্তি তীর্থানি পুণ্যানি পুণ্যান্যায়তনানি চ,
উৎকলে তু মুনিশ্রেষ্ঠা বেদিত্যব্যানি তানিবৈ।
সমুদ্রস্যোত্তরে তীরে তস্মিন্ দেশে দ্বিজোত্তমাঃ।
আস্তে হ্যাং পরং ক্ষেত্রং মুক্তিদং পাপনাশনং।
সর্ব্বত্র বালুকাকীর্ণং সবিকামদং,
আস্তে যত্রো স্বয়ং দেবোমুক্তিদঃ পুরুষোত্তমঃ।
ধন্যাস্তে বিবুধপ্রখ্যা যে বসন্ত্যুৎকলে জনাঃ,
তীর্থরাজজলে স্নাত্বা পশ্যন্তি পুরুষোত্তমং।
স্বর্গে বসন্তি তে মর্ত্ত্যা ন বসন্তি যমালয়ে।
ব্রহ্মপুরাণাত্য রঘুনন্দনোদ্ধৃত প্রমাণানি ;
যথা ঃ—

তত্রাস্তে ভারতেবর্ষে দক্ষিণোদধিসংস্থিতঃ
উড্রদেশ ইতি খ্যাতঃ স্বর্গমোক্ষপ্রদায়কঃ।
সমুদ্রাদুত্তরে-তীরে যাৎ বিরজমণ্ডলং।

বামন পুরাণবচনং তীর্থকল্পতরৌ যথা ঃ—

উপোপ্য রজনীমেকাং বিরজাং সনদীং যযৌ
স্নাত্বা বিরজসে তীর্থে দত্বা পিতং পিতৃস্তথা।
দর্শনার্থং যযৌ ধীমানজিতং পুরুষোত্তমং
ইত্যাদি।

কামণ পুরাণে উক্তং চ—

ভল্লাবনে মহাযোগী নীলাদ্রৌ পুরুষোত্তমং
ইত্যাদি।

কূর্ম্ম-পুরাণে—

তীর্থং নারায়ণ-স্যাঙ্গং নাম্না তু পুরুষোত্তমম্।
তত্র নারায়ণঃ শ্রীমানাস্তে পরমপুরুষঃ।

বিষ্ণুধর্ম্মে স্বস্থান কথন প্রস্তাবে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবান উবাচ।

সিংহাদ্রৌ দেবদেবেশং
বৈকুণ্ঠং মাগধেবনে,
সর্ব্বপাপহরং বিদ্ধ্যো উড্রে শ্রীপুরুষোত্তমং।

রুদ্র যামলে—

ভারতে ওৎকলে দেশে
ভূস্বর্গে পুরুষোত্তমে।
দারুরূপী জগন্নাথো ভক্তানাম ভয়প্রদঃ।

শিবপুরাণে

পুরুষোত্তমাত্ পরং ক্ষেত্রং
নাস্ত্যান্য ভবমোচনং।
যত্র সাক্ষাৎপরং ব্রহ্ম দারুব্যাজশরীরভিত।

আগ্নেয় পুরাণে—

আমাসাক্ষাত্ কৃতো যেনো স মুক্তো ব্রহ্মবিন্নতঃ
পুরুষোত্তম সংকেতঽস্মিন ক্ষেত্রে
যোনিবসেৎ দ্বিজঃ।
দারুব্রহ্ম নরঃ পশ্যন্ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ
বিনায়কাদিভিঃ পুণ্যৈঃ
যঃ ক্ষেত্রে তনুং ত্যজেৎ।

গরুড় পুরাণে—

অশেষ পুণ্যতীর্থেষু ক্ষেত্রেষু ভুবনত্রয়ে
পুরুষাখ্যং সমং ক্ষেত্রং
নাস্ত্যেবাস্মচ্ছ পাম্যহং।

ব্রহ্মপুরাণে—

মহাজ্যৈষ্ঠ্যাং তু যো গচ্ছেৎ
ক্ষেত্রং শ্রীপুরুষোত্তমং
ব্রতদানাদি যাবন্তি বহু যজ্ঞফলানি বৈ।

ভবিষ্য পুরাণে—

যত্র কুত্রাপি মরণাৎ ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে।
ন স্নান নিয়মস্তত্র্য যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদং॥

বৃহন্নারসিংহ পুরাণে—

পুরুষোত্তমাৎ পরং ক্ষেত্রং নাস্ত্যত্র
পৃথিবীতলে।
ভুস্বর্গমিতি বিখ্যাতং দেবানামপি দুর্ল্লভং।

বায়ুপুরাণে—

বারাণস্যাং কুরুক্ষেত্রে যাবৎ জীবং বসেন্নরঃ।
প্রাপ্নোতি যৎফলং রাজন ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে

শিবধর্ম্মোত্তরে—

কারাণস্যাং, কুরুক্ষেত্রে, প্রয়াগে নর্ম্মদাজলে জলে, স্থলে চাণ্ডরীক্ষে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে।

দারুমূর্ত্তি সম্বন্ধে প্রমাণ সমূহ।

আদৌ যদ্দারুপ্লবতে সিন্ধোঃপারে অপুরুষম্ তদালভস্ব দুর্দ্দনো তেন যাহি পরংস্থলং। অস্য ব্যাখ্যা সাম্বায়ন ভাষ্যে, আদৌ বিপ্রকৃষ্টে দেশে বর্ত্তমানং যদ্দারু দারুময়ং পুরুষোত্তমাখ্যাং দেবতাশরীরং প্লবতেজলস্যোপরি অপুরুষং নির্ম্মাতৃরহিতত্বেন অপুরুষম্ তত্র আলভস্ব দুর্দ্দনো হে হোতঃ। তেন দারুময়েন দেবেন উপাস্যমানেন পরংস্থলং বৈষ্ণবং লোকং গচ্ছেন্যর্থঃ।

অথর্ব্ববেদেহপি,—

আদৌযদ্দারু প্লবতে সিন্ধোর্ম্মধ্যে অপুরুষম্।
তদালভস্ব দুর্দ্দনো তেন যাহি পরংস্থলং।
অত্রৈব তর্ৎবার্থঃ মধ্যে তীরে।

পদ্মপুরাণে চ—

নমুদ্রস্যোত্তরে তীরে আস্তে শ্রীপুরুষোত্তমে পূর্ণানন্দময়ং ব্রহ্ম দারু ব্যাজশরীরভিৎ।

বৃহদঃ বিষ্ণুপুরাণে—

দুর্ব্বাসাঃ কপিল সম্বাদে ব্যাসদেব উবাচ,

যোগিনাং হি হৃদাকাশে বিদ্যুদ্বর্ণঃ প্রকাশতে স এব দারুরূপেণ আস্তে নীলাচলে মহঃ।

শ্রীভাগবতে যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদ বাক্যং যথা—

যত্রাস্তে দারুবপুষ্কা সর্ব্বচক্ষুপগোচরঃ
যো বিভাতি চিদাকাশে বেদান্তেক্ষুপীয়তে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

দেহে ব্যাপ্তং গবাং ক্ষীরং স্তনাভ্যাং প্রসবং
যথা
তথা জলধিতীরেহস্মিন্ ব্রহ্মদারুণে সংস্থিতং।
ক্ষীরোদধিং সমাসাস্য দেবাপপ্রচ্ছরাদরাৎ।
তথা জলধিতীরেস্মিন্ ব্রহ্মদারুণে সংস্থিতং।

স্কন্দপুরাণে—

চতুষষ্ঠি লঙ্গ কথন প্রস্তাবে—

যস্মাদর্থাৎ জগমিদং সম্ভূতং সচরাচরং
সোহর্থো দারুস্বরূপেণ ক্ষেত্রে জীবইবাস্থিতঃ
যস্মিন্ ক্ষেত্রে নীলগিরৌ দেহবান হরিরীশ্বরঃ।
তস্য দক্ষিণ পার্শ্বে তু যমেশোজাস্মামতঃ।

গরুড় পুরাণে—

তস্মিন্ ক্ষেত্রে নীলগিরৌ বসতো দারুরূপিণঃ॥

নারসিংহ পুরাণে—

অন্তোপা মন্ত্যজাতীনাং দর্শনান্মুক্তি দো বিভুঃ।
আস্তে তত্র জগন্নাথো দারুণা নির্ম্মিতোব্যায়ঃ।

বায়ুপুরাণে—

ভারতে চোৎকলে দেশে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে
নীলাক্ষো মাধবো যোহি আস্তে দারবদেহবৎ।

বিষ্ণুযামলে—

আস্তে তত্র জগন্নাথো ভগবান্ কললেক্ষণঃ
তুষ্যতে মনুজাপ্যেন দারুব্যাজ শরীরভিৎ।
স আস্তে শ্রীনীলগিরৌ জগন্নাথাখ্যজন্মা।

বহ্বৃচ পরিশিষ্টে—

তত্বজ্ঞা যং প্রতীক্ষ্যন্তে তৃতীয়া তীতমব্যায়ং
স এবাস্তে চিদানন্দো জগন্নাথাখ্যা মূর্ত্তিমান্
দারুণা নির্মিতো দেবো ইত্যাদি।

ব্রহ্মরহস্য, মেরুতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহে এই প্রকার প্রমাণ সমূহ দৃষ্ট হয়।

মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে—

প্রবিশনন্তু তৎক্ষেত্রং সর্ব্বে বিষ্ণু মূর্ত্তয়ঃ।
তস্মাঙ্গচারিণা তত্র নকর্ত্তব্য বিচক্ষণৈঃ।
চণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং গ্রাহ্যং তত্রান্নমগ্রজৈঃ
সাক্ষাৎ বিষ্ণুর্গতস্তত্র চণ্ডালোঽপি দ্বিজোত্তম।
তত্রান্নপাচিকা লক্ষ্মীঃ স্বয়ং ভোক্তা জনার্দ্দনঃ।
তস্মাত্তদন্নং বিপ্রর্ক্ষে দৈবতৈরপি দুর্ল্লভং।

বিষ্ণুপুরাণে—

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকং চ যৎ
ভক্ষাভক্ষ্যবিচারস্তু নাস্তি তদ্ ভক্ষণে দ্বিজ।

ভাগবৎপুরাণেঽপি—

হৃদিরূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ।
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ।

বিষ্ণুধর্ম্মাগ্নিপুরাণয়োঃ—

গন্ধান্ন-নীরভক্ষ্যাংস্তু স্তোত্রাবাসাংসিভূষণং
দত্ত্বা তু দেবদেবায় যে শেক্ষাণ্যুপভুঞ্জতে।

ভবিষ্যপুরাণে—

অতিপাতকপাপানি মহাপাপানি যানি চ।
তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি জগন্নাথান্নভক্ষণাৎ॥

ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে—

জগন্নাথস্য নৈবেদ্যং মহাপাতকনাশনং।
ভক্ষণাৎ ফলমাপ্নোতি কপিলাকোটিদানতাং।

তথা ভবিষ্যে—

জগন্নাথস্য নৈবেদ্যং ভক্ত্যা চ পিতৃদেবতাঃ
সন্তর্প্য যঃ স্বয়ং ভুংক্তে সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ।
যস্মাদন্নপতির্দেবো জগন্নাথো জনার্দ্দনং।
অন্নপূর্ণা সুভদ্রা স্যাৎ তৈবর্নানাম্নমুভিবরেৎ।

বরাহপুরাণে—বরাহ বাক্যং

যোমসৈবার্চ্চনং কৃত্বা তত্রাপণ-মনুত্তমং।
শেষমন্নং সমশ্নাতি ততঃ শৈরতরংমুকিং।

গরুড় পুরাণে—

ন কাল নিয়মোবিপ্রা ব্রতচন্দ্রায়ণে তথা।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভুঞ্জীয়াৎ যদীচ্ছেৎ মোক্ষনাত্মনঃ।

ভগবদবাক্য তত্র—

যেনাশ্নন্তি মমান্নমুস্পৃষ্টাস্পৃষ্টে বিবেকতঃ
তান্ ভংশয়ামি সম্পাদভ্যঃ তেভ্যোদণ্ডং দদাম্যহং।

বিষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মণোবাক্যং—

জগন্নাথস্য নৈবেদ্যং নাস্তি সংস্পৃষ্টদূষণং
সকৃত ভক্ষণ মাত্রেণ পাপেভ্যমুচ্যতে পুমান্।

বহ্বৃচ পরিশিষ্টে—

পবিত্রং বিষ্ণু নৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্তুতং
অন্য দেবস্য নৈবেদ্যং ভুংক্তা চান্দ্রায়ণং চরেৎ।

রুদ্রযামলে—

যদন্নং পাচয়েল্লক্ষ্মীর্হরয়ে পরিবেশয়েৎ।
তুহুচ্ছিষ্টং হরেভুর্ক্ত্বা কঃ সংসরতি পার্বতি।

স্কন্দপুরাণে—

মহাপবিত্রং হি হরে র্নবেদিতং
নিযোবয়েদ্ যঃ পিতৃদেব কর্ম্মসু।
তৃপ্যন্তি তস্মৈ পিতরঃ সুচাস্তথা
প্রযান্তি লোকং মধুসূদনস্য তে।

চতুবর্গ যোগীশ্ব—

নৈবেদ্যমন্নহং তুলশী বিমিশ্রিতং
বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তং
যোঽশ্নাতি নিত্যং পুরতো মুরানেঃ
প্রাপ্নোতি যজ্ঞাযুত কোটিপুণ্যং।

ব্রহ্মপুরাণে—

কুকুরস্য মুখভ্রষ্টং মমান্নং যদি যায়তে
ব্রহ্মাদ্যৈরপি তদ্ভক্ষ্যং ভাগ্যতো যদি লভ্যতে।

বায়ুপুরাণে—

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
দুর্জ্জনেনাপি সংস্পৃষ্টং সর্ব্বস্থে বাধনাশনঃ।

অশ্লীল মূর্ত্তি সম্বন্ধে।

অগ্নিপুরাণে ১০৪ অধ্যায়ে—
অধঃশাখা চতুর্থাংশে প্রতীহারৌ নিবেশয়েৎ।
মৈথুনে রথবল্লীভঃ শাখাশেষং বিভূষয়েৎ।

বৃহৎসংহিতায়াঃ ৫৭ অধ্যায়ে—
মিথুনৈঃ পত্রবল্লীভিঃ প্রমথৈশ্চোপশোভয়েৎ।
(অত্র মিথুনং নাম স্ত্রীপুরুষযুগলং)

জ্যোতিষ চন্দ্রিকাটীকায়াং বজ্রপাত শঙ্কয়া ইন্দ্রাণ্যাস্তা বন্ধাদেয়া ইতি—

শ্রীসদাশিব কাব্যকণ্ঠ।

বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অধ্যায়।

(১৮৩ পৃষ্ঠার পর।)

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় শিবনিবাসের বাটীতে মহা হর্ষে বিশ্রাম করিতেছেন সর্ব্বদা আনন্দিত পরবাসীরা সর্ব্বক্ষণ উত্তম কর্ম্মে নিযুক্ত নানা দেশীয় গুণবান ব্যক্তি আসিয়া রাজসভায় বসিয়া গুণের পরীক্ষা দিতেছেন পণ্ডিতেরা ছাত্র সমভিব্যাহৃত রাজার নিকটস্থ হইয়া শাস্ত্রের বিচার করিতেছেন। এই প্রকার প্রত্যহ হইতেছে দ্বিতীয় রাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় সভা সকলেই মহারাজাকে প্রশংসা করে দিন দিন রাজ্যের বাহুল্য এবং প্রজার বাহুল্য হইতেছে। রাজার পাঁচ পুত্র কোন অংশে ক্রটী নাই। যাবদীয় লোক সুখে কালক্ষেপণ করিতেছে, কিন্তু নবাব সাজেরদৌলা অত্যন্ত দুর্বৃত্ত হইয়াছে। মহারাজ চিন্তান্বিত আছেন দেশাধিকারী দুরন্ত কখন কি করে মধ্যে মধ্যে পণ্ডিতেরদিগের প্রতি আজ্ঞা করেন দেখ দেশাধিকারী অতি দুর্বৃত্ত তোমরা সকলে ঈশ্বরের নিকট আরাধনা কর যেন দুষ্ট অধিকারী এ দেশে না থাকে কিন্তু অতি গোপনে আরাধনা করিবা কদাচ প্রচার না হয়। এইরূপ নিজ রাজ্যে বাস করিতেছেন ইতিমধ্যে মুরসদাবাদ হইতে পত্র লইয়া দূত রাজপুরে উপস্থিত হইল। দ্বারী কহিলেক তুমি কে কোথা হইতে আসিলা। দূত আত্ম পরিচয় দিয়া কহিল তুমি মহারাজাকে সংবাদ দেহ পরে যেমন আজ্ঞা করিবেন সেই মত কার্য্য করিও। দূতের বাক্য ক্রমে দ্বারী মহারাজকে নিবেদন করিল মহারাজ মুরসদাবাদ হইতে পত্র লয়া এক দূত আসিয়াছে। রাজা দ্বারির বাক্য শ্রবণ করিয়া আজ্ঞা করিলেন দূতকে তোমার নিকট রাখ পত্র আনহ। দ্বারী অতি শীঘ্র গমন করিয়া দূতকে আত্ম স্থানে বাসাইয়া পত্র আনিয়া মহারাজকে দিলেক। রাজা সভা ত্যাগ করিয়া গোপনে বসিয়া পত্র পাঠ করিয়া যাবদীয় সংবাদ জ্ঞাত হইলেন বিস্তারিত সমাচার জ্ঞাত হইয়া হর্ষ বিষাদ দুই হইল যাবদীয় পাত্র মিত্র ও প্রধান প্রধান মন্ত্রীরা একত্র হইয়াছেন অতএব বুঝি অধিকারের ভাল হইবেক বিষাদ হইল নবাব অতি দুরন্ত যদি এ সকল কথা প্রকাশ হয় তবে জাতি

প্রাণ যাইবেক। এই রূপে মনোমধ্যে বিবেচনা করিতে লাগিলেন প্রচার কিছু করিলেন না কোন ভৃত্যকে আজ্ঞা করিয়া দিলেন যে দূত আসিয়াছে তাহাকে হাজার টাকা দেহ আর খাদ্য দ্রব্য যথেষ্ট করিয়া দেহ॥

পরে রজনীতে আত্মীয় বর্গের সহিত বসিয়া পাত্রকে আহ্বান করিয়া অতি নির্জ্জন স্থানে বসিয়া সকলকে পত্র জ্ঞাত করাইয়া কহিলেন তোমরা বিবেচনা করহ ইহার কি কর্ত্তব্য। নবাবের প্রধান পাত্র লিখিয়াছেন শীঘ্র মুরসদাবাদ এবং নবাবের দৌরাত্ম্য ক্রমে সকল প্রধান প্রধান মন্ত্রীরা ঐক্য হইয়া আমাকে আজ্ঞা লিপি লিখিয়াছেন আমি সে স্থানে যাইলে যে হয় বিবেচনা করিবেন অতএব মহতী বিপৎ উপস্থিত হইবার যে সৎ পরামর্শ তাহা তোমরা কহ। সকলেই নিঃশব্দ কাহারো মুখে বাক্য নাই ক্ষণেক পরে পাত্র নিবেদন করিল মহারাজ দেশাধিকারির বিষয় অতি সাবধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিতে হইবেক। রাজা কহিলেন কি বিবেচনা করা যায়। পাত্র নিবেদন করিল অগ্রে মহারাজ গমন না করিয়া আমি আগে গমন করি সেখানকার সমস্ত প্রকরণ জ্ঞাত হইয়া ভৃত্য যেমন নিবেদন লিখিবে সেইরূপ কার্য্য করিবেন হটাৎ মহারাজার যাওয়া পরামর্শ হয় না। এই কথা পাত্র কহিলে পর আর আর মন্ত্রীরা কহিল মহারাজ এই কর্ত্তব্য। এই পরামর্শ স্থির করিয়া কিঞ্চিৎ কালের পর পাত্রকে প্রেরিত করিলেন। তখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র কালীপ্রসাদ সিংহ।

কালীপ্রসাদ সিংহ মুরসদাবাদে উপস্থিত হইয়া আত্ম রাজার এক বাটী ছিল সেই স্থানে থাকিয়া মহারাজ মহেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদন করিলেন আমারদিগের মহারাজাকে নিকট আসিতে আজ্ঞা পত্র গিয়াছিল পত্র পাইয়া মহারাজ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া আগমনের দিন স্থির করিয়াছিলেন ইতিমধ্যে শারীরিক পীড়া হইয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইলেন এ নিমিত্ত আমাকে নিকটে পাঠাইয়াছেন এবং ভেটের কিঞ্চিৎ দ্রব্যও পাঠাইয়াছেন দৃষ্টি করিতে আজ্ঞা হউক। মহারাজ মহেন্দ্র হাস্য করিয়া [illegible] তুমি অদ্য রজনীতে আসিবে বিশেষ কার্য্য আছে। কালীপ্রসাদ সিংহ নমস্কার করিয়া বিদায় হইয়া স্বস্থানে গেলেন। পরে রজনী যোগে মহা রাজার বাটীতে আসিয়া মহারাজা মহেন্দ্রকে সংবাদ দেয়াইলেন মহারাজ মহেন্দ্র শ্রবণ করিলেন কালীপ্রসাদ সিংহ আসিয়াছেন আর আর যত মনুষ্য নিকটে ছিল তাহারদিগকে কহিলেন অদ্য তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর আমার কিঞ্চিৎ বিশেষ কর্ম্ম আছে আর আর যত লোক সভায় ছিল সকলে বিদায় হইয়া গেল পরে কালীপ্রসাদ সিংহকে আনিতে অনুমতি দিলেন। কালীপ্রসাদ সিংহ আসিয়া নমস্কার করিয়া নিকটে বসিয়া নিবেদন করিলেন, কি জন্যে আমার মহারাজাকে আসিতে আজ্ঞা পত্র গিয়াছিল। তাহাতে মহারাজ মহেন্দ্র কহিলেন আমারদিগের দেশাধিকারির প্রকরণ সমস্তই শুনিতেছ এ নবাব থাকিলে কাহার জাতি প্রাণ থাকিবেক না অতএব তোমার রাজা অতি বিজ্ঞ এবং নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ও অতি বড় বুদ্ধিমান অতএব তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া ইহার উপায়ান্তর চেষ্টা পাওয়া যায়। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কর-যোড়ে কালীপ্রসাদ সিংহ নিবেদন করিলেন মহারাজ যে ২ আজ্ঞা করিলেন সকলি প্রমাণ কিন্তু রাজ্য কর্ত্তা অতি দুর্ব্বৃত্ত সাবধানে এ

সকল পরামর্শ করিবেন আমার মহারাজও সর্ব্বদা এই চিন্তাতেই চিন্তিত আছেন অতএব নিবেদন করি যদি মহারাজারদিগের সকলের ঐক্যবাক্য হইয়াছে তবে অবশ্য ইহার উপায় হবেক কিন্তু জবন দমন না করিয়া যদি এরূপ দৌরাত্ম্য সহ্য করেন তবে কারু [illegible] প্রাণ থাকিবে না এবং জবন অধিকা[illegible]হইয়া অন্য কোন দেশীয় মনুষ্য দেশাধিকারী হন তাহা হইলে সকল মঙ্গল হবেক। মহারাজ মহেন্দ্র উত্তর করিলেন এইরূপ আমারদিগের বাসনা এই নিমিত্ত তোমার রাজাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম তিনি শারীরিক পীড়িত হইয়াছেন অতএব তুমি শীঘ্র বিদায় হও যাহাতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় শীঘ্র এখানে আসিতে পারেন তাহা করিবা আর এ স্থানে গৌণ করিও না। কালীপ্রসাদ সিংহ নিবেদন করিলেন এ স্থানে আসিয়া নবাব সাহেবের সহিত যদি সাক্ষাৎ না করিয়া যাই আর যদি দুষ্ট লোকে নবাব গোচরে সমাচার কহে তবে নবাবের উষ্মা হইবেক আর নবাবের আজ্ঞা ব্যতিরেক এ সহরে আমার মহারাজ আসিতে পারেন না অতএব নিবেদন করি আমাকে নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করান আমি নবাবের গোচরে নিবেদন করিব আমার মহারাজার একবার শ্রীযুতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিতান্ত বাসনা এবং আর আর যে বিশেষ নিবেদন আছে তাহা সাক্ষাতে নিবেদন করেন এইরূপ কহিয়া নবাব সাহেবের মত করিয়া শেষে মহারাজ এখানে আইলে ভাল হয় মহাশয় কর্ত্তা ইহাতে যেমত আজ্ঞা করেন তাহাই করি। মহারাজ মহেন্দ্র শুনিয়া কহিলেন উত্তম কহিয়াছ কল্য তোমাকে নবাব সাহেবের গোচরে লইয়া যাইব তুমি অতিপ্রাতে প্রস্তুত হইয়া আমার নিকট আসিবা। কালীপ্রসাদ সিংহ নমস্কার করিয়া বাসায় বিদায় হইলেন॥

পরে কালীপ্রসাদ সিংহ ভেটের নানা জাতীয় আয়োজন করিলেন প্রাতে ভেটের সামিগ্রী লইয়া মহারাজার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ মহেন্দ্রের চতুর্দ্দোল প্রস্তুত হইল কিঞ্চিৎ পরে মহারাজ মহেন্দ্র এবং কালীপ্রসাদ সিংহ নবাব সাহেবের দ্বারে উপস্থিত হইয়া অগ্রে মহারাজা মহেন্দ্র নবাবের গোচরে গেলেন যেমন নিয়ম আছে সেই মত নমস্কার করিয়া নবাব সাহেবের সভাতে ক্ষণেক বসিলেন পরে নবাব সাহেবকে নিবেদন করিলেন নবদ্বীপের রাজা আত্মপাত্রকে প্রেরিত করিয়াছে এবং ভেটের দ্রব্য পাঠাইয়াছে আজ্ঞা হইলেই নিকটে আইসে। নবাব সাহেব ক্ষণেক থাকিয়া কহিলেন আসিতে বল। একজন ভৃত্য গিয়া কালীপ্রসাদ সিংহকে নবাব সাহেবের গোচরে আনিল। কালীপ্রসাদ সিংহ সহস্র সহস্র নমস্কার করিয়া ভেট দিয়া নিবেদন করিলেন অনেক দিবস আমার রাজা সাহেবকে দর্শন করেন নাই এবং আত্ম নিবেদন আছে তাহাও গোচর করেন নাই যদি অনুগ্রহ করিয়া আজ্ঞা করেন তবে দর্শন করিয়া যে আত্ম নিবেদন তাহা করেন। নবাব এ সকল বাক্য শ্রবণ না করিয়া মহারাজার প্রতি দৃষ্টি করিলেন। তখন মহারাজ মহেন্দ্র করপুটে নিবেদন করিলেন যদি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় আসিবার কারণ নিবেদন করিয়া পাঠাইয়াছে ইহাতে আসিতে আজ্ঞা হইলে ভাল হয়। তখন নবাব সাহেব আজ্ঞা করিলেন ভাল রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় আমার নিকট আসিতে আজ্ঞাপত্র দেহ। এই বাক্যের পর কালীপ্রসাদ সিংহ অনেক

অনেক নমস্কার করিয়া নবাব সাহেবের নিকট হইতে যেখানে মহারাজা রাজকর্ম্ম করেন সেই স্থানে আসিয়া বসিলেন। কিঞ্চিত্ পরে মহারাজ মহেন্দ্র উপস্থিত হইয়া নবাবের অনুমতি লিপি দিয়া কালীপ্রসাদ সিংহকে বিদায় করিলেন।

পরে কালীপ্রসাদ সিংহ শিবনিবাসে আসিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা বিরলে গিয়া পাত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন মুরসদাবাদের যাবদীয় সংবাদ বিস্তার করিয়া কহ। কালীপ্রসাদ সিংহ বিস্তারিত করিয়া সমস্ত নিবেদন করিল। তিনি সমস্ত সমাচার জ্ঞাত হইয়া আত্মপাত্রকে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া রাজপ্রাসাদ দিয়া যথেষ্ট সম্মান করিয়া আজ্ঞা করিলেন ভাল দিবস স্থির করহ রাজধানিতে যাইব। কিঞ্চিৎ গৌণে শুভক্ষণে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় উত্তম উত্তম মন্ত্রী মুরসদাবাদে উপস্থিত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে নবাবের যাবদীয় প্রধান প্রধান পাত্র মিত্রগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই নবাবের দ্বারে উপনীত হইয়া সংবাদ দিলেন। নবাব সাহেব শুনিয়া আজ্ঞা করিলেন আসিতে কহ। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নানাবিধ ভেটের দ্রব্য দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ভেটের সামগ্রী নবাব সাহেব দৃষ্টি করিয়া তুষ্ট হইয়া বসিতে আজ্ঞা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন শারীরিক ভাল আছ। রাজা করপুটে নিবেদন করিলেন সাহেবের প্রসাদাৎ সকল মঙ্গল এবং শারীরিকও মঙ্গল। এইরূপ অনেক শিষ্টাচার গেল ক্ষণেক বসিয়া রাজা নিবেদন করিলেন যদি আজ্ঞা হয় তবে বাসায় যাই অনেক অনেক নিবেদন আছে পশ্চাত গোচর করিব। নবাব অনুমতি দিলেন। এ দিবস রাজা বাসায় আসিয়া মহারাজ মহেন্দ্র ও রাজা রামনারায়ণ ও রাজা রাজবল্লভ এবং জগৎসেট ও মীরজাফরালি খান ইহাদিগের নিকট মনুষ্য প্রেরিত করিলেন আমি সাক্ষাত্ করিতে যাইব। সকলেই অনুমতি করিলেন রাত্রে আসিতে কহিও। ক্রমে ক্রমে রাজা সকলের নিকট রাত্রে গমন করিয়া আত্ম নিবেদন করিলেন। পরে জগত্সেট কহিলেন এ দেশের অত্যন্ত অপ্রতুল হইল দেশাধিকারী অতি দুরন্ত কারু বাক্য শুনে না দিন দিন দৌরাত্ম্য অধিক হইতেছে অতএব সকলে এক বাক্যতা হইয়া বিবেচনা না করিলে কাহারু নিস্কৃতি নাই। এই কথার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন আপনারা রাজদ্বারে কর্ত্তা আমরা আপনকারদিগের মতাবলম্বী যেমন যেমন কহিবেন সেইরূপ কার্য্য করিব। ইহাই শুনিয়া জগত্সেট কহিলেন অদ্য বাসায় যাওন আমি মহারাজ মহেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া নিভৃত একস্থানে বসিয়া আপনকারকে ডাকাইব। সে দিবস বিদায় হইয়া রাজা বাসায় আসিলেন। পরে একদিবস জগত্সেটের বাটিতে রাজা মহেন্দ্র প্রভৃতি সকলে বসিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আহ্বান করিলেন দূত আসিয়া রাজাকে লইয়া গেল যথা যোগ্য স্থানে সকলে বসিলেন। ক্ষণেক পরে রাজা রামনারায়ণ প্রশ্ন করিলেন আপনারা সকলেই বিবেচনা করুন দেশাধিকারী অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত উত্তর উত্তর দৌরাত্ম্যের বৃদ্ধি হইতেছে অতএব কি করা যায় এই কথার পর মহারাজা মহেন্দ্র কহিলেন আমরা পুরুষানুক্রমে নবাবের চাকর যদি আমারদিগের হইতে কোন ক্ষতি নবাব সাহেবের হয় তবে অধর্ম্ম এবং অখ্যাতি অতএব আমি কোন মন্দ কর্ম্মের মধ্যে থাকিব না তবে যে পূর্ব্বে

এক আদ বাক্য কহিয়াছিলাম সে বড় উম্মা প্রযুক্ত এইক্ষণে বিবেচনা করিলাম এসব কার্য্য ভাল নয়। এই কথার পর রাজা রাম নারায়ণ ও রাজা রাজবল্লভ এবং জগৎসেট ও মীরজাফরালী খান কহিলেন যদ্যপি আপনি এ পরামর্শ হইতে ক্ষান্ত হইলেন কিন্তু দেশ রক্ষা পায় না এবং ভদ্রলোকের জাতিপ্রাণ থাকা ভার হইল। অনেক অনেক রূপ কহিতে মহারাজা মহেন্দ্র কহিলেন তোমরা কি প্রকার করিবা। তখন রাজা রামনারায়ণ কহিলেন পূর্ব্বে এ কথার প্রস্তাপ এক দিবস হইয়াছিল তাহাতে সকলে কহিয়াছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অতিবড় মন্ত্রী তাহাকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা যাউক তিনি জেমন জেমন পরামর্শ দিবেন সেইমত কার্য্য করিব। এখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই সাক্ষাতে আছেন ইহাকে জিজ্ঞাসা করুন যে যে পরামর্শ কহেন তাহাই শ্রবণ করিয়া যে হয় পশ্চাৎ করিবেন। ইহার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি সকলি জ্ঞাত হইয়াছ এখন কি কর্ত্তব্য। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় হাস্য করিয়া নিবেদন করিলেন মহাশয়েরা সকলেই প্রধান মনুষ্য আপনকারা আমাকে অনুমতি করিতেছেন পরামর্শ দিতে এ বড় আশ্চর্য্য সে যে হউক আমি নিবেদন করি তাহা শ্রবণ করুন আমারদিগের দেশাধিকারী যিনি ইনি জবন ইহার দৌরাত্ম্য ক্রমে আপনারা ব্যস্ত হইয়া উপায়ান্তর চিন্তা করিতেছেন। সমভিব্যাহৃত মীর জাফরালি খান সাহেব ইনিও জাতে জবন অতএব আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। এই কথার পর সকলে হাস্য করিয়া কহিলেন হাঁ ইনি জবন বটেন কিন্তু ইহার প্রকৃতি অতি উত্তম আপনি ইহাকে সন্দেহ করিবেন না। পশ্চাৎ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নিবেদন করিলেন এ দেশের উপর বুঝি ঈশ্বরের নিগ্রহ হইয়াছে নতুবা এক কালীন এত হয় না প্রথম যিনি দেশাধিকারী ইহার সর্ব্বদা পরানিষ্ট চিন্তা এবং যেখানে শুনেন সুন্দরী স্ত্রী আছে তাহা বলক্রমে গ্রহণ করেন এবং কিঞ্চিৎ অপরাধে জাতি প্রাণ নষ্ট করেন দ্বিতীয় বরগী আসিয়া দেশ লুট করে তাহাতে মনোযোগ নাই তৃতীয় সন্ন্যাসী আসিয়া যাহার উত্তম ঘর দেখে তাহাই ভাঙ্গিয়া কাষ্ট করে তাহা কেহ নিবারণ করে না অশেষ প্রকার এ দেশে উত্‌পাত হইয়াছে অতএব দেশের কর্ত্তা জবন থাকিলে কাহারু ধর্ম্ম থাকিবে না এবং জাতিও থাকিবে না অতএব ঈশ্বরের নিগ্রহ না হইলে এত উৎপাত হয় না আমি একারণ অনেক অনেক বিশিষ্ট লোককে কহিয়াছি তোমরা সকলে ঈশ্বরের আরাধনা বিশিষ্ট রূপে কর যেম আর উত্‌পাত না হয় এবং জবন অধিকারী না থাকে আত্ম আত্ম জাতি ধর্ম্ম রক্ষা পায়। এইরূপ ব্যবহার আমি সর্ব্বদাই করিতেছি অতএব নিবেদন করি ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন নষ্ট করিবেন না কিন্তু এক সুপরামর্শ আছে আমি নিবেদন করি যদি সকলের পরামর্শ স্থির হয় তবে তাহার চেষ্টা পাইতে পারি। সখন সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন কি পরামর্শ কহ। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন সকলে মনোযোগ করিয়া শ্রবণ করুণ। ক্রমশঃ

সঙ্গণিকা।

মৃত্যু, সংসারে সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে,—কিন্তু সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু দেখিয়াও, লোকেরা, মৃত্যু-ভয়কে জয় করিতে পারে না,—সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইবে, একথা ভাবিতে চায় না। সংসার-মায়া বিষম মায়া, কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। প্রতিদিন পৃথিবীতে কত ঘটনা ঘটিতেছে, কিন্তু জ্ঞানা মূর্খ, প্রবীণ নবীন তাহা অহরহ দেখিয়াও কেহই সতর্ক হইতেছে না। সকলে যদি সময়ে সতর্ক হইত, মানব-সমাজের এত অধোগতি হইত না।

অতি দর্পে হত লঙ্কা, এদেশের একটী নিরন্তন প্রবাদ। অতি দর্পে কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছিল। পাপের ভরা যখন পূর্ণ হয়, তখনই মানুষ দর্পের উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে, ধরাকে শরার ন্যায় মনে করে; তাহার পরিণাম যাহা, তাহা জগতের ইতিহাসে কত কতবার শোণিত অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু দেখিয়াও কেহ যেন তাহাতে মন দেয় নাই, অথবা দেখিয়াও ভুলিয়া গিয়াছে। দর্পহারী ভগবানের বিচিত্র লীলা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

এদেশের শাস্ত্রকারেরা বলেন, ধর্ম্ম যাহার পক্ষে, জয় তাহারই; মৃত্যুতেও তাহার জয়। পাণ্ডবকুলে ধর্ম্ম ছিল, রঘুকুলে ধর্ম্ম ছিল, বসুদেবকুলে ধর্ম্ম ছিল,—অনেক দুঃখ বিপদের পর জয় অনিবার্য্য রূপে শেষে সেই সব কুলকে আশ্রয় করিয়াছিল। ধ্রুব প্রহ্লাদ ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য কত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন; শেষে জয়ের বরমাল্য পাইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য এবং কুমারিল ভট্ট সামান্য লোক ছিলেন। অসামান্য বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতাপে এবং দুর্জ্জয় শাসনে ভারতবর্ষ তখন প্রকম্পিত;—ষষ্টি সহস্র বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক এই ভারতবক্ষে;—কত রাজা মহারাজা শাসন অনুশাসন বলে ভারত শাসন করিতেছিলেন। কিন্তু ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে যখন ধর্ম্ম মহাশক্তি রূপে অবতরণ করিল, তখন সামান্যের তাড়নায় বৌদ্ধ-সমাজ টলটলায়মান হইল—দেখিতে দেখিতে সব প্রতাপ নির্ব্বাণ হইল। নিরীশ্বরবাদের "অহিংসা পরম ধর্ম্ম"-মত এ ভারতে স্থান পাইল না; ভারত দেব-দ্বিজের মহিমায় ও কর্ম্মকাণ্ডে আবার প্রমত্ত হইল। মোস্‌লেম রাজন্যবর্গ যখন ধর্ম্ম ভুলিয়া বিলাসে প্রমত্ত হইলেন, ভোজের বাজির ন্যায় রাণা-প্রতাপ-জয়ী অদম্য শক্তিও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। উড়িষ্যার যে স্থানে যাও, ব্রাহ্মণ-প্রধান পল্লী বা গ্রামের নাম "শাসন"—বলিয়া শুনিবে। উৎকলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে বিশেষ প্রতাপ ছিল, খণ্ডগিরির গুহা সকল এবং ধউলি পর্ব্বত-গাত্রের অনুশাসন-লিপিই তাহার প্রমাণ। পুরুষোত্তমে যে জাতিভেদ নাই, তাহাতে এবং ধর্ম্ম, বুদ্ধ, সঙ্ঘের নামান্তর যে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা মূর্ত্তি, ইহাতেই তাহার অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান।*

* জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের আকৃতির কোন হিন্দু দেবমূর্ত্তির বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নাই, পক্ষান্তরে বৌদ্ধদিগের স্তুপের সহিত ইহার বিশেষরূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

বৌদ্ধগণ, বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ, এই তিনটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া কুসুমরাশি দ্বারা তাহা সজ্জিত করতঃ উপাসনা ও বন্দনা করিত। এজন্য পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে ত্রিমূর্ত্তি

আমাদের মনে হয়, উৎকলে বৌদ্ধধর্ম্ম বিনাশের পরই ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম সকলের নাম "শাসন" হইয়াছে। কিরূপে নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতাপ, রাজগৃহের প্রতাপ, অশোক ও বিম্বসারের প্রতাপ খর্ব্ব হইল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে ডুবিয়া যাইতে হয়। সে এক মহা প্রহেলিকা। যে দেশে এক সময়ে দিল্লীশ্বর জগদীশ্বর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, যে দেশে কথায় কথায় লোকেরা সিরাজের উপমা দিয়া এদেশের দুর্জ্জয় মোসলেম-প্রতাপ ঘোষণা করিয়া থাকে,সে দেশের মুসলমান-প্রতাপ-খর্ব্বের ইতিহাস অধ্যয়ন কর। বুঝিতে পারিবে,ধর্ম্ম নাশ এবং বিলাসিতাই মহা পতনের কারণ। হিন্দুস্থান,গ্রীস এবং রোমের উত্থান এবং পতনে,ফ্রান্সের উত্থান ও পতনেও ঐ একই কথার প্রমাণ,—ধর্ম্মনাশ এবং বিলাসিতা। সে দিন সংবাদপত্রে পড়িতেছিলাম,দিন দিন ফরাসী জাতির জনসংখ্যা হ্রাস হইতেছে,বৈজ্ঞানিকেরা গণনা করেন,আর দুই শত বৎসর পর ঐ জাতি সমূলে বিনষ্ট হইবে। সিডন সময়ের পর হইতে, আমরা, আবার কবে ফরাশী জাতি সমুত্থিত হইবে, তাহার জন্য উৎসুক ছিলাম, এখন ঐ সংবাদ পাঠ করিয়া নিরাশায় মগ্ন হইয়াছি। ফরাসী জাতি সভ্যতার আদর্শ, কিন্তু তবুও কেন এরূপ হইতেছে?—ধর্ম্মের নাশ এবং বিলাসিতাই কি কারণ নয়? ইংরাজ জাতির উত্থানের ইতিহাস আর এক প্রহেলিকা। যদিও ক্লাইবের ন্যায় ব্যক্তির চরিত্র-কালিমা পাঠ করিলে লজ্জায় মরিয়া যাইতে হয়, কিন্তু তবুও যে জাতিতে বার্ক প্রভৃতির ন্যায় লোক হেষ্টিংসের দর্প ও কলুষিত চরিত্রের কালিমা ঘোষণার জন্য বিদ্যমান ছিলেন, সেই জাতির মধ্যে ধর্ম্মভাব যে অক্ষুণ্ণ ছিল, কেহই তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এই জাতিতে পাপী থাকিলেও, তাহা নগণ্য ছিল, পুণ্যাত্মা ছিল অগণ্য ও প্রবল। এই জন্যই জগতে ব্রিটিস-জষ্টিসের দুর্জ্জয় প্রতাপ, এই জন্যই রুল-ব্রিটেনিয়ার সঙ্গীতধ্বনিতে সিন্ধু ব্যোম প্রকম্পিত। কিন্তু,—কিন্তু বলিতে লজ্জা হয়, কেবল লজ্জা নয়, দুঃখ হয়,এই উদার ধর্ম্মানুপ্রাণিত জাতি এখন কোথায় দাঁড়াইয়াছে? এমন একজন লোক নাই, যে স্বেচ্ছাচারের প্রতিরোধ করে। যে বালকদের দুষ্কর্ম্ম এ দেশের কোন ভাল লোক অনুমোদন করে নাই,সেই বালকদের দুষ্কার্য্যের বিভীষিকায় ঐ জাতির লোকেরা এখন ভীত এবং সন্ত্রস্ত—মূর্খের গলাবাজিতে ঐজাতি এখন কম্পিত-কলেবর! কারণ কি? বুঝিবা, ধর্ম্মহীনতা এবং বিলাসিতাই এই দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে।

আমরা বহুবার বলিয়াছি,যাঁহারা ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই ইতিহাস ভুলিয়া যান,--অথবা দেখিয়াও দেখেন না। বঙ্গবিভাগ এবং বয়কটের গণ্ডগোল কবে থামিয়া যাইত, যদি প্রচণ্ড-প্রতাপ ইংরাজ আজ পৃথিবীর উত্থান পতনের ইতিহাস না ভুলিয়া যাইতেন। অত্যাচারে নির্যিতের শক্তি বাড়ে, একথা ভুলিয়া যাইয়া, রজ্জুতে সর্প ভ্রম করিয়া, ইংরাজ যে ভ্রান্তি দ্বারা চালিত হইয়া নিষ্পেষণ আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাই, বুঝিবা,

গঠিত হইয়াছিল। এস্থলে ধর্ম্মকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, স্ত্রী পুরুষের একত্র সমাবেশ রূপ কল্পনা করিয়া দুই যুগল রূপের পূজা করাই এদেশের চিরন্তন পদ্ধতি। হিন্দুগণ সর্ব্বত্রই বিষ্ণুর সহিত লক্ষ্মী মূর্ত্তি সংযোজিত করিয়া প্রকৃতি পুরুষের একত্র পূজা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কুত্রাপি এরূপ ভ্রাতা ভগিনীর একত্র পূজা প্রচলিত থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সর্ব্বনাশের মূল! আমরা যাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, তাহাই বর্ত্তমান যুগের নির্ম্মম অত্যাচার আমাদিগকে দেখাইল। বোধ হয় যেন,এখন একটীও মাথাওয়ালা ধার্ম্মিক লোক ইংলণ্ডে নাই। বোধ হয় যেন, পাপ ও বিলাসিতার ভরা বড়ই ভারি হইয়া পড়িয়াছে। সুষুপ্ত ভারতের লোকেরা "শিবম্" মন্ত্র-বলে মৃত্যুভয়কেও জয় করিতেছে, এ চিত্র নানারূপ অত্যাচারই এদেশে অঙ্কিত করিয়াছে। হায় ইংরাজ, বারম্বার বলিতেছি, তোমরা বুঝিলে না, কি কুকর্ম্ম করিতেছ! হা ধর্ম্ম, তুমি আজ কোথায়?

অত্যাচার কতবার পৃথিবীর কত উত্থানকে থামাইতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারিয়াছে কি? সেদিন বুয়র ধ্বংসের জন্য ইংরাজগণ কি না করিলেন, কিন্তু এত অল্পেই তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিলেন কেন? কিছুদিন মানবের উত্থান প্রশমিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা চিরকালের জন্য নয়। মনে হয়, তাহা যেন শক্তি-সঞ্চয়ের কারণ। মহাত্মা এমারসন বলিতেন, প্রত্যেক পতনই উত্থানের সোপান। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্তের ইতিহাস স্মরণ কর, কিরূপে জগতের ইতিহাস রূপান্তরিত হইতেছে, বুঝিতে পারিবে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ইতিহাস—ভারতের ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ইতিহাসকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে; কিন্তু ইংরাজ তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। হায়, ধর্ম্মবুদ্ধি,তুমি আজ ইংরাজকে পরিত্যাগ করিলে কেন? হায় বৃটিস-জষ্টিস, তুমি আজ কোথায় অন্তর্হিত হইলে! এই সময়ে মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্তের অমূল্য কথা পাঠ কর—তিনি বোম্বের "Sanj-Vartama"র লিখিয়াছেন—

"The year 1848 was a year of revolutions in Europe. France established a republic for the second time. Riots and insurrections broke out at Vienna and at Berlin, and the Germanic Confederation was overthrown by the partisans of German Unity. Italy struggled to shake off the yoke af Austria, and Hungary struggled, for freedom. The year witnessed the most important break-up of Society and of the old regime in different countries that had yet been seen in Europe.

Historians tell us that all these endeavours failed. The second republic of France was swept away by Louis Napoleon. Germany was restored to its former state. Italy fell again under the rule of Austria. Hungary was crushed by the Russians and the Austrians with barbarous severity. Europe remained as the treaties of 1815 had left it.

And yet if we look closer into the matter the endeavours of 1848 did not fail. The reforms demanded by the people of Western Europe were conceded everywhere within 25 years. France established her republic on a permanent basis in 1870. Italy secured her independence in 1870. Germany was united. Hungary secured those rights for which she had striven. The face of Europe has been changed within the lifetime of men still in their middle age.

Such is ever the history of reforms. First endeavours seldom succeed, but the legitimate aspirations of the people seldom fail in the end. The work of Cromwell and his companions bore fruit in 1688: the work of Mirabeau and young Napoleon bore fruit in 1870.

The East is following in the footsteps of the West after a lapse of sixty years, and 1908 will be as memorable in history as 1848. Persia will secure a constitutional government in spite of her recent

failures. The success of young Turkey has startled the world,—a success based on a cordial agreement between Christians and Musalmans. Morocco under Mulai Hafid will secure a greater degree of independence for the people. There are vague aspirations in Indo China and in Egypt. In India the endeavours of the Congress, continued for ever twenty years, will bear fruit. Civilized man seeks for newer lights all over the earth ; civilized nations will secure popular rights evereywhere."

The Star of Utkal, 26th Sep, 1908.

ডিউক অব ওয়েলিংটন যখন বাল্যে ক্রীড়া করিতেন, তখন কেহই বুঝিতে পারিয়াছিল না যে, তাঁহার ভিতরে নেপোলিয়নের দুর্জ্জয় শক্তি-বিনাশের বীজ নিহিত আছে। চতুর্দ্দশ-বৎসর-ব্যাপী কঠোর সাধনায় লক্ষ্মণ যে ইন্দ্রজিৎ-বিনাশের শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তখন কেহ বুঝিতে পারিয়াছিল না। টলষ্টয়কে নির্ব্বাসিত করিয়াই জার ভাবিয়াছিলেন যে, রুসিয়ার বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু জাপান যে তাহার দর্পকে খর্ব্ব করিবার জন্য নবধর্ম্ম-বলে বলীয়ান হইতেছিল, তাহা তখন কে জানিত? কে ভাবিয়াছিল, টলষ্টয়ের মন্ত্রবলে অচিরে রুসিয়ায় "ডুমা" প্রতিষ্ঠিত হইবে? চীনের ও রুসের দুর্জ্জয় প্রতাপ খর্ব্ব করিলেন সেদিনকার অসভ্য জাপান! কিন্তু ইহা যে সম্ভব হইবে, কে ভাবিয়াছিল? আজ রুসিয়া জাগিতেছে, চীন জাগিতেছে। সকল জাতির নিয়ামক বিধাতার ইঙ্গিতকে যে ভুলিয়া যায়, তাহার অপেক্ষা মূর্খ আর কে?

সকল ভয় অপেক্ষা মৃত্যুর ভয় মানবকে যেরূপ বিচলিত এবং কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারে, এমন আর কিছুতেই পারে না। এজন্য একজন মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, আমি যখন মৃত্যুকে জয় করিতে পারিয়াছি, তখন আমার আর ভয় কি? সর্ব্বদা লোক মরিতেছে দেখিয়াও আমরা মৃত্যুকে ভুলিয়া যাই, উহা যেন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে গণ্য। কিন্তু এখন কে যেন মৃত্যুর ভয়কে জয় করিতে উপদেশ দিয়া এ ভারতকে জাগাইয়া তুলিতেছেন। সব ঘটনা যেন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতেছে। বলিব কি, লিখিবই বা কি, আমরা দেখিয়া শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছি। কিসের দ্বারা কিসের আয়োজন হইতেছে, ভাবিয়া অবাক্ হইয়া চক্ষের জলে ভাসিতেছি এবং বিধাতার করুণা স্মরণ করিতেছি। এই হতভাগ্য অযোগ্য দেশ আবার কি জাগিবে? না অত্যাচারে, নিষ্পেষণে চির সুষুপ্তি লাভ করিবে? ইতিহাস এ কথার উত্তর দিক্।

সে বলিতেছে, জাগরণের পথে কত অন্তরায়, কত অন্তরায়, কত কত অন্তরায়! আমরা আর কোন অন্তরায় জানি না, আর কোন অন্তরায় বুঝি না। ঐ সকল অন্তরায় কিছুই নয়, জল-বুদ্বুদ মাত্র। এ সংসার-রঙ্গালয়ে আসিয়া কেবল ধর্ম্মের জন্য খাটিতেছি—এবং ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছি। অধিকারী-ভেদে ধর্ম্ম-সাধনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া এখন ক্রমে ক্রমে অতলে এবং গভীরে ডুবিয়া যাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষী হইয়াছি। হায়, যদি ধর্ম্মধন পাইতাম, তবে কি কাহাকেও ডরাইতাম; হায়, যদি ম্যাট্‌সিনির ন্যায় পূত-দেবচরিত্র এদেশের লোকেরা পাইত, তবে আর কিসের ভয় ছিল? ঐ এক অভাবই এদেশের মহা অভাব। যদি এদেশে ধর্ম্ম জাগে, চরিত্র জাগে, নিঃস্বার্থতা জাগে, সংযম জাগে, পুণ্য জাগে, স্বদেশ-প্রেম জাগে,—যদি বিধাতা

সহায় হন, তবে আর কিসের ভয়? এদেশে ধর্ম্ম জাগুক দেখি, অধর্ম্ম বিনাশে কত বিলম্ব, বুঝাইতে পারিব। মা জগজ্জননী আমাদের পক্ষে থাকুন, আমরা তাঁর প্রসন্নতা স্মরণ করিয়া মৃত্যুভয়কে জয় করিয়া ডঙ্কা মারিয়া চলিয়া যাইব। এই ঘোর দুর্দ্দিনে আমরা বারম্বার কেবল বিশ্বপতিকে ডাকিতেছি, তিনি এই পতিত দেশের সহায় হউন। এক মন্ত্র, এক তন্ত্র, এক সাধন, এক জ্ঞান, ও আমাদের এক ধ্যান, তাহা এই, ধর্ম্ম আমাদের সহায় হউন;—উঠিতে, বসিতে, শুইতে, যাইতে যেন ধর্ম্ম হইতে আমরা বিচ্যুত না হই। ধর্ম্ম আমাদের পক্ষে থাকিলে, মরণকে জয় করা সহজ হইবে—একের স্বার্থ অপরের স্বার্থে পরিণত হইবে,—এই দুঃখ বিপদ দুর্দ্দিনের পথ দিয়া, ভারতে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবে, জাতীয় একতা। এবং তারপর? তারপর, দেশের জন্য প্রাণ দিয়া ধর্ম্মের হস্তে ভারতকে উৎসর্গ করিয়া, আমরা নির্ভয়ে ডঙ্কা মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইব। জগজ্জননী মৃত্যুঞ্জয়-মন্ত্রে ভারতকে দীক্ষিত করুন এবং ধর্ম্ম ও চরিত্রে ভূষিত করুন, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

উৎকল দুর্ভিক্ষ।

আমাদের এবারকার অন্যতর দুর্ভিক্ষ-সহচর পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত শশীভূষণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট কণিকা-রাজষ্টেটের ম্যানেজার মহাশয় দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। মনে হইতেছে, আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। পাঠকগণও আনন্দিত হইবেন মনে করিয়া উহা এস্থলে তুলিয়া দিলাম।

"প্রিয় শশী দাদা,

আপনার পত্র পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম।

আমাদের এষ্টেটে আসিয়া দেবীবাবু যেরূপ কষ্ট ও অপমান পাইয়া গিয়াছেন, তাহা নব্যভারতে পাঠ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। রাজা আমাকেই আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ দিনই বালেশ্বরে এক দায়রার মোকদ্দমার সাক্ষী দিবার জন্য বাধ্য হইয়া আমাকে বালেশ্বর যাইতে হয়; তাই সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইন্দ্রমণি বাবুকে কেররা-গড়ে পাঠাইয়াছিলাম। আমি থাকিলে নগেন্দ্র বাবু কখনই ওরূপ ব্যবহার করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, এজন্য দেবীবাবু ও আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করিবেন। রাজার সহিত এ সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল; তিনি দেবীবাবুর চিঠি পান নাই বলিলেন,* নগেন্দ্রবাবুর আচরণে তিনিও নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন।

আপনারা যে সময়ে রাজনগরে পৌঁছেন, ঐ সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে দুই মাস আমি এষ্টেটে ছিলাম না; প্রথম মাস আমার স্ত্রীর গুরুতর ব্যাধি উপশমার্থ কটকে ছিলাম; দ্বিতীয় মাস রাজার সহিত কলিকাতা রাঁচী প্রভৃতি স্থানে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আর গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রাজনগরের প্রজাদিগের জন্য Gratuitous Relief পাই-

* আমাদের ন্যায় সামান্য লোকের পত্র, বোধ করি, রাজ-কর্ম্মচারীগণ রাজার হাতে দেন না। ন, স।

বার জন্য চেষ্টা করা হইতেছিল এবং নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন লোকদিগকে কিছু চাউল দিবার জন্য তহশীলদার বাণাম্বর বাবুর উপর আদেশ ছিল। তখন দুর্ভিক্ষের প্রথমাবস্থা; তাই কোন রকম systematic সাহায্য দিবার বন্দোবস্ত তখন পর্য্যন্ত হইয়াছিল না। আপনারা চলিয়া যাওয়ার ২।৪ দিন পরেই জানা গেল যে, গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে প্রজাদিগকে কিছু সাহায্য দেওয়া যাইবে না; তখন এষ্টেট-তরফ হইতে রীতিমত সাহায্য দিবার বন্দোবস্ত করা গেল; এবং এখনও সেই বন্দোবস্ত কায়েম আছে; এই সময়ে আপনারা আর একবার আসিলে বিশেষ বাধিত হইতাম। মাসাবধি হইল, Miss Gilbert এখানে আসিয়া আমাদের Relief এর সকল বন্দোবস্ত দেখিয়া প্রীত হইয়া গিয়াছেন, আমাদের এ ক্ষুদ্র এষ্টেটের যতদূর সাধ্য, প্রজাদিগকে সাহায্য করা যাইতেছে; তবে সকল প্রজারই অভাব যে পূর্ণরূপে পূরণ করিতে আমরা সক্ষম হইতেছি, তাহা আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করিতে পারি না। আপনারা যাওয়ার পর হইতে রাজনগর এলাকার ৩টী স্থানে (যথা রাজনগর, কেররাগড় ও ভিতরগড়) খয়রাত চাউল (Gratuitous relief) দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ৩টী স্থানে মোট প্রায় ৬০০ লোক সপ্তাহে দুইবার করিয়া চাউল পাইতেছে; পরিমাণ অবশ্য কম; রোজ ১ পোয়া হিসাবে সপ্তাহে ১৮ (৭ পোয়া, বালেশ্বরী) দেওয়া যাইতেছে; ছোট ছেলেদের (অর্থাৎ ১০ বৎসরের কম) অর্দ্ধেক হিসাবে; শাকাদির সহিত এই চাউল সিদ্ধ করিয়া আধ পেটা খাইয়া কোন রকমে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে, আমন ধান্য কাটা পর্য্যন্ত এইরূপ সাহায্য করিতে হইবে। ঐরূপ রাজকণিকার এলেকাতেও ৩টী স্থানে প্রায় ৫০০ লোককে Gratuitous relief দেওয়া যাইতেছে; কর্ম্মক্ষমদের জন্য মাটীর কাজ দেওয়া গিয়াছে; তাহার রেট ৬ পয়সা নহে; প্রতি ১০০ ঘন ফুট ৵৬ হইতে ৶০ পর্য্যন্ত। এই প্রকার কার্য্যে এষ্টেটের কটকের অংশে ১২ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। বীজ ধান খরিদ করিবার জন্য প্রজাদিগকে, আপনারা যাওয়ার পর, ৪০ হাজার টাকা কর্জ্জ দেওয়া গিয়াছে; রাজনগর এলাকাতে ১৫ হাজার; রাজকণিকা এলাকাতে ১৩০০০৲, বালেশ্বর অংশে ১২০০০৲। এখনও দেওয়া যাইতেছে, মোট বোধ হয়, ৪৫ হাজারে গিয়া দাঁড়াইবে। ইহার পূর্ব্বে, অর্থাৎ গত বর্ষের বন্যার অব্যবহিত পরে, প্রজাদিগকে মোট প্রায় ৫০,০০০৲ টাকা নগদ বীজ ধান খরিদ করিবার জন্য ধার দেওয়া গিয়াছিল; অনেককে এষ্টেটের ধান খাইবার জন্য কর্জ্জও দেওয়া গিয়াছে; এখনও লোকদের খাইবার জন্য ধান কর্জ্জ দেওয়া যাইতেছে। আবার সম্প্রতি এ বছরেও একটু ছোট খাট বন্যা হইয়া কেররাগড়ের পশ্চিম ৭।৮ খানি গ্রামের, রাজকণিকার নিকট ৯।১০ খানি গ্রামের, ও বালেশ্বরাংশে প্রায় ২০।২৫ খানি গ্রামের ধান্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাদিগকেও আবার বীজ ধানের জন্য, জলটা ছাড়িয়া গেলেই, সাহায্য করিতে হইবে। মোটের উপর, এষ্টেটের তরফ হইতে সাধ্যমত প্রজাদিগকে সাহায্য করিবার ত্রুটী হইতেছে না, এই ক্ষণ সকলই ভগবানের হাতে। এখন যেরূপ দেখা যাইতেছে, যদি পরে বৃষ্টির অভাব না হয়, তাহা হইলে গত ২ বৎসরের অজন্মাজনিত প্রজাদিগের কষ্ট এবার দূরীভূত

হইবে। প্রজারা মোটের উপরে ৬০ বার আনা জমী আবাদ করিতে সক্ষম হইয়াছে; এই জমীতে এখন যেরূপ ফসল দেখা যাইতেছে, সব যদি ঘরে উঠে, তাহা হইলেই প্রজাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে; আমাদেরও বাকী খাজানা ইত্যাদি আদায় হইবে। এইক্ষণ ভগবানের দয়াই একমাত্র ভরসা!

স্নেহাকাঙ্ক্ষী—শ্রীক্ষিতীশ।"

তোমরাও মানুষ।

তোম্‌রাও মানুষ! তোম্‌রাও মানুষ!
যেমন, সুইডেনে সুইডিস, ফ্রান্সে ফরাসিস,
ডেনিস স্পেনিস যেমন পর্টুগীস্‌,
তেম্নি,
তোম্‌রাও মানুষ! তেম্নি তোম্‌রাও মানুষ!

২

যেমন তাদের অবয়ব,
তেম্‌নি তোমাদেরো সব,
তাদের চরণ যেমন শক্তিপূর্ণ,
অত্যাচার অবিচার করিতে চূর্ণ;
তেম্নি, তোমাদেরো পদে বিধাতা দিয়েছে বল,
মর্দ্দিতে মথিতে দেশের অমঙ্গল।

৩

রুষ, ফরাসীস, জার্ম্মেণ, ইংরাজ,
তারা করে যেমন তাদের দেশের কাজ,
তারা যেমন বোনে তাদের দেশে বস্ত্র,
তারা গড়ে যেমন তাদের দেশে অস্ত্র,
তারা গড়ে যেমন তাদের দেশে জাহাজ,
তোমাদেরো বিধাতা দিয়েছে হস্ত,
তোমাদেরো প্রতি তেমনি ন্যস্ত,
করিতে তোমাদের দেশের কাজ!

৪

তারা যেমন তাদের হৃদয় ভরা রক্ত,
তাদের দেশের হিতে করে তারা দান,
তারা যেমন তাদের দেশের ভক্ত,
তারা যেমন তাদের দেশের জন্য দেয় প্রাণ,
তেম্নি,
তোমাদেরো জন্মভূমি তোমাদেরো দেশের হিতে,
তোমাদেরো দেহ অস্থিমজ্জা রক্তমাংসে গড়া,
তাদের দেশের কল্যাণে বিধাতা দিয়েছে দিতে,
তোমাদেরো বক্ষে ধমনী শিরা তপ্ত রক্ত ভরা।

তাদের দেশের শস্য ফলে,
তাদের দেশের জলে স্থলে,
যেমন, তাদের অধিকার,
তোমাদের দেশের ধান্য যব,
ফল মূল কন্দ শস্য সব,
গিরি মরু প্রান্তর নভ অর্ণব,
তেম্নি, তোমাদের স্বত্ব—রাজ্য বিস্তার!

৬

তাদের দেশের রত্ন ধন তাদের লাগি,
কেহ নহে তাদের অংশী—ভাগী,
তাদেরি স্বত্ব—তারাই মালিক তার,
তেম্নি এদেশের খনি মণি সব,
হীরা মণিমুক্তা রত্ন বিভব,
তোমাদের স্বত্ব—তোমাদের অধিকার!

৭

তারা যেমন পেয়েছে মানবের স্বত্ব,
স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন ইচ্ছা বিধাতার দত্ত,
উত্থান পতন নিজের আয়ত্ত
তোমাদেরো ঠিক্ তাই,
তোমাদের নিজ দেশের উন্নতি,
করিছে নির্ভর তোমাদের প্রতি,
কারে মেরে কেহ হবে অধিপতি,
বিধাতার হেন আদেশ নাই!

৮

তাদের দেশে কেহ গিয়া করিলে জবরদস্তি,
তারা দেয় তার ভাঙ্গিয়া অস্থি,
তারা বলে তারে দস্যু—চোর,
তোমাদের দেশ যদি কেহ লুঠে,
তোমাদের অস্থি চূর্ণ করে বুটে,
তোমাদের পদ তাহে যদি উঠে,
কেন অপরাধ হবে কঠোর?

তারা দেয়না তাদের দেশে কারে যাইতে,
মুটে মজুরি করে' খাইতে,
দেয়না তাদের পথে কারে হাটিতে,
বসিতে দেয়না তাদের মাটীতে,
এম্‌নি তাদের আইন বিধান,
তোমরা যদি রোধ তোমাদের গৃহ-দ্বার,
তেম্‌নি যদি তোমরা কর বহিষ্কার,
শকুনের বাসা ভেঙ্গে দাও কার,
তাতে কেন হবে অভিমান ?

১০

"সত্য, সকল দেশেই সত্য এক সমান,
বায়ুতে সকলেরি বাঁচায় প্রাণ,
আঘাতে লাগে ব্যথা অপমান,
তোমারো যেমন আমারো তেমন—একসমান !

১১

তাদের দেশে যাহাতে পুণ্য,
আমাদের দেশে তাহাতে পাপ ?
তাদের দেশে যাহাতে আশীর্ব্বাদ,
আমাদের দেশে কি তাতে অভিশাপ ?
তাদের দেশে যে কাজে বলে সাধু,
আমাদের দেশে করিলে সে কি ভণ্ড ?
তাদের দেশে যে কাজে পায় শান্তি,
আমাদের দেশে পাইবে রাজদণ্ড ?
তাদের দেশে যারে বলে গ্যারিবল্‌ডি,
যারে বলে ম্যাট্‌সিনি,
আমাদের দেশে সেই নানা সাহেব, কুমারসিং—
সেই সিপাই মিউটিনি ?
তাদের দেশে যাহা ধর্ম্ম,
তাদের দেশে যাহা ধন্য,
আমাদের দেশে সেই কর্ম্ম
দোষের হবে কি জন্য ?
তারা প্রাণ দিয়া সত্যেরে রাখে সত্য,—
ইংরাজ ফরাসী রুষ,
তোম্‌রাও, সত্যের প্রতিষ্ঠা করি দেখাও মহত্ত্ব,
নহিলে কাপুরুষ !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৬। রবীন্দ্রনাথের "সদুপায়।" অর্চ্চনা হইতে পুনর্মুদ্রিত। সুলিখিত প্রবন্ধ। রবীন্দ্র নাথের এক সময়ের মত অন্য সময়ে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, লেখক রবীন্দ্র বাবুর লেখা উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পুস্তিকাখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে।

৭। অনল-প্রবাহ। সৈয়দ আবু মোহম্মদ ইস্মাইল হোসেন সিরাজী প্রণীত, মূল্য ।।০। সিরাজির কবিতা উদ্দীপনা পূর্ণ। নব্যভারতের পাঠক তাহা জ্ঞাত আছেন। এই পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার আপন হৃদয় ঢালিয়া মোসলেম জাতির উন্নতির জন্য যে সকল অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না। পুস্তকখানির কোন স্থান বাদ দিয়া কোন স্থান উদ্ধৃত করা যায় না—সকলই সুন্দর।

৮। উদ্বোধন। উপরোক্ত গ্রন্থকার প্রণীত, মূল্য ।৵০। অনল-প্রবাহে যেমন জাতি-প্রেম, এ গ্রন্থে তেমনি স্বদেশ-প্রেম মুকুলিত হইয়াছে।

আমরা কিছু গ্রন্থকারের পক্ষপাতী ; কিন্তু যিনি এই সহৃদয় স্বদেশ-প্রেমিক গ্রন্থকারের কবিতা পাঠ করিবেন, তিনিই ইঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিবেন। এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে গ্রন্থকার এই দুইখানিগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। গ্রন্থকার এদেশে আদৃত হইলে আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইব।

৯। ঠাকুর মার ঝুলি। বাঙ্গালার রূপ কথা। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। এই গ্রন্থের খুব আদর হইয়াছে। আদরের কারণ— ইহাতে রবীন্দ্র বাবুর প্রশংসা আছে, দেশের কাহিনী আছে, নানা প্রকার ছবি আছে ;—

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। এ গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের প্রথম কথা এই, বড় লোকের প্রশংসা লইয়া আজ কাল যে গ্রন্থকারগণ অবতরণ করেন, তাহা বর্জ্জন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এত প্রশংসার পর আর কি সমালোচনা করিব, এই কথা মনে জাগে। দ্বিতীয় কথা—এই গ্রন্থের সব কাহিনী যে এদেশের সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। তৃতীয় কথা,—নানা অস্বাভাবিক ছবি দ্বারা ছেলে মেয়েদের মন-বিকৃতি, মত-বিকৃতি ঘটাইবার আমরা পক্ষপাতী নহি। এখন দেশের উপর দিয়া যে স্বদেশ-প্রেমের স্রোত চলিয়াছে,যাহাতে দেশে তাহা স্থায়ী হয়,সকল গ্রন্থকারের তৎপক্ষে চেষ্টা করা উচিত। অস্বাভাবিক হেঁয়ালি কাহিনী প্রচারের এ যুগ নহে।

দক্ষিণারঞ্জন বাবুর নিকট আমরা এইরূপ ছেলে ভুলান পুস্তক অপেক্ষা আরো ভাল জিনিষ পাইবার আশা রাখি। এই ঘোর দুর্দ্দিনে, অর্থের মায়ায়, এইরূপে সময় নষ্ট করা উচিত কি?

১০। ভারত-গৌরব-গ্রন্থাবলী। বিদ্যাসাগর, সিটীবুক সোসাইটী, মূল্য ।৵০। যোগীন্দ্র নাথ সময় বুঝিয়া চলিতে পারেন বলিয়া আমরা তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী। বর্ত্তমান সময়ে যাহা একান্ত প্রয়োজন, ভারত-গৌরব-গ্রন্থাবলীতে তাহাই প্রকাশিত হইতেছে। ভাল ভাল লোক দ্বারা তিনি এই কাজ করিতেছেন। এগ্রন্থে লেখকের নাম নাই। তিনি যিনিই হউন, বাঙ্গালা ভাষার উপর তাঁহার প্রভূত দখল আছে। সংক্ষেপে তিনি বিদ্যাসাগরের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে।

১১। The Fifteenth Annual Report of the Calcutta Deaf and Dumb School—Session 1907. এই কার্য্যবিবরণ পাঠ করিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম। পূতচরিত্র মহাত্মা উমেশ চন্দ্রের ইহা এক অক্ষয় কীর্ত্তি। বিধাতা এই মহৎ কার্য্যের চির সহায় হউন।

১২। পরলোক-রহস্য। শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত, মূল্য ।৵০। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কথা শুনিতে এদেশের কে লালায়িত নয়? পরিপক্ক হাতের লেখা পড়িয়া আমরা সুখী হইলাম।

১৩। দয়ানন্দের স্বরচিত জীবনবৃত্ত। উল্লিখিত ও লিখিত। শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও সম্পাদিত, মূল্য।০। দেবেন্দ্র বাবু মহাপুরুষ দয়ানন্দের একজন প্রকৃত ভক্ত। তিনি বহু দিন হইতে দয়ানন্দকে এদেশে পরিচিত করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার এ কার্য্যে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। এ পুস্তকে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সুললিত ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সর্ব্বত্র এই গ্রন্থ আদৃত হইলে আমরা সুখী হইব।

১৪। ভীষ্ম মহাদর্শন বা মহাশক্তি আর্য্যদর্শন। উত্তরপাড়া-নিবাসী শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৲। "ভারতশ্রেষ্ঠ স্থান নাই, আর্য্যশ্রেষ্ঠ জাতি নাই, ব্রহ্মচর্য্য-শ্রেষ্ঠ সাধক নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।"—গ্রন্থকার মলাটে এই কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই গবেষণা-পূর্ণ গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালা দেশের বিশেষ গৌরবের বিষয় এই যে, অনেক কৃতী লেখক আজকাল বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবান হইয়াছেন। কাব্য-উপন্যাস-নাটক-প্রধান যুগে ভীষ্ম মহাদর্শনের ন্যায় পুস্তকের প্রচার দেখিয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, এই গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা করি, কিন্তু স্থানাভাব। পুস্তকের নামেই বিষয় বিবৃত হইয়াছে—অনেক সারবান তত্ত্ব এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।

১৫। সরল কাশীরাম দাস। শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বসু বি-এ সম্পাদিত। উৎকৃষ্ট কাগজ, উৎকৃষ্ট ছাপা এবং উৎকৃষ্ট বাধাই। ২৩ খানি চিত্র সম্বলিত, তাহা বাদে মহাভারত-বর্ণিত ভারতবর্ষের একখানি সুন্দর মানচিত্র আছে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের ভূমিকা সহ প্রকাশিত।

সরল কৃত্তিবাস প্রকাশ করিয়া যোগীন্দ্র

নাথ এদেশের বেরূপ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, এই গ্রন্থ দ্বারা ততোধিক মঙ্গল সাধিত হইবে। সরল কৃত্তিবাস প্রকাশিত হওয়ার পর আর একখানি সরল কৃত্তিবাস প্রকাশিত হইয়াছিল। যোগীন্দ্রনাথের সরল কাশীরাম দাস প্রকাশিত হইতে না হইতে, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সরল কাশীরাম দাসের বিজ্ঞাপন আশ্বিন মাসের "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হইয়াছে। এদেশের বিশেষ দুর্ভাগ্য যে, যে পথে একবার লোক অগ্রসর হয়, সেই পথেই অনেক লোক অগ্রসর হইতে ভাল বাসে। একজনের উন্নতি দেখিলে অন্যে তাহা যেন সহ্য করিতে পারে না। অল্প সংখ্যক লেখকগণের মধ্যে এইরূপ ঈর্ষা-কণ্ডূয়ন আমাদের মোটেই ভাল লাগে না। এইরূপ একই কাজে দশজনে কেন হাত দিবে? অন্য বিষয়ে সুফলপ্রসূ হইলেও ইহাতে সাহিত্যের অকল্যাণ হয়; ভাল গ্রন্থ উদ্ধার করিবার সময় লোকেরা ভীত হয়। আমরা যোগীন্দ্রনাথ ও দীনেশচন্দ্র, উভয়েরই পক্ষপাতী ব্যক্তি। দুই জনকে এইরূপ এক কাজে ব্রতী হইতে না দেখিলে আমরা সুখী হইতাম।

ভারত যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশ, রামায়ণ এবং মহাভারতই তাহার একমাত্র পরিচয়। রামায়ণ এবং মহাভারত এদেশের আপামর-সাধারণের উপর বহু শতাব্দী ধরিয়া যেরূপ প্রভূত ক্ষমতা বিস্তার করিয়া লোকচরিত্র গঠিত করিয়া আসিতেছে, সেরূপ কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দুই খানি গ্রন্থ একদিকে, আর সমস্ত শাস্ত্র তন্ত্র একদিকে; —আমাদের মনে হয়,—এই দুই গ্রন্থ এদেশের যে কাজ করিয়াছে, সকল শাস্ত্র মিলিত হইয়াও তাহা করিতে পারে নাই। এই দুই মহাগ্রন্থ সরল বাঙ্গালা ভাষায় কৃত্তিবাস এবং কাশীরাম অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া বাঙ্গালা দেশ আজও ধর্ম্মের পথে চলিতেছে। এদেশের লোকচরিত্রের উপর যে ভক্তি বিশ্বাস, নীতিধর্ম্মের পবিত্র ছায়া প্রতিফলিত রহিয়াছে, তাহা বোধ হয়, এই দুই অমূল্য গ্রন্থের দ্বারাই হইয়াছে। এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, এই দুই খানি অমূল্য গ্রন্থ এতদিন বটতলা রক্ষা করিতেছিল বলিয়াই রামায়ণ মহাভারতের আদর আজও এদেশে আছে, নচেৎ এতদিন এদেশ এই দুই অমূল্য গ্রন্থের কথা ভুলিয়া যাইত। বটতলা, তুমি অমর হও, এদেশ তোমাকে পূজা করুক।

বটতলার প্রশংসা করিলাম বলিয়া হয়ত অনেকে ভ্রুকুঞ্চিত করিবেন। করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই। বটতলা সৎগ্রন্থ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কত কত সৎগ্রন্থ প্রচার করিয়া আসিতেছেন। সে সকল গ্রন্থের ভাল সংস্করণ না হওয়া পর্য্যন্ত এদেশ বটতলাকে কখনও ভুলিতে পারিবে না।

বটতলা ছিল বলিয়াই আজ যোগীন্দ্রনাথকে আমরা সংস্কারক রূপে পাইয়াছি। নচেৎ এ গ্রন্থযুগলের আদরও থাকিত না, সংস্কারকেরও প্রয়োজন হইত না। অথবা সংস্কার হইলেও তাহা আদৃত হইত কি না, সন্দেহ। যোগীন্দ্রনাথের এই মহৎ কাজের প্রবর্ত্তক, বুঝিবা, বটতলাই।

অবান্তরিক কথা থাকুক। যোগীন্দ্রনাথ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই মহাকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি আমাদের বন্ধু—না হইলে তাঁহার এই কাজের জন্য তাঁহাকে পূজা করিতাম। বাঙ্গালা ভাষা-সাধন-ক্ষেত্রে যোগীন্দ্রনাথ এক মহাসাধক। অথবা এক মহাযোগী। তাঁহার চরিত্র যেরূপ বিশুদ্ধ, তাঁহার লেখাও তেমনি বিশুদ্ধ। তিনি কঠোর সাধনা করিয়া যে নির্ম্মল, কোমল এবং রাগদ্বেষ-বর্জ্জিত মধুর প্রকৃতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার লেখাতেও তাহা প্রতিফলিত। তিনি সকল আবর্জ্জনারাশি কাটিয়া ছাটিয়া এই বিশুদ্ধ সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে, এ সম্বন্ধে তাঁহার কিছু কিছু ত্রুটী হইয়া থাকিলেও, তাহা বিশুদ্ধতার খাতিরে তিনি বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। এই গ্রন্থ পারিপাট্যে এবং বিশুদ্ধতায়, বোধ হয়, অতুলনীয় হইয়াছে। আশা করি, তাঁহার কৃত্তিবাসের ন্যায় এ গ্রন্থও সর্ব্বত্র বিশেষরূপে আদৃত হইবে।

ছাত্র জীবনের আদর্শ।*

মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা ক্রমে ক্রমে কোন না কোন বিষয়ে জীবনের একটা ছাঁচ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি। তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, সেই অনুসারেই আমাদিগের জীবন পরিচালিত হয়। আমরা যে কার্য্যই করি না কেন, আমাদের সম্মুখে তাহার একটা আদর্শ সর্ব্বদায়ই প্রায় উপস্থিত থাকে। আদর্শতেই আমাদের জীবন গঠিত হয়। বাল্যকালে হাতের লেখাটী প্রস্তুত করিতে হইলে, আমরা একখানি কাপিবুক সম্মুখে রাখিয়া তদনুসারে হস্তাক্ষর প্রস্তুত করিতে যত্নবান হই। আমাদের চলাফেরা ও কথা বলার মধ্যেও আমরা অজ্ঞাতসারে অনেক সময় অপরের অনুকরণ করিয়া থাকি। আমাদের গৃহ-পরিবার, আমাদের আত্মীয়-স্বজন, আমাদের প্রতিবেশী, বিদ্যালয়, কার্য্যক্ষেত্র সকলেই আমাদের জীবনকে গঠন করিতেছে। কোন এক গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন, যখন ক্ষুদ্র শিশু মাতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া স্তন পান করে, তখন জননীর প্রত্যেক অঙ্গচালনার কার্য্যটীও শিশুর কোমল প্রাণের উপর একটা ছাপ মারিয়া দেয়। এইজন্য দেখা যাইতেছে, আমাদের সম্মুখে যেমন আদর্শ থাকে, আমাদের জীবনটাও সেই আকার ধারণ করে। উচ্চ ও মহৎ আদর্শ জীবনের সম্মুখে ধর, জীবন মহৎ হইবে, ছোট আদর্শের সম্মুখে থাক, জীবন ছোট হইয়া যাইবে।

ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যেমন, জাতি সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের সম্মুখে পূর্ব্বতন গ্রীক ও রোমক-জাতির উচ্চতর আদর্শ যদি না থাকিত, তাহা হইলে ইংলণ্ড শিল্প, সাহিত্য ও আইন-কানুনে বড় শীঘ্র উন্নতির উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইতেন না। ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় এক জাতি অপর জাতির ভালমন্দ গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। যখন আদর্শের উপরেই আমাদের জীবনের মঙ্গলামঙ্গল অধিকতর পরিমাণে নির্ভর করিতেছে, তখন যাহা সৎ, যাহা মহৎ, যাহা মঙ্গলকর, তাহাই আমাদের আদরণীয় হওয়া উচিত—তাহাই অনুকরণ-যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। আমরা শুনিয়াছি,

"যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি"।

আদর্শ সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে। একবার কোন স্থানে কয়েকটী বালক খেলা করিতেছিল, তাহার মধ্যে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট সাজিয়াছিল। আর একজন পেয়াদা সাজিয়া হাকিমের হুকুম বাহাল করিতে প্রস্তুত হয়। যে ছেলেটী হাকিম হইয়া বসে, সেটী গবর্ণমেণ্টের একটী উচ্চতর কর্ম্মচারীর পুত্র; পেয়াদা সাজে সজ্জিত ছেলেটী একটী সামান্য কর্ম্মচারীর পুত্র। ঘটনাক্রমে পেয়াদা-বেশধারীর ছেলেটীর

* ১লা সেপ্টেম্বর শনিবার সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ছাত্রসমাজের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু কর্ত্তৃক পঠিত।

পিতা সেই স্থানে উপস্থিত হন, হইয়া দেখিলেন, ছেলে পেয়াদা সাজিয়াছে; একটু দাঁড়াইয়া অতি দুঃখের সহিত ছেলেকে বলিলেন, যদি সাজ্‌লি ত পেয়াদা সাজ্‌লি! অর্থাৎ এখন হইতেই তোর মনের আদর্শটা এত ছোট। আদর্শের এমনই প্রভাব যে, হনুমানের কোন ভক্ত উপাসক সর্ব্বদা বৃক্ষের উপরে থাকিয়া তাঁহার উপাস্য দেবতার ন্যায় সময় কাটাইতে ভালবাসিতেন। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত হনুমানজীর জীবনের প্রভাব ঐ তদীয় ভক্তের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

এখন আমার বক্তব্য বিষয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছি। ছাত্র-জীবনের কিরূপ আদর্শ হওয়া উচিত, তদ্বিষয় আলোচনা করিতে গেলে কোন্ সময়কে ছাত্রজীবন বলিব? পূর্ব্বে গ্রীস ও রোমে চতুর্দ্দশ ও ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত ছাত্রেরা শিক্ষকের অধীনে থাকিয়া শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধনের বিষয় শিক্ষা লাভ করিত। আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে ঋষিদিগের অধীনে প্রায় ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত ছাত্রেরা অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন। ইয়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ অনুসারে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইয়াছে। এখানেও সাধারণতঃ ছাত্রেরা ত্রয়োবিংশ কি পঞ্চবিংশ বৎসর বয়সে শিক্ষার উচ্চতম প্রশংসাপত্র লইয়া বহির্গত হইয়া থাকেন।

জ্ঞানানুরাগী চিরদিনই আপনাকে ছাত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহার যত বয়স বৃদ্ধি হয়, তিনি ততই আপনাকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করেন—এ জ্ঞানভরা জগতের নিকট তিনি চিরদিনই শিক্ষার্থী থাকিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হন। এইরূপ চিরজীবন ছাত্রাবস্থার বিষয় আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। বাল্যকাল ও তরুণ যৌবনকেই আমি আমার বক্তব্য বিষয়ের লক্ষ্য করিয়া তদ্বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আমাদের দেশের পূজ্যপাদ ঋষিরা জ্ঞানসাধনকেই ছাত্রজীবনের উচ্চতম তপস্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মস্তিষ্ককে উত্তমাঙ্গ বলিয়া তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সকল অঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম অঙ্গের উৎকর্ষ-সাধন নর নারীর প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়াই তাঁহারা মনে করিতেন। যাহার উৎকর্ষ-সাধনে মানব আকাশস্থিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দূরত্ব নিরূপণ করিতে ও তাহাদিগের বিচিত্র গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে সক্ষম হয়;—যাহার প্রভাবে দূরস্থিত পথকে যেন মানবের গোষ্পদের ন্যায় পার হইবার ব্যবস্থা করিয়া দেয়, —যাহার প্রভাবে আমাদের সুখদুঃখে, সম্পদ বিপদের সমাচার চক্ষের পলকে আমাদের নিকট উপস্থিত করে;—যাহার প্রভাবে নানাবিধ বিষয় সকল উদ্ভাসিত হইয়া নর নারীকে কল্যাণের পথে অগ্রসর করিতেছে, সেই মহোচ্চ বিষয়ের যথোচিত উন্নতিসাধনে সকলেরই যে তৎপর হওয়া উচিত, সেবিষয়ে কি আর অধিক বলিবার প্রয়োজন আছে?

যাঁহারা মানসিক উন্নতি সাধনে আপনাকে বিশেষ রূপে নিয়োগ করেন, তাঁহাদিগের হৃদয়ের নির্ম্মল আনন্দের নিকট, সংসারের অনেক আমোদ প্রমোদ অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে। তাঁহারা নিজ হৃদয়ের মধ্যে কত মনোহর সৌন্দর্য্য দর্শন করেন, কত অভিনব তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া অপার আনন্দে মগ্ন হইয়া পড়েন। তাঁহার সেই অন্তরের আনন্দের

নিকট রাজার রাজত্ব লাভের আনন্দও তিনি সামান্য বলিয়া বিবেচনা করেন। জগতের বিচিত্র রহস্য দর্শনে—নর নারীর প্রকৃতি ও কার্য্যকলাপ দর্শন ও অধ্যয়নে তাঁহার হৃদয় মন বিস্ফারিত হইয়া উঠে—তাঁহার কল্পনাশক্তি প্রসারিত হয়। দরিদ্র হইয়াও তিনি যেন রাজপ্রাসাদে বাস করেন; আর বহু দাসদাসী পরিবেষ্টিত, রাজপ্রাসাদ-বাসী, মনিমুক্তা-শোভিত, রাজমুকুটধারী সম্রাটও এই ধনে বঞ্চিত হইয়া দরিদ্র শিক্ষিতের উচ্চতর আনন্দ লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন, দুর্দ্ধর্ষ রোমের সম্রাট নিরোর বাটীতে ইপিকটেটস্ নামে এক ক্রীতদাস ছিল; নিরো কৌতূহল চরিতার্থের জন্য ইপিকটেটসের একখানি পা ভাঙ্গিয়া দেন; ইপিকটেটস্ ক্রীতদাস হইয়াও সময়ে সময়ে পাঠে রত থাকিতেন। নিরোর শিক্ষক দার্শনিক সেনেকা এই দাসের পাঠানুরাগ দেখিয়া, উহাকে মুক্তি দিবার জন্য নিরোকে অনুরোধ করেন; নিরো শিক্ষকের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। ইপিকটেটস্ দাসত্বে মুক্তি লাভ করিয়া গভীর রূপে জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ইনিই তাৎকালীন দার্শনিকদিগের মধ্যে অতি উচ্চতম স্থান অধিকার করেন। সামান্য কুটীরে বাস করিয়া দরিদ্রের ন্যায় দিন যাপন করিতেন। শিষ্যেরা তদীয় গুরুর সেই কুটীরে গমন করিয়া দর্শন শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। একবার কোন সম্রাট এই সুবিখ্যাত পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হন; গিয়া দেখেন, দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ ইপিকটেটস্ রৌদ্রে বসিয়া শীত নিবারণ করিতেছেন। সম্রাটের আগমনে তাঁহার গাত্রে সূর্য্যের কিরণ পতনের কিছু ব্যাঘাত জন্মিল; ইপিকটেটস্ বলিলেন, "আপনি রৌদ্র ছাড়িয়া কিছু দূরে গিয়া দণ্ডায়মান হউন—রৌদ্র লাভের ব্যাঘাত করিবেন না।" সম্রাট বলিলেন, আমি আপনার নিকট ষ্টোইক দর্শনের উপদেশ লাভের জন্য আগমন করিয়াছি। ইপিকটেটস্ বলিলেন, আপনি এ কঠোর বিষয় শিক্ষা করিয়া কি করিবেন? সম্রাট তদুত্তরে বলিলেন, "আমি আপনার দর্শন শিক্ষা করিয়া, তদনুসারে জীবন পরিচালিত করিলে, আমি আপনার ন্যায় দরিদ্র হইয়াই থাকিব।" ইপিকটেটস্ বলিলেন, "কি! আপনি আমাকে দরিদ্র মনে করেন?" ইহা বলিয়া তিনি আপন বক্ষঃস্থলের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলে, My mind to me a kingdom is! আমার হৃদয়ের মধ্যেই রাজত্ব রহিয়াছে। লর্ড মেকলের সম্পত্তি ও সম্ভ্রম বড় কম ছিলনা, তিনি একবার কাহাকেও অধ্যয়নের উপকারিতা সম্বন্ধে এক পত্র লেখেন, তৎপ্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন "I would rather be a poor man in a garret with plenty of books than a king who did not love reading." ভাবার্থ এই, অধ্যয়ন-বিমুখ রাজা অপেক্ষা পুস্তকরাজির মধ্যে একটা গৃহে দরিদ্র অবস্থায় দিন অতিবাহিত করাও শ্রেয় বলিয়া মনে করি।

জ্ঞানের সকল দিকেই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি আজ এস্থলে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিজ্ঞান-মহারথীদিগের কয়েকটী বিষয় আলোচনা করিব। ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডে দুইটী বিশেষ দুর্ঘটনা ঘটে; একটী প্লেগ, অপরটী অগ্নিদ্বারা বহু সংখ্যক গৃহ ভস্মীভূত হওয়া। হক্সিলি বলেন, ইংলণ্ডবাসীরা প্লেগকে পর-

শ্বরের অভিসম্পাৎ বলিয়া মনে করিয়াছিল, আর অগ্নি সংযোগে গৃহ-ভস্মসাৎকে তাহারা মানবের অজ্ঞানতা অথবা শত্রুপক্ষের বৈর-আচরণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছিল। তাঁহার এক বক্তৃতায়,এই বিষয় উল্লেখ করিয়া তৎকালে ইংলণ্ডবাসীর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞতার বিষয় উল্লেথ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,"Our forefathers had their own ways of accounting for each of these calamities. They admitted to the plague in humility and in penitence, for they believed it to be the judgment of God. But towards the fire they were furiously indignant, inter-preting it as the effect of the malice of man." তৎপর তিনি বলিলেন, যদি তাঁহারা এখানকার ন্যায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মর্ম্ম ভালরূপ অবগত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতেন—"that all their hypotheses were alike wrong······but that they were themselves the authors of both plague and fire."প্লেগ ও অগ্নি,এ দুই তাঁহাদিগেরই দোষে ঘটিয়াছে। হক্‌সিলি বলেন,সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে দ্বাদশজন যুবাপুরুষ সমবেত হইয়া রোগের কারণ নির্ণয়ে এবং বিবিধ বিষয়িণী বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তৎপর হইতেই ইংলণ্ডের গতি ফিরিতে আরম্ভ হয়।

গ্রীস ও রোমে ছাত্রদিগকে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইত, তন্মধ্যে সাহিত্য, সংগীত ও শারীরিক বল লাভেরই ব্যবস্থা লক্ষিত হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষার কোন ব্যবস্থা লক্ষিত হইত না। আমাদিগের ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে ছাত্রেরা ব্যাকরণ পাঠে ও ন্যায় শাস্ত্রের কুটিল তর্কে যৌবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দিতেন। পূর্ব্বতন আর্য্যেরা বিজ্ঞানের কোন কোন বিষয়ে আলোচনা করিলেও তাহা আমাদিগের নিকট ভস্মাচ্ছাদিতের ন্যায় রহিয়াছে বলিতে হইবে। উহার অধিকতর আলোচনা ও প্রসারণের জন্য আমরা পাশ্চাত্য জগতের নিকট ঋণী, এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে ; ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা কখনই ইহার উন্নতি সাধনে আপনাদিগের হস্ত প্রসারণ করেন নাই। ভারতীয় ধর্ম্মাচার্য্যেরা আত্মার কল্যাণ সাধন ব্যতীত অন্য সকল বিষয়েরই প্রতি আমাদিগকে বীতরাগ প্রকাশ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, কেবল আত্মজ্ঞান লাভ করাই তাঁহাদিগের শিক্ষার মূল্য উদ্দেশ্য। খ্রীষ্টের শিষ্যেরা বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইউরোপে যে সময়ে বিজ্ঞানবিদেরা পৃথিবীর গতি ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সঠিক তত্ত্ব প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন বাইবেল্-বর্ণিত পৃথিবীর জন্ম প্রভৃতির উপর দারুণ আঘাত পড়াতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকেরা বিজ্ঞানের উচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। দুরন্ত মেরীর নৃশংস ব্যবহারে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী রিডাল, লাটিমার প্রভৃতি মহামনা ব্যক্তিগণ যেমন জীবন হারাইয়াছিলেন, তেমনি চর্চ্চের উৎপীড়নে গ্যালিলিউ প্রভৃতি বিজ্ঞানবিৎদিগকে মৃত্যুর হস্তে জীবন সমর্পণ করিতে হইয়াছিল।

বিজ্ঞান অথবা অন্য কোন শিক্ষা-বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা আমার এ প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। এখন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা কিরূপে প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে অত্যন্ত প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও আপনাদিগের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,সেইরূপ কয়েকটী দৃষ্টান্ত এখানে

উল্লেখ করিতেছি। প্রতিভা সর্ব্বোপরি হইলেও ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অতি আশ্চর্য্য।

একদিন ডিউক-অব-আর্গাইল আপন উদ্যানে পাদচারণা করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন, তৃণের উপর স্যার আইজ্যাক নিউটন-প্রণীত একখানি পুস্তক পড়িয়া রহিয়াছে। ডিউক পুস্তকখানি নিজের মনে করিয়া তাঁহার ভৃত্যের পুত্র ষ্টোনকে উহা গৃহের মধ্যে রাখিতে বলিলেন; ভৃত্যপুত্র ষ্টোন বলিল "পুস্তকখানি আমার।" ডিউক বলিলেন, "তোমার; তুমি কি ইহা বুঝিতে পার? ষ্টোন মৃদুস্বরে বলিল "আজ্ঞা হাঁ।" ডিউক বলিলেন, এ পুস্তক বুঝিতে হইলে অঙ্কশাস্ত্রে ভালরূপ অধিকার থাকা প্রয়োজন, তুমি গণিতবিদ্যা কোথায় শিক্ষা করিলে? ষ্টোন বলিল, "রাজমিস্ত্রীরা আপনার বাড়ীতে কার্য্য করিতেছিল, একদিন দেখি, তাহারা কম্পাস লইয়া বাড়ীতে কোন অংশ মাপ করিতেছে; উহা হইতে আমি বুঝিলাম, গণিত বিদ্যা বলিয়া এক বিদ্যা আছে। আমি অঙ্কের পুস্তক ক্রয় করিলাম; তৎপর জ্যামিতি ও বিজ্ঞানের পুস্তকাদি পাঠ করি; ফরাসী ও লাটিন ভাষায় অঙ্ক ও বিজ্ঞান বিষয়ে যে সকল পুস্তক আছে, তাহা দেখিবার জন্য, ফরাসী ও লাটিন ভাষার অভিধান ক্রয় করি। আমি এ সকলই নিজে শিক্ষা করিয়াছি।" আবার ষ্টোন বলিল, "মানুষ যখন বর্ণমালার ২৪ টা অক্ষর শিক্ষা করে, তখন সে সকল বিষয়েই ক্রমে নিজ যত্নে শিক্ষা করিতে পারে।" এ যত্ন ও জ্ঞানপিপাসার কথা শুনিয়া কোন্ ব্যক্তি না অবাক হইয়া থাকে? ডিউকের সাহায্যে তদবধি তাঁহার জ্ঞানচর্চ্চার সুবিধা হইল। তিনি অবশেষে অঙ্ক শাস্ত্র বিষয়ে পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

এক মুচির ছেলে নিজের অধ্যবসায়ের গুণে অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, 'কোন মহিলা, একবার আমার নিকট একখানি বীজগণিত রাখিয়া যান। পুস্তকখানির মধ্যে কি আছে, তাহা জানিবার জন্য আমার বিশেষ কৌতুহল জন্মিল। ক্রমে সহজ অঙ্কে কিছু অধিকার লাভ করিয়া উক্ত পুস্তকের বিষয় ভালরূপেই আয়ত্ত করি। আমার অবস্থা উন্নতি লাভের সম্পূর্ণ প্রতিকূলই ছিল। কালী, কলম অথবা কাগজ আমার কিছুই ছিল না, এজন্য চামড়া পরিষ্কার করিয়া জুতাশেলাই করিবার লোহার কাটির দ্বারা তদুপরি অঙ্ক কসিতাম। তিনি বলিতেছেন—"I beat out pieces of leather as smooth as possible and wrought my problems on them with a blunted awl."

অবশেষে কোন বন্ধুর অনুরোধে তিনি কয়েকটী কবিতা রচনা করেন, ঐগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। ইহাতে তাঁহার কিছু অর্থাগম হইয়াছিল। উহার দ্বারা অঙ্কশাস্ত্রের পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া মনের সাধে গণিতের চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল। তিনি গণিত সম্বন্ধে পুস্তকাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

একটী অন্ধ বালকের পরিচয় গ্রহণ করুন। নিকোলাস সণ্ডার্সন জন্মের এক বৎসর পরেই অন্ধ হন। কিছু বয়স হইলে তিনি বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। তথায় গ্রীক ও লাটিন ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কিন্তু গণিত বিদ্যার দিকেই তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মিল। কেমব্রিজে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা জন্মিল, কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহার সে

ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। তিনি কঠোর অধ্যবসায়ের সহিত অঙ্ক ও পদার্থ বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। যিনি অর্থাভাবে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই, অবশেষে তিনিই কেমব্রিজের গণিত ও পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সণ্ডার্স'র Doctor of Law উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রতীচ্য জগতের এইরূপ বহুল দৃষ্টান্ত আমাদিগকে সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে প্রোৎসাহিত করে।

ছাত্র জীবনকে প্রোৎসাহিত করিতে প্রতীচ্য জগতের ন্যায় ঐরূপ বহুল দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে না থাকিলেও, একেবারে নাই, এমন নহে। আমাদের চক্ষের সম্মুখেই দুইজন মনিষী ব্যক্তির অসাধারণ অধ্যবসায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঈশ্বর চন্দ্র বীরসিংহ-নিবাসী দরিদ্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। ঠাকুরদাস ৫।১০ টাকা বেতনের কাজ করিয়া পুত্রকে লেখা পড়া শিক্ষা দেন। ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় থাকিয়া সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। বাসায় সকলের রন্ধনাদি করিয়া দরিদ্র বালকের ন্যায়ই বিদ্যালয়ে গমন করিতেন। এই সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন। বাল্যকাল হইতেই, ঈশ্বরচন্দ্র দুঃখ দারিদ্র্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, আপনার গন্তব্যস্থানে উপনীত হইতে, অর্থাৎ ছাত্র-জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। তিনি যেন ইচ্ছাশক্তির লৌহ দণ্ড হস্তে করিয়া বিঘ্ন বাধাকে ত্রাসযুক্ত করিয়া বলিলেন, "সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও, আমার কর্ত্তব্য সাধন করিতে দাও।" ছাত্রাবস্থায় ঐরূপ সিংহ বলে প্রণোদিত না হইলে তিনি কি পরিণামে বিদ্যাসাগর হইতে পারিতেন ?

আর এক ব্যক্তি। ইনি বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত। প্রায় ১৮ বৎসর বয়সের সময় ইঁহার রীতিমত বিদ্যারম্ভ হয়। কলিকাতায় কোন ব্যক্তির বাসায় থাকিয়া ইনি গৌর মোহন আড্ডির স্কুলে গমন করিতেন। ইনি বড় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "সকলের মা বলে লেখা পড়া শেখ, আমার মা তাহার বিপরীত কথাই বলিতেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় ইনিও বঙ্গসাহিত্যের কিরূপ উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। ১৮ বৎসর বয়সে এক প্রকার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিয়া ৩৬ বৎসর বয়সের সময় দারুণ শিররোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। এই দারুণ রোগের মধ্যেও তিনি ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ২য় ভাগ বাহির করিয়াছিলেন। উপাসক সম্প্রদায় দুই খণ্ড রচনা করিয়া অক্ষয় কুমার বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইনিই বঙ্গসাহিত্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রবেশ করাইয়া উহার পরিপুষ্ট সাধনে যত্নবান ছিলেন। তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা এতই প্রবল ছিল যে, বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন বিষয় রচনা করিবার সময় তৎসম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের অল্পতা দর্শন করিয়া Medical Collegeয়ে ভর্ত্তি হইয়া উহা শিক্ষা করেন। অক্ষয় কুমার রাত্রিতে ছাদের উপর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা নক্ষত্ররাজি দর্শন করিতেন, তাঁহার পত্নী সেজন্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, পত্নীকে শয্যায় ফেলিয়া যুবা পুরুষ রাত্রিতে আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে, এমন ত আমি

কোথায় শুনি নাই। তিনি রূপকচ্ছলে "স্বপ্নদর্শন-বিদ্যা বিষয়ক" যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি জ্ঞান চর্চ্চাকে মানব জীবনের কি মহৎ ব্রত বলিয়াই মনে করিয়াছেন, যাঁহারা উহা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন।

আমাদের দেশের শাস্ত্র ও পুরাণাদির মধ্যেও জ্ঞানানুশীলনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সুন্দর উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—জ্ঞানী ব্যক্তির ভূয়সী প্রশংসা পরিলক্ষিত হয়। মহাভারতকার বলিয়াছেন, "মৃত্যু কেশাকর্ষণ করিয়া রহিয়াছে, ইহা জানিয়া ধর্ম্ম আচরণ করিবে, আর নিজেকে অজর ও অমর জানিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিবে।" আমরা মনুসংহিতায় দেখিতে পাই "যিনি বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ জন্মের কারণ হন, যিনি বেদাদি ব্যাখ্যান দ্বারা স্বধর্ম্মের উপদেশ করেন, সেই ব্রাহ্মণ, বালক হইলেও, বৃদ্ধ জনেরও ধর্ম্মতঃ পিতৃবৎ মাননীয়। অঙ্গিরার পুত্র বালক হইয়াও সাতিশয় বিদ্বান ছিলেন বলিয়া পিতৃব্য ও বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃব্যপুত্রদিগকে অধ্যয়ন করাইতেন; তিনি তাঁহাদিগকে "পুত্রক" শব্দে অহ্বান করিয়াছিলেন। পুত্রক বলাতে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া দেবতাদিগের নিকট তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করেন; তাহাতে দেবতারা সমবেত হইয়া বলিয়াছিলেন, "বালক যাহা বলিয়াছে, তাহা অন্যায় নহে। কারণ অজ্ঞ ব্যক্তি বৃদ্ধ হইলেও বালক, এবং যিনি জ্ঞানোপদেষ্টা, তিনি বালক হইলেও পিতৃবৎ পূজনীয়।" মনু আর এক স্থানে বলিতেছেন,—

ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ

"মস্তকের কেশ পাকিলেই যে বৃদ্ধ হয়, এমন নহে, কিন্তু যিনি যুবা হইয়াও বিদ্বান, দেবতারা তাঁহাকেই বৃদ্ধ বলিয়া জানেন।"

মস্তিষ্ক উত্তমাঙ্গ, তাহাতে সংশয় নাই; যদি ক্ষুদ্র জীবের ভালরূপ মস্তিষ্ক থাকিত,তবে সেও প্রকাণ্ড হস্তিকে আপনার বশে আনিতে পারিত, ইহাও বিশ্বাস করি; কিন্তু যে আধারে এই বুদ্ধির যন্ত্রটী স্থাপিত হয়, তাহার উন্নতি-সাধনে বীতরাগ প্রকাশ করিলে মস্তিষ্ক হীনবল হইয়া পড়ে। একদিগের ওজন অতিরিক্ত বাড়াইয়া দাও, অপরদিক অনুরূপ আকার ধারণ করিবে; সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে না। স্পেন্সর যথার্থই বলিয়াছেন—"Nature is a strict accountant; if you demand of her in one direction more than she is prepared to lay out, she balances the account by making a deduction elsewhere." গ্রীকদিগের শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে ছাত্রদিগের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে শারীরিক বললাভের প্রতিও সমভাবে দৃষ্টি রাখা হইত।

নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করা ছাত্রদিগের একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ভাল ছাত্র আমাকে একবার বলিয়াছিলেন যে, এক ঘণ্টা নিয়মিত ব্যায়ামে কেবল যে শরীরের বললাভের সহায়তা হয়, তাহা নহে; উহার দ্বারা দীর্ঘ সময় অধ্যয়নের সহায়তা করিয়া থাকে। কেবল ব্যায়ামের দ্বারাই যে শরীর রক্ষিত হয়, তাহা মনে করা উচিত নয়। প্রকৃতির নির্ম্মল বায়ুসেবন, পুষ্টিকর দ্রব্যভক্ষণ, যথাসময়ে আহারাদির প্রতি দৃষ্টি রাখা, এ সকল শরীরের বলবিধান ও দীর্ঘজীবন লাভের বিশেষ উপায় বলিয়া আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কত উৎকৃষ্ট ছাত্র, পাঠ্যাবস্থায় শরীরের প্রতি

উপেক্ষা করিয়া, ভবিষ্যতে রুগ্নদেহে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। একজন কৃতবিদ্য যুবক, দুঃখ করিয়া আমার নিকট বলিয়াছিলেন, আমার শরীর যেরূপ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাতে আমার এখন মনে হয়, আমার এম্-এ উপাধি লাভ করা অপেক্ষা, যদি সুস্থ শরীরে এ সংসারে বাস করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি নিজেকে বড় সুখী মনে করিতাম। রুগ্নের নিকট নক্ষত্র বিরাজিত আকাশমণ্ডল, সরোবরের প্রস্ফুটিত শতদল, নবীন ভানুর তরল-কিরণে শোভিত, তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ, যেন সকলেই কালিমায় আচ্ছাদিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এ ধন ধান্যপূর্ণ সংসারে তিনি ধন কুবের হইলেও অতি দুঃখী, পণ্ডিত হইলেও তাঁহার শিক্ষা জনসাধারণের হিতার্থে বিশেষরূপে নিয়োজিত হইবার সুবিধা হয় না।

শারীরিক নিয়ম অবগত হইয়া এবং তৎ-পালনে, আমরা শরীরের সুস্থতা ও দীর্ঘ-জীবন লাভ করিতে পারি। মার্কিন দেশের কোন এক ডাক্তারকে কোন ব্যক্তি তাঁহার বয়স জিজ্ঞাসা করেন, ডাক্তার প্রশ্নকারীকেই তাঁহার বয়স অনুমান করিতে বলিলেন। প্রশ্নকারী বলিলেন, আমার অনুমান হয়, আপনার বয়স পঞ্চাশের অধিক হইবে না; ডাক্তার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, পঞ্চাশে আর কুড়ি যোগ করুন; ইহা বলিয়া মার্কিন ডাক্তার বলিলেন, আহারাদির নিয়ম রক্ষা—শারীরিক নিয়ম রক্ষা দ্বারা এ বয়সে যৌবনের তেজ ও স্মারকতা শক্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, সূর্য্যগ্রহণের সময় যদি কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে সে ছেলে, চির-রুগ্ন ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। আমাদের পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঠিক গ্রহণের সময়ই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন। পণ্ডিতপ্রবর তাঁহার পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—পিতা ঠাকুর মহাশয় মিতাচারী ও মিতাহারী ছিলেন বলিয়াই তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অধ্যাপক টিনডেলের মতে নরনারীর পরমায়ু অন্ততঃ ১০০ বৎসর হওয়া উচিত। তিনি বলিয়াছেন, শারীরিক নিয়মে অজ্ঞতা প্রভৃতি হেতুই আমরা অল্পায়ু হইয়া থাকি।

শারীরিক স্বাস্থ্য বিধানের পক্ষে, যেমন নির্ম্মল বায়ু সেবন, নিয়মিত আহার প্রভৃতি বিষয়ে সকল শরীরতত্ত্ববিদদিগেরই প্রায় এক মত দেখা যায়; তেমনি অন্য দুই একটী বিষয়ে মতদ্বৈধ দেখা যায়। কাহারো কাহারো মতে সুরাপান স্বাস্থ্য-বিধানের একটা উপায়। সুরাপান বিষয়ে, অথবা স্বাস্থ্যলাভের কোন একটা বিশেষ বিষয় লইয়া আলোচনা করা আমার এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সুরাপান স্বাস্থ্য-লাভের বিপরীত বলিয়াই প্রতীচ্য জগতের মাদক নিবারণী-সভার অগ্রণীরা লেখনী চালনা করিতেছেন। সুরাপায়ীর মাত্রা যখন কিছু চড়িয়া যায় তখন তিনি মহাপণ্ডিত হইলেও তাঁহার উচ্চশিক্ষা তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ থাকিতে দেয় না; এ কথা কেন বলিতেছি, ইহার দৃষ্টান্ত অনেক ঘটিয়াছে। সুরার ঝোঁকে টলিতে টলিতে কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি গৃহে আসিয়া তাঁহার এক ক্ষুদ্র কন্যার চক্ষে গরম দুগ্ধ ঢালিয়া দিয়া তাহার একটী চক্ষু নষ্ট করিবার কারণ হইয়াছিলেন। হিব্রুজাতির মধ্যে একটী প্রবাদ আছে "যেখানে শয়তান

স্বয়ং গমন করিতে না পারেন, সেখানে তিনি সুরা পাঠাইয়া দেন।" শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশেষ সম্মানের পাত্র Sir John Lubbock কি বলিতেছেন শুনুন "The word drink is often used as synonymous with alcohol—the great curse of northern nations.—Honest water never made any one a sinner but crime may almost be said to be concentrated alcohol" আমাদের দেশে ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সুরারূপ বিলাতী বিষ প্রবেশ করিয়া বহুলোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আজ শিক্ষিতদলের মধ্যে যদিও ইহার প্রাবল্য অধিক দৃষ্ট হয় না, তথাপি ইহার মোহিনী, সর্ব্বনাশিনী শক্তি হইতে সকলেই যে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন, এমন মনে হয় না। আজ এই প্রসঙ্গে দুইজন মহাপুরুষের নাম উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার ও কেশবচন্দ্র সেনের যত্নেই কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা ইহার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আহারাদির নিয়ম রক্ষা ও অঙ্গচালনা শরীর-রক্ষার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি, সংশয় নাই। এ সকল ব্যতীত চিত্ত সংযম ও মনের প্রফুল্লতার উপরেও শরীরের উন্নতি বিশেষরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। চিত্তের সন্তোষকে মহৌষধি বলিয়া অনেকে বর্ণনা করিয়াছেন। মনের মধ্যেই আমাদের অনেক পীড়ার বীজ নিহিত থাকে। তুমি ভাব, আমার জ্বর হইয়াছে, ভাবের প্রাবল্যহেতু তোমার গাত্র গরম হইয়া উঠিবে, নাড়ী দ্রুতগতিতে চলিতে থাকিবে! অনেকের ধারণা, মনের ব্যাধিই শরীরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোকেরা ইচ্ছাশক্তির পরিচালনার দ্বারা রোগের প্রতীকার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। যাহা হউক, চিকিৎসকদিগের মনোবিজ্ঞানে অধিকার থাকা আবশ্যক বলিয়া অনেকে স্বীকার করিতেছেন।

প্রবৃত্তির উপর অধিকারে আমরা মানসিক শক্তি ও প্রফুল্লতা অনেক স্থলে লাভ করিতে সমর্থ হই। আমরা শুনিতেছি, মানুষ যখন ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া উঠে, তাহার শরীরের রক্ত বিষাক্ত হইয়া উঠে। কোন গ্রন্থকারের পুস্তকে পড়িয়াছি, কোন নারী সন্তানকে স্তনের দুগ্ধ পান করাইবার সময় কোন কারণে ক্রোধে অধীর হইয়া যেন আত্মহারা হইয়া পড়েন, তদবস্থায় তাঁহার ঐ শিশুটী যেন কি রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন, তদবস্থায় তাঁহার ঐ শিশুটী যেন কি রোগগ্রস্ত হইয়া চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিল। উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা বলেন, জননীই সেই শিশুর মৃত্যুর কারণ; ক্রোধানল ঐ নারীর রক্তবিন্দুকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল—শিশুর কোমলকণ্ঠে সেই দূষিত শোণিত প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিল। শত বৎসরের অধিক কোন রমণীকে তাঁহার দীর্ঘজীবনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন, বাল্যকাল হইতে আমি কখন ক্রোধের অধীন হইয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না—সন্তোষ ও প্রফুল্লতাকে আমার চিত্তের প্রধান অবলম্বন করিয়াই আজীবন চলিয়াছি।

আর একদিক। এইটীর প্রতি সকল মানবের বিশেষতঃ তরুণবয়স্ক ছাত্রদিগের বিশেষ দৃষ্টিরাখা উচিত। শরীরতত্ত্ববিদেরা, চিকিৎসকেরা একবাক্যে সকল সময়েই স্বীকার করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়-সংযম ও ইন্দ্রিয়ের যথাযথ ব্যবহারেই মানব অনেক রোগের হস্ত হইতে দূরে থাকিতে সমর্থ হয়; দীর্ঘ-

জীবন লাভ করিয়া বার্দ্ধক্যেও বহুল পরিমাণে শরীর মনের তেজ অক্ষুন্ন রাখিয়া যথার্থ মানব নামের গৌরব রক্ষা করিতে পারে। শরীরের যে শক্তির যথাযথ পরিচালনে আমরা জীবনের সকল বিভাগকেই সতেজ ও সবল রাখিতে সমর্থ হই, তাহার প্রতি যুবাদিগের কতই দৃষ্টিরাখা উচিত! Vitality কথাটার উপর দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের জীবনকে কতই সাবধানে সংযমের পথে পরিচালিত করা উচিত! কেহ যদি সংযমের পথ অতিক্রম করিয়া দুর্নীতির দ্বারা বিষময় করেন, আপনার জীবনকে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে, তিনিই যে কেবল তাঁহার ফলভোগী হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তাহা নহে, তাঁহার কার্য্যের কুফল তাঁহার বংশাবলীও ভোগ করিয়া থাকে। এ সকলের দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষের সম্মুখে সততই ঘটিতেছে, কত নিরপরাধী শিশু আমাদের ব্যাধির বীজ শরীরে ধারণ করিয়া জন্মাবধি কষ্টভোগ করিয়া আমাদের উদ্দাম যৌবনের উশৃঙ্খলতার দোষ দেখাইয়া আমাদিগকে লজ্জিত করিতেছে। এই সংযমের উপর যেমন শরীরের স্বাস্থ্য, মনের ও দীর্ঘজীবন লাভ নির্ভর করে, তেমনি, শারীরিক বীরত্বের মূলও আমরা ইহার কার্য্যে দেখিতে পাই। স্পার্টা দেশে দীর্ঘ বয়সে সমর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বীরপুরুষেরা দারপরিগ্রহ করিতেন। যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়া পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়া ভাল কি মন্দ, তাহা আমি কিছু বলিতেছি না,—সংযমই বীরত্বের নিয়ামক বলিয়া আমাদের স্মরণ করা উচিত। যাঁহারা দেশের হিতকল্পে আপনাদিগের জীবনকে নিয়োগ করিতে প্রস্তুত; শারীরিক ও মানসিক বল লাভ করা তাঁহাদের কতই প্রয়োজন!—স্পার্টানদিগের ন্যায় ৫০ কি ৬০ বৎসরে বিবাহ করা উচিত, আমি বলিতেছি না। কিন্তু শরীরের শক্তি সামর্থ্য রক্ষা করিতে হইলে কথাটা বোধ হয় তত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বাল্যবিবাহ কি দূষণীয় নয়? উপযুক্ত বয়সে দারপরিগ্রহের মধ্যেও শক্তিলাভের মন্ত্র নিহত রহিয়াছে।

ছাত্রজীবনে জ্ঞানানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে যিনি পবিত্রতাকে সহায় করিয়া চলিবেন, শাকান্নের মধ্যেও তিনি উশৃঙ্খল ধনীর সন্তান অপেক্ষা শরীর মনের সুস্থতা লাভ করিয়া টেনিসন-বর্ণিত Sir Galaheadএর ন্যায় বলিতে পারিবেন—

"My strength is as the strength often, Because my heart is pure."

ঐ যে ঋষিবাক্য বহু শতাব্দী ভেদ করিয়া আমাদের কর্ণকুহরে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, তাহা কি শিরোধার্য্য করিয়া ছাত্রগণ জীবনপথে অগ্রসর হইবে না?

কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ম্ জিতম্।"

আমার বক্তব্য বিষয়ের শেষ সীমায় উপনীত হইলাম। ধর্ম্মই মানবজীবনের সর্ব্বোচ্চ বিষয়। আমাদের অজ্ঞতার দোষে আমরা উহাকে নানারূপ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া, ধর্ম্মের বিশ্ববিজয়িনী উজ্জ্বল মহানভাব কখন বিনষ্ট হইতে পারে না। কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশি চন্দ্র তারার মুখ আবৃত করিয়া রাখিলেও তাহাদের কণামাত্র উজ্জ্বলতার হানি হয় না। আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ ধর্ম্মের বিকৃত আকার মানব সম্মুখে প্রকাশ করিলেও উহার ভাব কখন খর্ব্ব হয় না। এ জগতে নানারূপ ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু সকল ধর্ম্মের একমাত্র প্রতিপাদ্য সেই জগতের আদি কারণ

স্বয়ং পরমেশ্বর। ধর্ম্মমত লইয়া পৃথিবীতে অনেক বিবাদ সংঘটিত হইয়াছে, কিন্তু একটা স্থান আছে, যেখানে সকল ধর্ম্মাবলম্বীই সমভাবে দাঁড়াইতে পারেন।—ধর্ম্মের সেই উচ্চ উদার-ভূমির উপর দাঁড়াইয়া আমরা সকলেই বলিতে পারি, "পরমেশ্বরের চিন্তনে হৃদয়ে শান্তি হয়, প্রাণে সৎপ্রবৃত্তির উদয় হয়,—সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের জীবন পরিচালিত করা উচিত। সেই পরমেশ্বরই ধর্ম্মের আবহ। ছাত্রজীবনে কি সেই পরমেশ্বরকে জীবনের আধার করিয়া চলা উচিত নয়? উচিত বৈ কি?—শতবার উচিত বলিলেও অধিক বলা হইল বলিয়া মনে হয় না। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতীয় শাস্ত্রের কথা এই "যুবৈব ধর্ম্মশীল স্যাৎ"—যৌবন সময়েই ধর্ম্মশীল হইবে। অন্য ধর্ম্মশাস্ত্রেও আমরা দেখিতে পাই, "Remember the Lord in the days of thy youth"—যে সময়ে অর্দ্ধমানবী ও অর্দ্ধরাক্ষসীসমা সায়রেন মধুর স্বরে আমাদিগকে বিপাকে ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে, সেই সময় সেই সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বরের সান্নিধ্যে সতত বাস করিতে পারিলে জীবন কি সুরক্ষিত হয় না? সকল দেশেরই ধর্ম্মাচার্য্যেরা আমাদিগকে পরমেশ্বরের পথেই বিচরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। স্পর্শমণি সংযোগে যেমন লৌহ নূতন বর্ণ ধারণ করে, সেই সত্যস্বরূপ, সেই জ্ঞানস্বরূপ, সেই পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের চিন্তনে মানবের আত্মাও সেইরূপ উজ্জ্বল জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হয়। আমি আমাদের দেশের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মাচার্য্যদিগের সকল পথ অবলম্বন করা শ্রেয় বলিয়া মনে করি না; কিন্তু তাঁহাদিগের ভগবদ্ভক্তি ছাত্রদিগের অনুকরণীয়। আহা, সেই ছাত্রই দেখিতে ইচ্ছা করে, যিনি এই কথা বলিতে পারেন, "প্রভো! কি হবে সে জ্ঞানে, যা'তে তোমারে না পাই।"

যেমন একঘণ্টা ব্যায়ামের দ্বারা আমরা শারীরিক বল লাভ করিয়া শরীরকে অধিকক্ষণ কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিতে পারি, সেইরূপ, ক্ষণকাল পরমেশ্বরের সংবাস ও প্রার্থনাদ্বারা আমরা হৃদয়ে শান্তি ও বল লাভ করিয়া জীবন পথে অধিকতররূপে অগ্রসর হইতে সমর্থ হই। ইটালীর উদ্ধারকর্ত্তা জোসেফ ম্যাটসিনী প্রার্থনা করিয়া সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, তাঁহার ঈশ্বর-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলে তাঁহাকে কেবল ইটালীর উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে ইচ্ছা হয় না, তাঁহাকে ধর্ম্মাচার্য্যের পদে স্থান দান করিতে বাসনা হয়।

সৌভাগ্য ক্রমে ভারতে নবালোক দেখা দিতেছে। ভারতবাসীরা ভারত-জননীর সর্ব্ববিধ অভাব মোচনের জন্য, বহুদিনের আলস্য ও জড়তা পরিহার করিতে তৎপর হইতেছেন। এ সময় ছাত্রবৃন্দ কি উদাসীন থাকিবেন? এ কথা বোধ হয় কেহই বলিবেন না। এ কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর শৌর্য্য বীর্য্যের যদি কিছু পরিচয় অন্য জাতি পাইয়া থাকেন, সে কেবল ছাত্রদিগেরই গুণে, তবে রাজনীতিক আন্দোলনে তাঁহারা কত সময় ব্যয় করিবেন, এবং কিরূপে কার্য্য করিবেন, এ বিষয়ে দেশের অগ্রণীদিগের উপদেশ গ্রহণ করিয়াই তাঁহাদিগের চলা আবশ্যক। রাজনীতিক আন্দোলনকারীদিগের 'বৈরনির্য্যাতনের ভাবকেই' একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র বলিয়া মনে করা উচিত বলিয়া বোধ হয় না। তবে কাউণ্ট টলষ্টয়ের মতই যে সকল সময়ে প্রাচুর্য্য, তাহাও ঠিক

বলিয়া বোধ হয় না। কাউন্ট টলষ্টয় যীশুর doctrine of non-resistance এর মতটা পূর্ণ মাত্রায় পালন করাই বিধেয় মনে করেন। কোন বিষয়ে বল প্রয়োগ—কোন স্থলে রক্তপাত তাঁহার মতের বহির্ভূত। মহাত্মা শাক্যমুনি ও চৈতন্য এইরূপ মতই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণ ভারত ক্ষমা-কেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, কাউন্ট টলষ্টয় যেমন রুসিয়ার চিন্তাশীল ধর্ম্মাচার্য্য, থিওডোর পার্কারও আমেরিকা দেশের একজন সামান্য চিন্তাশীল ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহার জীবনের একটী ঘটনার বিষয় এখানে উল্লেখ করি-তেছি। যখন আমেরিকা দেশে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন একজন ক্রীতদাস রাত্রে প্রভুর বাটী হইতে লুকাইয়া থিওডোর পার্কা-রের বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। পার্কার তখন দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধেই প্রবন্ধ রচনা করিতেছিলেন। পার্কার আপন বাটীতে তাঁহাকে আশ্রয় দান করিলেন। এবং তাঁহার হস্তে একখানে বাইবেল ও একটী পিস্তল দিয়া এই কথা বলিলেন, বাইবেলখানি দ্বারা আত্মাকে রক্ষা করিবে, এবং পিস্তলের দ্বারা নিজ দেহকে রক্ষা করিবে, অর্থাৎ কেহ যদি তোমায় ধরিতে আইসে, ইহার দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিবে, এই বলিয়া তিনি সেই পালক ক্রীতদাসের কোন স্বাধীন ভূমিতে পলাইবার ব্যবস্থা করি-য়াদিলেন। এই এক দৃষ্টান্ত। দেহ ও মন ভগ-বানেরই দান, অতএব দুইয়েরই স্বাধীনতা ও পবিত্রতা রক্ষা আবশ্যক।

দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি ছাত্রদিগের উপ-রই অধিকতর রূপে নির্ভর করিতেছে। যেমন মহাবীর আলেকজণ্ডার গ্রীক-বীর একিলিসের বীরত্ব চিন্তা করিয়া বীরত্ব উপা-র্জ্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন; তেমনি, উন্নতি-শীল ছাত্রেরা, জ্ঞানী, শারীরিক বলে বলীয়ান ও ধর্ম্মপরায়ণ লোকদিগের মহৎ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া শরীরের বলে ও ধর্ম্মে বলীয়ান হইয়া নিজের, নিজ পরিবারের ও দেশের হিতসাধনে যত্নবান হইবেন, ইহাই সর্ব্বান্তঃ-করণে সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীশশিভূষণ বসু।

পাষাণ।

(১)

একদিন ছিলে তুমি কোমলতাময়;
একদিন যাইত গলিয়া
অশ্রুতে ও প্রাণ;
আজি যেন নিদ্রালসে নিঃস্ব নিরাশ্রয়,
বিদেশীর পদপ্রান্তে পড়িছ ঢলিয়া
হইয়া পাষাণ।

২

বিখণ্ডিত বিমলিন ধূলি ধূসরিত
রাজবর্ত্মে হেরিয়া তোমায়—
জড় অচেতন,
অকস্মাৎ শুনি প্রাণে বাল্মীকি সঙ্গীত,
হেরে স্মৃতি অহল্যার অভিশপ্ত প্রায়—
অতীত স্বপন।

৩

মনে হয়, হেথা যেন ফিরিবে রাঘব,
ফিরিবে সে পুণ্য ত্রেতা যুগ
অবতার সাথে;
পুনঃ পদস্পর্শে লয়ে বিগত গৌরব
কোন্ গরীয়সী দেবী হবে জাগরূক
বিমুক্ত প্রভাতে?

৪

লুক্কায়িত শত প্রাণ আছে দেহ ভরি,
স্নেহ-প্রীতি-কুসুম-কোমল,
শাপান্তে আবার,—
কে জানে তুমি যে কভু সিংহাসনোপরি,
নব হর্ষে ধরাপ্রান্তে সজীব সচল
দাঁড়াবে না আর?

৫

ভারতের প্রতি দেব-মন্দির মাঝারে,
আজো দানে পাষাণ মূরতি
বর আশীর্ব্বাদ,
তুমি ও মা জেগে উঠ ঊষার আঁধারে
আনিয়াছি অন্তিমের প্রাণের আরতি,—
বিজয় সংবাদ।

(৬)

তোমার মাঝারে আছে অনুতাপ সাথ
অবরুদ্ধ কত অশ্রুজল,
উৎসের মতন;
টেনে ফেলে দেব তার কঠোর সম্পাত
—মরুবক্ষে নিয়ত তা' করি কল্ কল্
হউক পতন।

(৭)

চল আপনারে নিয়ে বিরলে বিজনে;
বিজাতীয় হীন ধূলি-মগ্ন
রবে কত কাল?
অগ্রাহ্য জীবন গুলি নিভৃতে গোপনে
কত দিন অনঙ্কুর পড়ে র'বে নগ্ন
বেরি' বক্ষ ভাল?

শ্রীধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী।

সাধু কালীকান্ত।

বর্ত্তমান শতাব্দীর মধ্যে পূর্ব্ববাঙ্গালায় সে সমস্ত স্বনামধন্য মহাপুরুষের অভ্যুদয় হইয়াছে, আমাদের আলোচ্য এই মহাত্মাও তন্মধ্যে এক জন। ইনি পুলিশ বিভাগে কর্ম্ম করিয়াও "সাধু" আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। পুলিশ কর্ম্মচারী হইয়াও ইহাঁর ভাগ্যে যে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছে, তাহা অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না। আজ আমরা এই মহাত্মার আদর্শ জীবনের একটী সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এ প্রবন্ধে প্রকাশ করিব।

পূর্ব্বের বিবরণ।

প্রাচীন মৈথিল ব্রাহ্মণ সমাজের যে শাখা পরবর্ত্তীকালে বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাঙ্গালী বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছিলেন, মহাত্মা চন্দ্রশেখর উপাধ্যায় তাঁহার আদি পুরুষ। চন্দ্রশেখর "পণ্ডিত চক্রবর্ত্তী" এই উপাধিতে বিভূষিত হইয়া মিথিলারাজের সভাপণ্ডিতের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সেই হইতে "চক্রবর্ত্তী" ইহাঁদের বংশপরম্পরা উপাধি। মিথিলা রাজ্য মুসলমানের হস্তগত হইলে, চন্দ্রশেখর বঙ্গে আগমন করিয়া মুরশিদাবাদে স্বীয় আবাস স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। পরবর্ত্তী সময়ে এই মহাত্মার বংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে

রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নামই বিশেষ রূপে উল্লেখ-যোগ্য। তিনিও অল্প বয়সে "ব্যাসাচার্য্য" উপাধি লাভ করিয়া তাৎকালিক পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

রাজনগরের মহারাজা রাজবল্লভ মুরশিদাবাদে কিরীটকোণ নামক যজ্ঞ সম্পাদন করেন। এই অনুষ্ঠানে ব্যাসাচার্য্য মহাশয়কে হোতার কার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন। ব্যাসাচার্য্য মহাশয়ের কর্ম্মকুশলতা ও পাণ্ডিত্য দর্শনে একান্ত ভক্তিভাবাসন্ন হইয়া রাজবল্লভ তাঁহাকে রাজনগর লইয়া আসেন। ব্রহ্মোত্তর জমী প্রদান করিয়া ও পঞ্চমী দেবী নামক একজন শ্রোত্রিয়ের কন্যা সম্প্রদান করিয়া আকশা গ্রামে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। কালে তিনটী পুত্র লাভ করিয়া ব্যাসাচার্য্য মহাশয় পরলোক গমন করিলে, সাধ্বী পঞ্চমী দেবীও পতির জলন্ত চিতারোহণ করিয়া পতিভক্তির চূড়ান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ব্যাসাচার্য্য মহাশয়ের মধ্যম পুত্র রামজয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও একজন সংস্কৃতজ্ঞ বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজ বাটীতে একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু পাণ্ডিত্য গৌরবে নহে, সাধুতা, পরোপকার, নিষ্ঠা প্রভৃতি পৈত্রিক বহু গুণেরই অধিকারী হইয়া জনসমাজে সম্মান ও ভক্তিভাজন হইয়াছিলেন।

রামজয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়, মাধবচন্দ্র, কমলাকান্ত, রঘুনাথ, কালীনাথ ও স্বরূপচন্দ্র নামে যে পাঁচটী পুত্রের অধিকারী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চতুর্থ এই কালীনাথই আমাদের আলোচ্য কালীকান্ত। পরবর্ত্তী সময়ে ইনি কালীকান্ত নামে বিশেষ রূপে প্রসিদ্ধ হইলেও কালীনাথই ইঁহার পিতৃ মাতৃ প্রদত্ত প্রকৃত নাম।

জন্ম ও শিক্ষা।

বঙ্গাব্দ ১২২০ সনের ১৪ই আশ্বিন তারিখে, বিক্রমপুর আকশা গ্রামে * কালীকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। জন্মিয়া কালীকান্ত পিতা মাতার স্বচ্ছলাবস্থা দেখেন নাই, অতি শিশুকালেই দারিদ্র্য দুঃখে পতিত। রামজয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল ছিল না। যে সমস্ত ব্রহ্মোত্তর জমী ছিল, তাহা হইতেই নিজ সংসারের ও চতুষ্পাঠীর ব্যয় স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইত। কালীকান্ত জন্মগ্রহণ করার কিছু পরেই হঠাৎ গৃহদাহ হইয়া, গৃহস্থিত তাবত সামগ্রী ও জমীর দলিলাদি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল। দেশের মধ্যে সুশাসন একেবারেই নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয় সে সকল জমী আর উদ্ধার করিতে পারিলেন না। চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণকে বিদায় দিতে বাধ্য হইয়া, অতি কষ্টে কাল কর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

কালীকান্তের প্রাথমিক শিক্ষা তাৎকালিক প্রথানুসারে গ্রাম্য পাঠশালাতেই হয়। শিশুকাল হইতেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও দৃঢ় অধ্যবসায় ছিল। যাহা কর্ত্তব্য বোধ করিতেন, তাহা সম্পাদন করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটী করিতেন না। অতি অল্পকাল মধ্যেই কালীকান্ত বাঙ্গালা শিক্ষা সমাপন করিয়া, সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করেন। কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষা তিনি আর সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। দরিদ্রতার কষাঘাতে পীড়িত হইয়া, কিছুদিন

* এই আকশা গ্রাম এখন ফরিদপুর জেলান্তর্গত পালং থানার অধীন। পূর্ব্বে ঢাকা জেলান্তর্গত ছিল।

অধ্যয়নের পরেই ঢাকায় আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঢাকাতে আত্মীয় স্বজন কিম্বা সাহায্যকারী বন্ধু বান্ধব কেহই নাই। এমতাবস্থায় ঢাকা আসিয়া, তিনি প্রথম অতিশয় কষ্টে পতিত হন। কিন্তু ভগবানের কৃপাতে সে কষ্ট তাঁহার অধিককাল ভোগ করিতে হয় নাই। এই সময় বিক্রমপুর বেতকা-নিবাসী স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র বসু মহাশয় ঢাকাতে ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন। তিনি বহুতর দরিদ্র ভদ্র সন্তানের প্রতিপালন করিতেন। কালীকান্তের দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া, তিনি তাঁহাকে নিজ বাসায় আশ্রয় দিলেন ও গ্রাসাচ্ছাদনের ভার গ্রহণ করিলেন।

ডিপুটী বাবুর বাসায় থাকিয়া কালীকান্ত পার্সী ও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। যে সময় কালীকান্ত এই শিক্ষা আরম্ভ করেন, সে প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সে সময় এদেশে ইংরেজী ভাষার তাদৃশ আদর ছিল না। আর কলিকাতা ভিন্ন অন্যত্র ইংরেজী শিক্ষা করার তাদৃশ সুবিধাও ছিল না। রাজকীয় তাবত কার্য্য পার্সী ভাষাতেই সম্পাদন হইত।

বৈষয়িক জীবন।

১২৪৪ সনে গবর্ণমেণ্ট সেটেলমেণ্ট আফিসে পাঁচ টাকা বেতন কালীকান্ত প্রথমে মোহরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, অল্পকাল মধ্যেই দশ টাকা বেতনে মহাফেজের পদে উন্নীত হ'ন। সাধুতা ও কার্য্যতৎপরতা তাঁহার জীবনের প্রথম হইতেই ছিল। দরিদ্রতার কষাঘাতে কালীকান্ত পৈত্রিক ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছেন। শত প্রকারের অভাবগ্রস্ত হইয়াও পরিশ্রমলব্ধ এই পাঁচটী টাকা ভিন্ন উপরি পাওনার প্রতি তাঁহার ঘৃণা। ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী, তাঁহার এই প্রকার ভাব;—ক্রমে কথাটা ম্যাজিষ্ট্রেট আর, এবারক্রম্বি সাহেবের কর্ণগোচর হইল। এই প্রকার লোককে পুলিশ বিভাগে আনিলে মঙ্গল হইবে, মনে করিয়া তিনি কালীকান্তকে ফৌজদারীর নায়েব-নাজিরী কার্য্য প্রদান করেন। ক্রমে একশত টাকা বেতনে জিলার প্রথম শ্রেণীর দারোগা পদে কালীকান্ত উন্নতি লাভ করেন।

সেকেলে পুলিশ।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, যে সময় কালীকান্ত পুলিশ বিভাগে কার্য্য আরম্ভ করেন, সে প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সে সময়ের পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে বর্ত্তমান সময়ের লোকে "সেকেলে পুলিশ" বলিয়া অভিহিত করেন। শুধু পুলিশ বিভাগ বলিয়া নয়, অন্যান্য বিষয়েও সে সময়ের সহিত বর্ত্তমানে অনেক পার্থক্য উপস্থিত হইয়াছে।

তখন পুলিশের ঘুষ খাওয়া, তত নিন্দার বিষয় ছিল না। শুধু পুলিশ কেন, ডিপুটী মুন্সেফ প্রভৃতি হাকিমগণের মধ্যেও তৎকালে অনেকে ঘুষ গ্রহণ করিতেন। লোকের সংস্কার ছিল,—অর্থ উপার্জ্জনের সময়ে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। কোন প্রকারে অর্থ হস্তগত করিতে পারিলেই হয়, তা যে ভাবেই হউক। তবে ব্যয়ের সময় সদ্ব্যবহার চাই। দোল, দুর্গোৎসব, পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কার্য্যে বহু ব্যয় করিয়া যশস্বী হওয়াই, তখনকার দিনে জীবনের বিশেষ সার্থকতা ছিল। তাই, তিন টাকা বেতনে চাকুরী করিয়াও বহুলোকের ভরণপোষণ, মঠ প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী উৎসর্গ প্রভৃতি

কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, এই দৃষ্টান্ত সে দিনে বড় বিরল ছিল না।

পুলিশ চিরদিনই অত্যাচারী ; তখনও ছিল, এখনও আছে। কোন স্থানে তদন্ত উপলক্ষে উপস্থিত হইলে, কিছু আদায় করিয়া আনা, তখনকার দিনে যেমন একটা অবশ্য দাবীর মধ্যে ছিল, পুলিশের সে দাবী এখনও আছে। তবে সেকেলে পুলিশের উৎকোচ গ্রহণ ও অত্যাচার করিবার সুবিধা যেমন ছিল, এখন তেমন নাই। গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে পুলিশ বিভাগের বহুল সংস্কার করিয়াছেন। পুলিশের ক্ষমতা এখন অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। দেশের লোক শিক্ষিত। ঘরে ঘরে উকীল মোক্তার, ঘরে ঘরে ডিপুটী মুন্সেফ। এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি সংবাদ পত্র রহিয়াছে। পুলিশ কোন অন্যায় কার্য্য করিলে, সে বিষয় উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ও জন সাধারণের মধ্যে প্রচার হইতে এখন আর অধিক বিলম্ব হয় না। এত বাধা বিঘ্ন সত্বেও বর্ত্তমান সময়েও পুলিশ যে প্রকার অত্যাচার করে, তাহা দৃষ্টে "সেকেলে পুলিশ" যে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর অত্যাচারী ছিল, ইহা সহজেই অনুমান হয়। তখন দেশের মধ্যে সংবাদ পত্র ছিল না। কাজেই পুলিশ কোন অন্যায় কার্য্য করিলে তাহা প্রকাশ হইত না। লোকে জানিত পুলিশই, একমাত্র হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। শত প্রকার অত্যাচার হইলেও, পুলিশের বিরুদ্ধে যাইতে গ্রাম্য লোকের মধ্যে আর কাহারও সাহস হইত না। তদন্ত উপলক্ষে কাহারও বাটীতে উপস্থিত হইলে, সে বাটীতে মস্ত একটা ধুমধাম পড়িয়া যাইত। চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়াদি দ্বারা দারোগা বাবুর রসনা তৃপ্তির জন্য গৃহস্বামীকে ব্যস্ত হইতে হইত। ভোজন-দক্ষিণার ব্যবস্থাও অনেক উন্নত প্রণালীর ছিল। এখনকার মত সংক্ষেপে হইত না। আজ কাল দারোগা বাবুর ক্ষিপ্রহস্তে স্বীয় পকেট পূর্ণ করিবার প্রাণপণ প্রয়াস পাইলেও, একত্র এক সহস্র মুদ্রা দর্শন অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু তখনকার দিনে "হাজার টাকা উৎকোচ" বড় একটা বেশী কথা ছিল না।

অবশ্য অপেক্ষাকৃত হৃদয়বান লোক যে তখন পুলিশ বিভাগে না ছিল, এমন নহে। যাঁহারা মিথ্যার সম্পূর্ণ প্রশ্রয় না দিয়া, ন্যায় পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক, সে পক্ষ হইতেই যে কিছু পূজা গ্রহণ করিয়া, ন্যায্য কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, অথবা যাঁহারা নিম্নপদে অবস্থান সময়ে উৎকোচ গ্রহণ করিলেও দারোগপদে উন্নীত হইয়া আর উৎকোচ গ্রহণ করেন নাই, বেশ সাধুভাবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন ; তৎকালে তাহারাই প্রশংসিত পুলিশ কর্ম্মচারী বলিয়া জন-সমাজে যশস্বী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানেও পুলিশ বিভাগে যাঁহারা যশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী অন্বেষণ করিলে, এই প্রকার অবস্থাই প্রায় দৃষ্ট হয়। জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সাধুভাবে জীবন যাপন, চিরদিনই বড় দুর্ল্লভ। সেদিনেও যেমন দুর্ল্লভ ছিল, এখনও তেমন দুর্ল্লভ। আর দুর্ল্লভ বলিয়াই কালীকান্তের এত যশ, এত প্রতিষ্ঠা।

কালীকান্তের সাধুতা।

দরিদ্রের সন্তান কালীকান্ত পাঁচ টাকা বেতনে যখন দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'ন, তখনও আমলা-জন-সুলভ হস্ত প্রসারণ কার্য্য ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছিলেন। শত প্রকারে অভাবগ্রস্ত হইয়াও উপরি পাওনার প্রতি

ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আজ কালীকান্ত জেলার প্রধান দারোগা। উপঢৌকন বা উৎকোচ-স্বরূপে তাহার নিকট সহস্র সহস্র মুদ্রা উপস্থিত হইতেছে। কালীকান্ত তাহা মল মূত্রের ন্যায় ঘৃণার চক্ষে পরিত্যাগ করিতেছেন। তদন্ত উপলক্ষে মফঃস্বল কাহারও বাটীতে যাইতে হইলে আহার্য্য তাবৎ সামগ্রী সঙ্গে লইয়া যাইতেন। মোকদ্দমা সংসৃষ্ট কাহারও বাটীতে পান, তামাক খাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার সম্পূর্ণ আপত্তিজনক ছিল।

এই সাধু ব্যবহারের বিষয় ক্রমশঃ জনসমাজে প্রচার হইতে লাগিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের এই নির্লোভতা দেখিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। তখন ভিক্ষুকেরা পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রের গুণানুবাদ করিয়া দ্বারে দ্বারে গান করিত—

ধন্য কালীকান্ত যাঁহার গুণের অন্ত
করা কিছু নাহি যায়।
যিনি হাজারে হাজার রিস্‌ফত কতবার
ঠেলিয়া ফেলিলেন পায়॥
দেখ, জঘন্য নগণ্য আমলা কতজন
ঘুষ খেয়ে সদা কাজ করে।
বাবু পুরীষ সমান এই সব জ্ঞান
করিতেন নিরন্তরে॥
দেখ, দশ মুদ্রা বেতনে কত অভাজনে
পাকা দালান গড়িতেছে।
বাবু এত মোশরায় খেড়ী সমুদয়
যেম্‌নি প্রায় তেম্‌নী আছে॥

তখন কোন কঠিন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, তদন্তের ভার যেন কালীকান্তকে দেওয়া হয়,—এই প্রার্থনা করিয়া উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট লোকে দরখাস্ত করিত। কালীকান্তের চরিত্রের বিষয় উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণও সবিশেষ অবগত ছিলেন। লায়েল, অফ্-বি-সিম্‌সন্, আর-এবারক্রম্বি, রামপেনী, চার্লস, পছি, এ-এবারক্রম্বি, জর্জ গ্রেহাম প্রভৃতি কমিশনার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট সকলেই কালীকান্তকে সাধু ও প্রধান ডিটেক্‌টিভ্ কর্ম্মচারী বলিয়া প্রশংসা করিতেন।

ডিটেক্‌টিভ্ কালীকান্ত।

কমিশনার লায়েল্ মহোদয় কালীকান্তকে বিচারপতির (Deputy Magistrate) পদে উন্নীত করিবেন, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া, তাহার আয়োজন করিতেছিলেন; কিন্তু ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে কালীকান্তের ডিপুটীর পরিবর্ত্তে ডিটেক্‌টিভের পদ লাভ ঘটিল। এই সময় লেপ্টানেণ্ট গবর্ণর সার উইলিয়ম গ্রে বাহাদুর পরিদর্শনার্থে ঢাকাতে আগমন করেন। তিনি কালীকান্তের কৃতকার্য্যের ও সাধু চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া, "এই প্রকার লোককে পুলিশ বিভাগে রাখাই ভাল, তাহাতে দেশের বহু প্রকারে মঙ্গল হইবে, অথচ ইহার উন্নতিও বাঞ্ছনীয়" এই উভয় দিক রক্ষা করিয়া ডিপুটীর পরিবর্ত্তে দুই শত টাকা বেতনের ডিটেক্‌টিভের পদ প্রদান করেন। সেই সময় পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ডিটেক্‌টিভ বিভাগ C. I. D. সৃষ্টি হয় নাই। কালীকান্তই সর্ব্ব প্রথমে ডিটেক্‌টিভের পদ লাভ করিয়াছিলেন।

এই হইতে কালীকান্তকে আর পুলিশের পোষাক পরিধান করিতে হয় নাই, সাধারণ কোন তদন্তে যাইতে হয় নাই। জাল, জুয়াচুরী, খুনী, ডাকাতী প্রভৃতি কঠিন কঠিন তদন্ত, যাহা অপর কোন্ কর্ম্মচারী দ্বারা নিষ্পত্তি হইত না, সেই সকল স্থলে যাইতে হইত। তদন্ত করিয়া সত্য নির্ণয় করিবার শক্তিও কালীকান্তের যথেষ্ট ছিল। কৃতকার্য্যতার জন্য পুরস্কার স্বরূপে গবর্ণমেণ্ট

হইতে যে সমস্ত মুদ্রা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বসাকুল্যে প্রায় বিংশ সহস্রেরও অধিক হইল। ফকির, চাষা, বৈষ্ণব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধারণ করিয়া যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক সত্য নির্ণয় করিতেন, তাহা বস্তুতই বড় কৌতুহলোদ্দীপক। সময়ান্তরে তাহার দুই একটী ঘটনার অবতারণা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মহা পরীক্ষা।

তখন দেশের মধ্যে ছোট বড় সকলেই বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে, কালীকান্ত যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন, কমিশনার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির নিকট তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে। এমন কি, দাওয়ার বিচারের ফলও কালীকান্তের মতামতের উপর অনেকটা নির্ভর করে। এজন্য বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি মাত্রেই কালীকান্তকে স্বপক্ষে রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। ধনিগণ, দশ হাজার, বিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত উপস্থিত করিতেন। একবারে পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা কালীকান্তের নিকট উপস্থিত, এমন ঘটনাও কয়েকবার ঘটিয়াছে।

ধন্য কালীকান্ত! ধন্য তাঁহার হৃদয়ের বল। যে অর্থের প্রলোভনে মুনির মন পর্য্যন্ত প্রলুব্ধ হয়, রাজকীয় উচ্চ বিচারাসন পর্য্যন্ত কম্পিত হয়, আজ সেই অর্থের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া তিনি যে সাধুতার আদর্শ দেখাইলেন, তাহা আর কেহ বিস্মৃত হইতে পারিবে না। তাঁহার এই সাধুচরিত্র প্রসঙ্গ বাঙ্গালার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিনের জন্য স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

কালীকান্তের চরিত্র।

কালীকান্ত চরিত্রবান লোক ছিলেন। অহঙ্কার কাহাকে বলে,তাহা তিনি জানিতেন না। পরোপকার ভিন্ন, জীবনে, কাহারও কখনও অনিষ্ট চিন্তা করেন নাই। কোন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিও সাধ্যানুরূপ সদ্ব্যবহার করিতেন। ভারত-সাম্রাজ্যেশ্বরীর রাজত্বে দোষী ব্যক্তি অব্যাহতি পাউক, কিন্তু একজন নির্দ্দোষীও যেন দণ্ডিত না হয়, এই ভাব মনে রাখিয়া সর্ব্বদা কার্য্য করিতেন। এই সমস্ত কারণে দেশের ছোট বড় সকলেরই তিনি বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ঢাকার নবাব স্বর্গীয় আব্দুল গণি, কে-সি-এস-আই, জয়দেবপুরের রাজা স্বর্গীয় কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর, ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বাহাদুর, শ্রীনগরের বাবু, মূড়াপাড়ার বাবু প্রভৃতি এতদ্দেশীয় সমস্ত জমিদারগণের সঙ্গেই তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল।

কালীকান্ত নিজে দরিদ্রের সন্তান, জীবনের প্রারম্ভে দারিদ্র্য দুঃখ বিশেষরূপ ভোগ করিয়াছিলেন। দীন দুঃখী দেখিলে সে কথাটা তাঁহার স্মরণ হইত। কোন দরিদ্র সন্তান সাহায্যার্থী কিম্বা কার্য্যাপ্রার্থী হইয়া আসিলে পার্য্যমানে তিনি কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। কাহাকে বা নিজে আর্থিক সাহায্য করিয়া, কাহাকে বা কার্য্যের সংস্থান করিয়া দিয়া উপকার করিতেন। পাঠার্থী অনেক দরিদ্র সন্তানকে বাসায় রাখিয়া ভরণ পোষণ করিতেন। এজন্য জীবনে কিছুমাত্র অর্থ সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই, আর তাহার প্রয়োজনও বোধ করেন নাই। —"ন্যায়ার্জিত ধনোৎসর্গো সন্তঃসিধ্যেৎ ফলো পরম্।"—এ কথাটী সর্ব্বদাই আবৃত্তি করিতেন। নিজ জীবনে ইহারই একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন।

শেষ জীবন।

১২৮৫ সনে কালীকান্ত ৪১ বৎসর পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট কার্য্য করিয়া, ৬৫ বৎসর বয়সে, কার্য্য হইতে অবসর ও পেনসন গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি আর এদেশে বেশী দিন ছিলেন না। তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে যাঁহারা সমৃদ্ধিশালী, তাঁহারা অনেকেই তাঁহাদের জমীদারীর ম্যানেজার হইয়া থাকিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার করেন নাই। বৈষয়িক ব্যাপার হইতে দূরে থাকিয়া পরমার্থ চিন্তার জন্য পেনসন নেওয়ার কয়েক মাস পরেই কাশীধাম চলিয়া যা'ন।

জীবনের অবশিষ্ট বিশ বৎসর কাল কাশীধামেই অতিবাহিত করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি একবার তীর্থ-পর্য্যটন উপলক্ষে অযোধ্যা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। আর বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে বহুলোকের অনুরোধে, মাত্র কয়েক দিবসের জন্য ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আর এক দিনের জন্যও তিনি পুণ্যভূমি কাশীধাম পরিত্যাগ করেন নাই।

একমাত্র পুত্র তরণীকান্ত তখন নাবালক। সংসারে উপার্জ্জনশীল আর কেহই নাই। তাই পেনসনের টাকা হইতে অর্দ্ধাংশ সাংসারিক খরচের জন্য ঢাকায় পাঠাইতেন। বক্রী অর্দ্ধাংশ হইতে নিজের গ্রাসাচ্ছাদানোপযোগী যৎসামান্য রাখিয়া অবশিষ্ট দীন দুঃখীগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। নিরপেক্ষ ও নির্লোভ বলিয়া কাশীধামেও তাঁহার বিলক্ষণ সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল।

বিংশ বর্ষ কাল কাশী বাস করিয়া ১৩০৫ সনের ১৬ই বৈশাখ তারিখে কালীকান্ত ৮৫ বৎসর বয়সে স্বর্গধাম গমন করেন। মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তাঁহার শরীরে বেশ শক্তি সামর্থ্য ছিল। দেবদর্শন উপলক্ষে প্রতিদিন প্রায় এক ক্রোশের পথ পরিভ্রমণ তাঁহার নিত্য কর্ম্মের মধ্যে ছিল। কালীকান্ত অর্থপ্রয়াসী ছিলেন না, কিন্তু বিধাতার বিধানে পেনসন হইতেও তাঁহার যে অর্থ লাভ হইয়াছিল, তাহার সংখ্যাও চব্বিশ সহস্র মুদ্রা। বলাবাহুল্য এত দীর্ঘকাল পেনসন ভোগ অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না।

পরিশিষ্ট।

এই নশ্বর সংসারে ধন, জন, জীবন, যৌবন সকলই অস্থায়ী। একমাত্র কীর্ত্তিই অবিনশ্বর। কালীকান্ত এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অবিনশ্বর যে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন অক্ষয় থাকিবে। যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, আজও তাঁহারা তাঁহার জন্য অশ্রু-বিসর্জ্জন করেন। আর যাঁহারা তাঁহাকে দেখেন নাই, তাঁহারাও লোক পরম্পরায় তাঁহার সাধু আখ্যা শ্রবণ করিয়া, ভক্তিপ্রণত চিত্তে কালীকান্তের উদ্দেশে প্রণিপাত করেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বিগত ১৩০৭ সনের মাঘ মাসের প্রদীপ পত্রিকাতে প্রদীপ-সম্পাদক মহাশয় এই মহাত্মার একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছিলেন। অদ্য আমরাও তাঁহার সাধু জীবনের প্রসঙ্গ একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিলাম। মহাত্মা কালীকান্তের সুযোগ্য পুত্র পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী সরস্বতী মহাশয় সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত। নব্যভারত, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকাতে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্য ও বঙ্গীয় প্রাচীন কবি সম্বন্ধে

আলোচনা করিয়া, অল্পকাল মধ্যে বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন। আশা করি, তিনি তাঁহার পিতৃদেবের একটী বিস্তৃত জীবনী প্রকাশ করিয়া, সকলের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

মানব সমাজ। (১)

১৩১৫—এই শুভ বৎসরের পূর্ব্বে মনে ধারণা করিতেই পারিতাম না যে, চিরদাসত্বের সমর্থনের নিমিত্ত একটা ন্যায়শাস্ত্র প্রণীত হইতে পারে। কোন স্বনামবিখ্যাত ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিতেছেন, তাহা হইতেই প্রথম বুঝিতে পারি যে, আবশ্যক হইলে ওরূপ শাস্ত্রও রচনা করা যায়। মনুষ্যের সাধ্যাতীত কিছুই নাই। প্রথম প্রথম প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা হইতও এবং করিয়াছিও। কিন্তু এখন আর সে ইচ্ছা নাই। কেবল কয়েকটী স্থূল কথার আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

সমাজ পদার্থটী বুঝা বড়ই কঠিন। ব্যক্তির সমষ্টিতেই সমাজ। কিন্তু কেবল তাহাই নহে। ঐ সমষ্টি অপেক্ষাও সমাজ আর একটু বেশী।* সমাজ বুঝিতে হইলে ব্যক্তিকে বুঝা আগে আবশ্যক। কোন নির্দ্দিষ্ট মানব সমাজকে পরিচালন করিতে ঐ সমাজস্থ ব্যক্তিকে চিনা চাই; তাহাকে ব্যক্তি হিসাবে তো চিনা চাই-ই, জীব হিসাবেও চিনিতে হয়। সমাজ যেমন মানুষের আছে, তেমনই অনেক ইতর জীবেরও আছে, মানব ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে ইতর জীব হইতেই জাত হইয়াছে। তাই মানুষকে চিনিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব পুরুষগণকে অর্থাৎ ইতর জীবদিগকেও চিনা চাই। মানুষকে বিশ্ব হইতে পৃথক করিলে বুঝা যাইবে না। দেহে ও মনে মানুষ সমস্ত জীবের উত্তরাধিকারী, সে দেহ ও মনে পৃথিবীর ও জগতের সমস্ত পরিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত প্রতিঘাত বহন করিতেছে। সে বিশ্বের সহিত এক সূত্রেই গ্রথিত। তাই তাহাকে চিনিতে হইলে জীব জড় সমস্ত জগতের অংশরূপেই চিনিতে হয়। পৃথক করিয়া চিনিবার উপায় নাই। জড়বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান,—এ তিনের সম্যক আলোচনার পর মানবকে কিছু কিছু চেনা যাইতে পারে। এবং ব্যক্তিকে চিনিবার পর সমাজকে চিনিবার কিছু কিছু আশা করা যায়।

মানব-সমাজ বুঝা এত কঠিন। ইহাকে এক অর্থে মহাকাব্য বলিলেও কেবল কবি-কল্পনার সাহায্যে ইহাকে বুঝা যাইতে পারে না। উপরে যে ত্রিবিধ বিজ্ঞানের কথা বলিলাম, উহাদিগকে এক কথায় প্রকৃতি বলা যায়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যেরূপ ভাবে পরিজ্ঞাত থাকিলে মানবকে এবং মানব সমাজকে বুঝা যায়, সকল দেশেই সমাজের নেতৃগণ তাহা জানেন না। কিন্তু জীব-বিজ্ঞান না বুঝিয়া মানবকে বুঝিবার চেষ্টা করা একবারেই অসম্ভব। ইহা নেতৃগণ বুঝেন না, এবং জানেনও না।* মানুষের বিষয় সকলেই চিন্তা করে এবং মানব সমাজের বিষয়

* J. A. Thomson's Heredity.

* Ray Lankester, Kingdom of Man, p48.

সকলেই ভাবে। কিন্তু প্রকৃত রূপে ভাবিবার উপযোগীতা কয়জনের আছে? এ সম্বন্ধে সন্দেহ-শূন্য মত দিবার অধিকার বোধ হয় কাহারই নাই। কিন্তু যে রোগের প্রতি-বিধানে বহুদর্শী সুপণ্ডিত চিকিৎসক হতবুদ্ধি হইয়া যান, হাতুড়িয়া-বৈদ্য তাহা নিশ্চয় আরাম করিতে পারে বলিয়া অবপটে দ্বিধা-শূন্য ভাবে প্রচার করিয়া থাকে। যে যত জানে কম, যে যত বুঝে কম, সে ততই দৃঢ় মত পোষণ করে। জগতে এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার!

কোন কথাই বলা যায় না। কিন্তু প্রায় সকল সমাজের নেতৃগণই স্বরচিত বিধি-নিয়মের উপর এতদূর আস্থাবান যে, সকল কথাই নিশ্চিত রূপে বলিতে সাহসী হন; সকল বিধিই দৃঢ়তার সহিত অনুষ্ঠান করিতে সাহসী হন। জীব বিজ্ঞান, এমন কি, মানব তত্ত্ব পর্য্যন্তও জানিবেন না, অথচ মানব পরিচালন করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করেন। মানব সমাজ খেলা করিবার সামগ্রী নহে ইহার এক দিকে প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিলে শত দিকে অভাব-নীয়, অচিন্তনীয় ফল উৎপন্ন হয়। সে সমস্ত চিন্তা করা, সে সমস্ত ধারণা করা এক-বারেই অসম্ভব। স্পেন্সার দেখাইয়াছেন যে, ইংরেজ সমাজে সুরাপান নিবারণের চেষ্টা করায় নরহত্যা রূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। দরিদ্রের অন্ন সংস্থান করিতে গিয়া দারিদ্র্যকে আরও বাড়াইয়া তুলা হইল, তাহার উপর স্থানে স্থানে ব্যভিচার দোষ উৎপন্ন করা হইয়াছিল এমন যে সদনুষ্ঠান, তাহারও ফল কতদূর বিষময় হইল! ইহা কি পূর্ব্বে কেহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন? এতদ্দেশে জাতিভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রথমে কত সামাজিক মঙ্গল সাধন করিয়াছিল; কিন্তু আজি কে অস্বীকার করিতে পারেন যে, সেই মঙ্গল হইতেই কত অমঙ্গল সঞ্জাত হইয়াছে? এক দিকে বঙ্গ বিভাগ, আর এক দিকে বোমার মৃত্যুমি। কেহ কি কখন সম্ভব মনে করিয়া-ছিলেন যে, বঙ্গবিভাগ বোমাকে প্রশ্রয় দিবে? সমাজকে নাড়াচড়া করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। ব্যক্তিগত জীবন যেমন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হয়, সামাজিক জীবনও তেমনই নিয়মের অধীন। ব্যক্তিগত জীবনে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ যে সূত্রে গ্রথিত, সামাজিক জীবনেও তাহাই। একথা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করা চাই। ব্যক্তির প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত না হইলে ব্যক্তি-সমষ্টির অর্থাৎ সমাজের প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইবে না। যে কারণে যে কার্য্য ব্যক্তির জীবনে উৎপন্ন করিবে, অগ্রে তাহা বুঝা চাই। তৎপর ঐ কারণ সমাজে কি ফল উৎপন্ন করিবে, তাহা বুঝা যাইতে পারে। ব্যক্তি-তত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্ব এক না হইলেও এক সূত্রেই গ্রথিত।

জীব বিজ্ঞান শিখাইতেছে যে, এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীববস্তু-পূর্ণ কোষ ক্রমে বিভক্ত ও বিবর্ত্তিত হইতে হইতে নিম্নতম হইতে উচ্চতর জীবদেহ রচনা করিয়াছে। ঐ প্রাথমিক কোষের অঙ্গ বিভাগ ও ক্রিয়া বিভাগ কিছুই ছিল না। উহা ক্রমে বিভক্ত হইয়া বহু-কোষিক জীবদেহ গঠিত করিল। এ দেহে অঙ্গ বিভাগ ও ক্রিয়া বিভাগ ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। মানব সমাজেও তদ্রূপই। প্রাথমিক সমাজে অঙ্গভেদ ও ক্রিয়াভেদ ছিল না। আবশ্যকমত সকলেই সকল কর্ম্ম করিত। ক্রমে সমাজ দেহ যেমন বাড়িয়া

চলিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের নির্দ্দিষ্ট অংশ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে নিয়োজিত হইল; আর তখন হইতেই সমাজের অঙ্গ ভেদ ও ক্রিয়া ভেদ উৎপন্ন হইল। এইরূপে জীব বিবর্ত্তনের সহিত সমাজ বিবর্ত্তনের নিকট সম্বন্ধ লক্ষিত হইয়া থাকে।

তাহার পর ব্যক্তির কথা বিবেচনা করিতে হয়। পিতৃ মাতৃ শুক্র শোণিতে যে পিণ্ড উৎপন্ন হইয়া থাকে, ব্যক্তি তাহারই পরিণাম। সেই শুক্র শোণিত কত যুগ যুগান্তর হইতে কত কত পূর্ব্ব পুরুষগণের দেহ ও মনের উপাদান রাশি বহন করতঃ বর্ত্তমান পুরুষকে রচনা করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পুরুষ পরম্পরায় বিধিনিয়মের অধীন হইয়া সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোষদ্বয় কি উপকরণ লইয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগের সংমিশ্রণ কালে সেই সকল উপকরণ কিরূপ ভবে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া একীভূত হইয়া গেল, আর কেমন করিয়াই বা বর্ত্তমান পুরুষ রচনা করিল, এ সকল কথা পণ্ডিতগণ এখনও বুঝিতেই পারেন নাই, বলিলেই হয়। তবে যাহা কিছু বুঝিতে পারিতেছেন, তাহাতে এতদূর পর্য্যন্ত বলিতে পারা যাইতেছে যে, মানবকে কাদার মত যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া ভাঙ্গা গড়া যায় না। তাহার একটা জন্মগত ব্যক্তিত্ব আছে, যাহা শুক্র শোণিত সংমিশ্রনের কাল হইতেই নির্দ্দিষ্ট ও সম্পূর্ণ রূপে নিয়মিত। তাহার সেই ব্যক্তিত্ব হইতে এক কথাও এদিক ওদিক হইবার উপায় নাই।* তাহার জীবনে সেই ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত না হইতে পারে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে এক পথ হইতে অন্য তুল্য পথে ধাবিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তিত করিবার সাধ্য কাহারও নাই। যে বংশানুক্রম হেতু খর্ব্বাকার হইবে, তাহাকে কোন ক্রমেই দীর্ঘকায় করা যাইবে না। যে ঐ হেতু বশতঃ ধীর অথবা চঞ্চল হইবে, তাহাকে অন্যরূপ করা যাইবে না। যে পিণ্ড বুদ্ধির উপকরণহীন, তাহা হইতে কোনক্রমেই শঙ্করাচার্য্য উৎপন্ন হইবে না। তবে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থাধীনে যে পিণ্ড হইতে শঙ্করাচার্য্য উৎপন্ন হইল, তাহা অন্যবিধ অবস্থাধীনে বরাহমিহিরও হইতে পারিত, অথবা নাও পারিত। ভ্রূণতত্ত্ব হইতে ইহাই শিখিতে পাই যে, পুং কীট ও স্ত্রী ডিম্বের সংমিশ্রণে যে যুক্তকোষ উৎপন্ন হয়, তাহার সমস্ত শক্তি অবস্থাধীনে বিকশিত নাও হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে যাহা নাই, তাহা ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জীবনে কখনই আসিতে পারিবে না। শিক্ষা এ বিষয়ে নিতান্ত নিষ্ফল। যাহা আছে, শিক্ষা তাহাকে বাহির করিতে পারে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাকে প্রকটিত করিতে পারে, অথবা তাহা বিকাশের বাধক হইতে পারে, কিন্তু যাহা নাই, তাহা আনিতে পারিবে না। এই অর্থে ব্যক্তির দৈহিক বিকাশ পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট, সুতরাং মানসিক বিকাশও তাহাই। *

ব্যক্তির যদি এই অবস্থা হইল, তবে সমাজের অবস্থা কি হইবে? যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া সমাজ-দেহ গঠিত, যে সমস্ত শক্তি লইয়া সমাজ-শক্তি প্রতিষ্ঠিত,

* Nothing can arise in an organism unless the predisposition to it is pre-existent, for every acquired character is simply the reception of the organism upon a certain stimulous.
Weisman's Heredity Vol. p. 172.
also see p. 104.5.

* Mental condition is often caused by physical conditions.
Rentoul Race Culture 1906. p. 14.

তাহা কত যুগ যুগান্তরের ছায়া বহন করিতেছে, কত অতীত দেশ কালের পুঞ্জীকৃত উপাদানের পরিণাম! চিরাতীত কাল হইতে সমাজেরও দেহ ও মন, ব্যক্তির ন্যায় একটা নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া আসিতেছে। ব্যক্তির ন্যায় সমাজেরও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটা নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা কি হাতুড়িয়া বৈদ্যের ফুঁ ফাঁতে উড়িয়া যাইবে? ইহা কখনই হইতে পারে না। যে কারণ পরম্পরা যে কার্য্য উৎপন্ন করিয়াছে, তাহা উহাদিগের অনিবার্য্য ফল। ব্যক্তির ন্যায় সমাজ-দেহও বংশানুক্রম অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অন্তর্নিহিত শক্তি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা নিয়মিত হয়। * অতীত কাল হইতে ঐরূপই হইয়া আসিতেছে। এ তিনের পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে উভয় দেহেই পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করা অসম্ভব। সাময়িক বিধি নিষেধ দ্বারা সাময়িক লক্ষণ মাত্র উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু স্থায়ী পরিবর্ত্তন সিদ্ধ হইতে পারে না। স্থায়ী ফল উৎপন্ন করিতে হইতে স্থায়ী রূপে ঐ ত্রিবিধ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিতে হয়; ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ব্যক্তি ও সমাজের অন্তর্নিহিত বীজশক্তির পরিবর্ত্তন দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে, এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিক্রিয়াও অল্পকালে ফলোৎপাদন করে না। জীব যেমন এক হইতে বহু হইয়াছে, সরল হইতে জটিল হইয়াছে, সমাজেও তাহাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে জীবের ন্যায় সমাজেরও ক্রম-বিকাশ সিদ্ধ হইয়াছে। যদিও ক্রম-বিকাশ হইতে হইতে কখন বা অকস্মাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক ফল উৎপন্ন হয়, কিন্তু উহা সাধারণ নিয়ম নহে। এই কথা বুঝাইবার জন্যই পণ্ডিতগণ এই অবস্থাকে sport অর্থাৎ খেলা নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাঁহারা সাময়িক উৎপীড়ন অথবা একটা মিষ্ট কথা দ্বারা সমাজের গতি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চালিত করিতে ইচ্ছা করেন, আর তাহা হইতে স্থায়ী ফলের প্রত্যাশা করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। তিনি মর্লিই হউন, আর মিণ্টোই হউন, ইহা তাঁহাদিগের সাধ্যাতীত। জীব বহু হইয়াছে, সমাজও বহুবিধ আকার ধারণ করিবে। তাহা কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। যাঁহারা বহু সমাজকে মিশাইয়া "একাঙ্গত্ব" সাধন করিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁহারা বহুবিধ জীবকে আবার সেই মৌলিক একটী জীবকোষে পরিণত করিতে পারেন! উভয়ই তুল্য প্রকার দুরাশা মাত্র। জীব-তত্ত্ব না বুঝিয়া সমাজ-তত্ত্বের মত প্রকাশ করিলে, ফল এইরূপই হয়। দেহ ও মন একসূত্রে গ্রথিত; ব্যক্তি ও সমাজ এক নিয়মেই পরিচালিত। আর সে নিয়ম জীব-বিজ্ঞানের অন্তর্গত, সমাজ-তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীশশধর রায়।

* Heredity function and environment.

গীতার ঐতিহাসিকতা।

(গ) মহাভারতের ঐতিহাসিকতা।

খ্রীষ্টীয় মিসনারিগণ যখন গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে অথবা গীতার আধুনিকত্ব প্রমাণ করিতে অসমর্থ হইতেছেন বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা আর এক যুক্তির আশ্রয় লইলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, আদিম মহাভারতে পাণ্ডবাদির কোন কথা ছিল না, উহা পরে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু পাণ্ডব লইয়াই মহাভারত রচিত হইয়াছে। মহাভারত হইতে যদি পাণ্ডবদিগকে অপসৃত করা যায়, তাহা হইলে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা লোপ পায়। এখন দেখা যাউক, তাঁহাদের এই যুক্তি টিকে কিনা।

প্রথমতঃ পাশ্চাত্যেরা ভারতবর্ষে যে এক মহাকাব্য (Epic) প্রচলিত ছিল, তাহা Dion Chrysostorn লিখিত একখানি পুস্তক হইতে প্রথমে অবগত হন। কিন্তু Dion যে কোথা হইতে এই তথ্য অবগত হইয়াছিলেন; তাহা তাঁহারা পরিজ্ঞাত নহেন। Dion ৮০ খ্রীঃ অব্দের লোক; কিন্তু খ্রীষ্টজন্মের বহুপূর্ব্বে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন; সেই বুদ্ধদেবের আবির্ভাবেরও বহুপূর্ব্বে যে মহাভারত প্রচলিত ছিল, ললিতবিস্তর ও আদি পালিভাষায় লিখিত বহু বৌদ্ধগ্রন্থ হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, কল্পসূত্র-প্রণেতা কাত্যায়ন পাণিনির একখানি বার্ত্তিক লিখিয়াছিলেন। এই বার্ত্তিকে মহাভারতোক্ত ইতিহাসের বিবরণ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যদের মতে কাত্যায়ন খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক। সুতরাং খ্রীষ্ট জন্মের বহুপূর্ব্বে মহাভারত প্রচলিত ছিল।

তৃতীয়তঃ, কাত্যায়নের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে আশ্বালায়ন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তৎপ্রণীত গৃহ্যসূত্রে (৩—৪) মহাভারতের উল্লেখ আছে। ইহা ভিন্ন খ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্ব্বকায় আপস্তম্ভ ও শাঙ্খালায়ন গৃহ্যসূত্রে ভারত ও মহাভারতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

চতুর্থতঃ, পতঞ্জলি "অসি দ্বিতীয়োঽনুসসার পাণ্ডবম্"—এই উদাহরণের দ্বারা মহাভারতকে লক্ষ্য করিতেছেন। সুতরাং পতঞ্জলির পূর্ব্বে যে মহাভারত ছিল, তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে।

পঞ্চমতঃ, পতঞ্জলি যে ব্যাকরণের মহাভাষ্য লিখিয়াছেন, সেই পাণিনি ব্যাকরণই মহাভরতের ঐতিহাসিকতার জলন্ত প্রমাণ। এই ব্যাকরণখানি একটী অতি প্রাচীন পুস্তক। এমন কি, ইংরাজ পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। গোল্ডষ্টুকার সাহেব বলেন যে, পাণিনি খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। ম্যাকস্‌মুলার বলেন যে, খ্রীষ্ট জন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মান্দ্রাজের অন্তর্গত থিয়োজফিক্যাল্ সোসাইটীর এডিয়ার পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ভাষ্যাচারির (N. Bhashyacharya) "The Age of Patanjali" নামক গ্রন্থে বহুগবেষণা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পতঞ্জলি খ্রীঃ পূঃ ৯ম

হইতে ১০ম শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হন। তিনি পাণিনি-ব্যাকরণের একখানি মহাভাষ্য লিখিয়াছিলেন। তিনি যখন খ্রীঃ পূঃ দশম শতাব্দীর লোক, তখন পাণিনি যে তাহার পূর্ব্বকার, তাহা বলাই বাহুল্য। ডাক্তার মার্টিন হোগ পাণিনিকে খ্রীঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পাণিনি যে মহাভারত-প্রতিপাদ্য বিষয় অবগত ছিলেন, তাহা অষ্টাধ্যায়ীর ৪।১।৪৫, ৪।৩।৯৮, ৬।৩।৭৫, ৮।৩।৩৫, প্রভৃতি সূত্র পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায়। ইহা ভিন্ন, আমরা পাণিনি ব্যাকরণে নিম্নলিখিত সূত্রগুলি পাইয়া থাকি। যথা,—

(১) "মহান্ ব্রীহিগৃষ্টীষাসজাবালভারভারত হৈলিহিল রৌরব প্রবৃদ্ধেষু।" (৬—২—৩৮)

অর্থাৎ ব্রীহি প্রভৃতি শব্দের পূর্ব্বে মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে একটী শব্দ 'ভারত'। সুতরাং আমরা 'মহাভারত' নাম পাইলাম।

(২) "গবিযুধিভ্যাং স্থিরঃ"। (৮-৩-৯৫) অর্থাৎ গবি ও যুধি শব্দের পর স্থির শব্দ প্রয়োগ হইলে উহার 'স' স্থানে 'ষ' হইয়া থাকে। এখানে আমরা 'যুধিষ্ঠির' নাম পাইলাম।

(৩) "বহ্বচ ই ঞ প্রাচ্যভরতেষু"। (২-৪-৬৬) এস্থলে সিদ্ধান্তকৌমুদী ভারত গোত্রের উদাহরণ "যুধিষ্ঠিরাঃ" দিয়াছেন।

(৪) "স্ত্রিয়ামবন্তি কুন্তি কুরুভ্যশ্চ" (৪-১-৭৬) এস্থলে 'কুন্তি' নাম পাওয়া গেল।

(৫) "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন" (৪-৩-৯৮) অর্থাৎ, বাসুদেব ও অর্জ্জুন শব্দের পরে ষষ্ঠ্যার্থে বুন্ হয়। এখানে বাসুদেব ও অর্জ্জুনের নামও পাওয়া যাইতেছে।

(৬) "নভ্রাণ্ নপান্নবেদানাসত্যানমুচি নকুলনখনপুংসকনক্ষত্রনক্রনাকেষু"। (৬-৩-৭৫) এখানে 'নকুলের' নাম পাওয়া যাইতেছে।

(৭) "ধর্ম্মেণ স্ম কুরবো যুধ্যন্ত" (৩-২-১১৮) এখানে 'কুরুদের' নাম পাওয়া যাইতেছে।

(৮) "দ্রোণপর্ব্বতজীবন্তাদন্যতরস্যাম্।" (৪-১-১০৩) এখানে 'দ্রৌণায়ন' শব্দ পাওয়া যাইতেছে। 'দ্রৌণায়ন' অর্থে কেবল অশ্বত্থামাকেই বুঝাইয়া থাকে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত সূত্রগুলি হইতে পাণ্ডবাদির নাম পাওয়া গিয়া থাকে।

পাণিনি ব্যাকরণোক্ত উপরিলিখিত প্রমাণগুলি ভিন্ন বেদোক্ত কোন কোন ব্রাহ্মণে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমকালবর্ত্তী বা অচির পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণের উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে পারাশর্য্য (বেদব্যাস) ও তৎশিষ্য বৈশম্পায়নের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পরীক্ষিৎ ও জনমেজয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"এতেন হবা ঐন্দ্রেণ মহাভিষেকেন তুবন্ত কাবষেয়োঃ জনমেজয়ং পারীক্ষিতমভিষিষেচ তস্মাদ্ জনমেজয়ঃ পারীক্ষিতঃ সমন্তং সর্ব্বতঃ পৃথিবীং জয়ন্ পরীয়াচ।" (৮-২১)।

শতপথ ব্রাহ্মণে অর্জ্জুনের উল্লেখ আছে। ইহাতে আমরা আরও পরীক্ষিৎ ও জনমেজয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা,—

"এতেন ঐন্দ্রতোদৈবাপঃ শৌনকঃ। জনমেজয়ং পারীক্ষিতং যাজয়াং চকার তেনেষ্ট্বা সর্ব্বাং পাপকৃত্যাং সর্ব্বাং ব্রহ্মহত্যামপজঘান।" (১৩-৫-৪-১)।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় পাঠকে ধৃতরাষ্ট্রের নাম পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন বাজসনেয়-সংহিতায়

'অর্জ্জুনের' উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যজুর্ব্বেদে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, কুরু ও পাঞ্চালের কুটুম্বিতায় কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

কোন পুস্তকের নাম এবং ঐ পুস্তকের নায়কদিগের নাম এবং তাহাদের ঘটনা সকল যদি অপর কোন পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে শেষোক্ত পুস্তক প্রণয়নের সময় প্রথমোক্ত পুস্তকখানি প্রচলিত ছিল। সুতরাং পাণিনির সময় যে মহাভারত এবং মহাভারতোক্ত নায়কগণের নাম প্রচলিত ছিল,তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, পাণিনি খ্রীষ্ট জন্মের দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং মহাভারত যে ঐ সময়েরও পূর্ব্বকার, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এতদ্ সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর মত এই যে, "তবে ইহা স্থির যে, খ্রীষ্টের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদির বৃত্তান্ত সংযুক্ত মহাভারত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। এমন প্রচলিত যে পাণিনিকে মহাভারত ও যুধিষ্ঠিরাদির ব্যুৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। আর ইহাও সম্ভব যে,তাঁহার অনেক পূর্ব্বেই মহাভারত-প্রচলিত হইয়াছিল। কেননা, "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং ব্যূন্" এই সূত্রে 'বাসুদেব' ও অর্জ্জুনক' শব্দ এই অর্থে পাওয়া যায় যে, বাসুদেবের উপাসক, অর্জ্জুনের উপাসক। অতএব পাণিনিসূত্র প্রণয়নের পূর্ব্বেই কৃষ্ণার্জ্জুন দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। * * * * কৃষ্ণ এত প্রাচীন কালের যে, পাণিনির সময়ে উপাস্য বলিয়া আর্য্য সমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন।"

ডাক্তার দহলমান (Dr. Dahlman) আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র, পাণিনির ব্যাকরণ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, বুদ্ধদিগের জাতক এবং জৈনদিগের ধর্ম্ম কথার উপাখ্যানগুলির সাদৃশ্য দেখিয়া এবং অন্যান্য প্রমাণের আলোচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বর্ত্তমান মহাভারতের কাব্যাংশ খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে অতি সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে বর্ত্তমান ছিল।

(খ) শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা।

পূর্ব্বোক্ত মিসনারিগণ মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব নষ্ট করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপর আক্রমণ করিতেছেন। তাঁহারা অবগত আছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের একজন প্রধান নায়ক। যদি কোন ক্রমে শ্রীকৃষ্ণকে মহাভারত হইতে দূরীভূত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে গীতার জন্য আর কাহারও তত আগ্রহ থাকিবে না এবং তাহা হইলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে। ঐ সকল ইংরাজগণ ঘোষণা করিতেছেন যে, কৃষ্ণ বলিয়া আদৌ কোন ব্যক্তি ছিলেন না এবং তাঁহার নামও মহাভারতে উক্ত হয় নাই, পরে তাঁহাকে মহাভারতের ভিতর অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এই যুক্তি কতদূর বলবতী, তাহা দেখা যাউক।

এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে, অন্যত্র যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা প্রয়োজন। গ্রীক যবন মেগাস্থিনিস্ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, তখন মথুরায় কৃষ্ণপূজা প্রচলিত ছিল। ইহাতে Macdonell সাহেব বলেন যে, সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজিত হইতেন।

ইহা খ্রীষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর কথা। তখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এখন দেখা যাউক, বৌদ্ধগ্রন্থে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে কিনা। প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থ সূত্র-পিটকে কৃষ্ণ অসুর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ললিতবিস্তরের একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা —"প্রতিকৃতী রুদ্রস্য কৃষ্ণস্য বা।" ইহা ভিন্ন গুর্জ্জর রাজাদের ৪র্থ শতাব্দীস্থ তাম্রলিপিতে কৃষ্ণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা— "শ্রীমহাজন্মাকৃষ্ণহৃদয়াহিতাস্পদঃ কৌস্তুভ মনিরিব।" ২য় শতাব্দীস্থ আর একটী তাম্রলিপিতে শ্রীকৃষ্ণের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা "কৃষ্ণয়সস্য আরাম।" নসীকের নিকটবর্ত্তী একটী পর্ব্বতগুহায় খোদিত লিপিতে শ্রীকৃষ্ণাদির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—"রামকেশ-বোর্জ্জুনভীমসেনতুল্যপরাক্রম।" ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, কৃষ্ণ-প্রসিদ্ধি নূতন নহে। এইবার হিন্দুশাস্ত্রোক্ত প্রমাণ সকলের আলোচনা করা যাউক।

খ্রীষ্ট জন্মের কিছু পরেই যে, সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া পাশ্চাত্যরা অনুমান করিয়া থাকেন, সেই সকল গ্রন্থে কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ পাওয়া যায় কিনা, তাহাই প্রথমে আলোচনা করা যাইতেছে। তাহার পর খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্বে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা, সেই সকল গ্রন্থে কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ পাওয়া যায় কিনা, তাহার আলোচনা পরে করা যাইবে। পাশ্চাত্যদের মতে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে সঞ্জয়বিজয় নামক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থে আমরা কৃষ্ণকে অবতার বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাই। যথা,—"রামকৃষ্ণাদ্যবতারবিভেদেন" ইত্যাদি। তাঁহাদের মতে বাসবদত্তা খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ হইতে ৭ম শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছে। সেই বাসবদত্তাতে হরিবংশের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—"হরিবংশৈরিব পুষ্কর প্রাদুর্ভাব রমণীয়ৈঃ।" হরিবংশে যে শ্রীকৃষ্ণাদির কথা পাওয়া যায়, তাহা উল্লেখ করাই বাহুল্যমাত্র।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকের মত এই যে, খ্রীষ্টজন্মের অনেক পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছে। শ্রীরামের বহু ব্যবহিত অধস্তনপুরুষ রাজা বৃহদ্বল ভারত-সমরে অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন (বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ৪র্থ অধ্যায়)। মহাভারতে রাম-চরিত ও রাম নাম মধ্যে মধ্যে কীর্ত্তিত দেখিতে পাওয়া যায় (বনপর্ব্ব, ৮৫ অধ্যায়)। বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারতে (সভা, ৮ অধ্যায়) আমরা দেখিতে পাই যে, যুধিষ্ঠির অযোধ্যাধিপতি বৃহদ্বলের সমসাময়িক ছিলেন। এই বৃহদ্বল আবার শ্রীরামের ৬ পুরুষ অধস্তন ছিলেন (মহাভারত, বন, ২৭৫-২৯০)। এই সকল কারণে অনেকে বলেন যে, মহাভারত রচিত হইবার পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছে। আমরা রামায়ণে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা,—

"উৎপৎস্যতেহি লোকেঽস্মিন্ যদূনাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
বাসুদেব ইতিখ্যাতো বিষ্ণুঃপুরুষবিগ্রহঃ॥ ২০
ভারাবতরণার্থং হি নরনারায়ণাবুভৌ।
উৎপৎস্যেতে মহাবীর্য্যো কলৌযুগ উপস্থিতে॥ ২২
(উত্তর—৬৩)

অর্থাৎ যদুবংশীয়গণের কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ বাসুদেব নামে বিখ্যাত ভগবান বিষ্ণু পুরুষদেহ ধারণ করিবেন। কলিযুগ উপস্থিত হইলে, সেই মহাবীর্য্যবান্ নর এবং নারায়ণ ঋষি

ধরাভার হরণ করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন। আমরা রামায়ণের এই স্থলে বিষ্ণুর অবতার বাসুদেবের উল্লেখ পাইতেছি। সুতরাং মহাভারত রচিত হইবার পূর্ব্বেও যে বাসুদেব বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন, তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে।

কালিদাসের মেঘদূতে (১।১৫), ললিতবিস্তরে (১১ অধ্যায়), খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে খোদিত লিপিতে (Journal of the R. A. S. N. S., Vol I) এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (১।৪।৯২, ৪।১।১৪, ৫।৩।৯৯) কৃষ্ণ প্রসঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পতঞ্জলি লিখিয়াছেন যে—"নারদোঽপি অথ কৃষ্ণস্য পরম্ মেনে * * * শাশ্বতত্ত্বম্" (১২।২০৭।৪৮)। পাণিনি "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাম্ বুন্" (৪।৩।৯৮) —এই সূত্রের দ্বারা বাসুদেব অর্থে শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

পাণিনিতে 'কৃষ্ণ' শব্দটীর উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু 'বাসুদেবের' দ্বারা যে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করা হয়, তাহা শ্রীমদভাগবতের দশম স্কন্ধের ৬৬ অধ্যায়োক্ত পৌণ্ড্রক রাজার উপাখ্যান হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। পৌণ্ড্রক রাজা তাঁহার পরিষদগণের তোষামদে মত্ত হইয়া নিজেকে 'বাসুদেব' বলিয়া স্থির করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে একদা বলিয়া পাঠাইলেন যে, "আমিই একমাত্র বাসুদেব, —অন্য কেহ নহে, প্রাণীদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছি। তুমি মিথ্যা 'বাসুদেব' নাম পরিত্যাগ কর। হে যাদব! তুমি মূঢ়তাবশতঃ আমার যে সকল চিহ্ন ধারণ করিতেছ, সে সকল পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট শরণাগত হও; নতুবা আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর।" উহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈঃশব্দে হাসিয়া উঠিলেন এবং তৎপর তাঁহাকে যুদ্ধদান করিতে উদ্যোগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধস্থানে গিয়া দেখিলেন যে পৌণ্ড্রক, শঙ্খ, শ্রেষ্ঠ খড়্গ, গদা, শার্ঙ্গধনু ও শ্রীবৎস-চিহ্নে চিহ্নিত হইয়াছেন; কৌস্তুভ ধারণ করিয়াছেন; বনমালায় ভূষিত হইয়াছেন; পীতবর্ণ পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিয়াছেন এবং অমূল্য চূড়াভরণ ধারণ করিয়াছেন। তাহার কর্ণে মকর কুণ্ডল শোভমান। কৌষেয় বসন পরিধান করিয়া সে কৃত্রিম গরুড়োপরি উপবিষ্ট রহিয়াছে। রঙ্গ প্রবিষ্ট নটের ন্যায়, কৃত্রিম বেশধারী সেই পৌণ্ড্রককে আত্মতুল্য দর্শন করিয়া, হরি অত্যন্ত হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—"অহে পৌণ্ড্রক! তুমি আমাকে যে সকল অস্ত্র ত্যাগ করিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলে, আমি তোমার প্রতি সেই সকল অস্ত্র ত্যাগ করি। তুমি অনর্থক আমার যে নাম ধারণ করিয়াছ, তাহা পরিত্যাগ করাই।" এই বলিয়া চক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন।

উপরে লিখিত পৌণ্ড্রক রাজার উপাখ্যান হইতে আমরা অবগত হইতেছি যে, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণই 'বাসুদেব' নামে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং পাণিনিতে যে বাসুদেবের কথা উল্লেখ আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করিতেছে।

'কৃষ্ণ' শব্দটী পাণিনিতে না থাকিলেও ঋগ্বেদসংহিতার অনেক স্থলে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋকে এবং ১১৬ সূক্তের ৭ ঋকে 'কৃষ্ণের' উল্লেখ আছে। এই কৃষ্ণ যে কে, তাহা বলা দুরূহ।

পাণিনির সূত্রেতে আমরা নিম্নলিখিত উদাহরণ গুলি দেখিতে পাই। যথা—"কংসং বধমাচষ্টে" ও "কংস ঘাতয়তি" (৩-১-২৬) (২) "জঘান কংসং কিল বাসুদেব" (৩-২-১১) (৩) "অসাধুর্মাতুলে কৃষ্ণঃ" (২-৩-৩৬) এবং "সঙ্কর্ষণ দ্বিতীয়স্য বলং কৃষ্ণস্য বর্দ্ধতাম" (২-২-২৩)। এই সকল উদাহরণ গুলি যে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের খিল কাণ্ডে আমরা শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা,—"উদ্ধৃতানি বরাহেন কৃষ্ণেণ শত বাহন।" ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের খিল সূক্তে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ আছে। যথা,—"কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশ বাসুদেব নমোঽস্তুতে" ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের ১৭শ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"অথৈতদ্ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকী পুত্রায় উক্ত্বা উবাচ। অপি পাস এব স বভূব। সোঽন্তবেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেত অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি।"

অর্থাৎ, আঙ্গিরস বংশীয় ঘোর নামা এক জন ঋষি দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া বলিলেন যে, অন্তকালে এই তিনটী কথা অবলম্বন করিবে, "তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, এবং তুমি প্রাণ সংশিত।"

উপনিষদ হইতে আরণ্যক প্রাচীনতর। আমরা সেই আরণ্যকের মধ্যে তৈত্তরীয় আরণ্যকে (১০-৬-৬) কৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই। কিন্তু আবার আরণ্যক হইতে ব্রাহ্মণ আরও প্রাচীনতর। আমরা কৌষীতকী ব্রাহ্মণে পূর্ব্বোক্ত আঙ্গিরস ঘোরের নাম এবং কৃষ্ণেরও নামের উল্লেখ দেখিতে পাই। সেখানে কৃষ্ণ দেবকীপুত্র বলিয়া বর্ণিত হন নাই, আঙ্গিরস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আমরা পুরাণাদিতে দেখিতে পাই যে কতকগুলি সূর্য্যবংশীয় রাজা আঙ্গিরস বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। হরিবংশে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—"ইক্ষ্বাকুবংশাদ্ধি যযুবংশো বিনিঃসৃত" (বিষ্ণুপর্ব্ব, ৯৫। ৫৩৯),—অর্থাৎ মথুরার যাদবেরা সূর্য্যবংশীয়। সুতরাং খুব সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণও আঙ্গিরস ছিলেন।

বেদে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, পূর্ব্বোক্ত আঙ্গিরস ঋষির পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি ছিল। ইঁহারা সকলেই ঋষি ছিলেন। ঘোরের পুত্রের নাম কণ্ব। কণ্বের পুত্রগণের নাম মেধাতিথি ও প্রস্কণ্ব। কণ্ব, ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৩৬ সূক্ত হইতে ৪৩ সূক্তের ঋষি। মেধাতিথি ঐ মণ্ডলের ১২ হইতে ২৩ সূক্তের ঋষি। প্রস্কণ্ব ঐ মণ্ডলের ৪৪ হইতে ৫৫ সূক্তের ঋষি। ঘোরের পুত্র ও পৌত্রদ্বয় যদি ঐসকল সূক্তের বক্তা হন, তাহা হইলে, ঘোরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সমসাময়িক।

আমরা ঋগ্বেদে দেখিতে পাই যে, এক জন কৃষ্ণ অনেকগুলি সূক্তের ঋষি; যেমন অষ্টম মণ্ডলের ৮৫, ৮৬ ও ৮৭ সূক্তের এবং দশম মণ্ডলের ৪২, ৪৩ ও ৪৪ সূক্তের ঋষি। অনেকে হয়তো বলিতে পারেন যে, এই ঋষি কৃষ্ণ, ক্ষত্রিয়-নন্দন কৃষ্ণ নহেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় হইলে যে ঋষি হইতে পারা যায় না, এমন কিছু মানে নাই। বেদে শূদ্র ঋষিদের নামেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন অজমীঢ়, মান্ধাতা, প্রতর্দ্দন প্রভৃতি ক্ষত্রিয় ঋষিদের নামেরও উল্লেখ আছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণ-ঋষি ক্ষত্রিয় নন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইলে হইতে পারেন—সে বিষয়ে কোন আপত্তি করিবার কারণ নাই। যিনি

ঋষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে ঋষি বলিলে কোন দোষ হয় না।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠকের ১ম অনুবাকে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ঋষির পরিবর্ত্তে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া দেখিতে পাই। যথা,—"নারায়ণায় বিদ্মহে, বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ।" আমরা এখানে বাসুদেবের কথা পাইতেছি। কিন্তু বাসুদেবের দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করা হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা ইহাও অবগত হইতেছি যে, যখন বেদসঙ্কলিত হইয়াছিল, তখনও শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পুজিত হইয়াছিলেন।

বেদের অনেকস্থলে কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। কৃষ্ণ নামে একজন ঋষি ছিলেন, কৃষ্ণ নামে একজন অনার্য্য রাজা ছিলেন। সুতরাং পাণিনিতে যদি 'কৃষ্ণ' শব্দের উল্লেখ থাকিত, তাহা হইলে তাহা বাসুদেব কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতার প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে নাও পারিত। কিন্তু রামায়ণে, পাণিনিসূত্রে, বেদসংহিতায় এবং অন্যান্য স্থানে "বাসুদেব" নাম পাওয়াতে আমরা উহাকে শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতার প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিতে পারি।

বেদব্যাস বেদসঙ্কলন করিয়াছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ আছে, সেই প্রবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ বেদব্যাসেরও সমসাময়িক।

এখন বেদব্যাসের বেদ সঙ্কলন সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহা কতদূর সত্য, তাহা দেখা যাউক। বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তুং প্রচক্রমে
অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্॥"

অর্থাৎ, ব্রহ্মার আদেশক্রমে ব্যাস বেদসমূহের সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বেদপারগ চারিজন শিষ্যকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই চারিজন শিষ্যের নাম পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তু। বেদব্যাসের বহু পূর্ব্বে ঋক, যজুঃ সাম ও অথর্ব্ববেদের মন্ত্র সকল প্রচলিত ছিল। তাঁহার পূর্ব্বতন ঋষিগণ বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে ঐ সকল মন্ত্র আর্য্যসমাজে প্রচারিত করিয়াছিলেন। বেদব্যাস শিষ্যদিগের সাহায্যে সেই সকল মন্ত্র একত্র সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। তিনি বেদ চতুষ্টয়ের ব্যাস (Compiler) মাত্র, কর্ত্তা বা রচয়িতা (Author) নহেন।

বেদ চতুষ্টয়ের সংকলন সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজূংষিচ যজুর্ব্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ॥
রাজ্ঞস্বথর্ব্ববেদেন সর্ব্ব কর্ম্মাণি স প্রভুঃ।
কারয়ামাস মৈত্রেয় ! ব্রহ্মতত্ত্বঞ্চ যথাস্থিতি॥"
(৩।৪।১৩—১৪)

অর্থাৎ পরে ব্যাস ঋক্ সমূহের উদ্ধার করিয়া ঋগ্বেদ সঙ্কলন করিলেন; যজুঃ সমূহের উদ্ধার করিয়া যজুর্ব্বেদ এবং সাম সমূহের উদ্ধার করিয়া সামবেদ সঙ্কলন করিলেন। এবং তিনি অথর্ব্ব বেদের দ্বারা যথা বিধানে ব্রহ্মত্ব স্থাপন এবং রাজার সমুদয় কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিলেন।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, বেদের মন্ত্র সকল পূর্ব্ব হইতে বিক্ষিপ্ত আকারে বর্ত্তমান ছিল। ব্যাসদেব ঐ সকল মন্ত্র সংগৃহীত করিয়াছিলেন। যেমন বঙ্গদেশে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী

কবিওয়ালাদিগের গীত সমুদয় একত্র করিয়া সঙ্কলন করিয়াছিলেন, অথবা যেমন ইংলণ্ডে বিসপ পার্শি (Percy) প্রাচীন গাথা সমূহ (ballads) সংগৃহীত করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্যাসদেব বেদসংহিতার মন্ত্র সকল সংগৃহীত (compile) করিয়াছিলেন।

সুতরাং বেদব্যাস যে বেদসঙ্কলন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে, সেই প্রবাদ মিথ্যা নহে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ বেদসংগ্রহকর্ত্তা বেদব্যাসের সমসাময়িক; তিনি উপন্যাসের কল্পিত নায়ক নহেন।

(ঙ) পুরাণের ঐতিহাসিকতা।

পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের বিষয় বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং পুরাণ যে শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ করিতেছে, তাহাতে আর কাহারও দ্বিমত নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য বিদেশীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে পুরাণ সকল আধুনিক। সহস্র বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে। পুরাণগুলি এমন আধুনিক যে উহারা কালিদাসের পরে রচিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আমরা পুরাণগুলিকে বিশ্বাস করিতে পারি না।

এ যুক্তির যে সারবত্তা কতদূর, তাহা বিবেচ্য। আমরা কালিদাসের মেঘদূতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী দেখিতে পাই। যথা,—

"যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমালপস্যতে
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ।"
(১১৫ শ্লোক)

এখানে ময়ুর পুচ্ছ দ্বারা উজ্জ্বল বিষ্ণুর গোপবেশের সহিত ইন্দ্রধনু-শোভিত মেঘের তুলনা করা হইয়াছে। বিষ্ণুর কোন কালে গোপবেশ ছিল না, বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণেরই গোপবেশ ছিল। শ্রীকৃষ্ণেরই ময়ুর পুচ্ছ চূড়া ছিল। কিন্তু এই ময়ুরপুচ্ছ চূড়ার কথা এক পুরাণ এবং তদনুবর্ত্তী কাব্য ভিন্ন, বেদে মহাভারতে এবং রামায়ণে নাই। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে,যে কালিদাসের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ সংক্রান্ত হরিবংশ অথবা কোন বৈষ্ণব পুরাণ প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে, খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে কালিদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন; সুতরাং খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর পূর্ব্বেও যে পুরাণ প্রচলিত ছিল, তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে।

পুরাণের পৌরাণিকতা সম্বন্ধে আরও অন্যান্য প্রমাণ আছে। পুরাণের কথা, শতপথ ব্রাহ্মণে, গোপথব্রাহ্মণে, আশ্বলায়নসূত্রে অথর্ব্বসংহিতায়, বৃহদারণ্যকে, ছান্দোগ্যোপনিষদে, মনুসংহিতায়, মহাভারতে এবং রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে। দুই একটী প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

আশ্বলায়নসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"আয়ুষ্মতাং কথাঃ কীর্ত্তয়ন্তো মাঙ্গল্যানীতিহাস পুরাণানীত্যাখ্যা পয়মানাঃ।"
(আশ্বগৃহ্য, ৪।৬)

কোন সময়ে নারদ ভগবান্ সনৎকুমারের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট বিদ্যা যাচ্ঞা করেন। তাহাতে সনৎকুমার নারদকে প্রশ্ন করিলেন যে, তুমি কি কি বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহার পরিচয় বল; তদুপরে যাহা শিক্ষণীয় তাহা শিখাইব। তদুত্তরে নারদ বলিলেন,—

"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাস পুরাণং পঞ্চমং বেদানাংবেদং * * * ভগবোঽধ্যেমি।"

(ছান্দোগ্য—৭—১—২)

অর্থাৎ, আমি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি; যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন

করিয়াছি; পঞ্চম বেদ ইতিহাস পুরাণও অধ্যয়ন করিয়াছি।

বৃহদারণ্যকের ২য় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ সদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণঃ বিদ্যা * * *।" (২—৪—১০)

এই তালিকায় পুরাণের কথাও পাওয়া যায়। সুতরাং বৃহদারণ্যক রচনায় পূর্ব্ব-কালেও ইতিহাস এবং পুরাণ বর্ত্তমান ছিল।

অথর্ব্ববেদে উক্ত হইয়াছে যে,—

"ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ।"

(অথর্ব্ব—১১—৭—২৪)

এখানে পুরাণের কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের অপেক্ষাও প্রাচীনতর শতপথব্রাহ্মণের একাদশ ও চতুর্দ্দশ কাণ্ডে চারিবেদ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতির কথা আছে। সুতরাং পুরাণ আধুনিক কালে রচিত নহে। বৈদিক সাহিত্য-সকল, রামায়ণ এবং মহাভারত বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে যে রচিত হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে পুরাণ বলিয়া একপ্রকার সাহিত্য (literature) চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, আধুনিক পুরাণগুলি এখন যে আকৃতিতে পাওয়া যায়, পুরাকালে উহারা ঐরূপ ভাবে রচিত হয় নাই। আদি অবস্থার পুরাণের নাম পুরাণ-সংহিতা, উহা অতি প্রাচীন আর্য্যসংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল। পরে উহা হইতে ১৮শ পুরাণ রচিত হইয়াছে।

বৈদিক সাহিত্যে আমরা পুরাণ বলিয়া যে সাহিত্যের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা কেমন করিয়া এবং কখন ব্রহ্ম, বিষ্ণু, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি অষ্টাদশ পুরাণে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহা বিবেচ্য। আপস্তম্বগৃহ্য সূত্রে আমরা অন্ততঃ একখানি পুরাণের উল্লেখ দেখিতে পাই। ভবিষ্যপুরাণ হইতে আপস্তম্ব-গৃহ্যসূত্রে কিঞ্চিৎ বিষয় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা আর্য্যসংস্কৃতে রচিত। কিছুদিন পূর্ব্বে জাবাদ্বীপ হইতে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, অন্ততঃ ৫০০ খ্রীঃ অব্দে উহা জাবাদ্বীপে নীত হইয়াছিল। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের মহারাজের পুস্তকাগারে স্কন্দপুরাণের অংশ-বিশেষ পুঁথি আকারে পাইয়াছেন। ইহাও স্থীর হইয়াছে যে, অন্ততঃ ৬০০ খ্রীঃ অব্দ হইতে এই পুঁথি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা পুরাণগুলি আধুনিক কালে রচিত বলিয়া যে মত প্রকাশ করেন, তাহা যে অন্তঃসারশূন্য, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ভবিষ্যপুরাণের অংশ-বিশেষ আপস্তম্বসূত্রে গৃহীত হওয়ায়, আমরা ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া বলিতে পারি যে বৌদ্ধ-যুগের পূর্ব্বে ১৮শ পুরাণ সকল রচিত হইয়াছে; এবং পুরাণ সকলের উৎপত্তিসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা যে সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে,—

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পসিদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থ বিশারদঃ॥ ১৬
প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোভূৎ সূতো বৈ রোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহা-
মুনিঃ॥১৭

সুমতিশ্চাগ্নিবর্চ্চাশ্চ মিত্রয়ুঃ শাংশপায়নঃ।
অকৃতব্রণোঽথ সাবর্ণিঃ ষট্‌ শিষ্যাস্তস্যচা-
ভবন্‌॥ ১৮
কাশ্যপ্যঃ সংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ।
রোমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূলসংহিতা॥১৯
চতুষ্টয়েনাপ্যোতেন সংহিতানামিদং মুনে॥২০
(৩য় অংশ, ষষ্ঠ অধ্যায়)

অর্থাৎ পুরাণার্থ বিশারদ ভগবান্‌ বেদ-ব্যাস আখ্যান উপাখ্যান গাথা ও কল্পশুদ্ধির সহিত পুরাণ সংহিতা রচনা করিলেন। বেদব্যাসের সূতজাতীয় রোমহর্ষণ নামে বিখ্যাত একজন শিষ্য ছিলেন। মহামুনি ব্যাস তাঁহাকে পুরাণ সংহিতা অধ্যয়ন করাই-লেন। রোমহর্ষণের ছয় জন শিষ্য। তাঁহা-দের নাম—সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংশ-পায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি। কাশ্যপ-বংশীয় অকৃতব্রণ সাবর্ণি ও শাংশপায়ন, ইঁহারা রোমহর্ষণ হইতে অধীত মূল সংহিতা অব-লম্বনে প্রত্যেকে এক একখানি পুরাণসংহিতা রচনা করেন। হে মুনে! ঐ চারি সংহিতার সার গ্রহণ করিয়া আমি (পরাশর) এই বিষ্ণু-পুরাণ-সংহিতা রচনা করিয়াছি।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, বিষ্ণুপুরাণ প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যাস রচিত নহে; বরঞ্চ ব্যাস রচিত মূল সংহিতা এবং তদবলম্বনে লিখিত তিনখানি পুরাণ-সংহিতার সার অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে। ভাগবত, বায়ু এবং অগ্নিপুরাণাদিতে পুরা-ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই প্রকার আখ্যানই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহা হইতে এই-রূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সেই সময়ে যে সকল পৌরাণিক তথ্য প্রচলিত ছিল—যাহাকে উপনিষদ, রামায়ণ এবং মহাভার-তাদি গ্রন্থ সকল 'পুরাণ' বলিয়া বর্ণনা করি-য়াছেন—তাহাদিগকে ব্যাসদেব একত্রে গ্রথিত (compile) করিয়াছিলেন। ইহাই পুরাণ-সংহিতা নামে খ্যাত হইয়াছিল। তৎ-পরে তাঁহার তিনজন প্রশিষ্য পুরাণ-সংহি-তাকে ভিত্তি করিয়া, পুরাণের অপর তথ্য-সকল সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেকে এক একখানি পুরাণ রচনা করেন। এই চারখানি পুরাণ-সংহিতাই অষ্টাদশ পুরাণের মূল স্বরূপ। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, ১৮শ পুরাণ গুলির যথার্থ রচয়িতা কে, তাহা নির্দ্ধারিত করিতে না পারিলেও, ব্যাসদেব যে উহাদের রচয়িতা বলিয়া প্রবাদ দৃষ্ট হয়, তাহা কতক পরিমাণে সত্য, কারণ ঐ সকল পুরাণগুলিই তাঁহার মূল পুরাণ-সংহিতার যোজনা (adaptations) মাত্র।

কোন্‌ পুরাণ খানির পর অপর কোন্‌ পুরাণ রচিত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরা-ণাদিতে যে প্রবাদ দৃষ্ট হয়, তাহা অগ্রাহ্য করিবার এ পর্য্যন্ত কোন কারণ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যখন আপস্তম্ব-গৃহ্যসূত্র রচিত হয়, তখন খুব সম্ভবতঃ এই সকল পুরাণ গুলিই প্রচলিত ছিল।

কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, অষ্টাদশ পুরাণ গুলি আমরা মৌলিক আকারে প্রাপ্ত হই নাই। উহাদের ভাষা, বিষয়-সন্নিবেশ এবং বিষয় সকল ন্যূনাধিক পরিমাণে বিকৃত হই-য়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বঙ্কিম বাবু দেখাই-য়াছেন যে, আধুনিক ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে—যে ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণের সূচী মৎস্যপুরাণে নিবদ্ধ হই-য়াছে, তাহা হইতে—অনেকাংশে বিভিন্ন। সমুদয় পুরাণ সম্বন্ধে এই বাক্য প্রযুজ্য হইতে পারে। আমাদের এইরূপ বোধ হয় যে, বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের পর যখন হিন্দুধর্ম্মের

পুনরুত্থান হইয়াছিল, তখন সকল পুরাণেরই পুনঃ সংস্করণ হইয়াছিল। সেই সময়ে যাহার যাহা ভাল লাগিয়াছিল, তিনি তাহা ইহাদের ভিতর প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি, আমরা যখন পদ্মপুরাণে শঙ্করাচার্য্যের অথবা শ্রীচৈতন্যের কথা এবং ভবিষ্যপুরাণে নানকের কথা দেখিতে পাই, তখন পুরাণ গুলির কিরূপ সংস্করণ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি। অতি অল্প দিনের ভিতর কৃত্তিবাসের রামায়ণের কিরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে, আপস্তম্বের সময়ের প্রচলিত পুরাণগুলি কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া আধুনিক পুরাণরূপে পরিণত হইয়াছে,তাহা অনেক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়।

মূল অষ্টাদশ পুরাণগুলি কোন্ সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইবার অন্যান্য উপায় আছে। উদাহরণ স্বরূপ বিষ্ণু পুরাণখানি লওয়া যাউক। বিষ্ণুপুরাণে আমরা দেখিতে পাই যে,—

"অভিমন্যোরুত্তরায়াং পরীক্ষিৎযজ্ঞে। যোয়ং সাম্প্রতং এতদ্ ভূমণ্ডলং অখণ্ডায়তি ধর্ম্মেন পালয়তি।"

ইহা হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, পরীক্ষিতের রাজত্ব কালে এই পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল।

এইরূপ আমরা মৎস্য পুরাণে দেখিতে পাই যে,—"যজ্ঞেঽধীসীমাখ্যঃ সাম্প্রতং যো মহাযশাঃ, ইত্যাদি।" সুতরাং অধীসীমের রাজত্বের সময়ে মৎস্যপুরাণ রচিত হইয়াছে।

পুরাণগুলি যবেই রচিত হউক না কেন, উহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে অতি প্রাচীন গদ্য সংস্কৃতে রচিত অংশবিশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকে অনুমান করেন যে, মূল পুরাণসংহিতার অংশ বলিয়াই উহাদিগকে পদ্যে রচিত পুরাণগুলির মধ্যে স্থান প্রদত্ত হইয়াছে। বিষ্ণু পুরাণের মধ্যে আমরা এই রূপ গদ্য পাইয়া থাকি। যথা,—

"যত্র যদুবংশে ভগবান্ অনাদিনিধনো বিষ্ণুরবততার। ভগবান্ অনাদিমধ্যো দেবকী-গর্ভে সমবততার বাসুদেবঃ।"

পুরাণসংহিতায়ও যে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তাহা ইহা হইতে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

পুরাণগুলি বিশেষ লক্ষ্যের সহিত পাঠ করিলে, ব্রাহ্মপুরাণখানি যে উহাদের মধ্যে প্রথম পুরাণ বলিয়া প্রবাদ আছে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই হয় না। খুব সম্ভবতঃ ব্যাস রচিত আদিম সংহিতা এবং তাঁহার প্রশিষ্যগণ রচিত তিনখানি পুরাণ-সংহিতার সহিত ব্রাহ্মপুরাণখানির মিল আছে। কারণ ব্রাহ্ম ও বিষ্ণুপুরাণের অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আখ্যান গুলির অক্ষরে অক্ষরে মিল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, একই মূল সংহিতা অথবা একই তিনখানি পুরাণসংহিতা হইতে ঐ দুই খানি পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু একখানি পুরাণ অপরখানি হইতে ঐ সকল অংশ অবিকল চুরি করেন নাই; কারণ তাহা হইলে সর্ব্বত্রই মিল দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু আমরা সর্ব্বত্র ঐ রূপ মিল দেখিতে পাই না। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার অংশ বিশেষ লওয়া যাউক। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ, ১৩শ অধ্যায়, ২৫ হইতে ৪০ শ্লোক পর্য্যন্ত, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর গোপিরা কি করিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ বর্ণনা আছে। কিন্তু ব্রাহ্মপুরাণে কেবল মাত্র একটী শ্লোকে

ঐ বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে,—গোপিরা শ্রীকৃষ্ণে মগ্ন হইয়া তাঁহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া বৃন্দাবনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মপুরাণে যাহা একটী শ্লোকে বলা হইয়াছে, তাহা বিষ্ণুপুরাণে ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া ২৬টী শ্লোক বিবৃত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ব্রাহ্ম পুরাণ খানি সর্ব্ব প্রথমে রচিত হইয়াছে, তৎপরে বিষ্ণুপুরাণাদি রচিত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মপুরাণ খানি মূল সংহিতা গুলির উপাখ্যান অংশ বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গের অংশসকল সম্বন্ধে ব্রাহ্মপুরাণের সহিত বিষ্ণুপুরাণের মিল দেখিতে পাওয়াতে ইহা স্থির হইতেছে যে, ব্রাহ্মপুরাণ এবং বিষ্ণু-পুরাণ, উভয়েই ঐ সকল অংশ মূলসংহিতা-গুলি হইতে গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্ম ও বিষ্ণুপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল উপা-খ্যান বর্ত্তমান আছে, উহারা ব্যাসদেব রচিত মূলসংহিতারই অনুযায়ী। সুতরাং ব্রাহ্মাদি পুরাণ গুলি যে শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতার পরিচায়ক, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা অব-গত হইতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি, উপন্যাসের নায়ক নহেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ দেব।

দেব-শক্তি।

ভ'রে ছিল আঁখি দুটী প্রলয়ের আঁধিয়ায়,
বুকের কম্পন রাশি, হয়েছিল মৃতপ্রায়,
বাহির হইতেছিল ভয়ে ভয়ে, কৃশ-শ্বাস,
বুকেতে বসিয়াছিল, ধ্যানমগ্ন হা হুতাশ,
একটুকু শান্তি বুঝি, এনেছিল তন্দ্রা-রাণী,
এমন সময় যেন শুনিলাম কার বাণী।—

"এস নাথ এস ফিরে, আমারে হৃদয়ে ধর,
অপরাধ করিয়াছি, হে দেবতা, ক্ষমা কর,
অন্ধকার আঁখি 'পরে,আর না থাকিতে দিব,
অধরে যতেক ধাস্ত চুমিয়া, চুষিয়া নিব";

"প্রেয়সিরে এসো ধীরে,কাছে বসে কথা কও!
রূপহারা অন্ধ-আঁখি রূপেতে ফুটা'য়ে লও,
চম্পক লাবণ্যে ভরা মুখের পেলব কান্তি,
মায়া-দীপ্ত চোকে দেখে অন্তিমে লভিগো শান্তি।"

"পদমূলে বসি নাথ সেবিব চরণদ্বয়,
ভুলে যাও পূর্ব্ব কথা পিশাচীর অভিনয়।"

"বুক যে গিয়াছে ভেঙে, হৃদয়েতে নাহি বল
জীবনের শেষ দিনে রাখ বুকে করতল।"

"ভাঙা বুক জোড়া দিব, এইবুক ভেঙে চুরে,
মর্ম্ম-রক্ত মাখাইয়া ব্যথায় তাড়াব দূরে,
প্রেমসুরা, সঞ্জীবনী তোমারে করা'ব পান,
হাসিয়া উঠিবে পুন, বিষাদ নিষিক্ত প্রাণ"

"কেন প্রিয়ে কেন কহ আবার প্রেমের কথা,
কেন প্রাণে তুলিতেছ অযাচিত ব্যাকুলতা?
প্রেম তো স্বপ্নের সুর,হৃদয়েতে ধ'রে রাখা,
নেশায় বিভোর হ'য়ে হেসে কেঁদে বেঁচে থাকা।"

প্রেম নহে স্বপ্ন নাথ, প্রেম শিখা অলকার
প্রেম-স্পর্শে জায়াপতি পান শক্তি দেবতার।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

নব্যরাষ্ট্রে লোকচিকিৎসা-প্রশ্ন।

"We stand in a momentous time—a seething mass—in which the mind has made a sudden bound, left its old shape behind and is gaining new. The whole bulk of our ideas, the very bands of the world are rent asunder and collapse like a dream. *Mind is preparing a new start.*"

Hegel.

জড়তা-মুক্ত নব্যরাষ্ট্রে দিন দিন নূতন প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে। দেশ স্বীয় করচ্যুত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পদ্ধতি আবার করায়ত্ত করিতে চাহে। বিরাট সলিলোচ্ছ্বাসবৎ ভাব-স্ফীতির যে অভিনব শরীর-কম্পন রাষ্ট্র-বক্ষে কূল ছাপিয়া উঠিতেছে, তাহা নদীর শাখা-জালের প্রত্যন্ত ভাগের ন্যায়, সমাজের সীমা-প্রান্ত পর্য্যন্ত নীল স্বচ্ছজলপ্রবাহে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। যাহা কর্দ্দমের মলিন আবরণে পল্লীবক্ষ-নিষিক্ত নদী শাখার অস্পষ্ট জটিল বক্ষে লুক্কায়িত ছিল, তাহা হঠাৎ উর্ম্মি-সঙ্গ-শীর্ষে স্ফটিক-চূর্ণ-শুভ্র ফেন-কীরিটে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিতেছে।

লোক চিকিৎসার প্রশ্ন কি নিতান্ত গুরুতর ব্যাপার নহে? আমরা লোক-শিক্ষা বিস্তৃতির জন্য নানা নূতন পন্থা অবলম্বন করিতেছি—প্রাইমারী শিক্ষাকে যথাসম্ভব জাতীয় শিক্ষাদর্শের অন্তর্ভূত করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু সমাজ-সোপানে এখন একটী শ্লথতল অন্ধকূপ রাখিয়াছি, যাহা প্রতি মুহূর্ত্তে সকলকে অনুভব করিতে হয়, যাহার নিবিড় গভীর মলিন আলিঙ্গন পল্লীবক্ষে হাহাকার তুলিয়া দেয়, যাহা অহরহ আমাদের জনসাধারণকে হতশক্তি করিয়া তোলে।

বর্ত্তমান বহুমুখী কর্ম্মবিপ্লবে আমাদের সুস্থ শরীর, মুক্ত চিত্ত প্রয়োজন, আমাদের শিক্ষা, কর্ম্মের মাঝে এবং ভাবের মাঝে তাহাই অঙ্কিত করা চাহি। মায়াত্মক দুর্ব্বলতার ক্ষত চিহ্ন নব্যশিক্ষার অমৃত পল্লবে যেন গৃহ কোণেও থাকিতে পারেনা। অন্ততঃ নব্যযুগের ভাব-উৎস-মুখে যেন সমাজ-শরীরে কোথাও ভাবের অসামঞ্জস্য না থাকে। জৈবিক স্বাস্থ্যের ন্যায়, আমাদের ভাব রাজ্যের কোন প্রকোষ্ঠ যেন লৌহ অর্গলে রুদ্ধ এবং অসূর্য্যম্পর্শ থাকিয়া সর্ব্বত্র ভাব-শোণিত সঞ্চালনের পথ বন্ধ করিয়া না তোলে।

অন্তর্নিহিত শক্তির অমোঘতার প্রতি অশ্রদ্ধা বশতঃ দেশ যতদিন তৎপ্রতি অপাঙ্গ দৃষ্টিও করে নাই, ততদিন সকলের কর্ত্তব্য-কার্য্যের তালিকা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি যে অঙ্কের অভিনয় হইতেছে, উহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ সেকেলে চাপরাশী খান্‌সামা বা কোতোয়াল পেয়দা মাত্র নহে—রাজা ও রাণী স্বয়ং! ভারতবর্ষ আমাদের, ভারতের কার্য্য আমাদের কার্য্য, আমাদের এই নিজের দেশে নিজকেই মুক্ত ভাবে কাজ করিতে হইবে। বিদেশী রাজবংশ বাঙ্গালার দেওয়ান পদ প্রাপ্ত হইয়া যে সমস্ত কর্ম্মভার নৃপতির কর্ত্তব্যরূপে ধীরে ধীরে সমাজ হইতে আত্মসাৎ করিয়াছে, পুনরায় তাহা আমাদিগকে স্কন্ধে বহিতে হইবে।

ভারতের বিদেশী রাষ্ট্রনীতি আমাদের সনাতন সমাজের অনেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। এক শ্রেণীর ব্যবস্থাপকের মতে রাষ্ট্রবিপত্তির কর্ত্তব্য-সীমা যত সংক্ষিপ্ত হয়, ততই ভাল। জন ষ্টুয়ার্ট মিল যে রাষ্ট্রবাদের আদর্শ ইউরোপে প্রচার করিয়াছেন, তাহা তৎপ্রণীত স্বাধীনতা এবং অর্থনীতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থদ্বয়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে গবর্ণমেণ্ট মাত্রেরই Laissez-faire theory" অবলম্বন করা উচিত; অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট সামাজিক নানা ব্যাপারে যত অল্প হস্তক্ষেপ করেন, ততই সমাজের পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু তিনি, প্রয়োজন বোধ হইলে, শিক্ষা, শ্রমজীবীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ের প্রতিবিধান করাও গবর্ণমেণ্টের অন্যতম কর্ত্তব্য মনে করেন।

বিখ্যাত মনীষী Humboldt মনে করেন, শিক্ষা, ধর্ম্ম এবং নৈতিক স্বাস্থ্য বিধানাদি বিষয়ে কিছুতেই রাজশক্তির হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

হার্বার্ট স্পেন্সার মহোদয়ের মতামত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্পষ্ট। তিনি বলেন, ধন, প্রাণ এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে রাজশক্তির রূঢ় স্পর্শ সমীচীন নহে। কাজেই তাঁহার মতে বাণিজ্য ব্যবস্থা, ধর্ম্ম ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয় রাজশক্তি-বহির্ভূত সমাজের স্কন্ধে ন্যস্ত হওয়াই মঙ্গলজনক।

কিন্তু মনীষীগণের উপরোক্ত আদর্শ এখনও ইউরোপ অবলম্বন করিতে সক্ষম হয় নাই। ইউরোপ এতদুপযোগী শান্তি ও সংযম সহসা লাভ করিতে পারিবে, এখন বিশ্বাস হয় না। একথা ইউরোপীয়গণই স্বীকার করেন —কাজেই আমার বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

যদি বলি, প্রাচীন দার্শনিকগণের দূরদৃষ্টি বশতঃই হোক, কিম্বা ঘটনাবর্ত্তের রহস্যময় বিবর্ত্তনেই হোক্, ভারতবর্ষে এই আদর্শের ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তবে সম্প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ সহ্য করিতে হইবে না, এবিশ্বাস যেমন আমার আছে, তেমনি ক্ষুদ্র-দৃষ্টি-পল্লবগ্রাহী, অতীত ভারতের সেকেলে মজ্জাহীন, মলিন, সর্ব্বজ্ঞতার ভাণ-পুষ্ট মৃদু-হাস্য-কঙ্কাল-চূর্ণের ক্ষীণ আঘাত হইতে মুক্তি পাইব—বর্ত্তমানের গৌরব-মুক্ত নব্যভাব-বিধুর সমাজে এ কথা আশা করাও, বোধ হয়, তেমন বেশী কিছু নহে।

ভারতের প্রাচীন সমাজবিদ্‌গণ নৃপতির কর্ত্তব্যক্ষেত্র নিতান্ত সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। দ্বাদশ অধ্যায় পূর্ণ বৃহৎ মনুসংহিতার মাত্র সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় রাজধর্ম্ম-বিচারে ব্যবহৃত হইয়াছে। দেহ, ধন এবং রাষ্ট্ররক্ষা ছাড়া রাজার অন্য কোন কর্ম্ম নাই। উপরোক্ত অধ্যায়ে কেবল এই সমস্ত বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। শিক্ষাদীক্ষা, অতিথিসৎকার, স্বাস্থ্যরক্ষা, দুর্ব্বলের এবং পীড়িতের সেবা, ধর্ম্মচর্চ্চা প্রভৃতির উপর রাজার হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন হয় নাই, কারণ সমাজ সেই ভার আবহমান কাল হইতে স্বীয় স্কন্ধে বহন করিয়া আসিতেছে। অবশ্য এই সমাজ এবং সমাজপতি উভয়ই সনাতন আর্য্যধর্ম্মকে স্বীকরণ মৌলিক ব্যাপার মনে করিয়াছে।

বৌদ্ধ ভারতবর্ষেও এই আদর্শ মোটামুটি অক্ষত ছিল। কিন্তু তাৎকালিক ধর্ম্মসঙ্ঘর্ষের প্রভাবে এবং বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ বিধি কর্ত্তৃক অনুচালিত হওয়ায়, নৃপতি অশোক, নানা বিষয়ে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই ভাব-বিপ্লবের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের পক্ষে

উহা নানা কারণে প্রয়োজনীয় ছিল। অশোকের নব রাষ্ট্রধর্ম্ম শান্তি এবং প্রেমের ভিতর দিয়া প্রচারিত হয়। প্রজার স্বাধীন ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ কিম্বা বলপ্রয়োগ করা হয় নাই।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অবনতি এবং বৌদ্ধধর্ম্মের এই বিরাট প্লাবনে সমাজ অনেকটা উলট-পালট হইয়া উঠে। পুরাতন জীর্ণ ব্যবস্থা প্রভৃতি অন্তর্হিত হওয়ার এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে, অশোক, সমাজের সম্মুখে বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা এবং মহত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য, অনেক বিরাটকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

এই জন্য প্রচারের দ্বারা শুধু ধর্ম্মশাস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া অশোক ক্ষান্ত হন নাই। স্থানে স্থানে কূপ এবং তড়াগ খনন, বৃক্ষাদি রোপণ,বিশেষতঃ রাজ্যের সর্ব্বত্র সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া প্রজা-সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। Mr Robert Cust অশোকের চতুর্দ্দশ অনুশাসনের যে সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার দু'একটা উল্লেখ করিতেছি।

(১) প্রাণীহত্যা নিবারণ।

(২) মানব এবং ইতর জন্তুর চিকিৎসা বিধান, বৃক্ষাদি রোপণ প্রভৃতি।

(৩) নৈতিক স্বাস্থ্যবিধানের জন্য পর্য্যবেক্ষক নিযুক্তি।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি,এই সামান্য রাজকর্ত্তব্যের পরিধি-বিস্তৃতি তৎকালে প্রয়োজন ছিল।

নৃপতি ও প্রজা সমদেশবাসী এবং সমান প্রকৃতিযুক্ত হইলে ইহাতে তেমন কোন অনিষ্ট হয় না। অবশ্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা-বহির্ভূত সমাজ-সাধারণ ইহাতে মুক্ত আত্মশক্তির সম্যক্ ব্যবহারে সমর্থ হয় না—কিন্তু পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইলে কোন বিষয়ে আশঙ্কার কারণ থাকে না। বিশেষতঃ নৃপতির পক্ষে কোন উচ্চভাব কিম্বা কার্য্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া দোষাবহ নহে, তবে তদ্দ্বারা সাধারণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটিয়া শেষোক্তের যাবতীয় চেষ্টা নির্ম্মূল না হইলেই হইল।

এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হইয়া বহুকাল হইতে আমরা নিজকে এত অক্ষম মনে করিয়াছি যে, ধীরে ধীরে কখন আমাদের পক্ষাঘাত-রুগ্ন হস্ত হইতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য-সম্ভ্রম প্রভৃতির ব্যবস্থাযন্ত্র কিরূপে "ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড" এবং সরকারী পেয়াদা চুরি করিল ,তাহা ঠিক করিতে পারি নাই।

অনতিকাল পূর্ব্বেও যে এই সমস্ত ব্যাপার আমাদের হস্তে ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসের নবাবগণের হাতে কেবল রাজস্ব আদায়, শান্তিরক্ষা, সৈন্যসজ্জা, অস্ত্র ছিল—অন্যান্য সর্ব্ববিধ মঙ্গলকৃত্য দেশের যৌন-সমাজের অক্ষয়সাহচর্য্যে সম্পন্ন হইত।

দেশের এবং সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ দুইটী কর্ত্তব্য রহিয়াছে। শিক্ষাবিধান এবং আত্মরক্ষা। প্রথমোক্ত এবং শেষোক্ত কার্য্য আমরা হস্তে লইয়াছি। শেষোক্তের জন্য শারীরচর্চ্চা এবং সালিসী আদালত প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হইতেছে। প্রথমোক্ত-কার্য্যের জন্য আমরা জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছি। শেষোক্ত আত্মরক্ষা ব্যাপারে সেবাধর্ম্ম এদেশে বহুদিন আদৃত হইতেছে। পারস্পরিক সহায়তা, রোগে এবং শোকে উপলব্ধি হইলে, কেবল যে সাময়িক দুঃখ-নিরাকারণ হয়,এমন নহে, উহা সমাজবন্ধনের

দিকে এবং সামাজিক ব্যবস্থাদির প্রতি অতি-সহজেই সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করে। এজন্য তদ্‌সম্বন্ধীয় দেশের সনাতন পদ্ধতি এবং বর্ত্তমান কর্ম্মপর্য্যায় আলোচনা প্রয়োজন।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি বৎসর প্রকাশিত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজকার্য্যের বিবরণে (Administration Report) দেখা যায়, মোটামুটি পঞ্চবিধ উপায়ে রাজশক্তি দেশের পীড়িত, রুগ্ন এবং অক্ষম সাধারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছে।

(১) জন্ম এবং মৃত্যু রেজিষ্টারী। ইহাতে মোটামুটি স্থান বিশেষ বা প্রদেশ বিশেষের অবস্থা বোঝা যায়।

(২) ভারতের মাঝে বা বহির্ভাগে সাধারণের গমনাগমনের তালিকা। (Emigration)

(৩) ভেষজ-ব্যবস্থা—যথা স্থানে স্থানে চিকিৎসা-শিক্ষাগৃহ, দাতব্য-চিকিৎসালয়, হাঁসপাতাল, পাগলা গারদ, রসায়ন বিশ্লেষণ বিভাগ স্থাপন এবং বিষ প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা।

(৪) স্যানিটেশন—(Sanitation)

(৫) সংক্রামক রোগাদির জন্য (Vaccination এর ব্যবস্থা।

উপরোক্ত তালিকা তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম উপায়ে সমাজ অল্পবিস্তর অবলম্বন করিতে পারে। কিন্তু সে পথে একটু বাধা আছে,সেই বাধাটুকু আলোচনা এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বপ্রচলিত পঞ্চায়েত প্রথা প্রভৃতি ইংরাজের আগমনে পঞ্চত্ব পাওয়ায় সমাজের ব্যবস্থা প্রভৃতির দিকে সাধারণের অবজ্ঞা জন্মিয়াছে, রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা, জল নির্গমের উপায় সম্বন্ধে কোন কার্য্য পরস্পরের মধ্যে স্থির হইলে যে কেহ ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া বিঘ্ন উপস্থিত করিতে পারে। অতটুকু অবহেলা করিবার শক্তি সমাজ অজ্ঞাতসারে ব্যক্তিসাধারণকে দিয়াছে। কেবল ধর্ম্ম-সংমিশ্রিত আচারকৃত্যে, বিবাহ-শ্রাদ্ধে এবং মৃতদেহ সৎকার ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সমাজের সাহায্য না হইলে চলে না।

এই সমস্ত সামাজিক কর্ত্তব্য মূলে নানাবিধ আঘাত এবং তদুপরি সমাজশক্তির সংহতির অভাববশতঃ সমাজ আত্মশক্তি উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। আংশিক শক্তি চর্চ্চায় ব্যর্থ হইয়া নিজকে একেবারে পঙ্গু মনে করিতেছে। শক্তিমানের পক্ষে নিজকে শক্তিহীন মনে করা অত্যন্ত অদ্ভুত, সন্দেহ নাই। এই কথা মায়াজ্ঞান-যুক্ত নেত্র-দৃষ্টি কি ভাবে দেশে উপস্থিত হইল—কে সমাজের এবং ব্যক্তির চক্ষে এই মদির-বিভ্রম কজ্জল অর্পণ করিল, তৎসম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি আলোচ্য বিষয়, এই সমস্ত অসুবিধা এবং অক্ষমতা স্বীকার করিয়া কি প্রকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ ব্যাধির মূল কারণ যদি আপাততঃ দূর করা যাইতে না পারে, তবে তজ্জন্য অপেক্ষা না করিয়া রোগের চিকিৎসা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন।

ধনধান্যের অভাবে সাধারণের পক্ষে উৎকৃষ্ট পানীয়, মুক্ত-সুস্থ বায়ু, পুষ্টিজনক খাদ্য এবং পরিচ্ছন্ন পরিধেয় প্রাপ্তির সুযোগ অধিক নাই। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা হইতে যে স্বাবলম্বন এবং সুস্থ সম্মিলনের ভাবপ্রবাহ সহজভাবে জাগ্রত হইয়া উঠে, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক

জীবনের পরস্পর-প্রতিরোধী অসামঞ্জস্য তাহা মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ করে, এজন্য দেশকে অগ্নি-সম্পাত-গ্রস্ত কিম্বা অজ্ঞানান্ধকারসজ্জিত এইরূপ সার্টিফিকেট দেওয়াটা এক্ষেত্রে শেষ কর্ত্তব্য নহে।

হিংস্রধর্ম্মী মানব হইতে যেমন আত্মরক্ষা প্রয়োজন, রোগ ও দারিদ্র্য হইতে আত্মমুক্তির চেষ্টাও অবহেলনীয় নহে। আমরা সুস্থ, সবল, দীর্ঘকায় মানুষ চাহিলে, ইহা প্রাপ্তির পক্ষে প্রকৃতি এবং ভিন্নরাষ্ট্রীয় মানব যে সমস্ত প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহা অস্খলিত সঙ্কল্পে উৎপাটিত করা চাহি।

রাষ্ট্রীয় অধীনতা হইতে রোগ-তাপ-মৃত্যু সংখ্যা অধিক হইতেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় যথাসম্ভব প্রতিকার চেষ্টা একান্ত কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি পূর্ব্বোল্লিখিত নানা কারণে পল্লী-সমাজ, পল্লীস্বাস্থ্য রক্ষায় যাবতীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছে না। নৈতিক শক্তির প্রভাবে ততটা শ্রদ্ধা এবং শক্তি সমাজ এখনও আত্মস্থ করিতে পারে নাই। দৈহিক শক্তি (compulsion) ব্যবহারের ক্ষমতাও তাহার নাই। কিন্তু এই মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায়ও একেবারে যে সমাজ শক্তিহীন নহে, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি।

এই প্রবন্ধে জলরক্ষা, কূপ-তড়াগ প্রভৃতির ব্যবস্থা, আবর্জ্জনা, পশুপালন, গোময় প্রভৃতি সম্বন্ধে কার্য্যাকার্য্য, রাস্তাঘাটের পরিচ্ছন্নতা, ড্রেন বা পয়ঃপ্রণালী, বায়ুর মুক্তগতি, স্বাস্থ্য-কর-গৃহনির্ম্মাণ করা, ভূশয্যা ও মঞ্চশয্যার বিচার, মৃতদেহ সৎকার, সংক্রামক রোগ প্রাদুর্ভাবে সাবধানতা এবং নিবারণ চেষ্টা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ কিছু আলোচনার স্থান নাই। বাজার বা হাট প্রভৃতি নিয়মিত করা বা অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যাদি সম্বন্ধে বাণিজ্যাদি নিরুদ্ধ করা বিষয়ে আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

নব্যরাষ্ট্রের ভেষজব্যবস্থা এবং ভেষজ-সাহিত্য আলোচনা কিরূপ গুরুতর ব্যাপার এবং এই জ্ঞান বিভাগকে এই নবযুগে কি ভাবে মুক্ত এবং ফুল্ল করা প্রয়োজন, তাহা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ভেষজ-প্রয়োগ যখন সমাজে প্রচলিত আছে, তখন তদ্বিষয়ক সাহিত্য-চর্চ্চা একান্ত প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি পল্লীরাজ্যেই হউক বা অন্যত্রই হউক, চিকিৎসা শাস্ত্রটী এত অবজ্ঞাত যে, উহার উপর আস্থা স্থাপন করা একান্ত দুষ্কর। প্রচুর পরিমাণে মন্ত্রতন্ত্র, সিদ্ধকবচ, রহস্যজনক ফুৎকার প্রভৃতির শৃঙ্খলাহীন আতিশয্য দেখিয়া মাঝে মাঝে ধিক্কার দেও-য়ার প্রবৃত্তি জন্মে। তদুপরি টোট্‌কা ঔষধ, "মুষ্টিযোগ" তন্ত্রোক্ত নানাবিধ অঙ্গসঞ্চালন প্রভৃতির প্রাদুর্ভাবও কম নহে। এক একটী গ্রাম্য কবিরাজের বা মন্ত্রবিদ্‌ ফকিরের হাতে সহস্র সহস্র জীবন নির্ভর করে। নিতান্ত নিয়তির উপর স্থির বিশ্বাস থাকাতে ইহার প্রতিকার কিম্বা এতদ্‌সম্বন্ধে সমগ্র দেশময় আলোচনা বা আন্দোলন হইয়া উঠে নাই।

প্রাচ্যরাজ্য একান্ত কল্পনাপ্রিয়। লৌকিক ব্যবস্থার শুষ্ক নিগড়ে প্রাচ্য হৃদয় ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে ধরা দেয় নাই। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অতীন্দ্রিয় ব্যাপার আলোচনায় তাহার উৎ-সাহ অধিক, কারণ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান কল্পনার ততটা অবসর দেয় না। একটু প্রাচুর্য্য, একটু আতিশয্য, একটু অত্যুক্তি সে আদব কায়দার অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করে। আরব্যোপ-ন্যাস্‌ পঞ্চতন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতির উপাখ্যান

হইতে সহজেই সরল উদার প্রাচ্য-হৃদয় উন্মুক্ত হইয়া উঠে।

ফরাসী মনীষী August Comte জ্ঞান-জগতের যে তিনটী ক্রমাবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার শেষ অবস্থা অর্থা positive state প্রাচ্য-হৃদয় পছন্দ করে না।

কেহ যেন মনে না করেন, Comteএর শ্রেণীপর্য্যায়ের ক্রমকে আমি এতৎসম্বন্ধে চূড়ান্ত classification মনে করিতেছি।* ইচ্ছামত শ্রেণীপর্য্যায় নির্ণয় করিলেই উহা চরম সত্য হইল না। কাজেই positive state অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবস্থা আর নাই—কিম্বা উহাই গৌরব করিবার ব্যাপার, ইহা আমি মনে করি না। জ্ঞান-জগতের মাঝে ক্রমস্ফূর্ত্তির চক্র (cycle) আছে, ইউরোপ হয়ত যে positive ষ্টেটকে লইয়া করতালি দিতেছে, তাহার ক্ষুদ্রতার দৈন্য হয়ত তৎসঙ্গে উপলব্ধি হইতেছে না।

তুলনায় সমালোচনার জন্য আমার positive state বিষয়ে উল্লেখ করিবার প্রবৃত্তি হয় নাই। শুধু সেই অবস্থাটী উপলব্ধির জন্যই উল্লেখ করিয়াছি। অর্থাৎ যে সমস্ত শাস্ত্রশিক্ষার যে প্রণালী এবং মানসিক গতি প্রয়োজন, তাহার প্রতি উদাসীন হওয়া চলেনা। কাজেই ভেষজ বিদ্যাচর্চ্চায় যদি কাহারও ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান এবং বিচারশক্তির প্রতি অবহেলা জন্মে এবং তৎসঙ্গে অতীন্দ্রিয় ব্যাপারের দিকে মন প্রধাবিত হয়, তবে তাহাকে কিঞ্চিৎ সতর্ক করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

সংক্ষেপতঃ এই বিদ্যার মূলে observation, experiment এবং verification প্রয়োজন। যাহাতে সম্যক্‌রূপে এই ত্রিবিধ ব্যাপারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, তৎপ্রতি যত্নবান থাকা প্রয়োজন।

সম্প্রতি বাঙ্গালাদেশে ত্রিবিধ চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। উহার আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব বিচার নিষ্প্রয়োজন এবং সাধ্যায়ত্তও নহে। তবে কোন্ প্রণালীর চিকিৎসা বহু-বিস্তৃত এবং কোন প্রণালীর কি কি সুবিধা অসুবিধা আছে, কিম্বা শিক্ষাবিস্তৃতির পথ সুবিধাজনক, তাহার বিচার প্রয়োজন।

দুঃখের বিষয়, চিকিৎসকের তালিকা সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য, অথচ এমন গ্রাম নাই, যেথানে দু'চার জন চিকিৎসক নাই।

ইংরাজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এলোপ্যাথী এবং হোমিওপ্যাথী নামক দুইটী চিকিৎসা-পদ্ধতি বর্ত্তমানে দেশে অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাদের ব্যবহার পৃথিবী-বিস্তৃত শত শত পাব্‌লিক এবং প্রাইভেট হাঁসপাতালে, জগতের সর্ব্বত্র এই প্রণালীদ্বয়ের চিকিৎসা চলিতেছে। প্রতিদিন সহস্র সহস্র স্থান হইতে এই প্রণালীর ভেষজের পরীক্ষা হইতেছে। পীড়িতের অবস্থা বিবেচনা, কতটুকু পরিমাণ ঔষধ কি উপকার করিল, অন্যান্য কি কি ভেষজমিশ্রণে কি কি পরিবর্ত্তন ঘটিল, এতৎসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তন্ন তন্ন করিয়া মুক্তজ্ঞানের খরতর আলোকে বিচার হইতেছে।

প্রত্যেক দৈনন্দিন ঘটনা, ফলাফল, নূতন উপায় প্রভৃতি সহস্র চিকিৎসক, গ্রন্থরূপে বা সাময়িক পত্ররূপে, লিপিবদ্ধ করিতেছেন। ফলতঃ observation, experiment প্রভৃতি এই ক্ষেত্রে অহরহ চলিতেছে, কোন লুকোচুরি ব্যাপার নাই, গোপ্য বা গোপন বিষয়

* হারবার্ট স্পেনসার মহোদয়ের Genesis of Science নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কিছু নাই। চিকিৎসকের কৃতিত্ব প্রদর্শনের বিশেষ সুবিধা থাকিলেও কোন জ্ঞান তাহার বক্ষপঞ্জরে লুক্কায়িত নহে। একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের মৃত্যুতে তেমন হাহাকার করিতে হয় না—কারণ তাঁহার জ্ঞান অধিকাংশ অবস্থায় তিনি গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ করিয়া যান।

এই দুইটী পদ্ধতি সম্বন্ধে তেমন কিছু বলিবার নাই।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভারতীয় পদ্ধতি দেশে প্রচলিত নাই, একথা কিছুতেই বলা যায় না। বরং আমাদের যতই পল্লীর অভিজ্ঞতা বাড়িতেছে, ততই দেখিতেছি,মোটামুটী আয়ুর্ব্বেদপ্রণালীর প্রচার বিস্ময়জনক, এমন কি, হয়ত পূর্ব্বোক্ত দুইটী পদ্ধতি অপেক্ষা ইহা অধিক আদৃত হইতেছে। গ্রামে এলোপ্যাথ থাকুক না থাকুক, কবিরাজের অভাব নাই। এবং এই সমস্ত কবিরাজের খেয়ালের উপর বাঙ্গালার সাতকোটীর জীবন নির্ভর করিতেছে। ইহা আমাদের সভ্যতার বা গৌরবের নিদর্শন নহে।

কেহ যেন মনে না করেন, এই শ্রেণীর চিকিৎসাপদ্ধতির প্রতি অশ্রদ্ধাবশতঃ আমি কিছু বলিতেছি। কিন্তু শ্রদ্ধা জন্মাইবার বহু পন্থা থাকা সত্ত্বেও তৎপ্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই কেন?

যে সমস্ত উদ্ভিদ্ হইতে ভারতবর্ষ ভেষজসংগ্রহ করিয়াছে, তাহার প্রাচুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। ইতিমধ্যেই অনেক ভেষজ ইউরোপে অম্লানবদনে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু শুধু ইহাতে উচ্ছ্বসিত হইলে চলিবে না।

চরক প্রভৃতি প্রাচীন মনীষীগণ পত্র-শিকড়ের যে যে গুণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—তাহার সম্যক্ পরীক্ষা কিম্বা ঔষধের মাত্রা হিসাবে ও ফল-বিভিন্নতা বিষয়ে কোন পরীক্ষা হইতেছে কি? আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রণালীর পরীক্ষা এবং সম্যক্ চর্চ্চার জন্য বাঙ্গালাদেশে কিম্বা ভারতে একটী হাঁসপাতালও কি আছে?

ইতিহাসে দেখা যায়, নৃপতি অশোকই প্রথম এদেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হাঁসপাতাল স্থাপন করেন। হাণ্টার বলেন:—

"The best era of Indian medicines was contemporary with the ascendency of Bhuddhism(250 B.C. to 600 A.D.) and did not long survive it. The science was studied in the chief centres of Bhuddist civilisation such as the great monastic University of Nalanda near Gaya. The very ancient Brahmans may have derived the rudiments of anatomy from the direction of the sacrifice. But the public hospitals which the Bhuddhist princes established in every city were probably the true schools of Indian medicine. A large number of cases were collected in them for continuous observation and treatment; and they supplied opportunities for the study of disease similar to those which the Greek Physicians obtained at their hospital camps around the mineral springs."

ঐতিহাসিক আরও বলেন,—

"As Bhuddhism passed into modern Hinduism (600--1000 A.D.) and the shackles of caste were re-imposed with an iron rigour, the Brahmans more scrupulously avoided contact with blood or morbid matter......The abolition of the public hospitals on the downfall of Bhuddhism must also have proved a great loss to Indian medicine. The series of Mahomedan conquests commencing in 1000 A.D. brought in a new school of foreign physicians who derived their knowledge from Arabic translations of the

Sanskrit medical works of the best period. These Musalman doctors or Hakims monopolized the patronage of the Mahomedan prince and nobles of India. The decline of Hindu medicine went on until it has sunk into the hands of the village Kabiraj, whose knowledge consists of jumbled fragments of the Sanskrit texts and a by no means contemptible Pharmacopoiea supplemented by spells, fasts and quakery."

হাঁসপাতাল প্রভৃতিতে রোগ-পরীক্ষা, ঔষধ প্রয়োগ প্রভৃতির ধারাবাহিক চেষ্টা হইতে পারে। সেভাবে ব্যক্তিগত কৃতিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মাঝে যাবতীয় জ্ঞান সঞ্চিত থাকে।

ইচ্ছা করিলেই তৎক্ষণাৎ সর্ব্বত্র হাঁসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে এবং মনীষী চিকিৎসকগণ দিবারাত্র ভৈষজ সমূহের গুণাগুণ পরীক্ষায় ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন, এমন আশা সহসা করি না।

হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইবার পথে প্রতিবন্ধক থাকিলেও ভেষজ-পরীক্ষা স্থগিত থাকার কোন কারণ নাই। অনেক কৃতী চিকিৎসক আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের চিকিৎসা-লব্ধ যাবতীয় অর্থ অত্যুচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ-কল্পে আকাশে উড্ডীয়মান হওয়া শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য মনে না করিয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, ভেষজের ফলাফল সম্বন্ধে পরীক্ষায় ঐ অর্থ নিযুক্ত করিতে পারেন। ইহা হাওয়ায় টাকা নিক্ষেপ করা অপেক্ষা, বোধ হয়, শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য স্বীকার করিবেন।

ইউরোপ এবং আমেরিকার ভেষজের পরিমাণ-গত ফলবিপর্য্যয়ের ভারতবর্ষে পরীক্ষা মাত্র হইয়াছে, এমন নহে। উৎকৃষ্ট রাসায়নিকগণ বিজ্ঞানাগারে প্রত্যেক ভেষজ-বিশ্লেষণে অহরহ নিরত আছেন, ভেষজের তীব্রতা বা মৃদুতা, নির্ম্মলতা বা বিমিশ্রণ, পরিশুদ্ধি বা ভিন্ন পদার্থের সহিত উৎকৃষ্ট উপায়ে সংযোগ প্রভৃতি প্রাত্যহিক পর্য্যালোচনার বিষয়। তাহা গ্রন্থাকারে সর্ব্বদা নিবদ্ধ হইয়া সন্দেহ দূর করিতেছে।

স্থূলতঃ ভারতীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিকে emipirical অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ করিয়া যথাসম্ভব বিজ্ঞানমূলক করা প্রয়োজন। এজন্য সর্ব্বপ্রথম একটা উৎকৃষ্ট pharmacopoeia নব্যভাবে রচিত হওয়া প্রয়োজন। ইহাতে যেন প্রত্যেক ভেষজের নবীনভাবে পরীক্ষিত গুণাগুণ থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে সংখ্যাহীন উদ্ভিদ মূল, পত্র লতা, ফল, ফুল প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে। একখানি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ হাতে লইয়া পারিভাষিক সংজ্ঞার অধ্যায়ে নিম্নলিখিত নাম দেখিতেছি :—ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ, ত্রিজাত, চাতুর্জাত, চাতুর্ভদ্রক, পঞ্চকোল, ষড়ূষণ, চতুরম্ল প্রভৃতি। এক একটীতে অনেক পদার্থ আছে।

'যেমন পঞ্চকোল' বলিলে পিপুল, পিপলমূল, চই, চিতামূল, শুঁট, এই পাঁচটী দ্রব্যকে বুঝায়। এইরূপ অসংখ্য দ্রব্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু স্বতন্ত্রতঃ প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণগত ফলাফল প্রভৃতি সম্বন্ধে অবিরত পরীক্ষা হইতেছে কৈ? শুধু সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ হইলেই উহা শেষ প্রমাণ হইল না।

তেমনি prescription প্রভৃতির মাঝেও কোন কার্য্যকারণ ভেদ বোঝা দরকার। পুস্তকে আছে, অতএব এই ঔষধ প্রয়োগ করা প্রয়োজন, ইহা ছাড়া জ্ঞান অধিক দূর উদার ও বিস্তৃত নহে। এই অবস্থায় আস্থা স্থাপন বড়ই দুরূহ, অন্ততঃ আস্থা স্থাপনের সহজ উপায় নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন।

এমত অবস্থায় একটা রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন করা একান্ত অবশ্য-কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাঁসপাতাল স্থাপনের কল্পনা কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখিলেও, অন্যান্য অনেক উপায়ে সুস্থ জ্ঞান বিস্তার করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা দেশে অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক আছেন, অনেকে এ ক্ষেত্রে আশ্চর্য্য কৃতিত্বও দেখাইয়াছেন, কিন্তু চিকিৎসকগণের জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান মুদ্রিত বা লিপিবদ্ধ হইতেছে কৈ? যাঁহারা বাঙ্গালা দেশের বক্ষ হইতে সহস্র সহস্র মুদ্রা আহরণ করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট দেশ কি এ সামান্য প্রতিদানটুকু দাবী করিতে পারেনা? দ্বিতল বা ত্রিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ ছাড়া দেশের মাঝে তাঁহাদের কর্ত্তব্য-ভার কি নিতান্ত কম?

বাঙ্গালা দেশের প্রতি জেলায় অনেক উৎকৃষ্ট আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসক আছেন। পরস্পরের মাঝে কোন ঘনিষ্ট সম্পর্ক না থাকায়, অভিজ্ঞতা-লব্ধ অনেক উৎকৃষ্ট তথ্য বিস্মৃতির গর্ভে প্রোথিত হইতেছে। অর্থলোলুপ অধিকাংশ লোকই নিজের গৃহমাঝে মুদ্রাবৃষ্টির স্নিগ্ধতা অনুভব করিতে ব্যস্ত—যে কার্য্যে ত্যাগ আছে, সাধনা প্রয়োজন, যাহার জন্য দুএকজনকে আত্মহারা হইতে হয়, এমন কার্য্যের সাধক কৈ? সাধন না থাকিলে ব্রতপালন কি করিয়া হইবে?

আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত চিকিৎসা-পদ্ধতি আমাদের দেশে আছে বলিয়াই আমাদের এই মনোব্যথা এবং ইহার বিস্তৃতি ও প্রচার অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা কম নহে বলিয়া, এক্ষেত্রে সাধারণের মনসংযোগ একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ চুপ থাকিলে হানি নাই।

পূর্ব্বে হাঁসপাতাল এবং রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপনের কথা বলিয়াছি।

কিন্তু এক্ষেত্রে আরও কয়েকটী গুরুতর কার্য্য আছে। স্থূলতঃ আয়ুর্ব্বেদ পদ্ধতিকে শ্রদ্ধার ব্যাপারে পরিণত করিতে নিম্নলিখিত কার্য্যক্রম অবিলম্বে স্বীকার করা প্রয়োজন।

(১) প্রতি জেলায় একটী কিম্বা অন্ততঃ কলিকাতায় একটী হাঁসপাতাল স্থাপন।

(২) কলিকাতায় এবং সম্ভব হইলে প্রতি জেলায় একটী আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা।

(৩) একটী রাসায়নাগার প্রতিষ্ঠা।

(৪) একটী আয়ুর্ব্বেদুক্ত উদ্ভিদরাজ্যের Botanic garden.

(৫) নূতন প্রণালীতে ঔষধ তৈয়ারের কারখানা।

(৬) গ্রন্থমুদ্রনের ব্যবস্থা। ইহাতে নবরচিত Pharmacopœia এবং অভিজ্ঞতালব্ধ বর্ত্তমান পুস্তকাদি উপযুক্ত লোকের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হইবে।

(৭) আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের পারস্পরিক যোগ।

ধীরে ধীরে প্রত্যেক বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিব। প্রাচীন সম্পদকে রহস্যময় অতীতের অন্ধকার হইতে পুনরায় মুক্ত জ্ঞানে রাজপথে আনয়ন করিতে হইলে ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় নাই। ভারতের ভেষজের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জগতের অর্গলমুক্ত প্রাঙ্গণে পরীক্ষা সকলেরই বাঞ্ছনীয়, সন্দেহ নাই। এজন্য অধৈর্য্য ও অস্থৈর্য্য প্রকাশের চপলতা ত্যাগ করিতে হইবে। সম্ভব হইলে লেখকের উপর ক্রুদ্ধ হওয়ার প্রবৃত্তিটাও কিঞ্চিৎ সংযত করিতে হইবে।

কলিকাতায় অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের অস্তিত্বের কথা শোনা যায়। কিন্তু সরলভাবে স্বীকার করাই ভাল, ইহাতে সাধারণের সুশিক্ষার পথ বিন্দুমাত্রও প্রশস্ত হয় নাই। অনেককে বিদ্যালয়ের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়, ভিতরে প্রবেশ করিবার সুযোগ অনেকের ঘটে না। আমি একজন ছাত্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া একবার মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। বিদ্যালয়ে স্থান পাওয়া দূরের কথা,কোন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের প্রণালী অধ্যয়নের সুযোগও তাহার হইল না।

কিন্তু এ সমস্ত 'খেলো' পারিবারিক বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য উপযুক্ত নহে।

আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকগণের মাঝে "Surgery" বা অস্ত্র-চিকিৎসা এবং Midwifery বা ধাত্রী বিদ্যা সম্বন্ধে চর্চ্চা অতি সামান্য। এজন্য সম্প্রতি অনেকে মেডিক্যাল কালেজে উপাধি সংগ্রহ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ-প্রণালীতে চিকিৎসা করিতেছেন।

যদি নগরের শ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ একত্র হইয়া একটা কালেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে এই সমস্ত জ্ঞান বিস্তার করেন, তবে কালেজ হইতে প্রত্যাগত শিক্ষার্থীর উপর পল্লীর সাধারণ বহু পরিমাণে অস্খলিত আস্থা স্থাপন করিতে পারিবে।

বলা প্রয়োজন, বিখ্যাত এলোপ্যাথগণ কলিকাতায় College of Physicians and Surgeons নামক বিদ্যামন্দির এবং অন্যান্য শিক্ষাগার স্থাপন করিয়াছেন। নগরের অর্থশালী আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকগণ কি এইরূপ একটা কালেজ স্থাপন করিতে পারেন না? তাঁহাদের সমবায়-গঠিত এইরূপ একটা বিদ্যালয় বাঙ্গালাদেশের কি পরিমাণ উপকার করিবে, তাহা কি তাঁহাদিগকে বোঝান দরকার?

ইহাতে আরও একটা সুযোগ ঘটিবে। মফঃস্বলের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণকে উপযুক্ত বেতনে ইহার প্রোফেসার বা অধ্যাপক নিযুক্ত করা যাইতে পারে, ইহাতে নগর ও পল্লীর চিকিৎসকগণ সমবেত হইতে পারেন এবং নানা মঙ্গলজনক ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারেন। একবার একটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতের নৃপতি এবং রাজন্যগণ, যাঁহারা সম্প্রতিও পৃষ্ঠপোষকতা করেন, শোনা যায়, বহুমুদ্রা দান করিয়া বিদ্যালয়কে গৌরব-শ্রী-মণ্ডিত করিতে পারেন। একজনও কি এই কার্য্যের জন্য কিছু ত্যাগস্বীকার করিয়া চেষ্টা করিবেন?

বস্তুতঃ একটা আয়ুর্ব্বেদীয় কালেজের সম্পর্কেই একটা আয়ুর্ব্বেদীয় হাঁসপাতাল, একটা রাসায়নাগার, এবং একটা আয়ুর্ব্বেদীয় Botanic garden থাকিতে পারে।

একটা কালেজকে কেন্দ্রীভূত করিয়া ধীরে ধীরে এ সমস্ত স্থাপন করা বিশেষ দুরূহ ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না।

ইংরাজী কালেজে যে "Botany" শিক্ষা দেওয়া হয়, ভারতের Botany তাহা অপেক্ষা অনেক ভিন্ন জিনিষ, কারণ এখানকার বিচিত্র উদ্ভিদ পত্র, লতা, তৃণগুল্ম অন্যত্র সুলভ নহে, এজন্য শিক্ষার্থীদের ভারতের উদ্ভিদশাস্ত্রচর্চ্চা একান্ত প্রয়োজন।

কালেজ স্থাপনের আরও প্রয়োজনীয়তা আছে। কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ স্থাপিত হওয়ায় পরিষদের নির্দ্ধারিত syllabus মতে কতকগুলি প্রয়োজনীয় পুস্তকরচনার সূত্রপাত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় কালেজ স্থাপিত হইলে, এইরূপ কয়েকখানি

উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনার সুবিধা হইবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, বর্ত্তমান সময়ে শুধু চরক-শুশ্রুতের অনুবাদ পড়িলে চলিবে না, উহার অনুবাদে তেমন বাহবা পাওয়ার কিছুই নাই। নূতন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে হস্তক্ষেপণ করিতে হইবে।

কালেজের সংযোগে যে হাঁসপাতাল ও উদ্যান থাকিবে, ছাত্রগণ তথায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। অবশ্য শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের সাহচর্য্যে থাকার পথ ইহাতে নিরুদ্ধ হইবে না। কারণ ব্যক্তিগত শিক্ষায় হস্তক্ষেপ করার কোন সম্ভাবনা নাই।

রসায়ন বিদ্যা সম্বন্ধেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ অনভিজ্ঞ। তাহাদিগকে এবং শিক্ষার্থীগণ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগতের রসায়নচর্চ্চা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে সম্প্রতি ভেষজের নির্ম্মলতা এবং প্রখরতা বর্দ্ধিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রণালীতে ঔষধ প্রভৃতি তৈয়ার হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ এসম্বন্ধে স্থূলতঃ কলিকাতার Bengal Chemical and Pharmaceutical worksকে আদর্শ করিয়া কার্য্যের সূত্রপাত করিতে পারেন। বিদ্যার্থীগণ এইস্থানে ভেষজ-নির্ম্মাণ প্রণালী অধ্যয়ন করিতে পারি র। সম্প্রতি আয়ুর্ব্বেদীয় ভেষজ প্রভৃতি। তাস্ত অবহেলার সহিত প্রস্তুত হয়, ইহ বাধ হয়, অস্বীকার্য্য নহে।

এই সমস্ত প্রণালী অবলম্বিত হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় পদ্ধতির সফলতা এবং দুর্ব্বলতা ধীরে ধীরে ধরা পড়িবে। ক্রমশঃ উড্ডীয়মান জ্ঞানকে কেহই অবহেলা করিতে পারিবেন না এবং এতদ্ সম্বন্ধে যাবতীয় হেঁয়ালীও অন্তর্হিত হইবে।

কাজেই অবিশ্বাস বা অতি বিশ্বাস উভয়ই সংযত হইয়া একটি যথার্থ সহজ এবং সবল ধারণা সাধারণের হৃদয়পটে অঙ্কিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান এলোপ্যাথীর কৃষ্ণ-ঘন এলোকেশের বিরাট ছায়া বা হোমিওপ্যাথীর হোমশিখার কম্পিত-কলেবর মাত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না, শত রহস্য-জাল-জড়িত অতীত ভারতের বৈদ্যক-শাস্ত্রের বোধন-গীতি পুনরায় উপন্যাস পুরাণের কল্পনা-পুঞ্জ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।

পরিশেষে আমার শেষ প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকগণের কোন সমিতি, ক্লাব বা কন্‌ফারেন্স অসম্ভব কি? সভ্যজগতের সর্ব্বত্র নানা চিকিৎসকগণের কন্‌ফারেন্স, কংগ্রেস্ প্রভৃতি হইতেছে। অনেকেই International Medical Congressএর নাম শুনিয়া থাকিবেন। ইহার উপকারিতার সীমা নাই। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ হইতে এইরূপ কন্‌ফারেন্সে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়া এতদ্ সম্বন্ধে নানা জল্পনা কল্পনা করিতে পারেন। ইহাতে এই শাস্ত্রের ভারতব্যাপী চর্চ্চার সুবিধা হইবে। প্রত্যেক প্রদেশে যদি উপরোক্ত প্রণালীতে একখানি কালেজ, একটী হাঁসপাতাল, একটী রাসায়নাগার এবং অন্ততঃ একটী বোটানিক গার্ডেন (Botanic garden) স্থাপিত হয়, তবে, জ্ঞান-বিস্তৃতির পথ সহজ ও সরল হইবে। জনসাধারণের মঙ্গল ইচ্ছা করা হয়ত দুরূহ ব্যাপার নহে, কিন্তু পথ আবিষ্কার করাও প্রয়োজন। সেবাধর্ম্মের প্রধান কার্য্য ভেষজ ব্যবস্থা। প্লেগ, ম্যালেরিয়া, কলেরা, দুর্ভিক্ষ

প্রভৃতি এ দেশের নিত্য সহচরগণের সহিত কার্য্য করিতে হইলে লোক-চিকিৎসা প্রশ্ন না উঠিলে চলিবে না।

যে পর্য্যন্ত দেশে যুবক প্রচারক এবং কর্ম্মীগণ স্বয়ং চিকিৎসা বিদ্যায় কিঞ্চিৎ কৃতিত্ব লাভ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে না পারেন, সেই পর্য্যন্ত, যে উপকরণ দেশে আছে, তাহার শ্রেষ্ঠতা-বিধান প্রয়োজন! বর্ত্তমান সময়ে এবং ভবিষ্যতেও এদেশের ভিষক্‌-বৃন্দকে রাষ্ট্রকলেবরে বহু প্রধান কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেই হইবে, এজন্য তাঁহাদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর।

লোক-চিকিৎসা আলোচনায় এলোপ্যাথী এবং হোমিওপ্যাথীর আলোচনার তেমন প্রয়োজন নাই; কারণ এই দুই শাস্ত্রের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত দেশে আছে। এজন্য ইহাদের উত্তরোত্তর বিস্তৃতি হইতেছে।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অধ্যায়।

(রাজীব-লোচন কৃত "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র"—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এ দেশের অধিকারী সর্ব্বপ্রকারে উত্তম হন এবং অন্য জাতি ও এ দেশীয় না হন তবেই মঙ্গল হয়। জগৎসেট প্রভৃতি কহিলেন এমন কে তাহা বিস্তারিয়া কহ। রাজা কহিলেন বিলাতে নিবাস জাতে ইঙ্গরাজ কলিকাতায় কোঠি করিয়া আছেন যদি তাহারা এ রাজ্যের রাজা হন তবে সকল মঙ্গল হবেক। এই শুনিয়া সকলেই কহিলেন তাহারদিগের কি কি গুণ আছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তাহাদিগের গুণ এই এই সকল সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পরহিংসা করেন না যোদ্ধা অতিবড় প্রজা প্রতি যথেষ্ট দয়া এবং অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় ধনেতে কুবের তুল্য ধার্ম্মিক এবং অর্জ্জুনের ন্যায় পরাক্রম প্রজাপালনে সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির এবং সকলে ঐক্যতাপন্ন শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন রাজার সকল গুণ তাহারদিগের আছে অতএব যদি তাহারা এ দেশাধিকারী হন তবে সকলের নিস্তার নতুবা জবনে সকল নষ্ট করিবেক। এই কথার পর জগৎসেট কহিলেন তাহারা উত্তম বটেন তাহা আমি জ্ঞাত আছি কিন্তু তাহার দিগের বাক্য আমরাও বুঝিতে পারি না ও আমাদিগের বাক্য তাহারাও বুঝিতে পারেন না ইহার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন এখন তাহারা কলিকাতায় কোঠি করিয়া বাণিজ্য করিতেছেন সেই কলিকাতার দক্ষিণে কালীঘাট নামে এক স্থান আছে তাহাতে কালী ঠাকুরাণী আছেন আমি মধ্যে মধ্যে কালী পূজার কারণ গিয়া থাকি সেই কালে কলিকাতার কোঠির যিনি বড় সাহেব তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকি ইহাতেই তাহার চরিত্র আমি সমস্তই জ্ঞাত আছি। এই কথার পর রাজা রামনারায়ণ কহিলেন আপনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতার কোঠির বড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন

কিন্তু তাহার বাক্য কি প্রকারে আপনি বুঝেন আর আপনকার কথা তিনি বা কি প্রকারে জ্ঞাত হন। এই কথার উত্তর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় করিলেন কলিকাতায় অনেক অনেক বিশিষ্ট লোকের বসতি আছে তাহারা সকলে ইঙ্গরাজী ভাষা অভ্যাস করিয়াছেন এবং সেই সকল বিশিষ্ট মনুষ্য সাহেবের চাকর আছেন তাহারাই বুঝাইয়া দেন। ইহা শুনিয়া সকলে কহিলেন ইহারা এ দেশের কর্ত্তা হইলে সকল রক্ষা পায় অতএব আপনি কলিকাতায় গমন করিয়া যে সকল কথা উপস্থিত হইল এই সকল বৃত্তান্ত কোঠির বড় সাহেবের নিকট জ্ঞাত করাইবা তিনি যেমন যেমন কহেন বিস্তারিত আমারদের কহিবা এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করিবেন তাহারা দেশাধিকারী হইলে আমারদিগের এ রাজ্যের প্রতুল করিবেন আর এখন যে যে কার্য্য আমারদিগের আছে ইহাতেই রাখিবেন। এই কথার পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তাহারা দেশাধিকারী হইবেন রাজ্যের প্রতুল রাখিলেই রাজার প্রতুল হয় আমাদের এ কথা কহনে আবশ্যক নাই তবে যে কথা কহিলেন আপনারদিগের যে যে কার্য্য আছে ইহাতেই নিযুক্ত রাখিবেন তাহার কোন সন্দেহ মহাশয়েরা করিবেন না তাহারদিগের রাজ্য হইলেই সুখি সকল লোক হইবেক কিন্তু আপনারা আমাকে নিতান্ত স্থির করিয়া আজ্ঞা করুন। পরে সকলেই কহিলেন এই স্থির হইল আপনি কলিকাতায় গমন করুন। ইহা বলিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদায় করিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন॥

পর দিবস রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবাব সাহেবের নিকট আত্ম রাজ্যের অপ্রতুল নিবেদন করিয়া রাজধানিতে বিদায় হইয়া নিজ রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। পরে শিব নিবাসের বাটীতে উপনীত হইলেন। রাজা যাবদীয় পাত্র মিত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন আমি একবার কালীঘাটে যাইব তোমরা প্রস্তুত হও। সকলে যে আজ্ঞা বলিয়া রাজ সভা হইতে আত্ম আত্ম স্থানে আসিয়া রাজার গমনের আয়োজন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। কিঞ্চিৎ গৌণে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় পাত্রকে সঙ্গে করিয়া কালীঘাটে আসিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কোঠির বড় সাহেবের নিকট আপন পাত্রকে পাঠাইলেন আর কহিলেন তুমি সাহেবকে নিবেদন কর গিয়া আমি কল্য সাক্ষাৎ করিতে যাইব। রাজার পাত্র আসিয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কালীঘাটে আসিয়াছেন এখন বাসনা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাহেব আজ্ঞা করিলেন আসিতে কহ। সাহেবের আজ্ঞা পাইয়া পাত্র রাজাকে সমভিব্যাহৃত করিয়া পরদিবস সাহেবের নিকট আনিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবামাত্র সাহেব যথেষ্ট মর্য্যাদা করিয়া বসিতে সিংহাসন দিলেন। রাজা ও সাহেব দুই জন সিংহাসনে বসিয়া অনেক অনেক হাস্য পরিহাস্য করিলেন এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অনেক শিষ্টাচার করিলেন। সাহেবের প্রধান যে চাকর তিনি উভয়েরি বাক্য বুঝাইয়া জ্ঞাত করাইতে লাগিলেন। অনেক অনেক কথার পর রাজা কহিলেন আমার কিঞ্চিৎ বিশেষ নিবেদন আছে। সাহেব কহিলেন কি নিবেদন। রাজা মুরসদাবাদের বৃত্তান্ত সমস্ত জ্ঞাত করাইলেন আর কহিলেন এ রাজ্য আপনারা রক্ষা না করিলে যাবদীয়

লোক অত্যন্ত ব্যামোহ পায় এবং যবন অধিকারী থাকিলে সকল দেশ নষ্ট হয় এই কারণ নবাবের প্রধান প্রধান পাত্র মিত্রগণ আপনকার নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। সকল বৃত্তান্ত সাহেব শ্রবণ করিয়া আশ্বাস দিয়া কহিলেন আমি এ সংবাদ বিলাতে লিখি সেখানকার আজ্ঞা আনিয়া পশ্চাৎ যুদ্ধ করিয়া এ দেশ করতলে আনিয়া সকল মনুষ্যকে পরম সুখে রাখিব তুমি এই সমাচার নবাবের পাত্র মিত্রগণকে লিখহ। এবং যথেষ্ট আশ্বাস করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদায় করিয়া সাহেব সকল বৃত্তান্ত বিলাতে লিখিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় শিবনিবাসের বাটীতে উপস্থিত হইয়া সকল বিস্তারিত নবাব সাহেবের প্রধান প্রধান পাত্রকে জ্ঞাত করাইলেন সকলে শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইলেন।

দৈবের ঘটনা ক্রমে নবাবের বিপদ উপস্থিত হইল তাহার বৃত্তান্ত এই।

ইঙ্গরাজের বাণিজ্যের কোঠি অনেক গ্রামে ছিল যে জিনিষের যে রাজকর নিয়ম ছিল সেই মত নবাব সাহেব পাইতেন। নবাব স্রাজেরদৌলা অন্তঃকরণে করিলেন ইঙ্গরাজেরা ব্যাপার বানিজ্য অতি বিস্তর করিতে লাগিলেন অতএব আমি এখন অধিক রাজকর লইব ইহাই মনোমধ্যে বিবেচনা করিয়া প্রধান প্রধান পাত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন সর্ব্বত্রে সম্বাদ লিখহ যেখানে২ ইঙ্গরাজের বানিজ্যের কোঠি আছে সেই ২ খানে আমার যে ২ চাকরেরা রাজকরের কারণ আছে তাহারদিগের উপর এই লিখহ যে সব নিয়ম আছে তাহা অপেক্ষা রাজকর অধিক লয়। ইহা শুনিয়া পাত্র কহিলেন ইঙ্গরাজ সাহেবেরা বিদেশী মহাজন এ দেশে অনেক কালাবধি ব্যাপার বানিজ্য করেন নিয়মিত রাজকর বরাবর দেন কখন অধিক দেন নাই এখন আপনি অধিক লইবেন এ উত্তম পরামর্শ না তবে মহাশয় কর্ত্তা যেমত আজ্ঞা হয়। এই কথায় যাবতীয় প্রধান২ পাত্র মিত্রগণ সকলেই কহিলেন মহারাজ মহেন্দ্র যে কহিলেন এই উত্তম আদ্যোপান্ত যে হইয়া আসিতেছে এখন তাহাতে ব্যতিক্রম করা ভাল নহে। পাত্র মিত্রগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নবাব উম্মাম্বিত হইয়া কহিলেন তোমরা আমার চাকর আমি যেমন ২ কহিব সেই মত কার্য্য করিবা তোমারদিগের বিবেচনায় কি করে পুনরায় যদি এ বিষয়েতে কেহ বাক্য কহ তবে তাহার যথেষ্ট শাস্তি করিব। সকলে নিঃশব্দ হইলেন পরে আজ্ঞা প্রমাণ যেখানে ২ কোঠি ছিল সেই ২ খানের আত্ম চাকরের প্রতি লিপি লিখিলেন অদ্যাবধি ইঙ্গরাজ সাহেব লোকেরা বানিজ্য যে করিতেছে তাহারদিগকে করের যে নিয়ম ছিল তাহা অপেক্ষা রাজকর অধিক লইবা। এই সমাচার পাইয়া নবাবের চাকরলোকেরা কোঠির চাকরেরদিগের স্থানে অধিক রাজা কর লইতে উদ্যত হইল কোঠির চাকর সমস্ত কলিকাতায় কোঠির বড় সাহেবকে বিস্তারিত সমাচার লিখিলেন সাহেব সর্ব্বত্রের পত্র পায়া সম্বাদ জ্ঞাত হইলেন।

এই সময় নবাব সাহেব রাজা রাজবল্লভের উপর কোন কার্য্যের কারণ উম্মাম্বিত হইলেন কিন্তু বাহ্যে প্রকাশ করেন নাই। রাজা রাজবল্লভ আপন পুত্র কৃষ্ণদাসের সহিত গোপনে বিবেচনা করিলেন যে নবাব সাহেব আমারদিগের উপর উম্মা করিয়াছেন অতএব যদি আমরা এখানে থাকি তবে জাতি প্রাণ ও ধন সকল যাবেক অতএব এই সময় সপরিবারে পলায়ন করি। রাজা কৃষ্ণদাস কহি-

লেন নবাবের সাক্ষাতে থাকিলে এ সকলি সারিবে কিন্তু পলায়ন করিয়া কোথায় যাইব সকল দেশ নবাবের। রাজা রাজবল্লভ কহিলেন চল কলিকাতায় যাই সে স্থান নবাবের অধিকার নহে ইঙ্গরাজ সাহেবেরদিগের অধিকার এবং তাহারদিগের গুণ রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রায় বিস্তারিয়া কহিয়াছেন তাহাতে আমি জ্ঞাত আছি তাহারা শরণাগত জনকে ত্যাগ করেন না অতএব কলিকাতায় গমন করা পরামর্শ নতুবা সকল নষ্ট হবেক। এই স্থির করিয়া সপরিবারে পলায়ন করিয়া রাজা রাজবল্লভ কলিকাতায় আসিয়া কোঠির বড় সাহেবের শরণ লইয়া বিস্তারিত নিবেদন করিলেন। কোঠির সাহেব আশ্বাস করিয়া বলিলেন তোমারদিগের কোন চিন্তা নাই তুমি কলিকাতায় থাকহ। ইহাই বলিয়া আপনার প্রধান চাকরকে কহিয়া দিলেন রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস দুই জনে নবাবের সঙ্কায় পলায়ন করিয়া আমার শরণ লইয়াছে তুমি যথেষ্ট আশ্বাস দিয়া উত্তম এক স্থানে রাখহ। সাহেবের আজ্ঞা মতে প্রধান প্রধান চাকর উত্তম স্থানে রাখিলেন।

কিছুকাল গৌণে নবাব স্রাজেরদৌলা শ্রবণ করিলেন যে রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস সপরিবারে পলায়ন করিয়া কলিকাতায় গিয়া রহিয়াছে শুনিবা মাত্র অতি ক্রোধান্বিত হইয়া মহারাজ মহেন্দ্রকে আজ্ঞা করিলেন কলিকাতার কোঠির বড় সাহেবকে এক পত্র লিখ যে আমার চাকর রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস এখান হইতে পলায়ন করিয়া আপনকার নিকটে আছে তাহারদিগের দুই জনকে বন্ধন করিয়া আমার নিকট শীঘ্র পাঠাইবে। মহা রাজা মহেন্দ্র নবাব সাহেবের আজ্ঞা শুনিয়া নিঃশব্দে রহিলেন ক্ষণেকের পর নিবেদন করিলেন যে আজ্ঞা তাহাই লিখিতেছি কিন্তু এক নিবেদন আছে কলিকাতার কোঠির যে বড় সাহেব আছেন তাহারদিগের জাতের এক নিয়ম আছে যদি কেহ শরণাগত হয় তার জন্যে আপনার প্রাণ দিলেও যদি সে রক্ষা পায় তাহাও করেন। এ কেবল তাহারদিগের নিয়ম নহে সকলেরি শাস্ত্রে এই মত আছে শরণাগত রক্ষা ধর্ম্ম আর শরণাগত ত্যাগ করিলে অধর্ম্ম কিন্তু বিশেষ তাহারদিগের পণ প্রাণ থাকিতে শরণাগত ত্যাগ করেন না অতএব নিবেদন করি কিঞ্চিৎ কালের জন্যে রাজবল্লভ কলিকাতায় থাকুক পশ্চাৎ কৌশল ক্রমে আমি তাহাকে আনিতেছি হটাৎ এমত লিখন যদি আপনি লিখেন আর কোঠির সাহেব রাজবল্লভকে ত্যাগ না করেন তবেই বিবাদ উপস্থিত হইবেক তাহাতে যেরূপ কার্য্য করিতে আজ্ঞা করেন সেই মত কার্য্য করি। নবাব শুনিয়া অধিক ক্রোধ করিয়া কহিলেন এখনি কোঠির সাহেবকে লিখহ। পরে মহারাজ মহেন্দ্র মুনসিলোককে পত্র লিখিতে আজ্ঞা করিয়া দিলেন পত্রের বিবরণ এই॥

আত্মমঙ্গল সংবাদ লিখিয়া লিখিলেন আমার চাকর রাজা রাজবল্লভ ও রাজা কৃষ্ণ দাস এখান হইতে পলায়ন করিয়া আপনকার নিকটে রহিয়াছে অতএব ভাইজী তাহারদিগের দুই জনকে বন্ধন করিয়া শীঘ্র আমার নিকট পাঠাইবেন ইহাতে কদাচ অন্যমত করিবেন না। এই মত পত্র লিখিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন। কোঠির বড় সাহেব লিপি পাইয়া আপন প্রধান প্রধান পাত্র মিত্রগণকে আহ্বান করিয়া পত্র দেখাইলেন। চাকরেরা পত্র জ্ঞাত হইয়া সাহেবকে পত্রের অর্থ জ্ঞাত করাইলেন পত্রের

অর্থ শুনিয়া সাহেব হাস্য করিয়া আত্ম চাকরকে আজ্ঞা করিলেন পত্রের উত্তর লিখহ। নবাব সাহেবকে কলিকাতার কোঠির বড় সাহেব উত্তর লিখিলেন তাহার বিবরণ এই॥

আত্ম মঙ্গল সমাচার লিখিয়া লিখিলেন ভাই সাহেবের এক পত্র পাইয়া পরম হৃষ্ট হইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনকার চাকর রাজা রাজবল্লভ ও রাজা কৃষ্ণদাস দুই জন পলায়ন করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছে তাহার কারণ এই ভাই সাহেবের সঙ্গে আমার যথেষ্ট প্রণয় আছে আমার নিকট থাকিলে ইহারা ভয় হইতে মুক্ত হইবেক অতএব এ ক্ষুদ্র লোক ইহার প্রতি আপনকার ক্রোধ সে কেমন যেমন মেষের উপর সিংহের পরাক্রম অতএব আপনি এ দেশাধিকারী সকলের উপর কৃপাবলোকন করিয়া পালন করিতে উচিত হয়। ইহাতে যদ্যপি অল্প ২ অপরাধে চাকরেরদিগের উপর নিগ্রহ করেন তবে কর্ত্তার মহিমার ক্রটি হয়। আর লিখিয়াছেন দুই জনকে বন্ধন করিয়া শীঘ্র পাঠাইতে এ বড় আশ্চর্য্য বাক্য শরণাগত জনকে ত্যাগ করিতে সর্ব্ব শাস্ত্রে নিষেধ এবং আমারদিগের শাস্ত্রে ও ব্যবহারে যথেষ্ট মন্দ অতএব কিঞ্চিৎ কালের জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না আমি কৌশল ক্রমে রাজবল্লভকে নিকট পাঠাইব। আর আমারদিগের বাণিজ্য এ দেশে অনেক কালাবধি আছে তাহাতে রাজকরের যে নিয়ম আছে তাহা এখন দিতেছি হটাৎ আপনকার চাকরেরা অধিক লইতে চাহে এ বিষয় আপনি আত্ম লোকেরদিগকে বারণ করিয়া দিবেন যেন অধিক না চাহে॥

নবাব সাহেব কোঠির সাহেবের পত্রের উত্তর জ্ঞাত হইয়া পাত্রমিত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন কলিকাতার কোঠির সাহেব যে উত্তর লিখিয়াছেন তাহার শীঘ্র প্রত্যুত্তর লিখহ পাত্র আজ্ঞা মতে পত্র লিখিলেন তাহার বিবরণ এই॥

আত্ম মঙ্গল লিখিয়া লিখিলেন ভাইজীর প্রত্যুত্তর পত্র পাইয়া সংবাদ জ্ঞাত হইলাম। লিখিয়াছেন রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস দুই জন পলায়ন করিয়া আপনকার শরণাগত হইয়াছে অতএব শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগ করণে যথেষ্ট অধর্ম্ম সে প্রমাণ বটে কিন্তু রাজাজ্ঞা পরিত্যাগ করিলেও অধর্ম্ম আছে। আর আপনি বিদেশী তাহাতে মহাজন দেশাধিকারির সহিত বিবাদ হয় এমত কার্য্য করা উচিত নহে অতএব আমি এ দেশের অধিকারী আমার বাক্যে যদ্যপি নিয়ম ভঙ্গ হয় তাহাও পণ্ডিতের কর্ত্তব্য আপনকার সহিত যথেষ্ট প্রণয় আছে যাহাতে প্রণয় ভঙ্গ না হয় এমত করিবেন। আর লিখিয়াছেন আপনকার কোঠি যেখানে ২ সেই ২ স্থানে আমার লোকে অধিক রাজ কর লইতে উদ্যত হইয়াছে। তাহার কারণ এই পূর্ব্বে যখন আপনারা এ দেশে কোঠি করিলেন তখন অল্প ২ সামিগ্রীর বানিজ্য করিলেন এখন অতিশয় দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতেছেন অতএব ইহাতে কি রূপে পূর্ব্বের মত রাজকর থাকে। এবং সওদাগরেরদিগেরও এই ধর্ম্ম যদি অধিক বানিজ্য হয় তবে যে দেশাধিকারী থাকে তাহাকেও কিঞ্চিৎ অধিক দেয় সে যে হউক। এখন রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে শীঘ্র এখানে পাঠাইবেন এবং যেখানে২ আপনকার কোঠি আছে সেই ২ কোঠিতে সমাচার লিখিবেন অধিক রাজকর দেয় বরং এখন যে হারে রাজকর দিবেন এইমত চির কাল থাকিবেক। এইরূপ পত্র লিখিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন। দূত আসিয়া কোঠির বড় সাহেবকে পত্র দিলেক। ক্রমশঃ।

বাঙ্গালীর নেতৃত্ব।

"দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।"

লিখিতে বাসনা, কিন্তু ক্ষমতা অল্প, অধিকার আরো অল্প, কিন্তু ইতিহাসকে সাক্ষী করিয়া একথা না বলিলে, এদিনে, প্রত্যবায় হয় যে, এদেশের পোষ্যপুত্র মহারাজাগণ যতই বিরুদ্ধাচরণ করুন না কেন, বাঙ্গালীর ললাটে বিধাতা-নির্দ্দিষ্ট নেতৃত্বের তিলক বহু দিন হইতে শোভিত হইয়াছে। রামমোহন রায় অত্যাচারের নির্ম্মম কষাঘাতে কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ সর্ব্ববাদীসম্মতিতে তিনিই নব্যভারতের সর্ব্ব প্রকার উন্নতির নেতা রূপে পরিকীর্ত্তিত হইতেছেন। তাঁহার আগমনের বহু পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য বঙ্গের দুর্দ্দশা-কালিমা স্মরণে ব্যথিত হইয়া প্রথমে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, শেষে, তাহাও প্রচুর নহে বলিয়া, বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া উৎকলে শেষ-জীবন কাটাইলেন। তাঁহার স্বার্থত্যাগ, তাঁহার স্বদেশানুরাগ, তাঁহার প্রেম, তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র-মাধুর্য্য আজ ভারতের নবজীবনের কারণ হইয়াছে। রামমোহনের পরে হরিশ্চন্দ্র, রামগোপাল, রসিককৃষ্ণ প্রভৃতি যে সকল মহাত্মার অভ্যুদয় হইল, কে অস্বীকার করিবে যে, তাঁহাদের স্বদেশানুরাগ আজ ভারতের ঘরে ঘরে অনুসৃত হইতেছে না? তারও পরে, অক্ষয়কুমার এবং বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস এবং রাজেন্দ্রলাল একদিকে, দ্বারকানাথ এবং রমেশচন্দ্র মিত্র-যুগল অন্য দিকে; দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রাজনারায়ণ ও রামতনু একদিকে, এবং মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র অন্যদিকে, অভ্যুদিত হইয়া, বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিলেন;—শুধু তাহা নহে, তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনীতে ভারত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তৎপর আনন্দমোহন এবং সুরেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-যুগল, শিশিরকুমার এবং মনোমোহন ঘোষ-যুগল, এই বঙ্গে স্বদেশ-প্রেমের স্বর্গীয় সুষমা অদম্য তেজে প্রচার করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি-মণ্ডিত হইলেন। তৎপর বিপিনচন্দ্র এবং আরো কত কত মহাত্মা ঐ সুরে সুর মিলাইয়া বঙ্গে অবতরণ করিলেন। এই শেষোক্ত মহাত্মাদের মধ্যে কেহ কখনও মত পরিবর্ত্তন করেন নাই, বা ভীত হন নাই, একথা আমরা বলিতে পারি না। বলিতে পারি না যে, তাঁহারা সকলেই দেশের জন্য সর্ব্ব প্রকার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছেন। কিন্তু একথা বলিবার সময় সঙ্কোচের কোন কারণ নাই যে, বাঙ্গালীই নব্যভারতের নব-জাগরণের মূল। বাঙ্গালীর দায়িত্ব কত গভীর এবং বিস্তৃত, ভাই, তুমি স্থির চিত্তে, এই দুর্দ্দিনে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ।

এই সকল কথা লিখিবার সময়, আমরা বাঙ্গালী, আমাদের দোষ ক্রটী স্মরণ করিয়া বড়ই সঙ্কুচিত হইতেছি। সঙ্কুচিত হইতেছি—যে জাতির মধ্যে প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়া দিগ্বিজয়ী হইয়াছিলেন;—যে জাতির মধ্যে রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করিয়া স্বাধীন-চিত্ততার জন্য অতুল যশো-মণ্ডিত হইয়াছিলেন, বলিতে কি, যে জাতির মধ্যে "বন্দেমাতরম মন্ত্রের"—আবি-

কর্ত্তা, মহাসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় স্বাধীনতার পুরোহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই জাতির মধ্যেই কত স্বদেশদ্রোহী ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে! ব্রাহ্মণ বংশ ভারতের চির পূজ্য শ্রেষ্ঠবংশ, এই দেব-বংশে আজ কাল যে সকল কুলাঙ্গারের জন্ম হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে লজ্জায় বাঙ্গালীর মুখ মলিন হইয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া, মেটা, তুমি কখনও মনে করিও না, শতাব্দী-ব্যাপী বাঙ্গালীর নেতৃত্ব তুমি অধিকার করিতে পারিবে। তুমি যত বড়ই হও না কেন, বাঙ্গালী মহাজন-দিগের কথা ভাবিবার সময় একটু ভক্তি এবং সম্মানের সেবা করিও। মনে রাখিও, তোমার এবং তিলকের, তেলাঙ্গ এবং অযোধ্যা-প্রসাদের বহু পূর্ব্বে, রামমোহনের অভ্যুদয়, এই বঙ্গে হইয়াছিল। আর তুমি ইংরাজ, তুমি যত বড় ক্ষমতাশালীই হও না কেন, এই পুণ্যভূমি বঙ্গের কথা ভাবিবার সময়, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিম-চন্দ্রের কথা নিভৃতে এক একবার ভাবিও। শত শত-বৎসর-ব্যাপী তপস্যার ফলে বঙ্গ আজ বহু রত্নের অধিকারী—এহেন বঙ্গকে উপেক্ষা করিবার সময় একটু একটু একটু ভাবিও। আমাদের কোন সম্বল নাই, বলিতে কি, কিছুই নাই, কিন্তু, কিন্তু ভাবিও,—কত কত ঋষিপ্রতিম ব্যক্তির পূত চরণ-ধূলি এই বঙ্গভূমিকে পবিত্র করিয়াছে। এ জগতে কোন সত্য যেমন কখনও বিনষ্ট হয় নাই, তেমনি, কোন মহাত্মার জীবন-ধারণ বা জীবন-পাত ব্যর্থ হয় নাই—অণু পরমাণুতে মিশিয়া বংশানুক্রমে তাহা জাতির মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে। তোমাদের দেশে এক জনও শ্রীচৈতন্য বা রামমোহনের ন্যায় লোক জন্ম গ্রহণ করে নাই,—কেন বৃথা আস্ফালন কর,—কেন বৃথা অহঙ্কার কর? মনে রাখিও, বঙ্গ অজেয় পুণ্য-সাধনা-বলে অটল এবং নির্ভীক—কোটী কোটী বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের ফলে, মাতৃজাতির বুকের পুণ্যরক্তে, এই সাধক জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। মনে রাখিও, বাহু বলে নয়, রক্তপাত দ্বারা নয়, এই বাঙ্গালী জাতি কেবল নীতি, পুণ্য ও প্রতিভার সাধনা-বলে এই ভারতের নেতৃত্ব পাইয়াছে। যদি ধর্ম্ম এবং চরিত্র, পবিত্রতা এবং সংযম এই জাতির একমাত্র সাধনার বিষয় থাকে, নিশ্চয় জানিও, এই বাঙ্গালীর নেতৃত্ব কিছুতেই যাইবে না—বংশানুক্রমে ভারতের ঘরে ঘরে তাহা সংক্রামিত হইবে। আজ ভাই, জরা-মরণময় সংসারে, অমৃতত্বের আহ্বানে, আকাশ কাঁপাইয়া বল, জয় বাঙ্গালীর জয়।

আজ নানা দুশ্চিন্তায় আমরা সর্ব্বদা চক্ষের জলে ভাসিতেছি। উমেশচন্দ্র, আনন্দ মোহন, রমাকান্ত, কাব্যবিশারদ, ব্রহ্মবান্ধব স্বর্গে গিয়াছেন; অবশেষে, হায়, স্বদেশ-প্রেমিক মহা-রাজা সূর্য্যকান্তও আজ স্বর্গে;—বিপিনচন্দ্র আজ বিদেশে, সুরেন্দ্রনাথ বার্দ্ধক্যে প্রপীড়িত,—কত শত কথা ভাবিয়া আজ চক্ষের জলে ভাসিতেছি। যে দিকে তাকাই—কেবল নির্য্যাতন, নিপীড়ন, অত্যাচার, হায়, কত কত চিন্তায় আজ আমরা ম্রিয়মাণ। কিন্তু বিধাতার ইঙ্গিত কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না—তিনি সদা শয়নে, স্বপনে, জাগরণে বলিতেছেন,—"ভয় নাই, বাঙ্গালীর নেতৃত্ব নিশ্চয় অক্ষয় হইবে।" ভাইর কাছে ভাই, আজ দুঃখ বিপদে, মায়ের নাম স্মরণ করিয়া, প্রাণ বাঁধিয়া, একবার দাঁড়াও। এই চির-দরিদ্র দেশের একমাত্র রক্ষার উপায় "স্বদেশী-মন্ত্র", ভাই পায়ে ধরি, কিছুতেই এই মন্ত্র পরিত্যাগ করিও না। যাহারা স্বার্থসিদ্ধির

জন্ম বিপথে চালাইতে চায়, সেই পোষ্যপুত্র পা-চাটা-গোলামদের কথা শুনিও না। কত কত কারখানা উঠিয়া গিয়াছে,কত কত ব্যবসা মাটী হইয়াছে,কত কত লোক নিরন্ন হইয়াছে, কত কোটী কোটী লোক চক্ষের জলে ভাসিতেছে, একবার ধীর চিত্তে ভাব। ভাবিয়া, বুকে হাত দিয়া বলত, আর কি বিদেশী-দ্রব্য স্পর্শ করা উচিত? রসনাকে সংযত কর, ব্যবহারকে সংযত কর, জীবনকে সংযত কর। "সংযম" ভিন্ন কেহ এ সংসারে কখনও ধর্ম্ম পায় নাই। ধর্ম্ম ভিন্ন কেহ কখনও নৈতিক বল পায় নাই। নৈতিক বল ভিন্ন কেহ কখনও মনুষ্যত্ব পায় নাই। মনুষ্যত্ব ভিন্ন কেহ কখনও "নেতৃত্ব" পায় নাই। যদি বাঙ্গালীর "নেতৃত্ব"কে অক্ষুণ্ণ-রাখিতে চাও, সর্ব্বপ্রকার স্বার্থকে "স্বদেশী-মন্ত্র"-সাধনক্ষেত্রে বিসর্জ্জন দেও, এবং নীলকরদিগের অত্যাচার-প্রপীড়িত কৃষকগণ যেমন বলিয়াছিল, "এ হাতে আর নীল বুনিব না," তেমনি, প্রতিজ্ঞা কর,"এ হাতে আর বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ করিব না।" দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞায় দেশ কাঁপিয়া উঠুক,—মেটার দল বুঝুক যে,বাঙ্গালীর দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা কখনও টলিবে না। নিশ্চয় জানিও, এমন একদিন আসিবে, যেদিন মেটার দল পরাস্ত হইবে এবং "স্বদেশী মন্ত্রে," পূর্ণরূপে, ভারত দীক্ষিত হইবে। বাঙ্গালীর নেতৃত্ব অটুট থাকিলে, সোণার ভারত বাঙ্গালীর অনুসরণ না করিয়া কোথায় যাইবে? একদিন, নিশ্চয়, ভারত—"দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ"-মন্ত্রে পূর্ণরূপে দীক্ষিত হইবে। নিশ্চয় জানিও,একদিন "বন্দে মাতরম" মন্ত্রের জয় হইবেই হইবে।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১৬। শ্রীমৎ শিবনারায়ণ স্বামী কৃত পূর্ণ সাধনা।—স্বামীজির দীর্ঘকাল-সাধনা-প্রসূত অমূল্য উপদেশ পাঠে আমরা সুখী হইলাম।

১৭। রাখীবন্ধন।—শ্রীঅনাথবন্ধু সেন প্রণীত, মূল্য /১০। পুস্তকখানি পড়িয়া সুখী হইলাম। একটী কবিতার একটু উদ্ধৃত করিলাম।

"মায়ের প্রসাদী রাখী, আয় হাতে আয়,
বেঁধে রাখি তোরে আমি অসীম মায়ায়!
তোমারে করিয়া পূজা পূজিব সে দশভুজা,
জ্ঞান-কর্ম্ম-ধর্ম্মরূপা দেবী অন্নদায়!
আজি হেথা দীক্ষা লবো, পবিত্র, সুন্দর হবো,
পাব সঞ্জীবনী শক্তি বাঙ্গালী হিয়ায়!
নিত্য এ কুটীর-কোণে সমাদরে, সঙ্গোপনে,
পিয়াবি অমৃত-কণা অতুল কৃপায়!
মায়ের প্রসাদী রাখী আয় হাতে আয়!
বাঁধিলাম পুণ্য রাখী—জয় ভগবান!
এবার সফল কর বাঙ্গালীর প্রাণ!
বিশ্বের আদর্শ ধর্ম্মে জাগি যেন জ্ঞান-কর্ম্মে,
পরার্থে করিহে যেন আত্ম বলিদান!
জননী-জনমভূমি স্বর্গ হতে শ্রেষ্ঠ তুমি!
সর্ব্বোপরি আছ দেব পূর্ণ ভগবান!
স্মরি' স্নেহময়ী মায়, মাতৃ জ্যোতি-মহিমায়
পুণ্যবলে ধরাতলে বাড়াই সম্মান!
ভূমানন্দে জাগো প্রাণে পূর্ণ ভগবান!
তুমি পূর্ণ ভগবান!"

কি সুন্দর!

১৮। তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত।—শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত, মূল্য ৷৷৵৹। তিলকের চিত্র এবং হস্তাক্ষর সম্বলিত। ১৬ পেজ ডবল ক্রাউন ১২০ পৃষ্ঠায় পুস্তক পরিসমাপ্ত। মূল্য অতি সুলভ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মহামতি তিলকের নিন্দাবাদ ঘোষণা করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, দেউস্কর মহাশয়কে, হিতবাদীর সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এতদিন পর এই দুঃখ দূর হইয়াছে, তিলকের প্রতি গ্রন্থকারের অকৃত্রিম অনুরাগ ও ভক্তি প্রকাশের উপযুক্ত অবসর মিলিয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে সখারামের গভীর স্বদেশানুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে।

দেউস্কর মহাশয়ের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা প্রভূত পরিমাণে উপকৃত। তাঁহার আদর্শ জীবন বঙ্গের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইতেছে, ইহা ভাবিলেও আমরা গৌরবান্বিত হই। এই এক দৃষ্টান্তে প্রতিপন্ন হয় যে, বাঙ্গালীর সহিত অচিরে ভারতের সকল জাতির একতা হইবে। দেউস্কর মহাশয়কে, বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের জন্য, প্রণাম করিতেছি।

এই সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিতখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। দেউস্করের লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক।

গ্রন্থখানিতে মহামতি তিলকের মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় যাবতীয় কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আশা করি, প্রত্যেকে ইহার এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া তিলক-প্রীতি দেখাইতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

পরিশেষে অতি দুঃখের সহিত লিখিতেছি, পুস্তকখানি বিলাতী কাগজে মুদ্রিত। কাগজের এজেণ্ট শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় দুঃখ করিয়া বলিতেছিলেন, "বলিব কি, সন্ধ্যা প্রভৃতি কাগজের কথা দূরে থাকুক, উইকৃলি নোটস্ প্রভৃতিও বিলাতী কাগজে ছাপা হয়!" বাস্তবিক এ দুঃখ আমাদের রাখিবার ঠাঁই নাই। "মুখে এক, কাজে আর এক" —এই ভাব দূর না হইলে এদেশের মঙ্গল হইবে না। দেশের নেতাগণের ব্যবহারেই বুঝি বা "স্বদেশী" পণ্ড হয়।

১৯। নূরজাহান। নাটক। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত, মূল্য ১৲।

দুর্গাদাস যে হাত হইতে বাহির হইয়াছে, ইহাও সেই হাতের লেখা। গ্রন্থকারের লেখনী ধারণ সার্থক হইয়াছে।

মহবৎ খাঁর জীবনী এক আশ্চর্য্য জিনিস। মহাবৎ খাঁ যখন জাহাঙ্গীরকে বলিতেছেন— "কে আপনি? কোথা থেকে এসেছেন? কি স্বত্বে আপনি এক অতি পুরাতন সভ্য-জাতিকে শাসন কর্ত্তে বসেছেন—যদি সে ন্যায়ের শাসন না হয়? হিন্দু এ সাম্রাজ্য হারিয়েছে, কারণ তার আশা ভরসা এখানে নয়, (উর্দ্ধে অঙ্গুলি দেখাইয়া) ঐখানে। সে ইহকাল হারিয়েছে, পরকালের বিষয়ে বড় অধিক ভেবে। তবু জানবেন সম্রাট—যে, যদি এ শাসন অন্যায়ের শাসন হয়, যদি এ শাসন একটা বিরাট অত্যাচার মাত্র হয়, যদি হিন্দুর এই অসীম ঔদাসীন্যকেও ক্ষেপিয়ে তোলেন ত নিমিষে মোগল সাম্রাজ্য প্রভাতের কুজ্ঝটিকার মত বিলীন হয়ে যাবে।"— তখন মনে হয়, মহবৎ খাঁ মানুষ নন্, দেবতা। এই দেবতার চিত্র যেভাবে গ্রন্থকার চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে গ্রন্থকারের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয়ে মুগ্ধ হইতে হয়।

এই মহাবৎ খাঁ সম্বন্ধে যখন কর্ণসিংহ (মেবারের রাণা) বলিতেছেন—"যখন মনে হয় যে, মহাবৎখাঁর মত ধর্ম্মভীরু কর্ম্মবীর ব্যক্তিকে গুটি কতক আচারগত বৈষম্যের জন্ম আপনার বলে জাতির মধ্যে আলিঙ্গন করে' নিতে পারি না, তখন বুঝি কেন আমাদের অধঃপতন হয়েছে। যেখানে জীবন, সেখানে সে বাহিরের জিনিস টেনে নিজের করে' নেয়। আর যেখানে মরণ, সেখানে সে শতধা হয়ে নিজেই গলে' খসে' পড়ে। আমাদের এই মহাবৎকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি—আর আপনারা আপন করে' নিয়েছেন। তাই আপনারা উঠছেন, আর আমরা পড়ছি।"—তখন মনে হয়, একজন, স্বদেশ-ভক্ত লোকও যখন এইরূপ ভাবিতেছেন, তখন জাতিভেদের শৃঙ্খল অচিরে ছিন্ন হইবে এবং স্বদেশ-প্রেমে "সব ভাই এক-ঠাঁই হইবে।"

এই গ্রন্থখানি দুর্গাদাসের সমতুল্য না হইলেও, অযোগ্য নয়। আমরা বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া যারপর নাই সুখী হইয়াছি।

২০। ভুতুড়ে কাণ্ড। শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মূল্য ।৵০। আদ্যন্ত পড়িলাম। আমরা এ সকল কাহিনী সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি না। বহুদিন আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, যে সকল লোক চক্রে বসেন, তাঁহাদের "জ্ঞাত কথাই" বাহির হইয়া থাকে। "মেস্‌রিজম"আমরা স্বীকার করি,"উইল পাওয়ার" অন্যে সংক্রামিত হয়, জানি; কিন্তু এ সব ভুতুড়ে কথা বিশ্বাস করি না। বিশেষতঃ তথা-কথিত প্রেতাত্মারাও যখন এরূপ করিতে বারম্বার নিষেধ করিয়া থাকেন, তখন এরূপ চর্চ্চায় সময় ক্ষেপণ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

পুস্তকের লেখা ও ছাপা ভাল। কিন্তু কাগজ—ঐ বিলাতী! হায়রে হায়!!

২১। বাল গঙ্গাধর তিলক। (সংক্ষিপ্ত জীবনী) মূল্য ৵০। এই সময়োপযোগী সংক্ষিপ্ত জীবনী পড়িয়া আমরা সুখী হইলাম।

২২। মায়ের গান। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ／০ হিসাবে। অনেক ভাল ভাল লোকের ভাল ভাল গান এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

২৩। স্বদেশী পল্লী-সঙ্গীত। চতুর্থ সংস্করণ। মূল্য ৵১০। পূর্ব্ব বঙ্গের ভাষায় অনেক সুমিষ্ট গান এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

২৪। বঙ্গলক্ষ্মীর পাঁচালী। মূল্য ／০। এই পুস্তকের কবিতা কয়েকটী প্রত্যেকের কণ্ঠস্থ করা উচিত। সুন্দর পুস্তক। একটু তুলিয়া দিলাম—

হায় মাতঃ বঙ্গ ভূমি, কি দুঃখ পেয়েছ তুমি,
কিসে হবে এ দুঃখ মোচন।
পরাণ ত্যজিলে হায়, যদি দুঃখ ঘুচে যায়,
এ পরাণ দিব বিসর্জ্জন॥
এত দিন ঘুম ঘোরে দেখি নাই একেবারে,
মায়েরে করেছে দীন হীনা।
ছিল যেই রাজরাণী, আজি সে যে ভিখারিণী
অভাগিনী বিষাদ-মলিনা॥
হায় হায় কি ভীষণ, মা'র বক্ষ বিদারণ,
ছিন্ন অঙ্গে লুটায় জননী।
সহেনা বিলম্ব আর, চল ভাই পুনর্ব্বার
ঘুচাইব এ দুঃখ এখনি॥
আমরা'ত সাত কোটি, যদি এক সাথে জুটি,
কিসে বা দুর্ব্বল, কিবা ভয়।
চল ভাই চল ভাই, আর ত সময় নাই,
ডাকে ঐ জননী সবায়॥
সব না এ অপমান, যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
ঘুচাব ঘুচাব এই দুঃখ।
আবার মায়ের ঘরে, বসাইব কমলারে
উজ্জ্বল করিব মা'র মুখ॥

মহাত্মা রামমোহন রায় ও তাঁহার ধর্ম্ম

মানব জীবনের ইতিবৃত্ত অন্বেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে জননী জঠরে অধিষ্ঠানের পূর্ব্বে আমরা কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম তাহা জানি না। জননীর জঠরে আমাদের সূত্রপাত কেবল এক শোণিত বিন্দুর ন্যায় একটী সামান্য কোষমাত্র। উহা ক্রমে বহুকোষে পরিণত হইয়া অবশেষে ইন্দ্রিয় সকল, শারীরিক যন্ত্র, তন্তু ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিকশিত হয় এবং যথাকালে আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করি। এখানে প্রথমে আমরা নিতান্ত অজ্ঞান অবস্থাতেই বাস করি। পরে ইন্দ্রিয় সকল ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতে থাকে এবং উহাদের সাহায্যে আমরা জগতের জ্ঞানলাভ করি। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, ইচ্ছাবৃত্তি, ভাব প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির সীমা যে কোথায়, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে পারি না। মানবমনে যে উচ্চ অসীম আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, তাহা আমরা সততই দেখিতেছি। আমরা আমাদের জ্ঞানে, প্রেমে ও পুণ্যে কখনই সন্তুষ্ট নহি—যত পাই আরো তত চাই। এই যে অনন্ত পিপাসা, ইহা পৃথিবীর কয়েক বৎসর ব্যাপী জীবনে তৃপ্ত করা সম্ভব নহে। যিনি আমাদিগকে এই উচ্চ বাসনা সকল দিয়াছেন, তিনি কি তাহা পূর্ণ করিবার জন্য আমাদিগকে সময় দিবেন না, তাঁহার ন্যায় ন্যায়বান করুণাময় পুরুষের পক্ষে ইহা কি সম্ভব? মানুষ যে এ জীবনেই কত উচ্চ ও মহৎ হইতে পারে, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত যুগে যুগে এ পৃথিবীতে রাখিয়াছেন। সেই মহৎ আদর্শ সকলের দিকে তিনি আমাদিগকে সততই টানিতেছেন।

তিনি আমাদের শরীর, মন ও আত্মার রক্ষার্থে ও তাহার বিকাশের জন্য এ পৃথিবীকে ধনধান্য, জ্ঞান ও প্রেমপুণ্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার সকল দানের মধ্যে এই মহাত্মাদিগের দান একটী বিশেষ দান। আজ এক শত চৌত্রিশ বৎসর অতীত হইল, এইরূপ এক মহাত্মাকে পরাধীন, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতবর্ষে প্রদান করিয়াছিলেন। মহৎ লোকের মূল্য তাহাদের গুণানুসারে হইয়া থাকে। কেবল বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞানে মহৎ হইলে হয় না; উহার সহিত যদি নীতি ও ধর্ম্ম না থাকে, উহার মূল্য অতি সামান্য। এমন কি এরূপ বুদ্ধি, মন্দ অভিপ্রায়ে নিয়োগ করিলে পরে তাহাতে জগতের ঘোর অনিষ্টপাত হয়। কিন্তু, কেবল মানসিক বলে মহৎ না হইয়া, উহার সহিত যদি চরিত্রবল সংযুক্ত হয় এবং তাহা জগতে উচ্চ অভিপ্রায়ে নিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হয়। আলেকজাণ্ডার, সিজার, নেপোলিয়ান বা ওয়েলিংটনের যে মহত্ত্ব, তাহাতে শুভ অশুভ উভয়ই মিশ্রিত আছে। উহাদের কার্য্যের একদিকে যেমন গঠন

* মহাত্মা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিন উপলক্ষে ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সম্মিলন সমাজে প্রদত্ত উপদেশ।

প্রয়াসী, অপরদিকে তেমনি ধ্বংসকারী। অন্ত এক শ্রেণীর মহৎ লোক আছেন, যাঁহাদের কার্য্য কেবল শুভ ও কল্যাণের নিমিত্তই আবিষ্কৃত। তাঁহারা সমগ্র মনুষ্যজাতির কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং আজও করিতেছেন। এই শ্রেণীতে আমরা সক্রেটিস, প্লেটো, লুথার, যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য এবং মহাত্মা রামমোহন রায়কে দেখিতে পাই। রামমোহন রায়ে অসাধারণ ধীশক্তি, সত্যানুরাগ, প্রেম, ভক্তি, ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি গুণাবলী একাধারে দেখিতে পাই। এই সকল সদ্‌গুণরাশীই জগতকে ক্রমশ উন্নতির পথে লইয়া যায়।

এইরূপ মহাত্মাদের জীবনে কয়েকটী বিশেষ গুণ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, বিশ্বপ্রেম। তাঁহারা হৃদয়ে পৃথিবীর সকল লোক, সকল জীবজন্তুকে ধারণ করিয়া থাকেন; সকলের শুভ-কামনা ও মঙ্গলের জন্ম তাহারা সর্ব্বদাই ব্যস্ত। তাঁহাদের নিজেদের জন্ম দুঃখ করিবার কিছু না থাকিলেও, পৃথিবীর দুঃখ, দারিদ্র্য, পাপ তাপের জন্ম সর্ব্বদাই দুঃখিত। বুদ্ধদেব ত জগতের দুঃখ কষ্টের ভার লাঘব করিবার জন্যই সাধন করিয়াছিলেন। যিশুকে "*Man of sorrows*"—মূর্ত্তিমান দুঃখ বলিত। রামমোহন রায়ের প্রাণেও এই বিশ্বব্যাপী প্রেমের আবাস ছিল। তিনি যে কেবল স্বদেশের দুঃখ কষ্ট, পাপ কুসংস্কার প্রভৃতির অন্ধকার দুর করিবার জন্ম জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। সমগ্র পৃথিবীতে রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক, সামাজিক উন্নতির বিষয়ে তাহার একান্ত সহানুভূতি ছিল।

কোন স্থানে স্থায় ও সত্যের জয় হইয়াছে শুনিলে তাহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিত। ১৮২১ খ্রীঃ স্পেন দেশে নিয়মতন্ত্র শাসন প্রণালী সংস্থাপনের সংবাদ কলিকাতায় আসিলে, তিনি এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তজ্জন্ম কলিকাতা টাউন হলে নিজ ব্যয়ে একটী প্রকাশ্য ভোজ (public dinner) দিয়াছিলেন। সেইরূপ পর্টুগাল দেশে ঐরূপ নিয়মতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে শুনিয়াও তাহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছসিত হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে বিবাদের সংবাদ লইতেন। যাহাতে গ্রীকেরা তুরস্কবাসীগণের অধীনতা ও অত্যাচার হইতে মুক্ত হয়, ইহা তিনি একান্ত হৃদয়ে কামনা করিতেন। নেপালবাসীরা স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে শুনিয়া তিনি মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। মিঃ অকল্যাণ্ড নামক একজন ইংরাজের সহিত সে দিন তাহার সাক্ষাৎ করিবার কথা ছিল; তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, নেপালীদের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া মন বিষাদে পূর্ণ হইয়াছে, সে দিন আর তাঁহার সহিত দেখা করিবার সাধ্য নাই। ১৮৩০ সালে ফরাসী বিপ্লবেও তিনি যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাজনীতির প্রতি তাহার দৃষ্টি অধিকতর আকৃষ্ট ছিল। এক সময়ে ইংলণ্ডের আইন অনুসারে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী কোন ব্যক্তি পার্লেমেণ্ট সভার সভ্য হইতে অথবা গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোন কর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিতেন না। সেই সকল অন্যায় আইন রহিত হওয়ার জন্ম তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেন। Repeal of Test and Corporation Act এ যখন উহারা স্বাধীনতা লাভ করিল ও ১৮৩০ সালে হুইগ্‌রা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি Reform

Bill পাস হওয়া সম্বন্ধে যে কেবল আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা নহে; তজ্জন্য অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, সকল মহাজনদিগের জীবনে দেখা যায় যে ইঁহারা গতানুগতিকে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে নিজেরা একবার তলাইয়া দেখিবেন, সত্যের ভূমি কিছু পাওয়া যায় কিনা এবং জীবন মরণ পণ করিয়াও এই ব্রতসাধনে নিযুক্ত ছিলেন। বুদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিয়া বোধি দ্রুমের তলে বসিলেন, আলোক না পাইলে উঠিবেন না। যীশু চল্লিশ দিবা রাত্রি অনাহারে অরণ্য মধ্যে পড়িয়া রহিলেন, সত্যের সাক্ষাৎ না হইলে উঠিবেন না। মহম্মদ হরা পর্ব্বতের গহ্বরে পড়িয়া চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন, সত্যের আলোক না পাইলে প্রাণ রাখিব না। এইরূপে তাহারা যে সত্য,যে আলোক পান তাহাতেই আজীবন ঢালিয়া দেন। বুদ্ধ যে নির্ব্বাণ মুক্তির মন্ত্র ধরিলেন, তাহা চিরজীবন তাঁহার জপমালা হইয়া রহিল। যীশু যে স্বর্গ রাজ্যের ভাব হৃদয়ে পাইলেন, তাহা আর তাহাকে ছাড়িল না। "এক ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বর নাই"—মহম্মদ শেষ দিন পর্য্যন্ত ইহাই প্রচার করিয়াছিলেন।

মহাত্মা রামমোহন রায় চির-প্রচলিত মত ও ক্রিয়াতে অসন্তুষ্ট হইয়া, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে,কুসংস্কার,দেশাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে, ১৬ বৎসর হইতে ৫৯ বৎসর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান দেশ মধ্যে প্রচার ও ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। লোকে বলিতে পারে, রাম মোহন রায় নূতন কি করিয়া গিয়াছেন? ব্রহ্মজ্ঞান ত যোগী ঋষিরা ভারতবর্ষে অনেক দিন প্রচার করিয়া গিয়াছেন। উপনিষদ ব্রহ্ম বিষয়ক উপদেশে পরিপূর্ণ। জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে নিরাকার পরমেশ্বরের সার্ব্বভৌমিক উপাসনা প্রচার, তাহার বিশেষত্ব। তিনি বলিলেন "ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, হিন্দু কি যবন, এস সকলে এক নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করি।" এই সার্ব্বভৌমিক উপাসনায় জনসমাজ প্রতিষ্ঠা জগতের পক্ষে, অন্ততঃ ভারতের পক্ষে, নূতন।

তৃতীয়তঃ, অপরিসীম সাহস। ইহা সকল মহাত্মাদের জীবনেই দেখা যায়। রাজার প্রসাদ বা ভ্রূকুটী, সকলই তাঁহারা তুচ্ছ করেন, কেননা তাঁহারা এ পৃথিবীর সুখ দুঃখের উপরে উঠিয়া থাকেন। পৃথিবীর অত্যাচারকেও ভয় করেন না, অবাধে জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। রামমোহন রায়ের অতুল সাহস ছিল। তিনি কলিকাতায় আসিয়া যখন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে মত প্রচার করেন ও নানা পণ্ডিতদের সহিত প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের বিপক্ষে তর্কবিতর্ক করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার অনেক শত্রু হইল। এমন কি, তাঁহার প্রাণবধের কল্পনাও হইয়াছিল। তাঁহাকে তাঁহার বন্ধুরা রাত্রে গৃহের বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তিনি তাহা শুনিতেন না। একদা কতকগুলি লোক তাহার গম্যপথের অদূরে দণ্ডায়মান ছিল। তাহাদের অভিপ্রায়, তাঁহাকে আঘাত করে। তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া নির্ভয়ে একাকী তাহাদের সম্মুখে অগ্রসর হইলেন এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কি চায়। তাহারা লজ্জিত হইয়া সকলেই পলায়ন করিল।

চতুর্থতঃ, আশা। সকল মহাত্মারাই আশায় বলশালী ছিলেন। জগতের ধর্ম্মনিয়মের

প্রতি আশা, নিজদের প্রতি আশা ও মানবের প্রতি আশা। তাঁহারা সত্য ও সাধুতার জয় অনিবার্য্য বলিয়া অনুভব করিতেন। মানব প্রকৃতি যে ধর্ম্মের অনুকূল, তাহাও তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। এইরূপ আশা ছিল বলিয়াই তাঁহারা এত নিষ্ঠার সহিত আজীবন কার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন। এই আশার বলে বলীয়ান হইয়া, রামমোহন রায় ১৮৩৬ শকে একাকী বিদেশী উদাসীনের ন্যায় কলিকাতা আসিয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন।

পঞ্চমতঃ, ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভর। তাঁহাদের নিজেদের প্রতি নির্ভর ছিল না, তাই মহাত্মারা এতদূর সাহসী হইতে পারিয়াছিলেন। সেই ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস ছিল বলিয়া তাঁহাদের হৃদয় এত আশায় পূর্ণ ছিল। তাঁহারা দেখিতেন যে তাঁহাদের ক্ষুদ্র শক্তির পশ্চাতে ধর্ম্মের অদম্য ও অবিনশ্বর শক্তি রহিয়াছে।

ষষ্ঠতঃ, স্বার্থত্যাগ। যেখানে প্রেম, যেখানে বিশ্বপ্রেম, সেখানে স্বার্থ কিছুতেই থাকিতে পারে না, ইহা আমরা জীবনের সকল বিভাগেই দেখিতে পাই। মহাত্মারা মানব জাতির কল্যাণের জন্য ধন, মান, রাজ্য, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছেন, —জীবন দিতেও কখন কুণ্ঠিত হন নাই। রাম মোহন রায় অর্থ ও সামর্থ সকলই দেশের কল্যাণের জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন; জীবনের শেষদশায় তাহার অর্থকষ্টও যথেষ্ট হইয়াছিল।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনের সহিত অন্যান্য মহাত্মাদের জীবনের কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়। তিনি ধর্ম্ম-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক-সংস্কার, শিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতি জীবনের সকল বিভাগেই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় আদর্শ পুরুষ অতি বিরল; তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম মতের মূর্ত্তিমান দৃষ্টান্ত। তিনি ধর্ম্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোন বিরোধ দেখিতে পান নাই, প্রত্যুত, এ উভয়কেই মনুষ্যজীবনের অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতেন। যে রাম মোহন রায় ভারতবর্ষে একেশ্বরবাদ, ব্রহ্ম জ্ঞান প্রচারে অসাধারণ উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত ছিলেন, যিনি সুতীক্ষ্ণ তর্কশাস্ত্রে পৌত্তলিক, খ্রীষ্টান ও মুসলমানদিগের বিচারজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন, যিনি ভারতবাসিনী অনাথা বিধবাগণকে জ্বলন্ত চিতা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি অবলাকুলের মঙ্গলের জন্য বহুবিবাহ ও দায়াধিকারের অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপনার তেজস্বিনী লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন, তিনিই আবার ভারতের অশেষ অনিষ্টের মূল জাতিভেদ প্রথার মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন, তিনিই জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য বঙ্গভাষায় ব্যাকরণ ও সাধারণ হিতকর অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনিই ভ্রাতৃগণের বৈষয়িক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন।

তিনি যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা তাহার কয়েকটী বিশেষত্ব আমরা এখানে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব।

"প্রথমতঃ উদারতা। ব্রাহ্ম ধর্ম্মে কোন ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ, হিংসা বা ঘৃণার স্থান নাই। ব্রাহ্ম বিধাতার জীবন্ত বিধাতৃত্বে বিশ্বাস করেন; সকল ধর্ম্ম, সকল মহাজনের মধ্যে তাহার অভিব্যক্তি দেখেন, সেইজন্য তিনি উদার। শিশুর শরীর যেমন মাতৃজঠরে শোণিত বিন্দু হইতে ক্রমশ বিকাশিত হইয়া পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মও সেইরূপে

বিকশিত হইয়াছে; কিন্তু ইহার বিকাশ এখন শেষ হয় নাই। ব্রাহ্ম অনুভব করেন, তিনি সেই বংশের সন্তান সমগ্র পৃথিবী যাঁহাদের বাসস্থান, ঈশ্বর যাঁহাদের পিতামাতা, সকল সাধু মহাজন যাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জগৎ ও মানব-প্রকৃতি যাঁহাদের দুই প্রধান গ্রন্থ এবং স্বয়ং পরিত্রাতা ঈশ্বর যাঁহাদের শিক্ষক ও গুরু। সুতরাং ব্রাহ্ম উদার।"

দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা।

"ঈশ্বরান্বেষণ, আত্মার উন্নতি সাধন ও মুক্তি লাভ বিষয়ে মানবাত্মা সম্পূর্ণ স্বাধীন। মুক্তি কেহ কাহাকেও দিতে পারে না, সকলকেই স্বাধীন ভাবে অন্বেষণ করিয়া লাভ করিতে হয়। পাপ হইতে পুরোহিত বা পোপ মুক্ত করিতে পারে না, দানে বা ধর্ম্মের বাহ্য ব্যাপারে কিছু হয় না; পাপের যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত—অনুতাপ ও ভবিষ্যতে তাহা হইতে বিরত হওয়া। মানব শিশু যেমন পড়িয়া উঠিয়া, উঠিয়া পড়িয়া, হাঁটিতে শিখে সেইরূপ আমাদিগকে তত্ত্বচিন্তা, তত্ত্বানুসন্ধান, আত্মদর্শন, পাপ প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম, অনুতাপ অশ্রুপাত প্রভৃতির দ্বার দিয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়।

"ধর্ম্ম জীবনের প্রাণ স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন তত্ত্বান্বেষণ। প্রকৃত স্বাধীনতার মূল মন্ত্র এই—ঈশ্বর প্রত্যেককে মূলধন স্বরূপ দেহ মনের যে কিছু শক্তি সামর্থ দিয়াছেন, সে তাহার নিজ জীবনের মহত্ত্ব সাধনের জন্য নিয়োগ করিবে। সত্যে ও ঈশ্বরে বিমল প্রীতি না জন্মিলে মানুষ যথার্থ স্বাধীন হইতে পারে না; সে আসক্তি ও ভীতির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেনা, সে বন্ধন দশাতেই থাকে; সে বাহিরে দেখিতে স্বাধীন হইলেও, পরাধীন।

"তৃতীয়তঃ, আধ্যাত্মিকতা। প্রাচীন ধর্ম্ম বলিয়াছেন—উপাস্য দেবতার সন্তোষার্থে কিছু দিতে হইবে; ব্রাহ্মধর্ম্মও বলিতেছে, ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে কিছু হইতে হইবে। প্রাচীন ধর্ম্মসাধন প্রণালীতে দেখা যায়, তুমি যাহাই হও, যেরূপ হও, যদি কিছু দিতে পার, নৈবেদ্য বা বলি বা দেব দ্বিজে দান প্রভৃতি, তবেই দেবতা প্রসন্ন; সব পাপ ক্ষয়। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বলে তুমি কিছু দিতে পার আর নাই পার, তোমার চরিত্রকে ঈশ্বরারাধনার, উপাসনার উপযোগী করিতে হইবে। তিনি সত্য স্বরূপ, ন্যায়স্বরূপ, প্রেম স্বরূপ ও পবিত্র স্বরূপ; তাঁহার আরাধনার উপযুক্ত হইবার জন্য তোমাকে সত্য, প্রেম, ন্যায় ও পবিত্রতাতে উন্নত হইতে হইবে। অর্থাৎ, জ্ঞানকে মার্জ্জিত করিতে হইবে, বিবেককে উজ্জ্বল করিতে হইবে, এবং পবিত্রতাকে দৃঢ় করিতে হইবে। আরাধনাকে কোন বিশেষ মুহূর্ত্তের বা বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা মনে না করিয়া সমগ্র জীবন আরাধনা করিতে হইবে।"

"চতুর্থতঃ, সাম্য। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিশ্বাস করেন যে জাতি, বর্ণ, অবস্থা নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানবাত্মার পরমেশ্বরকে জানিবার পক্ষে ও তাঁহাকে প্রীতি করিবার পক্ষে সমান অধিকার। ইহা এ দেশের পক্ষে নূতন। যে দেশের প্রচলিত উপদেশ, ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের মুখ হইতে, শূদ্র পদ হইতে উৎপন্ন—ধর্ম্ম যাজনে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নে শূদ্রের অধিকার নাই—সে দেশে এই মহাসত্য সামাজিক জীবনে এক নূতন আদর্শকে উপস্থিত করিতেছে।"

পূর্ব্বোক্ত আদর্শের বিষয় চিন্তা করিলে সমাজ ও পরিবার কিরূপ হওয়া উচিত তাহা অনুভব করা যায়। উহার মধ্যে সাম্য, সুনীতি,

জ্ঞানালোচনা, ন্যায়পরতা, প্রীতি, পবিত্রতা, চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতা এবং উদারতার স্থান প্রাপ্ত হওয়া উচিত। এই সুন্দর ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম যেন আমাদের জীবনে ও পরিবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।"

উপসংহারে আমরা এখানে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে উক্তির কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি —

"তাঁর শরীরের বল, মনের বীর্য্য, হৃদয়ের ভাব সকলই অনুরূপ। ধর্ম্মের উন্নতির জন্য এখানে উদিত হন। তিনি জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একাকী অসংখ্য প্রকার পৌত্তলিকতার সহিত নিরন্তর যুদ্ধ করিলেন এবং সকলকে পরাভূত করিয়া অবশেষে গঙ্গার স্রোতের উপর এই সমাজ-রূপ জয়-স্তম্ভ নিখাত করিলেন। তিনি যে সময় উৎ-পন্ন হইয়াছিলেন, সে সময়কার ভীষণ সামা-জিক ভাব ও অবস্থা মনে হইলে হৃদ্‌কম্প হয়। তখন অন্ধকারের কাল, দ্বিপ্রহরা রজনীর কাল ; এখন আমরা সে সময়ের ভাব বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না, যে সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের নামে সকলেই খড়্গ-হস্ত হইত। বঙ্গভূমি নিবিড়ান্ধকারাবৃত অরণ্য ভূমি ছিল। ভ্রষ্টাচারের পিশাচ সকল তাহাতে রাজত্ব করিত। তিনি একা শত সহস্র শত্রু দ্বারা আবৃত হইয়া কুঠার হস্তে সেই ঘোর অবিদ্যা-রণ্য সমভূমি করিয়া দেশোদ্ধারে প্রবৃত্ত হই-লেন এবং অবশেষে তাহাতে ব্রহ্মসমাজ রূপ বীজ স্থাপন করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে সংসারের মধ্যে আনয়ন করিলেন। তঁহারই প্রখর জ্ঞানশাস্ত্রে কুসংস্কাররূপ অরণ্য ছিন্ন ভিন্ন হইল। তাঁহারই বুদ্ধির কিরণে প্রথম আলোক তাহাতে প্রবৃষ্ট হইল। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁহার কত যত্ন করিতে হই-য়াছিল ; তাঁহার ধন গেল, সমুদয় বিষয় গেল ; তখন তাঁহার মনে এই আনন্দ ছিল যে ভবিষ্যদ্বংশ তাহার আশা সকল করিবে। তিনি জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, আমরা কর্ষণ করিয়া উহাকে উর্ব্বরা করিব। যে মহাত্মা আপনার হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রথম পথ আবিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, আমরা যেন তাঁহার দৃষ্টা-ন্তের অনুকরণ করি। যখন তিনি কলিকাতা নগরে আসিলেন, তখন লোকে তাঁহাকে ধর্ম্ম চ্যুত, ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট, নরকে পতিত বলিয়া তিরস্কার করিত। কিন্তু ক্রমে সে সময়কার কলি-কাতার ক্ষমতাপন্ন অনেক বড় মানুষ তাঁহার সহচর হইলেন। ধর্ম্ম সভা তাঁহার বিপক্ষদল, সতী দগ্ধ করিবার দল, তাঁহাদের আধিপত্য অত্যন্ত অধিক। তাহারা ব্রাহ্ম সমাজকে জ্বালাইয়া দিবেন বলিতেন, কেহ বলিতেন রামমোহন রায়কে মারিয়া ফেলিবেন ; কিন্তু তিনি গম্ভীরভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন, কোন সহযোগী সঙ্গে থাকুক আর না থাকুক। তিনি মাণিকতলা হইতে পদব্রজে সমাজে আসিতেন। এই একটী তাঁহার অতীব শ্রদ্ধার ভাব ছিল।"

শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার মৃত্যুতে লিখিয়াছিলেন—"তোমার জ্ঞান ও ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত হৃদয় জঙ্গলময় পঙ্কিল ভূমি পরিবেষ্টিত একটী অগ্নিময় আগ্নেয়গিরি ছিল। তাহা হইতে পুণ্য পবিত্র প্রচুর জ্ঞানাগ্নি সতেজে উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত। তুমি বিজ্ঞানের অনুকুলপক্ষে যে সুগভীর রণবাদ্য বাদন করিয়া গিয়াছ, তাহাতে যেন এখনও আমাদের কর্ণকুহর ধ্বনিত হইতেছে। সেই অত্যুন্নত গম্ভীর তুর্য্যধ্বনি অদ্যাপি বার

বার প্রতিধ্বনিত হইয়া এই অযোগ্য দেশে ও জয়সাধন করিয়া আসিতেছে। তুমি স্বদেশ ও বিদেশব্যাপী ভ্রম ও কুসংস্কার সংহার-উদ্দেশ্যে আততায়ী-স্বরূপে রণদুর্ম্মদ বীরপুরুষের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ এবং বিচারযুদ্ধে সকল বিপক্ষ পরাস্ত করিয়া নিঃসংশয়ে সম্যক্‌রূপে জয়ী হইয়াছ। তোমার উপাধি রাজা; জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নয়; তুমি একটী সুবিস্তার মনোরাজ্য অধিকার করিয়াছ। যাহারা আবহমানকাল হিন্দুজাতীর মনোরাজ্যে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ অতএব তুমি রাজার রাজা।"

আমাদের তাহার সেই মৃত্যু দিনের শৌচ অদ্যাপিও চলিতেছে এবং চিরকাল চলিবে। আমাদের রাজা একেবারে নির্ব্বাণ হইবার বস্তু নহেন। তিনি ভূলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন তথায় চিরাবলম্বিত হিতব্রত উদযাপন করিয়া যান নাই। তদীয় সমাধি-ক্ষেত্র হইতে কতবার কত পরম শ্রদ্ধেয় সুপবিত্র মহানাদ বিনির্গত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া কতই হিতোৎসাহ উদ্দীপন ও কত শুভ সংকল্প সংসাধন করিয়া আসিয়াছে। অতএব তিনি প্রাণত্যাগ করিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। জীবিত কালের সদভিপ্রায় বলে ও নিজচরিত্রের দৃষ্টান্ত-প্রভাবে মৃত্যুর পরেও উপকার সাধন ও উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আমাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া রহিয়াছেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র।

প্রেমবিদ্ধা।

(১)

আশ্বিন মাসের ভোরের বেলায়—
বাগান তখন ফুল্-পরা,
সতেজ শ্যামল তরুর তলায়,
গঙ্গা ছিল কূল্-ভরা,—
দাঁড়িয়ে তুমি (আত্মমগ্ন)
শিউলি গন্ধি বাতাসে,
খুঁজ্‌তেছিলে নিশার স্বপ্ন,
আশায় এবং হতাশে;
ক্ষণেক পরে উঠ্‌লে কেঁপে—
উঠলে কেঁপে সহসা,—
তরঙ্গেতে অঙ্গ ছেপে,
গঙ্গা যেমন বিবশা।

(২)

ডাক্‌ল পাখী মিঠে গলায়,
তুমি কাণে তুল্লেনা;
নাচ্‌ল ছায়া গাছের তলায়,
তুমি তাতে ভুল্লেনা;
পাতার গায়ে বাতাস বেজে,
উঠ্‌ল ঘন স্বনে গো;
তোমার পানে (ফুলে সেজে)
চাইল তরু বনে গো।
তুমি ছিলে বন্যা-জলে,
কূলে কূলে ফুলিয়া,—
গঙ্গা সম গেলে চলে,
তরঙ্গেতে দুলিয়া।

(৩)

তাহার পরে সূর্য্যকরে,
ঝলকিল ধরণী;
শাদা মেঘের মতন্ বেগে,
গঙ্গাবক্ষে তরণী,

চলুন ছুটে; উঠ্‌ল ফুটে,
চূর্ণ ঢেউএর বুদ্‌বুদে;
তারার কণা, হীরার দানা,
গাঁথা সোণার বিদ্যুতে।
প্রেমের বানে, সুখের টানে,
তুমিও গেলে অন্বিত,
প্রীতির ধারার মাঝে ধরা
করি প্রতিবিম্বিত।

(৪)

নিরবধি গঙ্গানদীর
মতন্ যদি বহিতে,
ভোরের গাথা, কুলু-কথায়
নিত্য যদি কহিতে,
সিন্ধু পানে স্রোতের টানে,
চলে যেতে ছুটিয়া;
হীরাগাঁথা ঢেউএর মাথায়
উঠ্‌ত আলো ফুটিয়া।

* * * *

ক্ষীণ ধারায় বালির কারায়,
গড়িয়ে অতি মন্থরে,
তিলে তিলে শুকিয়ে গেলে
শুষ্ক মরুপ্রান্তরে।

(৫)

আজো ভোরের বাগান ভরে,
ফোটে ফুলের কলিতো;
শিশিরসিক্ত বায়ু নিত্য,
ফুলের গন্ধে দলিত;
গাছের তলায় ছায়া খেলায়,
স্বপ্নে রচি জড়িমা;
গঙ্গাজলে উছ্‌লে চলে
কিরণমাখা গরিমা।
তোমার ব্যথা তোমার কথা
নেইক কারো স্মরণে।
মাটির পৃথ্বীর দৃঢ় ভিত্তি,
মানুষ মরে মরণে।

২

মাটির ভাণ্ড তাপে গড়া সুখের বাঁধন্ পাপের দড়া;
নির্ম্মম এ বিধি অতি অলংঘ্য।
প্রাণটা যাহার বিষ-জোড়া, তারি বেশি কপাল পোড়া;
প্রীতির সুধার ধারে ঝরে কলঙ্ক।
ও গো সতি, ব্যথিত প্রাণে থাক্‌তে চেয়ে অতীত পানে,
মুখ্‌খানি লুকিয়ে ঘরের কোণে গো;
পায়ে ঠেলে তোমায় লোকে দেখ্‌ত চেয়ে ঘৃণার চোখে,
মোদের চেয়ে বাঘ্ ভালুকো বনে গো
মনে হয় যে ভাল বরং। ধিক্ মানুষের পুণ্য ধরম্!
পর কে দলে চরণ্ তলে, সাধুতা?
যত ভণ্ড যত চোর, গলায় তাদের তত জোর
নীরব সাধুর মাথায় তাদের পাদুকা।

৩

এড়িয়ে ভবের দুঃখ নানা, ছড়িয়ে তোমার প্রেমের ডানা
উড়ে গেছে পতিপ্রাণা, কোথা সে?
গঙ্গাতীরে ভোরের বেলায় শিউলি গন্ধে ছায়ায় তলায়
খুঁজেছিলে যারে আশায় হতাশে,
আজ্‌কে আবার শরৎকালে, পাখায় ২ তালে তালে,
তারি সাথে যাচ্চ উড়ে সুদূরে?
ভবের জ্বালা ফেলে পিছে, জন্ম মৃত্যু রেখে নীচে,
পেয়েছ কি প্রেম পুণ্য শুধুরে?

৪

(তুমি) চলে গেছ বোন্ নাজানি সে কোন্ রাজ্যে!
ফেলে গেছ হায় শিশু অসহায় আজ যে!
(তুমি) ভুলেছ কি তার ক্ষীণ করুণার ক্রন্দন?
ছোট বক্ষের মৃদু দুঃখের স্পন্দন?
(তুমি) ভুলেছ ব্যাধের গুরু আঘাতের স্মৃতি কি?
পেয়েছ তোমার চির সাধনার প্রীতি কি?
(তুমি) চলে গেছ বোন্ বহিয়ে জীবন- বাহিনী;
ফেলে গেছ ঢের দীর্ণ প্রাণের কাহিনী।

৫

তোমার দুঃখ ফুরিয়ে গেছে
জ্বালা গেছে জুড়িয়ে।
এখন্ তোমার ব্যথায়, সুখের ত্যক্ত অশ্রু, রক্ত বুকের
পাষাণ থেকে মুছে চেঁচে
রাখ্‌ছি আমি কুড়িয়ে।

কুড়িয়ে ইতিহাসের খাতা, জুড়ে নিয়ে ছেঁড়া পাতা,
শোক-বিদ্ধ অনুরাগে
পড়্‌ছি প্রাচীন যাতনা।

মুছে গেছে অনেক লেখা ; লুপ্ত দুঃখের শীর্ণ রেখা
ফুটিয়ে নিয়ে কালো দাগে
কচ্চি নানা ভাবনা।
দেখ্‌চি চেয়ে ফিরে ফিরে কঠোর সমাজ শিলার শিরে,
প্রীতির স্মৃতি-ধ্বজা যথায়
রেখে গেছ উড়িয়ে।
অশ্রু গড়ায় আমার চোখে, ঘৃণার হাসি ভাসে লোকে ;
তোমার আজ্‌কে চিন্তা কি তায় ?
ভাবনা গেছ পুড়িয়ে।
দুঃখ তোমার ফুরিয়ে গেছে
জ্বালা গেছে জুড়িয়ে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

নমঃশূদ্র।*

বিংশ শতাব্দীর নূতন আলোক সমগ্র দেশ মধ্যে একটী জীবনী শক্তি প্রদান করিয়াছে, নিদ্রিত জাতি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাই চারিদিকে একটা উত্থানের শব্দ, একটা হুটোহুটি, ছুটাছুটি দেখা যাইতেছে। উচ্চ শ্রেণীর জাতি সকল উঠিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে যাহারা নিম্নে নিরাপত্তিতে অবস্থিতি করিত, তাহারাও উঠিতে চাহিতেছে। এটা কোন ভয়ের লক্ষণ নহে, এটা নব জীবনের লক্ষণ, সুতরাং চিন্তাশীল বুদ্ধিমান সমাজ-নেতৃগণের ইহাকে সাহায্য করা প্রয়োজন। যাহারা মনে করেন, থামাইয়া রাখিবেন, তাহাদের ভুল। যখন ভূকম্পনে গিরি বিদীর্ণ হইয়া উঠে, কাহার সাধ্য তাহা রোধ করে। ঐরাবত জাহ্নবী স্রোত রোধ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু জাহ্নবীর প্রবল স্রোতে তাহার প্রকাণ্ড দেহ ভাসিয়া গেল। আবার ইহাদের কেবল যে বাধা দেওয়া আবশ্যক নহে, তাহাও নহে, ইহাদের উৎসাহ দেওয়ার দরকার, কারণ সমাজ-দেহের সকল ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্য ও বলই সমাজের সবলতার লক্ষণ। অতএব উচ্চ জাতিদিগেরও কর্ত্তব্য, ইহাদের ন্যায্য আকাঙ্ক্ষায় সাহায্য করা। এজন্য এই নমঃ-শূদ্র জাতির নব-উত্থানের দিনে সর্ব্বাগ্রে সেই সর্ব্বশক্তিমান বিশ্ববিধাতার শান্তিময় অভয় চরণে প্রার্থনা করি, তৎপরে দেশের ধনী, মানী, পণ্ডিত, উচ্চবংশীয় মহাত্মাগণের সহানুভূতি ও সাহায্য যাচ্ঞা করি। তাঁহারা সমগ্র হিন্দু জাতির কল্যাণের জন্য, সমগ্র ভারতীয় জাতির কল্যাণের জন্য, ভারত-মাতার সকল সন্তানকে উন্নত পদবী প্রদান করিতে সাহায্য করুন। নতুবা তাঁহাদের ও সমগ্র দেশের কল্যাণ সাধন সুদূর-পরাহত।

ভাই নমঃশূদ্র, তোমাদের উত্থানের জন্য আমাদের প্রধান পরামর্শ এই—"ইংরাজীতে, একটী কথা আছে, আপনাদিগকে সাহায্য কর, ঈশ্বর তোমাদের সাহায্য করিবেন।" যে কৃষক আপন জমি চাষ করিয়া রাখে, ও চারিদিকে আলি বান্ধিয়া রাখে, স্বর্গ হইতে আগত বারিধারা তাহার জমিকেই বপন করিবার শক্তি প্রদান করে। যে কৃষক তাহা করে না, স্বর্গের বৃষ্টি তাহার কোন কাজেই আসে না। তাই বলি, তোমরা আত্মোন্নতির চেষ্টা কর, দেখিবে, সকল অবস্থা তোমাদের অনুকূল হইবে। তোমরা নিজেরা শিক্ষিত হইতে আরম্ভ কর। আমাদের কলম-পেশা ভদ্রলোকের বিকৃত শিক্ষা প্রণালী দেখিয়া তোমরা কভুও মনে করিও না, শিক্ষা কেবল কেরাণীগিরির জন্য বা রাজসেবার জন্য। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য, শারীরিক ও

* নমঃশূদ্র-সভায় পঠিত।

মানসিক বিকাশ ও প্রকৃত ফল, দেশের কৃষি, বাণিজ্য, নাবিক-বিদ্যা, খনিজ বিদ্যা, বৈজ্ঞানিক উপকরণ-সংগ্রহ, দেহ-রক্ষা, সামাজিক শক্তি বৃদ্ধি, ধর্ম্ম কর্ম্মের বৃদ্ধি। এই শিক্ষাই আমাদের দেশে প্রকৃত মনুষ্যত্ব আনিবে। যেদিন দেখিব, একজন কৃষক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া নিজের জমিতে নূতন ফসল দ্বারা অন্যের দশ গুণ লাভ করিতেছে. সেদিন বলিব, সে শিক্ষিত কৃষক। যেদিন দেখিব, একজন নাবিক নৌকায় এক নূতন কল যোজন করিয়া ষ্টিমারের ন্যায় দ্রুত বেগে নৌকা চালাইতেছে, সেদিন বুঝিব,সে শিক্ষিত নাবিক। যেদিন দেখিব, একজন হিমালয়ের কালস্তর দেখিয়া তাহার নিম্ন খনন করিয়া নূতন ধাতু উঠাইয়া আনিলেন, সেদিন বুঝিলাম,তিনি খনিজ পণ্ডিত। উদাহরণ বাড়াইতে চাই না। শিক্ষার এমনি শক্তি, যে সমাজের যে যেখানে থাকে, সেই স্থানে সে যেন একটী স্তম্ভ রূপে সমাজ দেহকে ধারণ করে।

উন্নতির ইতিহাসের প্রধান কথা, প্রথমে তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের অনুসন্ধান কর, বাকী সব তোমরা প্রাপ্ত হইবে। প্রথমে তোমরা ধার্ম্মিক হও। আমরা আর্য্যজাতি—আমরা হিন্দু নাম গ্রহণ করিয়াছি, তদপেক্ষাও আর্য্য নাম উন্নত—এই জাতির মধ্যে শনক সনন্দ সনাতন, ধ্রুব প্রহ্লাদ শুক, নারদ বৈশম্পায়ন জনক, ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস, কত নাম করিব, কত মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বেদ উপনিষৎ বেদান্ত, পুরাণ ভাগবৎ,গীতা প্রভৃতি কত মহান্ শাস্ত্র আবির্ভূত হইয়াছিল। কোথায় লাগে ইহাদের কাছে বাইবেল। এ সকল পড়িলে বাইবেল পড়িতেই ইচ্ছা হয় না, বাইবেলকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়াই বোধ হয় না। সুতরাং ভ্রাতৃগণ, এই পবিত্র গৌরব ভুলিওনা যে, আমরা আর্য্যবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। ধর্ম্ম বিষয়ে নানা মত, নানারূপ সম্প্রদায়। এই জন্য আমাদের আর্য্যজাতি আবার নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া পরস্পর সহানুভূতি হারাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাত্মা চৈতন্য দেব সকলের মিলন-ভূমি করিয়াছেন—হরিনামে। এই হরি বেদ বেদান্তের ব্রহ্ম, পৌরাণিকের বিষ্ণু ও তান্ত্রিকের শিবশক্তি। এই হরি মুসলমানের আল্লা ও খ্রীষ্টানের God—এই হরি সকল নরনারীর আশ্রয়-দাতা, মুক্তি-দাতা ও ত্রাণ-কর্ত্তা। ভাই, তোমরা সকলে এই হরি-নামে প্রণাম কর, শ্রীহরির শ্রীচরণে জীব-নোৎসর্গ কর। এই হরি-সঙ্কীর্ত্তনে উচ্চ জাতি নিম্ন জাতি সকলে একত্র হইবে। এই হরিনামে প্রজা, রাজা, দুঃখী, ধনী সকলে একত্র হইবে। তাই, এস ভাই সকল, আমরা সেই পরম শরণ পরমাত্মন হরিচরণে শরণাপন্ন হই। তাঁহার সাধন ভজনের প্রধান অঙ্গ, চরিত্র গঠন। চরিত্র বিনা কেহই মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে না। বাই-বেলের ন্যূনতা প্রকাশ করিলাম, কিন্তু যদি একটী কথা না বলি, তবে সেই পাশ্চাত্য মনীষীগণের প্রতি অবিচার করা হইবে। বাইবেলে এক স্থানে সকল সুনীতির উপদেশ আছে। সে সকল তোমরা সর্ব্বদা মনে রাখিবে ও তদনুসারে কার্য্য করিবে।

১। নরহত্যা করিও না।

২। চুরী করিও না।

৩। ব্যভিচার করিও না।

৪ মিথ্যাকথা বলিও না।

৫। যাহা নিজে ভালবাস না, অন্যের প্রতি তাহা করিও না।

৬। এক ঈশ্বরের উপাসনা করিবে, হরি বল, ব্রহ্ম বল, একই তিনি।

৭। সকল নরনারীকে ভালবাসিবে ও সমান বলিয়া মনে করিবে।

এই সকল সত্য জীবনে সর্ব্বদা অঙ্কিত রাখিতে হইবে। এবং যেন কোনক্রমে পাপ পঙ্কে লিপ্ত না হইতে হয়, এইরূপ করিবে। জগতে যে জাতি চরিত্রবান, যে জাতি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ঈশ্বরভক্ত, পরোপকারী, পবিত্র-হৃদয়, তাহারাই জগতে অত্যুন্নতি লাভ করে। তুলসীদাস বলিয়াছেন।

"সার কহ পরোপকার পরনারী নৈয়াশ,
এমাম হরি নাহি মিলে তো জামিন
তুলসীদাস।"

এতএব ভ্রাতৃগণ, তোমরা এমন ভাবে ধর্ম্মপথে থাকিয়া জীবন যাপন করিবে যে, করুণানিধান ভগবান তোমাদের সপক্ষ হইবেন। তিনি যাহাদের সহায়, জগতে কেহ তাহাদের বিনাশ করিতে পারে না। তিনি ধার্ম্মিকের সহায়,যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়। তোমরা যদি এই জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে চাও, ধর্ম্ম পথ আশ্রয় কর।

৩। সাম্প্রদায়িক উন্নতি। হিন্দু জাতির ভেদনীতি ও সাম্প্রদায়িক কলহ চিরদিন নানাবিধ মনস্তাপের কারণ হইয়াছে। এমন কি, আমার মনে হয় যে, ২২ কোটী হিন্দু জগতে যে এত হীনভাবে দিন যাপন করিতেছে, এই ভেদনীতিই তাহার ফল। যে ইংলণ্ড আমাদের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতেছে, তাহার লোক সংখ্যা আর দুইটী দ্বীপ ধরিয়াও ৪ কোটী মাত্র, যে জাপান আজি জগতের সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার লোক সংখ্যাও ৪ কোটী মাত্র। আর আমরা ২২ কোটী হিন্দু ও ৮ কোটী মুসলমান, জগতে ধূলিকণার ন্যায় নগণ্য সমুদ্রতীরস্থ বালুকা-কণার ন্যায় কেবল পদতলে অবস্থান জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এই ভেদনীতি বাস্তবিকই আমাদের উন্নতির অন্তরায়। অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা কি দেখিতে পাই? যদি একজন মুসলমানকে একজন কোন কথা বলে, তবে সমুদয় মুসলমান জাতি তাহার সপক্ষে দাঁড়াইবে। যদি একজন সাহেবকে কোন কথা বলি, সমস্ত সাহেব একত্র হইয়া প্রতিবাদ করিবে, আর যদি কোন হতভাগ্য হিন্দুকে কোন লোক পদাঘাত করে, অন্য হিন্দু তজ্জন্য নাকে কাটি দিয়াও হাঁচিবে না। কেননা, আমরা পরস্পরকে পরস্পর ঈর্ষ্যা কি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকি? এ অভাব দূর না হইলে এ জাতির কখনও উন্নতি হইবে না। আজি নমঃশূদ্র জাতি এই ভেদনীতির প্রতিবাদ করিতে দণ্ডায়মান, সমগ্র হিন্দু জাতির নিকট আজি সমদর্শীতার জন্য প্রার্থনা করিতেছে। হিন্দু জাতি সমদর্শীতা শিক্ষা করে নাই, তাই আজি ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। নমঃশূদ্র জাতির কতকগুলি অভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে, উচ্চ জাতির নিকট তাহারা এই সকল দূরীকরণের জন্য প্রার্থনা করিতেছে।

১। অস্পৃশ্যতা। কেবল নমঃশূদ্র জাতি নহে, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও হিন্দু জাতির আর আর সম্প্রদায়ও এই আপত্তি করিয়া থাকে। বিড়াল কুকুর গৃহে গেলে গৃহের দ্রব্যাদি নষ্ট হয় না। অথচ নমঃশূদ্র জাতি ঘরে গেলে নষ্ট হইবে। এরূপ বিদ্বেষ বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়। কিন্তু সমাজ এতদিন ইহা চল রাখিয়াছেন, এবং নমঃশূদ্র জাতি ইহা নীরবে সহ্য করিয়াছে। ব্রাহ্মণ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া বাড়ীতে আসিলেও নমঃশূদ্রের সাধ্য নাই যে, এক গ্লাস

জল দিয়া সাহায্য করে, অন্যান্য উচ্চ বর্ণের পক্ষেও সেই কথা। কেন এরূপ হইল? হইতে পারে, কোন অতীত সময়ে এই জাতি আর্য্য জাতির নিকট কোন অপরাধ করিয়াছিল, সেইজন্য, ইহারা এই হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু কত শতাব্দী গত হইয়াছে, আজিও কি সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? কোন বৈদ্যুতিক কি কোন চৌম্বক আকর্ষণের কারণে যে কিছু হইতে পারে, আমি সে কথা বিশ্বাস করি না। নমঃশূদ্র জাতির এক গ্লাস জল পান করিলে যে আমার দেহে কোন অপবিত্রতা আসিবে, একথাও আমি মনে করি না। কিন্তু এই সামাজিক হীনাবস্থা কে দূর করিবে? কেহ কেহ বলিয়াছেন, ভাই নমঃশূদ্র, তোমরা খ্রীষ্টান হও, তাহা হইলে এ ভেদ-নীতি থাকিবে না, কিন্তু তাহাদের সম্পূর্ণ ভুল, কেননা যাহারা নমঃশূদ্রের জল পান করে না, তাহারা খ্রীষ্টানের জলও পান করে না, বরং নমঃশূদ্রকে দেবালয়ে অন্দর মহলে যাইতে দেয়, খ্রীষ্টানদের তাহাও দেয় না। মুসলমানের কথাও সেইরূপ। খ্রীষ্টান, মুসলমানদের প্রতি হিন্দুর বিদ্বেষ আরও অধিক, সুতরাং ইহাতে তাহাদের উন্নতি হইবে না। তবে তাহারা কি উপায় অবলম্বন করিবে? বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আমার মনে হয় যে, তাহারা যদি স্মৃতি শাস্ত্রের ব্যবস্থাপ্রদাতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিকট আপনাদের হীনাবস্থা দূর করিবার জন্য আবেদন করিতে পারে, সমাজে তাহাদের স্থান কোথায় এবং কি কার্য্য করিলে উন্নতি হইতে পারে, তজ্জন্য ব্যবস্থার প্রার্থনা করিয়া নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর, কাশী প্রভৃতি পণ্ডিত সমাজে আবেদন করে, এবং প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কিছু অর্থ প্রদান করে, তবে যাহাতে উচ্চ বর্ণের সহিত মিশিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত হওয়া সম্ভব। তাই আমি নমঃশূদ্র জাতিকে অনুরোধ করি, সময় বিলম্ব না করিয়া তাহারা প্রত্যেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে আপনাদের আবেদন প্রেরণ করুন। আমার বিশ্বাস, একবার ব্যবস্থা সংগ্রহ করিতে পারিলে এ কার্য্যে কাহারও আপত্তি হইবে না। এ সময়ে সাম্যের বায়ু চারিদিকে বহিতেছে, শিক্ষিত সম্প্রদায় এই জাতীয় বৈষম্য ও বর্ণ-ভেদের দূষণীয়তা বুঝিতে পারিয়াছেন। সুতরাং এক বার মাত্র পাতি বাহির করিতে পারিলেই, বোধ হয়, এ বিষয়ে কাহারও আপত্তি থাকিবে না।

২। যে কারণ উপরে উল্লেখ করিলাম, উক্ত কারণেই উচ্চ জাতীয় হিন্দুগণ তোমাদের সহিত একাসনে বসিতে চায় না। এই বৈষম্য দূর করিতে হইলে প্রথমে তোমরা উন্নত শিক্ষা লাভ কর। আজি যদি তোমরা পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কি ডাক্তার-সাহেব, কি জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিতে পার, তোমরা সমাজে বসিলে অন্য লোকে গৌরব বোধ করিবে। তোমরা সম্প্রদায় গঠন করিয়া কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ কর, সকলে তোমাদের সহিত একাসনে বসিয়া কীর্ত্তন ও হরিনাম করিবে—এ বিষয়ে কোন আপত্তি হইবে না। তোমরা হরিনাম করিয়া মহোৎসব দেও, অনেক জাতি তোমাদের সহিত আহার করিবে। তোমরা সচ্চরিত্র ও হরি-ভক্ত হইয়া ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে আহ্বান কর। তাহারা তোমাদের সমকক্ষ মনে করিয়া তোমাদের সহিত আহারাদি করিবেন। শিক্ষিত ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া, শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা গ্রহণ করিয়া, এই সকল জাতির সহিত মিলিত

হও। আভ্যন্তরীন সারবত্তা থাকিলে কাহার সাধ্য তুচ্ছ করে ?

আর একটী কথা বলি। তোমরা যদি উচ্চ হইতে চাও, উচ্চ জাতির সহিত বিরোধ করিও না। বিরোধ করিয়া অধিকার প্রাপ্ত হইবার আশা সুদূরপরাহত। একদিকে জেদ হইলে অন্য দিকেও জেদ হয়। সুতরাং উচ্চ জাতির কার্য্য বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে জব্দ করিতে চেষ্টা না করিয়া বৈধ উপায়ে কার্য্য করিতে আরম্ভ কর। কার্য্য বন্ধ করিলে উচ্চ জাতিদের ক্ষতি হইবে না। কিন্তু যাহারা কর্ম্ম বন্ধ করিবে, তাহাদের কি প্রকারে চলিবে ? তাহারা কি হঠাৎ কোন স্থান হইতে জমীদারী পাইবে, না একদিনে তাহারা বড় উকীল কি মোক্তার হইবে ? না, বরং তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য চুরি ডাকাতি, এই সকল পাপ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। পাপই বিনাশের মূল, পাপ অবনতির কারণ। পাপে মৃত্যু,একথা তোমরা শুনিয়াছ, অতএব কদাচ কুকার্য্যে রত হইও না। যাহারা চরিত্র সৎ রাখিয়া সৎ কার্য্য করে, তাহারই সম্ভ্রান্ত ; আর চরিত্র দূষিত করিয়া যে কার্য্য সম্পাদিত হয়,তাহাই অসম্মানের কার্য্য। তোমরা বোধ হয় গল্প শুনিয়াছ যে, এক সাধুর নিকট হইতে এক ব্রাহ্মণ একটী চস্‌মা পাইয়াছিল ; তাহা চক্ষে দিয়া রাজসভায় গিয়া সভাস্থ সকলকেই পশু পক্ষীর মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইল। রাজাকে বানর বলিয়া প্রতীয়মান হইল, কিন্তু একজন মুচি জুতা সেলাই করিতেছিল, তাহাকেই প্রকৃত মনুষ্যরূপে দেখিতে পাইল। যে সাধু হয়, পুণ্যবান হয়, সে যেখানে থাকে, যে ব্যবসায় করে, তাহাতেই তাহার সম্ভ্রম হয়। অতএব পুণ্য পথে থাকিয়া, তোমরা সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা কর ; অবশ্যই উন্নতি হইবে। আমি শুনিয়াছি যে, অনেক নমঃশূদ্র প্রকৃত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি ঘৃণিত কার্য্য করিয়া আপনাকে পাপ পথে ও নরকে নিমজ্জিত করিতেছে, ও লোকের অনেক অনিষ্ট সাধন করিতেছে। একথা প্রকৃত কিনা, সাধারণে বলিতে পারেন। যদি এরূপ হয়, লজ্জার কথা। আমি ভরসা করি, সমবেত নমঃশূদ্র-মণ্ডলী এই সকল লোককে শাসনে রাখিবেন। পাপ, আত্ম বিনাশের বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যাহারা এ পন্থা অবলম্বন করে, তাহারা অচিরে ইহার কুফল ভোগ করিবেই করিবে। সরল সত্য পথে থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করা গীতার ধর্ম্ম। ইংরাজীতেও কথিত আছে,যে আপন কার্য্যে তৎপর সে রাজার নিকট আসন পাইবে। যিনি যে ব্যবসা করেন, সেই ব্যবসায় সাধু ভাবে সম্পাদন করিলে নিশ্চয়ই সুখী হইবেন। অতএব আমার এই অনুরোধ, সমগ্র নমঃশূদ্রমণ্ডলী একত্রিত হইয়া আপনাদিগকে কর্ত্তব্য-কর্ম্মপরায়ণ কর। দেও এবং লও, এই জগতের মূল মন্ত্র। কার্য্য দেও পয়সা লও,এবং পয়সা দেও কার্য্য লও, জগৎ এই আদান প্রদান নিয়মে গঠিত। ইহাতে কাহারও মানাপমান নাই।

আমার বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র-সম্বলিত আর্য্যজাতি একটী প্রকাণ্ড দেহধারী মহান্ দেবতা। কেহ তাহার হস্ত, কেহ তাহার মস্তক, কেহ তাহার পদ ও কেহ তাহার উদর। প্রত্যেকের সম্মিলিত উদ্যম ও কার্য্যই এই মহান সমাজের জীবনী শক্তি। যখন সমাজে ক্ষত্রিয় শক্তি প্রবল ছিল, কোন বিদেশীয় জাতির শক্তি ছিল না যে, এই

আর্য্যভূমিকে অপদস্থ করে। আজি ভেদ নীতি বলে, পরস্পর পরস্পরে বিবাদ করিয়া সমগ্র আর্য্যজাতি নির্বীর্য্য হইয়াছেন। এক্ষণে যে প্রকাণ্ড দেহধারী মহান্ দেবতার কথা বলিলাম, তাহা দ্বিমুখ সাপে পরিণত হইয়াছেন, মস্তক চলিতে চাহিলে লেজ চলিতে চায় না। কাজেই মন্থর গতিতে শত্রু আসিয়া তাহাদের মস্তক পীড়ন করে। তাহার তেজ, বীর্য্য, প্রভাব, সকল ভেদনীতি বশে ও আত্ম কলহে অন্তর্হিত হইয়া যায়। নতুবা মুষ্টিমেয় পরধর্ম্মাবলম্বীগণ কি আমাদের দেবতার ও আমাদের সতীর অপমান করিতে সাহসী হয়? আমাদের কি দুর্গতি হইয়াছে, একবার ভাবিয়া দেখুন। ইউরোপে যে সমস্ত বীর জাতির ইতিহাস আমরা পাঠ করি, তাহা মুষ্টিমেয়। কেহ অর্দ্ধ কোটী, কেহ এক কোটী, বড় বেশী হইলে ২।৪ কোটী। আর আমরা ৩০ কোটী লোক কি এক মোহ নিদ্রায় মুগ্ধ হইয়া অনন্ত আলস্যে আমাদের জীবন কাটাইয়া দিতেছি! লোকে শুনিলে হাসিয়া অজ্ঞান হয় মনে করে, ইহারা মেষ জাতি। এমন এক সময় ছিল, যখন এই আর্য্যজাতি আন্দোলন করিয়া তিব্বত চীনে, ব্রহ্ম তাতারে বৌদ্ধ-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। তখন তাহারা যেত লাক ছিল, আজি তাহার ৩ গুণ লোক হইয়াছে। অথচ আমরা দীনহীন ও পরপদ লেহনকারী হইয়া জগতে মানবজাতির কলঙ্করূপে পরিণত হইয়াছি। যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, যাঁহারা ভূগোলের বৃত্তান্ত অবগত আছেন, তাঁহারা মনুষ্যত্বহীন এক পঞ্চমাংশ ভারতীয় জাতির এই জীবন্মৃত্যুর কথা চিন্তা করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

তাই বলি, উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণ এবং নমঃশূদ্র বন্ধুগণ, এক্ষণে আসুন আমরা দুই জাতি, দুই সম্প্রদায়, এই চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, একদেহ, এক-জাতি, এক লক্ষ্য মনে করিয়া জাতীয় পতাকার মূলে একত্র হই। পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করি। একজন অলস অকর্ম্মণ্য হইলে শরীরের পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী কোন কার্য্য সাধনে কৃতকার্য্য হয় না, বরং সমাজের ব্যাধিরূপে তাহার উন্নতির পথ রোধ করে। তাই বলি, ভাই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, আর আত্মহত্যার সাহায্য করিবেন না। সমাজের যাহার যে অবনতি থাকে, দূর করিতে চেষ্টা করুন, ক্ষুদ্র স্বার্থ ছাড়িয়া দিন, সার্ব্বজনীন উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করা যাক। আমরা চিরদিন আত্মকলহ করিয়া বিনষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থরূপ জলবিম্ব সমগ্র ভারতীয় জাতির উন্নতি-মহাসাগরে মিশাইয়া দেও। যে যেখানে আছ, একত্র হও, মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য দণ্ডায়মান হও। আমাদের ন্যায় জাপানও নানা ক্ষুদ্র স্বার্থে বিভক্ত ছিল। একদিন জাপানের প্রধান মন্ত্রী সগুণা, যে জাপান সম্রাটের সমকক্ষ ছিল, অপার ক্ষমতাপন্ন ছিল, সে আপন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বলিল, 'একরাজ্যে দুই রাজা থাকিতে পারে না, সুতরাং আমি আমার রাজত্ব ত্যাগ করিলাম।' কি মহত্ত্ব! সসাগরা ধরণীর যুক্ত রাজত্ব ত্যাগ করিতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন নৃপতিগণ আসিয়া আপন রাজত্ব জাপান-সম্রাটের অধীন বলিয়া স্বীকার করিল। ভাবিয়া দেখুন, কি স্বার্থত্যাগ। যাহারা নিষ্কর জমীদারীর রাজত্ব ভোগ করিত, সমগ্র দেশের মঙ্গলের জন্য তাহারা আপনা আপনি নিজের রাজ্যে

কর স্থাপন করাইল। সামুরিয়া অর্থাৎ জাপানী ক্ষত্রিয় জাতি, যাহারা আপনারা অস্ত্র শস্ত্রে বিভূষিত হইয়া দেশ শাসন করিত, তাহারা বলিল, সমগ্র জাতির কল্যাণের জন্য আমরা আমাদের অস্ত্রাদি জাপান রাজের পদতলে সমর্পণ করিলাম। সমগ্র জাতি স্বার্থত্যাগ করিল, নীচবাসনা দেশের মঙ্গলের শিবিরে বলিদান করিল। আপনার জীবন দেশের অনন্ত জীবনের জন্য বিসর্জ্জন দিল। তাই ক্ষুদ্র কয়েকটী দ্বীপপুঞ্জবাসী জাপানী আজি ইউরোপের আতঙ্ক, জগতে অভ্যুত্থানের জলন্ত দৃষ্টান্ত। আজি সমগ্র ভারতীয় জাতি একথা বলুন, দেশের মঙ্গলের জন্য, মাতৃভূমির উত্থানের জন্য, ভারতের উন্নতির জন্য আমরা আমাদের কৃত্রিম জাত্যভিমান বিসর্জ্জন করিলাম। বঙ্গে নমঃশূদ্র জাতি, মাদ্রাজের পারিয়া বা টারা জাতি ও অন্যান্য হীনাবস্থ জাতিগণ আজি, ভাই ভারতবাসী, তোমাদের সমক্ষে সমদর্শীতার জন্য দণ্ডায়মান। তোমরা বল,ইংরাজ তোমাদের সমচক্ষে দেখে না। তোমরা কি বলিতে পার, তোমরা নিজেরা সমদর্শী? আগে সমদর্শীতা শিক্ষা কর, পরে সমান অধিকার চাহিও; নতুবা তোমরা যে সমস্ত উন্নত অধিকার ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট চাহিতেছ, তাহা পাইবে না।

আর ভাই নমঃশূদ্র, তোমাদেরও বলি, তোমরা জানিয়া রাখ যে, প্রকাণ্ড এক মহান্ জাতির তোমরা এক অঙ্গ। তোমাদের উন্নতিতে সে জাতির উন্নতি, তোমাদের মঙ্গলে সে জাতির মঙ্গল, একথা ভুলিও না। শিক্ষালাভ কর,সামাজিক উন্নতি-বিধান কর। তোমাদের বাল্যবিবাহ, তোমাদের অল্পবয়স্কা বিধবাগণের দুরবস্থা, তোমাদের স্ত্রীশিক্ষা ও পুরুষ শিক্ষার অভাব, এ সকল আমাদের প্রাণে বড় ক্লেশ প্রদান করে। তোমাদের যদি কোন দুরাচার থাকে, সমাজ-বক্ষে তাহা ছুরিকারূপে বিদ্ধ হয়। তোমরা আপনাদের সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র হিন্দু-জাতির উন্নতি-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হও। তোমাদের প্রধান কর্ত্তব্য শিক্ষা; তোমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য ধর্ম্মাচরণ, তোমাদের তৃতীয় কর্ত্তব্য ভ্রাতৃভাব। আজি ভ্রাতৃভাব ভারত ভুলিয়া গিয়াছে, তাই ভারত এত হীন, একবার তোমরা উত্থান কর; আমরাও উত্থান করি। জগৎবাসী দেখুক, আজি হিন্দুজাতি উচ্চ নীচ ভেদ দূর করিয়া, পরস্পর ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিত হইয়া, জগতের নিকট উন্নত পদবী লাভের জন্য প্রস্তুত ও উপযুক্ত হইয়াছে। ঈশ্বর আমাদের চিরবাসনা পূর্ণ করুন

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

মহারাজা সূর্য

পূর্ব্ব গগনের রবি গেছে অস্তাচলে,
নাহি আর সূর্য্যকান্ত দীপ্ত বিবস্বান,
কর্ম্মবীর চলে গেছে কর্ম্ম অবসানে
রাখিয়া বিপুল কীর্ত্তি গৌরব সম্মান!

সে যে ছিল বসোরার সুরভী গোলাপ,
রূপে গুণে অতুলন শোভার ভাণ্ডার,
যদিও ঝরিয়ে গেছে ঝঞ্ঝার পীড়নে,
সুরভী কি হইয়াছে বিলুপ্ত তাহার?

প্রতিজ্ঞায় অবিচল—দৃঢ়তা কঠোর,
যাহা সত্য,যাহা ধ্রুব,তাহাতেই মতি,
দূরিতে অজ্ঞান-নিশা দীন ভারতের
সে যে ছিল একনিষ্ঠ কর্ম্মব্রতে ব্রতী।

সূর্য্যত যায়নি অস্ত, হয়েছে উদয়
কোটি কণ্ঠে শোন ওই তাঁরি জয় জয়।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

২

অহো! কিবা কুসংবাদ, কিবা অমঙ্গল
ঘটিল এ বঙ্গমাঝ,
সূর্য্যকান্ত মহারাজ,
ত্রিদিবে গেছেন ত্বরা, ত্যজিয়া সকল।

৩

সূর্য্যকান্ত ছিল শৌর্য্যে সূর্য্যেরি যতন,
সারাদিন অংশু ঢালি,
দিবাশেষে অংশু-মালী,
অস্তাচলে চিরতরে করেছে গমন!

৪

ফিলিপ্স করিয়াছিল নিগ্রহ যখন,
তখনো সুধীর পদে,
আপন কর্ত্তব্য পথে,
হে কর্ত্তব্যপরায়ণ! করেছ গমন।

৫

পূর্ণিমার শশী যথা, মধ্যাহ্নের রবি,
প্রভাতের ফুল যথা,
বসন্তের লতা পাতা,
সতেজ সুন্দর যথা দেবতার ছবি।

৬

তেমনি ছিলে হে তুমি ওহে নরোত্তম!
অনিন্দ্য অপূর্ব্ব কান্তি,
নাহি ছিল ভুল,ভ্রান্তি,
অকৃত্রিম দেশভক্ত কেবা তব সম?

৭

হেন পত্নীপরায়ণ বিরল জগতে,
পত্নী গেলে লোকান্তরে,
ভাসিয়া নয়নাসারে,
"জলছত্র" দিয়েছিলে শোকাচ্ছন্ন চিতে।

৮

প্রিয়তমা প্রণয়িনী স্বর্গারূঢ় হলে,
না করি বিবাহ আর,
পরিচয় দিলে তার,
তুমি যে দেবতা, দেব,এ মহীমণ্ডলে।

৯

প্রেম, পুণ্য, প্রজ্ঞাবান, প্রাণভরা মায়া,
মহাশয়, মহারাজা,
দেশশুদ্ধ করে পূজা,
বঙ্গ-ভূমি হেন ক্ষতি পূরাবে কি দিয়া?

১০

গৌরব কিরণ! আলো করেছিলে তুমি,
তোমারে হারায়ে আজ,
খসিয়া পড়িল বাজ,
বঙ্গের বিদীর্ণ বক্ষে, জানে বিশ্ব-স্বামী।

১১

সুলেখক, শুদ্ধ, শান্ত, সূর্য্যকান্ত রাজ,
মধুময় পুষ্প যূথ,
স্থায়ী আকাশের মত,
কেননা রহিলে পেয়ে এত প্রীতি পূজা?

১২

সূর্য্য অস্ত যায় দেব! দিবা অবসানে,
আবার প্রভাত হলে,
আইসে উদয়াচলে,
আলোক জুড়িয়া পড়ে,সুখ ফোটে প্রাণে।

১৩

তুমি সূর্য্য হলে কেন চির-অস্তমিত?
ফিরিয়া এসহে দেব!
জনম ভূমিরে সেব,
মায়েরে করিয়া তোল নব জাগরিত।

১৪
চির জনমের মত গিয়েছ কি তুমি ?
আর না আসিবে ফিরে,
এ ক্ষণভঙ্গুর ঘরে,
ত্যজিলে ত্রিদিব-রাজ্য সুধা মাখা ভূমি ?

১৫
থাক তবে স্বর্গরাজ্যে, থাক গুণধর,
তোমার অক্ষয় যশ,
সিঞ্চি সঞ্জীবনী-রস,
জীবিত রাখিবে তোমা অবনী উপর।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

শঙ্করের দার্শনিক মত।

শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিদ্যারত্ন, এম-এ, মহাশয় 'উপনিষদের উপদেশ' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ১৩১৪ সালের আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে ইহার প্রথমখণ্ডের সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। ইহাতে আমরা দেখাইয়াছি যে, গ্রন্থ খানা আগাগোড়া আত্মবিরোধে পূর্ণ এবং ইহাতে শঙ্কর-দর্শনের অতি বিকৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সমালোচনাটী গ্রন্থকারের মনঃপূত হয় নাই। সেই জন্য বিদ্যারত্ন মহাশয় ইহার প্রতিবাদ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে একটী প্রবন্ধ বাহির করেন। মাঘ মাসের প্রবাসীতে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে, গ্রন্থকার ইহার আর কোন জবাব দিতে পারেন নাই। পূর্ব্বোক্ত প্রথম সমালোচনার প্রতিবাদ করিয়া গ্রন্থকার ১৩১৪ সালের কার্ত্তিক মাস হইতে নব্য-ভারতেও প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছেন। ইহার জবাব দিবার জন্য নব্যভারতের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলাম, কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ শেষ না হওয়ায়, সম্পাদক মহাশয় এপর্য্যন্ত আমাকে অনুমতি দেন নাই। এই জন্যই আমাকে বৎসরাধিক-কাল নীরব হইয়া থাকিতে হইয়াছে। কোকিলেশ্বর বাবু অল্পদিন হইল উপনিষদের উপদেশ, দ্বিতীয় খণ্ড ও প্রকাশিত করিয়াছেন। নব্যভারতে আমার মতামত প্রতিবাদ করিয়া যে সমুদয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, গ্রন্থকার তাহাই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া উক্ত গ্রন্থের 'অবতরণিকা' নামে মুদ্রিত করিয়াছেন। সুতরাং, আবশ্যক হইলে, আমরা এ গ্রন্থেরও সমালোচনা করিব। বর্ত্তমান মাসের (অগ্রহায়ণ মাসের) 'প্রবাসী'তে ইহার যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে তাহা পাঠ করিলেও পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, বিদ্যারত্ন মহাশয় উপনিষদের কি প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১। ব্রহ্ম শক্তি স্বরূপ কি না। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন, শঙ্করের মতে "নির্গুণ ব্রহ্ম, পূর্ণ-শক্তি-স্বরূপ" (নব্যভারত, ১৩১৪, পৃঃ ৩৫৫)। আমাদিগের বিশ্বাস, শঙ্কর ঠিক ইহার বিপরীত কথাই বলিয়াছেন। শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ নহে, ব্রহ্ম শক্তির আধার ও নহেন এবং শক্তি ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না। শঙ্করের মতে শক্তি, মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান, অধ্যাস, ভ্রম, মোহ, অবিবেক সমুদয়ই সমপর্য্যায়ের কথা। মূর্খদিগের বিশ্বাস, এই মায়ার অস্তিত্ব আছে;

যাহারা যুক্তি তর্ক দ্বারা ইহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে চাহেন, তাহারা কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারেন না; কিন্তু বিদ্যার চক্ষে এই মায়ার অস্তিত্ব নাই। প্রকৃত তত্ত্ব আলোচনা করাই দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। আমরা প্রমাণ করিব যে শঙ্করের মতে, দার্শনিক ভাবে, পারমার্থিক ভাবে, এই মায়ার অস্তিত্ব নাই।

বিদ্যারত্ন মহাশয় নিজমত সমর্থন করিবার জন্ত শঙ্কর-ভাষ্য হইতে যে সমুদয় স্থল উদ্ধৃত করিয়াছেন, দেখা যাউক, সেই সমুদয় অংশ দ্বারা তাঁহার মত সমর্থিত হয় কিনা।

শঙ্করভাষ্যে আছে—'নহি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্ত স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি, শক্তিরহিতস্ত তস্ত প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ"—বেঃ ভাঃ ১।৪।৩। জগতের পূর্ব্বাবস্থার বিষয় প্রশ্ন উঠিয়াছিল। এই বিষয় বিচার করিবার সময় শঙ্কর পূর্ব্বোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার প্রকৃত অনুবাদ এই "ইহা ব্যতীত (অর্থাৎ জগতের প্রাগবস্থা স্বীকার না করিলে) পরমেশ্বরের স্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, তিনি শক্তিরহিত; সুতরাং তাঁহার (সৃষ্টি) প্রবৃত্তি হইতে পারে না"। 'শক্তিরহিতস্ত তস্ত' এই অংশের অর্থ—'শক্তিরহিত সেই পরমেশ্বরের'। এখানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, 'পরমেশ্বর শক্তি-রহিত'। অথচ এই অংশ দ্বারাই বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে 'ব্রহ্ম শক্তি-স্বরূপ।" কি কৌশলে তিনি ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা কি জানিতে চাহেন? তবে শ্রবণ করুন। বিদ্যারত্ন মহাশয় 'শক্তি-রহিতস্য তস্ত'অংশের 'তস্ত' অংশটী গোপন করিয়াছেন। মুদ্রাকরের প্রমাদ বশতঃ যে এই প্রকার ঘটিয়াছে, তাহা নহে; কারণ 'নব্যভারত' ও 'উভয় পত্রিকাতেই'তস্ত' শব্দটী অপ্রকাশিত। নব্যভারতের দুইটী স্থলে ঐ অংশটী উদ্ধৃত হইয়াছে এবং কোন স্থলেই 'তস্ত' শব্দটী খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। নব্যভারতে ঐ অংশের অনুবাদ দেওয়া হয় নাই; অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে প্রবাসীতে। অনুবাদটী এই:—'এই শক্তি স্বীকার না করিলে, ব্রহ্ম সৃষ্টি করিবেন কাহার দ্বারা? শক্তিরহিত পদার্থের প্রবৃত্তি হইতে পারে না।' লেখকের যুক্তি বিশ্লেষণ করিলে দাঁড়ায় এই—'শক্তি ভিন্ন জগৎ সৃষ্টি হয় না, সুতরাং ব্রহ্মের শক্তি আছে।' কিন্তু শঙ্করের বক্তব্য এই—'ব্রহ্মে শক্তি নাই, সুতরাং ব্রহ্মে সৃষ্টি-প্রবৃত্তি হইতে পারে না'। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, জগৎ সৃষ্ট হইল কি প্রকারে? ইহার উত্তর এই—'জগতের একটা প্রাগবস্থা স্বীকার কর, সব গোলমাল মিটিয়া যাইবে। এই প্রাগবস্থা অবিদ্যা কিম্বা মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।' কিন্তু লেখকের বুঝাইবার ইচ্ছা 'ব্রহ্ম শক্তিস্বরূপ; তিনি সেই শক্তি দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।' শঙ্করের সব অংশ উদ্ধৃত করিলে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, এইজন্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়কে 'তস্য' অংশ টুকু গোপন করিতে হইয়াছে। গোপন করিলে অবশ্যই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হয়। উদ্ধৃত অংশের ঠিক পরেই শঙ্কর বলিয়াছেন—"মুক্তানাঞ্চ পুনরনুৎপত্তিঃ, বিদ্যয়া তস্যা বীজশক্তের্দ্দাহাৎ। অবিদ্যাত্মিকা হি সা বীজশক্তিঃ, অব্যক্ত শব্দ নির্দ্দেশ্যা, পরমেশ্বরাশ্রয়া, মায়াময়ী, মহাসুষুপ্তিঃ যস্যাং স্বরূপ প্রতিবোধ রহিতাঃ শেরতে সংসারিণোজীবঃ"—অর্থাৎ, জগতের এই বীজ-শক্তি-রূপিণী পূর্ব্বাবস্থা, অবিদ্যাত্মিকা। বিদ্যা দ্বারা এই বীজশক্তি দগ্ধ হইয়া যায়, এই জন্যই মুক্ত-

আত্মাদিগের আর জন্ম হয় না। ইহার অপর নাম অব্যক্ত। ইহা পরমেশ্বরের আশ্রিত; ইহা মায়াময়ী ও মহাসুষুপ্তি; সংসারী জীব প্রতিরোধ শূন্য হইয়া ইহাতেই শয়ান থাকে।" বিদ্যারত্ন মহাশয় যাহাকে ব্রহ্ম শক্তি বলিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে তাহা অবিদ্যা, মায়া ও মহা সুষুপ্তি। যে অবিদ্যাতে প্রতিরোধ-শূন্য হইয়া সাংসারিক জীব শয়ান থাকে, তাহা কি ব্রহ্ম? যাহাকে মহাসুষুপ্তি বলা হয়, তাহা কি ব্রহ্ম-স্বরূপ? ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ; তাঁহাকে সুষুপ্ত বলা মহামূর্খতা। ব্রহ্ম 'বিদ্যাস্বরূপ'; তাঁহাকে অবিদ্যাস্বরূপ (=শক্তি-স্বরূপ) বলা, আর ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব কাড়িয়া লওয়া, একই কথা। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন "ব্রহ্ম শক্তিস্বরূপ"; তিনি আরও বলেন, শক্তি = অবিদ্যা = অজ্ঞান (নব্যভারত, পৃঃ ৩৫৩; উপঃ উপদেশ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮)। সুতরাং, দাঁড়াইল এই যে ব্রহ্ম 'অবিদ্যাস্বরূপ' বা 'অজ্ঞানস্বরূপ', অর্থাৎ অবিদ্যা বা অজ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ। বিদ্যারত্ন মহাশয় কি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে 'বিদ্যা-দ্বারা অবিদ্যা ধ্বংস হইয়া যায়'। অবিদ্যা ও ব্রহ্মস্বরূপ যখন একই কথা এবং অবিদ্যা যখন ধ্বংস হইয়া যায়, তখন বলিতেই হইতেছে যে ব্রহ্মস্বরূপও ধ্বংস হইয়া যায়। আবার, অবিদ্যাকে ধ্বংস করিবার জন্যই বেদান্তের জন্ম; সুতরাং, ব্রহ্মকে ধ্বংস করিবার জন্যই বেদান্তের জন্ম। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মত গ্রহণ করিলে এই প্রকার অদ্ভুত সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। "অবিদ্যা বিনা পরমেশ্বরের স্রষ্টৃত্ব অসম্ভব"—ইহা অতি সত্য কথা। বিদ্যাকে কখন অবিদ্যার কারণ বলা যায় না। পরমেশ্বর বিদ্যাস্বরূপ, আর সৃষ্টি অবিদ্যা-মূলক; সুতরাং, পরমেশ্বরকে স্রষ্টা বলা অসম্ভব। যেখানে সৃষ্টি, সেইখানেই অবিদ্যা; সুতরাং ব্রহ্মকে অবিদ্যাগ্রস্ত বলিয়া স্বীকার না করিলে, তাঁহাকে আর স্রষ্টা বলা যাইতে পারে না। অবিদ্যার জন্যই সৃষ্ট্যাদি কল্পনা। অবিদ্যার একটী নাম 'অধ্যাস' (বেদান্ত ভাষ্য-রম্ভ)। 'যে বস্তুতে যাহা নাই, সে বস্তুতে তাহা আছে' এইরূপ ভ্রম হওয়ার নামই 'অধ্যাস'। ব্রহ্মে স্রষ্টৃত্বাদি কিছুই নাই; অধ্যাসবশতই মনে হয়, তিনি স্রষ্টা। সাধারণ লোকে এই ভ্রম বিশ্বাসবশতই সৃষ্টিতত্ত্বে আস্থা স্থাপন করে। আমরা পরে প্রমাণ করিব যে সৃষ্ট্যাদি বলিয়া কিছু নাই। লোক-শিক্ষার জন্যই সৃষ্ট্যাদির গল্প রচনা করা হইয়াছে।

অবিদ্যাকে ব্রহ্মের আশ্রিত বলা হইয়াছে, ইহাও সত্য। মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্যে (৯) শঙ্কর বলিয়াছেন "মিথ্যা কল্পনারও একটী কারণ না থাকিলে চলে না। শুক্তিকা, রজ্জু, স্থাণু, উষরাদি না থাকিলে রজত, সর্প, পুরুষ ও মৃগতৃষ্ণিকার কল্পনা হইতে পারে না। এস্থলে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন 'পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে তুরীয় ব্রহ্মকে প্রাণাদি কল্পনার আস্পদ বলা হইল; সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে ঘটাদি যেমন জলাদির আধার, তেমনি ব্রহ্মও প্রাণাদির আধার। সুতরাং, ব্রহ্ম নিরুপাধি এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত নহে'। এ প্রকার আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ শুক্তিকাতে যেমন রজতাদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না,—এস্থলে যেমন রজতাদি অস্তিত্ব-বিহীন—প্রাণাদি কল্পনাও তেমনি অস্তিত্ব-বিহীন (প্রাণাদি বিকল্পস্য অসত্বাৎ শুক্তি-কাদিষু ইব রজতাদেঃ)। সৎ ও অসতের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই—ইহা অবস্তু, এই

অন্য বাক্য দ্বারা ইহা প্রকাশ করা যায় না (ন হি সদসতোঃ সম্বন্ধঃ শব্দপ্রবৃত্তি নিমিত্ত ভাক্ অবস্তুত্বাৎ)।

প্রাণ অর্থ হিরণ্যগর্ভ (উপঃ উপদেশ, ২য় ভাগ, ১৫৬ পৃঃ)। দেখা যাইতেছে, হিরণ্য গর্ভাদি সগুণ ব্রহ্ম অস্তিত্ববিহীন; ব্রহ্মকে এ সমুদয় কল্পনার আস্পদ বলিতে পার, কিন্তু তাঁহাকে এ সমুদয়ের আধার বলা যাইতে পারে না।

'অবিদ্যা ব্রহ্মের আশ্রিত' ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থকার যে অংশ (১।৪।৩) উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই অংশেরই 'ভামতী' টীকাতে 'আশ্রিত' শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে—"প্রপঞ্চবিভ্রমস্য ঈশ্বরাধিষ্ঠানত্বম্ অহিবিভ্রমস্য ইব রজ্জ্বধিষ্ঠানত্বম্," অর্থাৎ, সর্পভ্রম যে অর্থে রজ্জুর আশ্রিত, ঠিক সেই অর্থেই প্রপঞ্চ বিভ্রম ঈশ্বরের আশ্রিত। 'ভামতী' স্পষ্টই বলিয়াছে, ব্রহ্ম অবিদ্যার আধার নহেন—'ন তু আধার তয়া'। ব্রহ্মে অবিদ্যার অধ্যাস হয়—এই অর্থে অবিদ্যা ব্রহ্মের আশ্রিত। প্রকৃত কথা এই, যেমন রজ্জুই প্রকৃত সত্তা, সর্প জ্ঞান মিথ্যা, তেমনি ব্রহ্মই প্রকৃত সত্তা, অবিদ্যা-মূলক জগতাদি মিথ্যা বস্তু। সর্পাদির ন্যায় এসমুদয়ও অস্তিত্ববিহীন।

২। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিতেছেন "শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত দর্শনের ১।৪।১৪ সূত্রের ভাষ্যে নির্গুণ ব্রহ্মই যে জগৎ-স্রষ্টা, একথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন"। আমরা কিন্তু উক্ত ভাষ্যে বিপরীত কথাই পাইতেছি। শঙ্কর বলিতেছেন—

স্থষ্ট্যাদি প্রপঞ্চ প্রতিপাদন করা এসমুদয় (সৃষ্টি) শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে। কারণ, এই সমুদয়ের জ্ঞানে কোন প্রকার পুরুষার্থ দৃষ্টও হয় না, শ্রুতও হয় না এবং এ প্রকার কল্পনা করা সম্ভবও নহে। ......সম্প্রদায়বিদ্‌গণও বলিয়া থাকেন—"মৃত্তিকা, লৌহ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা সৃষ্টির কথা যে বলা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মকে জানিবার উপায়-স্বরূপ, প্রকৃত পক্ষে তাঁহাতে কোন প্রকার ভেদ নাই।" ১।৪।১৪ ভাষ্য।

এই শেষ শ্লোকটী গৌড়পাদীয়কারিকা হইতে উদ্ধৃত। শঙ্কর উক্ত শ্লোকের এই প্রকার ভাষ্য লিখিয়াছেন—

প্রশ্ন হইতে পারে, "উৎপত্তির পূর্ব্বে সমুদয়ই এক অদ্বিতীয় বস্তু ছিল, কিন্তু এই সমুদায় জীব উৎপন্ন হইবার পর, ভিন্নতা উপস্থিত হইয়াছে।" ইহার উত্তর 'না', ইহা হইতে পারে না। কারণ, উৎপত্তি সংক্রান্ত শ্রুতির অন্য অর্থ আছে।...... মৃত্তিকা, লৌহ বিস্ফুলিঙ্গাদির দৃষ্টান্তের উপন্যাস দ্বারা যে সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে, তাহা জীব ও পরমাত্মার একত্ব জ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ। যেমন প্রাণ সংবাদে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইবার জন্য, বাগাদি, অসুর, পাপ্মা, বেধা ইত্যাদির আখ্যায়িকা কল্পনা করা হইয়াছে, সৃষ্টি ব্যাপারেও তাহাই। (ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে কে বড় এই বিষয় লইয়া কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। একটী আখ্যায়িকার দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, প্রাণই শ্রেষ্ঠ। শঙ্করাচার্য্যের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রকৃত পক্ষে, কোন বিবাদ হয় নাই, প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য ঐ গল্প রচনা করা হইয়াছিল)। সুতরাং আত্মার একত্ব বুদ্ধি উৎপন্ন করিবার জন্যই উৎপত্তি-সূচক শ্রুতি। ইহার অন্য অর্থ কল্পনা করা যুক্তি যুক্ত নহে। সুতরাং উৎপত্তি মূলক যে ভেদ, সে ভেদ কখনই স্বীকার করা যায় না" । গৌঃ কাঃ ভাষ্য ৩।১৫।

দেখা যাইতেছে যে ১।৪।১৪ সূত্রের ভাষ্যে

সৃষ্টিকে একটী গল্প বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং বিদ্যারত্ন মহাশয় যাহা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন,তাহার বিরোধী কথাই প্রমাণিত হইয়া গেল।

৩ বিদ্যারত্ন মহাশয় ঐতরেয় ভাষ্য হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন,তাহাতেও একটী গুরুতর কথা গোপন করা হইয়াছে। উদ্ধৃত করিয়াছেন এই অংশ—"সর্ব্বোপাধি বর্জ্জিতং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং···সর্ব্বসাধারণা ব্যাকৃত জগৎ বীজ প্রবর্ত্তকং।" সংস্কৃত উদ্ধৃত করিয়াছেন নব্যভারতে, কিন্তু অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে 'প্রবাসী'তে। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অনুবাদ এই—"অব্যাকৃত শক্তিই এই জগতের বীজ। নির্গুণ নিষ্ক্রিয় সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত ব্রহ্মই এই অব্যাকৃত শক্তির প্রবর্ত্তক। নির্গুণ ব্রহ্ম দ্বারাই এই শক্তি জগৎরূপে প্রবর্ত্তিত হয়।" মূল ও অনুবাদ উভয় স্থলেই "উপাধি সম্বন্ধেন" কথাটী গোপন করা হইয়াছে। কেন গোপন করা হইয়াছে, পাঠকগণ বুঝিয়াছেন কি? উপাধি কথাটীর অর্থ জানিলেই এ রহস্য বুঝা যাইবে। বাচস্পতির অভিধানে 'উপাধি' শব্দের অর্থ এইরূপ—"অন্যথা স্থিতস্য বস্তুনোঽন্যথা প্রকাশন রূপে', অর্থাৎ, এক প্রকার বস্তু অন্য প্রকার প্রতীত হইলে, উপাধি শব্দ ব্যবহৃত হয়। "অথোপাধিঃ স উচ্যতে যদ্ধর্ম্মোঽন্যত্র প্রতিবিম্বতে, যথা জবা কুসুমং স্ফটিক লৌহিত্য উপাধিঃ।" "যে বস্তুর ধর্ম্ম অন্যত্র প্রতিবিম্বিত হয়, সেই বস্তুকে তাহার উপাধি বলা হয়; যেমন জবা কুসুমের লৌহিত্য স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হইলে, জবা কুসুমকে স্ফটিকের উপাধি বলা হয়।" 'ঔপাধিক' শব্দের অর্থ এই:—উপাধিজনিতে মিথ্যাভূতে আরোপিতে, স্ফটিক লৌহিত্যাদৌ জবা সন্নিকর্ষাৎ স্ফটিকে চ মিথ্যাভূতং লৌহিত্যমুৎপদ্যতে ইতি বেদান্তিনঃ।" শঙ্করাচার্য্য অসংখ্য স্থলে এই প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা উপাধিকে বর্ণনা করিয়াছেন। স্ফটিকের নিকটে জবা কুসুম থাকিলে, স্ফটিককে লোহিত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু স্ফটিক কখন লোহিত হয় না। সেই প্রকার উপাধি যোগে (সে উপাধি বিশুদ্ধই হউক বা অবিশুদ্ধই হউক) নির্গুণ ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম কখন সগুণ হয়েন না। ঐতরেয় উপনিষদেও শঙ্কর ইহাই বলিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় অংশ বিশেষ গোপন করিয়া ভাষ্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা পড়িয়া লোকের বিশ্বাস হইতে পারে, সগুণ ব্রহ্ম বুঝি নির্গুণ ব্রহ্মেরই অবস্থা বিশেষ। এই জন্য আমরা নিম্নে ভাষ্যের প্রকৃত অনুবাদ দিতেছি। প্রকৃত অনুবাদ এই—

তিনি সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত, নিরঞ্জন,নির্ম্মল নিষ্ক্রিয়, শান্ত,অদ্বিতীয়,'নেতি-নেতি'—'ইহা নয়' 'ইহা নয়'—এই প্রকার সর্ব্ব বিশেষ বর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে জানিতে হয়। তিনি সমুদয় বাক্য ও চিন্তার অগোচর। অত্যন্ত বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা-রূপ উপাধি বশতই ইঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, অব্যাকৃত জগদ্বীজের প্রবর্ত্তক এবং অন্তর্য্যামী সংজ্ঞা দেওয়া হয়। যে বুদ্ধি ব্যাকৃত জগতের বীজস্বরূপ, সেই বুদ্ধিতে আত্মাভিমান হইলেই তিনি হিরণ্যগর্ভ সংজ্ঞা লাভ করেন। অণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া শরীর রূপ উপাধির সহিত যুক্ত হইলেই ইঁহাকে বিরাট প্রজাপতি বলা হয়। তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া অগ্ন্যাদি উপাধিযুক্ত হইলেই তিনি দেবতা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। বিশেষ বিশেষ শরীররূপ উপাধি সংযোগেই ইঁহার আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত নানাপ্রকার নাম হইয়া থাকে।

বুঝা যাইতেছে যে উপাধির জন্যই ব্রহ্মের বিভিন্ন নাম। এই উপাধির জন্যই ব্রহ্মকে হিরণ্যগর্ভ, সর্ব্বজ্ঞ, ঈশ্বর, বিরাট, প্রজাপতি, দেবতা, কীট, পতঙ্গাদি নাম দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্ব্বোপাধি-বর্জ্জিত।

৪। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিশ্বাস ২।১।২৭ সূত্রের ভাষ্যদ্বারাও তাঁহার মত সমর্থিত হয়। নিম্নে শঙ্কর ভাষ্য অনূদিত হইল :—

"(পূর্ব্বপক্ষ)—তোমরা বলিতেছ নিরবয়ব ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হয়েন, কিন্তু তাঁহার পূর্ণ পরিণাম হয় না। তোমাদের একথা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ ব্রহ্ম যদি নিরবয়বই হ'ন,তাহা হইলে, হয় বল, তাঁহার পরিণামই হয় না, না হয় বল, তাঁহার পূর্ণ পরিণাম হয়। যদি বল ব্রহ্ম একরূপে পরিণত হয়েন এবং অপররূপে স্বরূপে অবস্থান করেন—তাহা হইলে প্রথমতঃ ব্রহ্মের রূপভেদ কল্পনা করা হয়, দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মের অবয়ব স্বীকার করা হয়। সুতরাং তোমাদের কথা অযৌক্তিক।"

(সিদ্ধান্তী)—ইহাতে দোষ নাই, কারণ এই যে ব্রহ্মের রূপ-ভেদ-কল্পনা,—ইহা অবিদ্যা-কল্পিত। অবিদ্যা-কল্পিত রূপভেদ স্বীকার করিলেই যে বস্তু অবয়ব বিশিষ্ট হইবে, তাহা নহে। নেত্রের তিমির দোষ হইলে, এক চন্দ্রকে বহু চন্দ্র বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে; কিন্তু চন্দ্র কখন অনেক হয় না। তেমনি নাম-রূপ-মূলক রূপ ভেদ অবিদ্যা-মূলক। ইহা ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত উভয়াত্মক। ইহা সৎ কি অসৎ কিছুই বলা যায় না। এই অনির্ব্বচনীয় ভেদবশতঃই ব্রহ্মকে পরিণামী ও সর্ব্বব্যবহারাস্পদ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পারমার্থিক রূপে তিনি সর্ব্বব্যবহারের অতীত ও অপরিণামী। পরিণাম শ্রুতিসমূহ (অর্থাৎ, যে সমুদয় শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম এই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, সেই সমুদয় শ্রুতি) পরিণাম প্রতিপাদন করিবার জন্য অভিহিত হয় নাই; কারণ এ প্রকার উপদেশে কোন ফল নাই। সর্ব্বব্যবহারবিহীন ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপাদনই ইহার উদ্দেশ্য, কারণ এ প্রকার উপদেশের ফল আছে।"

সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে—(১) ব্রহ্মের কখন পরিণাম হয় না, (২) নামরূপাদি সমুদয়ই অবিদ্যা-কল্পিত। (৩) পরিণাম শ্রুতি সমুদয়ের অর্থ ইহা নহে যে ব্রহ্ম রূপান্তরিত হইয়াছেন—ব্রহ্মাত্মভাব প্রকাশ করিবার জন্যই এই সমুদয়ের অবতারণা।

৫। বিদ্যারত্ন মহাশয় নিজমত সমর্থনের জন্য ২।১।৩১ বেদান্ত ভাষ্য হইতে এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন "প্রতিষিদ্ধ সর্ব্ব বিশেষস্যাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তিযোগঃ।" ইহা উদ্ধৃত করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন "অতএব আমরা দেখিতেছি শঙ্করাচার্য্য নির্গুণ ব্রহ্মেই শক্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং এই শক্তিদ্বারাই নির্গুণ ব্রহ্মই জগৎ কারণ" (নব্যভারত, পৃঃ ৩৫৫)। আমরা বিদ্যারত্ন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, বাক্যের শেষ অংশটুকু গোপন করিলেন কেন? গোপনীয় অংশটুকু এই—"এতদপি অবিদ্যা-কল্পিত রূপভেদোপন্যাসেন উক্তমেব"—অর্থাৎ, ইহা অবিদ্যা কল্পিতরূপ ভেদ প্রসঙ্গেই উক্ত হইয়াছে। সমস্ত অংশের অর্থ এই :—

"ব্রহ্মে কোন প্রকার বিশেষ নাই, একমাত্র অবিদ্যাবশতই তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান বলা হয়।"

দেখা যাইতেছে, এ অংশদ্বারাও বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। প্রত্যুত

তাঁহার বিরোধীমতই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

৬। বিদ্যারত্ন মহাশয় ঈশোপনিষদের ভাষ্য দ্বারাও নিজ মত সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মূলে আছে "সর্ব্বব্যাপি তদাত্মতত্ত্বং সর্ব্ব-সংসার-ধর্ম্ম-বর্জ্জিতং স্বেন নিরুপাধিকেন স্বরূপেন অক্রিয়মেব সৎ উপাধিকৃতা সর্ব্বাঃ সংসার ক্রিয়া অনুভবতি ইব।" লেখক অনুবাদ করিয়াছেন, "এই প্রাণশক্তি অবিক্রিয় ব্রহ্মে অবস্থিত রহিয়া জগতের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে।" প্রকৃত অনুবাদ এই—সর্ব্ব-সংসার-ধর্ম্মবর্জ্জিত সর্ব্বব্যাপী আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম স্বীয় নিরুপাধিক স্বরূপে নিষ্ক্রিয় হইলেও উপাধিজনিত সংসার কার্য্য অনুভব করিতেছে বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ ভ্রম হয়।" "অনুভবতি ইব" এই অংশের অর্থ "যেন অনুভব করিতেছেন।" "ইব" শব্দ দ্বারা শঙ্করাচার্য্য বুঝাইতেছেন যে, তিনি সংসার কার্য্য অনুভব করেন না, কিন্তু তিনি করেন এইরূপ ভ্রম হয়।

ঠিক ঐ মন্ত্রেই (ঈশ, ৪) আছে "তৎ ধাবতঃ অন্যান্ অত্যেতি তিষ্ঠৎ" অর্থাৎ তিনি স্থির থাকিয়াও দ্রুতগামী অন্য সকলকে অতিক্রম করিয়া যান। এখানে 'অত্যেতি' শব্দের অর্থ 'অতিক্রম করিয়া যান', কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের মতে 'অত্যেতি = অত্যেতি ইব' অর্থাৎ মনে হয় যেন অতিক্রম করিয়া যান। এখানেও 'ইব' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। শঙ্কর প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিনা তাহা আমরা বিচার করিতেছি না। আমাদিগের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে উক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর ব্রহ্মে কোন শক্তিই স্বীকার করিতেছেন না। 'ইব' শব্দের ব্যবহার দ্বারা তিনি সমুদয় কার্য্যকেই ভ্রমাত্মক বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। অথচ বিদ্যারত্ন মহাশয় সগর্ব্বে বলিতেছেন—"ইহা অপেক্ষা আর কি সুস্পষ্ট উক্তি থাকিতে পারে? নির্গুণ ব্রহ্মই যখন সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত, তখনই তাঁহাকে সগুণ ব্রহ্ম বলা হয়। বস্তুতঃ নির্গুণে ও সগুণে কোন ভেদ নাই।"

৭। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কঠোপনিষদের ভাষ্য হইতেও অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই অংশের অনুবাদ নব্যভারতে না দিয়া প্রবাসীতে দিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ এই:—'অব্যক্তই জগতের মূলবীজ। জগতে প্রকাশিত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য ও কারণ শক্তির এই অব্যক্তই মূল বীজ। বটকণিকায় যেমন বটবৃক্ষের বীজ নিহিত থাকে, তদ্রূপ এই অব্যক্ত শক্তি ব্রহ্মে নিহিত আছে"। 'ভাষ্যে নিহিত' শব্দ নাই—আছে সমাশ্রিত। বেদান্ত ভাষ্যের ১।৪।৩ অংশের অনুবাদ সমালোচনায় আমরা দেখাইয়াছি যে, এই অব্যক্ত = অবিদ্যা। জ্ঞান দ্বারা ইহা দগ্ধ হইয়া যায়। শঙ্কর কি অর্থে এই অব্যক্তকে ব্রহ্মের আশ্রিত বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। 'অহিবিভ্রম যেমন রজ্জুর আশ্রিত, তেমনি প্রপঞ্চ বিভ্রমও পরমেশ্বরের আশ্রিত'।

বিদ্যারত্ন মহাশয় যে কঠোপনিষদ্ভাষ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই উপনিষদের ভাষ্যেই এক স্থলে (৫।১১) শঙ্কর বলিয়াছেন, রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে যেমন রজ্জুর সহিত সর্পের কোন সংস্পর্শ হয় না; তেমনি ব্রহ্মে অবিদ্যার অধ্যাস হইলে, অবিদ্যার সহিত ব্রহ্মের সংযোগ হয় না—সংযোগ হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। পরে এই অংশ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে।

৮। কোকিলেশ্বর বাবু বেদান্ত ব্যাখ্যা হইতে

অংশ বিশেষ (২।১।১৪) উদ্ধৃত করিয়া এই-রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"সর্ব্ব ব্যবহারাণামেব প্রাক্ ব্রহ্মাত্মতাবিজ্ঞানাৎ সত্যত্বোপপত্তেঃ। পরমার্থ দৃষ্টি জন্মিলে তবে লোকে বুঝিতে পারে যে এ জগৎ ব্রহ্মশক্তির রূপান্তর—এ জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্মই।" নব্য,পৃঃ ৫৭৫।

বিদ্যারত্ন মহাশয় অন্যান্য স্থলে যে রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, এখানেও তাহাই করিয়াছেন। যে অংশ গোপন করিলে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সেই অংশই গোপন করা হইয়াছে। অংশটুকু এই—'স্বপ্ন ব্যবহারস্য প্রাক্ প্রবোধাৎ' অর্থাৎ "জাগ্রত হইবার পূর্ব্বে স্বপ্নকে যেমন সত্য বলিয়া মনে হয়।" বিদ্যারত্ন মহাশয় যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই—'ব্রহ্মাত্ম ভাব জন্মিবার পূর্ব্বে সমুদয় ব্যবহারের সত্যতা উপলব্ধি হয়' সুতরাং সমুদয় অংশের অর্থ এই—"জাগ্রত হইবার পূর্ব্বে স্বপ্নকে যেমন সত্য বলিয়া মনে হয়, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বেও এই জগৎকে সত্য বলিয়া মনে হয়।"

গ্রন্থকার বলিতেছেন'পরমার্থ দৃষ্টি জন্মিলে, তবে লোকে বুঝিতে পারে যে এজগৎ ব্রহ্মশক্তির রূপান্তর, এ জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্মই"। আমরা কিন্তু দেখিতেছি, ভাষ্যের অর্থ ঠিক ইহার বিপরীত। শঙ্করের অর্থ এই যে যতক্ষণ স্বপ্নাবস্থা, ততক্ষণই স্বপ্ন সত্য ; জাগ্রত হইলে স্বপ্ন অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তেমনি যতক্ষণ লৌকিক ব্যবহার, যতক্ষণ অজ্ঞানতা, ততক্ষণ ই এ জগতের সত্যতা ; ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে, স্বপ্নের ন্যায়, এ সমুদয় অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোকিলেশ্বর বাবু নিজ মত সমর্থন করিবার জন্য যে সমুদয় অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার মত ত সমর্থিত হইল না বরং তাঁহার বিরোধী মতই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। অপরাপর বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

কমলাকান্ত কথা লহরী। (৪)

প্রঃ—বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আরও কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

উঃ—বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে প্রাণ খুলিয়া বলিতে গেলে হয়ত আমাদের মধ্যে অনেকের নিকট অপ্রিয় হইতে হয় ; কারণ আমরা যেরূপে জীবনাতিপাত করিতেছি, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, আমাদের মধ্যে চিন্তাশীল লোক খুব কম ; যাঁহারা আদৌ চিন্তা করেন না, গড্ডলিকা-প্রবাহে খড়ের মত ভাসিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের নিকট আমার কথা রুচির না হওয়াই সম্ভব। তবে যখন আরও কিছু শুনিতে তোমাদের ইচ্ছা দেখিতেছি, তখন সত্যের অনুরোধে কিছু বলিব। আবার আর এক নূতন বিপদ অধুনা উপস্থিত হইয়াছে ; রাজপুরুষেরা অপ্রিয় সত্য শুনিতে নারাজ ; সেই নিমিত্ত অনেক সুপরামর্শ দিবার যোগ্য ব্যক্তি "সব্‌সে চুপ্ ভালা"-নীত অবলম্বন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। যাহা হউক, ভগবানকে স্মরণ করিয়া নিঃস্বার্থভাবে যে কোন হিতকর কার্য্যে ব্রতী হওয়া যায়, তাহাতে কখনই কোন বিঘ্ন বিপদ আসিতে পারে না; ইহা যেন কখন বিস্মৃত না

হই, জগদীশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি। যাহা ভাল বুঝিব, ঠিক বুঝিব, তাহা অকুতোভয়ে প্রকাশ করিতে যেন কখন দ্বিধা না হয়, এরূপ বল সর্ব্বদা অভয়ার চরণে যাচ্ঞা করিয়া থাকি।

বর্ত্তমানে ভারতের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকার যে ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। এরূপ পূর্ব্বেও হইয়াছে। রামরাজ্যের অবসান হইল, কৌরবসাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইল, যদুকুল বিনষ্ট হইল, পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থানে গমন করিলেন, ত্রেতাদ্বাপরের কাল পূর্ণ হইল, কলিযুগের প্রারম্ভে সেই এক ঘোর অন্ধকার আসিয়া কর্ম্মভূমি ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তাহার বহুদিন পরে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সময় আর একবার ভারতমাতাকে দারুণ অরাজকতার ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। আর আজ সুসভ্য সুদক্ষ বৃটিশ-শাসনাধীনে আমরা এই মহা বিভ্রাটে পতিত হইয়াছি। অধুনা রাজার পক্ষেও বিষম সমস্যা, প্রজার পক্ষেও বিষম সমস্যা উপস্থিত। রাজপুরুষগণ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করত কেবলই পরামর্শ করিতেছেন, কি উপায়ে রাজ্যে শান্তি পুনঃস্থাপিত হয়, প্রকৃতিবর্গও ভাবিতেছেন, হঠাৎ কেন এরূপ গোলযোগ আসিয়া সকলকে চিন্তাকুল করিল।

কি জানি কোন্ ভ্রমে পতিত হইয়া রাজপুরুষেরা, প্রকৃত কারণানুসন্ধানে বিরত থাকিয়া, কেবলমাত্র দুর্লক্ষণগুলির আশু চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন, অসন্তোষ অশান্তির বাস্তবিক কোন হেতু নাই, শুধু জনকতক কুশিক্ষিত দুষ্ট লোকের দুরভিসন্ধি দ্বারা হঠাৎ এবম্বিধ অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে, কঠোর ব্যবস্থাদি প্রণয়ন করত তাহাদিগকে পেষণ করিলেই আর কোন প্রকার শঙ্কার কারণ থাকিবে না। পরন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা এই মোটা কথাটা আদৌ বুঝিতেছেন না যে, দেড়শত বৎসর-কালব্যাপী শাসনের পর অকস্মাৎ এরূপ কেন ঘটিল। জনকতক কুচক্রীর কথার কি এতই বল যে, এই নিরীহ শান্ত বাঙ্গালী জাতি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, তাহাদের কুহকে পড়িয়া কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান একেবারে হারাইয়া ফেলিল। যাহারা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, যাহারা এখনও বিচারাধীন, ইহারা সকলেই কি নিরেট মুর্খ, ঘোর আহাম্মোক যে কেবলমাত্র হুজুকে পড়িয়া আপনাদিগকে এরূপভাবে ক্রোধান্ধ সিংহের কবলে ফেলিতে দ্বিধা করিল না? নিতান্ত বাতুল ভিন্ন এমন কাজ কি মহা বর্ব্বরের দ্বারাও সম্ভবে?

আমাদের অপেক্ষা অনেক বিজ্ঞ ভারতীয় ও বৃটিশ রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা এবিষয়ে নানা রূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন, সে স্থলে আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক হইতে যে কোন নূতন কথা বাহির হইবে, সে আশা করিওনা। আমি যে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহার একমাত্র কারণ কর্ত্তব্যপরায়ণতা। যে সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক প্রজা যদি আপন আপন বুদ্ধিবিদ্যা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এ সময় রাজপুরুষগণকে পরামর্শ দ্বারা সাহায্য না করেন, তাহাতে প্রত্যবায় আছে। যদ্যপি কেহ মনে করেন যে, রাজা, রাজপুরুষ বা রাজজাতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন না, সুতরাং অরণ্যে রোদন করিয়া লাভ কি? তদুত্তরে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শুধু পার্থিব রাজাদির কাছে

ও আমাদের দারিদ্র নয়, সেই রাজার রাজা বিশ্বরাজের সম্বন্ধে আমাদের যে কর্ত্তব্য আছে, তাহা পালন করিয়া না চলিলে ইহ-পরলোকে দণ্ডার্হ হইতে হইবে। সকলকে ফাঁকি দেওয়া যায়, যমকে ফাঁকি দেওয়া কাহারও সাধ্য নয়, সেই যমের যিনি ধর্ম, যাঁহার ভয়ে যম সদা সশঙ্কিত, তাঁহার ন্যায়দণ্ডের সম্মুখে ব্রহ্মাকেও অবনতমস্তক হইতে হয়, পার্থিব সম্রাটাদি কোন্ ছার!!!

বর্ত্তমান গোলযোগ যদি শুধু একটা আসুরিক ব্যাপার হইত, ইহার প্রতিকার সহজ ছিল, বিশেষ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বৃটিশরাজের পক্ষে। ভীষণ সিপাহীবিপ্লবের লকলকায়মান বহ্নি যাহারা"নিবাইল,তীব্র প্রচণ্ড দাপে" তাঁহাদের নিকট মুষ্টিমেয় ভারতীয় অপদার্থ প্রজার পাশবশক্তি নিতান্তই তুচ্ছ বিষয়, সন্দেহ নাই। সম্মুখ-সমরে লালমুখের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া, জলন্ত হুতাশনে পতঙ্গের ন্যায় আহুতি দেওয়া যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেই কালা আদমীর ওরূপ দুঃসাহিসকতা প্রকাশ করা চলে। যাঁহারা কল্পনাতেও উক্তরূপ আশঙ্কা করেন, তাঁহারা বাতুল অপেক্ষাও বাতুলতর। আমরা যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছি, তাহাতে বুক ঠুকিয়া বলা যাইতে পারে, যে সহস্র বৎসরের মধ্যেও ভারতবাসীর সেরূপ ক্ষমতা, যোগ্যতা, পরাক্রম হওয়া প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপার। পরন্ত অধুনা যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে বেশ বুঝিতে হইবে যে, এই ধূমাচ্ছাদিত অনল লোকচক্ষুর অগোচরে থাকিয়া যে হঠাৎ এখান সেখান হইতে এক একবার দপ করিয়া জলিয়া উঠিতেছে, ইহার কারণ নিগূঢ় এবং তাহা বাহিরের দুদশ কলসী জলে নির্ব্বাপিত হইবার নহে। ইণ্ডিয়ান-ডেলি-নিউস পত্রিকা সেদিন যথার্থই বলিয়াছেন, "We are firmly persuaded that the only right and efficacious mode of dealing with the situation is to attack the causes of discontent"—অসন্তোষের কারণসমূহ বিদূরিত না হইলে অশান্তি ঘুচিবে না, রোগের নিদান অর্থাৎ মূল কারণ অনুসন্ধান না করিয়া, যিনি হাতুড়ের মত চিকিৎসা আরম্ভ করেন, তাঁহার ঔষধাদিতে কিরূপ প্রতিকার হয়, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। প্রকৃতিবর্গ নানা কারণে ঘোর অসন্তোষের পীড়া ভোগ করিতে থাকিল, তজ্জন্য কোন প্রকার চেষ্টা হইল না, তন্নিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবিত হইল না, কেবল লাঠির চোটে তোমাদের বেদনাসম্ভূত কান্না থামাইবে, এরূপ বিবেচনা করা কি বুদ্ধিমানের কাজ? সহৃদয়তা, সহানুভূতি দূরে থাকুক, কেবল দুনিয়াদারীর লাভলোকসান গণনাতেও এবম্বিধ ব্যবস্থা অতীব দোষের। তাই ভাবি,স্বাধীনতার জন্মভূমি রত্নপ্রসূ শ্বেতদ্বীপ কি আজ রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত-শূন্য? ব্রাইট, গ্লাডষ্টোনের সঙ্গে সঙ্গে কি দয়াধর্ম্মের রাজনীতি ইংলণ্ড হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে? আর কাহার দোষ দিব? আমাদেরই দুরদৃষ্টবশতঃ বৃটিশজাতির এ প্রকার দুরবস্থা ঘটিয়াছে; নতুবা এই সোজা কথাটা বুঝিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন? রাজপুরুষদের কি মোহই উপস্থিত হইয়াছে যে, এক ভুল চাপা দিতে গিয়া আর এক ভুল করিতেছেন, ঐরূপে তৃতীয় ভুল, ক্রমে ভুলের পর ভুল; ভুলে ভুলে যে এদিকে হুলস্থূল হইতেছে, তাহার আদৌ খেয়াল নাই। ভুলের সঙ্গে জিদ্ জুটিয়া কোন কোন স্থলে কতকটা গোঁয়ারের মত কাজ হইতেছে, কাজেই আমাদের ঘোর বিপদ উপস্থিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের খাতিরে যে এদিকে মহাস্বার্থে

ব্যাঘাত জন্মিতেছে, তৎপ্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই। বিলাতের কাগজওয়ালারা কেহ বলিতেছেন, জোর জবরদস্তী দ্বারা দলন ভিন্ন দমনের প্রকৃষ্ট উপায় নাই :—

"What is needed above all is a stern interval in which the agitators shall feel the weight of our hand." (Daily Telegraph)

কেহ প্রকাশ করিতেছেন, অজস্র রক্তপাত আবশ্যক হইয়াছে :—It is just possible that some blood-letting on an extensive scale may become necessary." (Globe)

ইঁহারা কেহই ভারতের প্রকৃত অবস্থা মোটেই জানে না, জানিবার অবকাশও কখন পান নাই; কেবল কতকগুলি নীচাশয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তির অতিরঞ্জিত কথায় পরের মুখে ঝাল খাইয়া এরূপ প্রলাপবাক্য উচ্চারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদেরই বা কি দোষ দিব, সাত সমুদ্র তের নদী পারে বসিয়া তাঁহারা সুদূরবর্ত্তী সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত রাজ্যের সংবাদ যেমন শুনিতেছেন, তেমনি মতামত জাহির করিয়া গায়ের জ্বালা মিটাইতেছেন; যাঁহারা এখানে বসিয়া সাম্রাজ্যের কর্ণধারের কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারাই যখন ভ্রান্ত প্রবৃত্তির ন্যায় হুকুম জারি করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, তখন অব্যবসায়ী অজ্ঞ বলদৃপ্ত আত্মম্ভরি বিলাতী সংবাদ-পত্র-সম্পাদকগণকে আর কি বলা যায়! বড়লাট মিণ্টো বাহাদুর বঙ্গব্যবচ্ছেদের অব্যবহিত পরেই এদেশে পদার্পণ করিয়াছেন, তদবধি এই অশান্তি-আন্দোলনের আগাগোড়া বেশ ভাল করিয়াই দেখিতেছেন, পরন্তু দেখ, তাঁহারই কেমন ভুল :—"A poisonous seed has been sown in India hitherto foreign to the soil. It has grown up into a noxious weed. We must dig it up and cast it out." এই তাঁহার শেষ উক্তি। এই বিষবৃক্ষ এ দেশের জিনিস নয়, এখানকার মৃত্তিকা উহার অনুকূল নহে, উহা বিদেশের আমদানী, তথা হইতে বীজ আসিয়া এখানে অঙ্কুরিত এবং অবশেষে অপকারী আগাছায় পরিণত হইয়াছে, শিকড় বসিয়াছে, সুতরাং সমূলে উৎপাটিত ও দূরে নিক্ষিপ্ত করা হইবে। বেশ কথা, আমরাও তাহাই চাই; অরাজকতা উপদ্রবাদি কে ভালবাসে? পান্তা ভাত বাতাস দিয়া খাই, তবু হেঙ্গামে যাই না। এদেশের শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জন, সহস্র ক্ষতি স্বীকার করিয়াও, নির্ব্বঞ্ঝাটে আরামে থাকিতে চায়। পথে একটা ধর্ম্মের ষাড় দেখিলে আমরা বিশ হাত তফাৎ দিয়া যাই, বক্রবিষাণ মহিষ সম্মুখে আসিলে অনেকের মূর্চ্ছা হয়। আমাদের উপদেষ্টারা বলিয়া গিয়াছেন "শতহস্তেন বাজিনা" "স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জনঃ"—একটা ঘোড়া দেখিলে তাহার শত হস্ত দূরে থাকিবে, কি জানি যদি পিছ্‌লি ঝাড়িয়া মাথাটা গুঁড়া করে, আর দুষ্ট লোকের সংশ্রব অপেক্ষা স্বস্থান ত্যাগ করাও শ্রেয়। আমরাও প্রাত্যহিক জীবনে ঠিক তদনুরূপ কার্য্য করিয়া আসিতেছি। সুতরাং হুড়াহুড়ি, গুতাগুতি, মারামারি, কাটাকাটির দৃশ্য পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষে দুর্ব্বিসহ। এক্ষেত্রে লাটু সাহেবের বিভীষিকার ওজনটা মাপা যাউক। উনি আমাদের সম্রাটের প্রতিনিধি, সসাগরা সদ্বীপা ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা, আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, জগদীশ্বর উঁহার হাতে আমাদের ধনপ্রাণ ন্যস্ত করিয়াছেন, উঁহার কৃপাদৃষ্টি হইলে, আমি কমলাকান্ত, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ হইয়াও, মথুরার রাজতক্তে বসিতে পারি, আবার উনি কটাক্ষ করিলে আমাকে

চিরকারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়, এমন কি, আমার প্রাণ সংহার পর্য্যন্ত উঁহার এক তুড়িতে সম্পন্ন হইবার কথা। আসমুদ্র হিমগিরি পর্য্যন্ত ভারতে দিল্লীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত বাদশাহগণের যে শক্তি ছিল, ইঁহার বিক্রম তদপেক্ষা অনেক বেশী; আকবর আওরঙ্গজেব প্রভৃতি সহস্র চেষ্টাতেও যে সকল দেশীয় নৃপতিকে বশে আনিতে পারেন নাই, ইহার ইঙ্গিত মাত্রে তাহারা এখন উঠিতেছে, বসিতেছে; এক কথায় ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব ইহার লাটত্বের নিকট হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। এহেন মহামহোচ্চ পদাভিষিক্ত ব্যক্তির কথাটা ছুড়িয়া ফেলিবার-যোগ্য হইতেই পারে না। তবে কিনা বিষম পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁহার ঘোষণার মধ্যে কোটি কোটি নিরীহ নির্দ্দোষী রাজভক্ত প্রজার অভাব ক্লেশাদি বিমোচনের ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় দশটা বেশ গোছাল রকমের কথার সঙ্গে অবস্তির প্রসঙ্গের মত ঐ কয়টা ভীতিসঞ্চারিণী শাসন বাক্য থাকিলেই ভাল দেখাইত; তর্জ্জন গর্জ্জনময় কর্কশ কর্জ্জনের ভাব মৃদু মিণ্টোতে শোভা পায় না। শুধু ঐ গরল গাছই কি ভাবনার বিষয় হইল? তজ্জন্য একটু উদ্বেগ ভোগ করিতে হইতেছে বলিয়া কি উহাই প্রথম ও বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়? বিধাতা কর্ত্তৃক বিন্যস্ত ভার এই ত্রিশ কোটি প্রজার আর্ত্তনাদ কি আজও তাঁহার কাণে পঁহুছে নাই? অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, ম্যালেরিয়া, প্লেগাদি দ্বারা নিয়ত প্রপীড়িত দুর্ব্বল অসহায় পদানত প্রকৃতিবর্গের মতামত উপেক্ষা করত নানারূপ দুর্ব্ব্যবহার সহকারে তাহাদের মর্ম্মে যে এতকাল দারুণ আঘাত দেওয়া হইতেছে, তাহা কি রাজপ্রতিনিধির প্রথম ও প্রধান আলোচ্য বিষয় নহে? তাহার প্রতিকারের উপায় বিধান কি সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য নয়? এই সকল বিবেচনা করিলে কি লাট্ মাহাত্মার উক্তির প্রতি একদেশদর্শিতা দোষ আরোপ করা যায় না? শ্বেতকৃষ্ণ নির্ব্বিশেষে প্রজামাত্রেরই হিত চেষ্টা দ্বারাই প্রকৃতিরঞ্জন সম্ভবে; সেটী যদি না দেখিতে পাওয়া যায়, প্রজাপালন রূপ রাজধর্ম্ম রক্ষিত হইতেছে বলি কি প্রকারে?

আরও দুই চারিটী প্রশ্ন এস্থলে করিলে অপ্রাসঙ্গিক হয় না। এত বড় গুরুতর ব্যাপার, এই কালকূটের আমদানী কি সুসভ্য, সুশিক্ষিত, ধর্ম্মপ্রাণ খ্রীষ্টশিষ্যময় ইউরোপখণ্ড হইতে হয় নাই? সেখানে যত্রতত্র বিস্তর ফলফুল-শোভিত বিষবৃক্ষ বিদ্যমান আছে, তবেত অনায়াসে বীজ পাওয়া গিয়াছে। সমবেত খ্রীষ্টানজগতের প্রবলপরাক্রমেও যখন তাহা বিনষ্ট হয় নাই, তখন কাহার স্কন্ধে কিরূপ দোষ চাপাইব ভাবিয়া ঠিক পাই না। পাশ্চাত্য রাজ্যসমূহের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মানুমোদিত শাসনপ্রণালীর ফল যদি অবশেষে নাইহিলিজম্, এনার্কিজম্, ফিনিয়ানিজম্ প্রভৃতি কাল-সর্পিজম্ হয়, তবে বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা!!! উক্ত বীজ কোন্ জাহাজে কোন্ পথে কবে এদেশে আইল? কে আনিল? কেন আনিল? এতদিন বা কেন আসে নাই? এবম্বিধ গুরুতর প্রশ্নাদির উত্তর কে দিবে?

অতঃপর আর একদিক্ দেখা যাউক। খুনজখম গুপ্তহত্যাদি ত নূতন কথা নয়। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা চুড়িডাকাতী, লুটপাট, খুন-খারাপী প্রভৃতি অপরাধের নানারূপ অভিনয় হইয়া আসিতেছে। রাজপুরুষহত্যাও অধুনা অভিনব ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত নহে; শ্বেতাঙ্গরাজ্যসমূহে উহা ত নিত্য ঘটিতেছে।

আমাদের দেশেও ১৮৭১।১৮৭২ প্রধান বিচারপতি নর্ম্মাণ সাহেব ও বড়লাট মেও বাহাদুর আততায়ী হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হ'ন। ওরূপ দুর্ঘটনা ইংরাজভারতে পূর্ব্বে কখন হয় নাই, ভরসা করি, ভবিষ্যতে আর হইবে না। কিন্তু তখন ত রাজজাতির মধ্যে এত হৈচৈ শুনা যায় নাই, এবম্বিধ ভয়ভাবনা বিভীষিকার লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। এখনই বা এরূপ ভয়ঙ্কর হট্টগোলের কারণ কি? তবেই তথ্য-কথায় গিয়া পড়িতে হইতেছে। তখন যে কারণে ঐ দুই মহোদয় নিহত হয়েন, তাহা এবং আধুনিক কারণ ইত্যাদির মূলে যাহা বিদ্যমান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে, এইরূপ অনুমান অনেকে সঙ্গত বিবেচনা করেন। এইখানেই ধীর প্রণিধান, পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান, সূক্ষ্ম বিচার ও নিরপেক্ষ মীমাংসার প্রয়োজন। আবদুল্লা ও শের আলী ব্যক্তিগত স্বার্থহানিজনিত হতাশাবস্থায় উন্মত্তহৃদয়ে নরহত্যা করত ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিল, কি কোন সম্প্রদায়বিশেষের হিতেচ্ছায় নিজেদের প্রাণ আহুতি দিয়াছিল, তাহা প্রকাশ নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, সে সময় ওয়াহাবী মতাবলম্বী মুসলমানশ্রেণীর প্রতি রাজবিদ্রোহাপরাধে শাসনবজ্র প্রযুক্ত হইতেছিল। পরন্তু সেই হুলস্থুল ব্যাপারের কালে, এই ভীষণ কাণ্ডদ্বয় ঘটিলেও, রাজাজ্ঞায় জনসাধারণের প্রতি কোনরূপ কঠোর ব্যবস্থা প্রচারিত হয় নাই; বরং মুসলমান প্রজাকুলের উপর রাজপুরুষগণের কথঞ্চিৎ অনুগ্রহই প্রকাশ পাইয়াছিল; তাহাদের শিক্ষোন্নতির দিকে রাজদৃষ্টি যেন তৎকাল হইতে একটু খরতর বোধ হইতেছে। এবার কিন্তু যাহারা অত্যাচার উপদ্রবাদির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া কারাবাস, নির্ব্বাসন, প্রাণদণ্ড, আলিঙ্গন করিতেছে, তাহাদের দ্বারা স্পষ্টাক্ষরে বিজ্ঞাপিত যে তাহাদের নিজেদের বা বিশেষ কোন দলের কোন প্রকার স্বার্থরক্ষা তাহাদের লক্ষ্য নহে, সমগ্র ভারতের নানাজাতীয় উৎপীড়িত প্রজানিচয়ের ক্লেশ বিমোচনোদ্দেশে দেহপ্রাণ সমর্পণ করত তাহারা আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেছে। এবম্বিধ দুষ্কার্য্যকলাপ যে শিষ্টজনোচিত নহে, এবং এরূপ কুপ্রথাবলম্বনে যে কুফল বৈ সুফলের আশা নাই, ইহা আমরা ত বিশ্বাস করিই, বিপ্লবকারীরাও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নয়; অথচ তাহারা কিছুতেই এ পথ ছাড়িতেছে না। এই অদ্ভুত রহস্য ভেদ করে কে? উহারা কি ভাবিয়া কি কাজ করিতেছে, উহারাই জানে, আমাদের তাহা অনুমান দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। রামের লীলা রামই বুঝেন, তিনি ভিন্ন আর কাহারও সম্যক বুঝিবার সাধ্য কোথায়? উহাদের জন্ম, বয়স, স্বভাব, প্রকৃতি, শিক্ষা, দীক্ষা এবং শরীরমনের অন্যান্য অবস্থাদি কিরূপ, তাহা আমরা আদৌ জানি না, সুতরাং উহাদের ভিতরকার খবর আমাদের গোচর হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তদ্ব্যতীত সংসারের নিয়মই এই যে, বেদে ভিন্ন সাপের হাঁচি অন্যে চিনিতে পারে না। শিল্পী শিল্পীকে চিনে, বণিক্ বণিকের হাবভাব বুঝিয়া থাকে, বীর বীরোচিত গুণাবলীর মর্য্যাদা জানে, এই প্রকারে যে যতটা যাহার সমভাবাপন্ন, সে ততটা তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে, অন্যের পক্ষে তাহা দুঃসাধ্য। তবে কতকগুলি অত্যুজ্জ্বল গুণ বা উৎকট দোষ দেখিলে সাধারণের কিয়ৎপরিমাণে বিচার করিবার অধিকার আছে।

উল্লিখিত বৈপ্লবিক যুবকগণ যে একদম অনভিজ্ঞ, তাহার প্রমাণ অনেক পাওয়া গিয়াছে, উঁহাদের মস্তিষ্ক যে সংসারের সাধারণ জীবের ভাবে বিকশিত নয়, তাহাও সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, হ্রস্বদীর্ঘবোধ এবং সতর্কতার সম্পূর্ণ অভাব প্রত্যেক কার্য্যে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, অগ্রপশ্চাৎ-বিবেচনা দূরে থাকুক, একটা বিকট রকমের হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া জ্বলন্ত হুতাশনে ঝম্প প্রদান করিবার দুঃসাহস যে বিলক্ষণ আছে, তাহা আর দেখাইয়া দিতে হইবে না। এববিধ বহুতর দোষত্রুটি সত্বেও,নিজেদের আলোকানুযায়ী আত্মবলিদানে তাহারা যে শ্রেণীর তৎপরতা দেখাইতেছে, তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না; প্রাণদণ্ডের অব্যাবহিত পূর্ব্বে এবং দণ্ডগ্রহণকালে দুইজন যেরূপ চিত্তের স্থৈর্য্য ও প্রফুল্লতা প্রকাশ করিয়া গেল, তাহা অত্যদ্ভুত; ইহা শত্রুমিত্র উভয়েই বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন; তাহাদের অন্তিমকালের মানসিক তেজ ও হৃদয়ের বল দেখিয়া সকলকেই অবাক্ হইতে হইতেছে। এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা আলোচনা না করিলে দোষের হয়। অধুনা ইংরাজজাতি তাঁহাদের পূর্ব্ব মহত্ব অনেকটা হারাইয়াছেন,প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অনেকের মুখে এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তবুও তাঁহারা যে ফলাফলের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া শতমুখে গুণীর গুণের বাহবা দিতে পরাঙ্মুখ নহেন। বিশেষ যেখানে মনুষ্যত্বের প্রবল পরাক্রম পরিলক্ষিত হয়, সেখানে সহস্র ক্ষতির আশঙ্কা থাকিলেও যে তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিহারি দিতে বিরত হ'ন না, তাহার একটী প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দেখ, এই দুঃসময়ে স্বজাতির নিন্দা গ্লানি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পাইওনিয়র নরেন্দ্রবধোপলক্ষে ঘাতকদ্বয়ের শৌর্য্য ও আত্মোৎসর্গের কীর্ত্তন করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। "শত্রোরপি গুণাবাচ্যাঃ"—এই নীতি জন্‌বুল যে সর্ব্বদা অনুসরণ করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহার কম উদারতার পরিচায়ক নহে। অন্যান্য শ্বেতকায় কাগজওয়ালারা দুনিয়াদারীর অনুরোধে এবং পোড়াদেশের হাওয়ার গুণে জাতীয় স্বভাবটী চাপা দিয়া হজগজ করিয়া সারিলেন, কিন্তু একজন কিছুতেই বৃটিশ মহানুভবতা দাবাইয়া রাখিতে পারিলেন না। যাহা হউক, পাইওনিয়র মহাত্মা সমগ্র ইংরাজ জাতির মুখ রক্ষা করিয়াছেন, এজন্য তিনি উঁহাদের ধন্যবাদার্হ, আমরাও উঁহার নিকট কৃতজ্ঞ যে, উনি এই পতিত জাতির একজন নরহন্তার ভিতরেও সুখ্যাতির যোগ্য মহদ্‌গুণ দেখিতে পাইয়াছেন এবং আমাদিগকে তাহা দেখাইয়া শিক্ষা দিয়াছেন,—আমরা ত গুণের প্রতি অন্ধ।

আমরা পরলোক-বিশ্বাসী জন্ম-জন্মান্তরবাদী, মৃত্যু আমাদের পক্ষে আকাশ কুসুমবৎ একটা শব্দ মাত্র, এই শিক্ষা যিনি নিজে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদান করিয়া যান, তিনি পূজার্হ, সন্দেহ নাই, কিন্তু কয়জন তাহা পারে? সাধু সন্ন্যাসী মহাপুরুষগণ অনেকে এবম্প্রকারে আমাদিগকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, পরন্তু গৃহস্থ বালকে যে ওরূপ উদাহরণ দেখাইতে সক্ষম হয়,ইহা নূতন সংবাদ বলিতে হইবে।

প্রঃ—এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? রাজাই বা কি করিবেন?

উঃ—জনকতক লোক ক্ষেপিয়াছে মাত্র, সমগ্র দেশ ত স্থির আছে। আমাদের

কর্ত্তব্য রাজপুরুষগণকে দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইতে চেষ্টা পাওয়া, আর তাঁহাদের কর্ত্তব্য আমাদের সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করা। কেবল নিজের চাকর ব্যুাকরদের সঙ্গে যুক্তি করিলে ত কোন ফল হইবে না, আর তাহারা জানেই বা কি। ইংরাজ কর্ম্মচারীরা এদেশের খবর কিছুই জানেনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। একটা গল্প বলি, গল্প নয় প্রকৃত ঘটনা। একজন পুরাতন জজ, তিনি শেষে হাইকোর্টের বিচারাসন শোভিত করিয়া অতি অল্প দিন হইল পেন্সন লইয়া দেশে গিয়াছেন, বাস্তবিকই একটা দেওয়ানী মকর্দ্দমার সাক্ষীর এজাহারে লিখিয়াছিলেন "গোপালজীর ভোগের জন্য সন্ধ্যা কালে আধসের মুরগি লাগে" * কথাটা এই যে সাক্ষী "মুড়্কির" উল্লেখ করিয়াছে, উনি নিজের খাদ্যের হিসাবে "মুরগি" বুঝিয়াছেন; এ জ্ঞান নাই যে, ব্রাহ্মণের বাড়ীর বিগ্রহ, হিন্দুর অখাদ্য মুরগি কি প্রকারে গ্রহণ করিবেন !!! এবম্বিধ অজ্ঞ সব্‌জান্তাগণের নিকট দেশের লোকের অবস্থা সম্বন্ধীয় যে সকল সংবাদ সংগৃহীত হইবে, তাহার মূল্য বুঝিয়া দেখ।

প্রঃ—মোটামুটি আমাদের যাহা কর্ত্তব্য বলিলেন, তাহা ত বুঝিলাম। বিশেষ কিছু বলেন ত কৃতার্থ হই।

উঃ—হরিপদে চিন্তা রাখিয়া জীবনতরী ভাসাইয়া যাও, তদ্ভিন্ন এই হতভাগ্য দেশে আর কি করিতে পার? শাস্ত্রে আছে—

> "যদি কৃষ্ণপদে চিন্তা
> ভক্তি স্তৎপদপঙ্কজে।
> বিষমে দুর্গমে বাপি
> কা চিন্তাঃ মরণে রণে॥"

* One pound of chicken.

বাস্তবিক যদি ভগবানের চরণে চিন্তা রাখিয়া চলা যায়, বিষম আপদ বিপদ, এমন কি যুদ্ধে মৃত্যুতেও ভয়ভাবনা হয় না। হৃদয়ের দৃঢ়তা সম্পাদন জন্য হরিভক্তিই প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপায়; যত কিছু কষ্ট, দুঃখ বেদনা, যাতনা কউক না,ঈশ্বরে ভক্তি বিশ্বাস থাকিলে কিছুতেই কিছু করিতে পারে না।

প্রঃ—কিছু বিস্তারিত রূপে বলুন।

উঃ—দুরন্তবীর্য্য বিশ্ববিধাতার লীলাবলী অগম্য অপার! সেই অদ্ভুত লীলাচক্রের অধীন হইয়া আজ আমাদের বিষম দুর্দ্দিন উপস্থিত! লীলারসময়ের লীলাবলিতে একটা খামখেয়ালী যা-ইচ্ছা-তাই কাণ্ড বুঝিতে হইবে না, তাঁহার সকল ব্যাপারই সুপ্রণালীগত, কার্য্যকারণ সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত। ভারতবর্ষের আধুনিক লীলা-রহস্য-ভেদ করিবার চেষ্টায় কারণানুসন্ধান করিতে গেলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই বর্ত্তমান দুর্বিপাকের মূলে আমরা নিজেই; ইহার আগাগোড়া আমাদেরই স্বকৃত কর্ম্মফল। অপরের স্কন্ধে দোষারোপ করত মুক্ত হইবার চেষ্টা দুর্ব্বল হৃদয় জীবের ধর্ম্ম, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিবার যাঁহাদের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন যে আমাদের শত্রু আমরা নিজেরাই। কথায় বলে দিগ্বিজয়ী রোম আগে আপনাকে আপনি পরাজয় করিয়াছিল, পরে বর্ব্বর জাতিনিচয় কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়। বাস্তবিক তাই, নিজে যদি ষোল-আনা ঠিক থাকিতে পারি, কাহার সাধ্য আমার অঙ্গ-স্পর্শ করে? তাই বলিতেছিলাম, আমাদের বর্ত্তমান দুর্গতির মূলীভূত কারণ আমরা নিজেরাই, তজ্জন্য অপর কেহ দায়ী নহে।

সংসারে আমরা যে উদ্ভিদ্ পশ্বাদির মত

জীবন যাপন করিতে আসি নাই, এ কথা আমাদের মধ্যে অনেকেই সম্পূর্ণ বিস্মৃত। জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"Life is something more than eating, drinking, begetting children and accumulating money."

অর্থাৎ পানাহার, অপত্যোৎপাদন ও ধনসঞ্চয় ব্যতীত মানব জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে। শুধু সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিলে চলিবে না, মনুষ্যত্বের দিকে, দেবত্বের দিকে অগ্রসর হওয়া চাই। এই মহাসত্য ভুলিয়া যে দিন আমরা আদর্শ-হীন ভাবে কলুর বলদের মত কালক্ষেপ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, সেই দিন হইতে আমাদের অধঃপতনের সূত্রপাত, দুর্দ্দশার আরম্ভ, যাহা অধুনা প্রায় চরমে পঁহুছিয়াছে। যে মানুষের সম্মুখে সর্ব্বদা কোনরূপ উচ্চ আদর্শ নাই, সে নিতান্তই হতভাগা, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র সাংসারিক প্রয়োজনাদি সুচারু-রূপে সাধন করিতে ব্যস্ত, সে নিতান্তই কৃপা পাত্র, মানব-সমাজের খাতা হইতে তাহার নাম কাটিয়া দেওয়া উচিত। মানুষে দেব-ভাব ও পশুভাব, উভয়ই বিদ্যমান। দেবভাবের অঙ্কুর ও পশুভাবের পরাকাষ্ঠা এই দুই উপ-করণে গঠিত হইয়া ক্রমে পশুত্ব বর্জ্জন করত দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য মানুষ নিয়োজিত। যে ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা না ঘটিতেছে, সেইখানে জানিতে হইবে উৎকর্ষের চিহ্নও নাই, অবনতির উল্টা স্রোত প্রবাহিত। যদি আদর্শ মহৎ হয়, উন্নতি অনিবার্য্য, আর ইন্দ্রিয়-প্রীতিকামনা মাত্র যদি উদ্যমের কারণ হয়, তাহা হইলে দেবোপম গুণাদির প্রাপ্তি সম্ভাবনা দূরে থাকুক, জ্বলন্ত পশুত্বেরই পূর্ণলীলা প্রকটিত হইবার কথা। জগতের সমক্ষে হীনাৎহীনতর হইয়াও নরা-কারে পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগ দ্বারা কৃত-কৃতার্থ হইব, ইহা যাহার দুর্লভ জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য, সে কি কৃমিকীটাদি নিকৃষ্ট জীবাপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর নহে? সমগ্র সংসার দ্বারা উপেক্ষিত হইয়াও যাহার হৃদয়ে ঘৃণালজ্জার উদ্রেক না হয়, সে কি কখন মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারে? হাত, পা, মুখ, চোখ, নাক মানুষের মত হইলেও আমাদের ভিতরে যাহা আছে, তাহাকে কাহার সাধ্য মানুষ বলিয়া চিনিয়া লয়? মানুষ ব্রহ্মের সন্তান, ব্রহ্মত্ব লাভ তাহার চরম গতি, সুতরাং যাহার ভিতর হইতে একটু সামান্য ব্রহ্মজ্যোতির আভাসও ফুটিয়া না বাহির হয়, তাহাকে ব্রহ্মসন্তান বলিয়া কি প্রকারে চেনা যায়? ক্ষুদ্রের সন্তান হইয়া হৃদয়ে যদি মহৎ হইবার প্রবল আশা আকাঙ্ক্ষা রাখে, তাহার মুখে মহত্তের ভাবের একটা আভাস স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, আর মহতের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি কর্ম্মফলে ক্ষুদ্রাৎ-ক্ষুদ্রতর হইবার পথে গড়াইয়া নামিতেছে, তাহার মুখচ্ছবি দেখিলেই একটা বিকট রকমের বীভৎস ভাবের উদয় না হইয়া যায় না। এই শ্রেণীর জীবের কথা ভাবিলে পাষাণ ফাটিয়া যায়; ইহারা চরিত্রবলের অভাব হেতু সম্পূর্ণ ভাবে মানসিক তেজো-হীন, আত্মার অমরত্বে অবিশ্বাস নিবন্ধন দেহ নাশের ভয়ে জড়সড়, জীবিত থাকিয়াও তাহারা প্রত্যহ দশবার মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।

এরূপক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, হৃদয়ের বল সঞ্চয় করিবার চেষ্টা। সত্যের প্রতি নিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা না জন্মিলে, আত্মার অমরত্বে জ্বলন্ত বিশ্বস না হইলে, মনুষ্যত্ব লাভ

অসম্ভব; আর মনুষ্যত্ব না পাইলে শক্তি কোথা হইতে আসিবে? সত্যের প্রতি পূর্ণ আস্থা হইলেই সত্যস্বরূপের প্রেমময় রূপ হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে; তখন দেখিবে যে, নিজের অপেক্ষা পরের জন্য জীবনধারণেই প্রকৃত সুখশান্তি ও বলবিক্রম; আবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিবে যে, পরের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে পারিলে আরও উচ্চে উঠা যায়। দধীচি প্রভৃতি বহুবিধ মহাত্মার আত্মোৎসর্গের কথা পুরাণাদিতে আছে। অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ একবার দেখাইয়াছিলেন, এক কপোতদম্পতী অতিথির সেবার্থ কি প্রকারে প্রফুল্লচিত্তে তনুত্যাগ করিয়াছিল। সে আখ্যায়িকাটী বড়ই মনোহর।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

কামনা।

হে জনমভূমি!
সাধ হয়, মোর প্রাণ, হৃদয়, চেতনা
তোমার মাঝারে দিয়ে জাগাই তোমারে;
আমারে দশাংশ করি সম দিগঙ্গনা,
চিরদিন ঘিরে রাখি তোমা একবারে;
আমার হৃদয়-রক্ত করিয়া বাহির,
তোমার শিরার মাঝে দিই বহাইয়া;
নিঙ্গাড়িয়া শেষ বিন্দু তপ্ত অশ্রুনীর,
তোমার নিরুদ্ধ অশ্রু তুলি ফুটাইয়া;
মেঘ বক্ষে করি ক্ষুদ্র তারকা যেমন
আপনারে ঢেকে দেয়; অক্ষম দুর্ব্বল
তেমতি চরণ তব করি আলিঙ্গন,
তোমাতে ডুবিয়া যাই পুলক-বিহ্বল।
জন্মি তব বুকে, তোমা দেখিনু প্রথম,
গৃহান্তরে যে'ত মাতা ফেলে মোরে একা,
তখনি তোমার গাঢ় স্নেহ অনুপম
দিকে দিকে শত রূপে পাইতাম দেখা।
তোমারি ধূলির মাঝে রয়েছে গোপন
কত মান, অভিমান, কত অশ্রু, হাস্;
কিরণে অনিলে তব, শৈশব স্বপন
জড়াইয়া আছে তার ক্ষীণ বাহুপাশ।
তোমার ও সন্ধ্যাকাশে ব্যাপ্ত কত গান,
তোমার তটিনী জলে কতই রাগিণী,
স্মৃতির কপাটে চুপে পেতে দিলে কাণ,
আজো তার সেই স্বর প্রাণে প্রাণে শুনি।
জোছনা, আঁধারে ওই নীরদ মালায়,
জীবনের সুখ দুঃখ মিশেছে আমার,
বাতাসে সুবাস সম অবিচ্ছেদ্য কায়—
সারা প্রাণে হু হু রবে বহে অনিবার।
আজি এই দূরস্থিত প্রবাসী হৃদয়
প্রতিদিন একবার যে'য়ে ফিরে আসে,
তোরি কাছে কাছে মাগো! ব্যথা অশ্রুময়
বাহিরিয়া শ্মশানের কোন্ দীর্ঘশ্বাসে।
বুঝিয়াছি আমি তোর অণু পরমাণু,
একান্ত তোমার আমি, গেছি মোরে ভুলি,
ভক্তিভরে তোরি পায় পাতিলাম জানু,
হীন শিরে দে'মা! তুলি চরণের ধূলি।
আমারি শিখড় গুলি তোরি সারা গায়
বর্ম্ম সম ব্যাপ্ত হোক্; গরবে ভুলিয়া
কেউ যদি পশু বলে আঘাতে তোমায়,
উৎপাটিত হ'য়ে আমি পড়িব ভাঙ্গিয়া
তারি'পরে, ফিরে যদি দাঁড়াতে না পারি,
শ্রান্ত বাহু তোরি পদে জড়াইবে মম,
জন্ম জন্মান্তর র'বে কঙ্কালের সারি
শত্রু দেহ বিঁধিবারে কণ্টকের সম।
দেবতা আমার আছে কোথা কোন্ দূরে

লুকাইয়া আপনারে মাগো ! তোরি ঠাঁই,
তোমার ভিতর দিয়া, তব অন্তঃপুরে,
তাঁহারি স্নেহের আঁখি দেখিবারে পাই।
তটিনীর ঊর্ম্মিতলে, মলয় বাতাসে,
বরষা, বসন্তে, মেঘে, প্রদোষ প্রভাতে,
তোমারি মূরতি ধরি আসি মোর পাশে,
নিতি সে নেহারে মোরে তোমারই সাথে।
স্মরিয়া নামটী তাঁর, দেখেছি তোমায়,
মনমাঝে অপরূপ অপূর্ব্ব সুন্দর ;
তোমারি নিঝর তানে, বিহঙ্গ গলায়
শুনিয়াছি সুধা সম তাঁরি কণ্ঠস্বর।
তব প্রতি অঙ্গে পাই তাঁহারি আভাষ,
বিশ্ব-বিশ্বেশ্বর, দোঁহে মিশে চিরন্তন—
তোমাতেই করে যেন সদা স্বপ্রকাশ,—
সাকার ও নিরাকার—স্রষ্টা ও সৃজন।
জীবনে তোমার কাজে হ'ব ম্রিয়মান
বাজিবে যখন তব কাঁশী ঘণ্টা রণভেরি,
নানা উপচার সাথে দেখিবে শয়ান
বিশ্রান্ত হিয়া ওপদে, উঠিছে শিহরি।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী।

ইউরোপীয় দর্শনের উপর বেদান্ত মতের প্রভাব।

বেদান্তের অর্থ ও হিন্দু জীবনে
বেদান্তের প্রভাব।

বেদান্ত-মতই ভারতের প্রাচীনতম ও উচ্চতম দর্শন। আচার্য্য মোক্ষমূলর তাঁহার 'ভারতীয় ষড়দর্শনেতিহাসের' ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'বেদান্তদর্শন মনুষ্য চিন্তাশক্তির পরাকাষ্ঠা—"A system in which human speculation seems to me to have reached its very acme." বেদান্ত-নাম দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে যে বেদের সার নিকৃষ্ট হইয়া বেদান্ত মত গঠিত হইয়াছে। উপনিষদ বৈদিক সাহিত্যের অন্তভাগ বলিয়া, উপনিষদ্-নিবদ্ধ জ্ঞানই প্রধানতঃ বেদান্ত নামে অভিহিত। উপনিষদের জ্ঞান ব্যাসের 'উত্তর মীমাংসায়' প্রণালীবদ্ধ হইয়া 'বেদান্ত দর্শন' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দুর কার্য্য-জীবন যেমন বেদের দ্বারা অনুপ্রাণিত, হিন্দুর প্রকৃতি তদ্রূপ বেদান্তমতে গঠিত। সুতরাং বৈদিক কাল হইতেই বেদান্তমত হিন্দুজীবনে অধিকৃত হইয়াছে। আবহমানকাল হইতেই সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত বেদান্তমত মূল-বিস্তার করিয়াছে। হিন্দুর ভাষা ও হিন্দুর সাহিত্যে বেদান্তের অন্তঃস্রোত প্রবাহিত। বেদান্তের মূলতত্ত্ব, হিন্দু সাধারণের তুল্যরূপ সম্পত্তি।

"The fundamental ideas of the Vedanta have pervaded the whole of their literature, have leavened the whole of their language and formed to the present day, the common property of the people at large." The six systems of Indian Philsophy—Prof. Max Muller"

বেদান্তের প্রতিপাদ্য।

এই পরিদৃশ্যমান জগতের আদিকারণ নিরূপণই বেদান্তের প্রধান প্রতিপাদনীয় বিষয়। প্রথম হইতেই বৈদিক ঋষিদিগের মনে, জগৎকারণ-জিজ্ঞাসা উদিত হইয়াছিল। বহু দেবস্তুতির স্বাতন্ত্র্যবাদ (Henotheism)

হইতে ক্রমে প্রজাপতিরূপে একেশ্বরবাদ (monotheism), ব্রাহ্মণরূপে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ বা একত্ববাদ আত্মন্ রূপে, নিজের সহিত ব্রহ্মের অভেদবাদ, ঋষিদিগের চিন্তাতে আবির্ভূত হইয়াছিল। শেষোক্ত ভাবদ্বয়ে বেদান্তের বীজ নিহিত রহিয়াছে বলিয়া ইহাদের মূল উদ্ধৃত হইল:—

"আনীৎ অবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাৎহ অন্যৎ ন পরঃ।" 'সেই একব্রহ্ম স্বয়ং অবিচ্ছিন্ন শ্বাসের সহিত প্রাণ ধারণ করিতে লাগিলেন—তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই বিদ্যমান ছিল না।'

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ একএব।"

"এতদাত্মমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।"

'প্রথমে এক আত্মাই সর্ব্বত্র বর্ত্তমান ছিল।' আত্মাই সমস্তের স্বরূপ, ইহা নিত্য, হে শ্বেতকেতো! তুমিই সেই আত্মা।'

পূর্ব্বোক্ত দুইটী তত্ত্বই বেদান্তের স্তম্ভস্বরূপ। বেদান্তের মতে আত্মার স্বরূপ এই—বিদ্যমানতা (সৎ), চৈতন্যময়তা (চিৎ) ও নির্ব্বিকারতা (আনন্দ)।

বেদান্ত সম্প্রদায় ও মত।

প্রাচীন উপনিষদের মতে জগৎ, ব্রহ্ম হইতে 'নামরূপ' প্রাপ্ত হইয়াছে। উর্ণনাভের জালের ন্যায় জগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ।

উপনিষদ্।

ব্রহ্মই জগতের আদি কারণ, তাহাতেই জগৎ উপসংহৃত হয়। ইহাকে 'পরিণামবাদ' বলা হইয়া থাকে।

শঙ্করাচার্য্য।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যই প্রথম 'মায়াবাদের' প্রচার করেন। তাঁহার মতে এক অদ্বৈত ব্রহ্ম, মায়োপহিত হইয়া ঐন্দ্রজালিকের ন্যায়, মিথ্যা জগৎ-দৃশ্যের বিস্তার করেন। ইহাতে যেমন একদিকে মায়া বা অবিদ্যার কুহকে ব্রহ্ম, সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে প্রতীয়মান হন, সেরূপ, অন্যদিকে ব্রহ্মেরই স্বরূপ জীবাত্মাও, আপনাকে সৃষ্ট বলিয়া প্রবাহিত করে। মাহাত্মা শঙ্করাচার্য্য জগতের ব্যবহারিক যথার্থতা অঙ্গীকৃত করিয়া সাধারণ সংস্কারের সহিত অপনার মায়াবাদের সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। তদ্রূপ ব্রহ্মের ব্যবহারিক সগুণ ভাব, স্বীকার করিয়া সাধারণ ক্রিয়া কাণ্ডের সহিতও স্বকীয় দর্শনের বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন। তাঁহার মতে দুর্ব্বল অধিকারীরা এই ব্যবহারিক জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই পরব্রহ্ম-জ্ঞানে উন্নতি লাভ করিতে পারে। শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক মতকে অদ্বৈতবাদ বলে। ইহার আর অপর নাম 'বিবর্ত্তবাদ'ও দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি এক ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, জগৎ ও ঈশ্বর (সগুণ ব্রহ্ম) তাঁহার মতে মায়া মাত্র। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নতা তাঁহার মতে স্বীকার্য্য। তাঁহার মত সঙ্ক্ষেপে এই কয়েকটী কথায় ব্যক্ত হইতে পারে—

'ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।'

রামানুজ।

রামানুজের মতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম হইলেও, জগৎ মিথ্যা নহে। তিনি জীবাত্মাকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া কল্পনা করিয়া পরিণামে পরমাত্মার সহিত উহার মিলন স্বীকার করেন। ইহাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হইয়া থাকে।

মধ্বাচার্য্য।

মধ্বাচার্য্যের মতে জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে পৃথগ্‌ভূত। পরমাত্মা ও জীবাত্মাতে

সেবা সেবক ভাব। ইহার মতকে দ্বৈতবাদ বলা হইয়া থাকে।

বল্লভ।

বল্লভের মতে জীবাত্মা পরমাত্মারই রূপান্তর। ইহার মত শুদ্ধাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত।

ডাক্তার Deussenএর মতে শেষোক্ত মতত্রয়, জগতের যাথার্থ্য পক্ষে, শঙ্করের অদ্বৈতবাদেরই তাৎপর্য্য প্রকাশের বিফল চেষ্টা মাত্র। দূরদর্শী শঙ্করাচার্য্য এই সকল মতের উদ্ভব পূর্ব্বেই অনুমান করিয়া, ইহাদিগের খণ্ডন করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি দেখাইয়াছেন যে, জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলিলে, ও জীবাত্মাকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করিলে, ব্রহ্মের বিভাজ্যতা উপপাদিত হইয়া দেশকালাতীত অসীম ব্রহ্ম সসীম হইয়া পড়ে। ইহার দ্বারা রামানুজমত খণ্ডিত হইয়াছে। জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক বস্তুও নহে, কারণ ব্রহ্ম অনুভব-গ্রাহ্য 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। ইহা দ্বারা মধ্বমত প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। জগৎ ব্রহ্মের রূপান্তর ইহাও সম্ভবপর নহে, কারণ, ব্রহ্ম নির্ব্বিকার (অবিকার্য্য)। ইহা দ্বারা বল্লভ-মত প্রত্যুক্ত হইয়াছে।

সুতরাং শঙ্করের 'মায়াবাদ'ই প্রকৃত বেদান্ত মত। মধুসূদন সরস্বতী তৎ প্রণীত 'প্রস্থান-ভেদে' বেদান্তকে সকল দর্শনের মুখ্যতম ও সকল দর্শনেরই অবলম্বন বলিয়াছেন, এবং শঙ্কর-কৃত ব্যাখ্যাকেই বেদান্তের প্রকৃত মর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তদীয় উক্তির ইংরেজী অনুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল—

'This the Vedanta, is the principal of all doctrines, any other doctrine is but a complement of it, and therefore, it alone is to be reverenced by all who wish for liberation, and this according to the interpretation of the venerable Sankar—this is the secret. Max Muller's Six systems of Indian Philosophy. pages 104—105.

বেদান্ত ও সাংখ্য।

ষড়্‌দর্শনের মধ্যে, বেদান্তের সহিত সাংখ্যেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সাংখ্যের পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ বেদান্তে দেখা যায়, বেদান্তের পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগও সাংখ্যে দেখা যায়, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে সাংখ্য দর্শনের 'প্রকৃতি' অর্থে 'মায়া' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে এবং বেদান্তের 'ব্রহ্ম' অর্থে পুরুষ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। গীতাতে বেদান্ত ও সাংখ্য মতের সংমিশ্রণ হইয়াছে, ইহাতে উভয়েরই মূলতত্ত্ব এক সাধারণ দার্শনিক ক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। সাংখ্যের পুরুষ বেদান্তের ব্রহ্মের স্থানীয়। ব্রহ্ম হইতে পুরুষের প্রভেদ এই যে, ব্রহ্ম এক, পুরুষ বহু, ব্রহ্মে কর্তৃত্ববীজ লীন, পুরুষ নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্ম মায়োপহিত হইলে সৃষ্টি হয়, পুরুষ প্রকৃতির সহিত যুক্ত হইলে সংসার আরম্ভ হয়। মায়োপহিত পরমাত্মার নামান্তর জীবাত্মা, প্রকৃতি-সংশ্রিত পুরুষেরই অনুরূপ। মায়া বিদূরিত হইলেই সৃষ্টির বিনাশ ও ব্রহ্মের প্রকাশ হয়। প্রকৃতি হইতে পুরুষের বিচ্ছেদ হইলেই, সংসার-নিবৃত্তি হইয়া পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়।

বেদান্ত, সাংখ্য ও বৌদ্ধমত।

বেদান্ত ও সাংখ্যের সহিতও আবার বৌদ্ধ দর্শনের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। সাংখ্যকে কেহ কেহ বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শনের প্রসূতি বলিতেও কুণ্ঠিত

হয় না। কপিল ও বুদ্ধকে, কেহ কেহ, অভিন্ন জ্ঞানও করিয়া থাকেন। ইহাই উভয়ের সাদৃশ্যের দৃঢ়তর প্রমাণ। বেদান্ত, সাংখ্য ও বৌদ্ধ দর্শনে সংসার ও পুনর্জ্জন্ম (বা সৃষ্টি) তত্ত্ব একই রূপ। কর্ম্মের জন্যই জীব পুনঃ পুনঃ সংসার-চক্রে আবর্ত্তিত হয়। সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে বেদান্ত ও সাংখ্যের সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের পার্থক্য লক্ষিত হয়। বেদান্ত মতে নির্গুণ ব্রহ্ম, সাংখ্য মতে সৎ বা সত্ত্বামাত্রোপলক্ষিত পুরুষ, সৃষ্টির মূলাধার কিন্তু বৌদ্ধমতে অসৎ, সৃষ্টির প্রারম্ভ। ইহাতেই বৌদ্ধ মতকে শূন্যবাদ বলা হইয়া থাকে। বেদান্তের মায়াবাদের অযথা ব্যবহারেই এই বৌদ্ধ শূন্যবাদের উদ্ভব হইয়াছে। কোন কোন বৈদান্তিকও পূর্ব্বোক্ত শূন্যবাদাবলম্বী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ নামে বিশেষিত হয়। এই 'শূন্যবাদের' মতে আমাদের অনুভূতিজ্ঞান ব্যতীত আর সমস্তই অলীক ও অসার। সুতরাং ইহার নামান্তর 'বিজ্ঞানমাত্র' বা 'জ্ঞানমাত্র'। শঙ্কর ইহার প্রতিবাদ করিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন যে, কোন সত্য বস্তুকে অবলম্বন না করিয়া জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং সমস্ত অনিত্যের মূলে এক নিত্য বস্তুর বিদ্যমানতা স্বীকার করা আবশ্যক।

বৌদ্ধের নির্ব্বাণ, বেদান্তের ভূমানন্দ ও সাংখ্যের কৈবল্য, সংসারের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির একই চিত্র।

ইউরোপের সহিত ভারতের সংস্রব।

গ্রীসের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, গ্রীক্ জাতি স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই Ionian নামে তাঁহাদের এক শাখা এসিয়া মাইনরে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই এসিয়া মাইনরে গ্রীকগণ বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। গ্রীক্ আদি কবি Homer, প্রসিদ্ধ গ্রীক্ ঐতিহাসিক Herodotus ও ও গ্রীক্ দর্শনের জন্মদাতা Thales এই Ionic গ্রীক্দিগের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হন। Ionic গ্রীক্দিগের মধ্যেই গ্রীক্দর্শন প্রথম উদ্ভূত হয়। ইহা হইতেই ইহাঁদের নাম Ionic দার্শনিক সম্প্রদায় হয়। Ionic গ্রীক্গণ প্রাচীনকাল হইতেই পারসীক্দিগের সহিত সাক্ষাৎ সংস্রবে আসে, এবং সেই সূত্রে ভারতের সহিতও তাহাদিগের সংস্রব অসম্ভাবিত নহে। ভারতের সহিত বাণিজ্য ও সৈনিক কার্য্যের জন্য অতি পুরাকাল হইতেই পারস্যের সম্বন্ধ প্রমাণিত হইয়াছে।

আচার্য্য Goldstucker প্রমাণ করিয়াছেন যে, বৈয়াকরণাচার্য্য পাণিনি, বৈদিক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিতে 'যবনানী' পদ যবনদিগের লিপি অর্থে লক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, বৈদিক কালেই Ionianএরা ভারতে যবন নামে পরিচিত হন। কারণ Ionian এই শব্দের সহিত 'যবন' নামের যেরূপ সাদৃশ্য, সেরূপ অন্য কোন শব্দের সহিতই নহে।

পুরাতত্ত্ববিৎদিগের মতে মধ্য এসিয়া পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের ধর্ম্ম প্রচারের চিহ্ন পাওয়া যায়। তুরস্কদেশীয় বসোরা নগরে গোবিন্দ রায় ও কল্যাণ রায় নামক দুই বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণ Alexandria পর্য্যন্ত যে পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তাহা 'মহাবংশ' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের Alasando নাম হইতেই প্রমাণিত হয়।

বাণিজ্যব্যপদেশেও ভারতের বৈদেশিক

সংশ্রবের প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতের গজদন্ত পণ্যদ্রব্য মধ্যে গণ্য ছিল। গজের ভারতীয় ইভ নাম হইতে গজদন্তের নাম ivory হইয়াছে।

Solomonএর সময় হইতেই ভারতের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ থাকার বিষয় old Testamentএ উল্লেখ দেখা যায়। তথায় ভারত Ophir বা স্বর্ণদেশ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ইহাতে বোধ হয় ভারতের সমৃদ্ধির প্রবাদ প্রাচীনতম কাল হইতেই পাশ্চাত্য জগতে প্রচলিত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জ্ঞান-গৌরবও অপ্রকাশিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। প্রথিত আছে,গ্রীক দার্শনিক পাইথাগোরস্ জ্ঞানসংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন এবং ভারত হইতে পুনর্জ্জন্মমত ও দশকসংখ্যা স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন।

"Some of the most ancient of the Greek philosophers travelled into India, that by conversing with the sages of that country, they might acquire some portion of the knowledge for which they were distinguished." Robert's Hist. Disqu-Con. Anc. India p 240.

মহাবীর আলেক্জাণ্ডার ভারতের জ্ঞান ও ধন, এই উভয় সমৃদ্ধির কথা জানিয়াই বোধ হয় ভারতাক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

আচার্য্য মোক্ষমূলর তাঁহার ভারতীয় ষড়দর্শনের ইতিহাস নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, গ্রীক্ মহাপণ্ডিত Aristotleএর পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় দর্শনের অস্পষ্ট কিম্বদন্তী পাশ্চাত্য সমাজে প্রচারিত ছিল। কথিত আছে, আলেক্জাণ্ডারের নিজের মনে এই ধারণা দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ছিল। তিনি যে, ভারতীয় যোগীদিগের সহিত আলাপ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা দ্বারাই উক্ত বিষয় প্রমাণিত হয়। স্বনামখ্যাত কল্যাণ এই যোগীদিগের অন্যতম বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি মেসিডনীয় সৈন্যের সমক্ষে জলন্ত-চিতারোহণে স্বেচ্ছাতে মৃত্যু আলিঙ্গন করেন।

"There had been vague traditions of ancient Indian philosophy, even, before the time of Aristotle. Alexander himself, we are told, was deeply impressed with that idea, as we may gather from his desire to communicate with the gymnosophists of India. One of these gymnosophists or Digambaras seems to have been the famous Kalanos (Kalyana ?) who died a voluntary death by allowing himself to be before the eyes of the Macedonian army.

পূর্ব্বোক্ত পাইথাগোরসের ভ্রমণ বৃত্তান্তও, আচার্য্যমোক্ষমূলর-বর্ণিত কিম্বদন্তীর সমর্থন করে।

এরূপও কিম্বদন্তী আছে যে, Sarmancherja (সম্ভবতঃ শর্ম্মণাচার্য্য) নামে এক ব্রাহ্মণ গ্রীস্‌দেশে গমন করিয়া ম্লেচ্ছদেশে আগমনহেতু আপনাকে পতিত জ্ঞান করিয়া, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এথেন্স নগরে অগ্নিপ্রবেশ করেন।

গ্রীকদিগকে, পুরাকাল হইতেই,ভারতের সম্বন্ধে কৌতুকপরায়ণ দেখা যায়। ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব অতি প্রাচীনকাল হইতেই গ্রীক্‌দিগকে ভারতের সংশ্রবে আসিতে উৎসুক করে। ভারতীয় দর্শনই গ্রীক্‌দিগের অধিক বিস্ময়ের কারণ হয়। এই জন্যই মহাত্মা আলেক্জাণ্ডার ভারতে আসিয়া যোগীদিগের বিষয় জানিবার জন্যই প্রথম কৌতূহল প্রকাশ করেন। এরূপ কথিত আছে যে, তিনি ভারতীয় দর্শন গ্রন্থ সকল স্বগুরু Aristotle সমীপে প্রেরণ করেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজ-

সভাস্থ গ্রীকদূত Megasthenesও, তাঁহার ভারত-বিবরণে, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের উন্নতি দর্শনে আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রীক দর্শন ভারতীয় দর্শনের সমকক্ষ হইলে কখনও গ্রীকগণ ভারতীয় দর্শনের প্রতি এরূপ সম্ভ্রম প্রদর্শন করিতেন না।

গ্রীক্‌দিগের ভারতাক্রমণ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ঘটনা। গ্রীক্‌দিগের লিখিত বিবরণেই এই সময়ের প্রমাণিত বিবরণ পাওয়া যায়। সিংহলের পালিভাষা-বিরচিত 'মিলিন্দা প্রশ্ন' নামক গ্রন্থে গ্রীক্ শাসনকর্ত্তা মীনেন্দ্র (Menander) বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক নাগসেন হইতে নির্ব্বাণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া উপদেশ প্রাপ্ত হন বলিয়া লিখিত আছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে ভারতীয়ধর্ম্মপ্রচারকগণ Alexandria-তে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার করেন। বৌদ্ধ দর্শনের সহিত বেদান্ত দর্শনের সাদৃশ্য পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধ মতের সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ে বেদান্তমতও পাশ্চাত্য বিদ্বৎসমাজে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, ইহা সহজেই অনুমেয়।

পাই... ।রসের ভারত-ভ্রমণ ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রীক্ দার্শনিক-প্রবর প্লেটোর জীবন আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, তিনি জ্ঞান-পিপাসু হইয়া মিশর (Egypt) পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর পূর্ব্বেই Egyptয়ে ভারতীয় জ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। পাইথাগোরীয় সম্প্রদায়ের মতও, প্লেটোর দর্শনকে বিশেষ গঠন প্রদান করে। পাইথাগোরস তাঁহার দার্শনিক মতের জন্য ভারতের নিকট ঋণী ছিলেন। পাইথাগোরসের মত-যোগেই হউক বা মিশরে অনুশীলিত জ্ঞান যোগেই হউক, প্লেটোর দর্শন, হিন্দুদর্শনের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়াছে।

খ্রীঃ ৩য় শতাব্দীর প্রারম্ভে NeoPlatonic সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। ইতিহাসের প্রমাণে আলেকজেণ্ড্রিয়ার সহিত ভারতের সম্বন্ধ তখন ঘনিষ্টতর বলিয়া জানা যায়। এই NeoPlatonic দর্শনেই বেদান্তমতের প্রভাব প্রথম পরিস্ফুট হইয়াছে। যাহা হউক, ...ক্ত 'যবন' নাম এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের প্রমাণ দ্বারা NeoPlatonic মতের পূর্ব্বেও, গ্রীক্‌দর্শনের বেদান্ত মতের সাদৃশ্য ভারতীয় সংশ্রব-মূলক বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে বাধ্য হইলাম।

অধ্যাপক Weber, Wilson, Colebrooke, Count Goblet d' Alviella ও Girres প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে গ্রীক্ দর্শন ভারতীয় দর্শনেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছে। Count Goblet d' Aeviella তাঁহার Ce que l' Inde doit a'la Grice নামক গ্রন্থে Alexanderএর ভারতাক্রামণের পর হইতে যে গ্রীক্ ও ভারতীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সযত্নে বহুতর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তদীয় গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে,Damascusএর বর্ণনায় জানা যায় যে, আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় ব্রাহ্মণ-প্রবাসী বর্ত্তমান ছিল। Max Muller ও Niebuler উভয়েই গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনের সাদৃশ্য, এবং গ্রীক্ ও হিন্দুর সংশ্রবও স্বীকার করেন। Max Mullerএর মতে "গ্রীক্ ও হিন্দুর মানসিক প্রকৃতির সমতাই এই সাম্যের কারণ। গ্রীক্ ও হিন্দুর সংশ্রবের এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, যাহাতে পরিষ্কার ভাবে উভয়ের ভাব বিনিময় হইতে পারে।" ইহার প্রত্যু-

ত্তরে আমরা এই বলিব যে, প্রকৃতি-সাম্য কারণ হইলে, ইউরোপীয় অন্যান্য আর্য্য শাখারও স্বাধীন ভাবে এইরূপ দার্শনিক বিকাশ সম্ভবপর হইত। গ্রীকগণ স্বয়ং ভারতীয় জ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু ছিলেন, সুতরাং বিশেষ চেষ্টা করিয়া যে তাঁহারা ভারতীয় দর্শনের মূলসূত্র অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, ইহাতে কি অসম্ভাব্য আছে? Niebuler উভয় দেশীয় দর্শনের সাদৃশ্য ও উভয় জাতির সংশ্রব পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াও, ভারতীয় দর্শনকেই গ্রীক্ দর্শনের অনুবর্ত্তনকারী বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন। কিন্তু ইহাতে যে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হয়, তাহা বোধ হয় তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। গ্রীক্‌দিগের ভারতাক্রমণের পূর্ব্বেই ভারতীয় দর্শন মত সকলের উৎপত্তি ও শৃঙ্খলাবন্ধন সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিৎদিগের অতি অল্প মত-বৈষম্যই দেখা যায়। আচার্য্য মোক্ষমূলর-রচিত গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভারতীয় ষড়দর্শনেতিহাসের একটী মাত্র সূত্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা ভারতীয় দার্শনিকদিগের মৌলিকতা ও Niebuler অবলম্বিত মতের অসারতা প্রতিপাদন করিব :—

"The conception of the world as deduced from the Veda, and chiefly from the Upanishads, is indeed astounding. It could hardly have been arrived at by a sudden intention or inspiration, but presupposes a long preparation of metaphysical thought, undisturbed by any foreign influences." Preface.

প্রাচ্যভাষাবিৎ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত Wilson-এর মতও ইহারই পরিপোষক :—

"That the Hindus derived any of their philosophical ideas from the Greeks, seems very improbable, and if there is any borrowing in the case, the latter were most probably indebted to the former."

মহাপণ্ডিত Colebrooke এর মত আরও স্পষ্টরূপে ভারতের অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়, যথা— "The Indians were in this instance, teachers, rather than learners." এস্থলে ভারতবর্ষীয়েরা শিক্ষার্থী না হইয়া বরঞ্চ শিক্ষকই ছিলেন।

এতৎসঙ্গে আমাদের স্বদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদের মতও উল্লেখযোগ্য—

"Modern researches by Western scholars and savants distinctly point out that the mythologies, philosohies, creeds and customs of ancient Greece, Italy and Egypt were of Asiatic, especially of Indian origin." Boses Hindu civilization in ancient America, Page.

গ্রীকগণই ইউরোপের সভ্যতা ও জ্ঞান-গুরু, সুতরাং গ্রীকদর্শনের তুলনায়ই আমরা ইউরোপে বেদান্তমতের প্রভাবানুসরণে প্রবৃত্ত হইব। জগৎ রহস্য-প্রকাশের চেষ্টা হইতে প্রথম দার্শনিক জিজ্ঞাসা আরব্ধ হয়।

Ionic সম্প্রদায়।

গ্রীকদিগের Ionian শাখাসম্ভূত Thalesই প্রথম গ্রীকদিগের মধ্যে দর্শনের প্রবর্ত্তক। তাঁহার সম্প্রদায় Ionic দার্শনিক সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। এই সম্প্রদায় পঞ্চভূতের একতমকে জগতের মূলতত্ত্ব ধরিয়া, জগৎ ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন, ইঁহাদিগের জড়বাদ হিন্দুদিগের পাঞ্চভৌমিক সৃষ্টির সহিত তুলনীয়।

পাইথাগোরীয় সম্প্রদায়।

Ionic সম্প্রদায়ের পর পাইথাগোরীয় সম্প্রদায়। ইহারা Ionicদিগের জড়বাদে সন্তুষ্ট না হইয়া জগতের আরও গূঢ়কারণ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হন। দেশকালাবচ্ছিন্ন

হইয়াই পদার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অতএব সংখ্যা ও বিস্তৃতি তাঁহাদের মতে পদার্থজ্ঞানের প্রকৃত মানদণ্ড। বিস্তৃতি বা পরিমাণ সংখ্যারই সমষ্টি বলিয়া, সংক্ষেপে সংখ্যাকেই ইঁহারা পদার্থের সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে সংখ্যাই সংযোগ-সাধক। এই সংখ্যা-বাদ জড়জ্ঞানমূলক হইলেও ইহার বিশ্লেষণশক্তি জড়বাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়াছে। ইহাতে মায়াবাদের প্রথম আভাস পাওয়া যায়। তাঁহাদের মতে দেহ আত্মার কারাগার স্বরূপ, ঊর্দ্ধলোকই আত্মার প্রকৃত দেশ। আত্মা পরমেশ্বরেরই অধিকার, পরমেশ্বরের স্বারূপ্যলাভই আত্মার কর্ত্তব্য। ইহা মধ্বমতের সহিত অনেকাংশে তুলনীয়। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, মধ্বাচার্য্য পাইথাগোরস অপেক্ষা নব্য হইলেও, তাঁহার মত তেমন নব্য নাও হইতে পারে, কারণ আচার্য্য মোক্ষমূলরের মতে ভারতভূমিতে দর্শনবীজ সকল দূরতম অতীত কালেই উপ্ত হইয়াছিল।

Eleatics

পাইথাগোরীয়দিগের পর ইলিয়েটিক্স সম্প্রদায়। ইঁহারা জড়ের সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ দ্বারা পাইথাগোরীয়দিগের দেশকালসম্বন্ধের অতীত নিত্য সত্তা বা সদ্বস্তু-তত্ত্ব(Pure being) স্থাপন করেন। তাঁহাদিগের "one and all, সকলই এক, বেদান্তের "তদেকম" তত্ত্বেরই অনুবাদ মাত্র। ইঁহাদিগের Pure beingএ বেদান্তমতের ব্রহ্মতত্ত্বের বা সাংখ্যের পুরুষ তত্ত্বের প্রথম অঙ্কুর দেখা যায়; জড়জগতের অসারতা প্রতিপাদনে 'মায়াবাদের' প্রথম বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

Eleatics সম্প্রদায়ের সম্বাদে "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" 'হেসোম্য (শান্ত) প্রথমে এক সৎমাত্রই বর্ত্তমান ছিল', এই আর্যজ্ঞানের অনুবৃত্তি দেখিতে পাই। Eleatics সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা Parmenides-এর মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বারা আমরা তাঁহাদের সহিত বেদান্তমতের সাদৃশ্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিব। তিনি সৎকে, মূলতত্ত্ব রূপে পর্য্যাপ্ত মনে না করিয়া,তাহাতে চৈতন্যের আরোপ করেন। এইরূপে বেদান্তের 'সচ্চিৎ' ভাবের উপলব্ধি Eleatics সম্প্রদায়ে আবির্ভূত হয়। দৃশ্যমান জগৎকে ভ্রম বলিয়া প্রকাশ করিয়া তিনি স্পষ্টরূপে মায়াবাদের প্রচার করেন। Dr. Deussenএর মতে Parmenidesই Platoর মায়াবাদের পথ-প্রদর্শক।

Heraclitus.

কিন্তু জড়জগৎ উড়াইয়া দেওয়া চলে না। সুতরাং Heraclitus নিত্যসত্তার সহিত জড়জগতের সম্বন্ধ উপপাদিত করিবার জন্য অব্যক্তনিত্য সত্তার (Pure being) ব্যক্তাবস্থায় (becoming) উভয়ের অভিন্নতা স্বীকার করেন। তাঁহার মতে জগৎ অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল, অব্যক্তনিত্যসত্তার শক্তিতে জগৎ বিপরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহাতে বেদান্ত ও সাংখ্যের মায়া ও প্রকৃতি সহকারিতায় জগৎ প্রবর্ত্তনমত প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

পরমাণুবাদ।

অতঃপর পরমাণুবাদ আবির্ভূত হয়।

Anaxagoras.

Anaxagoras অন্ধ জড়শক্তি দ্বারা জগৎ ব্যাখ্যার অপূর্ণতা অনুভব করিয়া, জড়ের পার্শ্বে সৃষ্টি-সঙ্কল্প সমর্থমনের কল্পনা করেন। ইহা দ্বারা দর্শন শাস্ত্রের একটী মহৎ সত্য উদ্ধার হইল। দর্শনশাস্ত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী

জড়বাদের স্থান এখন জ্ঞানবাদের (ideal principle) উদ্ভব হইল।

Sophists.

ইহার পর সোফিষ্ট সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইল। পূর্ব্বে যে জ্ঞানবাদের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার দ্বারা অন্তর্জ্ঞানের প্রতিই অধিক অধিনিবেশ হইল, বাহ্যজ্ঞান অবজ্ঞাত হইতে লাগিল। মনুষ্যই সকলের পরিমাপক (man is the measure of all things) ইহাই ইহাদিগের সার-কথা। ইহা "অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" 'অহঙ্কার-বিমুগ্ধ (বিভ্রান্ত) আত্মা আপনাকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করে' এই গীতাবাক্যেরই মর্ম্ম প্রকাশ করে। এই অহংজ্ঞানের অতি প্রাধান্যবশতঃ প্রত্যক্ষই মাত্র বস্তুজ্ঞানের প্রমাণ হইল, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞান ব্যতীত বস্তুজ্ঞানের সাধারণ ভূমি অস্বীকৃত হইল।

Socrates.

এই ব্যক্তিগত অহঙ্কার-জ্ঞান ও বস্তুজ্ঞানের সাধারণ ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই সক্রেতিসের দর্শন জন্মগ্রহণ করে। প্রত্যেকের অহঙ্কার-জ্ঞানেরই মূলে এই অনুভূতি দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার জ্ঞান কেবল ব্যক্তিগত জ্ঞান নহে, ইহা ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে তুল্যজ্ঞান, এইরূপে প্রতিজ্ঞানের বাহ্য প্রমাণ ও বাহ্য সম্বন্ধ বিচার করিয়া চিন্তার সাধারণ সূত্র আবিষ্কারের দ্বারা Socrates অহংজ্ঞানের সার্ব্বভৌমিকত্ব স্থাপন করেন। তাঁহার মতে বিচার শক্তিই প্রকৃত তত্ব, কিন্তু ইহার সার্ব্বভৌমিক প্রকৃতির দ্বারা তাঁহার দর্শন বাহ্য বিষয়ক বা জ্ঞেয়-প্রধান হইয়াছে।

প্রত্যেক বস্তুরই ব্যক্তিগত বিশেষজ্ঞানের সামান্য লক্ষণ দৃষ্টে বস্তু সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানের (generalised idea) সিদ্ধান্ত করিয়া সক্রেতিস্ বস্তু মাত্রেরই মূল প্রকৃতি অবধারণ করেন। প্রোক্ত উভয় তত্বই মনুষ্যের অন্তঃপ্রকৃতির উপাদান প্রদান করিয়াছে। অতএব মনুষ্যের অন্তঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণই প্রকৃত তত্ব লাভের উপায় স্বরূপ। এইজন্যই সক্রেতিস্ 'know thyself' 'আত্মতত্ব অবগত হও' এই বাক্যটীকেই তদীয় দর্শনের মূল ভিত্তি করিয়াছেন। সক্রেতিসের এই একটী উক্তিতেই দর্শনের প্রকৃত প্রতিপাদ্য স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গ্রীক্‌দর্শনের জড়-বাদ ও জ্ঞান-বাদের প্রকৃত সামঞ্জস্য এই একটী বাক্যেই অতি আশ্চর্য্যরূপে বিহিত হইয়াছে। গ্রীক্ চিন্তা প্রণালী সক্রেতিস দর্শনেই শৃঙ্খলা প্রাপ্ত হইয়াছে। সক্রেতিস্‌ই প্রকৃত পক্ষে গ্রীক্ দর্শনের জন্মদাতা। এইজন্যই এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে,সক্রেতিস্ 'তত্বজ্ঞান' স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আনয়ন করেন। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত উক্তিতে আমরা 'আত্মাবারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' এই ঋষি বাক্যেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। সক্রেতিস্ দর্শনের ইহাই তাৎপর্য্য যে, সমস্ত অহংজ্ঞানের মূলভিত্তি আত্মজ্ঞান, সমস্ত বস্তু জ্ঞানের মূল ভিত্তি সামান্য জ্ঞান।

Plato.

সক্রেতিস্ সামান্য জ্ঞান-(generalized notion)-কেই বস্তু সকলের প্রকৃত তত্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তৎশিষ্য প্লেটো বস্তু হইতে এই সামান্য জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার 'মায়াবাদ'রচিত করিয়াছেন। সক্রেতিস্ যাহাকে জ্ঞাতার মানসিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেন—Plato তাহাতে পৃথক্ অস্তিত্ব আরোপ করিয়া তাহার পৃথক্ স্বরূপ প্রচার করেন। প্লেটোর মতে আমা-

দের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত সমস্তেরই একটী একটী আদর্শ (archetype) রহিয়াছে। যাহা আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, তাহা ঐ আদর্শেরই ছায়ামাত্র—ঐ আদর্শই প্রকৃত স্বরূপ। সুতরাং আমাদের জগৎজ্ঞান অলীক, ঐ আদর্শ-জ্ঞানই জগতের প্রকৃত সত্য। জগতের চির পরিবর্ত্তনের মধ্যে ঐ আদর্শ-জ্ঞানই নিত্য-পদার্থ। প্লেটোর দৃশ্য জগতে জ্ঞান-স্বরূপ বা আদর্শের (ideas or archetypes) প্রতিভাস, বেদান্তের জীবাত্মারই প্রতিরূপ। প্রতিভাসের অন্তরালে আদর্শজ্ঞান, বা পরমাত্মা প্রকাশক রূপে বিরাজমান। Dr. Deussen তাঁহার 'Philosophy of the Vedanta' নামক পুস্তিকায় এইরূপে বেদান্ত ও প্লেটোর মায়াবাদের তুলনা করিয়াছেন :—"You see the concordance of Indian, Grecian and German metaphysics ; the world is maya, is illusion, says Cankara, it is a world of shadows, not of realities, says Plato ; it is appearance only, not the thing in itself, says Kant."

Aristotle.

প্লেটোর আদর্শ-জ্ঞান বিশেষ জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ ব্যাখ্যাত হয় নাই। Aristotle গুরুর এই অপূর্ণতা দূর করিয়াছেন। তাঁহার মতে, আদর্শের বিশেষ হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই, প্রত্যেক বিশেষ-জ্ঞানেই আদর্শ অনুস্যূত। প্রত্যেক বিশেষ জ্ঞানেই আদর্শ উপলব্ধ। প্লেটোর জ্ঞানের বিচার দ্বারা এরিষ্টটল্ জ্ঞেয়ের বাহ্য রূপ ও স্বরূপ, এই দুইটী লক্ষণে উপনীত হন। বস্তুর কারণাবস্থারই নাম স্বরূপ, ও কার্য্যাবস্থার নাম বাহ্যরূপ। কারণের কার্য্যোন্মুখ শক্তি (potentia) দ্বারাই কার্য্যোৎপত্তি হয়। বেদান্ত ও সাংখ্যের কার্য্যকারণের অভেদভাবের সহিত এরিষ্টটল্-মতের সম্পূর্ণ ঐক্য লক্ষিত হয়। কারণের প্রকট অবস্থারই নাম কার্য্য, আর কার্য্যের অপ্রকট অবস্থারই নাম কারণ। এই কার্য্য-কারণের একাত্মতা প্লেটোর দ্বৈতবাদের স্থান গ্রহণ করে।

Stoicism &c.

Stoicism, Epicureanism, Scepticism ও NeoPlatonism, এই চারি সম্প্রদায় Aristotleএর পরবর্ত্তী। ইঁহাদের দার্শনিক মতে জ্ঞাতৃত্বের (subjectivity) প্রাধান্য লক্ষিত হয়। Stoicদিগের মতে জ্ঞাতার সার্ব্বভৌমিকত্ব (universality of subjectivity) স্বীকার্য্য। জ্ঞানযোগই ইঁহাদের প্রধান অবলম্বন। সমপ্রকৃতি, সমপ্রকৃতির উপর কার্য্য করে, বিরুদ্ধ প্রকৃতির পরস্পরের উপর কার্য্য করা অসম্ভব, এই যুক্তি আশ্রয় করিয়া, ইঁহারা পদার্থ জ্ঞানের সাম্য স্থাপন করিবার জন্য, Aristotleএর জগৎ ও ব্রহ্ম জ্ঞান বিষয়ক মতের প্রতিবাদ করেন। ব্রহ্মকে স্বরূপ ও জগৎকে রূপ বলিয়া কল্পনা করায়, তাঁহাদের মতে বিরুদ্ধ প্রকৃতির আপেক্ষিক কার্য্যরূপ দোষ, Aristotle দর্শনকে স্পর্শ করিয়াছে। অতএব তাঁহারা জগৎ ও ব্রহ্ম এক বস্তু, এই মত প্রকাশ করেন। ইহার নিষ্ক্রিয় অনিত্য ভাবজগৎ ও নিত্য স্বরূপ, সক্রিয়ভাব ব্রহ্ম। জগৎ দেহ ও ব্রহ্মই আত্মা। 'এতদাত্মমিদং সর্ব্বং' এই বেদান্ত মতেরই মর্ম্ম ইহাতে প্রকটিত হইয়াছে।

Epicureanism প্রবৃত্তিমার্গে আত্মতৃপ্তি সাধনই পুরুষার্থ মনে করে।

Scepticism তদ্বিপরীত নিবৃত্তিমার্গে আত্মচরিতার্থতাই পুরুষার্থ জ্ঞান করে। বৈরাগ্যই ইহার প্রধান উপায়।

NeoPlatonism—জ্ঞাতা বা জীবাত্মার 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বা পরমাত্মার সহিত তন্ময়ত্ব প্রাপ্তি, ইহাই NeoPlatonismএর বিশেষ লক্ষণ। ধ্যান যোগের দ্বারাই মাত্র এই বিলয় সংঘটিত হইতে পারে (mystical absorption into divinity or the one)। নিউপ্লেটনিক সম্প্রদায়ের অগ্রণী Plotinusএর মতে এক বা অদ্বিতীয় (one),'নেতি''নেতি' দ্বারাও নির্দ্দেশ্য নয়, ইহা অবাঙ্মনসগোচর (all other negative determinations are incompetent in its regard ; in short it is something unspeakable and unthinkable.) ইহা "যতোবাচো নিবর্ত্ততে, অপ্রাপ্যং মনসাসহ" এই বেদান্ত বাক্যেরই অবিকল অনুবাদ। এই পরমাত্মার বিপরিণাম এইরূপ কল্পিত হইয়াছে :—নিত্যশুদ্ধ (the all perfect and eternal) প্রথমে আপনা হইতে চিত্তের (reason) বিকাশ করিলেন, চিৎ হইতে ভূতাত্মা (ঈশ্বর) (eternal soul of the world) বিকাশ করিলেন। ভূতাত্মা হইতে জীবাত্মা বা প্রত্যাত্মা (individual soul) বিকাশ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্বেরই অনুবর্ত্তন।

NeoPlatonic দর্শনে একত্বেরই প্রতিষ্ঠা, প্রাচীন দর্শন ইহাতে চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। Dr Deussen লিখিয়াছেন—

'The conclusion is that Jiva, being neither a part nor a different thing, nor a variation of Brahman, must be the Parmatman fully and totally himself, a conclusion made equally by the Vedantin Cankara, by Platonic Plotinus and by the Kantean Schopenhaur.' কিন্তু প্রাচীন দর্শনের অন্তিম দশাও এই দর্শনেই উপস্থিত হইয়াছিল।

খ্রীষ্ট-ধর্ম্মবিজ্ঞান।

খ্রীষ্টধর্ম্ম NeoPlatonic সমস্যারই সমাধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ব্রহ্ম ও জীবাত্মার ব্যবধান তিরোহিত হইয়া, ব্রহ্ম ও জীবাত্মার বস্তুগত একত্ব (substantial unity of God and man) প্রচারিত হইল। পরমেশ্বর মানব রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই খ্রীষ্ট দর্শনের মূলতত্ত্ব। 'God made man after his own image'—খ্রীষ্টীয় এই সারবাক্য 'তত্ত্বমসি' এই বেদান্ত বাক্যকেই প্রমাণিত করিতেছে।

Scholasticism.

পরবর্ত্তী Scholasticismএ যুক্তি ও বিশ্বাসের সামঞ্জস্য বিধানই প্রধান লক্ষ্য। বস্তু ও চিন্তার অভেদ জ্ঞানকে স্বীকার্য্য করিয়াই Scholasticism প্রবর্ত্তিত। ইহার শেষ ফলে, বস্তুর বাহ্য অস্তিত্বের ধ্বংস হইয়া, কেবল চিন্তার আকরেই বস্তুর বিদ্যমানতা রহিল। সুতরাং একমাত্র চিন্তাই এখন জ্ঞানের বিষয় হইল। বহির্জ্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, চিন্তা কেবল কূট তর্কজালেরই সৃষ্টি করিতে লাগিল। এই অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী হইল। একদিকে

পরিবর্ত্তন যুগ।

যেমন বাহ্য বস্তুর প্রতি আস্থা বর্দ্ধিত হইল, অন্যদিকে তদ্রূপ আত্ম স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব-বোধও (independent self-conciousness) জাগরিত হইল। এতদুভয়ের প্রথমটী অবলম্বনে Bacon বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মূলপত্তন করিয়াছেন, দ্বিতীয়টী অবলম্বনে Descrates বর্ত্তমান দর্শনের মূলপত্তন করিয়াছেন।

নবযুগ।

Baconএর সহকারীদিগের মধ্যে Vanini ও Giordano Brunoর প্রকৃতির প্রতি

আস্থা ন্যূনাধিক মাত্রায় বেদান্ত মতেরই লক্ষণাক্রান্ত (their enthusiasm for nature, an enthusiasm, which, with all of them, has more or less of a pantheistic character)

Vanini.

Vanini তাঁহার কোনও প্রবন্ধের নামকরণ এইরূপ করিয়াছেন—'of the wonderful secrets of the queen and Goddess of mortals. Nature' 'মানবের অধিষ্ঠাত্রী ও পরমেশ্বরী প্রকৃতি দেবীর আশ্চর্য্য রহস্য বিষয়ক (গ্রন্থ)। ইহাতে আমরা সাংখ্য প্রকৃতির বর্ণনা পাইতেছি।

Bruno.

Brunoর মতে এক পরমাত্মার দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পৃথিবী চৈতন্য বিশিষ্টা। এই পরমাত্মা জগতের রূপ সকলের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করেন (Reveals himself in the space of the world) ইহাতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ অনুসৃত হইয়াছে।

J. Bohm.

জর্ম্মনিতে Jacob Bohmই নব পরিবর্ত্তন যুগের নায়ক। তাঁহার মতে স্বগতভেদই আত্মার স্বভাব, পরমাত্মা বা ব্রহ্মেরও ইহাই স্বভাব, ইহাতেই আত্মানুভব জন্মে। এই আত্মানুভবে জ্ঞেয় রূপে বাহ্য সম্বন্ধ হইতেই আত্মার বাহ্য অভিব্যক্তি রূপ সংসার হইয়া থাকে (self-externalization of God into a world) শঙ্করের মায়োপহিত ব্রহ্মের স্রষ্টা ও সৃষ্ট রূপে প্রতীয়মান হওয়ার তত্ত্ব এইখানে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী দার্শনিক বিকাশে ইহার স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে, ইহাকে Spinozaর দার্শনিক প্রণালীরই অনুপূরক বলিতে নয়। Spinoza যেস্থলে, প্রত্যেক সসীমের একনিত্যে প্রত্যাবর্ত্তন শিক্ষা দেন, Bohm সেস্থলে সসীমের অসীম হইতে বিবর্ত্তন শিক্ষা দেন। কারণ, এই আত্মাভিব্যক্তি (self-direction) ব্যতীত পরমাত্মার সত্তা অসত্তারই মত থাকিত।

Descartes.

Descartes জ্ঞানের প্রকৃত আশ্রয় ও উপাদান নির্ণয় করিবার জন্য 'নসংশয়মনারুহ্য নরো ভদ্রানি পশ্যতি' এই ন্যায়ের অনুসরণ করিয়া প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাস সকলকেই সংশয়ের অগ্নি পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেন। তাহাতে একটী মাত্র জ্ঞানই তাঁহার নিকট উজ্জ্বল স্বর্ণ রূপে প্রতিভাত হইল, তাহা চিন্তাপরায়ণ রূপে তাঁহার স্বকীয় বিদ্যমানতা। আমি চিন্তা করিতেছি, অতএব আমার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে (cogito, ergo sum) এই জ্ঞান সংশয়ের অতীত। নিজের অস্তিত্ব সংশয় করিতেও, সংশয়কারীর বিদ্যমানতা স্বতঃসিদ্ধরূপে অনুভূত হয়। সুতরাং cogito ergo sum ইহাই Descartesর দর্শনের মূলসূত্র। শঙ্করও একমাত্র আত্মজ্ঞানের প্রামাণ্য সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন—'My atman cannot be illusive as Cankara shows, anticipating, the 'cogito ergo sum' of Descartes, for he would deny it, even in denying it, witnesses its reality.' Philosophy of the Vedanta, Duessen.*

'আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ' এই বেদান্ত মতে আত্মই সর্ব্বজ্ঞানের বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞানের আধার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। Descartesও আপনার চিন্তার বিষয় সকলের বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা ঈশ্বরজ্ঞানকেই প্রধান রূপে উপলব্ধ করিয়াছেন। ইহার কোন বাহ্য

* "অস্তিতাবৎ স্বয়ং নাম বিবাবাদাবিষয়ত্বতঃ। স্বাস্ময়লি বিবাদশ্চেৎ প্রতিবাদ্যো বাকোভবেৎ।"
পঞ্চদশী তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মূল অনুমিত না হওয়ায় ইহাকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই তিনি ধরিয়া লইয়াছেন।

'আমার চিন্তাদ্বারা আমার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইলেই,' Descartesর এই মূল সিদ্ধান্ত হইতে দুইটী জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে; একটী আমিরূপ বস্তু ও অপরটী আমার চিন্তারূপ মন। Descartes উভয়েরই স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া সংযোগ সাধনার্থ ঈশ্বর-জ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছেন। ইহার মতে দৈবসঙ্কেতে উভয়ের সংযোগ বিহিত হইয়াই, মনে বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব বোধ জন্মে।

Geulinx

মন ও অগ্রাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধ নিরূপণই Descartesর পরবর্ত্তী দার্শনিকদিগের প্রধান সমস্যা হইয়াছে। Geulinxএর মতে চিৎ অচিতের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অসম্ভব। বস্তুকে উপলক্ষ করিয়া ঈশ্বরাভিপ্রায়ে তত্তৎ বস্তুর ভাব মনে উদ্বোধিত হইয়া জ্ঞানোৎপত্তি হয়, Geulinxএর ব্যাখ্যা। ইহাকে উপলক্ষিক মত (occasionalism) বলা হইয়া থাকে।

Malebranche.

Malebranche বলেন, বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ স্বীকার্য্য। পরমাত্মাই একমাত্র নিত্য বস্তু। ইহা চিৎ, অচিৎ, উভয়েরই আধার, উভয়েরই স্বরূপ ইহাতে উদ্ভাসিত। সুতরাং পরমাত্মার জ্ঞান-যোগেই মাত্র (through participation of His knowledge) আমরা বস্তুর স্বরূপ বোধে সমর্থ হই।

Spinoza.

Spinoza, Malebranche মতের বৈশদ্য সম্পাদন করিয়া, Descartes মতের পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মই একমাত্র পূর্ণসত্তা। জাগতিক পদার্থে যে সত্তা আরোপিত হয়, তাহা অনিত্য। সমস্ত জাগতিক পদার্থই এক সদ্বস্তুরই ক্ষণিক ব্যাপার মাত্র (accidents of the one true substance) Spinozaর মতে ব্রহ্ম ব্যতীত সৃষ্টির আর মূলাধার নাই। তাঁহার মতে এই একত্বে সমস্ত বহুত্বের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত। Spinoza বেদান্ত লয় তত্ত্বেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। বেদান্তের "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব" Spinoza দর্শনের প্রকৃত মর্ম্ম। Spinoza ইহুদি জাতীয়। জাতীয় সংস্কারের ফল স্বরূপ প্রাচ্য একত্ব তত্ত্ব তাঁহার দর্শনে প্রতিধ্বনিত (an echo of the east)

বাস্তব-বাদ ও জ্ঞান-বাদ।

(Realism and Idealism)

Spinoza একত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেও, দ্বিত্বের একবারে ধ্বংস করিতে পারেন নাই। চিৎ ও অচিতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া কেবল পরমাত্মাতে তাহাদিগকে এক সূত্রে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে উভয়কে একে পরিণত করার চেষ্টা হইতে দুইটী পক্ষের উৎপত্তি হইল। একপক্ষ জড় হইতেই সমস্ত উৎপাদিত করিলেন; তাঁহাদের মতে চিত্ত বা মন জড়েরই সূক্ষ্ম বিকাশ মাত্র। অপর পক্ষ জ্ঞানমাত্রই চিত্তের অনুভূতি সাপেক্ষ বলিয়া, সমস্তকেই চিত্তেরই সৃষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিল। প্রথম পক্ষের নাম হইল Realism বা বাস্তববাদ, দ্বিতীয় পক্ষের নাম হইল Idealism বা জ্ঞান-বাদ।

Locke.

ইংরেজ দার্শনিক Locke ও Humeই বাস্তব বাদে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। Locke-এর মতে মনের সহজাত সংস্কার বলিয়া

কোনও জ্ঞান নাই, সমস্তই বাহ্যজগতের অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ। মানসিক পর্য্যালোচনা ও ইন্দ্রিয় জ্ঞান দ্বারাই আমাদের মানসিক প্রকৃতি গঠিত হয়।

Hume.

Hume, Lockeএর স্বীকার্য্য মনেরও অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া, পদার্থ সকলের বাহ্যসম্পর্কানুভবকে কেবল জ্ঞানের সাহচর্য্যমূলক (association of ideas) বলিয়াছেন। ইহাতে মন, অহংত্ব প্রভৃতি স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে গণ্য না হইয়া, জ্ঞানের পরম্পরা (succession of ideas) রূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

Lockeএর অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism) ও Humeএর সংশয়বাদ (Scepticism) বেদান্ত 'মায়াবাদে'র অতি ভূমি-প্রাপ্ত বৌদ্ধ 'শূন্যবাদের'ই রূপান্তর। উভয় দার্শনিক মতই বস্তুতঃ জ্ঞানবাদ বা মায়াবাদের সংযোগ স্থল। একদিকে Lockeএর দার্শনিক মত হইতে Bishop Berkleyর মত আলোক পাইতেছে, অপর দিকে Humeএর মত Kantএর মতকে প্রকাশিত করিতেছে।

Leibnitz.

Spinoza ও Lockeএর প্রতিপক্ষতায় Berkley ও Kantএর পূর্ব্বে জর্ম্মেনিতে Leibnitz দর্শনের অভ্যুদয় হয়। Spinoza বাহ্য পদার্থের নিত্যত্ব অস্বীকার করিয়া, এক পরমাত্মারই পদার্থত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; Leibnitz তৎস্থলে বহু তত্ত্বের (Monad) প্রচার করেন। সাংখ্যের পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতির ন্যায়, তাঁহার Monadএ চৈতন্য ও সক্রিয়তা উভয়ই আছে। বস্তু মাত্রেই গুণ বৈষম্যের দ্বারা প্রকৃতি ভেদের ন্যায়, তাহার Monadও, পরস্পর বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র। Leibnitzই ভাষার সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার জন্য Jesuit ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে বিভিন্ন ভাষার অনুশীলনার্থ প্রথম প্রোৎসাহিত করেন। ভারতবর্ষে Jesuitগণ ধর্ম্ম প্রচারার্থ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের দ্বারা হিন্দু-দর্শনের স্থূল মর্ম্ম তাঁহার বিদিত হওয়া অসম্ভব নহে।

Lockeএর অভিজ্ঞতাবাদের প্রতিবাদে Leibnitz আত্মা ও চিত্তকেই সমস্ত জ্ঞানের কারণ করিয়া গ্রহণ করেন। সমস্ত জ্ঞানের, এমন কি, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞানের পর্য্যন্ত উৎপত্তিক্ষেত্র আত্মা। সুতরাং জ্ঞানের বাহ্য উদ্বোধক স্বীকারের আবশ্যকতা দেখা যায় না। ইহাতে জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়াতে বেদান্তে'মায়াবাদ' প্রকটিত হইয়াছে।

Berkley.

Berkleyর মতে মনে জ্ঞানরূপে অস্তিত্ব ব্যতীত বস্তুর আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। অনুভবযোগ্যতাই বস্তুর প্রধান ধর্ম্ম। আমাদের বিভিন্ন জ্ঞানের পরমাত্মাই একমাত্র আধার। তাহাতে যাহা জ্ঞানের আদর্শ (archetype) আমাদিগেতে তাহাই প্রতিবিম্ব (ectype)। Berkley মায়াবাদে বাহ্যজগতের কোন স্থান নাই, সমস্তই জ্ঞানমাত্রাবশেষ। এই তত্ত্ব বৌদ্ধ-দর্শনের বিজ্ঞামাত্রেরই নামান্তর।

Kant.

Kantএর দর্শনে বাস্তব-বাদ ও জ্ঞান বাদ বা মায়াবাদ সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইয়াছে। Kantএর মতে বাহ্যবস্তু জ্ঞানের উদ্বোধক মাত্র, কিন্তু বুদ্ধির সহযোগ-ব্যতীত জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারেনা। সুতরাং বুদ্ধির দ্বারা নিয়মিত ও অনুরঞ্জিত হইয়াই কেবল বস্তু আমাদিগের অনুভূতিতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে

বুদ্ধির বৈলক্ষণ্য স্বতঃই বস্তুতে আরোপিত হইয়া, বস্তুকে মানসিক নূতন আকার প্রদান করে। এই ব্যাখ্যায় একদিকে যেমন বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতেছে, তদ্রূপ অপর দিকে অনুভূতি বিষয়ে বুদ্ধিরই সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইতেছে। বস্তুর স্বরূপ স্বীকার্য্য হইলেও আমাদের অজ্ঞেয়; দৃশ্যরূপ বুদ্ধিরই রচিত। ইহাই Kant দর্শনের সার মর্ম্ম। ইহা হইতে Kant দর্শনের মূল উপপত্তি এই দাঁড়াইয়াছে যে (১) আমরা কেবল দৃশ্যরূপ অবগত হইতে পারি, স্বরূপ অবগত হইতে পারি না; (২) তথাপি অভিজ্ঞতা মাত্রই আমাদের জ্ঞানের আকর, সুতরাং বুদ্ধির সহিত অসম্বদ্ধ বস্তুর বিজ্ঞান হইতে পারেনা (there cannot be a science of the unconditioned.)

বস্তু স্বরূপতঃ চিত্তেরই সহিত অভিন্ন চিন্তা প্রকৃতিক হইতে পারে বলিয়া, Kant যে অনুমানের আভাস দিয়াছেন, তাহাই পরবর্ত্তী দার্শনিক মতের ভিত্তি হইয়াছে।

প্লেটোর দর্শনমত আলোচনায়, প্লেটো ও শঙ্করের মায়াবাদের সহিত Kantএর মায়াবাদের Dr. Deussen-কৃত তুলনা উদ্ধৃত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা Berkley ও Kantএর মায়াবাদের অপূর্ণতা যে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বিদূরিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই আচার্য্য মোক্ষমূলের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এতৎসম্বন্ধে প্রকাশিত মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিব। Berkley ও Kant বাহ্য জগৎকে মায়ামাত্র বলাতে তাঁহাদিগের দর্শনমত লৌকিক সংস্কারের বিরোধী হইয়া সাধারণের পক্ষে দুরবগাহ হইয়াছে; কিন্তু মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য লোকব্যবহারের জন্য জগতের যাথার্থ্য স্বীকার করিয়া, তাঁহার দর্শনের সহিত সাধারণের ধারণার চমৎকার সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন,—তাঁহার মতে ব্যবহারিক জ্ঞানই তাত্ত্বিকজ্ঞানের সোপান স্বরূপ—

"But besides the concession to which we alluded before, that for practical purposes ('ব্যবহারার্থম্') things may be treated as real, whatever we may think of them, in our heart of hearts, a concession, by the by, which even Berkley and Kant would readily have allowed ......" Page 210.

বেদান্তের মায়াবাদ ও Kantএর সমালোচনাত্মক দর্শন তুলনা করিলে, দেখা যাইবে, শঙ্করের মায়াবাদ Kantএর সূক্ষ্ম সমালোচনাকেও অতিক্রম করিয়াছে। যেস্থলে Kant অনুভূতির প্রকার (forms of intuition) ও বুদ্ধির প্রক্রিয়া সকল (categories of thought) যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সেস্থলে, বেদান্ত সে সকলকে রূপ মধ্যে গণ্য করিয়া মায়ার খেলামাত্র বলিয়াছেন। কেবল ব্যবহারার্থই ইহাদের যাথার্থ্য কল্পিত হইয়াছে। Kantও অতীন্দ্রিয় বিষয়ে ইঁহাদের প্রামাণ্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এস্থলে আমরা আচার্য্য মোক্ষমূলরকৃত তুলনা উদ্ধৃত করিলাম :—

"This might become clearer, if we took Brahman for the Kantian 'Ding an sich', remembering only that, according to the Kantian philosophy, the Rupa, the forms of intuition and the categories of thought, though subjective, are accepted as true, while the Vedanta treats them also as the result of Nesciense, though true for all practical purposes in this phenomenal life. In this sense the Vedanta is more sceptical or critical than even Kant's critical philosophy; though the two agree with each

other again, when we remember that Kant also denies the validity of these forms of perception and thought when applied to transcendent subjects. According to Kant it is man who creates the world, as far as its form (নামরূপ) is concerned, according to the Vedanta this kind of creation is due to অবিদ্যা। And strange as it may sound to apply the name of অবিদ্যা to Kant's intention of sense and his categories of the understanding, there is a common element in them, though hidden under different names. Page 226.

Fichte.

কেণ্ট, জ্ঞেয়ের যে গৌণকল্প অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, Fichte তাহাও নিরাস করিয়া কেবল জ্ঞাতারই প্রামাণ্য স্থাপন করেন। জ্ঞাতা স্বয়ং অনন্ত, তাহা হইতেই সমস্ত সান্ত প্রসূত হয়। তাঁহার মতে জ্ঞাতাই সর্ব্ব স্বরূপ ("Ich ist Alles" the I is every thing)। 'ইহা বেদান্তের সোঽহং' তত্ত্বেরই ভাষান্তর মাত্র। ইহা Spinoza দর্শনেরই বিপরীত দিক্ (an inverted idealistic Spinozism)

Spinoza চিৎ ও অচিতের অতিরিক্ত ব্রহ্মে ব্রহ্মাণ্ড বিলীন করিয়া উভয়ের ভেদ বিনষ্ট করিয়াছিলেন। Fichte চিৎ বা জ্ঞাতাকেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র করিয়া অচিৎ বা জ্ঞেয়ের সম্পূর্ণ অপলাপ করিলেন। রামানুজের ন্যায় জ্ঞাতা বা জীবাত্মাকে Fichte পরমাত্মারই অংশ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। পরমাত্মা (absolute ego) আত্মোপলব্ধির জন্য আপনাতেই ভেদ জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে ও এই আপেক্ষিক জ্ঞানে বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞাতা (জীবাত্মা) ও জ্ঞেয় (জগৎ) রূপে প্রতীত হয়। জীবাত্মা, আপনার স্বরূপ প্রাপ্তির জন্য এই ভেদ ধ্বংস করিতে নিয়ত ব্যাপৃত থাকে।

"To attain consciousness of itself, the absolute ego, must limit itself, and by this self-limitation, it gives rise to a non-ego, with which however, is quite as much a part of itself, as the limited ego, with which alone it is consciously identified. The infinity of the ego, however, reappears as an impulse to strive against this self-made limit" Hegel, Blackwood's Philosophical classics, P 126.

Schelling.

Fichteর একদেশদর্শিতাকে পূর্ণতা প্রদান করিবার জন্য Schelling, Fictheর 'The I is everything' 'যোমাং পশ্যতি সর্ব্বত্র' এই মূল সূত্রের সহিত 'Alles ist Ich' 'everything is I' 'সর্ব্বঞ্চময়ি পশ্যতি' এই মূল সূত্রের যোগ করিলেন। তাঁহার মতে চিৎ ও অচিৎ উভয়েরই অন্তঃ প্রকৃতি এক পরমাত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাহাদের বাহ্য ভেদ ছায়াবাজি মাত্র; (to regard all conflict and antagonism as but the play of shadows) আপাতদৃশ্য, তাত্ত্বিক নহে। Schellingএর মতে বস্তু সকলের ধর্ম্মগত কোন প্রভেদ নাই, কেবল মাত্রাগত প্রভেদ (there are no qualitative but only quantitative difference in things) Schellingএর দর্শন রামানুজের 'জগৎ সত্য' মতেরই ব্যাখ্যা।

Hegel.

Schellingএর দ্বৈতবাদ অপাস্ত করিবার জন্য, Hegel 'অদ্বৈত-তত্ত্ব বস্তু নহে কিন্তু জ্ঞাতা' ('the absolute is not substance but subject') Kant দর্শনের এই প্রথম উপদেশকে Schellingএর প্রতিবাদ স্বরূপ দৃঢ়তা সহকারে, পুনঃ প্রচারিত করিলেন। ইহাই Hegel দর্শনের মূল সূত্র।

ইহারই ব্যাখ্যা Hegel দর্শনের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য। ইহার অর্থ এই যে, যে একত্ব সমস্তেরই আশ্রয়, যাহাতে সমস্তেরই শেষ মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা, আত্মানুভবের একত্ব বই আর কিছুই নহে—'The unity to which all thing are to be referred and in which they must find their ultimate explanation, is the unity of self-consciousness.' Hegel, Blackwood's Philosophical Classics: P. 128.

Hegel বলেন, চিৎ ও অচিৎ উভয়েরই মূলে এক মহাপ্রাণ। উভয়ই তুল্যরূপে সত্য হইলেও চিতেরই অচিৎ অপেক্ষা প্রাধান্ত। প্রকৃতিতে অদ্বৈততত্ত্বেরই চরিতার্থতা, অনন্ত বিচিত্র বিলাস ও বিকাশ হইলেও, চিৎ (জীবাত্মা বা জ্ঞাতা) আত্মসম্বিৎ বিশিষ্ট হওয়াতে, যখন তত্ত্বজ্ঞান রূপে ব্রহ্মাণ্ড আপনাতে উপসংহৃত করে, তখনই বহুধাবিভক্ত জগতের বাহ্য প্রসারিত সমস্ত অবয়ব তাহার অন্তর্ভূত হইয়া যায়, ও সঙ্গে সঙ্গে জীবাত্মা ইহাকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের আকারে পরিবর্ত্তিত করিতে থাকে। ইহাতে বাহ্য সম্পর্ক তিরোহিত হইয়া, সমস্তই মানসিক ব্যাপারে পরিণত হওয়াতে, একত্বজ্ঞানেরই (পরমাত্ম জ্ঞানেরই) অবিরত বিবেক হইতে থাকে।

"Though, in nature,we have the realisation,the infinitely diversified mediation and evolution of the absolute, yet spirit, as being essentially self-conscious, when it draws back the universe into itself, as it does in knowledge, at once includes in itself the outwardly expanded totality of this manifold world, and at the same time over-reaches and idealises it, taking away its externality to itself and to the mind, and reflecting it all into the unity of thought." Hegel—Page 61.

বেদান্তের আত্মসাক্ষাৎকার চিত্র ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি চ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

"যথানদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথাবিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

আত্মজ্ঞানীর, সমস্ত আসক্তি রহিত ও সমস্ত বন্ধন মোচিত হয়। হিন্দু দর্শনের তত্ত্বজ্ঞানের এই অবস্থাও, Hegelএ স্পষ্ট অঙ্কিত হইয়াছে—

"এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি নমে নাহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥"

"আত্মবিবেকের দ্বারা অপার, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প জ্ঞান-পারাবার প্রবাহিত হইতে থাকে।"

Hegel দর্শনে রামানুজ ও বল্লভ মতের সংমিশ্রণ লক্ষিত হয়।

আত্মবিৎ জ্ঞাতা (self-conscious subject) হইতে আরম্ভ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান (unity of thought) Hegel দর্শনের পর্য্যাপ্তি হইয়াছে। এই একত্বজ্ঞানে বেদান্তের শেষ সিদ্ধান্তে অভেদবাদ প্রতিভাত হইয়াছে। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও Hegelএর Absolute Pantheism একার্থক। Hegel দর্শনে ইউরোপীয় দর্শনের চরম উন্নতি।

কিন্তু বেদান্তের পূর্ণ ব্যাখ্যা ও পরিতৃপ্তি ইহাতেও হয় নাই। এইজন্যই Kant শিষ্য সুপ্রসিদ্ধ সোপেনহেয়ার (Schopenhauer) উপনিষদের পরমাণুবাদমাত্র পাঠ করিয়াই হর্ষ ও সম্ভ্রমের আবেগে বলিয়াছিলেন—"In the whole world there is no

study, except that of the original (of the Upanishads), so beneficial and so elevating as that of the Oupnekhat (Persian translation of the Upanishads). It has been the solace of my life, it will be the solace of my death." 'সমগ্র পৃথিবীতে মূল উপনিষদের পরে উপ্নেখতের (মূলের পারস্যানুবাদের) অধ্যয়নের ন্যায় হিতকর ও উৎকর্ষবিধায়ক আর কিছু নাই। ইহা আমার জীবনে শান্তি হইয়াছে, আমার মৃত্যুতে শান্তি হইবে।

আচার্য্য মোক্ষমূলরও, স্বপ্রণীত 'ভারতীয় ষড়্দর্শনের ইতিহাসে', ইউরোপীয় দর্শনের তুলনায় বেদান্ত দর্শনের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে নিম্নলিখিত বাক্যে সাক্ষ্য দিয়াছেন—

"None of our philosophers, not excepting Heraclitus, Plato, Kant or Hegel, has ventured to erect such a spire, never frightened by storms or lightnings." p 239-40.

ঝটিকা ও বজ্রপাতে ভীত না হইয়া এরূপ উচ্চ চূড়া নির্ম্মাণে আমাদের কোন দার্শনিকই (Heraclitus, Plato, Kant ও Hegelও যদিচ ইহাতে বাদ পড়ে নাই) সাহসী হন নাই।

"If I can admire the bold climbers scaling mount Gouri Sankar, I can also admire the bold thinkers toiling up to heights of the Vedanta, where they seem lost to us in clouds and sky." p 241.

যদি গৌরীশঙ্কর গিরি আরোহণকারীদিগের সাহসের প্রশংসা করিতে হয়, তবে বেদান্তের উচ্চ শিখারোহণ-শ্রমপটু সাহসিক তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণও প্রশংসা-যোগ্য, কারণ, বেদান্তের উন্নত শৃঙ্গে মানব-দর্শনের অবিষয়ীভূত হইয়া তাঁহারাও মেঘ ও শূন্যে বিলীনপ্রায় প্রতীয়মান হন।

বর্ত্তমানে বেদান্তমত কেবল ইউরোপীয় দর্শনে নহে, কিন্তু বিজ্ঞানেও মূলমন্ত্র হইতেছে। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ইংলণ্ডের রাজকীয় বিজ্ঞান সভায়, পাশ্চাত্য উন্নত বিজ্ঞানসমাজে এই একত্বের কথা ঋষিদিগের নামে অতি তেজস্বিনী ভাষায় বিঘোষিত করিয়াছেন—

"He concluded with the remark that this continuity between the organic and inorganic worlds enabled them to begin to understand the quotation from one of the ancient books of his race—"They who see one in all the changing manifoldness of this universe, unto them belongs eternal truth, unto none else." Times, May 14, 1907.

"তিনি এই মন্তব্যের দ্বারা উপসংহার করিলেন যে, জড় ও জীব জগতের এই সংযোগ, তাঁহার স্বজাতীয় প্রাচীন গ্রন্থ সকলের একমত হইতে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত প্রসিদ্ধ বাক্যটীর মর্ম্ম গ্রহণে সহায়তা করিতেছে— চিরন্তন সত্য কেবল তাঁহাদিগেরই আয়ত্ত, যাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরিবর্ত্তন-বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব দেখিতে পান।"

সুসভ্য মার্কিন দেশে পৃথিবীর মহা ধর্ম্ম সভায় বেদান্ত মতের প্রতিনিধি বাগ্মীবর স্বামী বিবেকানন্দ সগর্ব্বে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে বেদান্তেরই প্রতিধ্বনি বলিয়াছিলেন—

"The high spiritual flights of Vedanta philosophy, of which the latest discoveries of science seem like the echoes." Paper on Hinduism, Read at the World's Parliament of Religion. "বেদান্ত দর্শনের উচ্চ আধ্যাত্মিক উৎক্রমণ অধুনাতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যাহার প্রতিধ্বনির ন্যায় বিবেচিত হয়।"

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য।

জন্মস্থান বিচার।

নব্য স্মৃতির প্রবর্ত্তক মহাত্মা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তদীয় স্মৃতি গ্রন্থাবলীতে নিজ পরিচয় সম্বন্ধে মাত্র এই দুইটী কথা বলেন (১) তাঁহার পিতার নাম হরিহর ভট্টাচার্য্য এবং (২) তিনি বন্দ্যঘটী কুলের ব্রাহ্মণ। তাঁহার জন্মভূমি কোথায়, সেই সম্বন্ধে তিনি নিজ গ্রন্থে কিছুই উল্লেখ করিয়া যান নাই।

বঙ্গের সারস্বতপীঠ নবদ্বীপ অতি পূর্ব্ব-হইতেই বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্রস্থান রূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। স্থানটী আবার গঙ্গা তীরবর্ত্তী হওয়াতে বাঙ্গালার নানা স্থানের লোক প্রথমতঃ অধ্যয়নার্থ আসিয়া, ভাগীরথীতে নিত্য স্নানার্থ এই স্থানটী অনুকূল মনে করিয়া, এই খানেই ঘর বাড়ী বান্ধিয়া অবস্থান করিত। আবার যাঁহারা প্রতিভাশালী পণ্ডিত হইতেন, তাঁহারা আপন দেশে ফিরিয়া গিয়া টোল সংস্থাপন করিলে আশানুরূপ ছাত্র জুটিবে না, মনে করিয়া, স্বীয় প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ সাধনার্থ, এই পাণ্ডিত্যের কেন্দ্র-ভূমিতেই চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিয়া, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে এখানেই বসবাস করিতেন।

নবদ্বীপবাসিগণ, এবং অনেকেই, নবদ্বীপ-মহিমা-কীর্ত্তন-কালে রঘুনাথ ও রঘুনন্দনকে নবদ্বীপজাত বলিয়াই কহিয়া থাকেন। রঘুনাথ সম্বন্ধে এখন নিশ্চিত ভাবেই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, তিনি প্রতিভা দ্বারা নবদ্বীপ আলোকিত করিলেও জন্ম দ্বারা শ্রীহট্টভূমির গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। যাঁহারা এতদ্বিষয়ক মীমাংসা দেখিতে চান, তাঁহারা শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি কর্ত্তৃক লিখিত রঘুনাথ শিরোমণি বিষয়ক প্রবন্ধ, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যায় পাঠ করিতে পারেন। তৎপর এতদ্বিষয়ে আরও প্রবন্ধাদি লিখিত হইয়াছে, এই স্থল তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার উপযুক্ত নহে বলিয়া ঐগুলির উল্লেখ করা হইল না।

এখন রঘুনন্দন কোন্ স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহাই আলোচনার বিষয়। নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী নামক জনৈক ব্যক্তি-রচিত "নবদ্বীপ মহিমা" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে :—

"রঘুনন্দনের পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য। তিনিও নবদ্বীপে এক জন স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। নবদ্বীপে তাঁহার স্মৃতির টোল ছিল। "সময় প্রদীপ"* নামক স্মৃতিগ্রন্থ ইঁহারই প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। হরিহরের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠের নাম রঘুনন্দন, কনিষ্ঠের নাম যদুনন্দন। যদুনন্দন বাল্যকালেই কালগ্রাসে পতিত হন। * * * * রঘুনন্দন যেমন শাস্ত্র ছিলেন, লেখা

* "সময় প্রদীপ" নামক একখানি জ্যোতিঃশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ শ্রীহট্ট প্রদেশে গবর্ণমেণ্টের টোল পরীক্ষার পাঠ্য গ্রন্থ রূপে প্রচলিত আছে। উহার প্রণেতা শ্রীহট্টের দ্বিতীয় রঘুনন্দন, কাব্য প্রকাশের টীকাকার মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার। রঘুনন্দনের "অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের" ন্যায় ইনিও "অষ্টাবিংশতি প্রদীপ" লিখিয়া গিয়াছেন।

পড়াতেও তাঁহার তেমনি মনোযোগ ছিল। তিনি পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া ব্যাকরণ, অভিধান ও কাব্যাদি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। * * * * * হরিহর কুলীন ছিলেন। কুলীনদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ ও বহুবিবাহ তৎকালে অতিশয় প্রবল ছিল। কিন্তু হরিহর পুত্রের কাব্যাদি পাঠ শেষ হইলে, অন্ততঃ ২০ বৎসর বয়সে নবদ্বীপেই পুত্রের বিবাহ দেন। এই বিবাহের পরই রঘুনন্দন পিতার নিকট স্মৃতি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। * *" ইত্যাদি।

গ্রন্থকার কোথা হইতে এই সকল কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার কোনও ঠিকানা পাওয়া যায় না। তদীয় গ্রন্থের ভূমিকায় আছে :—

"আমি নবদ্বীপ নিবাসী। বাল্যকাল হইতে সর্ব্বদাই নবদ্বীপের প্রাচীন লোক-দিগের মুখে নবদ্বীপ মহিমার কথা শুনিয়া আমার হৃদয় ও মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। নবদ্বীপ সম্বন্ধে গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে নবদ্বীপবাসীদের মুখে যে সকল কথা শুনা যায়, তহোর অনেক কথাই দেখিতে পাই। এই জন্য বহুকাল হইতে নবদ্বীপের মহাজনদিগের সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবাদ যতদূর সঙ্গত বোধ হয়, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নহে।"

ইহাতে এইমাত্র প্রতীত হইতেছে যে, রঘুনন্দনের সম্পর্কে উপরিভাগে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য বড় বেশী নয়। এই গ্রন্থকার রঘুনাথেরও জন্মস্থান যে নবদ্বীপই বলিবেন, ইহা বলা বাহুল্য।

কিছু কাল হইল কোনও ইংরেজী কাগজে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিত একটী প্রবন্ধ উদ্ধৃত দেখিয়াছিলাম; ইহাতে যতদূর স্মরণ হয়, রঘুনাথ রঘুনন্দনকে ত নবদ্বীপ-জাত বলা হইয়াছেই, অধিকন্তু তাঁহাদের জন্ম মৃত্যুর সনও উল্লিখিত আছে। ঐ প্রবন্ধটী অনুসন্ধান করিয়াও আর পাইতেছি না, অথচ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট, এই প্রবন্ধটী পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া থাকিলে আমাকে একখণ্ড পাঠাইতে, এবং রঘুনাথ রঘুনন্দনের জন্মভূমিরও জন্ম-মৃত্যু অব্দের বিষয় কিরূপে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা জানাইতে একখানি চিঠিও লিখিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, উহার উত্তর পাই নাই।

যাহা হউক, পূর্ব্বপক্ষ যাহা, তাহা এক প্রকার বলা হইল। এক্ষণে উত্তর পক্ষ ক্রমশঃ বলা হইতেছে। মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তদীয় উদ্বাহ-চন্দ্রালোকের "বিজ্ঞাপন" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

"পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ও ভট্টাচার্য্যা বন্দ্যঘটী বংশং পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশঞ্চ জন্মনালঙ্কৃত বন্তঃ। অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশে তেষাং বংশ্যাঃ সন্তি। পরন্তু তেষাং নিবোসো নবদ্বীপে জাত ইতি কিংবদন্তী। কয়াপি পুণ্যসম্পদা তৈর্জ্জন্মনালঙ্কৃতেবংশে প্রদেশে চায়মপি জনঃ সমজনিষ্ট। তেথস্মৎ সগোত্রাঃ পূর্ব্বতনাশ্চৈতা বতাহপিমৎ পূজনীয়াঃ॥" ইত্যাদি।

শৈশবে পাঠ্যাবস্থায় একদা দৈববাণীর ন্যায় শুনিয়াছিলাম, রঘুনন্দনের জন্মভূমি শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ উপবিভাগস্থ নবিগঞ্জ থানার নিকটবর্ত্তী মন্দারকান্দি নামক গ্রামে। দুঃখের বিষয় এই যে, আজ ৬।৭ বৎসর যাবৎ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত সংকলন কল্পে সমগ্র শ্রীহট্ট জেলার গ্রাম নগর, পণ্ডিত বিষয়ী, প্রাচীন অর্ব্বাচীন, অসংখ্য স্থল হইতে কত কাহিনী পাওয়া গেল, কিন্তু রঘুনন্দনের বিষয় বিশেষ কিছু জানা গেল না। "রঘুনন্দন" "রঘুনন্দন" করিতে করিতে কেচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে সাপের ন্যায় রঘুনাথ বাহির হইয়া পড়িলেন; তাঁহার বাল্য জীবনী, পিতৃ মাতৃ কাহিনী, এমন কি, বংশাবলী পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইল। *

* রঘুনাথ সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত অচ্যুত বাবু লিখিত প্রবন্ধ পাঠে অনুসন্ধিৎসু পাঠক অবগত হইবেন। প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও "বঙ্গের ব্রাহ্মণ কাণ্ড" বৈদিক প্রকরণে ঐ সকল মাল মসলা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বেও রঘুনাথ যে পূর্ব্ব বঙ্গের লোক, তাহার সম্বন্ধে প্রবল কিংবদন্তী ছিল। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত "বান্ধব" পত্রিকায়, ১৩০৯ সালের আষাঢ় সংখ্যা এবং ১৩১০ সালের আশ্বিন কার্ত্তিক

কিন্তু রঘুনন্দনের সম্বন্ধে ঐরূপ কিছু পাওয়া গেল না। মন্দারকান্দি গ্রামটীতে গিয়াও খোঁজ করা হইয়াছিল; কিন্তু কেহ কিছু বলিতে পারিল না। বন্দ্যঘটী বংশ প্রভব কোনও ব্রাহ্মণও এই গ্রামে কিম্বা ইহার সন্নিকটে কুত্র পি নাই, কিন্তু ইহাতে আমার বাল্যকালে লব্ধ ধারণাটী দূর হইল না।

অদ্য প্রায় চারি শতাব্দী অতীত হইল, রঘুনন্দন আভির্ভূত হইয়াছিলেন। এত-দিন পরে তাঁহার জন্মভূমিতে কেহ তাঁহার সংবাদ রাখিবে, এদেশে এমনটী আশা করা বৃথা। তাঁহার বংশীয়েরা পূজনীয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কথিতানুরূপ শ্রীহট্টের—তথা পূর্ব্ববঙ্গের অন্যত্র অবশ্যই উপনিবিষ্ট হইয়া আছেন। ইহাতে অসম্ভব কিছুই নাই; বরং প্রতিপোষক আর একটী উদাহরণ শ্রীহট্ট হইতেই দিতেছি।

শ্রীমদদ্বৈত প্রভু শ্রীহট্টের লাউড় রাজ্যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সেও আজ প্রায় পাঁচ শতাব্দীর কথা। অধুনা লাউড় গিয়া অদ্বৈত প্রভুর জন্মস্থান কোথায়, জিজ্ঞাসা করিলে, ইহার উত্তর কেহ দিতে পারিবে কিনা সন্দেহ।* অদ্বৈতবংশের কেহ লাউড়ে দূরে থাকুক, সমগ্র শ্রীহট্ট জিলায়ও নাই, অথচ পূর্ব্ববঙ্গের অন্যত্র অনেকস্থলে আছেন। আজ যদি "অদ্বৈত প্রকাশ" প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থে এই কথাটীর উল্লেখ না থাকিত, তবে কি শ্রীহট্টভূমি অদ্বৈতাচার্য্যের জন্মস্থান বলিয়া গৌরব করিতে পারিত?

তবে কি শ্রীহট্ট রঘুনন্দনের জন্মভূমি নয়? মন্দারকান্দি গ্রাম সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া দুর্ঘট হইতে পারে, কিন্তু শ্রীহট্টই যে রঘু-নন্দনের জন্মস্থান, এই বিষয় সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। শ্রীহট্ট কিছু-

সংখ্যায় এই বিষয় উল্লিখিত আছে। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয় সম্পাদিত কুসুমাঞ্জলির ভূমিকায়ও রঘুনাথ শিরোমণি পূর্ব্ববঙ্গের লোক বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

* সুখের বিষয়, সম্প্রতি লাউড়ের অন্তর্বর্ত্তী একটী স্থান অদ্বৈত প্রভুর জন্মভূমি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং তথায় একটী আখড়াও স্থাপিত হইয়াছে।

দিন আসামভুক্ত হইয়া থাকিলেও, ইহা পূর্ব্ব বঙ্গেরই একটী প্রকৃষ্ট অংশ সুতরাং আমার এই ধারণা পূজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মত দ্বারা সম্পূর্ণ সমর্থিত হইতেছে। *

এই সিদ্ধান্তের অবান্তর আরও প্রমাণ আছে। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের চরিত-গ্রন্থাবলী মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, তৎসময় শ্রীহট্ট অঞ্চলের বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ পুণ্যভূমি নবদ্বীপে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। চৈতন্য দেবের পিতা, মাতামহ, শ্বশুর, মাতৃ-স্বসৃপতি প্রভৃতি ত ছিলেনই, এ ছাড়া আরও বহুব্রাহ্মণ শ্রীবাস, রঘুনাথ, অদ্বৈত প্রভৃতি এবং মুকুন্দ দত্ত, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি কায়স্থ বৈদ্য, শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে গিয়া, অবস্থান করিতে-ছিলেন। সকলেই সবিশেষ প্রতিভাবান্— যেন প্রতিভার বিকাশ-ভূমি বলিয়াই নব-দ্বীপের আশ্রয় লইয়াছিলেন। চৈতন্য ও রঘুনাথ সমপাঠী ছিলেন, উভয়ে সৌহার্দ্দও ছিল বিলক্ষণ এবং ইঁহারা উভয়েই শ্রীহট্টীয় সুতরাং এক সমাজভুক্ত ছিলেন বলিয়াই, বোধ হয়, তাঁহাদের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠতা ছিল।† রঘুনন্দন বোধ হয় ইঁহাদের অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ, অতএব অল্পবয়সে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক নবদ্বীপ পরিত্যাগ করাতে তদীয় জীবনীতে রঘুনন্দনের কোনও উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ পরিত্যাগের পরে যখন রঘুনাথ মধ্যাহ্নমার্ত্ত-ণ্ডের ন্যায় নবদ্বীপাকাশে দেদীপ্যমান ছিলেন, তখন রঘুনন্দনকে তদীয় সম্পর্কে আসিতে

* পূজনীয় তর্কালঙ্কার মহাশয়কে এতৎ সম্বন্ধে আমার মত, অর্থাৎ রঘুনন্দন শ্রীহট্টজাত, এই কথা, জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি ইহার প্রতিবাদ ত করেন নাই বরং রঘুনন্দন পূর্ব্ব বঙ্গের লোক, ইহার সমর্থন কল্পে তদীয় "উদ্বাহ চন্দ্রালোক" একখণ্ড কৃপা করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার "বিজ্ঞা-পন" অংশ হইতে তদীয় মত ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হই-য়াছে।

† রঘুনাথের মনঃক্ষুণ্ণতা দেখিয়া চৈতন্য দেবের ন্যায়ের টীকার গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন কাহিনী প্রভৃতিই ইহার প্রমাণ।

দেখিতেছি। "নবদ্বীপ মহিমা" হইতেই তৎসম্বন্ধে একটী গল্প উদ্ধার করিলাম :—

"কথিত আছে, রঘুনন্দন আপন পুত্রের উপনয়ন-স্বমতে প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ উপনয়নের পর তাঁহার পুত্র কোনও কার্য্যোপলক্ষে রঘুনাথ শিরোমণিকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া প্রথানুসারে তাঁহাকে নমস্কার করেন। কিন্তু শিরোমণি একটু চিন্তা করিয়া প্রতি নমস্কার করিলেন না। দুঃখিত হইয়া বালক পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে, "জেঠা মহাশয়কে নমস্কার করিলাম, কিন্তু তিনি প্রতি-নমস্কার করিলেন না"। রঘুনন্দন শুনিয়া দুঃখিত হইলেন।

যথাসময়ে শিরোমণি উপস্থিত হইলে রঘুনন্দন, তাঁহাকে প্রতিনমস্কার না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন শিরোমণি বলিলেন, "ভাই হে, আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, তুমি যে মতে পুত্রের উপনয়ন দিয়াছ, তাহাই যদি শাস্ত্রের প্রকৃত মত হয়, তাহা হইলে তোমার তদনুসারে উপনয়ন না হওয়ায় তুমি নিজে অব্রাহ্মণ রহিয়াছ, সুতরাং অব্রাহ্মণের ঔরসজাত পুত্রকে যদি শতগাছি যজ্ঞসূত্র দেওয়া যায়, তাহা হইলেও সে কোন মতে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না। আর যদি তোমার মত যথার্থ শাস্ত্রসম্মত না হয়, তাহা হইলে তোমার পুত্রও এক্ষণে ব্রাহ্মণ হয় নাই। এইরূপ বিবেচনা করিয়াই আমি তোমার পুত্রকে নমস্কার করি নাই।" তদবধি রঘুনন্দনের সংস্কার-তত্ত্বের উপনয়ন প্রথা অপ্রচলিত হইল। এক্ষণে উপনয়ন প্রাচীনমতেই হইয়া থাকে।"* এই কাহিনীটি হইতে সূচিত হইতেছে যে, উভয়ের মধ্যে সামাজিক ঘনিষ্ঠতাও ছিল। রঘুনাথ বৈদিক ছিলেন। কিন্তু রঘুনন্দন বন্দ্যঘটীয় ছিলেন, উঁহাদের মধ্যে সামাজিকতার ঘনিষ্ঠভাব অন্যত্র অসম্ভব হইলেও শ্রীহট্টের বলিয়াই সম্ভব; কেননা শ্রীহট্টে রাঢ়ী বৈদিক বারেন্দ্র ভেদ কদাপি ছিল না, এখনও নাই।

রঘুনাথ রঘুনন্দন! নামেরই বা কি ঘনিষ্ঠতা! যদি আমরা তাঁহাদের বংশগত ভিন্নতা না জানিতাম, তবে "জেঠা মহাশয়"কে ছেলের পিতার জ্যেষ্ঠ সহোদরই ভাবিতাম। প্রতিভায়ও উভয়তঃ কি সাদৃশ্য! একজন মিথিলার দর্পচূর্ণ করিয়া ন্যায়ের প্রাধান্য স্থাপন পূর্ব্বক, অপরে সেই মৈথিল বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির প্রসার খর্ব্ব করিয়া স্মৃতির প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়া বঙ্গের তথা নবদ্বীপের গৌরব ভিত্তি সুদৃঢ় করিলেন। একই প্রদেশের দুইজন প্রতিভাবান্ ব্যক্তি যদি একত্র ভিন্ন স্থানে যান, তন্মধ্যে যদি এক জন বিষয় বিশেষে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তবে অপরেও বিষয়ান্তরে তদ্রূপ প্রতিপত্তি লাভের জন্য ব্যাকুল হন।—ইহা স্বাভাবিক এবং তন্নিমিত্তও উভয়েই শ্রীহট্টের লোক বলিয়া ধারণা করা অনুচিত বোধ হয় না। আর একটী কথা এস্থানে উত্থাপিত হইতে পারে। শ্রীহট্টের অতি অল্পাংশ ভিন্ন—সেও অতি অল্প দিন যাবৎ প্রবর্ত্তিত—রঘুনন্দনের স্মৃতি প্রচলিত নহে। ইহা বরং রঘুনন্দনের শ্রীহট্টিত্বই প্রমাণিত করে। কেননা ইংরেজী প্রবাদ বাক্যই ইহার সমর্থক :—Prophets are never honoured in their own country" (মহা পুরুষেরা স্বীয় জন্মভূমিতে কদাপি সম্মান লাভ করেন না)। সংস্কৃতেও কি "জ্ঞাতিশ্চেদ্দহনেন কিম্?"প্রভৃতি উক্তি নাই? ফলতঃ স্বদেশীয়েরই সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রঘুনন্দন যেমন মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তেমনই স্বদেশীয়দের হিংসামূলে তাঁহার মত নিজের সমাজে প্রচলিত হয় নাই। নৈয়ায়িক শিরোমণির একটী মাত্র ফক্কিকার চোটে সংস্কার-তত্ত্বের উপনয়নটা উড়িয়া গেল। রঘুনন্দনের পরম ভাগ্য যে অন্যান্য বিষয় সেই কুশাগ্র বুদ্ধির তর্কের আবর্ত্তে পড়িয়া মারা যায় নাই। *

* এই গল্পটী অলীক না হইবারই কথা, কেননা ইহার সঙ্গে একটা বড় মত বিষয় জড়িত রহিয়াছে।

* এবিষয়ে এরূপ বিপরীত কল্পনা না করিলেও বোধ হয় কোন হানি নাই। কোনও একটা নূতন মত সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইতে বহু সময় লাগে, বিশেষতঃ যদি তাহা ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সম্বদ্ধ হয়। হয়তঃ সেইজন্যই

রঘুনন্দনকে শ্রীহট্টে জাত বলিলে যদি নবদ্বীপের গৌরব-মাহাত্ম্যের অণুমাত্রও হানি হইত, তাহা হইলে এই প্রবন্ধ প্রকটনের প্রয়াস পাইতাম না। দূরদেশ হইতে লোক আসিয়া যে স্থানটীকে প্রতিভা বিকাশের অনুকূল মনে করিয়া অবলম্বন করে, স্থান-মাহাত্ম্য বলিয়া যদি একটা কথা থাকে, তবে উহা ঐ স্থানেই শুধু প্রযোজ্য। যে মাহাত্ম্য ব্যক্তি বিশেষ-নিরপেক্ষ, সেই মাহাত্ম্যই প্রকৃত মাহাত্ম্য; কেবল রঘুনাথ রঘুনন্দন দ্বারাই যে নবদ্বীপ মহিমান্বিত হইয়াছে, তাহা ঠিক বলিতে পারি না, তবে তাঁহাদের দ্বারা উহার মহিমা প্রমাণিত হইয়াছে। কেন না, এই স্থানের মহিমা আছে বলিয়াই উঁহারা স্বদেশ ছাড়িয়া জীবনের অত্যাবশ্যক অংশ, কৈশোর যৌবন বার্দ্ধক্য, এইখানেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। প্রতিভার "বীজ-ভূমি" অপেক্ষা "লীলাক্ষেত্র" হওয়াই প্রকৃত গৌরবের হেতু—তাই বারাণসীর এত গৌরব, বর্ত্তমান কলিকাতার এত নাম ডাক।

নবদ্বীপ মহিমার লেখক নবদ্বীপকে রঘুনন্দনের জন্মভূমি রূপে নির্দ্দেশ করিয়া, অথবা তদঞ্চলস্থ জনসাধারণ লোক পরম্পরা নবদ্বীপকেই রঘুনন্দনের জন্মভূমি ভাবিয়া দুই একটা গল্প গুজবের সৃষ্টি করিয়া যে একটা অস্বাভাবিক কিছু করিয়াছেন, তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না; বরং যেখানে

শ্রীহট্ট প্রদেশে রঘুনন্দনের মত পৌঁছিতে এত বিলম্ব ঘটিয়াছে।

যাঁহাকে দেখা যায়, সেই স্থানটীকে তদীয় জন্মস্থান ভাবাই সাধারণ্যে স্বাভাবিক; বিশেষতঃ যদি বহুকাল মধ্যে অন্যত্র হইতে কোনও দাবি দাওয়া না হয়। অন্য স্থান হইতে যদি সম্প্রতি রঘুনন্দনের নিমিত্ত দাবি আসিয়া উপস্থিত হয়, তজ্জন্য নবদ্বীপবাসিগণের ক্ষুব্ধ হইবার কোনও কারণ নাই, কেননা এইরূপ দাবি দাওয়া স্বাভাবিক। গ্রীসের অন্ধকবি হোমারের মৃত্যুর পর তাঁহার নিমিত্ত সাতটী প্রসিদ্ধ নগরী বিবাদ বিসংবাদ করিয়াছিল, (seven rival cities contend for Homer dead)।

আশা করি, শ্রীহট্টের পক্ষ হইতে এই দাবিটী সুধী সমাজে উপেক্ষিত হইবে না। *

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

* এই দাবির পোষকতায় মাতব্বর সাক্ষীও উপস্থিত করিতেছি। মহামহোপাধ্যায় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতিভাবান্ ছাত্র শ্রীহট্ট-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামতনু ন্যায়সাংখ্যচুঞ্চু মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন যে, যখন তিনি সেরপুরে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিতেন, তখন সেরপুর-নিবাসী প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ৺ঈশানচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় একদা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "বাপুহে, তোমরা কম নও, যেস্থানে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তোমরা সেই শ্রীহট্ট অঞ্চলের লোক।" ন্যায়সাংখ্যচুঞ্চু মহাশয় আরও বলেন যে, একদা কলিকাতায় স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের আবাস বাটীতে বহু পণ্ডিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন এবং তৎস্থানে তিনিও উপস্থিত ছিলেন; তখন রঘুনন্দনের জন্মভূমির আলোচনায় সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে মন্তব্য হয়, যে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীহট্টেরই লোক ছিলেন।

জ্ঞানবীর অক্ষয় কুমার দত্ত।

জগতের মানসিক, আধ্যাত্মিক, কি আধিভৌতিক, যে কোন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে একটী অদ্ভুত নিয়মের ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর মঙ্গলার্থে যখন যে বিষয়ের অত্যাবশ্যক হইয়াছে, পরম কারুনিক পরমেশ্বর দয়াপরবশ হইয়া তখন তাহাই যোগাইয়া দিয়াছেন। ইংরাজীতে এই ভাবের একটী কথা আছে, "Necessity is the mother of invention." যখন আমরা যে বিষয়ের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা বা অভাব অনুভব করি, তখন সকলে সমবেত হইয়া সেই সার্ব্বজনীন অভাব দূরীকরণার্থ আমাদের বুদ্ধি, বিবেচনা ও যুক্তি বৃত্তির বিশেষরূপে চালনা করিতে যত্নবান হই এবং সৎবৃত্তিনিচয়ের প্রকৃত চালনার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ অভাব-মোচনকারী কোন অভিনব সুখপ্রদ উপায় আবিষ্কৃত হয়। পথভ্রমণ কষ্টকর বোধ করিয়া, মনুষ্যবুদ্ধি, বাষ্পীয়যান, বৈদ্যুতিক যানাদি আবিষ্কার করিয়াছে। এইরূপ, জগতের প্রত্যেক উন্নতির মূলে কোন জাতি বা ব্যক্তি বিশেষের স্থায়ী অভাব-মোচন-স্পৃহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

ফ্রান্সে যখন ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লব বা অরাজকতা উপস্থিত, চতুর্দ্দিকে উন্মাদগ্রস্ত সমুদায় ধ্বংসকারী নরপিশাচগণের প্রেতনৃত্য ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, লোকের মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়া জীবন রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে, সকলেই স্বীয় শোচনীয় পরিণাম দর্শনে ভীত ও ত্রস্ত, তখন দয়ালু জগদীশ্বর কৃপাবিষ্ট হইয়া ফ্রান্সের মঙ্গলার্থ মহাবীর নেপোলিয়নকে পাঠাইয়া দিলেন।

সাহিত্যজগতেও এ স্বাভাবিক নিয়মের ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। পলাশীযুদ্ধে মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিয়া ইংরাজ বঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হইলেন এবং দেশীয় মনোমুগ্ধকর আদর্শ বঙ্গবাসীর মানসচক্ষু-সমীপে উপস্থাপিত করিলেন। ইহাতে এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব অভিনব ফল ফলিল। বঙ্গের অবস্থা, কি সামাজিক, কি সাহিত্যিক, কি ধর্ম্মনৈতিক, অতীব শোচনীয়। প্রজ্বলিত আলোকশিখালিঙ্গনকারী পতঙ্গের ন্যায়, বঙ্গীয়যুবকগণ, অনেকে, নয়নমুগ্ধকর আপাতমধুর খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম, ইংরাজী বেশভূষা, আদবকায়দা আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন; হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। তখন এক মহাপুরুষের আবির্ভাবের অত্যন্ত প্রয়োজন হইল এবং এই প্রয়োজনের ফলস্বরূপ মহাত্মা রামমোহন রায় অবতীর্ণ হইয়া, সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক অনেক প্রাচীন মত পরিবর্ত্তন সংঘটন পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মেরই অস্থিমজ্জায় পরিপুষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে এক অভিনব ধর্ম্মপ্রচার করিয়া; খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারের স্রোত একবারে খর্ব্ব করিলেন। কিন্তু ইহাতে বঙ্গসাহিত্যের দুরাবস্থা সম্বন্ধে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিল না। তখন পরমপিতা পরমেশ্বর দীনা শীর্ণা বঙ্গভাষার দুঃখে দুঃখিত হইয়া, আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, জ্ঞানবীর অক্ষয়কুমারকে বঙ্গসাহিত্যের দুঃখ মোচনার্থ পাঠাইয়া দিলেন। অক্ষয় কুমার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের

কি অশেষ কল্যাণ সাধিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত আভাস নিম্নে বিবৃত করিতেছি। আমি এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, অক্ষয় বাবুর জীবন-সংক্রান্ত অন্য কোন পুস্তকাদি না থাকায়, নিম্নলিখিত প্রবন্ধের যাবতীয় উপকরণাদি মহেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত ও তাৎকালীন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

আমাদের মধ্যে অনেকে কোন বিষয়ে উন্নতি করিবার উপাদানস্বরূপ অনেক সদ্গুণাবলী উল্লেখ করিতে পারেন, কিন্তু কি কি উপায় অবলম্বন করিলে কার্য্যতঃ ভাবী উন্নতিমূলক সেই সদ্গুণাবলী আয়ত্ত করিতে পারা যায়, তাহা অল্প লোকেই বলিতে পারেন। সেই জন্য, কি প্রকারে কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া আদর্শচরিত্র, বিপুল জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মাগণ স্বীয় জীবনে অসামান্য উন্নতি-সাধন করিয়া জগতে অশেষ কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অমূল্য নীতিগর্ভ জীবনী পাঠে অনেকেরই কৌতূহল জন্মিয়া থাকে। এই সমস্ত মহাত্মাগণের পবিত্র জীবনের সাধু-দৃষ্টান্ত আমাদের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তিদের প্রতি কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, তাহা সামান্য বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। সহস্র উপদেশ শ্রবণে, শত সহস্র সদ্গ্রন্থপাঠে যে উপকার সাধিত না হয় তাহা আমরা একটী সাধুদৃষ্টান্তে প্রাপ্ত হইতে পারি।

সন ১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ, শনিবার, নবদ্বীপের অদূরবর্ত্তী চুপী নামক গ্রামে মহাত্মা অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত ও মাতার নাম দয়াময়ী। তাঁহারা উভয়েই নিজস্বভাবসিদ্ধ পরোপকারিতা, ন্যায়পরতা ও সৌজন্যতাদিগুণে প্রতিবেশী মণ্ডলীর বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। জনক জননীর গুণাগুণ সন্তানে বর্ত্তিয়া থাকে। প্রবল পরাক্রান্ত মহাবীর নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট, মহাত্মা জর্জ্জ ওয়াসিংটন, স্বদেশভক্ত ম্যাটসিনি ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণের জীবনী পাঠ করিলে সন্তানের ভাবী উন্নতিমূলক চরিত্র-গঠনের প্রতি পিতামাতার, বিশেষতঃ মাতার স্বভাব কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অক্ষয় বাবু তাঁহার পিতামাতার নিকট হইতে মানবচরিত্রের অনেক উৎকৃষ্ট গুণাবলী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যে পরে ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপুল সংস্করণ সম্পাদন করিয়া একজন অসামান্য সুনীতি-সম্পন্ন বলিয়া পরিচিত হন, স্বীয় জননীর ধর্ম্মপ্রবণতাই তাহার মূল। পুত্র পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিলে পিতা তাঁহার "হাতে খড়ি" দিয়া প্রায় সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পুত্রের শিক্ষাভার গ্রামস্থ একজন গুরুমহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করেন। ইনি এই বয়সেই পাঠাভ্যাসকালে এরূপ সুশীলতা, বুদ্ধি ও বিদ্যানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন যে, গুরু-মহাশয় তাঁহার প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়া, অতিযত্নের সহিত তাঁহাকে অনেক মনোহর ভাবপূর্ণ চাণক্যের শ্লোক পড়াইতেন। যাঁহারা জীবনে, সামাজিক কি নৈতিক, যে কোন বিষয়ে বিশেষ উন্নতি-সাধন করিয়া ইহজগতে অমরকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যান, তাঁহাদের শৈশবকালীন প্রাত্যহিক কথা-বার্ত্তা কিম্বা ক্রিয়াকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহাতে ভাবী উন্নতির উপাদানগুলি বীজ-রূপে প্রকাশিত বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। অক্ষয় বাবুর সম্বন্ধে এ প্রাকৃতিক নিয়মের

ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাঁহার শৈশবের কথাবার্ত্তায় তাঁহার জীবনের ভাবী উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়।

দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অক্ষয় বাবু খিদিরপুরে পিতৃব্যপুত্রদের বাসায় চলিয়া আসেন এবং তথায় কলিকাতাস্থ হিন্দুকলেজ ও ভবানীপুরের ইউনিয়ন স্কুল সংক্রান্ত নানা কৌতুহলোদ্দীপক বৃত্তান্ত শুনিয়া, তাঁহার ইংরাজী পড়িবার ইচ্ছা বলবতী হয়। বিচারালয়ে পার্শীভাষা প্রচলিত থাকায়, পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ সকলে তাঁহাকে পার্শী পড়িতে বলেন, কিন্তু তিনি সকলের অনুরোধ অতিক্রম করিয়া পার্শী পড়া পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজী পড়িতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় ঘটনাক্রমে একদিন ইংরাজী ও বঙ্গভাষায় লিখিত একখানি ভূগোল তাঁহার নয়নপথে পতিত হয়। এই ভূগোল খানি তাঁহার অন্তরে এরূপ এক দুর্দ্দমনীয় ইংরাজী শিক্ষানুরাগ জন্মাইয়া দেয় যে, তখন হইতে ইংরাজী অধ্যয়ন করিতে কৃতসংকল্প হন। ইঁহার এক পিতৃব্যপুত্র, তাঁহার পরিচিত জয়মাষ্টার নামক একজন ব্যক্তির উপর,তাঁহাকে ইংরাজী শিখাইবার ভার ন্যস্ত করেন। কিন্তু ইংরাজীতে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি না থাকায়, এই মাষ্টার অক্ষয় বাবুকে পাঠ উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন না, তীক্ষ্ণবুদ্ধি অক্ষয় বাবু ইহা অতি অল্পবয়সেই বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু কোন উপায় করিতে না পারায়, তাঁহাকে কিছুকাল এরূপ অসুবিধা অতি বিষণ্ণচিত্তে সহ্য করিতে হইয়াছিল; অবশেষে খিদিরপুরে নবপ্রতিষ্ঠিত একটী মিশনরি ক্রিস্কুলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ অধ্যবসায় বলে ভর্ত্তি হন। কিন্তু তাঁহার আত্মীয়বর্গ, বিশেষ হিন্দুমতাবলম্বী থাকায়, তাঁহার খ্রীষ্টান স্কুলে পড়ার সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি করেন এবং এক পিতৃব্যের পরামর্শে অক্ষয় বাবু উক্ত স্কুল পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতার গৌরমোহন আঢ্যের Oriental Seminaryতে পড়িতে বাধ্য হন। এই বাদানুবাদের সময় তাঁহার যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানতৃষ্ণা ও অধ্যবসায়ের বিপুল পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অতুলনীয়। এখন তাঁহার বয়স ষোল বৎসর। বয়স অধিক বোধ হওয়ায় ও অক্ষয় বাবুর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে গৌরমোহন বাবু নবীন ছাত্রটীকে ৫ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিতে অবশেষে সম্মত হন। প্রার্থিত ৫ম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হওয়া অবধি গুরুতর পরিশ্রম ও অসীম অধ্যবসায় বলে সাত মাসের মধ্যে অক্ষয় বাবু ২য় পারিতোষিক লাভ করাতে গৌরমোহন বাবু তাঁহার প্রতি এরূপ সন্তুষ্ট হন যে, তাঁহাকে একেবারেই ৩য় শ্রেণীতে উঠাইয়া দিলেন। এই শ্রেণীতেই তিনি পোপের অনুবাদিত হোমরকৃত ইলিয়ড কাব্য শিক্ষকের নিকট পাঠ করেন এবং নিজের সাহায্যে বাটীতে ভার্জিল অধ্যয়ন করিয়া ইংরাজী ভাষায় অনেক উন্নতি লাভ করেন।

ইলিয়ড পাঠে ইঁহার মানসিক অবস্থার একটী গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিল। হিন্দুধর্ম্মের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে তাঁহার সংশয় জন্মিল ও হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। জগতের কার্য্যকারণ পর্য্যালোচনা দ্বারা যে ধর্ম্ম প্রতিপন্ন হয়, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। পিতার অসুস্থতা বশতঃ স্কুলের বেতন দানে অক্ষমতা জানাইলে, গৌরমোহন বাবু বিনা বেতনে তাঁহাকে পড়িতে দিলেন। জগতে কোন সদুদ্দেশ্য সাধনে অনেক বিঘ্নবিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিতে হয়। বিদ্যাচর্চ্চার অনুরোধে যে

কষ্ট পাইতে হয়, অধ্যয়নপ্রিয় ব্যক্তির তাহা কখনও কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। অক্ষয় বাবু চেষ্টা ও উদ্যোগ দ্বারা সেই সমস্ত বিপত্তি অতিক্রম করিতেন। এই সময়ে কাশীধামে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পূজ্যপাদ পিতৃদেবের শোচনীয় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাংসারিক এরূপ দুরবস্থা ঘটে যে, তাঁহাকে স্কুল পরিত্যাগ করিয়া সংসারের সাহার্য্যার্থ অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইতে হয়। কিন্তু স্কুল পরিত্যাগ করিয়া এরূপ বিষম বিপদে পতিত হইয়াও, তিনি কিঞ্চিৎ মাত্র বিচলিত হন নাই, বরং উচ্চ শিক্ষালাভের পথে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহার প্রকৃত জ্ঞানপিপাসা ও বিজ্ঞান-শিক্ষা-তৃষ্ণা আরও দ্বিগুণ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এক বৎসরের মধ্যে জ্যামিতির অবশিষ্টাংশ, বীজগণিত, কনিক্সেক্সেন, ডিফারেন্সিয়েল্ কেল্কুলাস প্রভৃতি দুরূহ গণিত শাস্ত্রের উচ্চাঙ্গ সকল শিখিয়া ফেলিলেন এবং ফ্রেনলজি প্রভৃতি মনোবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক ভূগোল সংক্রান্ত নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের জামাতা শ্রীনাথ ঘোষ ও দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসুর সহিত কোন এক রহস্য পূর্ণ ঘটনাক্রমে আলাপ হওয়ায়, তাঁহার বিজ্ঞানচর্চ্চা সম্বন্ধে অনেক সুবিধা হইল। তিনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষা চর্চ্চা করিতেন এবং কিছু কিছু বাঙ্গালা পদ্য রচনা করিয়া নিজ রচনা শক্তি মার্জ্জিত রাখিতেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, ইংরাজী রচনায় সুদক্ষ হইয়া ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিবার চেষ্টা করিলে, দেশের কোন বিশেষ উপকার করিতে পারিবেন না; কারণ ইংরাজী বিদেশীয় ভাষা ও ইংরাজীতে বহুবিধ উৎকৃষ্ট উৎকষ্ট গ্রন্থ আছে; অতএব বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা করাই আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করিলেন। পরম কারুণিক পরমেশ্বর বুঝি নিঃসহায়া বঙ্গভাষার দুরাবস্থা দেখিয়া, শুভক্ষণে, অক্ষয় বাবুর মনে এই সৎ সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া দিলেন। ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতা-আলোকিত আমাদের বঙ্গীয় কৃতবিদ্য নব্য-সম্প্রদায়েরা, প্রবল অনুচিকীর্ষা বলে, তাঁহাদের অবশ্য-সেব্য মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করিয়া, ইংরাজী ভাষার অনুশীলন ও ইংরাজী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া দেশের উন্নতি সাধন করিবেন বলিয়া ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, এখন তাঁহাদের এ ভ্রমপূর্ণ ধারণা ঘুচিয়াছে। এখন দুঃখিনী মাতৃভাষার দিকে আকৃষ্ট হইয়া, ইংরাজী শিক্ষা সাহায্যে তাহার উন্নতি সাধন ও দুঃখ দূরীকরণার্থে ক্রমশঃ তাঁহারা সচেষ্ট হইতেছেন। এতদ্ সম্বন্ধে মহামান্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা তাহার প্রধান নিদর্শন। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনোদ্দেশ্যে অক্ষয় বাবু, প্রায় বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, সংস্কৃত শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং হিন্দুজাতির পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান কল্পে অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করেন। পরে কোন সামান্য ঘটনাক্রমে পদ্য প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হন এবং এই সূত্রে প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের সহিত আলাপ পরিচয় হয়। কিন্তু অর্থাভাব প্রযুক্ত কিছুদিন তাঁহাকে নানা কর্ম্ম স্থানে বৃথা ঘুড়িয়া বেড়াইতে হয়। কোন আত্মীয় তাঁহাকে আইন শিক্ষা করিতে বলিলে, তিনি তাহাকে উত্তর দেন "যে নিয়ম নিত্য নিত্য পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা শিক্ষা করিয়া আমার কি ফললাভ হইবে? আমি জগতের অপরিবর্ত্তনীয় স্বাভাবিক নিয়ম শিক্ষা করিতে চাই।" একদিন

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ইহাঁকে তত্ত্ববোধিনী সভায় লইয়া যান এবং এইসূত্রে ইনি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইয়া ১২৪৬ সালে উক্ত সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন এবং পরে এই সভা কর্তৃক সংস্থাপিত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় তিনি ভূগোল ও পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক পদে মাসিক ১৪৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। এই সময়ে শিক্ষপোযোগী এক খানি ভূগোল প্রস্তুত করেন ও "বিদ্যাদর্শন" নামক একখানি মাসিক পত্রিকার প্রচারারম্ভ করেন। কিন্তু তদানীন্তন কুরুচিপূর্ণ বঙ্গ সমাজ কর্তৃক পত্রিকাখানি আদৃত না হওয়ায়,ছয় মাস পরে উঠিয়া যায়। ১২৫০ সালে কোন কারণ বশতঃ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কলিকাতা হইতে হুগলীর অন্তর্গত বংশবাটী গ্রামে উঠিয়া যায়। তত্ত্ববোধিনী সভার কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেও,কলিকাতা পরিত্যাগে জ্ঞান চর্চ্চা ও স্বদেশের মঙ্গলোন্নতি সম্বন্ধে ব্যাঘাত হইবে বলিয়া,তিনি উক্ত পদ অস্বীকার করিলেন, এবং টাকীর জমিদারের বরাহনগরস্থ বাটীতে "নীতি-তরঙ্গিণী" নামে এক সভার সভ্য হন এবং তথায় অনেক নীতিগর্ভপূর্ণ প্রবন্ধ ও প্রস্তাব পাঠ করেন।

১২৫০ সালে সুবিখ্যাত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রচারারম্ভ হয় এবং তিনি তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। পরমার্থ বিষয়ক প্রস্তাব প্রচার এই পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য হইলেও, ইহাতে বিজ্ঞান, দর্শন, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত করিয়া, ঐ পত্রিকার তিনি কতদূর উন্নত অবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, জীবনচরিত, দর্শনশাস্ত্রাদি বিষয়ক নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ সঙ্কলিত করিয়া ঐ পত্রিকাকে,তিনি স্বীয় ঐকান্তিক উৎসাহ, উজ্জ্বল প্রতিভা ও আন্তরিক পরিশ্রমের গুণে তদানীন্তন সাহিত্যানুরাগী প্রথিতনামা মহাত্মাগণের কিরূপ আদরের ও যত্নের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছিলেন,তাহা ঐ পত্রিকা সম্বন্ধে প্রকাশিত যাবতীয় মন্তব্য ও সমালোচনা পাঠ করিলেই স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারা যায়। তিনি ঐ পত্রিকাকে এতই স্নেহচক্ষে দেখিতেন যে, ইহার উন্নতি কল্পে তাঁহার অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ ও অদম্য অধ্যবসায়ের বিষয় পাঠ করিলে সকলের হৃদয়ে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। এই পত্রিকার জন্য ইনি মাসিক ৬০৲ টাকা বেতনের কর্ম্মানুরোধে,বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটী ইন্স্পেক্টরের পদ, অস্বীকার করেন। পরে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটনাক্রমে কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ স্বীকার করিলেও,সর্ব্বসাধারণের শুভকরী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। তৎকালে বঙ্গ ভাষার প্রতি সাধারণতঃ লোকের যে অশ্রদ্ধা ছিল, অক্ষয় বাবুর দ্বারা পরিচালিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাহা দূরীভূত করিয়া, বঙ্গ ভাষার প্রতি লোকের আস্থা ও অনুরাগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। বস্তুতঃ এই পত্রিকা যে বঙ্গভাষার প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই। এই পত্রিকায় প্রকাশিত 'পদার্থবিদ্যা' 'ধর্ম্মনীতি' এবং 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' প্রবন্ধগুলি এরূপ যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেচনা পূর্ণ এবং ওজস্বিনী ভাষায় এমন মধুর ও গম্ভীর ভাবে রচিত যে,এখন একবার পাঠ করিলে,উহা তদানীন্তন কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মানসিক রীতিনীতি ও স্বাধীন বুদ্ধি

বৃত্তির উপর কিরূপ বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই সারগর্ভ প্রবন্ধগুলি অনেককে কর্ত্তব্য জ্ঞান শিক্ষা দিয়া অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিয়াছে। অক্ষয় বাবু, এই পত্রিকা সহযোগে "সমাজ হইতে বেদের আধিপত্য উঠাইয়া দিয়া, স্বভাবকে ধর্ম্মপুস্তকরূপে প্রতিপন্ন করতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন।" বিভিন্ন প্রদেশের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত থাকায়, ইহা বিদেশীয় ব্যক্তিগণের বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল। তত্ত্ববোধিনীর ভাষা বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ বলিলেও বলা যাইতে পারে। এই পত্রিকা বাঙ্গালায় ইউরোপীয় ভাব সমূহ প্রচারের প্রথম প্রবর্ত্তক। পরে অক্ষয় বাবু বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত-নিরপেক্ষ করিয়া, ইহার নানা অংশের শ্রী বৃদ্ধি সাধন করতঃ, পৃথিবীর একটী উৎকৃষ্ট ভাষায় পরিণত করিবার চেষ্টা করেন। ইনি স্বভাব গ্রন্থের কিরূপ মেধাবী পাঠক ও পর্য্যালোচক ছিলেন, তাহা মদন মোহন তর্কালঙ্কারের সর্ব্বজন-প্রশংসিত "পাখী সব করে রব" কবিতার অপূর্ব্ব সমালোচনা' পাঠ করিলে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তর্কালঙ্কারের মনোহর রচনামাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কেহই তাঁহার কবিতার প্রকৃত স্বভাব বর্ণনের দোষগুলি উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হন নাই। এতদ্দেশে প্রণালী শুদ্ধ ভাষাজ্ঞান-সম্পন্ন ও প্রকৃত সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তির অভাবই, এই অসমর্থতার কারণ বলিতে হইবে। ইউরোপে কিরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সমালোচনার প্রণালী প্রচলিত আছে এবং তাহাতে সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাদি গদ্য কিম্বা পদ্য রচনাদি ক্রমশঃ কিরূপ উন্নতি করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু আমাদের দেশে প্রকৃত নিরপেক্ষ সমালোচনার অভাবে বাঙ্গালা ভাষার যে অবনতি হইতেছে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

এই সময়ে অক্ষয় বাবু শিরোরোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন, কিন্তু এরূপ রোগাক্রান্ত হইয়াও বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া তাহার উন্নতি সাধনোদ্দেশে কিরূপ পরিশ্রম করিতেন, তাহা অবগত হইলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। অক্ষয় বাবুর পরামর্শেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার "সেকাল ও একাল" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। নিজের জ্ঞানোপার্জ্জন ও অন্যকে জ্ঞান বিতরণ করাই ইহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। সেই সদুদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গুরুতর সম্পাদকতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও, মেডিকেল কলেজে গিয়া প্রথম বর্ষে রসায়ন ও দ্বিতীয় বর্ষে উদ্ভিদবিদ্যার উপদেশাদি শ্রবণ করিতেন। প্রবল জ্ঞানস্পৃহা সতত বিদ্যমান থাকায়, তিনি হিন্দুজাতির পুরাবৃত্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষায় লিখিত কতকগুলি পুস্তক পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে ঐ ভাষাদ্বয়ের অনুশীলন করেন। এই বিপুল জ্ঞানের ফল স্বরূপ ইনি "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" বিষয়ক পুস্তকাবলী, "মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিষয়ে 'ধর্ম্মনীতি', 'পদার্থ-বিদ্যা' ও 'চারুপাঠ' ৩য় ভাগ প্রভৃতি যাবতীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। তাঁহার সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ইংরেজ ও জর্ম্মণ জাতীয় অনেক ব্যক্তি পাঠ করিতেন। "এক দিন General Assemblyর সুবিখ্যাত অধ্যাপক Rev. John Anderson ঐ পত্রিকার প্রশংসা করিয়া ছাত্র-সমীপে বলেন—

"Akhaykumar is Indianising European Science" অর্থাৎ "অক্ষয়কুমার ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে ভারতবর্ষীয় করিয়া তুলিতেছেন।" তিনি তত্ত্ববোধিনী-সভা ও ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত নানা যুক্তি তর্ক করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈতবাদ মত রহিত করিয়া, বেদ ঈশ্বরপ্রণীত অভ্রান্ত শাস্ত্র. এই মতের ঘোর প্রতিবাদ করেন। কিন্তু সুদৃঢ় সংস্কারবশতঃ বেদে দেবেন্দ্র বাবুর প্রগাঢ় ভক্তি থাকায়, অক্ষয় বাবু ৭।৮ বৎসর ধরিয়া তাঁহার সহিত যুক্তিতর্ক করিয়া বুঝাইয়া পরিশেষে নিজমতে আনিতে সক্ষম হন। এইরূপে তিনি সমাজ হইতে বেদের আধিপত্য উঠাইয়া দিয়া, স্বভাবকে ধর্ম্মপুস্তকরূপে প্রতিপন্ন করতঃ, ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া প্রথম প্রচার করেন। ব্রাহ্মসমাজে এই অত্যাবশ্যকীয় মতদ্বয়ের আমূল সংস্কার সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া অক্ষয় বাবু হৃদয়ে অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি লাভ করেন এবং অধিকতর উদ্যম সহকারে ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে মনঃসংযোগ করেন। এতদ্‌সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ওজস্বিনী ভাষায় যে সমস্ত হৃদয়গ্রাহী সারগর্ভ অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন, তাহা পাঠ করিলে অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। দুর্ব্বলমতি স্ত্রীলোকগণের জন্য দেবেন্দ্র বাবু পুষ্প চন্দন ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা-প্রণালী প্রবর্ত্তন করেন। এই মতের প্রতিবাদ করিয়া অক্ষয় বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত ঘোরতর তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন এবং পরিশেষে তাঁহাকে ঐ মত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন।

অক্ষয় কুমার ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিবার আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না; বলিতেন—"ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম বলে যাহা সঙ্ঘটিত হয়, তাহার জন্য প্রার্থনা করার কোনও প্রয়োজন নাই।" পরে বাইবেল, কোরাণাদি যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে ও গৌতম, নিউটন, লাপ্লাস, বেকন্, ক্যাণ্ট প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের গ্রন্থ হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রকৃত তত্ত্ব সমুদায় সংগ্রহ করিয়া একটী সুমহৎ উদার মত প্রবর্ত্তন করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে বিজ্ঞানসিদ্ধ সুনিশ্চিত তত্ত্ব সমুদায়ের সন্নিবেশ প্রস্তাব করেন। তাঁহার মতে "প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কার্য্য করাই ধর্ম্ম এবং না করাই অধর্ম্ম।" এস্থলে মহাভারতীয় উচ্চভাব পূর্ণ বচনটী উদ্ধৃত করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—

নহীদৃশং সংবদনং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে
দয়া মৈত্রী চ ভূতেষু দানঞ্চ মধুরা চ বাক্।

তাঁহার মতে ব্রাহ্মধর্ম্মে শরীর, বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির যাহাতে যুগপৎ উৎকর্ষ সাধিত হয়, তদ্‌বিষয়ে সুবন্দোবস্ত থাকা উচিত এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই সেই সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থের উপসংহারে এই বিজ্ঞানসম্মত মত স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাদি কার্য্য প্রায় সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় অনুষ্ঠিত হইত, কিন্তু অসংস্কৃত লোকের পক্ষে তাহা বোধগম্য না হওয়ায়, অক্ষয় বাবু সরল বাঙ্গলা ভাষায় উপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের অনেক হিতসাধন করেন। ফলতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক বিখ্যাত লুথরের ন্যায় অক্ষয় কুমার নানাবিধ ব্রাহ্মমত সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া, ব্রাহ্মমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের যে প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহাতে আর

সন্দেহ নাই। তাঁহার অভাবে ব্রাহ্মসমাজকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তিনি ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষাকে অনেক উৎকৃষ্ট উপহার প্রদান করেন। ১৭৭৩ শকে মাঘ মাসে "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" প্রথম ভাগ এবং তাহার পরবৎসর ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রচার করেন। উক্ত গ্রন্থ "Constitution of man" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের সারসঙ্কলন। ইহাতে মানব জীবনের যাবতীয় কর্ত্তব্য নিচয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। কি কি নিয়মাবলী পালন করিলে মানুষ্য সংসারে যাবতীয় বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া পরম সুখে জীবন যাপন করিতে পারে, এই গ্রন্থে তাহা বিশদরূপে উল্লেখ করিয়া, সদুপদেশ প্রদান এবং তৎসমুদয়ের লঙ্ঘনে কি ঘোরতর বিষময় ফল ফলে, তাহা গভীর গবেষণা সহকারে আলোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকে সাংসারিক অতি গুরুতর বিষয়গুলি, তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও যুক্তি প্রভাবে ও রচনাপ্রণালীর লালিত্যে এরূপ মধুর ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, একবার মাত্র পাঠ করিলে মন মুগ্ধ করিয়া ফেলে এবং পাঠকের মনে অক্ষয় বাবুর প্রদর্শিত পথে, ও তাঁহার উপদেশানুসারে,স্বীয় জীবন চালিত করিবার এক প্রবল অভিলাষ জন্মাইয়া দেয়। বাস্তবিক এই গ্রন্থখানি যে অশেষ গুণের আকর,তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। বহুকাল প্রচলিত অনেক কুপ্রথা উঠাইয়া দিয়া এই গ্রন্থ বঙ্গসমাজের মহৎ উপকার সাধিত করে। শুনিতে পাওয়া যায়, এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায়, কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। এই কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকই পুরুষানুক্রমে ৪০।৫০টী করিয়া বিবাহ করিতেন, বিক্রমপুর-নিবাসী কতকগুলি কুলীন ব্রাহ্মণ যুবক একটী সভা স্থাপন করিয়া এই পুস্তকে লিখিত বিবাহাদির নিয়ম সকল পালন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ইহাতে প্রাচীন পক্ষীয়েরা ইঁহাদের প্রতি এত রুষ্ট হন যে, ইঁহাদের মধ্যে অনেককে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তথাপি যুবক সভ্যগণ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া নিজ নিজ শিক্ষিত মতানুসারে কার্য্য করেন, কদাচ একের অধিক দুটী বিবাহ করেন নাই। লেখার প্রভাবে এরূপ আশু ফলোৎপত্তি অত্যন্ত বিরল। এই পুস্তক নিরামিষ ভোজন ও সুরাপান সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিয়া সাধারণের রুচির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল। ইহা প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই বিদ্বৎসমাজ কর্ত্তৃক ইহার সমাদর ও ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদ পুস্তক খানির প্রয়োজনীয়তা ও গুণাগুণের যথেষ্ট প্রমাণ বলিতে হইবে। বস্তুতঃ এই অমূল্য গ্রন্থ খানি Goldsmithএর সর্ব্বজন প্রশংসিত Deserted Village কিম্বা Travellerএর ন্যায় সকল সময়ে প্রত্যেক বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির আদরের বস্তু হইয়া থাকিবে।

১৭৭৪ শকের শ্রাবণ মাসে চারুপাঠ প্রথম ভাগ এবং তাহার দুই বৎসর পরে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনীতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক যে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল,তাহাই পুস্তকাকারে চারুপাঠে লিপিবদ্ধ করেন। এই পুস্তক দুইখানি এত প্রচলিত ও সর্ব্বজনপ্রশংসিত যে,ইহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। ইহা বাঙ্গালা-শিক্ষার্থী সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের জ্ঞানরত্নের আকর বলিলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু বড়ই দুঃখের

বিষয় যে, এই সমস্ত জ্ঞানগর্ভ মহামূল্য পুস্তকের পরিবর্ত্তে আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অনভিজ্ঞ নব্যযুবক-প্রণীত অনেক নগণ্য পুস্তক বালকবালিকাদের শিক্ষার্থ কাণ্ড জ্ঞান-হীন Text-Book-Commitee দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেছে। আমার বিশ্বাস, এই সমস্ত পুস্তক বালক বালিকাগণের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ উপকারী হওয়া অপেক্ষা বরং তাহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত করিতে সহায়তা করে। জানি না, অনাথা বঙ্গভাষার অদৃষ্টে আরও কি আছে!

ইহার পরে চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। এখানি অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভাবের হইয়াছে। স্বপ্নদর্শন নামক প্রবন্ধগুলি প্রগাঢ় চিন্তা ও জ্ঞান বৃত্তির পরিচায়ক এবং গভীর ভাবব্যঞ্জক। প্রত্যেক শিক্ষানুরাগী পাঠকের পুস্তকখানি একবার অন্ততঃ পাঠ করা উচিত। ১৭৭৮ শকের শ্রাবণ মাসে পদার্থবিদ্যা প্রচারিত হয়। এই বিদ্যা যে বাঙ্গালা ভাষায় কত দূর সরল ও বিশুদ্ধ হওয়া উচিত, ইহাই তাহার আদর্শ স্থল। কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি ১২৮৭ সালের বঙ্গদর্শনে 'বঙ্গ-বৈজ্ঞানিক' নামক প্রবন্ধে মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ প্রণীত পদার্থবিদ্যার সমালোচনায় কতকগুলি ভ্রমপ্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, "মহেন্দ্র বাবু যদি কোনও ইংরাজী পুস্তক না পড়িয়া কেবল অক্ষয় বাবুর পদার্থ বিদ্যাখানি পড়িতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, এরূপ মহাভ্রমে পতিত হইতেন না।"

১৭৯৭ শকের মাঘমাসে ধর্ম্মনীতি প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মনীতিতেও শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতি সাধনাদি পার্থিব জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা আছে। ইহার দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থকার অসাধ্য শিরোরোগ প্রযুক্ত বাহির করিতে পারেন নাই। এই গ্রন্থ বিদ্যালয়ের পাঠ্য রূপে পরিগণিত হওয়ায় হিন্দু সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, কারণ ইহাতে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের অবৈধতা, বিধবা-বিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবু সমযোগে এই সময়ে অনাথা শোক-ভার-বিহ্বলা হিন্দু বিধবাদিগের দারুণ দুঃখে দয়াপরবশ হইয়া বিধবা বিবাহ শাস্ত্র-সঙ্গত প্রতিপন্ন করিয়া উহা প্রচলন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন এবং স্থানে স্থানে দুই চারিটা বিধবা বিবাহ দিতে সক্ষমও হইয়াছিলেন। যাহা হউক, ইঁহাদের তীব্র যুক্তি ও সমালোচনা ফলে বহু বিবাহাদি সমাজের অনেক কুপ্রথা উঠিয়া যাইবার পথ পরিষ্কার হইয়া যায়। এখন ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে বহু বিবাহ প্রথা ত প্রায় একবারে উঠিয়া গিয়াছে, এবং এক পত্নী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় পত্নী পরিগ্রহও আজ কাল অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকেন। যাহা হউক, এ সমস্ত জঘন্য রীতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ইহাই মঙ্গল।

১৭৯২ শকে ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ এবং ১৮০৪ শকে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। অশেষ গবেষণা ও তর্ক-পূর্ণ পুস্তকখানির প্রথম প্রকাশিত হইবা মাত্র বিদ্বৎসমাজ সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক তৎপাঠে বিপুল আনন্দ প্রকাশ করেন, দ্বিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে ইনি ঘোরতর মস্তিষ্ক-পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন। বাস্তবিক অক্ষয় বাবু কিরূপ দুর্ব্বিসহ মস্তিষ্ক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত করেন, তাহা পাঠ করিলে হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও

দুঃখের উদ্রেক হয়। তাঁহার হৃদয়ভেদী কষ্ট-কাহিনী পাঠ করিলে নয়নাশ্রু সংবরণ করিতে পারা যায় না। "আর্য্যদর্শন" সম্পাদক যথার্থই বলিয়াছেন যে "কোন দেশের কোন পণ্ডিত এরূপ মস্তিষ্করোগে প্রপীড়িত হইয়া মস্তিষ্কেরই চালনা করিয়া কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কিনা, আমরা কোন স্থানে পাঠ করি নাই এবং কাহারও নিকট শুনি নাই।" তাঁহার কি উজ্জ্বল প্রতিভা, অপরিসীম ধৈর্য্য এবং অসাধারণ অধ্যবসায়,তাহা সামান্য বাক্য দ্বারা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করা বাতুলের কার্য্য। এই পুস্তকখানি কিরূপ মূল্যবান আদরের সামগ্রী, তাহা সুধীগণের এতদ্-সম্বন্ধীয় মন্তব্য পাঠ করিলেই উপলব্ধি করা যায়। Max Muller ইহা পাঠ করিয়া লিখিয়া পাঠান "আপনি নিজে অনুসন্ধান পূর্ব্বক যে সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহা বহুমূল্য।" মনিয়ার উইলিয়মসও লিখিয়া পাঠান "They (two volumes on the Religious sects of the Hindus) appear to every body a great deal of very interesting information and research. They are certainly very creditable to your industry and scholarship and will be a great acquisition in my library (June 13, 1884.) প্রসিদ্ধ ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই পুস্তক পাঠ করিয়া লেখেন —"আপনার উপহার, উপাসক সম্প্রদায় দ্বিতীয় ভাগ,প্রাপ্ত হইয়া কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলাম, বলিতে পারি না। প্রথমতঃ তো উহার প্রকাণ্ড আকৃতি দেখিয়া চক্ষুঃস্থির হইল। তাহার পর উহাতে প্রদর্শিত পাণ্ডিত্য ও স্থানে স্থানে বাগ্মিতা ও কবিত্ব দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম। অন্য লোকে সুস্থ শরীরে যাহা না করিতে পারে, আপনি তাহা রুগ্নশরীরে করিয়াছেন।" ইহাঁর গ্রন্থগুলি অনেক গ্রন্থের আদর্শস্বরূপ হইয়াছে এবং নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে জ্ঞান বিতরণ করিতেছে,ইহা গ্রন্থ-কর্ত্তার কম গৌরবের বিষয় নহে। যখন শিরোরোগের যন্ত্রণা অধিক বোধ হইত, তখন মধ্যে মধ্যে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া পল্লী গ্রামের নির্জ্জন শান্তিময় ভবনে আসিয়া বাস করিতেন। প্রকৃতির স্নিগ্ধ মনোহর সৌন্দর্য্য দর্শনে হৃদয়ে পরম আনন্দানুভব করিতেন এবং যাহাতে জীবনের শেষভাগ প্রকৃতির নিত্য নূতন শোভা সন্দর্শনে অতিবাহিত করিতে পারেন, সেইজন্য প্রকৃতি-সেবক শীঘ্র পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে বালীগ্রামে একটী মনোহর পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে আরম্ভ করেন। উদ্যানটীর দৃশ্য কি মনোমুগ্ধকর! ভাগীরথী কল কল শব্দে একপার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে; নানা জাতীয় পরম রমণীয় অসাধারণ বৃক্ষরাজি শাখায় শাখায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উদ্যানটীকে কি এক স্বর্গীয় পবিত্রতাময় শান্তিময় স্থানে পরিণত করিয়াছে,তাহা বর্ণনাতীত, স্বচক্ষে না দেখিলে কেহই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না। উদ্যানটীতে প্রবেশ করিবামাত্র দর্শক সাংসারিক জ্বালাযন্ত্রণা সমুদয় ভুলিয়া যেন এক সুরম্য শান্তিময় তপোবনে আসিয়া পড়িয়াছেন বলিয়া বোধ করেন। এই উদ্যানটী ছোট হইলেও প্রকৃত প্রকৃতি-উপাসকের আদর্শ রম্য আরামের স্থান। এই মহাত্মার এইস্থানে জীবনের শেষ যবনিকা পতিত হয়। এইখানে তিনি বঙ্গ-ভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের সেবকগণকে চিরদিনের জন্য শোকসাগরে ভাসাইয়া নিত্য শান্তিধামে গমন করেন। বালীগ্রাম! তুমি

ধন্ত, তুমি যে মহাত্মার চরণরজঃ বক্ষে ধারণ করিয়া নিজদেহকে সার্থক করিতে পারিয়াছিলে, সেজন্ত সমস্ত বালীগ্রামবাসী তোমার নিকট এক অপরিশোধনীয় ঋণে ঋণী। বালীগ্রামে অবস্থিতিকালে ইনি কত দুঃস্থ দারিদ্র্য-ভার-ক্লিষ্ট পরিবারবর্গের দুঃখমোচন করিয়াছেন এবং কত অনাথা বিধবার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত মাসিক বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, ইহাঁর বাক্য ও কার্য্যনিষ্ঠা দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইতেন, যখন যাহা করিতেন, অথবা করিতে মনস্থ করিতেন, তখন কদাপি তাহার অন্যথা হইত না। ইহার অসাধারণ ধৈর্য্য ও ক্ষমা গুণ ছিল। কোন পুরাতন কর্ম্মচারী তাঁহার বিশেষ ক্ষতি করিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার দোষ মার্জ্জনা করিতেন। ইনি অনেক গুপ্তদান করিতেন; অনেক দুঃস্থ বালককে বিদ্যাশিক্ষার জন্ত যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। বালী গ্রামে টমসন্‌স্কুল স্থাপন কালে অযাচিত ভাবে দান করেন এবং উত্তরপাড়া ও বালীর স্কুলে সচ্চরিত্র ছাত্রগণকে প্রতি বৎসর উত্তমরূপ পারিতোষিক প্রদান করিবার জন্ত কিঞ্চিৎ অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন।

১২৯৩ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ মহাত্মা ঈশ্বরাভিপ্রেত জীবনের পবিত্রকার্য্য সম্পন্ন করিয়া অমরধামে গমন করেন। চিরদিনের তরে বঙ্গের জ্ঞানসূর্য্য অস্তমিত হইল। বঙ্গভাষা একটী সুসন্তান হারাইলেন। সমগ্র বঙ্গবাসী তাঁহার জন্ত শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। মহাত্মার পবিত্রদেহ ভাগীরথীর পবিত্রতীরে আনীত হইল এবং সুগন্ধচন্দন কাষ্ঠে সুসজ্জিত হইলে সর্ব্বভুক ক্ষণকালের মধ্যে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। কি যুবক, কি বৃদ্ধ, কি ধনী কি নির্ধন, সকলেই দারুণ দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করিয়া সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনাবাক্য-পূর্ণ পত্র লেখেন। এখনও সেই সর্ব্বজন-তৃপ্তিকর শান্তিদায়ী রমণীয় উদ্যান বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত উদ্যান-পালকের অভাবে ইহার সে শ্রী কই? ইহাতে সে স্বর্গীয় শান্তি কই? ইহা এখন দর্শকের মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিয়া দুঃখ আনয়ন করে মাত্র। কোন প্রতিমূর্ত্তি কিম্বা প্রস্তরফলক এরূপ মহৎজীবনের স্মৃতিরক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, কারণ তাহা দ্বারা এরূপ প্রতিভা ও মহত্ত্বের বিকাশ কিরূপে সম্ভবে? প্রত্যেক সদনুষ্ঠানে ও প্রত্যেক লোকহিতকর কার্য্যে ইহাদের স্মৃতি যে সূত্রে বিজড়িত, তাহা কখনও বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। যতদিন বঙ্গভাষার অস্তিত্ব থাকিবে, যতদিন বঙ্গবাসীর নাম ভারত-ইতিহাসে স্থান পাইবে, ততদিন এই মহাত্মার জীবনের মহৎক্রিয়া-কলাপ ও সংগ্রন্থাদি বঙ্গবাসীগণের পবিত্র মানসপটে তাঁহার স্মৃতি উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত করিয়া রাখিবে।*

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

* বালী "শান্তি-কুটির লাইব্রেরী ও অক্ষয় দত্ত-স্মৃতি-সমিতির অনুষ্ঠিত, সন ১৩১৩ সাল, ১লা শ্রাবণের সাম্বৎসরিক স্মৃতিসভায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

মানব সমাজ। (২)

সমাজতত্ত্ব মানবতত্ত্বের এবং মানবতত্ত্ব জীবতত্ত্বের অধীন। জীবতত্ত্ব বিশ্বতত্ত্বের একাংশ মাত্র। এই নিমিত্তই বলিয়াছি যে, বিশ্ব হইতে পৃথক করিলে মানবকে বুঝা যাইবে না।* মানব যুগ যুগান্তর হইতে সমস্ত বিশ্বের ঘাত প্রতিঘাত দেহে ও মনে বহন করিতেছে, জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সকলই তাহাকে নিয়মিত করিতেছে। জলবিন্দু হইতে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত, তৃণ হইতে ভূধর পর্য্যন্ত, বাষ্প হইতে ঝটিকা পর্য্যন্ত, অন্ধকার হইতে আলোক পর্য্যন্ত, উদ্ভিদ হইতে কীট পতঙ্গ, পক্ষী ও পশু পর্য্যন্ত, নীহারিকা হইতে জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যন্ত—সকলেই মানবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে।† কেবল মানবের দেহ নহে, তাহার স্বভাব, তাহার আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতি নীতি সকলই উহাদিগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। নদীবহুল দেশের জনগণের স্বভাব একরূপ, সমুদ্রতীরবাসিগণের অন্যরূপ, এবং পার্ব্বত্যগণের স্বভাব আর একরূপ হইয়া থাকে, এ কথা কাহারও অবিদিত নাই। পার্ব্বত্যগণের মধ্যে কন্যাসন্তান অপেক্ষা পুত্রসন্তান অধিক জন্মে। সমতলবাসীদিগের মধ্যে ইহার বিপরীত হইয়া থাকে। এই এক ঘটনা হইতেই অর্থাৎ স্ত্রী-পুং সংখ্যার ইতর বিশেষ হইতেই সামাজিক আচার ব্যবহার কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়! সংস্কারক সমাজের প্রতি যত অস্ত্রই প্রয়োগ করুন, এ প্রভেদ, এ পরিবর্ত্তন তিনি কোন ক্রমেই নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না। তাই বলিয়াছি, মানবকে ইচ্ছানুরূপ ভাঙ্গা গড়া যায় না। সে জড় ও জীব, দ্বিবিধ প্রকৃতির উত্তরাধিকারী। কেবল বংশপরম্পরা জানিলে মানবকে জানা যাইবে না, সুতরাং মানব সমাজকেও বুঝা যাইবে না।

সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি, সন্দেহ নাই; কিন্তু সমাজ সমষ্টি হইতেও অধিক।* সমাজের যেন নিজেরই একটা জীবন আছে; এই জীবন আদর্শকে লক্ষ্য করে। আদর্শ ব্যবহারিক জগৎ হইতে অনেক উপরে। ব্যক্তি তাহা কখনই লাভ করিতে পারে না; কিন্তু যখনই কোন মহাপুরুষ ঐ আদর্শ লইয়া অবতীর্ণ হন, সমাজ অমনই তাহা আত্মসাৎ করে। তাই সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

মানবের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতেছে "আত্মানং বিদ্ধি" "Know thyself" মানবের বিজ্ঞান বলিতেছে, সকল আলোচনা অপেক্ষা আপন তত্ত্ব অবগত হওয়াই মানবের অধিক প্রয়ো-

* Man is hold to be a part of Nature, a product of the definite and orderly evolution which is universal, a being resulting from and driven by the one great mechanism which we call Nature. Kingdom of Man, p 7.

† The physical conditions of a country, including the climate, the vegetation and the indegenous animals, affect the lives of the human inhabitants of that country. Haddon's Study of Man, Introduction, p xvii.

* Human societary unit is a new synthesis * * *—a unity with distinctive mode of benaviour, with a whole that is more than the sum of its parts; in short with a life and mind of its own. Thomson's Heredity, p 510.

জনীয়। * আপনাকে না চিনিলে, আপনাকে না বুঝিলে মানবের বন্ধ-মুক্তির উপায় নাই। কিন্তু তাহাকে চিনিতে হইলে বিশ্বপ্রকৃতিকে চিনা চাই। তাই বলিয়াছি, মানবকে, মানবসমাজকে চিনা, বুঝা এত কঠিন। সমাজের দুর্ভাগ্য এই যে, যাঁহারা মানবকে চিনিবার চেষ্টা করিবেন, চিরদিনই তাঁহারা সমাজের নেতৃত্বকে তুচ্ছ করিয়া আসিতেছেন। এক দেশে নয়, সর্ব্ব দেশেই এইরূপ, যাহারা প্রকৃতিকে বুঝে না, তাহারা মানবকে বুঝিবে কেমন করিয়া? দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রায় সর্ব্ব দেশেই এই শ্রেণীর অজ্ঞ লোক সমাজের নেতৃত্বপদ অধিকার করিয়া আসিতেছে। † তাই সমাজ মানবের প্রকৃত উদ্দেশ্য, মানব জীবনের প্রকৃত সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না।

মানব জীবনের প্রকৃত সফলতা বন্ধ-মুক্তি। কিন্তু তাহা মানবকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নহে। মানবকে খণ্ড খণ্ড করা যায় না। ব্যক্তিগত মানব, সামাজিক মানব, রাজনৈতিক মানব, ধর্ম্মনৈতিক মানব, অর্থনৈতিক মানব—মানব এরূপ টুকরা টুকরা হইবার বস্তু নহে। পারিবারিক মুক্তি হইল, সামাজিক মুক্তি হইল না; সামাজিক মুক্তি হইলে, রাজনৈতিক মুক্তি হইল না; রাজনৈতিক মুক্তি হইল, ধর্ম্মনৈতিক মুক্তি হইল না—এরূপ হইতেই পারে না। ইহা ব্যক্তির পক্ষেও অসম্ভব, সমাজের পক্ষেও অসম্ভব। ব্যক্তির মুক্তি আত্মজ্ঞানে, সমাজের মুক্তিও আত্মজ্ঞানে। ব্যক্তির সহিত সমাজের সাদৃশ্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তির ন্যায় আত্মজ্ঞানহীন সমাজও মুক্তি লাভ করিতে পারে না। যে সমাজ আপনার গঠন ও শক্তি, আপনার চিরাগত প্রকৃতি ও ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া যায়, জগতে তাহার স্থান নাই। সে ক্রমে ক্রমে মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে, সন্দেহ নাই। যে আপনাকে চিনে, অমৃতের অধিকারী সে-ই হয়, অপরের তাহাতে অধিকার নাই।

সমাজকে প্রকৃতরূপে বুঝা, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সফলতা দান করা, ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায় দুঃসাধ্য। ইহাকে বুঝি অথচ বুঝিও না। নাহংমন্যে সুবেদেতি নোনবেদেতি বেদচ। * সমাজকে বুঝি, ব্যবহারিক হিসাবে। পরমার্থতঃ বুঝিতে হইলে সমাজতত্ত্ব শাস্ত্রই প্রণীত হইতে পারিত না। সকল মানবেরই এক একটা সাধারণ ধর্ম্ম আছে। তাহা লইয়াই একটা অপূর্ণ সমাজ-তত্ত্ব রচিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাকে আজিও প্রকৃত পক্ষে জীব তত্ত্বের সহিত একীভূতও করা হয় নাই। মানব সবই শিখিতে চায়; শিখা অত্যাবশ্যকও। কিন্তু মানব কেবল মানবতত্ত্বই অবহেলা করিয়া আসিতেছে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। সমাজকে বুঝিতে, সমাজের বিধি নিয়ম প্রণয়ন করিতে, ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে, কখনই বিস্মৃত হইলে চলিবে না। সামাজিক ইতর জন্তু হইতে মানব সমাজ পর্য্যন্ত সকলকেই মনোমধ্যে অঙ্কিত রাখিতে হইবে। পিপীলিকা,

* After all we are of more interest to ourselves than any study can be. The study of Man, Introduction, p xxiv.

† Even at the present day, in some civilized states, a body of clerks without any pretence to an education in the knowledge of Nature, headed by gentlemen of title equally ignorant, are intrusted with and handsomely paid and rewarded for the superintendence of the armies, the navies, the agriculture, the public works, the fisheries and even the public education of the states, Kingdom of Man, p 48.

* নিতান্তই বুঝি না যে তাও সত্য নহে। বুঝি যে এমন কথা কার সাধ্য কহে। জানিনা তবু জানি। উপনিষদ গ্রন্থাবলী, পৃঃ৬৯।

মধুমক্ষিকা, ইহারা সমাজবদ্ধ হয় কেন? বহু তীর্থযাত্রী একত্র তীর্থে গমন করে, তাহারাও মানব সমষ্টি। কিন্তু তাহাদিগকে সমাজ বলা যায় না কেন? এই বিষয় চিন্তা করিলেই সমাজের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সমাজবদ্ধ জীব পরস্পরের উদ্দেশ্য সাধন করে; এবং তন্নিমিত্ত একে অন্যের সহায় হয়। সমাজকে অপরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা সমাজ-ভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে দুর্ব্বলকে সবলের হস্ত হইতে উদ্ধার করা, পরস্পরের জীবন-ব্যাপারের অনুকূল কার্য্য করা এবং প্রতিকূল কার্য্য হইতে বিরত হওয়া, এক কথায় পরস্পরের প্রতি সমবেদনা অনুভব করা—ইহাই সমাজের প্রধান লক্ষণ এবং উপকারিতা।* যদি পরস্পরের উদ্দেশ্য সাধন ও সহায়তা না হইল, তবে সমাজের অন্য কোনও অর্থ নাই। এস্থলেও ব্যক্তিকে স্মরণ রাখিতে হইবে, সমাজের প্রত্যেক বিষয়েই ব্যক্তিকে স্মরণ রাখিতে হয়। ব্যক্তির প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাহার জীবনব্যাপারের অনুকূল; সমাজেরও তাহাই হওয়া আবশ্যক। ব্যক্তির কোন এক স্থানে আঘাত লাগিলে সর্ব্বশরীরেই বেদনা অনুভব হইয়া থাকে,সমাজেরও তাহাই হওয়া আবশ্যক। যে ব্যক্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জীবন ব্যাপারের অনুকূল হয় না, সে রুগ্ন; যে ব্যক্তির এক স্থানে আঘাত লাগিলে সর্ব্বত্র বেদনা অনুভূত হয় না, সে পীড়াগ্রস্ত, সে মৃত্যুমুখে পতিত। সমাজেরও তাহাই। যে সমাজে এক ব্যক্তির বিপদে অন্যান্য ব্যক্তিগণ বেদনা অনুভব করে না, যেখানে সমাজের এক অংশ সমস্ত সমাজের উপকারে আসে না,যে সমাজ রুগ্ন, সে সমাজ মৃত্যুমুখে পতিত।

* Ency. Brit., vol 8, p 620.

তাহাকে সুস্থ অবস্থায় আনিতে পারিলে রক্ষা হইবে, নচেৎ নহে।

মানব সামাজিক জীব। সামাজিকতার ফল যেমন পরস্পরের নিকট হইতে উপকার লাভ, তেমনই বিবিধ মনোবৃত্তির উন্নতি সাধন। যে সমস্ত সদ্গুণ মানবের হৃদয়ে দেবত্ব আনিয়াছে, তাহা সামাজিকতারই ফল। আত্মরক্ষা, অপত্যরক্ষা, সমাজের প্রবর্ত্তক কারণ; এবং বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি, ন্যায় ও কর্ত্তব্যজ্ঞান, সমদর্শীতা ও স্বার্থত্যাগ, তৃপ্তি ও সুখ বৃদ্ধি, সমাজ-বন্ধন হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।† এস্থলে ব্যক্তির বাল্যজীবন হইতে মানবের প্রাথমিক অবস্থা অনুমিত হইতে পারে। বালক কেবল আপনাকেই বুঝে, তাহার আপনারটী ষোল আনা বহাল থাকা চাই; বালক বড়ই স্বার্থপর। কিন্তু যখন ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে সেই বালক নানা জনের সংসর্গে আসে, তখন পরার্থের নিকট স্বার্থকে বলী দিতে ক্রমে অভ্যস্ত হয়। সামাজিক মানবও তদ্রূপ। কেবল স্বার্থ দেখিলে সমাজ চলেই না। সামাজিক ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিগণ পরার্থ দেখিতে বাধ্য।

বলিয়াছি, মানব সমস্ত জীবের উত্তরাধিকারী। তাই অসামাজিক মানবেতর ধর্ম্ম সকলও মানবে বর্ত্তমান আছে। উন্নতবৃত্তি সকল তাহাদিগকে দমিত রাখিতে পারে; কিন্তু তাহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট করিতে পারে না। তাই সমাজবদ্ধ মানবও কখন কখন অসামাজিক স্বার্থসেবী ভাব কর্ত্তৃক চালিত হইয়া সমাজের এবং ব্যক্তির অনিষ্ট করিয়া থাকে। এইরূপে সামাজিক অপরাধ উৎপন্ন হয়। ইহা মানব হৃদয়ে নিদ্রিত পশুভাবের পুনরাবৃত্তি। এই নিমি-

† Ency. Brit. p 619.

ত্তই অপরাধিগণকে অধ্যাপক টমসন অতীত কালের পুনরাবৃত্তি বলিয়াছেন। * সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বকালের ভাব অর্থাৎ স্বার্থ, আত্ম-সেবা ইহাদিগকে অদ্যাপি পরিচালিত করে। এই অবস্থাতেই সামাজিক অবনতি। দণ্ড ইহার একমাত্র প্রতিরোধক নহে, অথবা প্রধান প্রতিরোধকও নহে। এ কথা পরে বুঝা যাইবে।

ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ বাল্য, যৌবন, জরা ও মৃত্যু আছে, সামাজিক জীবনেও তাহাই। ব্যক্তির জীবনে যেমন কর্ম্মই এক মাত্র লক্ষণ, সামাজিক জীবনেও তাহাই। কর্ম্মের ভাব জীববিবর্ত্তনের সহিত ইতর প্রাণীদিগের নিকট হইতে মানব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাই বা বলি কেন? ব্যক্ত-চৈতন্যের তো কর্ম্মই একমাত্র লক্ষণ; কর্ম্ম জীবনের সহজাত ব্যক্তি। তাই অধ্যাপক লোয়েব্ বলিতেছেন, "One of the most important instincts is usually not even recognized as such, namely the instinct of workmanship." * অর্থাৎ কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি মানবের সহজাত ধর্ম্ম। হিন্দুর গীতাও এই শিক্ষা দিতেছে। ব্যক্তি এবং সমাজের উভয়েরই লক্ষণ ও পরিণাম কর্ম্মে। সামাজিকের পরিণাম পরস্পরের সুখকর কর্ম্মে, সমাজ রক্ষার কর্ম্মে। তাহার বিপরীত ব্যক্তির ন্যায় সমাজের মৃত্যু উপস্থিত হয়। যেমন অপরে ব্যক্তির কর্ম্ম কাড়িয়া লইতে পারে, তেমনই সমাজের কর্ম্মও কাড়িয়া লইতে পারে। এইরূপ হইলেই উভয়েরই জীবনের আশা চলিয়া যায়।

শ্রীশশধর রায়।

* Are not many criminals mere anachronism?—People out of time or out of place, who require not incarceration or worse......Heredity 1908 p, 531.

* Loeb's comparative physiology of the brain, p 197.

বাঙ্গালা ভাষা।

"ভাষাতত্ত্বে সুপণ্ডিত" শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় সম্প্রতি 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র অতিরিক্ত সংখ্যায় সুদীর্ঘ প্রবন্ধে 'বাঙ্গালা ভাষা'র আলোচনা করিয়াছেন। এরূপ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের পক্ষেই শোভা পায়। প্রসঙ্গান্তরে শব্দ বিশেষের মূলতত্ত্বানুশীলন কল্পে তাঁহার মীমাংসিত মন্তব্য সম্বন্ধে বর্ষীয়ান্ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই 'অজ্ঞতা' স্বীকার করিয়াছেন।* সে অবস্থায় 'বাঙ্গালা ভাষা'-রূপ গুরুতর বিষয়ে কোন কথা বলিতে যাওয়া আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত বাতুলতা মাত্র। তবে, পণ্ডিতেরা যেখানে পশ্চাৎপদ হয়েন, মূর্খ সেস্থানে আগুয়ান হইতে সঙ্কোচ বোধ করেনা; তাই, রায় মহাশয়ের আলোচিত প্রবন্ধ উপলক্ষ করিয়া আমরা দুই একটী কথা বলিতে অগ্রসর হইয়াছি। তিনি "বর্ণ-বিন্যাসের ও বর্ণের রূপের যে নূতন রীতি" প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, স্বয়ং সাহিত্য-পরিষৎ তৎসম্বন্ধে "কোন মতামত এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই"; আমরাও সে পক্ষে নীরব রহিলাম।

"বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা" আলোচনা †

* প্রবাসী। ৮ম ভাগ। ৯ম সংখ্যা।

† নব্যভারত। ২৪শ খণ্ড। ৩য় সংখ্যা।

উপলক্ষে আমাদিগের স্মরণ হয়, বহুদিন পূর্ব্বে 'নব্যভারত' আশা করিয়াছিলেন, বঙ্গভাষাই কালক্রমে নব্যভারতের ভাষা হইবে। স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও, রায় মহাশয়ের প্রবন্ধেও সেই আশার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবকের পক্ষে ইহা সামান্য আনন্দের বিষয় নহে। কিন্তু এই সার্ব্বজনীনতা সংস্থাপনের জন্য বঙ্গভাষাকে ভারতীয় অন্যান্য ভাষার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, তাই রায় মহাশয় বলিয়াছেন, "বাঙ্গালা ভাষাকে লড়াই করিবার এবং লড়াইতে জয়ী করিবার জোগাড় আবশ্যক।" জোগাড়ের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিতেও তিনি ত্রুটি করেন নাই;—"লিখিত ও কথিত ভাষার অতিরিক্ত প্রভেদ" দূর করা এই ব্যবস্থার অন্যতম। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম, "বর্ত্তমান বাঙ্গালা লেখকগণের মধ্যে একদল সংস্কৃতশব্দ-বহুল ও অন্যদল গ্রাম্য শব্দ বহুল ভাষাগঠনের পক্ষপাতী।" রায় মহাশয় তাঁহাদিগের মধ্যে কোন্ দলভুক্ত, ঠিক বুঝা যায় না; তবে ইহা বুঝা যায় যে, তিনি কোন দলেরই চরমপন্থী নহেন—প্রত্যুত, উভয়েরই মধ্যপন্থী। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "সকল বিষয়েই সামঞ্জস্য আবশ্যক।" বঙ্গভাষার গঠন কল্পে এই সামঞ্জস্য সাধনের জন্যই তিনি অবশ্য "লিখিত ও কথিত ভাষার অতিরিক্ত প্রভেদ" ঘুচাইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

লিখিত ও কথিত ভাষায় প্রভেদের অতিরেক দূর করাই তাঁহার অভিপ্রেত; নতুবা, উভয়ের বিভিন্নতা একেবারে দূর করা সঙ্গত বা সম্ভব কিনা—সন্দেহের বিষয়। কোন দেশের কোন ভাষার লিখিত ও কথিত রূপ অবিকল একবিধ বলিয়া বোধ হয় না। ভারতবর্ষেইরই কথিত 'প্রাকৃত' কি লিখিতে 'সংস্কৃত' হয় নাই?—Yorkshire এর গ্রাম্যভাষা (patois) কি literary English এ ব্যবহৃত হয়?—ভট্টাচার্য্য ঠাকুরাণীর ভাষা গৃহস্থালির "নানা কাজে" যথেষ্ট উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু বেদান্তের জ্ঞানকাণ্ড ব্যাখ্যাকালে বা মেঘদূতের রসমাধুর্য্য আলোচনার সময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পক্ষেও সেই ভাষা ব্যবহার্য্য কিনা, তৎপক্ষে মতভেদ থাকা অসম্ভব নহে। উল্লিখিত patios অর্থেই, বোধ হয়, রায় মহাশয় 'ভাখা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যদি আমাদের অনুমান ঠিক হয়, তবে লিখিত ভাষায় ভাখার ন্যূনতা সাধন সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় বটে। বর্ত্তমান লিখিত বঙ্গভাষাতেও তাহার ন্যূনতার লক্ষণ ও উপকারিতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহট্টের বিপিন, চট্টগ্রামের নবীন, ঢাকার কালীপ্রসন্ন, ফরিদপুরের দেবীপ্রসন্ন, বাঁকুড়ার রামানন্দ, বর্দ্ধমানের পঞ্চানন্দ, স্ব স্ব গ্রাম্যভাষায় কথা কহিলে পরস্পর বিলক্ষণ বিসদৃশ বোধ হইতে পারে; কিন্তু তাঁহাদিগের সকলের লিখিত ভাষায়, একই রূপ, একই ছাঁদ, প্রতীয়মান হয়—তাহাতে তাঁহাদিগকে রাজধানীর সন্নিহিত অক্ষয়চন্দ্র ও চন্দ্রনাথের সহিত একই বঙ্গমাতার সুসন্তান বলিয়া চিনিয়া লইতে কোন সন্দেহ জন্মে না।

লড়া'য়ে জয়ী করিবার জন্য জোগাড়ের মধ্যে, রায় মহাশয়ের ব্যবস্থানুসারে, "বাঙ্গালা ভাষা শেখা সহজ করিতে হইবে, উহাকে সুশ্রী ও অন্যের লোভনীয় করিতে হইবে।" ইহা অপেক্ষা সুব্যবস্থা আর হইতে পারে না। কিন্তু ভাষার ওজস্বিতা ব্যতিরেকে উহার পারিপাট্য সাধন ও অন্যের চিত্তাকর্ষণ করা সম্ভব বোধ হয় না। সম্প্রতি মেঘদূতের

কোন পদ্যানুবাদ সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন, অনুবাদকের "ভাষা ভাল, ব্যাখ্যাও সরল হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার ছন্দ এবং শব্দ নির্ব্বাচনের ফলে মেঘের গুরুগম্ভীর ধ্বনি বড় শুনিতে পাওয়া যায় না।" ইহা দ্বারা বুঝা যায়, গুরুগম্ভীর ধ্বনির অভাবে, নির্ভুল ও সরল ভাষা সত্ত্বেও, বক্ষ্যমান মেঘ মজুমদার মহাশয়ের 'লোভনীয়' হয় নাই। অতএব, ভাষার পারিপাট্য সাধন কল্পে যথোপযোগী সুন্দর শব্দ নির্ব্বাচনকুশলতা আবশ্যক। এই শব্দনির্ব্বাচনে ভট্টাচার্য্য কর্ত্তার বা তাঁহার গৃহিণীর অনুসরণ করিব, ইহাই সমস্যা। রায় মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন, "আমাদের মত খুঁট-আখরেয়র নিস্তার কোনদিকেই নাই।" তবে এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি, কর্ত্তাগৃহিণী উভয়ের ভাষারই ক্রিয়াপদগুলি প্রায় এক; অতএব, গৃহিণীর ভাষা 'বাঙ্গালা' পদবাচ্য হইলে, কর্ত্তার ভাষাকেও তৎশ্রেণীস্থ মনে করিয়া একের ভাষা 'আটপহুরিয়া' ও অন্যের ভাষা 'পোষাকি' রূপে ব্যবহার করায় বিশেষ প্রত্যবায়ের আশঙ্কা দেখা যায় না। তবে, সকল বিষয়ের ন্যায়, এ বিষয়েও সামঞ্জস্য আবশ্যক; কথায় কথায় কর্ত্তার "নবজলধর পটলসংযোগে" যেমন শ্রুতিকটু, সেইরূপ সময়ে অসময়ে গৃহিণীর "হেঁশেলে ব্যন্নন সম্বরা"ও অরুচিকর। গৃহিণীর প্রত্যেক শব্দের গোড়ায় "সংস্কৃতের ঘ্রাণ আছে" বলিয়াই যে তাহা অবাধে পণ্ডিতসভাতেও চালাইতে হইবে, অথবা কর্ত্তার "কণ্ঠে দেবভাষা" বিরাজমানা বলিয়াই যে গৃহাঙ্গনেও তদীয় ঘরট্টপেষকের ঘর্ঘরধ্বনিতে কর্ণপটহ নিনাদিত করিতে হইবে;—এরূপ নিয়ম বাঞ্ছনীয় নহে।

এস্থলে আর একটী বিষয়ের বিবেচনা আবশ্যক। কর্ত্তার ভাষা বা গৃহিণীর ভাষা—যাহাই অবলম্বনীয় বলিয়া স্থির হউক, তদনুসারেই চলা উচিত; কিন্তু উভয়ের 'খিচুড়ি' বাঞ্ছনীয় কি না?—স্বর্গীয় সিংহ মহাশয়ের অনুবাদিত মহাভারতের ভাষার সঙ্গে হুতুমী ভাষার সংযোগ সঙ্গত কি না? আমরা যে মুহূর্ত্তে দেখি, "নবপ্রশস্তি *** স্নায়ুচক্রটাকে উত্তরোত্তর বুভুক্ষু বলিয়া" তুলে, তাহার পর মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাই, "ভোগের স্পৃহা অল্প সানায় না।"* এই "সানায়"টী, বোধ হয়, রায় মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট একটী 'ভাখা,' "বুভুক্ষু স্নায়ুচক্র" বা "ভোগের স্পৃহা"র সহিত উহার সংযোগ তাঁহার বা অন্য কোন ভাষা-সংস্কারকের অনুমোদিত কি না, জানিতে আমাদিগের কৌতূহল জন্মে।

"বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা" শীর্ষক পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে আমরা লিখিয়াছিলাম, সংস্কৃত ও ইংরাজি এই উভয় ভাষার সাহায্যে বাঙ্গালা রচনার অনুশীলন বাঞ্ছনীয়। রায় মহাশয়ের ব্যবস্থানুসারে বাঙ্গালী ভিন্ন অন্যের পক্ষেও বাঙ্গালা ভাষা শেখা সহজ করিতে হইলে সেই উপায়ই প্রকৃষ্ট বোধ হয়। আমরা অবশ্য সভামণ্ডপে ব্যবহার্য্য, সুশিক্ষিতের পাঠ্য, স্থায়ী সাহিত্যের উপযোগী, ভাষার কথাই বলিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানে ঐ দুই ভাষা শিক্ষা বাঙ্গালার ছাত্রগণের পক্ষে যেরূপ প্রায় অপরিহার্য্য, হিন্দু প্রধান ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের ছাত্রগণের পক্ষেও প্রায় তদ্রূপ। অতএব, কেবল বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের যথোচিত জ্ঞান লাভ করিলেই, সকল প্রদেশের অন্ততঃ হিন্দু শিক্ষানবিশের পক্ষে ইংরাজি ও সংস্কৃতের সাহায্য-গঠিত বঙ্গভাষা শিক্ষার পথ সুগম হওয়া সম্ভব, এবং তদ্দ্বারা

* প্রবাসী। ৬ষ্ঠ ভাগ। ৯ম সংখ্যা। ৫০৩ পৃষ্ঠা।

বঙ্গভাষাই কালে সমগ্র নব্যভারতের ভাষা হওয়ার আশাও নিতান্ত আকাশকুসুম বোধ হয় না। কিন্তু, বলা বাহুল্য, এরূপ ভাষা সর্ব্বসাধারণের উপযোগী হইবে না,—হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে। রায় মহাশয় যেরূপ "কারু ও কলাজীবী"র বা আদালতের মওয়াক্কেলের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 'ভাখা' নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ গৃহস্থালির 'ভাখা' বা শ্রমজীবীর 'ভাখা'য় পরস্পর ন্যূনাধিক পার্থক্য থাকাই সম্ভব; বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার কল্পে সে সমস্ত 'ভাখা'র সমন্বয় বা বিলোপ সাধন সম্ভব কি না, পক্ষান্তরে বিষয় বিশেষের পরিভাষা সংগ্রহে সঙ্কলনকর্ত্তাগণের ধৈর্য্য ও পাণ্ডিত্য প্রশংসনীয় হইলেও, তাহা বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধনোপযোগী প্রকৃত উপাদান কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। রায় মহাশয়ের বোম্বাই ও ত্রিবাঙ্কুরবাসী বন্ধুদ্বয় কিরূপ বাঙ্গালা শিখিবার উপযোগী পুস্তক পাইতে বা প্রণালী জানিতে চাহিয়াছিলেন, বলিতে পারি না; কিন্তু নৈশ বিদ্যালয়ে মাত্র পঠন, লিখন ও গণিতের মূলসূত্র চারিটী শিক্ষাই যাহার চরম প্রয়োজন, তাহার জন্য, আর রায় মহাশয়ের ন্যায় ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের জন্য,একই ভাষার প্রচলন সমীচীন বোধ হয় না।

রায় মহাশয় আর একটী সুন্দর কথা বলিয়াছেন,—"সামাজিক শাসনের ন্যায় ভাষার শাসন সাধারণের পক্ষে মঙ্গলময়।" দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা ভাষার কোন শাসক নাই, তাই সহজেই উহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া পড়ে। বাল্যকালে কোন কবিতাপ্রিয় বৈয়াকরণের বিধান শুনিয়াছিলাম—

'ঋ-র-ষ'এর পর যদি দন্ত্য নকার থাকে।
কচাৎ ক'রে কাটবে মাথা—কোন্ দাদা তা'র রাখে?'

এখনও অনেক বিষয়ে ঐরূপ কঠোর শাসনের প্রয়োজন হইয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য একদিকে ব্যাকরণ, কোষ ইত্যাদি শাস্ত্রের অসদ্ভাব, অন্যদিকে শাসনদণ্ড পরিচালকের ঔদাসীন্য, দেখিতে পাওয়া যায়। সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মগুণে আমরা ইংরাজি পদপ্রত্যয়াদির সুব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া পড়ি এবং তাহার কোনরূপ ব্যতিক্রম 'বাধতি'র ন্যায় কর্ণে বাধে; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার সেরূপ স্থলে আমরা সকলেই স্বেচ্ছাধীন। বক্ষ্যমান প্রবন্ধোপলক্ষেই রায় মহাশয় যেখানে লিখিলেন 'লড়াইতে' আমাদের ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিও সেস্থলে "লড়ায়ে" লিখিতে সঙ্কোচ বোধ করিল না, পরন্তু অপর একজন পণ্ডিত ব্যক্তি তিন পঙ্‌ক্তির মধ্যে একস্থানে লিখিলেন, পথে অন্যত্র লিখিলেন, "পথেতে।"† ইহাদিগের মধ্যে কোন্‌টা সুষ্ঠু প্রয়োগ, কে শাসন করিবে? ইংরাজি assassination শব্দে একটা s কম করিলে পাতকগ্রস্ত হইতে হয়,কিন্তু বাঙ্গালায় "উশৃঙ্খলতা"‡ লিখিয়া অনায়াসে অব্যাহতি পাওয়া যায়। "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত" নামক দেশপূজ্য গ্রন্থেও আমরা 'বাহ্যিক' 'একত্রে,' 'পরিত্যজ্য,' 'আয়ত্তাধীন,' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি,¶—এখনও 'অপরিত্যজ্য,' †† 'মূল্যাধিক্যতা' ‡‡ প্রভৃতি শব্দ অবাধে চলিতে দেখিতেছি। ইহার মধ্যে কোন্ ব্যবহার প্রশস্ত, কোন্‌টা অপ্রশস্ত—কোন্ কথা শুদ্ধ, কোন্ কথা ব্যাকরণ-দুষ্ট—বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার সূত্রে কি সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন নাই? কিছুদিন গত

---

† নব্যভারত। ২৬শ খণ্ড। ৬ষ্ঠ সংখ্যা। ২০৫ পৃষ্ঠা।
‡ ঐ ঐ ৭ম ৩৪৩ "
¶ সাহিত্য-সেবক ২য় ভাগ ১১শ ৩২৯ "
§ নব্যভারত ২৬শ খণ্ড ৩য় ১২৮ "
†† ঐ ঐ ২য় ৯০

হইল, শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় এরূপ স্থলে একটু শাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,কিন্তু কেহই, বোধ হয়, তাঁহার সে শাসন মানিল না, তিনিও তজ্জন্য উদ্যমে ভঙ্গ দিলেন। সাময়িক পত্রের সম্পাদক মহাশয়রা অনায়াসে এরূপ শাসন চালাইতে পারেন, কিন্তু সে পক্ষে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। "প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী" হইতে পারেন, কিন্তু প্রবন্ধের ভাষাগত অশুদ্ধি সংশোধনের জন্য কি সম্পাদকগণের দায়িত্ব গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে? বাঙ্গালার সুপ্রণালী-সঙ্গত ব্যাকরণ ও কোষ প্রকাশের জন্য সাহিত্য-পরিষৎ বহুদিন হইতে উপাদান সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন, কিন্তু ব্যক্তিগত মত-পার্থক্যে, বোধ হয়, সে চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হওয়ার পক্ষে বিলম্ব ঘটিতেছে। এরূপ মতভেদ বঙ্গভাষার দীর্ঘ-জীবনসূচক বলিয়া আনন্দকর হইতে পারে, কিন্তু উহাতে ভাষার প্রকৃত সংস্কার সুদূরপরাহত বলিয়া আশঙ্কা জন্মে।

উপসংহারে, "লিখিত ও কথিত ভাষার অতিরিক্ত প্রভেদ" ঘুচাইবার জন্য, রায় মহাশয় দুই পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"এক পথ ধ্বনিসংবাদী বানান, অন্য পথ বানান-সংবাদী উচ্চারণ।" বহুদিন হইল,"বঙ্গীয় বর্ণমালা"র* আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছিলাম, "বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় সংস্কৃত শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় বলিয়াই, উচ্চারণের শক্তি না থাকিলেও, আমাদিগকে অনর্থক অনেকগুলি বর্ণ অদ্যাপি বহন করিতে হইতেছে। নচেৎ, ধ্বনির দ্যোতক চিহ্ন হিসাবে বর্ণের বাস্তব প্রয়োজন স্বীকার করিলে, বঙ্গভাষা হইতে অনেক বর্ণ অনায়াসে বর্জ্জন করা চলিত। * * * অধিকাংশ স্থলেই ঙ'র কার্য্য ং দ্বারা এবং ঞ'র কার্য্য ণ দ্বারা সাধিত হইতে পারে; পরন্তু দ্বিবিধ জ ন ও ব, ত্রিবিধ স ও ক্ষকারের আদৌ প্রয়োজন দেখা যায় না,—হ্ এরও বড় আবশ্যকতা বোধ হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উচ্চারণ করিতে পারি বা না পারি, কোন সংস্কৃত শব্দের বর্ণমালায় স্থান দিতে হইয়াছে।" মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় উল্লিখিত মন্তব্যে আমাদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ বিরূপ হইয়াছিলেন। এখন রায় মহাশয়ের নির্ব্বাচিত "কোন্ পথে কত দূর যাইতে পারা যায়" জানিবার জন্য ও বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহাতে কি বলেন, শুনিবার জন্য, আমরা উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

* ভারতী। ২৫শ ভাগ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

কমলাকান্ত কথা-লহরী।

প্রঃ—ইংরাজেরা এই সুদীর্ঘকাল যে আমাদের দেশে রাজত্ব করিতেছেন, তাহার ফলে উহাদের লাভ লোক্‌সান কতদূর দাঁড়াইয়াছে?

উঃ—ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যাধিকারী হইয়া উহারা যে পার্থিব ঐশ্বর্য্যে বিলক্ষণ লাভবান হইয়াছেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ক্লাইব যখন প্রথম কলিকাতায় পদার্পণ করেন, তখন তাঁহার কথামত বাঙ্গালায়

তখনকার রাজধানী মুরসিদাবাদ লণ্ডন অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, আর এখন লণ্ডন পৃথিবীর মধ্যে প্রধান ধনরত্নপূর্ণা নগরী। পুরাতন কথা দূরে থাকুক, মোগল সাম্রাজ্যের সময় যে সকল ইউরোপীয় পর্য্যটক ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা একমুখে স্বীকার করিয়া যান যে, ভারতের ন্যায় সমৃদ্ধ রাজ্য আর কোথাও দেখা যায় নাই। এ প্রকার ধনধান্যভরা দেশ পৃথিবীতে আর একটী ছিল কিনা সন্দেহ। মেকলে সাহেব সত্য সত্যই বলিয়াছেন :—

"The empire which Baber and his Moguls reared in the sixteenth century was long one of the most extensive and splendid in the world. In no European kingdom was so large a population subject to a single prince, or so large a revenue poured into the treasury. The beauty and magnificence of the buildings erected by the sovereigns of Hindostan amazed even travellers who had seen St. Peter's. The innumerable retinues and gorgeous decorations which surrounded the throne of Delhi dazzled even eyes which were accustomed to the pomp of Versailles. Some of the great viceroys who held their posts by virtue of commissions from the Mogul ruled as many subjects as the king of France or the Emperor of Germany. Even the deputies of these deputies might well rank, as to extent of territory and amount of revenue, with the Grand Duke of Tuscany or the Elector of Saxony":—Macaulay's Lord Clive."

অর্থাৎ একজন ভূপতির অধীনে এরূপ বিপুলসংখ্যক লোক পৃথিবীর আর কুত্রাপি ছিল না; এবং এদেশের সুরম্য হর্ম্ম্যাদি ও রাজধানীর বাদশাহী কাণ্ডকারখানা, লোক লস্কর, শ্রীসৌন্দর্য্য, জাঁকজমক অতুলনীয় বলিয়া পরিব্রাজকগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। দিল্লীশ্বরের প্রাদেশিক সুবাদারগণের প্রজাসংখ্যা ফরাসীরাজ বা জর্ম্মাণ সম্রাটের সমান ছিল, এবং ইহাদের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তারা টাস্কেনি বা সাক্সনির অধীশ্বরের সমপরিমাণ রাজত্ব ও রাজস্ব উপভোগ করিতেন।

আর, যে পোড়াদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া আজ আমরা এত ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, নানা প্রকারে দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তাহার বর্ণনাকালে উক্ত শ্বেতাঙ্গ মহাত্মা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয় যেন কোন বাজীকরের যাদুমন্ত্রে সে সব সুখসমৃদ্ধি কর্পূরের মত উড়িয়া বায়ুগত হইয়াছে, শূন্য ভাণ্ড মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি বলেন :—

"Of the provinces which had been subject to the house of Tamerlane the wealthiest was Bengal. No part of India possessed such natural advantages both for agriculture and for commerce. * * The rice fields yield an increase such as is elsewhere unknown. Spices, sugar, vegetable oils, are produced with marvellous exuberance. The rivers afford an inexhaustible supply of fish. * * * Bengal was known through the East as the garden of Eden, as the rich kingdom. * * * * Distant provinces were nourished from the overflowing of its granaries, and the noble ladies of London and Paris were clothed in the delicate produce of its looms."—Ibid.

অর্থাৎ তৈমুর বংশের করতলস্থ প্রদেশ সমূহের মধ্যে বাঙ্গালা সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট ;—কৃষিবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে প্রকৃতি ইহার সহায়। ভাগীরথী প্রসাদাৎ বঙ্গদেশের ভূমি সুজলা সুফলা সর্ব্বশস্যাঢ্যা। জমির অনুপম উর্ব্বরতার সঙ্গে ইহার নদীসমূহ বিধাতা কর্ত্তৃক অফুরন্ত মীনভাণ্ডার হওয়ায়, ধান্যাদি, মৎস্য, বহুবিধ তৈল, মশলা, শর্করা

প্রভৃতি অধিবাসীগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত। বঙ্গের বিভব প্রাচ্য জগতে প্রসিদ্ধ ছিল। সুদূর দেশসমূহ ইহার উদ্বৃত্ত ব্রীহিযবাদি দ্বারা পোষিত হইত; এবং লণ্ডন ও পারিসের সম্ভ্রান্ত যোষিদ্গণের অঙ্গসৌষ্ঠবার্থ এখানকার জগদ্বিখ্যাত তন্তুবায় সম্প্রদায় বহুমূল্য সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি যোগাইতেন।

এহেন রত্নগর্ভা ভূভাগ এই দীর্ঘকাল যাঁহাদের করায়ত্ত রহিয়াছে, তাঁহারা যে বিপুল বিভবের অধিকার হেতু বুকের ছাতি ফুলাইয়া আর সকলকে তৃণজ্ঞান করিয়া চলিবেন, ইহা আর বেশী কথা কি? ঐহিক সুখ সম্ভোগে তাঁহারা যে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় হইয়াছেন, ইহাতে কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায় না। পরন্তু অর্থ যে সর্ব্ববিধ অনর্থের মূল, যেখানে ধনরাশি বিদ্যমান, সেইখানেই কলি-রাজের মাহাত্ম্য প্রকাশ, ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই; এবং ইহারা যে বর্ত্তমান সময়ে তাহার জীবন্ত সাক্ষীরূপে জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, তাহা সংসারের বুঝিতে বাকী নাই। পার্থিব ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে ইংরাজ যে ক্রমে মানব জীবনের গুরুতর বিষয় সমূহে অবনত হইতেছেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে কম ক্ষতির কথা নহে। এই হতভাগা দেশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিবন্ধন তাঁহারা যে মনুষ্যোচিত উচ্চ গুণ সমূহ হারাইতেছেন, তাহা দেখাই-তেছি। প্রথমঃ—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলেন, পদার্থ মাত্রেই অন্য পদার্থে শক্তি বিকীর্ণ করে, এবং অন্য পদার্থ হইতে শক্তি গ্রহণ করিয়া থাকে। শীতোষ্ণ বস্তুদ্বয় একত্র থাকিলে উক্ত নিয়মানুযায়ী পরস্পরের ভাব বিনিময় দ্বারা উভয়ে সমগুণাক্রান্ত হয়। তদ্রূপ সংস্রবের দোষগুণে মানুষ যে ক্রমে অবনত-উন্নত হইতে থাকে, তাহা বোধ হয়, বেশী কথার দ্বারা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। আমরা সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপ্রাণ, মহানুভব আর্য্য শূরবীরগণের বংশাবতংশ বলিয়া গৌরব করিতে পারি, রামায়ণ মহাভারত বেদোপ-নিষৎ প্রভৃতি ভুবনবিখ্যাত গ্রন্থনিচয়ের প্রণেতারা আমাদের নিকট কুটুম্ব হইতে পারেন, ব্যাস, শুক, নারদাদি পুণ্যশ্লোক মহর্ষিবৃন্দের সহিত আমাদের রক্তের সম্বন্ধ আছে বলিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতে পারি; পরন্তু এই সুদীর্ঘকাল জ্ঞানধর্ম্ম বিবর্জ্জিত অবস্থায় নানাজাতীয় বেদাচার-বিহীন ইহা সর্ব্বস্ববাদী ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ লোকের দাসত্ব করিতে করিতে আমরা যে দেহাত্মবোধী অন্তঃসার-শূন্য হীনমতি নীচাশয় হইয়া পড়িয়াছি, তাহা অস্বীকার করিবার ত কোনরূপ উপায় দেখি না। আমাদের মত সাহসহীন ভীত-স্বভাব কাপুরুষগণ যে নানাবিধ অপকৃষ্ট গুণের আধার হইবে, তাহা প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই। নিষ্ঠা, প্রেম, অর্জ্জাবাদি যেমন বীররাচিত গুণ, জঘন্য স্বার্থপরতা, অসত্যাচরণ, কৌটিল্যাদি তেমনি হীনবীর্য্য ভীরুকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের সহিত সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে গিয়া গুণবান ব্যক্তিগণ যে ক্রমে নিকৃষ্টের মত দোষগ্রস্ত হইবেন, তাহা আশ্চ-র্য্যের বিষয় নহে। অপরন্তু বলহীনের ত্রুটি দুর্ব্বলতা হেতু ক্ষমবানের যদি ধৈর্য্য-চ্যুতি হয়, তাহা হইলে তেজীয়ানের ক্রমান্বয়ে ক্রোধ, মোহ, স্মৃতি-বিভ্রম ও বুদ্ধিনাশ হইবার কথা। দ্বিতীয়,—পদাশ্রিত অসহায় মেষবৎ জীবগণের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহারের অবাধ ক্ষমতা ও অবকাশ পাইয়া কেহ নিজেকে ঠিক রাখিতে পারে না। নিয়ত চিত্তবিকারের

হেতু দুর্জ্জয় প্রলোভনাদি সম্মুখে উপস্থিত হইলেও চিরকাল তাহার শক্তি অতিক্রম করিয়া অবিকৃতচিত্তে চলিতে পারা সংসারী বদ্ধ জীবের কাজ নয়; কেবল মাত্র শমদমতিতিক্ষাদি অমূল্য সম্পত্তির অধিকারী পূতাত্মা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ ব্যতীত সাধারণ মনুষ্যের উহা একান্ত সাধ্যাতীত বলিতে হইবে।

অধুনা বৃটিশজাতির যে দৈহিক ও মানসিক অবনতি পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা তাঁহাদের মধ্যে চক্ষুষ্মাণ ব্যক্তিগণ বেশ দেখিতে পাইতেছেন। লণ্ডনের দুইখানি পত্রিকায় অল্পদিন হইল যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, শ্রবণ কর :—

"Undeniable statistics are available to prove the serious physical decline in the race during the last fifty years through the migration to town from country-life. These statistics show that we are rapidly becoming a shorter and lighter race, but, to an even more serious extent a narrow-chested one as well."

"This deplorable decline in the physical power of the British people has its concomitant evils—falling birth-rate, greater infant mortality owing to congenital defects and premature child-birth."

Graphic.

অর্থাৎ, বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে (রাজ্যের সমৃদ্ধির সঙ্গে) বৃটনের বিস্তর লোক পল্লিগ্রাম ত্যাগ করত নগরবাসী হওয়া হেতু দেহ খর্ব্ব ও লঘু এবং বক্ষঃস্থল সংকীর্ণ হইতেছে। ইহার ফলে জন্ম সংখ্যার হ্রাস, শৈশবে-মৃত্যু বৃদ্ধি ও অপুষ্ট শিশুর জন্ম হইতেছে। আর একখানি মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশঃ—লর্ড মিথ্ (Lord Meath) প্রশ্ন করিতেছেন ও নিজে উত্তর দিতেছেন,—

"Are we losing grit as a Nation —Yes."

"Have we the grit of our forefathers ?—No."

grit শব্দের অর্থ তিনি বলেন,—

"The virile spirit which makes light of pain and physical discomfort, and rejoices in the consciousness of victory over adverse circumstances, and which regards the performance of duty, however difficult and distasteful, as one of the supreme virtues of all true men and women."

অর্থাৎ যে হৃদয়ের বল ও আন্তরিক তেজের প্রভাবে মানুষ কায়িক ও মানসিক দুঃখ ক্লেশকে অগ্রাহ্য করতঃ প্রতিকূল অবস্থার উপর জয়লাভ সহকারে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে, এবং হাজার কটু ও কঠোর হইলেও কর্ত্তব্যপালনে কখন পরাঙ্মুখ হয় না।

ইংরাজ মহিলাবৃন্দ সম্বন্ধে উক্ত লর্ড বলেন ;—

"Some girls decline to marry unless provided with luxury unheard of by their mothers."

"Some marry a man for his money or position, and then refuse to live with him."

"Mothers are not found so often in the nursery and school-room as their ancestors."

"Women to-day show courage and endurance in sport and society but what of discipline and self-control in daily duties ?"

"The middle class woman apes her fashionable sister, and by her extravagance often ruins her husband."

অর্থাৎ ;—কোন কোন তরুণী ভোগবিলাসের সুবন্দোবস্ত না হইলে বিবাহ করিতে আদৌ ইচ্ছা করেন না। তাঁহাদের গর্ভধারিণীরা যে সকল আমোদপ্রমোদ সুখ স্বচ্ছন্দতার কথা কর্ণেও শুনেন নাই, ইঁহারা তাহাই চান।

কেহ কেহ কেবলমাত্র স্বামীর ধনসম্পত্তি ও পদমর্য্যাদার পানে তাকাইয়া বিবাহ করেন, কিন্তু পরে পতিসহবাসে থাকিতে বিরত হয়েন।

জননীগণ সেকালের মত সর্ব্বদা নার্সারি বা শিশুদের প্রকোষ্ঠে এবং স্কুলরুম বা শিক্ষা-গৃহে কাজ করেন না।

আধুনিক রমণীরা কেবল ক্রীড়া কৌতুকে ও মজলিসে বিক্রম ও তিতিক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন; নৈতিক কার্য্যে ত নিয়ম প্রণালী ও আত্মসংযম দেখিতে পাওয়া যায় না।

মধ্যবিত্ত ভামিনীগণ ফ্যাশনবতীদের অনুকরণে মনোযোগী থাকিয়া অমিতব্যয় দ্বারা পতির সর্ব্বনাশ সম্পাদন করিয়া থাকেন।

এতদ্ব্যতীত লর্ডমিথ্ আরও বলিয়াছেনঃ—

"Labour in the present day is a thing to be avoided not to be proud of."

"To avoid dismissal is the limit of duty."

"Other nations commence work at five or six in the morning. In the West End of London no business can be transacted before 9 or 10 Amm."

অর্থাৎ;—বর্ত্তমান সময়ে পরিশ্রম করা গৌরবের বিষয় মনে করা দূরে থাকুক, সকলেরই মেহনত এড়াইবার চেষ্টা।

কর্ম্মচ্যুত না হইয়া কোন প্রকারে চাকরী বজায় রাখিয়া চলিতে পারাই কর্ত্তব্যের চরম বলিয়া বিবেচিত।

অন্যান্য জাতিরা প্রাতে পাঁচ ছয়টার সময় দৈনিক কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে, কিন্তু লণ্ডনের পশ্চিমাংশে (যেখানে সম্ভ্রান্ত লোকদের বাস) নয়টা দশটার পূর্ব্বে কোনই কাজ হয় না।

তারপর শুনঃ—

"Slackness is found among the leissured rich, who will not work as once they would without pay for the public benefit."

"There is a general slackness among all classes of the population. 'Pleasure is the god—self-indulgence the object aimed at. Hence the increase of suicides, men, women and even children will not tolerate hardship."

অর্থাৎ;—নিষ্কর্ম্মা ধনীগণ পূর্ব্বে যেমন সাধারণ হিতকর ব্যাপারে বিনা বেতনে কাজ করিতেন, এখন আর সেরূপ করিতে চাহেন না। তাঁহাদের মধ্যে এতই শৈথিল্য দেখা যাইতেছে।

সকল শ্রেণীর লোক মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে শৈথিল্য প্রকাশ পাইতেছে। বিলাসই এখন উপাস্য দেবতা, আত্মসুখই লক্ষ্য। একারণ আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়িতেছে। শিশুরা পর্য্যন্ত কোন প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে পারে না।

এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিলে, ভারতের বিপুল সম্পত্তি কি প্রকারে ইংলণ্ডের উপর বিষের ক্রিয়া করিতেছে। উঁহারা নিজেই বলিতেছেন, অপর কাহারও কথা নয়, যে বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বিলাসব্যসনের গরলে বৃটিশ নরনারীর দেহমন জর্জ্জরিত হইয়া অবনতির দিকে ধাবমান হইয়াছে। সূক্ষ্মদর্শী লর্ড মিথ্ ঐ যে কথাটী বলিয়াছেন যে, যেখানে কর্ত্তব্যপালন কঠোর বা কটু ব্যাপার, সেখানে ইংরাজজাতি অধুনা মুখ ফিরাইয়া বসিতেছেন, উহাই মারাত্মক, উহাই সর্ব্বনাশের মূল। ঐ অবস্থা ঘটিলেই মানুষ নীতিবন্ধন লঙ্ঘন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না, যে হেতু নীতিবিগর্হিত পথ ব্যতীত কর্ত্তব্য এড়াইবার উপায় নাই। নৈতিক অবনতই

যে সর্ব্ববিধ অধঃপতনের মূলীভূত কারণ,তাহা সংসারে নিত্য দেখা যাইতেছে। কর্ত্তব্য কথাটী বড় শক্ত জিনিস। উহার ইংরাজী প্রতিশব্দ duty, যাহার প্রতি যাহা duty অর্থাৎ যাহার নিকট যে, ঋণ আছে, সেই প্রাপ্য তাহাকে দেওয়া। সেই কর্ত্তব্যপালনে বা ঋণ পরিশোধে যখন উঁহারা পরাঙ্মুখ হইতেছে, তখন পরিণাম শুভ নয়। ঋণ লইবার বেলা বেশ মিষ্ট লাগে, কিন্তু পরিশোধের সময় অতি অপ্রিয় বোধ হয়, সেটাত ভাল কথা নয়; উহার দ্বারা হৃদয়ের যে দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায়, তাহা ঘোল আনা কলুষকল্মষের পরিচায়ক। বৃটনবাসীর সম্বন্ধে ঐ কথাটা যে অধিক নয়, তাহার প্রমাণ আমাদের সঙ্গে আধুনিক ব্যবহার। এতকাল ভারতের শোষণমোষণ দ্বারা যে বিপুল ঋণ জালে উঁহারা আবদ্ধ হইয়াছেন,এখন তাহার প্রতিশোধের কাল উপস্থিত দেখিয়া নানারূপ টাল্‌মাটাল, ওজর আপত্তি,ছলবাহানা আরম্ভ করিয়াছেন।

আর এক কথা, কাহাকেও সর্ব্বদা ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া অবিরত তাহার দোষাবলী কীর্ত্তন করিলে সেই দোষগুলি ক্রমে নিন্দুকে আসিয়া বর্ত্তে। ধনজনবলদৃপ্ত মদবিহ্বল জনবুল পৃথিবীশুদ্ধ লোককে হেয়জ্ঞান করিয়া থাকে,বিশেষ প্রাচ্যজাতিনিচয়কে মিথ্যাবাদী, ধূর্ত্ত, শঠ, প্রবঞ্চক ইত্যাদি অভিধানে অভিহিত করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। একারণ উঁহাদের মধ্যে ক্রমে দুষ্টচরিত্র লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। গর্ব্ব,ধৃষ্টতা,পরাবজ্ঞা, ঔদ্ধত্য একযঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়া থাকে।

ইংরাজের চিত্তবৈকল্যের অপর একটী কারণ আমাদের তোষামোদ। চাটুবাক্যবাণ প্রয়োগে বড় বড় বীরপালোয়ানকেও সহজে কা'ল করা যায়। উহা দ্বারা সর্ব্বদা বিদ্ধ হইলে মেরুদণ্ড আর থাকে না, ব্রহ্মাণ্ড কা'ত হইয়া পড়েন। শ্বেতাঙ্গ দেখিলেই আমরা লম্বা লম্বা সেলাম দিয়া"হুজুর""স্বামিন্" "দীলদুনিয়ার মালিক" "হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা" বলিয়া সম্বোধন করিতে ছাড়ি না। অযথা স্তুতিবাদে স্তাবকের যেমন ক্ষতি, স্তুতেরও ততোধিক, উহা উভয়ের চিত্তকে ভয়ানক তরল করিয়া ফেলে। অবশেষে একপক্ষকে স্ফীত ভেকের দশা পাইতে হয়, আর ততদূর শ্রাদ্ধ না গড়াইলে মস্তিষ্কের ঘোর বিকার ত অবশ্যম্ভাবী।

খোসামোদের ধাক্কা সাম্‌লাইয়া চলিতে পারা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, একটা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব;—জ্ঞানধর্ম্মে কতক পরিমাণে উন্নত কোন ব্যক্তিকে যদি কেহ হঠাৎ একদিন বলে, "আপনি ত সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার" তিনি হয়ত মনে করিবেন,কথাটী বিদ্রূপাত্মক বা সাধারণ চাটুবাদ। উপর্য্যুপরি এবম্বিধ স্তুতিবাক্য মাত্র একজনের নিকট শুনিলেও কিয়ৎপরিমাণে চিত্তবিকার সম্ভব, কিন্তু ঐরূপ যদি দশবিশ জন ক্রমাগত বলিতে থাকে,তখন স্তুত ব্যক্তির মনে নিশ্চয় দারুণ সংশয় উপস্থিত হইবে, "এতলোক যখন বারম্বার এমন কথা বলিতেছে, তখন উহাদের উক্তি কি প্রকারে অগ্রাহ্য করা যায়? আমরই ভ্রম, আমি হয়ত ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মানুষের মাথা সহজেই বিগড়াইবার কথা, সুতরাং অবশেষে তিনি স্থির করিতে বাধ্য যে, তিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, তাহার এক পাঁইও কম নহেন। অতঃপর বুঝিয়া লও, তাঁহার কি দশা ঘটিল।

অনেক "গুরু" শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক এইপ্রকার গোলকধাঁদায় পড়িয়া খেই হারাইয়াছেন।

প্র :—আপনি যে কর্ত্তব্য মানে ঋণ বলিয়েন, তাহা একটু বুঝাইয়া দিলে ভাল হয়।

উ :—ইহা কর্ম্মশাস্ত্রের কথা, ইহা বুঝিতে গেলে কর্ম্মের আইন জানা চাই। যাহা হউক, এতৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। কর্ম্মশাস্ত্রের মতে সংসার ঋণসম্বন্ধী, অর্থাৎ যে কুহকে সংসারের সবাই অহোরাত্র ছুটাছুটি করিতেছে, তাহা ঋণদায়, এ দুনিয়া কেবলমাত্র দেনা-পাওনার কারখানা—বিশাল ব্যবসার স্থান। এখানে আমরা শুধু পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধ করিতে বারম্বার যাতায়াত করিতেছি, এবং এক ঋণ শোধ করিতে আসিয়া আবার নূতন নূতন ঋণ করিয়া যাইতেছি, তাই এই গমনাগমনের শেষ করিতে পারি না। ঋণের জের একদম্ না মিটাইতে পারিলে ভববন্ধন ছেদনের উপায় নাই। আমরা যাহা কর্ত্তব্য মনে করিয়া কায়মনোবাক্যে সম্পাদন করিতে প্রয়াস পাই, তাহা ঋণপরিশোধের চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নয়। নতুবা কিসের কর্ত্তব্য? পিতৃঋণ, ধাত্রীঋণ, ভ্রাতৃঋণ, ভগ্নীঋণ, পতিঋণ, পত্নীঋণ, পুত্রঋণ, কন্যাঋণ, আত্মীয়-কুটুম্ব-বন্ধু-বান্ধবগণের ঋণ, রাজার ঋণ, প্রজার ঋণ, প্রভুর ঋণ, ভৃত্যের ঋণ, সেবক সহকারীদিগের ঋণ, সমাজের ঋণ, স্বদেশের ঋণ, সমগ্রমানব-মণ্ডলীর ঋণ, বসুন্ধরার ঋণ, সূর্য্যচন্দ্রগ্রহাদির ঋণ, পূর্ব্বপুরুষগণের ঋণ, আচার্য্যাদির ঋণ, দেবতাদের ঋণ, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি জীবসমূহের ঋণ, বৃক্ষলতা-গুল্মাদির ঋণ;—এক কথায় বিশ্বচরাচরের জড়চেতনোদ্ভিদ্ যাবতীয় পদার্থের নিকট আমরা নানাপ্রকার ঋণে আবদ্ধ হইয়াছি, আরও কতকাল হইব, তাহার ঠিক নাই। আবার এই বিপুল ঋণ প্রত্যেক চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের দ্বারা নিয়ত বৃদ্ধি পাইতেছে। কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন,—একাকী আসিয়াছি, একাকী যাইব, কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ নাই; তবে এত ঋণ কিসের? প্রকৃত পক্ষে তাহা নয়, মোটামুটি দেখিতে একা আসা, সুখ দুঃখ ভোগ করা, একা ভবধাম ত্যাগ করিয়া গমন; কিন্তু আসলে সমগ্র বিশ্বের সবাই পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া চলিতে পারে না, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেই একত্রে বাঁধা। ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়, ভ্রূণাবস্থা হইতে দেহান্ত পর্য্যন্ত, সূর্য্যদেব হইতে আরম্ভ করিয়া কত প্রকার লোকের দ্বারা আমাদের শরীর মন আত্মার গঠন, পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। কোন ইংরাজ মনীষী যথার্থই বলিয়াছেন,

"The universe is an unbroken chain from God himself to the very dust beneath our feet."

ইউরোপীয়গণও উক্তপ্রকারের ঋণ সমূহ স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পণ্ডিত কিংজলী * এক স্থলে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, আমাদের "একা আসা, একা যাওয়া" কথাটা ঠিক নয়, আসিবার সময় ত মাতার দেহের সঙ্গে গ্রথিত হইয়া আগমন, প্রসূত হওয়ার পর একা থাকিলে বাঁচি কৈ? অতঃপর শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সকল বিষয়েরই জন্য কত লোকের সাহায্য আবশ্যক হইয়া থাকে। আহারীয় দ্রব্যাদি, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, বিদ্যাশিক্ষা, জীবিকা, জ্ঞানধর্ম্মোপার্জ্জন

* Rev. charles Kingsley.

প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনের নিমিত্ত মুখা-পেক্ষী না হইয়া চলিবার উপায় নাই। তবেই দেখা যাইতেছে যে, বিকট স্বাতন্ত্র্য-প্রধান পাশ্চাত্য জগতেও এ ধারণা ক্রমে ফুটিয়া উঠিতেছে যে, মানুষ অন্য-নিরপেক্ষ হইতেই পারে না।

প্রঃ। কর্ম্মশাস্ত্রের কথা যাহা উল্লেখ করিলেন, তাহার ব্যবস্থাপিত প্রণালী কিরূপ এবং তদনুযায়ী আমাদের ব্যক্তিগত ও দেশব্যাপী সুখ দুঃখাদির ভোগ কি প্রকার হইয়া থাকে, একটু বিস্তারিত ভাবে যদি বলেন, তবে ভাল হয়।

উঃ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন "কর্ম্মণো গহনা গতিঃ"—কর্ম্মের গতি গহন অর্থাৎ জীবের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। কর্ম্মরাজ্যের অতীত জীবন্মুক্তাবস্থা না পাইলে কর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, আমরা কেবলমাত্র মোটামুটি গোটা-কতক কথা জানিতে সক্ষম। যাহা হউক, যতটুকু পারি, বলিতেছি।

কর্ম্ম শব্দের সাধারণ অর্থ ক্রিয়া, কার্য্য, —যাহা কিছু করা হয়। আমরা প্রতিনিয়ত যাহা করি, তাহার একটা ফল তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাই, সেই ফল কার্য্যের গুণানুসারে ভাল, মন্দ বা ভালয় মন্দে মিশ্রিত হইয়া থাকে। এই হিসাবে মহর্ষি পতঞ্জলি কর্ম্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন;—শুক্ল, কৃষ্ণ, শুক্ল-কৃষ্ণ।

কর্ম্ম ও তাহার ফল বীজাঙ্কুরবৎ এক সূত্রে গাঁথা জানিবে। শাস্ত্রে বলিয়াছে;—

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতংকর্ম্ম শুভাশুভম্।
নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটী শতৈরপি॥

অর্থাৎ শতকোটী কল্পকাল অতিবাহিত হইলেও কর্ম্মের ফল প্রসবিনী শক্তি তেজো-হীনা হয় না। শুভাশুভ কৃতকর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। *

যাহা কিছু আমরা মনে মনে ভাবি, যাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করি এবং যাহা হস্ত-পদাদি সহকারে নিষ্পন্ন করি, সমস্তই কর্ম্মপদ-বাচ্য; এরূপেও কর্ম্ম ত্রিবিধ;—মানসিক, বাচিক, কায়িক। আমাদের সর্ব্ববিধ উদ্যমের নামই কর্ম্ম, সেগুলিকে যিনি যখন যেদিক্ দিয়া দেখিয়াছেন, তিনি তেমনি শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। কোন পণ্ডিতের দ্বারা ভাবনা, বাসনা, চেষ্টা, এই তিন প্রকার কর্ম্ম উল্লিখিত। যাহা হউক, পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে কর্ম্মকে তিন থাকে ফেলা হইয়াছে,—সঞ্চিত, প্রারব্ধ, ক্রিয়মান। এক জন্মের কৃত কর্ম্ম সমূহের অতি অল্প অংশেরই ভোগ সেই জন্মে হয়, বাকী সমস্তই পরজন্ম বা তাহার পর কোন জন্মে ভোগের জন্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। আমাদের এইরূপ অনেক জন্মকৃত বিস্তর সঞ্চিত কর্ম্ম আছে। সেই বিপুল কর্ম্মরাশি হইতে বাছিয়া যেগুলি কোন এক জন্মে ভোগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাকে জন্মের প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে। আবার প্রারব্ধের মধ্যে পাকা ও কাঁচা, দুই রকম আছে; পাকা প্রারব্ধ হস্তচ্যুত বাণের ন্যায়, উহা হাত ছাড়াইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, আমাদের এক্তারের সম্পূর্ণ বাহিরে; চেষ্টার দ্বারা কাঁচায় হাত এড়াইতে পারা যায়, কিন্তু সে চেষ্টা একটু বিশেষভাবে প্রবলা হওয়া চাই।

কর্ম্ম সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথা আপাতত

* ইংরাজীতেও বলে,—

"Though the mills of God grind slowly,
Yet they grind exceeding small;
Though with patience stands He waiting,
With exactness grinds He all."

থাকুক ; পরে কোন সময় হইবে। এখন, আমরা সমস্ত ভারতবাসী যে অতীব শোচনীয় অবস্থায় উপনীত, তৎসম্বন্ধে কর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কিছু আলোচনা করা যাউক। আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কর্ম্ম লইয়াই আমরা আত্মান্তর মনে করি, পরন্তু একবারও ভাবি না যে কোন্ কোন্ বিশাল কর্ম্মের সহিত ঐ কর্ম্ম জড়িত ;—সমগ্র বিশ্বের কর্ম্ম, এই সৌরজগতের কর্ম্ম, পৃথিবীর কর্ম্ম, ভূখণ্ড বিশেষের কর্ম্ম, স্বদেশের কর্ম্ম, স্বসমাজের কর্ম্ম, স্বপল্লির কর্ম্ম, স্বপরিবারের কর্ম্ম, এত গুলি কর্ম্মের সমষ্টির সহিত তুলনা করিলে আমাদের ব্যক্তিগত কর্ম্মটুকু সমুদ্র মধ্যে একটী সামান্য জলবিন্দুবৎ প্রতীয়মান হয় তন্মধ্যে আর সব থাকুক, কেবল স্বদেশ ব স্বজাতির কর্ম্ম দ্বারা আমরা কি ভাবে পরিচালিত হইতেছি,তাহা দেখা যাউক। যেমন ব্যক্তিগত কর্ম্মফলে আমরা প্রত্যেকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি-দুষ্কৃতি ভোগ করিতেছি, ঠিক সেই প্রণালীতে জাতীয় কর্ম্মফলের প্রভাবে আমাদের উপর দিয়া সুকৃতির স্নিগ্ধ সমীরণ ও দুষ্কৃতির প্রবল ঝঞ্ঝাবাত চলিয়া যাইতেছে। এস্থলে জাতীয় বলিতে হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি কোন সংকীর্ণ সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় বুঝিতে হইবে না, সুবিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের সকল অধিবাসীকে ভারতবর্ষীয় জাতির অন্তর্গত জানিতে হইবে। ব্যক্তিগত ও জাতিগত উভয়বিধ কর্ম্মই সমান ভাবে দুর্ব্বোধ্য। কুখাদ্য উদরস্থ করিবামাত্র কদাহারজনিত শারীরিক পীড়া অনুভব করা যায় না। কখন এক দিন, কখন দুই দিন, কখন দশবিশ দিন পরে তাহার ফলভোগ আরম্ভ হইয়া থাকে। কবে কোন্ কদর্য্য সামগ্রী ভোজন করিয়াছি, কে মনে করিয়া রাখিতে পারে? এজন্য অনেক সময় হঠাৎ উদরের পীড়া উপস্থিত হইলে মনে হয়, বিনা হেতুতে এরূপ কেন হইল? কিন্তু বাস্তবিক উহার কারণ বহুদিন হইতে ক্রমান্বয়ে সঞ্চিত হইয়া রোগাক্রান্ত হইতে হইয়াছে। ওরূপ ক্ষেত্রে যেমন কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া দৈহিক বিপ্লবকে আকস্মিক বলিয়া মনে হয়, পূর্ব্বজন্মকৃত স্বকীয় ও জাতীয় কর্ম্মফল-জনিত বিঘ্নবিপত্তি সমূহকেও তদ্রূপ অসঙ্গত বোধ করিয়া আমরা অদৃষ্টকে নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হই এবং সময়ে সময়ে বিধাতাকে তিরস্কার করিতেও ছাড়ি না। এই যে আমাদের দেশে অধুনা সর্ব্বদাই শুনা যায়, গৌরাঙ্গহস্তে, কৃষ্ণকায়দিগের নানাবিধ অপমান, লাঞ্ছনা, শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা, এমন কি, তনুত্যাগ পর্য্যন্ত, আবার তদুপরি রাজপুরুষগণের অনুগ্রহে ঐ সকল ব্যাপারে সর্ব্বত্র বিচার-বিভ্রাট ঘটিয়া জ্বালার উপর দ্বিগুণ জ্বালা আনিতেছে ;—এসব কাণ্ড কি কোন খামখেয়ালী আসুরিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত,না কোন পরমদয়ালু,সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিশালী, ন্যায়বান প্রভুর সুশাসনাধীনে সংঘঠিত হইতেছে? আপাতদৃষ্টিতে যদিও কোন সন্তোষজনক সমীচীন কারণ দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না, সমস্তই দারুণ কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন অন্যায় অত্যাচার অবিচারের অপ্রতিহত প্রবাহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তত্রাচ বুঝিতে হইবে, বিশ্বাস করিতে হইবে যে, ঐ সকল পরস্পর বিরুদ্ধভাবের অন্তরালে সামঞ্জস্য আছে, বিধাতার ন্যায়দণ্ড তথায় সপ্রতাপে কার্য্য করিতেছে, সুতরাং বিশিষ্ট কারণ সমূহ বিদ্যমান। জগৎপতি সর্ব্বদর্শী ন্যায়াধীশ,তাঁহার সুবিশাল বিশ্বরাজ্যে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে সুনিয়ম অক্ষুণ্ণভাবে

চলিতেছে, কুত্রাপি ব্যভিচারের তিলমাত্র সম্ভাবনা নাই, পক্ষপাত দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ; এবং সদা জাগ্রত—কস্মিন কালে বিরাম, বিশ্রাম, অবসর জানেন না। এবম্বিধ অবস্থায় আকস্মিক ঘটনা বলিয়া কিছু বিশ্বাস করা যায় কি ? কোন ব্যাপার বিনা কারণে ঘটিল, ইহা কি প্রকারে মনে স্থান পাইতে পারে ? ইংরাজ-কবি পোপ অতিসুন্দর কয়টী কথায় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন,তাহা উচ্চ বিজ্ঞানানুমোদিত :—

"All nature is but art unknown to thee,
All chance direction which thou canst not see ;
All discords harmony not understood,
All partial evil universal good"—Pope.

জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি, প্রকৃতিতে কোথাও কোন বিষয়ে অনিয়ম দৃষ্ট হয় না ;—বিনামেঘে বজ্রাঘাত বলিলে কেহ বিশ্বাস করে না ; কারণ সবাই জানে, মেঘের সঙ্গেই বজ্রাঘাত সম্ভব, মেঘ ব্যতীত বজ্রের সম্ভাবনা স্বভাবের কঠোর নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, সুতরাং আকাশকুসুমবৎ অলীক। জড়রাজ্যের সর্ব্বত্র সুনিয়ম, সুশৃঙ্খলা, আর সৃষ্টির সর্ব্বোচ্চ ব্যাপার মানবপরিবারের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, উন্নতি অবনতির বেলায় তাহাদের ক্ষমতা বাহিরে যা-ইচ্ছা-তাই ঘটিতেছে, কোন নিয়ম নাই, কোন ব্যবস্থা নাই, কোন বিচার নাই, প্রতিবিধানের কোন উপায় নাই, ইহা বাতুলের পক্ষেও অবিশ্বাসযোগ্য।

এই যে ইংরাজজাতি দেখিতেছ, খুব সম্ভব ইঁহারা বহুকাল পূর্ব্বকার ভারতবর্ষীয় আদিম অনার্য্যসমূহ, নানাজন্ম ভোগ করিয়া অধুনা বৃটনে আবির্ভূত। আর্য্যেরা এদেশে আসিয়া রাজ্য বিস্তার করিবার সময় ঐ সকল অসভ্য বর্ব্বর শ্রেণীর জীবগণের প্রতি যে উপদ্রব অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহারই এখন প্রতিশোধ চলিতেছে। আমরা তখনকার অত্যাচারী, এখন বিপক্ষপদতলে পড়িয়া কাঁদিতেছি। হয়ত সময়ে সময়ে প্রতিশোধের মাত্রা একটু বেশী হইয়া পড়িতেছে,তাহা হইবারই কথা; ফাজিলটা ক্রিয়মানের মধ্যে ধরিতে হইবে। এই প্রকারে জন্মজন্মান্তরে কখন গাড়ীর উপর নৌকা, কখন নৌকার উপর গাড়ী দেখা গিয়া থাকে। যে সময় আমরা এদেশে অধিকার করিয়া অধিবাসী অনার্য্যদিগকে উৎপীড়ন করিয়াছিলাম,তখন আমাদের খেয়াল ছিল না যে অত্যাচার-প্রপীড়িত ব্যক্তির যাতনাসমূহ অত্যাচারীর বলবিক্রমের গুপ্তভাবে ক্ষয় সাধন করে, ইহা বিধাতার মঙ্গলবিধান। এ সকল কথা বুঝিতে হয়ত তোমাদিগকে একটু বেগ পাইতে হইতেছে। ভাল, কোন সময় ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে। এখন অন্য প্রশ্ন করিতে পার।

প্র :—বিধাতার বিধানে অধুনা ইংরাজ আমাদের দেশের অধীশ্বর, তাঁহাদের শাসনপ্রণালী আইনকানুন উৎকৃষ্ট, কথাবার্ত্তা বক্তৃতা উপদেশ উদার ও শ্রুতিমধুর। স্বয়ং সমাট্ অভয়দান করতঃ ঘোষণা প্রচার করিতেছেন,—শ্বেতকৃষ্ণ জেতৃজিতে কোন প্রকার প্রভেদ না রাখিয়া নিরপেক্ষভাবে সমগ্র সাম্রাজ্য সুশাসিত হইবে। সবই দেখিতে ভাল, শুনিতে ভাল ; ছাপাকাগজ পড়িতেও ভাল ; বাহিরের লোকের মনে হয় বৃটিশ-ভারতের প্রজার নিকট স্বর্গসুখও তুচ্ছ। পরন্তু আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ এরূপ ন্যায়পরায়ণ সত্যনিষ্ঠ ইংরাজজাতিও সব সময় কথায় কাজে সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন না। ইহার কারণ কি ?

উ ঃ—উঁহারা মানুষ বৈত দেবতা ন'ন। স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া পক্ষপাতদোষ তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা ঠিক পথে চলিতে দেয় না। যে শ্রেণীর মোহবশতঃ ইংরাজরাজ-পুরুষদিগকে মধ্যে মধ্যে নিজেদের অঙ্কিত সরল পথ ত্যাগ করিয়া বক্রগতি হইতে হয়, তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া সাধারণ জীবের পক্ষে অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য ত বটেই। পূর্ব্বেও একথা বলা হইয়াছে। বিবেকী বৈরাগী পুরুষ ভিন্ন সাংসারিক মোহ অতিক্রম করিয়া চলা অন্যের পক্ষে অসম্ভব। ইংরাজ যদি আমাদের দুঃখে কাতর হইয়া কেবলমাত্র পরার্থপরতার অনুরোধে আমাদের শাসনভার গ্রহণ করিয়া থাকিতেন, অবশ্য আমরা তাঁহাদিগকে দুনিয়াদারী-মোহের অতীত মনে করিয়া তাঁহাদের কথা ও কাজে অমিলের আশঙ্কা আদৌ করিতাম না, কিন্তু তাহা ত নয়। উঁহারা সাধারণ মানুষের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সাংসারিক স্বার্থের বশীভূত হইয়া সাত-সমুদ্র-তের নদী পারে আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে আসিয়াছেন। সুতরাং যেখানে তাঁহাদের কোন রূপ স্বার্থে ব্যাঘাত লাগিবার সম্ভাবনা,সেখানে তাঁহারা সাধারণ দুনিয়াদারী নিয়মের বশীভূত হইয়া এদিক ওদিক করিতে বাধ্য হন। তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, সাংসারিক জীব এ প্রকার ভিন্ন আর কি করিয়া থাকে ? আমরা নিজেরা এরূপ অবস্থায় কি করিতাম ? আমরা আপনাদিগকে ইংরাজের অবস্থায় ফেলিয়া যদি নিরপেক্ষভাবে বিচার করি, দেখিতে পাই যে, সম্ভবতঃ আমরা ঠিক অতখানিই করিতাম, বরং কিছু বেশী। একটু বিবেচনা করিয়া দেখ, এই যে আজকাল প্রচণ্ড আইনাদি বিধিবদ্ধ হইয়েছে, অতি কঠোর ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, আমরা উঁহাদের অবস্থায় পড়িলে ঠিক ঐরূপই করিতাম। সুদূর ইংলণ্ড হইতে মুষ্টিমেয় ধবলকায় আসিয়া আল্‌গোছে বসিয়া ত্রিশকোটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির কালা-আদমীর উপর হুকুম চালাইতেছেন; শাসিতের কথাবার্ত্তা, রীতি-নীতি,আচার-ব্যবহার, হাবভাব কিছুই বুঝেন না, বুঝিতে চেষ্টাও করেন না; সব রকম সংবাদের জন্য তাহাদের মুখের কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর, তাহারা সাপ-বেঙ যেমন বুঝাইয়া দিবে তেমনি বুঝিতে হইবে; এক্ষেত্রে নিজেদের গুণাগুণ ভাবিয়া দেখ, যাহা যাহা ঘটিতেছে, ঠিক কি না। আমরাই নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনোদ্দেশে রাজপুরুষদের কাণে নানা ভয় বিপদের কথা অতিরঞ্জিতভাবে তুলিয়া তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া, আপনাদের মতলব হাসিল করিবার চেষ্টায় আছি, তাহাতে প্রজার কষ্টই বাড়ুক, দেশময় অশান্তিই হউক, আর বিস্তর নিরীহ লোকই মারা যাউক, কাহার কি ? এই ত অবস্থা !!!

প্র ঃ—যখন পারিবেন না, তখন ওরূপ আশাপ্রদ বাক্যসমূহ প্রচার না করিলেই ত ভাল হইত।

উঃ—লম্বা কথার উপর ত কোন প্রকার টেক্স নাই। তারপর বাস্তবিক ইংরাজজাতির প্রকৃতিতে ন্যায়পরায়ণতা পূর্ব্বে কিছু ছিল, তাঁহারা সরল মনে নিজেদের ক্ষমতা না মাপিয়া উচ্চবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া উচ্চকথা প্রচার করিয়াছেন, পরে বিশেষ বিশেষ স্থলে যে উহা রক্ষা করিতে অক্ষম হইবেন, ইহা তখন ভাবিতে পারেন নাই; হয়ত অদূরদর্শিতাবশতঃ বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, পরীক্ষার ক্ষেত্র কখন উপস্থিত হইবে না।

প্র ঃ—যখন মানুষ কোন কালেই স্বার্থ-

পরতার হাত এড়াইতে পারে না, তখন ইংরাজের হাতে কি আমাদের কোনই আশা নাই? অনন্তকাল কি আমাদিগকে এইভাবে লাঞ্ছিত উৎপীড়িত হইতে হইবে? পৃথিবীর ধ্বংস পর্য্যন্ত কি ঈশ্বর গালে হাত দিয়া বসিয়া হতভম্বভাবে আমাদের দুর্দ্দশা দেখিতে থাকিবেন?

উঃ—তাহা কখনই হইতে পারে না। যে ঘটনাগুলিকে আমরা আপাততঃ উপদ্রব অত্যাচার বলিয়া মনে করিতেছি, বাস্তবিক ওগুলির ভিতর গভীর মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। আবার সেই পুরাতন কথা বলিতে হয়;—সৃষ্টি হইতে এ পর্য্যন্ত সাধুরা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন, প্রচার করিয়া আসিতেছেন,—জগদীশ্বর মঙ্গলময়, তাঁহার রাজ্যে অমঙ্গল সম্ভবে না। সুতরাং এরূপ না বুঝিয়া উপায় নাই যে, যাহা কিছু আমরা অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, আকস্মিক বিপদ-আপদ প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকি, সে সমুদয় আমাদের মঙ্গলের জন্য ঘটিতেছে; আপাততঃ কটুবোধ হইলেও বিকট তিক্ত ঔষধের ন্যায় পরিণামে হিতকারী। বিধাতার আদেশে তাঁহার কল্যাণকর নিয়মেই ওরূপ ব্যাপার সমূহ সংঘটিত হইতেছে; কাল পূর্ণ হইলে ওভাবে আর উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। ঈশ্বর চিরকাল এক গুলিতে দশ চিড়িয়া মারিয়া থাকেন, তিনি বড় মিতব্যয়ী। যাঁহারা অন্যায় অত্যাচার করিতেছেন, তাঁহারা ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন, এবং উৎপীড়িতের উষ্ণ নিশ্বাস ও তপ্ত অশ্রুর তেজে তাঁহাদের বলবিক্রম ক্ষয় হইয়া আসিবে; আমরাও দুষ্কৃতি বশতঃ অত্যাচারের কুফল ভোগ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া কাতর প্রাণে বিপত্তির মধুসূদন শ্রীহরির চরণ প্রান্তে লম্বা হইয়া পড়িব; উপর হইতে ব্যবস্থা হইবে, অর্থাৎ কর্ম্ম ক্ষয় হইলে পরস্পরের প্রতি ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া সুমিষ্ট সম্বন্ধ দাঁড়াইবে। কোন্ কোন্ পথ দিয়া উহা সম্পন্ন হইবে, তাহা এখন লোকচক্ষুর অগোচর। তবে এমনও হইতে পারে যে, ক্রমান্বয়ে অন্যায় অত্যাচার করিতে করিতে উৎপীড়নের ভীষণ ভাব এত উগ্র হইয়া উঠে যে, উৎপীড়ক নিজে তাহার নিকট সঙ্কুচিত হইয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারেন যে, ঐ সকল ভগবদ্বিরোধী কার্য্যের দ্বারা তাঁহার হৃদয়রাজ্যে কি ভয়ানক বিভ্রাট ঘটিয়াছে। এবম্বিধ প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহার উন্নতি হয়। অপরপক্ষে উৎপীড়িত নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা উপার্জ্জন করত মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকেন। চরমে উভয়েরই কল্যাণ হয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

শঙ্করের ব্রহ্মবাদ।*

দর্শন শাস্ত্র পাঁচ ফুলের সাজী নহে। পাঁচটী ভাল ভাল মত একত্র করিয়া এক খানা পুস্তক লিখিলেই তাহা 'দর্শন শাস্ত্র' আখ্যা লাভ করে না। আবার পাঁচটী

* শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতামত সমালোচিত হইল।

মতের সামঞ্জস্য করিয়া একটা নূতন গ্রন্থ রচনা করিলেই যে তাহা দর্শন-শাস্ত্র হইবে, তাহাও নহে। দর্শন শাস্ত্র একটী মহান বৃক্ষ। একটী অণুপরিমাণ বীজই যেমন পত্র, পুষ্প, ফল, শাখা প্রশাখা সমন্বিত বৃক্ষের আকারে বিকশিত হয়, তেমনি একটী বীজ সত্যই বিকশিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট দর্শনের আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা এভাবে দর্শন রচনা করিতে পারেন না, তাঁহাদের মতামত জগতে উচ্চ স্থান লাভ করিতে পারে না। দর্শন জগতে শঙ্করের স্থান অতি উচ্চ। তাঁহার মতামত 'জোড়াতালি'দেওয়া ব্যাপার নহে; তিনি একটী বিশেষ সত্যকে বীজ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া একটী দর্শন রচনা করিয়াছেন। প্রথমে দেখা যাউক, এই বীজ সত্যটী কি।

বীজ-সত্য।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"ই শঙ্কর-দর্শনের বীজ সত্য। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্যে (২।১) শঙ্কর ইহার যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা নিম্নে অনূদিত হইল ;—

"ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ: 'সত্য' শব্দের অর্থ কি? যাহা যেরূপে নিশ্চিত, তাহার যদি সেই রূপের ব্যভিচার না হয়, তবেই তাহা সত্য (যৎ রূপেণ যৎ নিশ্চিতং তংরূপং ন ব্যভিচরতি, তৎসত্যম্)। সুতরাং 'ব্রহ্ম-সত্যম্' ইহার অর্থ এই যে ব্রহ্ম স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। অনেক সময়ে জড় বস্তুকেও অপরিবর্ত্তিত ভাবে থাকিতে দেখা যায়। সেই জন্য কেহ কেহ মনে করেতে পারেন, ব্রহ্ম হয়ত মৃদ্বৎ 'অচিৎ'। এই আশঙ্কায় বলা হইল, ব্রহ্ম 'জ্ঞানম্' অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। লৌকিক জ্ঞান সীমা বিশিষ্ট; 'জ্ঞান' বলিলে লোকে সীমা বিশিষ্ট জ্ঞানের কথাই ভাবিয়া থাকে। 'ব্রহ্মজ্ঞানম্' এই কথা শুনিয়া লোকে ভাবিতে পারে, ব্রহ্ম বুঝি সীমা বিশিষ্ট জ্ঞান। এই জন্য বলা হইল, ব্রহ্ম 'অনন্তম্'। শ্রুতিতে (ছাঃ উঃ ৭।২৪।১) অনন্ত বিষয়ে এইরূপ বলা হইয়াছে, —"যেখানে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা অর্থাৎ অনন্ত; আর যেখানে অন্য কিছু দেখা যায়, অন্য কিছু জানা যায়, তাহাই অল্প। সুতরাং যিনি অনন্ত, তাঁহার অংশ থাকিতে পারে না।

"জ্ঞান শব্দের অর্থ 'জ্ঞপ্তি', অববোধ। জ্ঞান—জ্ঞা ধাতু ল্যুট (ভাববাচ্যে)। কেহ কেহ বলেন, এখানে জ্ঞান অর্থ 'জ্ঞানবান' বা 'জ্ঞাতা'। এ অর্থ যুক্তিযুক্ত নহে; 'জ্ঞান শব্দ ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন, কিন্তু 'জ্ঞাতা' শব্দ কর্ত্তৃ বাচ্যে নিষ্পন্ন। দ্বিতীয়তঃ যেখানে জ্ঞান—কর্ত্তৃত্ব, সেইখানেই কার্য্য, বিকার ও পরিবর্ত্তন। সুতরাং ব্রহ্মে জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিলে বিকার-বিহীন ব্রহ্মে বিকার স্বীকার করা হয়। তৃতীয়তঃ—আত্মায় যখন ভেদ নাই, তখন আত্মাতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না, (স্বাত্মনি চ ভেদাভাবাৎ বিজ্ঞানানুপপত্তিঃ)। যদি ব্রহ্মকে জ্ঞাতা বল, তাহা হইলে ব্রহ্মকে জ্ঞান ও জ্ঞেয় হইতে পৃথক্ করা হয়। ইহাতে ব্রহ্মের অনন্তত্বে আঘাত পড়ে, কারণ যেখানে অন্য কিছু দেখা যায়, তাহাই সীমাবিশিষ্ট। সুতাং ব্রহ্মকে জ্ঞাতা বলা যায় না।"

"কেহ কেহ আবার এরূপও বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্ম দ্বিতীয় বস্তু না জানিতে পারেন, কিন্তু তিনি ত নিজেকেই জানিতে পারেন—তাহার ত আত্মজ্ঞান থাকিতে পারে। না, এ প্রকারও বলা যায় না। ব্রহ্ম অদ্বিতীয় বস্তু, সেই অদ্বিতীয় বস্তুকে তুমি

জ্ঞাতা বলিতেছ। তিনি যদি জ্ঞাতা হন, তাহা হইলে তিনি জ্ঞাতারূপেই অবস্থিত আছেন। তিনি যখন জ্ঞাতৃরূপে অবস্থিত, তখন তিনি আর জ্ঞেয়রূপে অবস্থান করিতে পারেন না। যদি বল, একই আত্মা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই উভয় রূপেই অবস্থিত, তাহা হইলেও দোষ হয়। ব্রহ্মের যদি অংশ থাকিত, তাহা হইলে এক অংশকে জ্ঞাতা এবং অপর অংশকে জ্ঞেয় বলিতে পারিতে। কিন্তু ব্রহ্ম যখন অংশবিহীন, তিনি যখন নিরবয়ব, তখন তাঁহাকে যুগপৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই বলিতে পার না (ন যুগপৎ অনংশত্বাৎ) সুতরাং 'জ্ঞানম্ ব্রহ্ম' এই অংশ দ্বারা ব্রহ্মের কর্তৃত্বাদি করিতে অস্বীকার করা হইল।" ('জ্ঞানং ব্রহ্মেতি কর্তৃত্বাদি কারক নিবৃত্যর্থম্ ইত্যাদি)।

এখানে বলা হইল, ব্রহ্মের কোন প্রকার পরিবর্তন নাই, তাঁহার অংশ বা অবয়ব নাই, তাঁহাতে কোন প্রকার ভেদ নাই, কর্তৃত্বাদি ব্রহ্মে স্বীকার করা যায় না।

ব্রহ্মাবস্থা।

ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে যে, 'মানব প্রতিদিন সুষুপ্তাবস্থাতে সৎস্বরূপের সহিত একীভূত হয়—সে তখন আপনাকে প্রাপ্ত হয় ৬।৮।১। অপর এক স্থলে লিখিত আছে "মনে কর পৃথিবী গর্ভে সুবর্ণ নিহিত আছে। কিন্তু মানুষ যদি সুবর্ণের কথা না জানে, তাহা হইলে উপর্য্যুপরি এই ভূমির উপর বিচরণ করিলেও সে জানিতে পারে না যে নিম্নে সুবর্ণ নিহিত হইয়া রহিয়াছে। তেমনি যদিও মানব প্রতিদিনই ব্রহ্মলাভ করিতেছে, তবুও অসত্য দ্বারা চালিত হইয়া ইহা জানিতে পারিতেছে না" ৮।৩।২। শঙ্কর বহু স্থলে (বেঃ ভাঃ ২।১।১৪, ১।১৫।১৬, গীঃ ভাঃ ১৩।২, বৃহঃ ভাঃ ৪।৪।২, ২।৪।১৪, ৩।৩।১, ৩।৪।১ ইত্যাদি) এই দুইটী অংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, সুষুপ্ত অবস্থাই ব্রহ্মাবস্থা। এক স্থলে লিখিয়াছেন "প্রগাঢ় সুপ্ত পুরুষ দেখিলে লোকেও বলিয়া থাকে, এব্যক্তি ব্রহ্ম হইয়াছে, এব্যক্তি ব্রহ্মে গমন করিয়াছে" বেঃ ভাঃ ১।১৫।১৬।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে এবং ইহার শাঙ্কর ভাষ্যে লিখিত আছে যে, তুরীয় অবস্থা সুষুপ্ত অবস্থা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। মানুষ সুষুপ্তাবস্থা হইতে প্রত্যাগত হইয়া জাগ্রতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তুরীয় অবস্থা হইতে কাহারও প্রত্যাগমন সম্ভব নহে। প্রাজ্ঞ অর্থাৎ সুষুপ্তাবস্থা কার্য্যকারণ সংযুক্ত, কিন্তু তুরীয় কার্য্য কারণ-বদ্ধ নহে (প্রাজ্ঞস্ত কারণ বদ্ধঃ; ন কার্য্য কারণবদ্ধঃ তুরীয়ঃ গৌঃ পাঃ ভাঃ ১।১৪)। নতুবা বাহ্যতঃ এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। এই সুষুপ্ত ও তুরীয় অবস্থা কি প্রকার, তাহা শঙ্কর বহু স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন।

(১)

এই সুষুপ্ত অবস্থাতে পুরুষ প্রজ্ঞাত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া অন্তর বা বাহ্য কিছুই জানে না। ইহাই ইঁহার আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম ও শোকরহিত অবস্থা। এই অবস্থাতে পিতা অপিতা হয়েন, মাতা অমাতা, দেব অদেব, এবং বেদ অবেদ হয়েন। এই অবস্থাতে স্তেন (=চোর) অস্তেন, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ, তাপস অতাপস হয়েন। এই অবস্থাতে পুণ্য ইহার অনুগমন করে না। পাপও ইহার অনুগমন করে না। তখন এই পুরুষ হৃদয়ের সমুদয় শোক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।

এই অবস্থাতে তিনি দর্শন করেন না, দর্শন করিয়াও দর্শন করেন না। দর্শন করেন, এরূপ বলিবার কারণ এই যে দ্রষ্টার দৃষ্টি কখন বিলুপ্ত হয় না। দর্শন করেন না, এরূপ বলিবার কারণ এই যে আত্মা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই, যাহা তিনি দর্শন করিবেন। এই প্রকার আত্মার পক্ষে ঘ্রাণ করা, আস্বাদন করা, শ্রবণ করা, বলা, মনন করা, স্পর্শ করা ও জানা, সম্ভব নহে। এই আত্মাকে শ্রোতা, মন্তা, জ্ঞাতাদি বলিতে পার, কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, আত্মা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় অবিভক্ত বস্তু নাই, যাহা আত্মা জানিতে, শুনিতে, আঘ্রাণ ও আস্বাদন করিতে পারেন। যেখানে অন্য কোন বস্তু রহিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়, তখন এক অপরকে দর্শন করে, এক অপরকে আঘ্রাণ করে, এক অপরকে আস্বাদন করে, এক অপরকে বলিয়া থাকে, এক অপরকে মনন করে, এক অপরকে স্পর্শ ও এক অপরকে অবগত হয়। কিন্তু এই সলিল (অর্থাৎ সলিলের ন্যায় অন্তর্বাহ্যভেদ-রহিত আত্মা) এক ও অদ্বিতীয় দ্রষ্টা। ইহাই ব্রহ্মত্ব। বৃঃ উঃ।৪।৩। শঙ্করাচার্য্য এই অংশের বিস্তীর্ণ ভাষ্য লিখিয়াছেন, সুতরাং তাহা উদ্ধৃত করা সম্ভব নহে। ভাষ্যকার বিভিন্ন স্থলে বহুবার এই সমুদয় অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(২)

অন্য এক স্থলে উপনিষদে ব্রহ্মাবস্থার বিষয়ে এইরূপ বলা হইয়াছে, "যতক্ষণ দ্বৈত, এইরূপ ভ্রম থাকে, ততক্ষণ এক অন্যকে দর্শন করে, এক অপরকে ঘ্রাণ করে, এক অপরকে আস্বাদন করে, এক অপরকে অভিবাদন করে, এক অপরকে শ্রবণ করে, এক অপরকে মনন করে, এক অন্যকে স্পর্শ করে, এক অন্যকে জানে, কিন্তু যখন সবই আত্মা হইয়া গেল, তখন কে কি উপায়ে কাহাকে দর্শন করিবে? কে কি উপায়ে কাহাকে ঘ্রাণ করিবে? কে কি উপায়ে কাহাকে শ্রবণ করিবে? কে কি উপায়ে কাহাকে স্পর্শ করিবে? কে কি উপায়ে কাহাকে জানিবে? বৃঃ ২।১।১৪।

(৩)

মুণ্ডকোপনিষদের ভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন:—

"রাত্রিতে নৈশ অন্ধকারে যেমন সমুদয় বস্তু অবিভক্ত ঘনাকার হয়, প্রজ্ঞান-ঘনও তেমনি।"৫।

(৪)

এই সমুদয় দৃষ্টান্তে বলা হইল, ব্রহ্ম একাকার। তাঁহাতে কোন প্রকার ভেদ বর্ত্তমান নাই। এই প্রকার কথা বহুস্থলে রহিয়াছে, নিম্নে আরও দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

"শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আশ্রয় ও জগৎকে আশ্রিত বলা হইয়াছে এবং 'সর্ব্বং ব্রহ্ম' এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম ও জগতের অভেদ নির্দ্দেশ করা হইতেছে। ইহাতে এই প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে যে, বৃক্ষ যেমন এক হইলেও শাখা, স্কন্ধ ও মূল প্রভৃতি বশতঃ নানাত্ব পূর্ণ, তেমনি আত্মাও বুঝি 'নানা রস' ও 'বিচিত্র।' এই আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, "এই আত্মাকে একই রূপ বলিয়া জানিবে।"এখানে বলা হইতেছে যে, আত্মাকে কার্য্যরূপী প্রপঞ্চ বিশিষ্ট বিচিত্র বলিয়া মনে করিও না।' তবে কি ভাবে জানিবে?— "বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যাজনিত জগৎ প্রপঞ্চকে লয় কর। লয় করিয়া সেই আয়তনভূত

এক আত্মাকে 'একরস' বলিয়া অবগত হও।" বেঃ ভাঃ ১।৩।১।

'প্রপঞ্চ বিলয়' অর্থ কি, শঙ্কর অন্যত্র (৩।২।২১) তাহাও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অগ্নির উত্তাপে ঘৃতের কাঠিন্য যেমন বিলীন হইয়া যায়, প্রপঞ্চবিলয় সে প্রকার নহে। কারণ এ প্রকার বিলাপন অসম্ভব। যাহার চক্ষুর তিমির রোগ হইয়াছে, সেএক চন্দ্রকে বহু চন্দ্র বলিয়া দেখে। এই তিমির রোগ যখন বিদূরিত হয়, তখন বহু চন্দ্র আপনা আপনিই বিলীন হইয়া যায়। প্রপঞ্চ বিলীন অর্থও ঠিক এই প্রকার। এই জন্যই শঙ্কর উক্ত ভাষ্যেরই শেষ ভাষ্যে বলিয়াছেন—"ব্রহ্মকে জ্ঞানগোচর করাইলে বিদ্যা আপনা-আপনিই উৎপন্ন হইবে, এবং সেই বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যা বিদূরিত হইবে। তখন অবিদ্যা-ধ্বান্ত এই নামরূপ প্রপঞ্চ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবে। বেঃ ভাঃ ৩।২।২১

কি অর্থে ব্রহ্ম 'একরস', এখানে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। ইহাতে ভেদগন্ধ বিন্দুমাত্রও নাই—ইনি একাকার*।

* কোকিলেশ্বর বাবু বলিতেছেন "কেহ কেহ মনে করেন যে, শঙ্কর মতে নানাত্ব একবারে অলীক বা মিথ্যা। এইরূপে শঙ্করের উপরে কতজনে কত অবিচার করিয়াছে" নব্যভারত পৃ ৫৭৬।১৩১৪ ফাল্গুন। 'উপনিষদের উপদেশ' দ্বিতীয় খণ্ডেও লিখিয়াছেন—"পরমার্থ দৃষ্টি জন্মিলেও এই সসাগরা বনশৈলা মেদিনী অন্তর্হিত হইয়া যায় না। জগৎ জগৎই থাকে, শক্তি শক্তিই থাকে। ইহাই শঙ্করের মত"। পৃ ১৩০।

ইহাকেই বলে "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে"। পাঠকগণ (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬) অংশের সহিত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সিদ্ধান্ত মিলাইয়া দেখিবেন। প্রপঞ্চ বিলীন হইয়া যায়, অথচ জগৎ নাকি জগৎই থাকে।

পরমার্থ জ্ঞান জন্মিলেই যে যে প্রপঞ্চ বিলীন হইয়া যায়,তাহা নহে। এই জগৎ সর্ব্ব সময়েই অস্তিত্ববিহীন। শঙ্কর এ বিষয়ে এই প্রকার আলোচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন যে, প্রপঞ্চ নিবৃত্তি হইলে অদ্বৈতজ্ঞান জন্মে। কিন্তু এই প্রপঞ্চের যদি নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে অদ্বৈত কি প্রকারে সম্ভব হয়? ইহার উত্তর এই—প্রপঞ্চ যদি বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইত। কিন্তু রজ্জুতে যেমন সর্প কল্পিত হইয়া থাকে, তেমনি এই প্রবঞ্চও ব্রহ্মে কল্পিত হইয়াছে,সুতরাং এই প্রপঞ্চের অস্তিত্ব নাই। ইহা যদি বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে ইহা বিদূরিত করা সম্ভব হইত। ভ্রান্তি বুদ্ধি বশতঃ রজ্জুতে সর্পের অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়। (সর্পই যখন বিদ্যমান নাই তখন) বিবেক দ্বারা এ সর্পের নিবৃত্তি করা সম্ভব নহে। তেমনি মায়াবী কর্ত্তৃক যে মায়া প্রসারিত হয়,তাহার অস্তিত্ব নাই। (মায়ারই যখন অস্তিত্ব নাই তখন) দর্শকদিগের চক্ষু মায়ামুক্ত হইলে মায়া নিবৃত্ত হইবে,ইহাও হইতে পারে না। সেইরূপে দ্বৈত প্রপঞ্চও মায়ামাত্র। রজ্জুর ন্যায় কিম্বা মায়াবীর ন্যায় পরমার্থতঃ অদ্বৈতই সত্য। সুতরাং প্রপঞ্চের উৎপত্তি বা বিলয় কিছুই নাই (গৌঃ পাঃ কারিকা ভাষ্য ১।১৭।)

(৫)

শঙ্কর অন্য একস্থলে বলিয়াছেন—"শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম চৈতন্যমাত্র, নির্ব্বিশেষ, ইহাতে কোন মাত্র রূপ নাই। "যেমন সৈন্ধব খণ্ড অন্তর ও বাহ্যরহিত, এবং এক মাত্র রসঘন, তেমনি এই আত্মাও অন্তর ও বাহ্যরহিত এবং একমাত্র চৈতন্যঘন। ইহাতে বলা হইল,আত্মার অন্তর্ব্বাহ্য নাই এবং চৈতন্য ভিন্ন অন্য কোন রূপ নাই; তিনি, অন্তর-বিহীন নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই, ইহার স্বরূপ। যেমন সৈন্ধবপিণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে এক-মাত্র লবণরস, ইহাতে অন্য কোন প্রকার রস নাই, ব্রহ্মও তেমনি" বেঃ ভাঃ ৩।২।১৬।

পর প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা যাইবে।

(৬)

ব্রহ্ম কি প্রকার, তাহা বুঝাইবার জন্য 'সৈন্ধবঘন' 'একরস' 'সলিল' ইত্যাদি নানা প্রকার উপমা দেওয়া হইয়াছে। ইহা অপেক্ষাও একটী শ্রেষ্ঠতর দৃষ্টান্ত আছে। সেটী আকাশের দৃষ্টান্ত। আকাশ যেমন সর্ব্বত্রই এক প্রকার, ইহাতে যেমন কোন প্রকার বিচিত্রতা নাই, কোন প্রকার ভেদ নাই—ব্রহ্ম ঠিক সেই প্রকার। (গীতাঃ ভাঃ ১৩।২৯ বা ৩০)।

ব্রহ্মাবস্থা কি প্রকার, পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে তাহার আভাষ পাওয়া যাইতেছে। সুষুপ্তাবস্থাই ব্রহ্মাবস্থা। এবং ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ; তাঁহার রূপের কখন পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং ব্রহ্ম নিত্যই সুষুপ্ত আত্মার ন্যায় অন্তর্ব্বাহ্য-ভেদবিহীন। পরমাত্মা নিত্যই স্বগত ভেদবিহীন অবস্থায় বিরাজমান। ইহার অবস্থার পরিবর্ত্তন কখন স্বীকার করা যাইতে পারে না। একথা আমাদের সিদ্ধান্ত নহে। শঙ্কর নিজেই ইহা বলিয়াছেন।

(১)

গীতা-ভাষ্যে বলা হইয়াছে "আত্মার অবস্থা ভেদ স্বীকার করা যায় না"—আত্মনোঽবস্থা ভেদানুপপত্তেঃ * (১৩।৩)।

(২)

শঙ্কর বৃহদারণ্যক ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"কেহ কেহ বলেন "পরব্রহ্ম অচঞ্চল মহা সমুদ্রের ন্যায়। ইহারই ঈষৎ চঞ্চল অবস্থাকে অন্তর্য্যামী (খণ্ডনব্রহ্ম) এবং অত্যন্ত চঞ্চল অবস্থাকে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ আবার ব্রহ্মের পঞ্চাবস্থা (পিণ্ড, জাতি, বিরাট, সূত্র ও দৈব) কেহবা অষ্টাবস্থা (পিণ্ড, জাতি, বিরাট, সূত্র, দেব, অব্যাকৃত, সাক্ষী ও ক্ষেত্রজ্ঞ) কল্পনা করিয়া থাকেন। আবার কেহ বলেন, এ সমুদয় ব্রহ্মের শক্তি, কারণ ব্রহ্মকে অনন্তশালী বলা হয়। কাহারও কাহারও মতে এ সমুদয়ই ব্রহ্মের বিকার। এ সমুদয় আপত্তির উত্তর এই :—'—এই সমুদয় ব্রহ্মের অবস্থা বা শক্তি, ইহা বলা যুক্তিযুক্ত নহে (অবস্থা—শক্তী তাবৎ না উপপদ্যেতে) *। কারণ শ্রুতিতেই বলা হইয়াছে যে, অক্ষর পুরুষ অশনায়াদি সংসার ধর্ম্মের অতীত। এখন যদি ব্রহ্মে অশনায়াদি ধর্ম্ম আরোপ করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সংসারধর্ম্মরহিত ও সংসার ধর্ম্মযুক্ত, উভয়ই বলা হয়, কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। ব্রহ্মের শক্তিমত্বা সম্বন্ধেও ইহাই বক্তব্য (তথা চ শক্তিমত্বা)। এই সমুদয়কে ব্রহ্মের অবয়ব বা বিকার * *

* বিদ্যারত্ন মহাশয় শঙ্করের নামে কি প্রচার করিতেছেন, শ্রবণ করুন—"সগুণ ব্রহ্মও প্রকৃত পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মের একটী অবস্থান্তর মাত্র"। উপনিষদের উপদেশ, ২য় খণ্ড পৃঃ ৫৬। নব্যভারতেও লিখিয়াছেন, "নির্গুণ ব্রহ্মেরই উহা (সগুণ ব্রহ্ম) আগন্তুক অবস্থাভেদ মাত্র" পৃঃ ৩৫৮, ১৩১৪ সাল। শঙ্কর যাহা বলেন, বিদ্যারত্ন মহাশয় ঠিক তাহার বিপরীত কথাই বলিতেছেন। বৃহদারণ্যক ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধেই পরে (২) সংখ্যক অংশে শঙ্করের ঐ যুক্তি তর্ক উদ্ধৃত হইল।

* শঙ্করাচার্য্য এখানে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সগুণ ব্রহ্মাদি নির্গুণ ব্রহ্মের শক্তিও নহেন এবং অবস্থা বিশেষও নহেন! কিন্তু বিদ্যারত্ন বলিতেছেন যে, শঙ্করের মতে "সগুণ ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্মেরই শক্তি সম্বলিত অবস্থা বিশেষ"। নব্যভারত পৃ ৩৫৮, ১৩১৪ সাল।

* * কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন যে, শঙ্করের মতে "ব্রহ্মই বস্তুতঃ জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন" নব্যঃ পৃ ৪৬০।

বলিলে কি দোষ হয়, তাহা চতুর্থ অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। সুতরাং এ সমুদয় কল্পনা অসত্য। (তস্মাৎ এতাঃ অসত্যাঃ সর্ব্বাঃ কল্পনাঃ)। বৃহঃ ভাঃ ৩.৮।১২।

পরমাত্মার সহিত সগুণ ব্রহ্ম জীবাত্মা প্রভৃতির কি সম্বন্ধ, তাহা পরে আলোচিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত অংশে প্রমাণিত হইল ব্রহ্মের 'অবস্থা ভেদ' স্বীকার করা যাইতে পারে না। তিনি সর্ব্বসময়েই একই ভাবে বর্ত্তমান।

কার্য্য ও কারণ।

ব্রহ্ম যখন নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় সত্ত্বা, এবং যখন তিনি সমুদয় ভেদরহিত, তখন তাঁহাতে কর্ত্তৃত্বাদি কারক অর্পণ করা যায় না। এই জন্যই প্রশ্নভাষ্যে (৬।৩)। শঙ্কর বলিয়াছেন "ব্রহ্মে কর্ত্তৃত্ব,* ভোক্তৃত্ব, কিম্বা ক্রিয়া,কারক বা ফল কিছুই নাই। 'কারক' কথাটার ব্যাখ্যা আবশ্যক। কর্ত্তাকর্ম্ম-করণ, অপাদান, অধিকরণাদিকে কারক বলে। ব্রহ্মে এই প্রকার কারক নাই। ব্রহ্ম কোন কার্য্য করেন না, সুতরাং তিনি কর্ত্তা হইতে পারেন না। তিনি কোন ক্রিয়ার কর্ম্মও নহেন। ব্রহ্মদ্বারা কোন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, সুতরাং তিনি করণও নহেন। ব্রহ্ম হইতে কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না, সুতরাং তিনি অপাদান নহেন। ব্রহ্ম কোন বস্তুর আধারও নহেন। এই জন্যই শঙ্কর বহুস্থলে ব্রহ্মকে ক্রিয়া ও কারকাদি বর্জ্জিত বলিয়াছেন (বেঃ ভাঃ ২।১।১৪ গীঃ ভাঃ ১৩।২,বৃঃ ভাঃ ৪।৪।২, ২।৪।১৪, ৩।৩।১, ৪।৪।১ ইত্যাদি।

ব্রহ্মে কার্য্য-কারণ ভাব নাই এবং ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুও নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে, 'কার্য্যকারণ' বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না।

গৌড়পাদীয়কারিকার ভাষ্যে শঙ্কর ঠিক এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। কারিকাতে নিম্ন লিখিত উক্তিটী পাওয়া যায়ঃ—

"অসৎ কখন অসতের কারণ হইতে পারে না এবং অসৎ সতেরও কারণ হইতে পারে না। সৎও কখন সতের কারণ হইতে পারে না; সৎ অসতের কারণ হইবে কি প্রকারে? -৪।৪০।

শঙ্করাচার্য্য উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেনঃ—

"প্রকৃত পক্ষে কোন প্রকারেই কোন বস্তুরই কার্য্য কারণভাব প্রতিপন্ন হয় না।* প্রশ্ন হইতে পারে, কেন প্রতিপন্ন হয় না? তাহার উত্তর এই—অসত্য কখন অসত্যের কারণ হইতে পারে না—যেমন শশবিষাণ খ-পুষ্পাদির কারণ নহে। সেই প্রকার

অধিকাংশ স্থলেই কোকিলেশ্বর বাবু এইরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

* কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন "নির্গুণ ব্রহ্মই যে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা,একথা শঙ্কর বারম্বার বলিয়াছেন, নব্যভারত কার্ত্তিক পৃঃ ৩৫২, ১৩১৪ সাল। 'সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম" নামক প্রবন্ধে পরে ইহার সম্যক আলোচনা করা যাইবে।

* শঙ্কর কোন প্রকার কার্য্যকারণ ভাব স্বীকার করেন না; সুতরাং জগৎ, সৃষ্টিতত্ত্ব ও স্রষ্টৃত্ব পর্য্যন্ত উড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু কোকিলেশ্বর বাবু বলিতেছেনঃ—"অনেকে আবার ইহাও মনে করেন যে, শঙ্কর সৃষ্টিতত্ত্ব ও ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত মায়াময় ও অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, ইহাও নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা। শঙ্করের তাৎপর্য্য যাঁহারা বুঝেন না, তাঁহারাই শঙ্করের নামে এই সকল অন্যায় কথা বলিয়া বেড়ান" উপনিষদের উপদেশ, ২য় খণ্ড পৃঃ ১৩৫। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের 'বিশ্বাস' যে, 'অন্ধ বিশ্বাস' তাহা পর প্রবন্ধে আরও বিশেষভাবে প্রমাণিত হইবে।

অসৎবস্তুও সৎবস্তুর কারণ নহে—যেমন শশ-বিষাণাদিকে ঘটাদির কারণ বলা যায় না। সৎ বস্তুও সৎবস্তুর কারণ নহে, যেমন ঘটাদি বস্তু অন্য ঘটাদির কারণ হইতে পারে না। আর সৎবস্তু অসৎবস্তুর কারণ কি প্রকারে হইবে? অন্য প্রকার কার্য্যকারণ ভাব থাকা বা কল্পনা করা সম্ভব নহে। সুতরাং বিবেকীগণের নিকটে কোন বস্তুরই কার্য্য কারণ ভাব নাই।

গৌড়পাদাচার্য্যের আর একটী শ্লোক এই:—

একটী বস্তু অন্য একটী বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় না এবং নিজ হইতেও নিজের উৎপত্তি হইতে পারে না। সৎই হউক, বা অসৎই হউক বা সদসৎই হউক, কোন বস্তুরই উৎপত্তি নাই। ৪।২২।

শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য এই:—কোন বস্তুরই উৎপত্তি নাই। যে বস্তুকে উৎপন্ন বলিয়া মনে করা যায়, তাহা নিজ হইতে বা পর হইতে বা উভয় হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহা 'সৎ'ই হউক, বা 'অসৎ'ই হউক 'সদসৎ' (অর্থাৎ, একাধারে সৎ ও অসৎ উভয়)ই হউক, ইহার উৎপত্তি নাই। কোন উপায়েই ইহার জন্ম সম্ভব নহে। যে বস্তু স্বয়ং অনিষ্পন্ন, সেই বস্তু হইতে—স্বতঃ স্বরূপ হইতে স্বয়ং সেই বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না। যেমন একটী ঘট সেই ঘট হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ—একটী বস্তু অপর কোন বস্তু হইতেও উৎপন্ন হয় না; যেমন ঘট হইতে পট বা পট হইতে ঘটের উৎপত্তি সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ—একটী বস্তু নিজ কিম্বা অপর—এতদুভয় হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ ইহা বিরোধী কথা;—যেমন ঘট ও পট এতদুভয় হইতে ঘটেরও উৎপত্তি হইতে পারে না, পটেরও উৎপত্তি হইতে পারে না। বলিতে পার, মৃত্তিকা হইতে ঘট এবং পিতা হইতে পুত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা সত্য, মূর্খলোকেই প্রত্যয় করে যে বস্তুর উৎপত্তি হয় এবং এজন্য তাহারা অনুরূপ ভাষাও ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু বিবেকী ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে এই প্রত্যয় ও ভাষা সত্য না মিথ্যা ৪।২২।

ব্রহ্মকে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' বলিলে কত গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, পাঠকগণ তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন। আমাদের অগ্যকার সিদ্ধান্ত এই—

(১) ব্রহ্ম, নিত্য নির্ব্বিকার, অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা;

(২) তাঁহার অবস্থা-ভেদ স্বীকার করা যায় না; তিনি নিত্য এক অবস্থাতে বর্ত্তমান।

(৩) ব্রহ্মে কর্ত্তৃত্বাদি কারক থাকিতে পারে না।

(৪) ব্রহ্ম সর্ব্বদাই 'একরস' তিনি সর্ব্ব প্রকার-ভেদ রহিত।

(৫) ব্রহ্মে বা ব্রহ্ম হইতে কোন বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না। এই জগৎ প্রপঞ্চ ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

(৬) 'কার্য্যকারণ' বলিয়া কিছু নাই। মূর্খ ব্যক্তিই কার্য্য ও কারণে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে।

ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব বিষয়ে পর প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

অদ্বৈতবাদ ও ঋগ্বেদের দেবতা। (১)

শঙ্করাচার্য্য যে অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এই অদ্বৈতবাদ ভারতের অতি প্রাচীন সম্পত্তি। আমাদের বিশ্বাস এই যে, শঙ্করাচার্য্য এই অদ্বৈতবাদটীকে বেদ গ্রন্থ হইতেই লইয়াছেন এবং বেদান্তদর্শনে উহারই পুষ্টি সাধন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদই ভারতে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং ইহাই খুব সমীচীন এবং বিজ্ঞান-সম্মত। আমরা সম্প্রতি "উপনিষদের উপদেশ" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায়,অতি বিস্তৃতভাবে শঙ্কর-ব্যাখ্যাত অদ্বৈতবাদের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছি। একদল লোক আছেন, যাঁহারা শঙ্করাচার্য্যকে মায়াবাদী, এবং ঐন্দ্রজালিক বাজীকররূপে প্রতিপাদন করিতে বড়ই ব্যস্ত এবং শঙ্করের গৌরব লোপ করিবার জন্য লালায়িত। ইহাও নূতন নহে। অনেক দিন হইতেই শঙ্করের মায়াবাদটীর উপরে বিবিধ অবিচার আরোপিত হইয়া আসিতেছে। আমরা এই গড্ডালিকা-প্রবাহের অনুসরণ না করিয়া, শঙ্করের বিবিধ ভাষ্য এবং তাঁহার ভক্ত শিষ্যবর্গের সাহায্যে তাঁহার অদ্বৈতবাদের যে তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে উপরোক্ত গ্রন্থে দেখাইতে যত্ন করিয়াছি।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ কি প্রকার? এস্থলে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। শঙ্কর-মতে, এক ব্রহ্ম-সত্তাই বিবিধ নামে ও বিবিধরূপে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন। সৃষ্টির পরে সেই সত্তাই অসংখ্য নামে ও রূপে বিকশিত হইয়াছেন। * সৃষ্টির অর্থ কি? সৃষ্টির অর্থ—আধিক্য। যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহা অপেক্ষা আর কিছু অধিক। † ইহারই নাম সৃষ্টি। পূর্ব্বে কেবল মাত্র ব্রহ্মসত্তা ছিলেন, সৃষ্টির পরে সেই ব্রহ্ম-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া কতকগুলি নাম ও রূপের অভিব্যক্তি হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মসত্তা এবং সেই সত্তার আশ্রয়ে কতকগুলি নাম ও রূপ—ইহারই অর্থ সৃষ্টি। যেমন প্রাণবায়ুকে নিরোধ করিয়া কুম্ভক করিলে কেবল মাত্র জীবনের ক্রিয়া হয়, কিন্তু আকুঞ্চন-প্রসারণাদি ক্রিয়া তখন হয় না; কিন্তু কুম্ভক ছাড়িয়া দিলে জীবনক্রিয়ার উপরে আবার আকুঞ্চন-প্রসারণাদি অধিক ক্রিয়া হইতে থাকে, ‡ এইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল ব্রহ্ম-সত্তামাত্র থাকেন, সৃষ্টির পরে সেই সত্তাকে আশ্রয় করিয়া কতকগুলি নাম ও রূপ ব্যক্ত হয়। এই নাম-রূপ লইয়াই জগৎ। জগতের যত কিছু পদার্থ, সকলেরই কোন না কোন 'রূপ' আছে। এবং কোন না কোন নাম আছে। এই নাম-রূপগুলি ব্রহ্ম-সত্তার আশ্রয়েই অবস্থিত; ইহাদের নিজের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ব্রহ্ম-সত্তাই এই নাম-রূপগুলির মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন। নাম-রূপগুলিতে অনুস্যূত এই সত্তা দ্বারাই আমরা

* প্রাগুৎপত্তেঃ... আত্মৈকশব্দ প্রত্যয়গোচরং জগৎ। ইদানীং...অনেক শব্দ প্রত্যয় গোচরমাত্মৈক শব্দ প্রত্যয়গোচরঞ্চেতি বিশেষঃ।—ঐতরেয় ভাষ্য।

† শঙ্কর-শিষ্য বিদ্যারণ্যকৃত অনুভূতি-প্রকাশ,২।৪০।

‡ বেদান্ত-ভাষ্য।২।১।২০

ব্রহ্মের সত্তা অনুমান করিতে পারি।* কেন না, এগুলির ত নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই; ব্রহ্ম সত্তাতেই ইহাদের সত্তা।

কিন্তু এই অসংখ্য নাম-রূপগুলি অভিব্যক্ত হওয়াতেও, ব্রহ্ম-সত্তার কোন ক্ষতি হয় নাই; তিনি পূর্ব্বেও যে ব্রহ্ম-সত্তা, এখনও সেই ব্রহ্ম-সত্তা। স্বর্ণ যখন হার ও বলয়াকার ধারণ করে, তখন কি স্বর্ণ প্রকৃতই কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে? হার এবং বলয়—স্বর্ণেরই রূপান্তর মাত্র। স্বর্ণই হার ও বলয়ের মধ্যে অনুস্যূত থাকে। স্বর্ণের সত্তাকে তুলিয়া লও, তোমার হারও নাই, বলয়ও নাই। সুতরাং নামরূপগুলির দ্বারা, ব্রহ্ম-সত্তার কোন ক্ষতি হয় না। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা জানেন যে, এক ব্রহ্মসত্তাই নাম-রূপগুলির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। নাম-রূপগুলি সেই সত্তাকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করিতেছে।†

যাহারা তত্ত্বদর্শী নহে, তাহারাই মনে করে যে, নাম-রূপগুলির স্বতন্ত্র স্বীয় সত্তা আছে। এই স্থলেই ভ্রমের মূল বীজ। অজ্ঞানীরা যাহাকে পদার্থের সত্তা মনে করে, বাস্তবিক পক্ষে উহা ব্রহ্মসত্তা মাত্র। ব্রহ্মসত্তাতেই পদার্থগুলির সত্তা।

যাহার নিজের সত্তা নাই, তাহা নিশ্চয়ই 'অসত্য' এবং 'কল্পিত।' এই উদ্দেশ্যেই শঙ্করাচার্য্য অনেক স্থলে নাম-রূপ গুলিকে বা জগৎকে 'অসত্য' 'কল্পিত' 'মিথ্যা' প্রভৃতি শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যেই অনেক স্থলে শঙ্কর জগৎকে ইন্দ্রজালের ন্যায় অসত্য, গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় অসৎ, মায়ামরীচিকার ন্যায় কল্পিত বলিয়াছেন। এই উক্তিগুলি নাম-রূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে; ব্রহ্মসত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই। অনেকে এই উদ্দেশ্যটী ভুলিয়া যান। শঙ্কর বারংবার দেখাইয়াছেন যে, 'শক্তির দ্বারা জগৎ সত্য, আকারের দ্বারা জগৎ অসত্য।' জগতের প্রত্যেক পদার্থে যে ব্রহ্মসত্তা অনুস্যূত রহিয়াছেন; তাহা চির-সত্য। নাম-রূপগুলি সেই সত্তারই আকার-বিশেষ মাত্র। ঐ আকারগুলির স্বীয় স্বতন্ত্র সত্তা আছে যদি মনে কর, তবেই তুমি ভুল বুঝিলে। আকারগুলি ব্রহ্মসত্তাকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করিতেছে; সুতরাং উহাদের আবার নিজের সত্তা কোথায়? কিন্তু অজ্ঞানীরা ত এভাবে জগৎকে দেখে না। অজ্ঞানীরা প্রত্যেক বস্তুকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট বলিয়াই বোধ করে। সুতরাং অজ্ঞানীরা যে ভাবে জগৎকে দেখিয়া থাকে, সে ভাবে জগৎ সত্য হইতে পারে না। সে ভাবে জগৎ—অসত্য, মায়াময়, ইন্দ্রালের ন্যায় এবং মরু-মরীচিকা ও গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় মিথ্যা। ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত।‡

পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে, এ প্রকার সিদ্ধান্তে নাম-রূপ বা জগৎ অলীক হইয়া উড়িয়া যাইতেছে না। নাম-রূপ গুলিকে শঙ্কর ব্রহ্ম-সত্তারই আকার বিশেষ ও নাম বিশেষ—এই ভাবে বোধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। নাম-রূপগুলিকে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে

* তৈত্তিরীয়-ভাষ্য, ২।৬।২ "নামরূপে সর্ব্বাবস্থে ব্রহ্মণৈব আত্মবতী।" ইত্যাদি। "অসতশ্চেৎ কার্য্যং গৃহ্যমানমপি অসদন্বিতমেব স্যাৎ; নচৈবং"—ইত্যাদি।

† "কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু 'সত্বং' ন ব্যভিচরতি; একঞ্চ পুনঃ সত্বম্।"—বেদান্ত-ভাষ্য।

‡ "সর্ব্বত্রৈব বুদ্ধী সর্ব্বৈরুপলভ্যেতে।.........তয়োর্ব্ব্যোর্ঘটাদিবুদ্ধির্ব্যভিচরতি, নতু সদ্বুদ্ধিঃ;" ইত্যাদি—গীতাভাষ্য।

বোধ করিতেই কেবল তিনি নিষেধ করিয়াছেন মাত্র। তিনি এই জন্যই বলিয়া দিয়াছেন যে, জগৎ বা জগতের পদার্থগুলি কেহই স্বাধীন, স্বতন্ত্র বস্তু নহে; জগৎ বা জগতের পদার্থগুলি—ব্রহ্মসত্তারই রূপ ভেদ ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য মাত্র বা বিভূতি মাত্র। *

শঙ্করের এই অদ্বৈত-বাদ অতি প্রাচীন। ঋগ্বেদে আমরা ইন্দ্র, আদিত্য, সোম, রুদ্র, সবিতা, দ্যৌঃ, পৃথিবী, অদিতি প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ ও স্তুতি দেখিতে পাই। এই দেবতাবর্গ, ব্রহ্মসত্তারই কার্য্যভেদমাত্র; ব্রহ্মসত্তারই বিবিধ বিকাশ মাত্র। নিরুক্তকার যাস্ক এই দেবতাবর্গকে "আত্মজন্মানঃ," "কর্ম্মজন্মানঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহারা আত্মশক্তি হইতে উদ্ভূত, ইহারা ক্রিয়ারই বিবিধ বিকাশ মাত্র। ইহাদের কাহারই স্বতন্ত্র সত্তা নাই। এক ব্রহ্মসত্তাই, বিবিধরূপে ও বিবিধ নামে জগতের সমুদয় ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছেন। ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি সেই ব্রহ্মসত্তারই বিবিধরূপ এবং বিবিধ নাম মাত্র, কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে। ঋগ্বেদে এই ব্রহ্মসত্তাই, বিবিধ নামে ও রূপে স্তুত হইয়াছেন।

অদ্বৈত-বাদই যে ঋগ্বেদের লক্ষ্য, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা ক্রমে ক্রমে কতগুলি যুক্তির অবতারণা করিব। ঋগ্বেদের সূক্তগুলির মধ্যেই এ সম্বন্ধে প্রচুর উপাদান রহিয়াছে। উপনিষদ গুলিতেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

বৈদিক তত্ত্ব ও বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে, সর্ব্ব প্রথমে বেদান্ত-দর্শন বুঝা আবশ্যক। বেদান্তদর্শন দুই ভাগে বিভক্ত; পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা। ঋগ্বেদের দেবতাবর্গের স্বরূপ কি, এ সম্বন্ধে বেদান্ত শাস্ত্রের মীমাংসাই সর্ব্বাপেক্ষা আদরনীয়। সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদেই বা দেবতাবর্গের সম্বন্ধে কি প্রকার সিদ্ধান্ত প্রদত্ত আছে, তাহাও দেখা আবশ্যক। সর্ব্বোপরি, ঋগ্বেদেই বা এই দেবতাবর্গের কি প্রকার প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহারও বিশেষ আলোচনা আবশ্যক।

ঋগ্বেদের উপাস্য জড়শক্তি নহে। প্রাচীন ঋষিগণ জড়শক্তি বলিতে কাহাকে ও বুঝিতেন না। তাঁহারা অভিব্যক্ত বস্তুমাত্রকেই ব্রহ্ম সত্তারই বিকাশ বলিয়া বুঝিতেন। ব্রহ্মসত্তাকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া, স্বতন্ত্ররূপে, তাঁহারা কোন শক্তি বা বস্তু বা ক্রিয়া বুঝিতে পারিতেন না। সকল পদার্থ বা শক্তি,—সেই এক চেতন-সত্তারই বিকাশমাত্র; সকল পদার্থের মধ্যেই সেই চেতন-সত্তা অনুপ্রবিষ্ট; প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ ইহাই মনে করিতেন।

কিন্তু আমাদের মীমাংসার প্রমাণ কি? কি কি প্রমাণের বলে আমরা ঋগ্বেদ সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করিতে সাহসী হইয়াছি? আমরা সর্ব্বপ্রথমে বেদা-ন্তদর্শনের প্রমাণ উপস্থিত করিব। বৈদিক তত্ত্বগুলি বুঝাইয়া দিবার জন্যই বেদান্ত-দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং বেদান্তদর্শন ঋগ্বেদের দেবতা-সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন, সর্ব্বোপরি

* "উপনিষদের উপদেশ" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় অতি বিস্তৃতরূপে ও প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে এ সকল কথা প্রদর্শিত হইয়াছে। তত্ত্বদর্শীরা নাম-রূপের মধ্যে অনুস্যূত ব্রহ্মসত্তাকেই দেখিয়া থাকেন এবং নাম রূপগুলিকে সেই সত্তারই রূপান্তর বা বিভূতি রূপে বোধ করেন। কিন্তু অজ্ঞানীরা নাম-রূপগুলিকে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে বোধ করে এবং নামরূপের মধ্যে অনুস্যূত ব্রহ্ম-সত্তার কথা একেবারে ভুলিয়া যায়।

আমাদিগকে তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। বেদান্ত-দর্শনের সিদ্ধান্ত কি প্রকার? আগামী বারে তাহা বলিতে চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

স্মৃতি

(১)

একটী স্মৃতি সকল স্মৃতির সেরা—
জাগে চিত্ত মাঝে,
একটী গীতি দুঃখ দিয়ে ঘেরা—
সুখের মত বাজে।
কন্যার প্রতি মায়ের বিদায়-বাণী,
যশের মত নেশা,
বিরঞ্জিত সন্ধ্যার ছায়া খানি
সুখে দুঃখে মেশা।

(২)

এসেছিল আমার চিত্তে নামি
ঊষার মত জেগে,
কি গরিমা দেখেছিলাম আমি
আকাশে ও মেঘে;
জন্মান্তরের যেন একটা গাথা
জীবন আমার ব্যেপে,
সৃষ্টির একখানা উজ্জ্বল ছেঁড়া পাতা
এল যেন কেঁপে।

(৩)

ঝাঁপিয়ে গীতি লভিল সে মরণ
ঝঙ্কারেরি কূপে,
পুড়ে গেল ঊষার দেহের বরণ
নিজের তীব্র রূপে।
ক্ষুব্ধ নইক, আছে সেই স্মৃতি
জীবন আমার ছেয়ে,
আকাশ থেকে আছে সেই প্রীতি
আমার পানে চেয়ে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

স্বদেশ-প্রেম।

(সামাজিক)

বিশুদ্ধ বিবাহ-প্রণালী।

২য় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

স্থান—মেসের বাসা। সময়—বেলা ৩টা। আসীন—বিজয় ও রমানাথ

রমানাথ। বিজয় তুমি আজ প্রাতে অভিষেক সভাতে যাও নি?

বিজয়। না। বাবা প্রাতে আমাকে একটা কাজ দিয়েছিলেন। ভাই, বলনা, কি রকম হলো?

রমানাথ। সে দৃশ্য না দেখ্‌লে কল্পনা করা যায় না। কেমন একটা পবিত্র ভাব। যেন স্বর্গ হতে দেবতারা আশীর্ব্বাদ-পুষ্প বর্ষণ কর্‌ছিলেন। বাতাস যেন সঙ্গীত-লহরী হয়ে খেল্‌ছিল। নির্ম্মল প্রেমের আকাঙ্ক্ষা-শিখা আপনা আপনি যেন স্বর্গের দিকে ভগবানের কাছে উঠেছিল। আর আমাদের গুরুজীর প্রত্যেক কথাটী প্রাণে কেমন বেজেছিল—ভাই তোমাকে কেমন কোরে বল্‌বো?

বিজয়। না ভাই, বলো, সব। হতভাগ্য আমি, সেখানে যেতে পারিনি।

রমানাথ। ভাই, বলি সংক্ষেপে—যেমন প্রভাত হলো, অমনি দলে দলে, সঙ্কীর্ত্তন কর্ত্তে কর্ত্তে, সভ্যগণ আস্‌তে লাগলেন। দেবভবন ফুল পাতায় সজ্জিত হয়ে মরি কি মধুর মূর্ত্তি ধরেছে! এদিকে যাদের অভিষেক হবে, এক শ জন গঙ্গায় প্রাতঃস্নান ক'রে গরদের কাপড় পরে বেদীর সম্মুখে এসে একে একে বস্‌লো।

বিজয়। হরগোবিন্দ ছিলো?

রমানাথ। সে গঙ্গাস্নান ক'রে সকলের পূর্ব্বে এসেছিল। গরদের কাপড়ে তারে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল।

বিজয়। বরটীর মত?

রমানাথ। দূর, বরটীর মত কেন? চেলীর কাপড় পরেনি ত, মাথায় টোপরও দেয় নি—বরটীর মত কেন দেখাবে?

বিজয়। শাদা গরদ পরে কাকে বিয়ে কর্ত্তে দেখিনি বটে। যাক, তারপর?

রমানাথ। যেমন সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিকে হাসি হাসি রাঙ্গা মুখে দেখা দিলেন, অমনি ঢং ঢং কোরে পেটা ঘরি বেজে গেল। তার পর মন্দিরের দুই দিক থেকে গম্ভীর শঙ্খধ্বনি হলো—ধূনার সুগন্ধে মন্দির পূরে গেল; বেদীতে অমনি গুরুজী বসিলেন। তিনিও গঙ্গাস্নান করে এসেছিলেন—কপালে চন্দনের ত্রিরেখা—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। পরণে নির্ম্মল ধবল বসন। তিনি যেমন বস্‌লেন, অমনি তানপূরা ও মৃদঙ্গ বাজতে লাগ্‌লো। ক্ষণকাল পরে, মেঘেন্দ্র বাবু—সেই মধুর কণ্ঠে ভগবানের গুণ গান আরম্ভ কর্‌লেন। সে গান শুনিয়া আমাদের সকলের চোখে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল। কি মধুর সেই গান! শুন্‌তে শুন্‌তে যেন স্বর্গে চলে গেলাম। গান যখন থাম্‌লো, অমনি যেন স্বর্গ হতে আমরা মর্ত্ত্যে এলাম।

বিজয়। হতভাগ্য আমি! এমন গান শুন্‌তে পেলাম না। গান হোয়ে গেলেই অভিষেক হলো?

রমানাথ। না। গানের পর শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ স্বামীজী বল্‌লেন "হে অভিষেক-প্রার্থী যুবকগণ! তোমরা অদ্য যে প্রতিজ্ঞা করিতে উদ্যত হইয়াছ, তাহা পালন করা সহজ নহে। জগতে পালনের পথ, প্রতিজ্ঞা রক্ষার ব্রত উদ্‌যাপনের পথ পুষ্পাকীর্ণ নহে, তাহা অনেক সময় কণ্টকময়। সংসারে জড় জগতের হীন আকর্ষণে যাঁহারা বর্দ্ধিত হইয়াছেন, অর্থকে যাঁহারা জীবনের সিংহাসনে বসাইয়াছেন, অর্থের জন্য ধর্ম্ম ও আত্মমর্য্যাদা যাঁহারা পদদলিত করিয়াছেন, তাঁহারা, তোমাদিগের পবিত্র ও উচ্চ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা দূরে থাক, তোমাদের উপহাস করিবেন, এবং তোমাদিগের অপেক্ষা আপনাদিগকে বুদ্ধিমান স্থির করিয়া তোমাদিগকে নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবেন। তাহাতে তোমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু এমন স্থানে বাধা পাইবে, যেখানে তোমাদের হৃদ্‌পিণ্ড যেন পরস্পর বিরোধী শক্তির আকর্ষণে ছিড়িয়া যাইবার মত হইবে। তোমাদিগের মস্তক সতত পিতৃচরণে ভক্তি-প্রণত থাকা উচিত। পিতার চরণ পুত্রের নিকট পূজ্য। সেই পিতার আজ্ঞা পালন এক দিকে, আর প্রতিজ্ঞা পালন অন্য দিকে। মনে কর পিতা পুত্রকে বলিতেছেন "পুত্র, অর্থ লইয়া তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।" ধর্ম্ম বলিতেছে, সত্যরক্ষা বলিতেছে, "অর্থ লইয়া বিবাহ করিও না"—তখন বিষম সঙ্কট—তখন অগ্নি-পরীক্ষা উপস্থিত হইবে। প্রত্যেকে মনে বুঝিয়া দেখ, সেই পরীক্ষার জন্য তুমি উপযুক্ত কি? যদি এই উভয় সঙ্কট পরিত্যাগ করিতে চাহ, এক্ষণে এই ব্রতে দীক্ষিত হইও না—এখনও সময় আছে—যাও গৃহে ফিরিয়া যাও। বৎস! তোমার পিতার অনুমতি চাহ, অথবা অনুমতির জন্য অপেক্ষা কর। বলো, তোমরা সকলেই কি দীক্ষিত হইবার জন্য পিতার অনুমতি পাইয়াছ? (হাঁ পাইয়াছি) "ভাল"। (রমানাথ বলিতে লাগিল) তাহার পরে একে একে সকলকেই গুরুজী এই রকম মন্ত্র দিলেন—"বল—

১। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি বিশুদ্ধ প্রণালীতে বিবাহ করিব।

শিষ্য। "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি বিশুদ্ধ প্রণালীতে বিবাহ করিব।"

গুরু। বল—(২) "যে বিবাহে অর্থের কথা উঠিবে বা থাকিবে, তাহা আমি করিব না।"

শিষ্য। যে বিবাহে ইত্যাদি—

গুরু। বল (৩) "আমি বিবাহে কন্যাকে কেবলমাত্র সংসার ধর্ম্ম পালনের সহধর্ম্মিণী বলিয়া গ্রহণ করিব, কোন কালে কখনও অর্থাগমের উপায় বলিয়া ভাবিব না।

শিষ্য। আমি বিবাহে কন্যাকে ইত্যাদি।

গুরু। বল—(৪) "আমি যতদিন বিবাহ না করিব,ততদিন জিতেন্দ্রিয় ও বিশুদ্ধ চরিত্র থাকিব।"

শিষ্য। আমি যতদিন ইত্যাদি—

গুরু। বল—(৫) আমি আমার সচ্চরিত্রতা দ্বারা, উপদেশের দ্বারা অন্যান্য কুমারগণকে এই "বিশুদ্ধ বিবাহ-প্রচলন-সভার"সভ্য করাইবার চেষ্টা করিব।

শিষ্য। আমি আমার—ইত্যাদি।

(রমানাথ বলিল) এই মন্ত্র একে একে গুরুজী একশত জনকে দিলেন, তৎপরে সকলের গলায় শ্বেত পুষ্পের মালা পরিয়ে দিলেন।

তখন বিশুদ্ধানন্দ স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন :—

"বৎসগণ! অদ্য তোমাদের অভিষেক হইল। এক্ষণ, সংসার-রাজ্যে যাও। এই অন্ধকারময় সমাজে তোমরা প্রত্যেকে এক্ষণে এক একটা প্রদীপ। তোমরা এক্ষণে সমাজের ভরসা স্থল, রক্ষক। ভবিষ্যতে স্থূল জগতে তোমাদের যে পবিত্র শুভ বিবাহ হইবে, অদ্য আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম জগতে, সেই পবিত্র শুভ বিবাহের পূর্ব্ব-সূচনা হইল। এই আধ্যাত্মিক জগতে সুনীতি রাজকন্যা অথচ তপস্বিনী। হে অভিষেকপূত নবীন তপস্বী, হে বিশুদ্ধ-চরিত্র বালকবীর! অদ্য সেই তপস্বিনী-রাজকন্যা 'সুনীতি'র গলে পরিণয় মাল্য দান করিলে। অদ্য হইতে আত্মা-জগতে 'সুনীতি' তোমার ধর্ম্মপত্নী। যেদিন স্থূল (দেহ) জগতে তোমার বিবাহ হইবে, এই সুনীতি স্থূলভাবে তোমার পত্নী রূপে রূপে মূর্ত্তি ধারণ করিবেন। এখন যাঁহাকে ধর্ম্মচক্ষে দেখিতে হইবে, তখন তাঁহাকে চর্ম্ম-চক্ষে দেখিতে পাইবে। তখন তোমার বিবাহ, আত্মা ও দেহে পূর্ণ হইয়া, ভগবানের আশীর্ব্বাদের শরীরী-বিকাশে পরিণত হইবে। তখন তুমি তপস্বী রাজা, তোমার স্ত্রী তপস্বিনী রাজ্ঞী। তখন তোমরা স্বামী ও স্ত্রী—এই ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের সুচিকিৎসক হইবে—তখন এই ব্রতপূত বিবাহ-বন্ধনে, সনাতন প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলনে, এই হরগৌরীর স্বর্গীয় পরিণয়ে, মঙ্গলময় জ্যোতির্ম্ময় কুমার উৎপন্ন হইবে—তাহার কার্য্য, চরিত্র, গুণ-গৌরবে তমসাচ্ছন্ন সমাজ আলোকময় হইবে, আনন্দ ও পুণ্যের উৎস ছুটিবে। ভগবান তোমাদিগের সেই সুখের দিন আনয়ন করিয়া দিন। ওঁ ভগবতে নমঃ।

বিজয়। তোমার ত গুরুজীর কথাগুলি বেশ মনে আছে।

রমানাথ। না ভাই, আমার ঠিক মনে নাই। ভাব,গুরুজীর কেমন গভীর কম্পিত স্বর, তখন যেন প্রত্যেক কথাটা কাণের মধ্যে দিয়ে হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করে।

বিজয়। ভাই,এখন আমি যাই।

রমানাথ। কল্য "দেবভবনে" শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামীজী বিশুদ্ধ বিবাহ প্রণয়ন সম্বন্ধে বক্তৃতা কর্ব্বেন। আসবে ত?

বিজয়। কি জানি—বাবা যদি নিষেধ করেন।

রমানাথ। তা নিষেধ কর্ব্বেন না। এমন অন্যায় নিষেধ কেন কর্ব্বেন?

২য় অঙ্ক। ২য় দৃশ্য।

স্থান—রামধন বাবুর বৈঠকখানা, কাল-রাত্রি।

রামধন বাবু তাকিয়ার ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। নীলমণি বাবু তাঁহার সম্মুখে বসিয়া,হাতে একটা হুঁকা। বিজয় (রামধন বাবুর পুত্র) রামধন বাবুকে একখানি পত্র পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন।

নীলমণি। মহাশয়! লেখাপড়া অধিক জানি না ও বহি বুঝি না, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি? (বিজয়ের দিকে ফিরিয়া) বাবা! তুমি ত অল্পবয়সেই পণ্ডিত হয়েছ, বলদিনি—এই যে চাউলের দর দিন দিন বাড়ছে—কি কর্লে অল্প বেতনভোগী মধ্য-

বিত্ত ভদ্রলোক এখন বাঁচে? তাদের বেতন ত বাড়ছে না।

রামধন বাবু (বিজয়ের পিতা) বেশ। বিজয়! তুমি এর উত্তর দেও।

বিজয়। আমার বোধ হয় দেশে যদি চাউলের দর দিন দিন বাড়ে, তাহলে মধ্যবিত্ত লোকের আয়ও যাতে বাড়ে, তা করা উচিত।

নীলমণি। আমার বেতন বাড়াত আমার হাতে নয়।

বিজয়। আমি বেতন বৃদ্ধির কথা বল্‌ছিনে।

নীলমণি। বেতন বৃদ্ধি যদি না হয়, আমার আয় আর কিসে বাড়তে পারে?

বিজয়। এমন কোন কাজ শেখা, যা আপনি রাত্রিতে আর প্রাতে কর্ত্তে পারেন। এই পাড়ার শিবনাথ বাবুরা আফিসে কাজ করেন, তাঁরা গঞ্জি ও মোজা বুন্‌তে শিখেছেন, একটা দোকান করেছেন, সেখানে প্রাতে ও রাত্রিতে গঞ্জি ও মোজা তৈয়ার করেন ও বিক্রয় করেন। শুন্‌ছি তাদের তাঁতে লাভ হচ্ছে। বাড়ীর ছেলে মেয়েরা, যারা এখন অনেক সময় বসে থাকে, তারাও কাপড় বুন্‌তে বা অন্য কোন শিল্পকাজ শিখতে পারে, তা কি হতে পারে না? বাবা! (রামধন বাবুর প্রতি)

রামধন বাবু। তা হবে না কেন? আসামে ভদ্রলোকের বাড়ীতে অধিকাংশ স্ত্রীলোক কাপড় বুন্‌তে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে, হাতে কাপড় বুন্‌তে এত শ্রম বা খরচা পড়ে যে, লোকে কলের সস্তা কাপড় ফেলে তা কেনে না।

বিজয়। হাঁ, তবে তাঁত ভাল কর্ত্তে পার্লে কি তাঁতে কম শ্রমে ও খরচায় কাপড় তৈয়ারী হতে পারে না?

রামধন বাবু। পারে।

নীলমণি। বাপু, কল ফল এখন আর পার্ব্বো না। এখন এ বয়সে কি কল ফল শিখতে পারি? আর কোন উপায় বল্‌তে পার না কি?

বিজয়। আচ্ছা। প্রত্যেক ভদ্র গরিব ভদ্রলোকের যাতে সমুদয় পরিবারের চাউলের সংস্থান হয়, এমন কতক জমী চাষ কর্লে সুবিধা হতে পারে না কি?

নীলমণি। চাকুরী ছেড়ে জমী চাষ কর্ত্তে হবে?

বিজয়। চাকুরীর সঙ্গে সঙ্গে জমী চাষ করা যায় না কি?

নীলমণি। ১ম আপত্তি, আমি সেখানে চাকুরী করি, সেখানে জমী পাব কোথা? ২য় আপত্তি, যদি বা জমী পাই, আমি চাকুরী করি, আমার চাষবাস দেখ্‌বে কে। ৩য় আপত্তি, চাষে যে খরচা পড়বে, তাতে বোধ করি বিশেষ লাভ থাক্‌বে না। কখন কখন লোকসানও হতে পারে।

রামধন বাবু। অনেক স্থানেই জমী পাওয়া যায়। প্রাতে কাছারী যাবার পূর্ব্বে আপনি চাষবাস দেখ্‌তে পারেন। কৃষাণের সঙ্গে ভাগে জোত কর্লে লোকসানের সম্ভাবনা নাই, লাভ হওয়াই সম্ভব।

নীলমণি। মহাশয়, চাকুরী আর চাষ, দুদিক ঠেকান আমার পক্ষে বড় কঠিন বোধ হচ্ছে। চাকুরী ছেড়ে কেবল চাষে ভদ্রলোকের চল্‌তে পারে না।

রামধন বাবু। পার্ব্বে না কেন? কিন্তু ভদ্রলোকের চাষবাস কর্ত্তে হলে কৃষিকাজ রীতিমত শেখা আবশ্যক।

নীলমণি। আমি ভাব্‌ছি আজ কাল চাকুরী পাওয়া বড় কঠিন। চাকুরীতে কষ্টও খুব। যদি কৃষি কাজ চলে, তা হলে আমার ছেলেটাকে কৃষি কাজ শেখাব।

রামধন বাবু। সে ত ভালই।

নীলমণি। মহাশয়, তবে এখন চল্লাম। আরও দু চার জনকে জিজ্ঞাসা করি, তারা কি বলেন।

(নীলমণির প্রস্থান)

বিজয়। বাবা, সেদিন গ্লাডষ্টোনের কথাটা কি বলিছিলেন।

রামধন। কি বিষয়?

বিজয়। গরিব শ্রমী লোকদের কিসে অধিক উপকার হয়—সস্তা দরে জিনিষ পেলে, না অধিক কাজ পেলে?

রামধন। অধিক কাজ পেলেই শ্রমীদের মঙ্গল। Gladstone বলেন—"It is a

mistake to suppose that the best mode of giving benefit to the labouring classes is simply to operate on the articles consumed by them; if you want to do them the maximum of good, you should rather operate on the articles which give them a maximum of employment"*

বিজয়। Tariff Reform বিষয়টা কি আমাকে আজ বুঝিয়ে দেবেন?

রামধন। আজ সময় নাই, কাল হবে। দেখ বিজয়, তোমাকে আবার সাবধান কোরে দিচ্ছি। তুমি যেন কোন হেঙ্গামে ফেসাদে মিশো না।

বিজয়। আজ্ঞে, মিশ্‌বো না।

(বিজয়ের প্রস্থান)

রামধন। (স্বগতঃ) বিজয় ভাল ছেলে, নম্র, পিতৃভক্ত। সে কখনই আমার অবাধ্য হতে পার্ব্বে না। এ বিয়েতে সে মত কর্ব্বে। দেখি তার মাকে আজ কি বলে।

৫ম দৃশ্য।

স্থান—রামধন বাবুর অন্তঃপুর। কাল—সূর্য্যাস্তের সময়।

আসীন বিজয় ও তাহার জননী।

বিজয়। মা! বাবা কোথায়?

জননী। বেড়াতে গিয়েছেন।

বিজয়। কখন আস্‌বেন?

জননী। কেন?

বিজয়। কেদার বাবু তাঁর জন্য বাহিরে বসে আছেন। ২০৲ টাকা মাহিনে ত তার কোন মতেই চলে না। তাই বাবা তাকে কি একটা কাজ দেবেন—তাই বোধ হয় এসেছেন।

জননী। বাবা, তোমাকে একটী কথা বলি, বিয়ের কথা বল্‌লেই তুমি পালাও।

বিজয়। মা আমি এখন চল্লুম। (প্রস্থানোদ্যত)

জননী। না—তুমি বসে আমার কথা শুন। তোমার বাবা তোমাকে বল্‌তে বলেছেন—শোন।

বিজয়। কি বল। শুনছি।

জননী। বলি, বকুলপুরের পাত্রীটী বেশ সুন্দরী। কেদার বাবুর মেয়েও খুব সুন্দরী। আমার তাতে আপত্তি নাই। তবে উনি রাজি নন। উনি যখন বল্‌ছেন, বকুলপুরের জমীদারের মেয়েটীর সঙ্গে বিয়ে দেবেন, তোমার তাতে কি অমত করা উচিত?

বিজয়। আমি ত আপনাদের সকল কথাতেই স্বীকৃত আছি, কেবল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্ত্তে পার্ব্বো না। ঐ বিয়েতে, বা যে বিয়েতে বাবা মত কর্ব্বেন, যদি টাকা না নেওয়া হয়, আমি তাতে কখন অমত কর্ব্বো না।

জননী। উনি বলেন, ছেলে বাপের মতে চলবে, না বাপ ছেলের মতে চল্‌বে?

বিজয়। আমি এর উত্তর কি দিব মা?

জননী। তিনি বলেছেন, আমি চার দিন অপেক্ষা কর্ব্বো। তারপর যদি বিজয় আমার কথা না শোনে, আমি পরে তার মুখ দর্শন কর্ব্বো না। উনি বড় জেদী মানুষ, তা জানত বাবা। আমার ভয়, কি কর্ত্তে কি হয়।

বিজয়। আমি রাজি না হলে বাবা কি আমাকে বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দেবেন?

জননী (কাঁদিয়া ফেলিলেন, চখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন) বিজয়, বিজয়, কি বল্‌ছিস—তোকে ছেড়ে কি আমি এক দণ্ড বাঁচি, অমন দারুণ কথা কখন মুখে আনিস নে।

বিজয়। (চোখে জল এসেছে) মা! বাবা আমাকে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দেন দেবেন, কি কর্ব্বো। পথের কাঙ্গাল হতে হয়, হব। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্ত্তে কখনই পার্ব্বো না।

জননী। বিজয়! বিজয়! (পুত্রের গলা জড়াইয়া ধরিয়া) বিজয়! তুই কি আমাকে ফেলে চলে যেতে পারিস (উভয়ের অশ্রুমোচন)

বিজয়। (তাঁহার জননীর চরণ ধরিয়া) মা, তোমার পা ধরিয়া মিনতি করতেছি, তুমি কাঁদিয়া আমাকে মিথ্যাবাদী করিও

---

* গত আশ্বিন মাসের নব্যভারতে ২৯২ পৃষ্ঠাতে ভুল ক্রমে ইহার ভিতরের দুই ছত্র ছাপানে বাদ পড়িয়াছিল।

না। আমাকে যদি গৃহত্যাগ কর্ত্তে হয়, তাহলে তুমি যে কাঁদবে—তা মনে করে আমার এখনি যে বুক ফেটে যাচ্ছে (দুই-জনেরই ক্রন্দন।

(মনোরমার প্রবেশ)।

মনোরমা। মা কাদ্‌ছে কেন, দাদা তুমিও যে কাদ্‌ছ (এই বলিয়া মনোরমা বিজয়ের গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিল,—

দাদা! বাবা তোমাদের বকেছেন, (মনোরমার ক্রন্দন)

বিজয়। মনোরমা, কিছু নয়,কাঁদিসনে। বলিয়া মনোরমার কপাল চুম্বন করিলেন (স্বগত) এই হয়ত আমার শেষ বিদায়।

মনোরমা। দাদা, তোমার চোখে আবার যে জল পড়্‌ছে—আবার কাঁদ্‌ছ?

বিজয় (চোখ মুছিয়া) কই,বাহিরে কেদার বাবু এসেছেন। তোর মাষ্টার হবে, জানিস্‌?

মনোরমা। (চোখের জল মুছিয়া) ইঃ—আমার মাষ্টার হবে বই কি! আমি যে মার কাছে পড়ি।

বিজয়। এখন আসি মনোরমা। মা চরণধূলি দেও।

(উত্তমানন্দের বক্তৃতা)।

৪র্থ দৃশ্য।

সন্ধ্যা হইল। কলিকাতা সহরে দীপাবলী জ্বলিল। "দেবভবন" উজ্জ্বল আলোকে দীপ্তিময় হইল। বালক, যুবক ও বৃদ্ধের স্রোত দেবভবন দিকে প্রবাহিত হইতেছে। আজ উত্তমানন্দের বক্তৃতা হইবে, তাই সেখানে এত লোকের সমাগম। আর তিলার্দ্ধ স্থান নাই। সকলেই শ্রীমৎ উত্তমানন্দের আগমন ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন। ৭টা বাজিল। অমনি শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামী সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সম্মানের জন্য সকলেই দাঁড়াইলেন। তখন উত্তমানন্দ বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ করিলেন। এবং চক্ষু মুদিয়া ক্ষণকাল প্রার্থনা করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—"দীর্ঘকাল পরে, আমি অধুনা এই রাজধানীতে আসিয়াছি। চতুর্দ্দিকে অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। কেমন একটা নূতন ভাব দেখিতেছি, কোথাও রাজনীতির কল্লোল, কোথাও চাঞ্চল্য বা উদ্বেগ, কোথায় বা ভয়, কোথায়ও বা ভরসা—কখনও বা হৃদয়াকাশে আতঙ্কের উল্কাপাত দেখিতেছি, কখন বা মন হাস্যমুখী আশা-উষার কনক কিরণছটা—দেখিতে পাইতেছি। কখন বা এই মলয় সমীরণ বহিতেছিল, পাখী ডাকিতেছিল, কবিত্ব ও সঙ্গীত ছুটিতেছিল, আবার এই বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, অম্বর পথে কড় কড় ধ্বনি শুনিতেছি—এ কি ভাব! আমি ভরসা করি, আকাশ শীঘ্র পরিষ্কার হইবে। শীঘ্র নির্ম্মেঘ প্রফুল্ল আলোকে দেশ আনন্দময় হইবে। কিন্তু আপাতত ইহা বিবেচ্য যে, এক্ষণে এই মহানগরীতে সমগ্র দেশে যে একটা চাঞ্চল্যের ভাব দেখিতে পাইতেছি—ইহা কি রাজনীতিঘটিত? ইহা কি কেবল রাজনীতিতে আবদ্ধ? ইহা কি শ্রেয়ঃ লাভ করিবার ইচ্ছা-সম্ভূত? আমি সন্ন্যাসী। সুতরাং রাজনীতির সহিত আমার সংশ্রব নাই। কিন্তু এ কথা আমি বলিতে পারি যে, রাজনীতি সমাজনীতির অন্তর্গত। সমাজের মর্ম্মস্থান ব্যাধিগ্রস্ত হইলে সমাজ-দেহ কখনই সুস্থ হইতে পারে না। সমাজ-দেহ সুস্থ না হইলে সমাজনীতির অন্তর্গত যে রাজনীতি, তাহা কখন সুস্থ হইতে পারে না। সমাজ যদি পীড়াগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে, সেই সমাজের রাজনীতির অতি উচ্চ উদ্যম, অসাধারণ বীরত্ব, ক্ষিপ্ত ব্যক্তির আত্মঘাতের ন্যায়, উন্মাদের অহেতুক হননের ন্যায় নিষ্ফল, ভয়াবহ, শোকাবহ হয়। যত দিন ধর্ম্ম, বিশুদ্ধতা, উচ্চাশয়তা, সমাজের অভ্যন্তরে পরিব্যাপ্ত না হইবে, তত দিন রাজনৈতিক চেষ্টা দ্বারা সমাজের প্রকৃত মঙ্গল কখনই হইবে না। আমাদিগের নিজেদের মধ্যে, পরস্পরের সহিত ব্যবহারে, যদি নীচ স্বার্থপরতা থাকে, আমাদিগের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ যদি নীচ বণিকবৃত্তিতে দূষিত হয়, তাহা হইলে অন্য জাতির সহিত সম্বন্ধ কখনই পরিণামে উচ্চভাবাপন্ন হইবে না, মঙ্গলপ্রদ হইবে না। তাই যাহাতে আমাদের সমাজ, ব্যাধি-মুক্ত হইয়া, সুস্থ ও সবল হইতে পারে, পবিত্র ভাবে কার্য্যে পটু হইতে পারে, তাহার চেষ্টা

করিতে হইবে। সামাজিক ব্যবহারে যে আত্ম-সংযম, দূরদর্শিতা, ধর্ম্মানুষ্ঠান অভ্যস্ত হইবে, তাহা আপনাদিগের রাজনৈতিক ক্রিয়াকে সুস্থভাবাপন্ন করিবে, মঙ্গলময় করিবে। যদি প্রেম চাহেন, তাহা হইলে সমাজের হৃদয়ে তাহা অগ্রে অনুসন্ধান করুন।

আত্মঘাত পাপ। সমাজ অদ্য আত্মঘাতী হইয়াছে, ছিন্নমস্তার ন্যায় আপনার রুধির আপনি পান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে, ইহা সমাজের একটী নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ভাব। যখন এই উচ্ছৃঙ্খল ভাব অতিশয় বর্দ্ধিত বা ঘনীভূত হয়, তখন সমাজে মহা অনর্থ উৎপন্ন হয়, সেই অনর্থের প্রতিকার না করিলে সমাজের ধ্বংস হয়, চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া যায়। এই দুর্দ্ধর্ষ আত্মঘাতী ভাব, নানা ক্ষেত্রে নানা আকারে বিচরণ করে—কখন বা সমাজের এক অংশ আর এক অংশকে পীড়ন করে—ধনী নির্ধনকে পীড়ন করে, ভূস্বামী কৃষককে দলিত করে, প্রভু ভৃত্যকে নির্য্যাতন করে। কখন বা পরিবারের এক অংশ অপর অংশকে লাঞ্ছিত করে,—পতি পত্নীকে যাতনা দেয়, ভ্রাতা ভ্রাতাকে নিপীড়িত করে। কখন বা এক ব্যক্তির এক অংশ অপর অংশকে, অর্থাৎ নীচপ্রবৃত্তি উচ্চপ্রবৃত্তিকে প্রপীড়িত করে, লোভ কর্ত্তব্যজ্ঞানকে পরাহত করে—ধর্ম্মের পবিত্র সম্পর্ক মধ্যে পাপ বণিকবৃত্তি আনিয়া আত্মাকে জখম করে। যাহাকে আপনারা পাপ বলেন, তাহা ভাল করিয়া দেখিলে একরকম আত্মঘাত, আত্মপীড়ন মাত্র। এই ব্যক্তিগত আত্মপীড়ন যখন অধিক লোকের মধ্যে দেখা যায়, তখন তাহা,—ব্যক্তিগত আত্মপীড়ন বিস্তৃত হইয়া সামাজিক আত্মপীড়নে পরিণত হয়।

এক একটী মনুষ্য এক একটী সমাজ। যখন কোন মনুষ্যের সমুদয় প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে সমুচিত সামঞ্জস্য থাকে, তখন তাহার সুস্থ ভাব। যখন বিবেকের আদেশে রিপুগণ চালিত ও নিয়মিত হয়, তখন হৃদয়রাজ্যে সুশাসন থাকে, আর যখন রিপুগণ ভাবী-পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করে না, আশু সুখের অনুসরণ করে, জ্ঞান বা বিবেকবাণী শুনে না, তখন হৃদয় মধ্যে একটা নৈতিক অরাজকতা ঘটে, নৈতিক অরাজকতা বিস্তৃত হইয়া সামাজিক অরাজকতা উৎপাদন করে। ব্যক্তিগত অরাজকতা ও রাজনৈতিক অরাজকতার মধ্যে সাধারণ ধর্ম্ম এই, উভয়েই দূরদর্শিতা নাই; উভয়ই বর্ত্তমান উত্তেজনায় অধীর হয়, উভয়ই সামঞ্জস্যকে উপেক্ষা করে, উভয়ই শ্রেয়ঃ বলিয়া যাহাকে অনুমান করে, তাহাতে শ্রেয়ঃ লাভ হয় না, তাহাতে আত্মপীড়ন হয় মাত্র।

যাউক সে কথা। সামাজিক আত্মপীড়নই আমার অদ্যকার ব্যাখ্যার বিষয়। সামাজিক আত্মপীড়নের নির্দ্দিষ্ট অংশ মাত্র অদ্য আমি আলোচনা করিব। কিন্তু যে আত্মপীড়নে অদ্য ভারতের অযুত অযুত পরিবার অবসন্ন হইতেছে, এবং যাহা নানা দিকে সমাজকে নীচ, দুর্ব্বল, দুঃখ-সন্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে—সেই সামাজিক আত্মপীড়ন—"নীচ বণিক্‌ভাবাবিষ্ট বিবাহপ্রণালী" সম্বন্ধে আমি অদ্য আপনাদিগকে কিছু বলিতে চাহি। কিন্তু এই বক্তৃতার পথ কুতর্ক-কণ্টকে দুর্গম হইয়া রহিয়াছে। প্রথমতঃ সেই কণ্টকগুলি আমি উন্মূলিত করিবার চেষ্টা করিব। আপনারা একটু ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে পারিবেন কি? (বলুন বলুন) (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

মলিনার বিবাহে।

১

ছিলি আমাদের মেয়ে, আমাদের মুখ চেয়ে,
একান্ত আপন ;
আমাদের কোলে কাঁখে, আমাদের বাহুপাকে,
জড়ায়ে জীবন।
দেখি পূর্ণ দশ বর্ষ স্নেহ, যত্ন, সুখ, হর্ষ,
আদর, সোহাগ,
আমাদের যাহা শুভ, যাহা সত্য, যাহা ধ্রুব,
যাহা পুণ্যভাগ।

২

এ আনন্দ-মহোৎসবে, মধুর বাঁশরী-রবে
বিষণ্ণ হৃদয়।
এত হাসি, ফুলরাশি, তবু আঁখিজলে ভাসি—
কত মনে হয়!
মনে হয়,—সংসারের শত-সুখ-দুখ-ফের,
তরঙ্গ ভীষণ!
কত কষ্ট, কত ব্যথা, কত ছলা, কুটিলতা,
কতই পীড়ন!

৩

যত কেন মনে করি, রাখিতে পারিনা ধরি,
উঠে হুলুধ্বনি।
হৃদি-অন্তঃপুর হতে সহস্র নয়ন-পথে
দাঁড়াও, বাছনি!
জগতের আলোরাশি পড়ুক মুখেতে আসি!
দয়া মায়া ভুলি—
কঠোর জগত-ঝাঝ, কঠোর কর্ত্তব্য-কাজ
দিনু হাতে তুলি।

৪

বাঁধিতে নূতন নীড়ে যাও, বাছা, ধীরে ধীরে ;
বাঁধ বুকে বল।
লও সুখ, লও সাধ, লও পিতৃ-আশীর্ব্বাদ
ভরিয়া আঁচল!
লও নিত্যনব আশা, জগজনে ভালবাসা
পূরিয়া হৃদয়!
লও তৃপ্তি, লও শান্তি! রেখে যাও ভুল ভ্রান্তি
দুঃখ সমুদয়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অধ্যায়

(রাজীবলোচন কৃত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।)

(পূর্ব্বপৃষ্ঠার পর—শেষ)

কোঠির বড় সাহেব পত্র জ্ঞাত হইয়া পুনরায় উত্তর লিখিলেন তাহার বিবরণ এই।

আপন মঙ্গল ও শিষ্টাচারের পর লিখিলেন নবাব ভাইজীউ সাহেবের পত্র পাইয়া সকল সংবাদ জ্ঞাত হইলাম। রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসের কারণ পুনঃ পুনঃ লিখিতেছেন আর লিখিয়াছেন যে দেশাধিকারির বাক্যে নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারে এবং

রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনে পাপ আছে সেও প্রমাণ বটে কিন্তু আত্ম আত্ম শাস্ত্র মতে এই হয় যে শরণাগত জনের কারণ প্রাণ দিবেক তথাপি তাহাকে ত্যাগ করিবে না অতএব দেশাধিকারী ব্যতিরেকে অন্য কেহ প্রাণ দণ্ড করিতে পারে না তুল্যাতুল্য হইলেই প্রাণের সঙ্কা কিন্তু শরণাগতের সে সঙ্কা করিবে না তাহার প্রমাণ অনেক অনেক শাস্ত্রে আছে সমান জনের সহিত শরণাগতের কারণ বিবাদ হইলে প্রাণ যাওনের কারণ কি অতএব যেখানে প্রাণপণ সেখানে শরনাগতের জন্য যদি দেশাধিকারির সহিত বিবাদ হয় তাহাও স্বীকার করিবে তাহাতে যদ্যপি প্রাণ যায় তথাপি ধর্ম্ম এবং যে নিয়ম আছে তাহাও রক্ষা হবে। অতএব আপনকার নিকট উত্তম উত্তম পণ্ডিত আছে তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন যদি তাহারদিগের ব্যবস্থাতে শরণাগতকে ত্যাগ করা যায় তবে আমি ত্যাগ করিব। আর এ রাজ্য পূর্ব্বে হিন্দু লোকেরদিগের ছিল আপনকার নিকটে অনেক অনেক হিন্দু চাকর আছে তাহারা অবশ্য আপন আপন শাস্ত্র জ্ঞাত আছে দেখ অতি পূর্ব্বে দণ্ডী নামে এক রাজা ছিলেন সর্ব্বদা মৃগয়া করিতেন। এক দিবস দণ্ডী রাজা মৃগয়াতে গমন করিলেন এক বনের মধ্যে গমন করিয়া মৃগয়া করিতেছেন। ইতিমধ্যে এক অশ্বিনী দেখিলেন অত্যন্ত চঞ্চল গতি এবং আশ্চর্য্য মূর্ত্তি অশ্বিনীকে দেখিয়া রাজা অতিশয় হৃষ্ট হইয়া সকল সৈন্যকে কহিলেন এই অশ্বিনীকে ধর। রাজাজ্ঞা পাইয়া সকল সৈন্য অশ্বিনীকে ধরিলেক। দণ্ডী রাজা অশ্বিনীকে লইয়া আত্মরাজ্যে আসিলেন। অশ্বিনী দিবসে ঘোটকী রাত্রে এক অপূর্ব্বা সুন্দরী কন্যা হয় ইহাতে দণ্ডী রাজার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। এইরূপে কিছু কাল যায় এক দিবস রজনীতে সেই কন্যাকে দণ্ডী রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে আমাকে সত্য কহ। তখন সেই কন্যা কহিলেন আমি স্বর্গের নৃত্যকী ছিলাম এক দিবস ইন্দ্রের নিকট নৃত্য করিতেছি অন্যমনস্কা হইলাম ইহাতেই তাল ভঙ্গ হইল। তাল ভঙ্গ হওনে ইন্দ্র উষ্মা করিয়া কহিলেন যেমন তুমি মন্দ নৃত্য করিলা অতএব অশ্বিনী হইয়া সর্ব্বদা বন মধ্যে নৃত্য কর গিয়া। পরে আমি ইন্দ্রকে বহুবিধ স্তব করিলাম। পরে ইন্দ্র কিঞ্চিৎ তুষ্ট হইয়া কহিলেন তুমি রজনীতে কন্যা হইবা এবং দণ্ডী রাজা তোমাকে ধরিবেক তারপর মুক্ত হইয়া আমার নিকটে আসিবা। ইহা শুনিয়া দণ্ডী রাজা যত্নপূর্ব্বক অশ্বিনীকে রাখেন। এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ আপন আলয় হইতে শ্রবণ করিলেন যে দণ্ডী রাজা এক অপূর্ব্বা অশ্বিনী পাইয়াছে সেই অশ্বিনী চাহিলেন দণ্ডী রাজা সে অশ্বিনী কদাচ দিলেন না। পরে শ্রীকৃষ্ণ বহু সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। দণ্ডী রাজা শ্রবণ করিলেক যে শ্রীকৃষ্ণ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন ইহা শুনিয়া পলাইয়া অনেক অনেক স্থানে গমন করিলেন। পরে পাণ্ডব পুত্র যুধিষ্টির ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব ইহার দিগের মধ্যে ভীমের শরণাপন্ন হইলেন। ভীম আশ্বাস করিলেন হে দণ্ডী রাজা অশ্বিনীর সহিত আমার নিকটে থাক তোমার কোন চিন্তা নাই। দণ্ডী রাজা যথেষ্ট আশ্বাস পাইয়া ভীমের নিকটে রহিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ শুনিলেন যে দণ্ডী রাজা অশ্বিনীর সহিত ভীমের শরণাপন্ন হইয়াছে পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ দূত পাঠাইলেন যে দণ্ডী রাজা অশ্বিনীর

সহিত সেখানে আছে অতএব তাহাকে এবং অশ্বিনীকে শীঘ্র আমার নিকট পাঠাইবেন। এই সংবাদ পাইয়া ভীম বড় ভাবিত হইলেন ভীমেরদিগের বল বুদ্ধি বিক্রম যে কিছু সকলি শ্রীকৃষ্ণ অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলেন যে শরণাগত জনকে রক্ষা যদি না করি তবে বৃথা প্রাণ ধারণ করা যদি না দিই তবে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবেক কৃষ্ণের যুদ্ধেতে প্রাণ রক্ষা হইবে না তবে কি করি। অনেক মত চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন বরং যুদ্ধেতে প্রাণ যায় সেও উত্তম তথাপি শরণাগত জনকে দেয়া মত নহে। ইহাই স্থির করিয়া কৃষ্ণের দূতকে বিদায় করিলেন দণ্ডী রাজা ও অশ্বিনীকে দিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ পাইয়া মহা ক্রোধে সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন। পশ্চাৎ ভীম আত্ম সহোদরেরদিগকে সম্বাদ দিলেন তখন যুধিষ্টির প্রভৃতি শুনিয়া মহা ক্রোধান্বিত হইয়া রণ করিতে প্রবর্ত্ত। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন তোমরা আমার আশ্রিত দণ্ডী রাজার কারণ আমার সঙ্গে রণ করিতে আসিলা। ভীমার্জ্জুন কহিলেন আপনি যে কহিলেন সে প্রমাণ বটে কিন্তু শরণাগত জনের কারণ আমরা প্রাণ দিতে স্বীকার করিয়াছি। তখন শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন আমি তোমারদিগের সাহস এবং ধর্ম্ম জ্ঞান দেখিবার কারণ এরূপ করিয়াছিলাম। এরূপে কথোপকথন অনেক হইল পশ্চাৎ অশ্বিনী সাক্ষাতে আসিয়া কৃষ্ণ দর্শন করিয়া ইন্দ্রের অভিসম্পাত হইতে মুক্ত হইয়া আত্ম স্থানে গমন করিলেক॥

অতএব আমি হিন্দু লোকের কাছে এমন কথা শ্রবণ করিয়াছি এবং হিন্দু শাস্ত্রেও অনেক স্থানে প্রমাণ আছে যে শরণাগতকে কদাচ ত্যাগ করিবে না। আমারদিগের শাস্ত্রেও শরণাগতকে ত্যাগ করিতে যথেষ্ট নিষেধ আছে তথাপি বার বার লিখিতেছেন আপনি এ দেশের কর্ত্তা আপনকার নিকটে জাতীয় মানুষ্য আছে এবং সকলকে জিজ্ঞাসা করিবেন বিশেষত আমারদিগেরগণ প্রাণ সত্বে শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগ করিব না। অতএব রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে পশ্চাৎ কৌশল ক্রমে আপনকার নিকট পাঠাইব এই ক্ষণে আপনি কিঞ্চিৎ কালের জন্যে স্থির থাকিবেন। আর যে লিখিয়াছেন আমারদিগের বাণিজ্য অধিক হইতেছে অতএব রাজ কর অধিক লাগিবেক কিন্তু আমারদিগের বাণিজ্য এ দেশে অনেক কালাবধি আছে তাহাতে হস্তিনাপুরের সম্রাটের রাজা যিনি এই নিয়ম করিয়া দিয়াছেন এবং কত কত সুবা গিয়াছে কখন অধিক দিই নাই এখন অধিক দিব না। আপনি বিবেচক বিবেচনা করিয়া যে সৎ পরামর্শ হয় তাহাই করিবেন॥

এইমত লিখন লিখিয়া নবাব সাহেবের নিকট পাঠাইলেন॥

নবাব সাহেব কলিকাতার কোঠির বড় সাহেবের পত্র জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া পাত্রকে আজ্ঞা করিলেন কলিকাতার কোঠির সাহেব বুঝি আমার বাক্য শুনিলেন না অতএব আর এক পত্র লিখহ যদি বাক্য পালন করেন তবে ভালই নতুবা আমি কলিকাতা লুট করিয়া তাহারদিগকে এ দেশে থাকিতে দিব না। পাত্র নিবেদন করিলেন আপনি দেশাধিকারী কিন্তু শাস্ত্রমত বিচার করিলে ভাল হয়। তাহাতে নবাব কহিলেন আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে আমি শাস্ত্র বিচার করি না তুমি শীঘ্র পত্রের উত্তর লিখিয়া আনহ। মহারাজ মহেন্দ্র নীরব হইয়া পত্র লেখাইলেন তাহার বিবরণ এই॥

আত্ম শিষ্টাচারের পর লিখিলেন ভাই সাহেবের পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম আপনি অনেক অনেক শাস্ত্রমত লিখিয়াছেন এবং পূর্ব্ব যেমন যেমন হইয়াছে তাহাও লিখিয়াছেন এ সকলি প্রমান বটে কিন্তু সর্ব্বত্রেই রাজারদিগের এইপণ যে শরণাগত ত্যাগ করেন না তাহার কারণ এই রাজা যদি শরণাগত ত্যাগ করেন তবে তার রাজ্যের বহুল্য হয় না এবং পরাক্রমেরও ত্রুটি হয়। আপনি রাজা নহেন মহাজন কেবল ব্যাপার বানিজ্য করিবেন ইহাতে রাজার ন্যায় ব্যবহার কেন অতএব যদি রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে এখানে শীঘ্র পাঠান তবে ভালই নতুবা আমি আপনকার সহিত যুদ্ধ করিব। আপনি যুদ্ধ সজ্জা করিবেন কিন্তু যদি যুদ্ধ না করেন তবে পূর্ব্বের যে নিয়মিত রাজকর আছে এইক্ষণে তাহাই দিবেন আমি আপন চাকরেরদিগকে আজ্ঞা করিয়া দিলাম এবং শ্রীযুৎ কোম্পানির নামে যে ক্রয় বিক্রয় হইবেক তাহারি নিয়ম থাকিবেক কিন্তু আর আর যত সাহেব লোকেরা বাণিজ্য করিতেছেন তাহারদিগের স্থানে অধিক রাজকর লইব অতএব আপনি বিবেচক সৎ পরামর্শ করিয়া পত্রের উত্তর লিখিবেন। এইরূপ পত্র লিখিয়া কলিকতায় বড় সাহেবের নিকট পাঠাইলেন॥

কোঠির বড় সাহেব পত্র জ্ঞাত হইয়া আপনার চাকর লোককে জ্ঞাত করিলেন আর কহিলেন আমি রাজবল্লভ ও কৃষ্ণ দাসকে কদাচ দিব না অতএব বুঝি নবাবের সহিত আমার বিবাদ উপস্থিত হইল, কিন্তু নবাব এ দেশাধিকারী তাহার সৈন্য অধিক আমি মহাজনীয় ব্যবসা করি সৈন্য নাই তাহাতে চায়া কি তোমরা এ নগরে বাস করিয়া রহিয়াছ অতএব আত্ম আত্ম পরিবার অন্য দেশে প্রেরণ কর আর কিছু সৈন্য যদি সংগ্রহ করিতে পার তাহারও চেষ্টা পাও এবং নবাবের পত্রের উত্তর লিখহ।

এই মত পত্রের উত্তর প্রত্যুত্তর অনেক অনেক গেল নবাব স্রাজেরদৌলা কদাচ কাহারু বাক্য শ্রবণ করিলেন না মহা ক্রোধান্বিত হইয়া যাবদীয় সৈন্য সঙ্গে করিয়া যুদ্ধে রকারণ কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন॥

কলিকাতার কোঠির বড় সাহেব শুনিলেন যে নবাব স্রাজেরদৌলা সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন ইহা শ্রবণ করিয়া আপনার যাবদীয় চাকর লোককে আহ্বান করিয়া কহিলেন তোমারদিগকে পূর্ব্বেই সকল বৃত্তান্ত কহিয়াছি সংপ্রতি নবাব সসৈন্যে রণ করিতে আসিতেছেন তোমরা সকলে সাবধানে থাকহ এবং আর কিছু সৈন্য আমাকে আনিয়া দেহ। সাহেবের যত যত চাকর লোক সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে প্রবর্ত্ত এবং সাহেবের আজ্ঞানুসারে কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া আত্ম আত্ম পরিজন লোককে অন্য স্থানে গোপনে রাখিয়া আপনারা সকলে সৈন্যের সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। পুরাণ কোঠির গড়ের উপর থরে থরে কামান রাখিয়া রণ সজ্জা করিয়া সকলে সাবধানে থাকিলেন। তখন পুরাতন কোঠির নীচে গঙ্গা ছিলেন তাহাতে যুদ্ধের ছোট জাহাজ প্রস্তুত করিলেন এবং যাবদীয় ধন ও বহুমূল্য দ্রব্য সমস্তই জাহাজে রাখিয়া অত্যন্ত সাহস করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিলেন এবং বাগবাজারের পুলের উপর পাঁচশ কামান ও কিঞ্চিৎ সৈন্য রাখিলেন।

কিঞ্চিৎ গৌণে নবাব স্রাজেরদৌলা সব সৈন্য লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। বাগবাজারের পুলের নিকট উপনীত হইলেই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নবাবের বহু সৈন্য ছিল তথাপি পুলের সৈন্যগণকে জয়ী হইতে পারিতেছে না এবং নবাবের অনেক সৈন্য নষ্ট হইল। কলিকাতা নিবাসী লোক সকল তরণীতেই প্রায় আছে। রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস নৌকা যোগে বঙ্গ দেশেতে গমন করিয়া অতি গোপনে রহিলেন। পরে বাগবাজারে অনেক রণ করিয়া কোঠির বড় সাহেবের সৈন্য কাতর হইল। পরে নবাবের সৈন্য নগরে প্রবেশ করিয়া নগর নিবাসিরদিগের ধন এবং দ্রব্য যে যাহা পায় সে তাহাই লইতে লাগিল। পশ্চাৎ নবাবের প্রধান প্রধান সৈন্য সকল পুরাণ কোঠির নিকট উপনীত হইলেই কোঠির সাহেব রণ করিতে আরম্ভ করিলেন। নবাবের সৈন্যও রণ করিতে লাগিল কিন্তু কাহারু শক্তি হয় না যে এক পদ অগ্রগামী হন। সাহেবের যুদ্ধ ও সাহস দেখিয়া সকলেই যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে এমন যোদ্ধা কখন কেহ দেখে নাই শীলা বৃষ্টির ন্যায় গোলা গুলি পড়িতেছে। এইরূপ সপ্তাহ রণ হইল নবাবের বিস্তর সৈন্য প্রাণত্যাগ করিলেন। কোঠির সাহেবের সৈন্য অল্প কি করিবেন গড়ে তিষ্টিতে না পারিয়া জাহাজের উপর আরোহণ করিলেন। পশ্চাৎ নবাব সাহেবের সৈন্য গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রণ করিতে লাগিল। কোঠির বড় সাহেব জাহাজের উপর থাকিয়া অনেক প্রকার রণ করিলেন বিস্তর সৈন্যের অল্প সৈন্যে কি করিতে পারে। অনেক যুদ্ধের পর জাহাজ ভাষাইয়া সাহেব বিলাতে গমন করিলেন। তখন ভদ্র লোক সকলেই বিমর্ষ হইয়া কহিতে লাগিলেন যে এ দেশের আর মঙ্গল হয় না কেন না বিদেশী সওদাগর লোক আর আসিবে না যে অন্যায় উপস্থিত হইল অতএব যদি কখন ইঙ্গরাজেরা এ দেশে আইসেন আর ইশ্বর যদি জবনাধিকারী নষ্ট করেন তবেই এ রাজ্যের মঙ্গল হবে নতুবা এ দেশের লোকের যথেষ্ট দুর্গতি হইবেক। এই রূপ পরস্পর কহিতে লাগিলেন এবং ক্ষুদ্র লোক সকলেই হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল আর সকলেই মনে ২ নবাবের মন্দ কহিতে লাগিল। কোন ব্যক্তি কহে ভাই হে ইঙ্গরাজের তুল্য সত্যবাদী নাই এবং দয়া যথেষ্ট যে লোক অন্য স্থানে যে বেতন পাইত সেই লোক সাহেবের চাকর হইলে তার দ্বিগুণ বেতন মিলিত। এই রূপ সকলে সাহেবের গুণানুবাদ করিতে প্রবর্ত্ত।

পরে নবাব স্রাজেরদৌলা সমরে জয়ী হইয়া যাবদীয় লোককে আজ্ঞা করিলেন কোঠির সাহেবের চাকর লোকের বাটী ঘর যত আছে সকল ভাঙ্গিয়া ফেল। আজ্ঞা মতে সকল ভৃত্যেরা কলিকাতার যাবদীয় অট্টালিকা ভাঙ্গিতে প্রবর্ত্ত হইল নগর মধ্যে উত্তম স্থান রাখিলেক না। এইরূপ নগর ভগ্ন করিয়া সর্ব্বত্রে সৈন্য রাখিয়া নবাব মুরসদাবাদে গমন করিলেন। পাত্র মিত্রগণ সকলে অন্যায় দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন শঙ্কায় কেহ কিছু কহিতে পারেন না। এই রূপ এক বৎসর গত হইল।

পরে ইঙ্গরাজ সাহেবলোক সৈন্যে পাঁচ জাহাজ পরিপূর্ণ করিয়া কলিকাতার নিকটে আসিয়া দূত দ্বারায় সংবাদ জ্ঞাত হইলেন যে নবাব কিছু সৈন্য রাখিয়া আপনি রাজধানিতে গমন করিয়াছেন। পরে যে সকল সৈন্য

কলিকাতায় ছিল তাহারদিগের সঙ্গে রণ করিয়া সে সব সৈন্য নিপাত করিয়া কলিকাতার কোঠির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্ম পতাকা উঠাইয়া দিলেন।

পশ্চাত্ সকল মনুষ্য পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইল এবং পূর্ব্বে যে সকল লোক চাকর ছিল তাহারা শ্রবণ করিয়া আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া আপন ২ পরিবার লইয়া নগরে প্রবেশ করিল। পশ্চাত্ সাহেবের নিকট নানা জাতীয় খাদ্য দ্রব্য ভেট দিয়া আত্ম ২ সমাচার জ্ঞাত করাইলেন। সাহেব হাস্য করিয়া অনেক প্রকার আশ্বাস দিয়া পূর্ব্বে যে যে লোক যে যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল সেই২ লোক সেই২ কর্ম্মেতে নিযুক্ত করিলেন। নগর বাসী লোকেরদিগের আনন্দের সীমা নাই। পরে সাহেব প্রধান চাকরকে আজ্ঞা করিলেন যে পূর্ব্বে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় আমার নিকটে আসিয়াছিলেন তাহাতে আমি তাহাকে কহিয়াছিলাম যে বিলাতের আজ্ঞা না পাইয়া নবাবের সহিত বিবাদ করিতে পারি না এখন বিলাতের কর্ত্তার আজ্ঞা লইয়া আসিয়াছি নবাবের সহিত রণ করিব তাহারা আমার সাহায্য করিবেন কি না এই সমাচার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে কহিলে তিনি যে উত্তর করেন তাহা যাহাতে জ্ঞাত হইতে পারি তাহা করহ। প্রধান পাত্র কহিলেন যে আজ্ঞা আমি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকটে দূত প্রেরিত করিয়া সম্বাদ আনাইতেছি। পরে সাহেবের চাকর সাহেবের আগমন সমাচার বিস্তারিত করিয়া লিখিয়া মহা রাজার নিকটে দূত পাঠাইলেন। দূত কৃষ্ণনগরে উপনীত হইয়া মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র রায়কে পত্র দিল। রাজা পূর্ব্বেই সাহেবের আগমন সম্বাদ পাইয়াছিলেন পরে পত্র পাইয়া সকল জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া দূতকে রাজপ্রসাদ দিয়া পত্রের উত্তর লিখিলেন॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় সাহেবকে যে পত্র লিখিলেন তাহার বিবরণ এই॥

আপন মঙ্গল এবং অনেক অনেক প্রকার শিষ্টাচার লিখিয়া লিখিলেন সাহেব পুনরায় আগমন করিয়া কলিকাতা অধিকার করিয়াছেন ইহাতে অমৃতাভিষিক্ত হইয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইয়াছি এবং বুঝি আমারদিগের এ রাজ্য রক্ষা পাইবে। আপনকার সহিত পূর্ব্বে যে কথোপকথন হইয়াছিল সেই সকল সম্বাদ কারণ মুরসদাবাদে মনুষ্য প্রেরিত করিলাম আপনি রণসজ্জা করিয়া প্রস্তুত রাখিবেন মুরসদাবাদের সমাচার পাইলেই নিবেদন লিখিব কিন্তু পূর্ব্বে যে নিবেদন করিয়া আসিয়াছি তাহার অন্যথা কদাচ হবে না॥

এই প্রকার পত্র লিখিয়া কলিকাতায় সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পরে মুরসদাবাদে আত্ম পাত্রকে পাঠাইলেন। সাহেব রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের লিপি পাইয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন। পশ্চাত্ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র মুরসদাবাদে উপনীত হইয়া মহারাজ মহেন্দ্র ও রাজা রামনারায়ণ ও জগৎসেট ও মীর জাফরালীখান প্রভৃতি সকলকে পূর্ব্বের সমাচার স্মরণ করিয়া দিলেন। সকলেই যথেষ্ট আশ্বাস করিয়া কহিলেন তোমার রাজাকে সম্বাদ দেহ যে কলিকাতায় মনুষ্য পাঠান ও যাহাতে সাহেব ত্বরায় সৈন্য সহিত আইসেন তাহা করেন। মীর জাফরালী খান কহিলেন আমি নবাবের সেনাপতি সকল সৈন্য আমার বসতাপন্ন যেমত যেমত কহিব তাহাই সৈন্যেরা করিবে কিন্তু আমার এক কথা সাহেবকে পালন করিতে হইবে ইহাই

সাহেব পর্য্যন্ত নিবেদন করিয়া করার আনহ তবে যেমত যেমত সাহেব আজ্ঞা করিবেন আমি সেই মত কার্য্য করিব। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র কহিলেন কি কথা আজ্ঞা করুণ আমি সাহেবতক নিবেদন লিখিয়া করার আনাইব। মীরজাফরালি খান কহিলেন পশ্চাৎ এ দেশের নবাবি আমাকে দিবেন যদি সাহেব এই প্রতিজ্ঞা করেন তবে আমি মনোযোগ করিয়া সাহেবের সহিত যুদ্ধ করিব না এই সমাচারের উত্তর আনহ। পশ্চাৎ কালি প্রসাদ সিংহ বিস্তারিত সমাচার আপন আত্মীয় জনেক মনুষ্য দিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে নিবেদন লিখিয়া পাঠাইলেন। মহা রাজ মুরসদাবাদের যাবদীয় সম্বাদ লিখিয়া কলিকাতার সাহেবকে জ্ঞাত করাইলেন সাহেব বিস্তারিত সমাচার শুনিয়া যথেষ্ট হৃষ্ট হইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে লিখিলেন নবাব স্রাজেরদৌলার সেনাপতি মীরজাফরালি খান নবাবি চাহিয়াছে আমিও সত্য করিলাম স্রাজেরদৌলাকে দূর করিয়া মীরজাফরালি খানকে নবাব করিব তুমি এই সমাচার মীর জাফরালি খানকে দিলে সে যেমত উত্তর করে তাহা আমাকে লিখিবা। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সাহেবের পত্র জ্ঞাত হইয়া বিস্তারিত সমাচার লোক দ্বারায় আপন পাত্রকে জানাইলেন॥

রাজপাত্র সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া মীরজাফরালিখানের নিকট গমন করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিলেন। মীরজাফরালিখান অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া কহিলেন আমি আর মনোযোগ করিয়া রণ করিব না তুমি সাহেবকে সমাচার দেও যুদ্ধ করিয়া শীঘ্র জয়ী হউন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র নিবেদন করিলেন যেমন সাহেব সত্য করিয়াছেন আপনাকে নবাব করিবেন তেমন আপনিও সত্য করুণ যে মনোযোগ করিয়া সমর করিবেন না। এই কথার পর মীরজাফরালিখান হাস্য করিয়া সত্য করিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বিদায় হইলেন॥

পরে কৃষ্ণনগরে গমন করিয়া দেখেন যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় শিবনিবাসের বাটীতে গিয়াছেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবাবের শঙ্কায় কখন কোন বাটীতে থাকেন ইহা আত্ম ভৃত্য বর্গেরাও জানে না সর্ব্বদা চিন্তান্বিত এই সকল কথার যোজন কর্ত্তা আমি যদি নবাব স্রাজেরদৌলা কিঞ্চিৎ সন্ধান পায় তবে আমার জাতি প্রাণ রাখিবেক না ইহাতে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন। পরে পাত্র মুরসদাবাদ হইতে মহারাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। মহারাজ জ্ঞাত হইয় পাত্রকে আজ্ঞা করিলেন তুমি অদ্যই কলিকাতায় প্রস্থান কর বিস্তারিত সমাচার সমাচার সাহেবের নিকট নিবেদন করিয়া শীঘ্র যাহাতে নবাব নিপাত হয় তাহার চেষ্টা পাও গিয়া। পাত্র রাজাজ্ঞানুসারে কলিকাতায় আসিয়া সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিলেন। সাহেব তুষ্ট হইয়া রাজপাত্রকে প্রসাদ দ্রব্য দিয়া যথেষ্ট সম্মান করিয়া বিদায় করিলেন। তখন কালীপ্রসাদ সিংহ কিঞ্চিৎ গৌণে বাটী প্রস্থান করিল। সাহেব আপনার যাবদীয় সৈন্যকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে সুসজ্জ করিয়া প্রস্তুত হও আমি কল্য নবাব স্রাজেরদৌলার সহিত সমর করিতে যাইব আজ্ঞা মাত্রে সকল সৈন্য রণ সজ্জা করিয়া প্রস্তুত হইল। সাহেব দেখিলেন সকল সৈন্য প্রস্তুত তখন শুভক্ষণে সাহেব গমন করিলেন। নানা প্রকার বাদ্য বাজিতে লাগিল বাদ্যের ধ্বনিতে

এবং সৈন্যের অপূর্ব্ব সজ্জা দেখিয়া সকল লোক চমত্কৃত হইয়া সকলেই জয় জয় ধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত হইল এবং যাত্রিক দ্রব্য সকল সম্মুকে রাখিয়া গ্রামের মনুষ্যেরা মঙ্গল ধ্বনি করিতে লাগিল। সাহেব হাস্য করিয়া আপন সেনাপতিকে আজ্ঞা করিয়া দিলেন গ্রামের লোকের উপর কোন সৈন্য দৌরাত্ম করিতে না পারে। সাহেব এইরূপে সৈন্য সঙ্গে করিয়া চলিলেন।

পরে মুরসদাবাদ তক সমাচার হইল যে ইঙ্গরাজ সাহেব নবাবের সহিত রণ করিতে আসিতেছেন এবং নবাব সাহেব পূর্ব্বেই জ্ঞাত ছিলেন বিশেষ জ্ঞাত হইয়া আপন সেনাপতিকে আজ্ঞা করিলেন তুমি পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া পলাশির বাগানে গিয়া প্রস্তুত থাকহ। সাবধানে সমর করিয়া কোন রূপে ইঙ্গরাজ জয়ী হইতে না পারে বাকি যে সৈন্য এখানে থাকিল তাহা লইয়া আমি পশ্চাৎ গমন করিব কিন্তু ইঙ্গরাজেরা বড় যোদ্ধা এবং অশেষ মন্ত্রণা জানে কোন রূপে ত্রুটি না হয় সাবধান সাবধান। সেনাপতি মীরজাফরালি খান বিস্ত বিস্ত সাহস দিয়া সৈন্যের সহিত পলাশির বাগানে আসিয়া রণ সজ্জা করিয়া আছেন কিন্তু মনোমধ্যে বিচার করিতেছেন কি রূপে ইঙ্গরাজেরা জয়ী হবেন অনেক বিবেচনার পর সৈন্যের মধ্যে প্রধান প্রধান যে যে সৈন্য তাহারদিগের সহিত প্রণয় করিয়া কহিল তোমরা কেহ মনোযোগ করিয়া রণ করিও না যে সেনাপতি সেই যত্তপি এমন গতি করিতে প্রবর্ত্ত হইল ইহাতেই সকল সৈন্য ঔদাস্য করিয়া অসাবধানে থাকিল॥

পরে ইঙ্গরাজের যাবদীয় সৈন্য পলাশির বাগানে উপনীত হইয়া সমর আরম্ভ করিল। নবাবি সৈন্য সকল দেখিল যে প্রধান প্রধান সৈন্যেরাঅমনোযোগ করিয়া যুদ্ধ করে না এবং ইঙ্গরাজের অগ্নি বৃষ্টিতে শত শত লোক প্রাণ ত্যাগ করিতেছে কি করিব ইহাতে কেহ উম্না ক্রমে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। যুদ্ধ ভাল হইতেছে না ইহা দেখিয়া নবাবের চাকর মোহন দাস নামে একজন সে নবাব সাহেবকে কহিলেক আপনি কি করেন আপনকার চাকরেরা পরামর্শ করিয়া মহাশয়কে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। নবাব কহিলেন সে কেমন। মোহন দাশ কহিল সেনাপতি মীর জাফরালি খান ইঙ্গরাজের সঙ্গে প্রণয় করিয়া রণ করিতেছে না অতএব নিবেদন আমাকে কিছু সৈন্য দিয়া পলাশির বাগানে পাঠান আমি যাইয়া যুদ্ধ করি আপনি বাকি সৈন্য লইয়া সাবধানে থাকিবেন পূর্ব্বের দ্বারে যথেষ্ট লোক রাখিবেন এবং এইক্ষণে কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবেন না। নবাব মোহন দাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয় যুক্ত হইয়া সাবধনে থাকিয়া মোহন দাসকে পচিশ হাজার সৈন্য দিয়া অনেক আশ্বাস করিয়া পলাশিতে প্রেরিত করিলেন। মোহন দাস উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইল। মোহন দাসের যুদ্ধেতে ইঙ্গরাজের সৈন্য শঙ্কান্বিত হইল। মীরজাফরালিখান দেখিলেন এ কর্ম্ম ভাল হইল না যত্তপি মোহন দাস ইঙ্গরাজকে পরাভব করে আর এ নবাব থাকে তবে আমারদিগের সকলেরি প্রাণ যাইবেক অতএব মোহন দাসকে নিবারণ করিতে হইয়াছে ইহাই বিবেচনা করিয়া নবাবের দূত করিয়া একজন লোককে পাঠাইলেন সে মোহন দাসকে কহিল আপনাকে নবাব সাহেব ডাকিতেছেন শীঘ্র চলুন। মোহন দাস কহিল রণ ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে যাইব। নবাবের দূত কহিল আপনি রাজাজ্ঞা

মানেন না। মোহন দাস বিবেচনা করিল এ সকল চাতুরি এ সময় নবাব সাহেব আমাকে কেন ডাকিবেন ইহা অন্তঃকরণে করিয়া দূতের শিরচ্ছেদন করিয়া পুনরায় সমর করিতে লাগিল। মীরজাফরালি খান বিবেচনা করিল বুঝি প্রমাদ ঘটিল পরে আত্মীয় এক জনকে আজ্ঞা করিল তুমি ইঙ্গরাজের সৈন্য হইয়া মোহন দাসের নিকট গিয়া মোহন দাসকে নষ্ট করহ। আজ্ঞা পাইয়া এক জন মনুষ্য মোহন দাসের নিকট গমন করিয়া অগ্নিবাণ মোহন দাসকে মারিল সেই বাণে মোহন দাস পতন হইল। পরে নবাবি যাবদীয় সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল ইঙ্গরাজের জয় হইল॥

পরে নবাব স্রাজেরদৌলা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে২ বিবেচনা করিলেন কোন মতে রক্ষা নাই আপন সৈন্য বৈরি হইল অতএব আমি একান হইতে পলায়ন করি। ইহাই স্থির কযিয়া নৌকোপরি আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে ইঙ্গরাজ সাহেবের নিকটে সকল সমাচার নিবেদন করিয়া মীরজাফরালী খান মুরসদাবাদের গড়েতে গমন করিয়া ইঙ্গরাজী পতাকা উঠিয়া দিলে সকলে বুঝিল ইঙ্গরাজ মহাশয়েরদিগের জয় হইল তখন সমস্ত লোকে জয়২ ধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত হইল এবং নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল। যাবদীয় প্রধান২ মনুষ্য ভেটের দ্রব্য দিয়া সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব সকলকে আশ্বাস করিয়া যিনি যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন সেই২ কর্ম্মে তাহাকে নিযুক্ত করিয়া রাজপ্রসাদ দিলেন। মীরজাফরালীকে নবাব করিয়া সকলকে আজ্ঞা করিলেন তোমারা সকলে সাবধনে পূর্ব্বক রাজকর্ম্ম করিবা রাজ্যের প্রতুল হয় এবং প্রজা লোকে দুঃখ না পায়। সকলে আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন॥

পরে নবাবস্রাজেরদৌলা পলায়ন করিয়া যান তিন দিবস অভুক্ত অত্যন্ত ক্ষুধিত নদীর তটের নিকট এক ফকিরের আলয় দেখিয়া নৌকার কর্ণধারকে কহিলেন এই ফকিরের স্থান তুমি ফকিরকে বল কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রি দেও এক জন মানুষ্য বড় পীড়িত কিঞ্চিত্‌ আহার করিবেক। ফকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৌকার নিকট আসিয়া দেখিল অত্যন্ত নবাবস্রাজেরদৌলা বিপন্ন বদন; ফকির সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছে বিবেচনা করিল নবাব পলায়ন করিয়া যায় ইহাকে আমি ধরিয়া দিব আমাকে পূর্ব্বে যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছিল তাহার শোধ লইব ইহাই মনো মধ্যে স্থির করিয়া করপুটে বলিল আহারের দ্রব্য আমি প্রস্তুত করি আপনারা সকলে ভোজন করিয়া প্রস্থান করুণ। ফকিরের প্রিয় বাক্যে নবাব অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া ফকিরের বাটীতে গমন করিলেন। ফকির খাদ্য সামগ্রির আয়োজন করিতে লাগিল এবং নিকটে নবাব মীরজাফরালি খানের চাকর ছিল তাহাকে সম্বাদ দিল যে নবাবস্রাজেরদৌলা পলায়ন করিয়া যায় তোমরা নবাবকে ধর। নবাব জাফরালি খানের লোকে এ সম্বাদ পাবা মাত্র অনেক মনুষ্য একত্র হইয়া নবাব স্রাজেরদৌলাকে ধরিয়া মুরসদাবাদে আনিলেন॥

পরে অতি গোপনে নবাব মীরজাফরালি খানের পত্র মীর মিরণকে সংবাদ দিয়া ইঙ্গরাজের বড় সাহেবকে সংবাদ দিতে যায় তাহাতে মীর মিরণ নিষেধ করিয়া কহিলেন

যে আর কাহাকেও এ সমাচার কহিবা না। মীর মিরণ মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন যদি বড় সাহেব এ সংবাদ শ্রবণ করেন তবে স্রাজেরদৌলা কদাচ নষ্ট হইবে না তবে আমাদিগেরও মঙ্গল হওয়া ভার এবং যে ২ পাত্রমিত্রগণেরা আছে ইহারা শ্রবণ করিলেও কদাচ নষ্ট করিতে দিবে না বরং নবাব স্রাজেরদৌলাকে নবাবি দেওনের চেষ্টা পাইবেক অতএব নবাব স্রাজেরদৌলাকে এক দণ্ড রাখা নয় ইহাই স্থির করিরা আপনি খড়্গা হস্তে করিয়া নবাবস্রাজেরদৌলার নিকটে উপনীত হইলেন। নবাব স্রাজেরদৌলা দেখিলেন মিরণ আমাকে ছেদন করিতে আসিতেছে তখন মিরণকে অনেক ২ স্তুতি করিলেন। কিন্তু নির্দয় মিরণ কদাচ ক্ষান্ত হইল না। পশ্চাত্ নবাব স্রাজেরদৌলা ঈশ্বরে মনোযোগ করিয়া নিঃশব্দে রহিলেন তখন মিরণ খড়্গাতে নবাবকে ছেদন করিয়া পশ্চাৎ প্রচার করিলেক। এই সকল বৃত্তান্ত বড় সাহেব শ্রবণ করিয়া যথেষ্ট খেদ করিলেন এবং পাত্র মিত্রগণ সকলেই মহা ব্যথিত হইয়া কাতর হইলেন।

মহা রাজ মহেন্দ্র পাত্র কর্ম্মে আপন ভ্রাতাকে নিযুক্ত করিয়া কলিকাতায় সপরিবারে আসিলেন। তখন বড় সাহেব বিবেচনা করিলেন জবনকে প্রত্যয় নাই অতএব পুর্ব্বে যেমত নবাবি ভার ছিল সে মত না রাখিয়া রাজ্য করতল করিতে লাগিলেন। স্থানে ২ সাহেব লোক কর্ত্তা নবাবের লোকে কার্য্য করে এই রূপ রাজ কর্ম্ম হইতে লাগিল। রাজ্যের শাসন দিন২ হইতে লাগিল প্রজা লোকের যথেষ্ট সুখ কোন শঙ্কা নাই ভয় ক্রমে কেহ কাহার উপরে দৌরাত্ম্য করিতে পারে না রাম রাজার ন্যায় মনুষ্য সকল সুখী হইল। এই রূপে কাল ক্ষেপণ করেন॥

কিঞ্চিত্ কালের পর বড় সাহেব কলিকাতায় আসিয়া রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রায়কে আহ্বান করিলেন। রাজা বড় সাহেবের আজ্ঞা পাইয়া কলিকাতায় উপনীত হইয়া বড় সাহেব রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রায়কে যথেষ্ট মর্য্যাদা করিয়া কহিলেন তোমার মনোনীত যাহা তাহা বিস্তারিত করিয়া বল আমি পূর্ণ করিব। মহারাজ করপুটে নিবেদন করিলেন আমি কেবল অনুগ্রহের আকাঙ্ক্ষিত। এই কথার পর বড় সাহেব রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রায়কে কহিলেন তুমি আমার বিশ্বাস পাত্র এবং তোমার মন্ত্রণায় সর্ব্বত্র জয়ী হইলাম তোমার যাহাতে ভাল হয় তাহা আমি সর্ব্বদা করিব। মহা রাজাকে অনেক প্রিয় বাক্য কহিয়া সে দিবস বাসায় বিদায় করিলেন। পর দিবস রাজাকে বিস্তর২ রাজপ্রসাদ দিয়া যথেষ্ট সম্মান করিলেন আর পুর্ব্বের যে রাজকর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় দিতেন তাহা অপেক্ষা পাঁচ লক্ষ তঙ্কা ঘুচাইয়া ছয় লক্ষ তঙ্কা রাজকরের নিয়ম করিয়া দিলেন ও রাজার সুখ্যাতি বিলাত্ পর্য্যন্ত লিখিয়া মহা রাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদায় করিলেন। রাজা বড় সাহেবের প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া ও রাজ্যের প্রতুল করিয়া এবং যখনকার যে সমাচার সাহেব তক নিবেদন জ্ঞাত করায় একারণ সর্ব্বাংশে ভাল একজন লোক বড় সাহেবের নিকটে রাখিয়া আপনি রাজধানিতে গমন করিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পুর্ব্বে যে নাম ব্রাহ্মণেরা দিয়াছিলেন বড় সাহেবও সেই নাম প্রচার করাইলেন যাবদীয় মনুষ্য পত্রাদিতে লিখেন অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী শ্রীমন্মহা রাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর

এইরূপে সর্ব্বত্রেই মহা রাজার সুখ্যাতি হইল ॥

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দুই রাণী প্রধান রাণীতে পঞ্চ পুত্র জ্যেষ্ঠের নাম রাজা শিবচন্দ্র দ্বিতীয় ভৈরবচন্দ্র তৃতীয় মহেশচন্দ্র চতুর্থ হর-চন্দ্র পঞ্চম ঈশানচন্দ্র এই পঞ্চম পুত্র বড় রাণীর। ছোট রাণীর এক পুত্র শম্ভুচন্দ্র। রাজার এই ছয় পুত্র। পুত্র সকল সর্ব্বাংশে উত্তম নানা বিদ্যাতে বিশারদ। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় পুত্র সকলের রূপে এবং গুণে অত্যন্ত হৃষ্ট রাজার সর্ব্বক্ষণ ধীরবর্গের সহিত অশেষ শাস্ত্রের বিচারেই কাল ক্ষেপণ এবং নিজাধিকার অতিশয় শাসিত যাবদীয় লোকের প্রতি দয়া এবং দরিদ্রে দান ক্ষুধার্ত্ত জনেরে ভোজন করান এইরূপে কাল ক্ষেপণ। কিছু কালানন্তরে বিবেচনা করিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র রায় অত্যন্ত শান্ত এবং পণ্ডিত সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত দেখিয়া নিজ রাজ্যে শিবচন্দ্র রায়কে অভিষিক্ত করিয়া রাজা করিলেন। এবং আপনি ঈশ্বরে মনস্থির করিয়া ধ্যান করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। রাজা শিবচন্দ্র রায় রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বদা পিতৃ সেবাতেই মনোযোগ এইরূপে বহুকাল যায়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ঈশ্বর প্রাপ্তি হইল।

মহারাজ শিবচন্দ্র রায় নিয়ম মতে ক্রিয়া-নন্তরে কলিকাতায় আসিয়া বড় সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব লোক অনুগ্রহ করিয়া যথেষ্ট মর্য্যাদা বিদায় করিয়া অধিকারের প্রতুল করিয়া দিয়া রাজ্যে বিদায় করিয়া দিলেন ॥

রাজা শিবচন্দ্র রায় নিজ রাজ্যে গমন করিয়া যাবদীয় প্রধান প্রধান পাত্র মিত্রগণকে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা করিলেন তোমরা অনেক কালের মন্ত্রী আমার পূর্ব্বপুরুষ মহা রাজ কৃষ্ণচন্দ্রাদি মহাশয়ের যেমন যেমন রাজ নীতি কর্ম্ম করিয়াছেন সেই মত আমাকেও তোমরা মন্ত্রণা দিবা আমিও সেইমত কার্য্য করিব। এই বাক্য পাত্র মিত্রগণেরা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিবেদন করিলেন মহা রাজ আপনি মহা মহোপাধ্যায় সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত মহাশয়কে মন্ত্রণা দিবার অপেক্ষা নাই তবে যখন যে স্মরণ করান তাহা নিবেদন করিব। পাত্র মিত্রগণের বাক্যে রাজা শিব-চন্দ্র রায় অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া রাজপ্রসাদ দিয়া সকলের সম্মান করিলেন এইরূপে পরম সুখে রাজ্য করেন ॥

কিঞ্চিৎ কালের পর মহারাজা শিবচন্দ্র রায় মনোমধ্যে বিবেচনা করিতেছেন পূর্ব্বে যে সকল মহারাজারা আমারদিগের বংশে ছিলেন তাহারা অশেষ প্রকার পুণ্য কর্ম্ম করিয়া দেশান্তরে খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন অত-এব আমিও সেই মতাচরণ করিব ইহাই স্থির করিলেন ॥

কিঞ্চিৎ গৌণে নবদ্বীপ হইতে প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া আনিয়া কহিলেন আমার ইচ্ছা যে মহতী ঘটা করিয়া একটা যজ্ঞ করি অতএব অপনারা বিবেচনা করিয়া আজ্ঞা করুন কি যজ্ঞ করিব। পণ্ডিতবর্গেরা কহিলেন মহারাজ সোম যাগ করুণ। মহারাজ শিবচন্দ্র রায় পণ্ডিতের-দিগের বাক্যে উত্তম উত্তম যজ্ঞ করিয়া এবং বহুবিধ দান করিয়া ইশ্বরে মনোর্পণ করিয়া লোকান্তরে গমন করিলেন।

মহারাজ শিবচন্দ্র রায়ের এক পুত্র ঈশ্বর-চন্দ্র রায়। কিছু দিনান্তরে ঈশ্বরচন্দ্র রায় মহাশয় নবদ্বীপের রাজা হইলেন। পূর্ব্বের যে সকল মন্ত্রীরা ছিলেন সে সকল মন্ত্রী-দিগেরও লোকান্তর হইয়াছে উপযুক্ত মনুষ্য

না পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্ত দিন দিন রাজ্যের ক্ষীণতা এবং নানা প্রকারে অর্থ ব্যায় এই প্রকারে কতক কাল রাজ্য করিলেন। ইহার পুত্র গিরীশচন্দ্র রায়। মহা রাজ ঈশ্বরচন্দ্র রায় কল্পতরুর ন্যায় দাতা এবং ঈশ্বরে সর্ব্বদা মন ও বহুবিধ দান করিয়া লোকান্তরে গমন করিলেন ॥

পরে গিরীশচন্দ্র রায় মহাশয়কে সাহেব লোক সকলে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন। এইক্ষণে তিনিই নবদ্বীপের রাজত্ব করিতেছেন কিন্তু রাজ্যের অনেক ক্ষীণতা হইয়াছে তথাপি পূর্ব্বের মহা রাজারা যেমত ব্যবহার করিয়াছেন সেইমত আচরণ করিতেছেন। মহারাজ গিরীশচন্দ্র রায় অত্যন্ত দাতা যাচক জনকে কদাচ বিমুখ করেন না এইরূপে রাজ্য আরম্ভ করিয়াছেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব মহা রাজারদিগের যে সকল কৃত্য তাহার যেরূপ ব্যায় ছিল এখন যে রাজ্যের ন্যূনতা হইয়াছে তথাপি সে সকল ব্যায়ের ন্যূনতা নাই এবং পূর্ব্বে যেমত যেমত রাজনীতি ছিল ও এখনও সেই মত আচরণ করিতেছেন যাবদীয় বিশিষ্ট হয় পণ্ডিতবর্গেরা অত্যাপি আগমন করিলেও পণ্ডিতের যথেষ্ট সম্মান করেন এবং অশেষ প্রকার ধীর সকলকে সন্তোষ করিয়া বিদায় করিতেছেন কোন মতে নিন্দা করেন না ॥

॥ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মহাশয়ের চরিত্র ॥

॥ সমাপ্ত হইল ॥

স্বর্গতি রমণী-মণি চপলাবালা গুহ।*

"Not in their households merely but over all within their sphere.
And in what sense, if they rightly understood and
exercised this royal or gracious influence the order
and beauty induced by such benignant
power would justify us in speaking
of the territories over which each
of them reigned as Queen's
Gardens." Ruskin.

মহৎ চরিত্র আলোচনায় যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আছে,তাহার রসাস্বাদ হৃদয়কে উন্নত করে। দৈনন্দিন কৃত্যের অবিরল প্রবাহিত ধারার মাঝে তাহা অবিনশ্বর জগতের চিহ্ন-রেখা মুদ্রিত করিয়া, জগতের মঙ্গলমুখী গতির প্রতি আস্থা জন্মায়, নচেৎ অবাঙ্মুখী প্রবৃত্তির

* এই প্রতিভাময়ী দেবী-প্রতিম মহিলা "মহিলা-সম্মিলনী" প্রভৃতি নানা মহান্ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া জীবনের অগ্র প্রভাতে—সপ্তদশ বর্ষের সন্ধিস্থলে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার হস্তে অনেক গুরুভার ছিল। সেই সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে আজ তাঁহার পুণ্যালোক পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহার জীবন-সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ, পত্র, কবিতা প্রভৃতি হস্তগত হইয়াছে—তাহা সংগ্রহ উদ্ধৃত করিতে পারি নাই, অনেক কিছু উল্লেখও করিতে পারি নাই (প্রবন্ধের দুরত্বা বশতঃ) এজন্য শ্রদ্ধেয়া মহিলাগণের নিকট আমি ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। বিনীত লেখক।

উদ্দাম চপলতা ভগবানের সত্য-সুন্দর এবং মঙ্গলসৃষ্টির উপর উত্তরোত্তর যবনিকা ফেলিয়া দেয়।

আগ্নেয়গিরির বহিঃপ্রকাশে গগনবিদারী ধূলি ও ধূম্রপটলের আচ্ছাদন ধরণীকে যতটা ক্লান্ত করে, তাহার বক্ষ হইতে বহ্নি-শিখার উজ্জ্বল প্রকাশ ততটা বৈচিত্র্য ও বিপুলত্ব সৃষ্টি না করিলে, উহার বহির্বিগলিত গৈরিক-ধারা নগরের পয়ঃপ্রণালীর কর্দ্দমস্রোত অপেক্ষা অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করিত না।

কাজেই ব্যবহারিক জগতের মাঝে যদি কোন ভাবাকুল হৃদয়কে দেশকালের ক্ষুদ্রগণ্ডী অতিক্রম করিতে দেখা যায়—শ্রদ্ধার সহিত আমরা তাহা অবলোকন করি এবং বিস্ময়-হর্ষে জগতের মর্ম্ম-তটে উহার জন্য অমর-আসন রচনা করিতে থাকি! সে তাহার জ্যোতিঃবিমণ্ডিত হৃদয়-শ্রী লইয়া এত সহজে স্বভাব-সুলভ গৌরব-কীরিট ধারণ করিয়া, সম্রাটের ন্যায় স্বকীয় আসন গ্রহণ করে যে, আনন্দমগ্ন-জনতা উহার ঐশ্বর্য্যে নিজের দীনতা ভুলিয়া যায় এবং হর্ষরসে আবিষ্ট হইয়া ক্ষণকালের জন্য উদ্দেশ্যহীন, আদর্শহীন জীবন-পথে থমকিয়া দাঁড়াইয়া নিজের মাঝে উহার স্তিমিত ছায়া অনুভব করে।

বাঙ্গালাদেশের সৌভাগ্য, তাহার বক্ষদেশ এইরূপ নরনারীর পূতপেলব চরণচিহ্নপাতে অমর হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের গৌরব কাহাদের লইয়া বেশী? ভারতের মাঝে বাঙ্গালা দেশের ললাটে অমর-তিলকচিহ্ন শত-দল-শুভ্র কাহার অঙ্গুলি দ্বারা চিত্রিত হই-য়াছে? কাহার সাধনা, কাহার ত্যাগ, কাহার নিষ্ঠা, কাহার শ্রদ্ধার বলে, আজ শত বৎসর পরে, বঙ্গভূমি আবার জগতে কীর্ত্তিত হইতেছে? সে কি নারীজাতি নহে? সে কি বাঙ্গালী রমণীর হৃদয়ের বলে নহে? বাঙ্গালী ভারতবর্ষকে 'মা' বলিয়া আহ্বান করিল কেন? মাতৃনাম কেন তাহার বক্ষ-শীর্ষে উড়াইয়া দিল? সে কি কৌতুকের অভিনয়ের জন্য, না শত শত বৎসর হৃদয়-রাজ্যে পূজিত নারীজাতির প্রতি তাহার অকৃত্রিম অনন্যসুলভ শ্রদ্ধার অনিবার্য্য আবে-গের প্রেরণায়?

বাঙ্গালার নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে তাহাদের ত্যাগে, প্রেমে, শ্রদ্ধায়, স্নেহে, ভক্তিতে যে জাতি পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছে—সে জাতি সময়ে জগৎকে বিস্মিত করিবে! এ বিশ্বাস প্রতিদিন প্রমাণিত হইতেছে! ধর্ম্মে, সাহিত্যে,—সর্ব্বত্রই নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধার পথ নিদর্শন প্রতিদিন বাঙ্গালী দেখাইতেছে।

একথা কি অমূলক, বাঙ্গালা দেশের, অন্যদেশের কথা উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন—সমগ্র উত্তেজনা ও উত্থানে, মাতৃজাতির বুকের রক্ত জীবনী-স্রোত ঢালিয়া দিয়াছে? নচেৎ তাহা দু'দিনের অস্থায়ী চাঞ্চল্যে কি পর্য্যবসিত হইত না? অলক্ষ্যে, মায়াদেবীর ন্যায়, উপা-খ্যান-কথিত অমূর্ত্ত পুরলক্ষীর ন্যায়, তাহারাই দেশের কর্ম্মপ্রবাহ সুস্থ করিয়া দিতেছে, মূঢ় দেশ তাহা লক্ষ্য করিতেছে না! চারিদিকে আত্মগীতির জয়ঢাক বাজিয়া উঠিলে ও নব-জাগ্রত দেশের কয়েকটী রমণী-মণির—নারী নেত্রীর—উল্লেখ করিতেও কেন সংবাদ পত্র কুণ্ঠিত হয় কিম্বা ভুলিয়া যায়? তাহাদিগের চরিত্র বিস্মৃতির কবলে এবং লোকচক্ষুর অন্ত-রালে রাখা কি দেশের পক্ষে লজ্জার কথা নহে? কেন এই অকৃতজ্ঞতার দোষ বাঙ্গলা দেশকে কলঙ্কিত করিতেছে?

প্রবন্ধে-আখ্যানে সর্ব্বত্র মৌনগৌরবময়ী

মাতৃচরিত্রের দৃষ্টান্তে বাঙ্গালা-সাহিত্য কেন উচ্ছ্বসিত হইতেছে না? তাঁহারা, তাঁহাদের অন্ততঃ কয়েকজন, স্থানেস্থানে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং করিতেছে, তাহা দেখিয়া বাঙ্গালা দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত না হইয়া পারি না।

এই প্রবন্ধে একান্ত শ্রদ্ধার আস্পদ যে প্রতিভার মূর্ত্তির বিষয় আলোচনা করিব, তাহার প্রভাব এইরূপ বিস্তৃত ছিল যে,তজ্জন্য কিছুমাত্র ভূমিকার প্রয়োজন নাই এবং এজন্য বর্ত্তমান লেখকেরও বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নিষ্প্রয়োজন, কারণ শক্তির বহিস্ফূর্ত্তি এবং প্রকাশ কখনও করতালির উপর নির্ভর করে নাই। কাজেই যদি এই রমণীমণির অমর আত্মার লৌকিক অবস্থান-জাত বহুমুখী কর্ম্মপরম্পরার আদর্শ আমার দুর্ব্বল লেখনী চিত্রিত করিতে না পারে—তবে তাহার অসীম উদারতা লেখককে মার্জ্জনা করিবে; এ বিশ্বাস লেখকের আছে।

লৌকিক হৃদয় বিশেষে আদর্শের বিশেষ স্ফূর্ত্তি, ভবিষ্যকর্ত্তব্যের স্বচ্ছমুক্ত ধারণা হঠাৎ কখনও হয় না—সমগ্র জাতির অন্তর্গূঢ় বহুকাল সঞ্চিত মর্ম্মকথা কোন প্রতিভাময় চিত্তকে আশ্রয় করিয়া মঞ্জরিত হইয়া উঠে। তাহার ভিতর দিয়া জাতির শ্রেষ্ঠ বেদনা, শ্রেষ্ঠ চিন্তা জাগ্রত হইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তোলে —সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠা, সেই চিন্তাপ্রবাহের বিস্তৃতি ও বিক্ষেপ সাধন না করিলে সে আকুল হইয়া উঠে।

এই আকুলতার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে সে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এবং যে পর্য্যন্ত এই আদর্শের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা প্রতি হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া তাহার সাধনা সার্থক না করিয়া তোলে, তাহার ত্যাগ ফলগ্রহ না করে,—তাহার দৈনন্দিন আকুলতার চরম-সিদ্ধি মুকুলিত ও ফলভারনত করিয়া না তোলে, ততদিন পর্য্যন্ত, এই বিপুল নিষ্ঠার ভার প্রয়োজন হইলে, জীবন হইতে জীবনান্তর পর্য্যন্ত, এক সাধকের অন্তর্ধানের পর, সমানধর্ম্মী অন্য সাধকে সংক্রামিত হইয়া,ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করে।

কাজেই যদি কোন মহৎ চরিত্রের প্রশংসা ও স্তুতি করা যায়,তবে তাহার ভাগ ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে বাঙ্গালার জনসাধারণ লাভ করুক, প্রতিভাময় জীবন এইরূপে আকাঙ্ক্ষা করিয়া স্বীয় বিনয় প্রকাশ করে। মহিলা-চরিত্রের এই গৌরবভার নারী জাতির প্রাপ্য, সন্দেহ নাই।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত রমণী-মণি চপলাবালা সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষোভ এই যে, অতি তরুণ বয়সে তাহার বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সামান্য অংশ মাত্র সম্পন্ন করিবার সুযোগ পাইয়া সে ভগবানের অমৃতময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে। যদি তাঁহার আদর্শ হৃদয়ে লইয়া কোন মহিলা তাহার আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে যত্নপরায়ণা হন, তবে তাহার অশ্রান্ত চেষ্টা ও ইচ্ছা সার্থক হইবে এবং বিনীত লেখকের এই প্রবন্ধ লিখার উদ্দেশ্যও ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে সিদ্ধ হইবে। সেই আশা করিতে পারি কি? বাঙ্গালার মহিলা-সমাজের মাঝে বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সমাজগত সীমাহীন বাধাবিঘ্ন রহিয়াছে,এজন্য এক্ষেত্রে কার্য্য করা বিশেষ ক্ষমতা-সাপেক্ষ। বিশেষ শিক্ষা, বিশেষ ধৈর্য্য, বিশেষ ত্যাগ, বিশেষ কষ্টস্বীকার প্রয়োজন।

এই সমস্ত অধিকার করিতে অক্লান্ত সাধনা চাহি, নিবিড় নিষ্ঠা চাহি। সরল উদার চিত্ত,

মধুর প্রকৃতি, বুকভরা আশা, শান্তিপূর্ণ স্নিগ্ধ দৃষ্টি এবং নেতৃত্বের পক্ষে একান্ত অবিচ্ছেদ্য হৃদয়ের মোহিনী আকর্ষণী শক্তি, চাঞ্চল্যের মাঝে স্থিরতার প্রতিষ্ঠা, উদ্বেগের মাঝে অনাসক্তি—এসব না হইলে নারী-সমাজে কার্য্য অসম্ভব! দুঃখে সহানুভূতি, বিপদে সেবা, নারী-হৃদয়ের যাবতীয় মধুর কোমলভাব, ঘন বর্ষার কূলপ্লাবী তড়াগ-সলিলের ন্যায় চিত্তকে ভরপুর না করিলে মহিলা-সমাজে কার্য্য অসম্ভব ব্যাপার।

স্বর্গত চপলাবালার এরূপ মোহিনীশক্তি ছিল, একথা বলিলে সমগ্র কথা বলা হয় না—সে ধীরে ধীরে অধ্যয়নে, চিন্তায় নিজকে নানা কল্পনার মাঝে কর্ম্মোপযোগী করিয়া তুলিতেছিল। পিতৃ ভবনের ঐশ্বর্য্য, এবং স্বচ্ছন্দতার মাঝে তাহার বিনয়, তাহার পরদুঃখ-কাতরতা, ত্যাগ-স্নিগ্ধ ব্যবহার, তাহার সৎ সাহস ধীরে ধীরে মুকুলিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তাহার স্বচ্ছ-সরস সরলতা এমন মধুর ছিল—যে স্কুল-সাথী ছাত্রীগণ বাল্য জীবনে তাহাকে ছাড়া থাকিতে চাহিত না। সে সরলতা ও হৃদয়ের মধুর উন্মুক্ততা দ্বারা সকলের মন অধিকার করিত। তাঁহার স্বর্গলোক গমনের পর পিতৃভবনে অগণিত মহিলার আগমন ও তাহাদের মর্ম্মভেদী বিলাপ ও আক্ষেপ শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা প্রমাণিত করিয়াছে।

এমন সরলপ্রাণ, শিশুর ন্যায় ব্যবহার তাঁহার মাঝে এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি সঞ্চার করেছিল। সেই শক্তি কখনও কোথা পরাভূত হয় নাই। উহা কনক-কীরিটের ন্যায় তাহাকে মহিলা-সমাজে যতটা হৃদ্য ও মনোজ্ঞ করিয়া তুলিত, উহা মহান্ আদর্শ, ভাবের প্রখর তীব্রতা, সত্যের প্রতি, কর্ত্তব্যের প্রতি, এবং স্বদেশের প্রতি তাহার অশ্রান্ত বিগলিত অনুরাগ নির্ভরও ততটা করিত কিনা সন্দেহ।

চট্টগ্রাম বার এসোসিয়েশনের আমৃত্যু সভাপতি, চট্টগ্রাম এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং স্বর্লোক গমন পর্য্যন্ত ত্রিংশৎ বৎসরের সভাপতি, চট্টগ্রামের যাবতীয় মঙ্গল কৃত্যের জনক স্বরূপ পরলোকগত মহাপুরুষ কমলাকান্ত সেন মহোদয়ের কনিষ্ঠতম প্রিয় কন্যা রূপে সে যেরূপ অনাবিল আদরে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, শৈশব হইতে তাহা ঘন ভাব-পুঞ্জে জমাট হইয়া পিতৃদেবের কর্ম্ম জীবনকে ধীরে ধীরে অন্তর্গ্রহণ করিতেছিল। তাহার বুক ভরা আশা, সহস্র সুবর্ণ কল্পনা, দেশের রমণী-রাজ্যের বহুমুখী মঙ্গল চিন্তা, পিতৃ এবং পতি কুলের অনন্ত উৎসাহ সঞ্চার করিত।

এই উৎসাহের অমূর্ত্ত প্রভাবে নানা কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া—বিদ্যুতের মত জলদ রাজ্যে দেখা দিয়া যেন সে অন্তর্দ্ধান করিল! দেশের ঘন দুর্দ্দিন-প্রদোষে, রজনীগন্ধার ন্যায় তাহার সংহত-সৌরভ, অজ্ঞাত মধুর অতীন্দ্রিয় রাজ্য হইতে যেন সমস্ত হৃদয়ময় উৎসারিত করিয়া হিরণ্য-আলোক-দীপ্ত ঊষার অপেক্ষাও করিতে চাহিল না। কর্ত্তব্য আনন্দের অপেক্ষা রাখে না, সাধকের নিষ্ঠার ফল সাধারণ ভোগ করে।

দেশের অন্তঃপুরচারিণী নারী-রাজ্যে নবজাগ্রত ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রজীবনের মৌন-সংযত জীবন-ধারা প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত ঢালিয়া দিবে, তাহার সরল-শুভ্র চিত্ত নিয়ত আকাঙ্ক্ষা করিত। বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজের নিষ্ঠাপূত নিভৃত প্রচ্ছন্ন আড়ালে কপোত-কোমল রমণীর হৃদয়-রাজ্যে তাহার নিবিড় ঘন শ্রদ্ধার

উদ্রেক করিয়া তাহাকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিত। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ভাবসম্পদের উজ্জ্বল আলোক লাভ করিয়াও যুগাগত পল্লী-জীবন সারল্যের মাদকতা তাহাকে উত্তরোত্তর আবিষ্ট করিত।

তাহাদের মাঝে নব নব শিল্প দ্রব্যের নির্ম্মাণ কলা বিস্তারে যেন সে অধীর হইয়া উঠিত! যে মস্‌লিন্‌-অবগুণ্ঠন হিন্দুরাজ্যের গৃহলক্ষ্মীদের অলক্তক-রঞ্জিত কান্তি-শ্রী পল্লবাচ্ছাদিত মালতী-বকুল চম্পক-চামেলীর ন্যায় অভিনব রহস্যজালে আবৃত করিয়াছে— তাহা তাহাদের হৃদয়ের মহত্ব গোপন করিতে সক্ষম হয় নাই, উহা বাঙ্গালীর কর্ম্ম জীবনকে হেম-রসে সিক্ত ও আর্দ্র করিয়া গুরুভারশুষ্ক চিত্তে লাবণ্যের সঞ্চার করিয়াছে। ইহা চপলাবালার বড়ই প্রিয় বস্তু ছিল! সে বলিত,পল্লীর মাঝে যারা দিন দিন অন্নাতুরকে অন্ন দান, পীড়িতের সেবা, শিশুরাজ্যের আনন্দ ও স্বাস্থ্য বিধান, এবং ঐশ্বর্য্যমুক্ত নিরহঙ্কারে বাঙ্গালীর গৃহকর্ম্মের শোভা বিধান করিতেছে, কোন্‌ রাজার মহিষী তদপেক্ষা মহিয়সী?

তাহার এমন একটা অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা ছিল যে, সহজে সকলে তাহার অঙ্গুলি-হেলনে চলিত। পিতৃ গৃহে বাস্তবিকই তাহার তরুণ মূর্ত্তি রাজমহিষীর গৌরব-মণ্ডিত ছিল। নবযুগের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা-প্রাপ্ত পিতা মাতা ভ্রাতা তাহার কথাকে বড়ই শ্রদ্ধা করিত, তাহার অনুরোধকে উপেক্ষা করিত না।

ভগবানের মঙ্গল বিধানে যখন সে যোগ্যতম জীবন পথের সাথীকে লাভ করিয়াছিল, তখন সকলের আনন্দের সীমা ছিলনা। সেই রমণী-মণির তরুণ কবি-পতি সাহিত্য-প্রেমিক উৎসাহী যুবক শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন গুহ লিখেছেঃ—"'চ' আমার জীবনের সব আলো লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে; একদিন কি একটা কথার জন্যও বলেছিল "আমি 'রাণী" সে'হতে 'সুশী' ও'রা সবাই তাকে 'রাণীমা' 'রাণীমা' কোরে' ডাকৃত, চপলের কথা যদি চিরজীবন বোসে ভাবি, তবুও বোধ হয় ফুরাবে না—সে শিক্ষা, সে জ্ঞান, সে ভক্তি, সে স্নেহ, সে প্রেম কত গভীর ছিল, তাহা সংসারের কেউ বুঝতে পারবেনা—আহা এমন অমূল্যরত্ন হারিয়েছি!" *

তাহার কবি-হৃদয়ের এই কথার প্রতিধ্বনি করিবে না, চপলাবালার পরিচিত এমন কেহ নাই। পিতৃগৃহে, পতিগৃহে, সর্ব্বত্রই তাহার সহজ সরল আধিপত্য ছিল!

চপলাবালার কবি-হৃদয় বিধির মঙ্গল আশীর্ব্বাদের যোগ্যতর কবি-হৃদয়ের সহিত যুক্ত হইয়াছিল। একখানা কবিতা পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় সে লিখিয়াছে—"হৃদয়ের অপরিসীম ভক্তি ও প্রীতির সহিত এই অমূল্য পুস্তক খানি শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন গুহ মহারাণার করকমলে সমর্পণ করিলাম— ইতি সেবিকা শ্রীচপলাবালা গুহ।" শ্রীমান্‌ মোহিনী মোহনের কবি-হৃদয় হইতে প্রবাহিত কাব্যমুক্তাগুচ্ছ সে নিজ হাতে লিখিয়া লইত। একটা কবিতা পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় শুধু একটা সুন্দর শ্লোকে এই ভাব উদ্ধৃত আছে—তাহা এই স্বচ্ছ পেলব হৃদয়যুগলের মর্ম্মকথার ন্যায় ভাসিয়া উঠে।

সে সাধ করিয়া নিজের স্বামীকে 'মহারাণা' বলিয়া লিখিয়াছিল। যে তরুণ জীবনে শ্রীমান্‌ মোহিনী মোহন এরূপ উচ্চ হৃদয়-সম্পদের অধিকারী হইয়াছিল—তাহা সে

* সুদীর্ঘ বহু পত্রাবলির একতম হইতে উদ্ধৃত।

উপাধিকে সার্থক করিয়া তুলিত। চপলাবালা একদিন স্বামীর উজ্জ্বল ফটোখানি তাহার প্রিয় দিদিকে দেখাইয়া বলিয়াছিল—"কেমন দিদি, দেখ্‌তে রাজার মত নহে কি? তিনি কেমন কোরে' আমার দিকে দেখে অমন্‌ সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখেন, বুঝিনা—আমি বিস্মিত হই, পুলকিত হই, জোয়ারের মত শতশুভ্র তরঙ্গ নিয়ে কোথা থেকে ওঁর ভাব আসে, বুঝি না।" * বিংশতিবর্ষ-তরুণ সদ্য-মুকুলিত কবি-হৃদয় চপলাবালাকে উপযুক্ত জীবন সঙ্গিনীরূপেই পেয়েছিল।

চপলাবালার ভগবদ্‌প্রেম পিতৃভবনে আদর্শরূপে বিরাজিত ছিল। প্রতি দিন সংযত-শুচি হৃদয়ের প্রাভাতিক স্নানান্তর সে দুই ঘণ্টাকাল ব্রহ্মপদে মাথা লুটাইয়া থাকিত। এজন্য তাহাকে অনেক পরিহাসও সহ্য করিতে হইত। "এতক্ষণ পর্য্যন্ত তুই দেবতার কাছে কি বলিস্‌ কি ভাবিস্‌?" বর্ষিয়সীগণ সর্ব্বদা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত। সে হাসিয়া অবিলম্বে তাহাদের সমালোচনা বন্ধ করিয়া দিত। তাহার হাস্যে সকলে পরাভূত হইত। পার্থিব জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সে এই ব্রত পালন করিয়া গিয়াছে।

আমরা যদি কখনও এই ব্যাপার সম্বন্ধে দার্শনিক তর্ক আরম্ভ করিতাম (তর্কে, সে কখনও সহজে পরাজিত হয় নাই, বরং তাহার সরল মাজ্জিত বিশ্বাস সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত)—সে নেহাৎ গোলমাল দেখিলে পুলক-হাস্যে বলিত—"ও' আমার একটা দুর্ব্বলতা! সৃষ্টিরহস্য বোঝা যায় না—কেহ ভাল বুঝ্‌বেও না!"

কে জানিত, এই দুর্ব্বলতার ভিতর সে

উদ্ধৃত।

ধীরে ধীরে শক্তির অক্ষয় তূণীর সংগ্রহ করিয়াছে! ছোট বড় সকলের উপর সে যে উজ্জ্বল প্রভাব বিস্তার করিত, তাহার তুলনা বড় দেখি নাই। শ্রীমান্‌ মোহিনীমোহন, বোধ হয়, চপলাবালার আরাধ্য দেবতাকে উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছিল,—

"এ প্রাণ-কাননে তুমি, আনন্দ কুসুম রাশি
এ হৃদি-অম্বর-কোলে নির্ম্মল তারকা হাসি!
তুমি সত্য, ধ্রুব তুমি, তুমি অখিলের স্বামী,
এ শুষ্ক কল্পনা-কুঞ্জে বাজে গো তোমার বাঁশী।

* * *

"ক্ষীরোদ-সাগর-বুকে অনন্ত শয়নমাঝে,
তুমি ত' শয়ান দেব নাভিপদ্মে ব্রহ্ম রাজে,
কি বিমল, কি পবিত্র, গভীর কল্পনাচিত্র
সাজিয়াছে বিশ্বজনে মধুর গভীর সাজে!
তোমার কম্বুর ধ্বনি বিশ্বেরে জাগায়ে তোলে,
তোমারি ঘূর্ণিত চক্র বিজ্ঞাপিয়ে মহাকালে,
হৃদয়ে কৌস্তভ-শোভা ভাস্কর বিশ্বের বিভা-
শাসিত এ বিশ্বরাজ্য মুদগর শকতি-বলে।'*

চপলার এই নিবিড়-ঘন ভক্তিরস যে জীবনের মর্ম্মস্থান রচনা করিয়াছিল, তাহা সকলে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, এই জন্য এই আতিরিক্ত্য সকলে উপলব্ধি করে নাই। কিন্তু চপলাবালার অমর চরিত্রের বিশেষত্ব সকলের হৃদয়-পটে আঘাত না দিয়া পারে নাই। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রাজকুমার দত্ত, উকীল মহাশয় জীবনের এই সায়াহ্নেও লিখিতেছেন:—

"এই পত্রখানা না লিখিয়া পারিলাম না ... কিন্তু আমার প্রাণ যে এখনও হুহু করিয়া কাঁদিতেছে, এখনও যে বিরাম পাইতেছি না, এখনও যে চিত্তবৈকল্য ঘুচিতেছে না। * *

---

* শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন গুহের অপ্রকাশিত কবিতা হইতে।

"চপলা"—আহা, নাম করিতেই যেন বুকের ভিতর একটা আগুন জ্বলিয়া উঠে! যেন কি জানি কি এক মর্ম্মবেদনায় মনপ্রাণ অভিভূত হয়!··· ···যখন শুনিলাম, তখন বজ্রাহতের ন্যায় নিস্পন্দ রহিলাম। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না—মুহূর্ত্তের মধ্যে শরীরের জল রক্ত, সমস্তই যেন শুকাইয়া গেল! এক ফোঁটাও অশ্রুজল চক্ষে আসিল না—শুনিয়াই আমি নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ।··· ···ধীরে ধীরে আসিয়া নৌকায় উঠিলাম। নৌকায় উঠিলাম বটে, কিন্তু প্রাণের আবেগ আর চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। চপলার সেই দেবী-মূর্ত্তি মনে পড়িতে লাগিল—নৌকায় বসিয়া অবিরত কাঁদিলাম! সরলপ্রাণা বালিকা, এই বালিকা বয়সে এত স্নেহ, এত দয়া, এত শ্রদ্ধা, এত সরলতা, এত ভগবদ্ভক্তি কোথা হইতে শিখিল—এই সকল ভাবিয়া কাঁদিলাম।··· ··· ···এমন স্বর্গীয় মূর্ত্তি হঠাৎ কেমন করিয়া মৃত্যুচ্ছায়ায় মিশিয়া গেল, এ চিন্তা ক্রমে অন্তরকে অভিভূত করিতে লাগিল। ভাবিলাম, ভগবানের লীলা, তিনি জীবের আদর্শের জন্য এই আদর্শচরিত্র ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন—ভগবান ইচ্ছাময়—তিনি আবার আপন ইচ্ছায় সেই পবিত্রতাময় মূর্ত্তি, সেই পবিত্র চরিত্র—এই কুটিল মর জগতের চক্ষু হইতে অন্তর্হিত করিলেন! ··· ···আবার ভাবি (প্রাণের একটু আরামের জন্য ভাবি) এই মরজগতে, এই পাপসঙ্কুল, কুটিল মানব-সমাজে স্বর্গীয় প্রতিমার মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার স্থান হইবে কি রূপে?"

এইরূপ বর্ষীয়ান পূজ্যপাদ ব্যক্তিগণ স্বগত রমণী-মণির পিতৃভবনে যেরূপ সংযমহীন উচ্ছ্বাসের সহিত বিলাপ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, আমরা রমণীসমাজের উন্নতির ও উৎসাহের নায়িকা বলিয়া এবং তাহাদের ভবিষ্যকার্য্যের কর্ণধার বলিয়া অহরহ ভগবানের নিকট যাহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিতাম, সে ঐশী রাজ্য হইতে ভগবানের স্বহস্ত-প্রদত্ত বিজয়-তিলক ললাটে ধারণ করিয়া আসিয়াছিল! শ্রদ্ধেয়, মহিলা বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শ্রীযুক্ত কমলচন্দ্র সেন * মহাশয় চপলাবালার পাঠ্য-জীবন সম্বন্ধে লিখিতেছেন:—

"জীবনের অধিকাংশ সময় বালিকাদিগের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছি—এই দীর্ঘকালের মধ্যে অনেক মেয়ে আমার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছে, কিন্তু চপলাবালার ন্যায় এমন বুদ্ধিমতী এবং সুশীলা মেয়ে আমার হাতে পড়ে নাই। সে পরীক্ষাদি শ্রেষ্ঠ বিভাগে, অতি অল্পায়াসে, এমন কি, আমাদের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া তাহার নিজের প্রতিভায় উত্তীর্ণ হইত। * * চপলাবালার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সৌন্দর্য্য, এই যে, সে কেবল একটা ভাল কার্য্য করিয়া, কি কোন ভাল উপদেশ পাইয়া নিজে সুখী হইয়া তৃপ্তিলাভ করিত না, তাহার সঙ্গীরা, অন্যান্য মেয়েরা সে বিষয় শিক্ষা করিলে সে বেশী সুখ অনুভব করিত। সকল বিষয়ে সে অন্যকে ভাল দেখিলে বিশেষ আনন্দিত হইত।············তাহার সাহিত্য-জ্ঞান বড়ই চমৎকার ছিল। এমন পরকে ভাল করিবার স্পৃহা আমি অতি কম লোকের মধ্যেই দেখিয়াছি। এমন সুন্দরী দেব-প্রতিমা স্বর্গের কি কার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়া আসিয়াছিল, তাহাই হয়ত ভগবান তাহাকে এত শীঘ্র আহ্বান করিয়া নিলেন।"

বাল্য জীবনের অবসানে চপলাবালার জীবন, ভাবে, প্রেমে, সরলতায় রামধনুর ন্যায় বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছিল এবং তাহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সমভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল! "পরকে ভাল করিবার স্পৃহা" তাহার সমগ্র চিত্তকে স্নাত করিয়া শত ধারে প্রকাশিত হইত।

এই স্পৃহার তীব্রতায় এমন একটী কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছিল, যাহাকে, আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়, সহজেই আদর্শরূপে দাড় করান যাইতে পারে।

চপলাবালার এমন একটা প্রখর তীব্র, অগ্নি-করকা-চূর্ণবৎ উত্তপ্ত উদগ্র ঐশীতেজঃ ছিল যে, সে ঐহিক যাবতীয় পদার্থের উপর অপরূপ অনির্ব্বচনীয় পুণ্যরস বিস্তার করিয়া প্রতি দ্রব্যের একটী সহজ অবিনশ্বর

* ইনি অত্রত্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম ভক্ত পরিচালক। সমগ্র জীবন তিনি মহিলাদের শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

সত্তা উদ্ভাসিত করিয়া তুলিত। শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন গুহ কি এই শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিল?

"মায়ার কি মন্ত্র জানে, কি মোহের জানে সুর,
ও নয়নে জাগে কি মোহিনী!
কষ্ট শোক জীবনের ভ্রূকুটিতে পুড়ে'যায়
আছে তার শক্তি প্রমোদিনী। *

তাহার অভিনব, বিস্ময়জনক রমণী-গর্ব্ব ছিল। তাহার সাম্‌নে নারীজাতি সম্বন্ধে কৌতুক করিয়া কেহ কিছু বলিয়াও ত্রাণ পাইত না। বাঙ্গালী রমণীর বিশ্বজয়ী অমর-প্রভার গৌরব, চপলাবালা যতটা অনুভব করিত, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইত। মেয়েদের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ লইয়া যে কত উচ্চভাব ব্যক্ত করিত, তাহা সহজে প্রকাশ করা সুসাধ্য নহে। মেয়েদের ভাব-গত ও গানগত ক্ষমতা পুরুষদের অপেক্ষা কিছুতেই কম নহে, বরং তাহাদের স্নিগ্ধতা ও হৃদ্যতার তুলনা নাই—একথা সে বলিত। একবার বর্ত্তমান লেখক কৌতুক ও পরিহাস-ছলে তাহাকে বলেছিল—"মেয়েদের হৃদয় আছে বটে, কিন্তু তা'রা যে বোধশক্তিতে বালক!" চপলাবালা ইহাতে উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে—"তোমাদের মত নিষ্ঠুর জাতিও আর নাই। তোমরা আবার নিজমুখে কি ক'রে বল?"

রমণী জাতির বহুমুখী চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষতার জন্য যে জাতি আপন কর্ত্তব্যের সামান্য ভগ্নাংশও করে নাই, পল্লীর মাঝে দীনতা-লুণ্ঠিত অবজ্ঞা-পীড়িত বাঙ্গালী রমণীর সূর্য্যোজ্জ্বল প্রতিভার মুদিত-শ্রী যে জাতির হর্ষ-কল্লোলে বাধা দেয় না—সে জাতির পক্ষ হইয়া আমি মর্ম্মের মাঝে এই তিরস্কারকে 'স্বাগত' বলিয়া আহ্বান করিয়া নিলাম।

সে বিশ্বাস করিত, মহিলাদের উন্নতি-সাধন, মেয়েদের নিজেরই কার্য্য, তাহাদের নিজ হাতেই রমণী-রাজ্যে গৌরবশ্রী অঙ্কিত করিতে হইবে। তাহার উচ্চভাবের আতিশয্যে মুগ্ধ হয়ে' তাহার কোন ভক্তিভাজন আত্মীয় একবার কথোপকথনের মাঝে বলে-ছিল—যে "যদি মেয়েদের নিজের হাতে স্ত্রী শিক্ষা প্রভৃতির ভার নিতে হয়, তবে দেশের মাঝে কয়েকজন রমণী কি ব্রহ্মচারিণীর ব্রত গ্রহণ করিতে পারে না?" সে বলেছিল—"সেটা আমাদের বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ভাব-বিরোধী—তা'তে বেশী কিছু হবে না—সমাজের আনুকূল্য পাওয়া যাবে না। আমাদের গৃহের মঙ্গলভার গ্রহণ কোরেই, গৃহী হ'য়েই অগ্রসর 'হোতে' হবে। পরিবারের বহুমুখী মঙ্গলকর্ত্তব্যের মাঝে সকল মেয়েদের সঙ্গে নিজের ঐক্য ও সমান ধর্ম্ম অনুভব ক'রে অগ্রসর হ'তে হ'বে।" তাহার ভক্তিভাজন আত্মীয়-গুরু এই কথার সত্যতা অনুভব করিয়া তাহার সিদ্ধান্তের সমীচীনতা স্বীকার করিলেন।

চপলাবালার ঐকান্তিক আগ্রহে চট্টগ্রামে "মহিলা-সম্মিলনী" * প্রতিষ্ঠিত হয়। সরল বালিকার আকুল উচ্ছ্বাসে বর্ষিয়সী মহিলাগণের হৃদয় আর্দ্র হয়। তাহার স্নেহের আব্দার কেহই উপেক্ষা করিতে পারিত না। অত্রত্য শ্রেষ্ঠ এবং শিক্ষিত সকল পরিবারের মহিলাগণ উৎসাহের সহিত এই সম্মিলনীতে যোগ দেন। পূজনীয়া শ্রীযুক্তা গোলকেশ্বরী খাস্তগির (স্বর্গীয় বিখ্যাত ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির মহোদয়ের বর্ষিয়সী সহধর্ম্মিণী) পূজনীয়া শ্রীযুক্তা নারায়ণী সেন (পূজ্যপাদ স্বর্গত উকিল ও চট্টগ্রাম এসোসিয়েসনের সভাপতি কমলাকান্ত সেন মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী চপলাবালার পূজনীয়া মাতৃদেবী) প্রমুখ শীর্ষস্থানীয়া মহিলাগণ এই সম্মিলনীর উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন।

হিন্দু পরিবারের অন্তঃপুরাবগুণ্ঠন-শ্রী বজায় রাখিয়া এইরূপ নবাদর্শের মহিলা এসোসিয়েসনের ন্যায় সভা স্থাপন করা কিরূপ দুরূহ ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, যাঁহাদের কার্য্যের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারাই জানেন। বিশেষতঃ চট্টগ্রামের ন্যায় সুবৃহৎ, বিস্তৃত বিক্ষিপ্ত

* অপ্রকাশিত কবিতা হইতে।

* এই অপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ সম্মিলনী তাহার তরুণ হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলা যাইতে পারে। ইহা যেরূপ সম্পূর্ণ অভিনব প্রণালীতে যুগধর্ম্মের আনুকুল্যে পরিচালিত—ইহার স্থাপনে যত ত্যাগ সাধন প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ব্যক্ত করা অসম্ভব। এই "প্রাচ্য-প্রতীচ্য" অনুষ্ঠান সকলেরই হৃদ্য হইয়াছে।
লেখক।

জনপদে ইহার সৃষ্টি কিরূপ কষ্টসাধ্য, তাহা সকলে বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু এই কল্পনার সফলতা হইতে বোঝা যায়, সরল হৃদয় জগতে পরাজয় জানেনা। আমার মনে হয়, গত চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে চট্টগ্রামে নানা বৃহৎ অনুষ্ঠানের মাঝে ইহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া যাইতে পারে। প্রতি জেলায় নবী-ভূত আদর্শ লইয়া এইরূপ স্থায়ী মহিলা এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা তাহার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল।

যেদিন এই স্থায়ী মহিলা সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হয়, সে দিন বয়োজ্যেষ্ঠা বর্ষিয়সী, অগণ্য মহিলাগণ তাহাদের মাঝে কনিষ্ঠতম বালিকা চপলাবালার স্কন্ধেই সম্মিলনীর উদ্দেশ্য প্রভৃতি ব্যক্ত করিবার ভার দেন। কোন মহিলা সে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"স্নেহের চপলা আমাদের যেরূপ সহজ সরলতার সহিত প্রফুল্ল মুখে উৎসাহ ভরে সম্মিলনীর উদ্দেশ্য প্রভৃতি বলেছিল, সে দৃশ্য আমি ভুলিব না। ভাবে তাহার ললাট উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল—তাহার দু'টী সুন্দর চোখ্ যেন আনন্দে অধীর হ'য়েছিল। সে অনেকক্ষণ বলিতে লাগিল, আমরা চুপ করিয়া শুনিলাম—ভাবিলাম মেয়েদের মাঝেও কি এমন বল্‌তে পারে? কি উজ্জ্বল-সরল-সুন্দর ভাষা।... ..."

"মহিলা সম্মিলনী"র কার্য্য কেবলমাত্র আলোচনায় নিবদ্ধ ছিল না। নানারূপ উৎকৃষ্ট মহিলা-রচিত কারুকার্য্য সভায় প্রদর্শিত হইত এবং যিনি নূতন যাহা কিছু জানেন, অন্যকে তিনি তাহা শিখাইতেন। এক একটী অধিবেশন প্রায় সমস্ত দিন ব্যাপী হইত এবং যাবতীয় কারুকার্য্য সংগৃহীত হইয়া প্রতি অধিবেশনে একটা ক্ষুদ্র প্রয়োজনীয় প্রদর্শনী হইত। প্রত্যেক দ্রব্যই সযত্নে রক্ষিত হইত। সম্মিলনী ক্রমশঃ নানা দিকে কার্য্য বিস্তৃত করিবার জন্য চেষ্টাপর ছিল।

সম্মিলনীর অনুরাগী ও উৎসাহী সভ্যা শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত যে সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি:—

"আমি জীবনে কখনও চপলার বিমর্ষ ভাব বা ক্রোধের লক্ষণ দেখি নাই। তাহার হাসিমুখ যেন সদানন্দময় ছিল।

"আমার মনে চপলার দুইটী প্রধান উদ্দেশ্য সব সময় ভাসিত; আমি ইহা তাহার প্রায় পত্রে ও প্রত্যেক কথায় অনুভব করিয়া লইতাম।* তাহার একটী উদ্দেশ্য দেশের মঙ্গল সাধন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করা ও অপরটী রমণীর অতীত লুপ্ত গরিমা আবার জাগাইয়া তুলিতে যথাসাধ্য আত্মসমর্পণ করা। কিন্তু হায়! চপলা অকালেই চলিয়া গেল! তাহার মনের মহতী ইচ্ছাও অনন্তে বিলীন হইয়া গেল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, চপলার মত স্বদেশ-প্রাণা, ন্যায়পরায়ণা একজন থাকিলেও আজ আমরা দেশের কাজে বহু দূর অগ্রসর হইতে সক্ষম হইতাম এবং এক দিন আমাদের রমণী নামের অতীত মহাগরিমা জাগ্রত করিয়া কলঙ্ক কালিমা ধৌত করিতে পারিতাম। হায়! আমার প্রিয় সখী চপলা অতি অল্প বয়সেও দেশের ও দশের চিন্তায় নিযুক্ত ছিল। আমাদের বঙ্গমাতার অত্যন্ত মন্দ ভাগ্য, নতুবা অকালেই তাঁহার অঙ্ক হইতে বিধাতা চপলাকে আপন অঙ্কে টানিয়া নিলেন কেন? চপলা হারা হইয়া আজ যে কেবল আত্মীয় স্বজন মর্ম্মাহত, এমন নহে—তাহার গুনরাশি যিনি একবার স্মরণ করিয়াছেন, কিম্বা দর্শন করিয়াছেন, তিনিও শোকাকুল! আজ চপলাবিহনে, চট্টগ্রামস্থ মহিলা সমিতি দক্ষিণ হস্ত-বিহীন! আমাদেরও উৎসাহ এবং আশা-আলোক গভীর হতাশে প্রায় নির্ব্বাপিত।

"আমি চপলাবালার প্রিয়সখীগণকে বিনীত অনুরোধ করি, ভগিনাগণ—যদি তোমরা একান্তই চপলাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া থাক—তবে এস, চপলাবালা যে সংকল্প হৃদয়ে স্থাপন করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইতেছিল—সেই মহৎ বাসনাকে হৃদয়ে স্থান প্রদান পূর্ব্বক তাহা সাধন করিয়া

---

* এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এইরূপ নানা পত্র উদ্ধৃত করিতে পারি নাই বলিয়া মহিলাগণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। লেখক।

চপলার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচয় প্রদান করি।

"চপলার অশেষ গুণরাশির পরিচয় প্রদান করা সাধ্যাতীত হইলেও কিছু প্রকাশ করিয়া হৃদয়-বেদনা লাঘব করিব, ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহাও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে পারিলাম না—কারণ তাহার অশেষ গুণের পরিচয় ক্ষুদ্র লেখনীর মুখে প্রকাশ করিতে আমি মনের দারুণ আবেগে ভাষা খুজিয়া পাইতেছি না। আমি ভগবানের নিকট তাহার নির্ম্মল পবিত্র আত্মার মঙ্গল প্রার্থনা করি।.................চপলা নানাগুণে ভূষিতা ছিল, তজ্জন্য সকলের প্রিয় ছিল। সংসারের কোন দুঃখ কষ্ট না পেয়ে হেসে হেসে চলে' গেল—ইহাই ভেবে আমাদের মনস্থির করিতে হইবে... (৩রা ডিসেম্বর ১৯০৮)"*

শ্রীযুক্তা সরোজবালা দত্ত লিখেছেন :—"স্বর্গত প্রিয়তম চপলাবালা গুহের অলৌকিক প্রতিভা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিবার ইচ্ছায় ক্ষুদ্র লেখনী হাতে নিয়ে বসেছি! এই ক্ষুদ্র তুচ্ছতম হেয় লেখনীমুখে তা'র প্রতিভারাশি প্রকাশ করা এবং এমন গৌরবান্বিত পূত জীবনের আলোচনায় সাহস করা,তার পবিত্র জীবনের উপর ছায়াপাত করা হয় বলিয়া ভীত।......

"আমাদের মহিলা-সম্মিলনী চপলাবালার একতম প্রধান প্রিয় দ্রব্য ছিল,তা'রি উৎসাহে, তা'রি প্রাণপণ যত্নে, তা'রি উদ্দীপনায়, তা'রি উদ্যোগে এই মহিলা-সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত। হায়, এত শীঘ্র চপলার প্রিয় সম্মিলনী চপলা-হারা হ'য়ে গেল।

"চপলাই সম্মিলনীর 'শির' ছিল। মহিলারা তা'কেই আদর্শ রাখিয়া তারি কথায় চলিত। তারি উৎসাহপূর্ণ বাণীতে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জাগ্রত হ'ত। আমরা যে সঞ্জীবনী আশালতা সম্মুখে রেখে' অগ্রসর হইতাম—বিধাতা তাহার রুদ্র রবিকরস্পর্শে আমাদের সেই মৃতসঞ্জীবনী আশালতা সমূলে জীবনহীন করিয়া দিলেন। সম্মিলনী আজ মৃতকল্পের ন্যায়। আমরা আজ জীবনহীনের ন্যায় অসার ও অচল হইয়াছি। হায়, তা'র প্রতিভা শতমুখেও বলিবার নহে—শতকণ্ঠেও তা'র গুণগীতি গাহিবার নহে।

"সম্মিলনীর প্রতি অধিবেশনে প্রদত্ত চপলার সেই তেজোপূর্ণ বক্তৃতা এখনও কাণে ধ্বনিত হইতেছে। এমন তেজোময়ী কথা প্রফুল্লমুখে, সুমিষ্ট ভাষে অথচ সুস্থির চিত্তে কেহ কখনও বলিতে পারিবে কিনা, জানি না—একাগ্রচিত্তে মহিলামণ্ডলি ঐ সুমধুর তেজোভরা বাণী শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইত। তখনকার তা'র সেই হাস্যপূরিত মুখ, সেই ভাব-কুঞ্চিত ললাট, সেই আনন্দে নৃত্যকারী চোখ এখনও মনশ্চক্ষে ভাসিতেছে। তা'র স্বদেশপ্রেম দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতাম এবং তাহারাই আদর্শ আঁকিয়া জীবন তৈরী করিতেছিলাম।

"চপলা বড়ই সঙ্গীতপ্রিয় ছিল—নিজের অতি স্নিগ্ধমধুর কণ্ঠ ছিল—গাহিবার একটা বিশেষ ক্ষমতা ও কায়দা ভগবান তা'কে দিয়াছিলেন। সে প্রতি অধিবেশনে—

"না জাগিলে সব ভারত-ললনা
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা"—

এই সঙ্গীতটী বেশীর ভাগ গান করিত। সর্ব্বদাই বলিত, আমরা না উঠিলে ভারতের কল্যাণ নাই। আমাদের ছাড়া পুরুষ সত্ত্বাহীন। আমরা পুরুষের ভিতর হ'তেই দেশের জন্য নিজকে নিয়োজিত রাখিব। চিমনীর ভিতর যেমন আলো—তেমনি পুরুষের ভিতর নারী—আলো ছাড়া যেমন চিম্‌নী নিরর্থক—তেমনি নারী ছাড়া পুরুষও শক্তিহীন! আমরা আলোর মত পুরুষের ভিতর থেকেই নিজের কর্ত্তব্য সাধন করিয়া ধন্য হইব। এইরূপ কত কথায় সে মহিলাদের উৎসাহিত করিত। এত অল্পবয়সে তার প্রতিভা দেখে বিস্মিত হ'তে হয়।..... শিল্পকার্য্যে সে খুব অনুরাগী ছিল। ললিত কলা তা'র বড়ই আগ্রহের জিনিষ ছিল—সে নিজহাতে নানা প্রকার সূক্ষ্ম-কারুকার্য্য প্রস্তুত করিত। তা'র গুণাবলী লিখিবার শক্তি আমার নাই—আমরা এমনই রত্ন হারাইয়া হাহাকার করিতেছি। যা'কেই সে নিজ গুণালোকে আকৃষ্ট করেছে, তারাই আজ গভীর শোকে ম্রিয়মাণ—হায়, আমাদের, সান্ত্বনার কিছু

* সুদীর্ঘ পত্রের একতম অংশ উদ্ধৃত।

নাই। তবে শুধু ইহা বলেই যা' কিছু সান্ত্বনা :—

"এত নহে কামনার দেশ,
রঙ্গভূমি শুধু কল্পনার।"

এই সম্মিলনীর মুখপত্ররূপে এবং তাহা সম্ভব না হইলে স্বয়ং একখানি মাসিক পত্র বাহির করিয়া মহিলাসমাজকে আহ্বান করিবার তাহার বিশেস ইচ্ছা ছিল। ভগবান্ পতিগৃহেও তাহাকে ঐশ্বর্য্য দিয়াছিলেন—অর্থবান্, কবিহৃদয়, সাহিত্যপ্রেমিক জীবন-সঙ্গীও চপলাবালা লাভ করেছিল। শ্রীমান্ মোহিনীমোহনের উৎকৃষ্ট "নলিনী-লাইব্রেরী"র গোপন-কক্ষে এই তরুণ হৃদয়-যুগলের কত নব আশা ও কল্পনা বিকশিত হইত, ইয়ত্তা নাই। শ্রীমান্ মোহিনীমোহন গুহ লিখেছে :—"আহা, জীবনের এই অঙ্কুরে উভয়ে বোসে বোসে কত ছবিই আঁকিতাম। আজ আমার সব শেষ.........।"

এই আনন্দ মুহূর্ত্ত নানা আকাঙ্ক্ষায় তাহাদের ভবনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত:—

"সে মুহূর্ত্তে কত সুখ সে মুহূর্ত্তে হাসি ফোটে;
শিরায় শিরায় যেন হর্ষের লহরী ছুটে।
সুখের শতেক উৎস অবিরল করে তায়—
কত সুখ-পদ্ম ফুটে প্রতিরক্ত কণিকায়।"

ভাবের এই মঙ্গল মূর্ত্তিকে প্রকৃতি দেবীও উৎসাহিত করিয়াছেন:—

"দূর দূরান্তরে পর্ব্বত বিদারি'
ঝরিবে নির্ঝর জল;
গাহিব আমরা পরাণ আবেগে
ফুটিবে মনের বল।......"

এই জন্য প্রেমসিক্ত এই জগতের আহ্বান উপেক্ষিত হয় নাই:—

"কিসের আহ্বানে আজ সুখনিদ্রা মোর
ভেঙ্গে গেল কিরূপে কি জানি,
চমকিয়া জেগে দেখি সংসারের বুকে
আপনার প্রতিবিম্ব খানি!
"কে যেন কোথায় থাকি গোপনে গোপনে
আপনারে দিল চিনাইয়া!
মানস মোহন কত সুচারু ভূষণে
হৃদিখানি দিল সাজাইয়া!"

মহিলাদের উন্নতির জন্য চপলাবালার আকুল প্রার্থনা কোন বিশেষ কার্য্যমাত্রে নিবদ্ধ ছিলনা—তাহা দশদিক্‌মুখী উৎসের ন্যায় প্রত্যেক বিষয়ে তাহার হৃদয় সহজভাবে আকর্ষণ করিত। তাহা জীবনমাত্রকেই আলোকিত করিত:—

"হেথায় আঁধার নাই
সদা আলো বিরাজিত।
হেথা অশ্রু জল নাই
বিশুষ্ক মরুর মত!
স্মৃতির আলোতে ধনি!
ঝলকিত প্রাণ খানি
বসন্ত সমীর যেন
প্রেম সদা সমীরিত।" *

শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্তের করকমলে প্রেরিত চপলাবালার একখানি চিঠির কতক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"হেম, আশীর্ব্বাদ কর এবং বিভুপদে প্রার্থনা কর যেন কখনও দেশের কাজে বিমুখ না হই। জন্মভূমির কাজ যেন আজীবন করিতে পারি। ভাই, আমার ন্যায় মাতার অক্ষম তনয়া কি কখনও মায়ের কাজ করিতে পারিবে? আমার অপরিসীম বাসনা পূর্ণ হইবে? জন্মভূমির কাজে কি দেহপাত করিতে পারিব?—অত সৌভাগ্য কি আমার ভাগ্যে ঘটিবে? আমাদের উৎসাহ এবং উন্নতির পথ যে কণ্ঠকাকীর্ণ—আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর শত হস্ত উত্তোলিত—আমাদের নবজাত আশা ও আদর্শকে যে সমাজ কোরকেই নির্ম্মূল করিতে সচেষ্ট! বল দেখি, আমাদের সৌভাগ্য-সূর্য্য কি উদিত হইবে? হেম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি কি বল জানিনা—যত দিন রমণীরা দেশের কাজে না মাতিবে, ততদিন উন্নতির কামনা আকাশ-কুসুমবৎ—কারণ সব বিষয়ে রমণীদের কর্ত্তব্য কাজ বেশী।

"হেম, পুজা আস্‌ছে—এই ত পরীক্ষার দিন—এই অগ্নি পরীক্ষায় সমস্ত দেশবাসীকে উত্তীর্ণ হওয়া চাই॥

"ভাই, তুমি সেখানে থেকেও প্রাণপণে দেশের কাজ করিত। আমার বিশ্বাস, সভা-সমিতি থেকেও পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের প্রাণে

* শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহনের অপ্রকাশিত কবিতা "হাসি", "বনবাস" ও "তারুণ্য" হইতে উদ্ধৃত হইল।

যদি স্বদেশ-প্রেমাগ্নি জ্বালাতে পার, তবেই দেশের প্রকৃত কাজ করা হয়। পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা সরল—তাদের প্রাণে যা' একবার লাগাতে পারা যায়, তা ও'রা কিছুতেই বিস্মৃত হবে না। আমরা পূর্ণ উৎসাহের সহিত সমিতির কাজ চালাচ্ছি। আমার বিশ্বাস, আজ না হয় দশ বৎসর পরেও আমার আশা সফল হবে। ভগবৎ চরণে একমাত্র প্রার্থনা, তিনি যেন দয়া করে আমাদের আশা সফল করেন। বিধাতার যদি ইচ্ছা থাকে, তবে শত বাধা বিপত্তিতেও আমরা বিচলিত হইব না। মা জন্মভূমি যেন তাঁর অধম কন্যাদের তাঁরই সেবার উপযুক্ত করিয়া তোলেন।"

শ্রীমতী হেমন্তবালা চপলাবালার জ্যেষ্ঠ সহোদরাকে লিখিতেছেন :—

"আমার জীবন আজ যেন লক্ষ্যহারা হইয়া পড়িয়াছে—হায়, আমি যখন তার জন্য এতই আকুল হয়ে পড়েছি—তখন না জানি তোমাদের মনের অবস্থা কি ভয়ানক! আমি রচনা বা কবিতা কিছুই লিখিতে পারিতেছি না—সর্ব্বত্রই চপলাময় হইয়া পড়িতেছে।...দিদি, চপলার পত্র বন্ধ হওয়া অবধি আমি বাস্তবিকই শান্তিহারা হইয়াছি। দিদি! আজ আমার উৎসাহ, আশা, দিবার মত সাথীদের মধ্যে কেহই নাই।"

চপলাবালার অন্যান্য বহু চিঠি উদ্ধৃত করিবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই। প্রত্যেক চিঠির মাঝেই তাহার একটা বিশেষ সত্ত্বা উদ্ভাসিত হয়। দেশচর্য্যামূলক চিঠি ছাড়া তাহার পারিবারিক চিঠিগুলির মাঝে একটী অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধ ভাব-প্রবাহ আছে যে, সহজেই তাহা হৃদয়কে আকর্ষণ করে।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কখন ও কোথায়ও চপলাবালার মোহ অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাহাকে জড়াইয়া, তাহার হাস্যে পুলকিত হইয়া,তাহার ক্রোড়ে উঠিয়া শিশুরাজ্যে তৃপ্ত হইত। সে নিজ হাতে তাহাদের পরিচ্ছদ এবং অঙ্গভূষণ অর্পণ করিয়া তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, দেবীর ন্যায় তাহার একটা অনির্ব্বচনীয় প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা ছিল।

তাহার নানা মাঙ্গলিক প্রশ্ন বিচারে এখন একটী সহজ দৃষ্টি ছিল যে, তাহার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠগণ অনেক সময় তাহার মতামতকে বিশেষ মূল্যবান মনে করিত। রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়নও তাহার উজ্জ্বল প্রতিভার সম্মুখে যেন ম্লান হইয়া যাইত। কাব্য, ইতিহাস মাত্র নহে—ললিতকলা সম্বন্ধে তাহার যেন একটা অপূর্ব্ব তীক্ষ্ণ, মর্ম্মভেদী দৃষ্টি ছিল।

দেবা প্রতিম চপলাবালার কর্ম্মোজ্জ্বল জীবনের অপূর্ব্ব আলোকে পুলকিত, বেদনাপীড়িত পরমশ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী সরোজবালা গুহ, মহিলাসমাজের অন্যতম প্রতিভূরূপে যে কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার সরল ভাবোচ্ছ্বাসের মাঝে চপলাবালার পার্থিব নিষ্ঠা ও দেবীমূর্ত্তি তুলিকাঘাতে বিকাশত হইয়াছেঃ—তাহার কিছু উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

" ... ...

ভগিনী সমাজ আজি
হারায়ে তোমারে!
চৌদিকে পুড়িছে ভাই
শোক-হাহাকারে!
বিমল যশোরাশিতে, শোভি' জন্মভূমি,
ক্ষণপ্রভা সম কোথা লুকাইলে তুমি!
মনে ছিল এই সাধ, পতিত মায়েরে,
সাজাবে অতুলনীয়, যশোরত্নহারে।
অমার আঁধাররাশি, সরায়ে গগনে—
উজলিবে দশদিক, মধুর কিরণে।
পতিত দেশের ভালে বালারুণ সম,
প্রকাশিবে নিজ তেজঃ অতি নিরুপম,
হায় রে! ফুটিয়া উঠিবে তব জীবনের কলি,
ছিঁড়ে নিল নিদারুণ ঝটিকায় দলি।
কুঁড়িতেই ছায়াময় নিঠুর সমন—
সোণার জীবন তব করিল হরণ।
তোমার জীবন কলি মলয় অনিলে—
পারিজাত ফুল সম মৃদু মৃদু দুলে!
বিতরি সৌরভ রাশি মোহিবে ধরণী।
বড় সাধ ছিল মনে নারীরত্ন-মণি!
কে আর দূরি'বে এই কুয়াসান্ধকার—
কে আর মুছা'বে মার নয়ন আসার!
স্বদেশের কণ্ঠে কণ্ঠে হাহাকার ধ্বনি।
তোমার গৌরব কীর্ত্তি দিবস রজনী।
ভারত-মাতার দুঃখ কে বুঝিবে আর,

কে লইবে পুণ্যব্রত দুঃখ-বেদনার।
হে রমণী-মণি, কর সমিতি গঠন,
দেখুক তোমারে দেশ, সাধনা-মগন!
হোম-অগ্নি জ্বাল, জ্বাল, রমণী-হৃদয়ে,
দাও তব পুণ্যমন্ত্র নির্ম্মল নিলয়ে!
আপনি হাসিয়া তুমি হাসাও সবায়।
নব প্রাণ দাও সবে, আছে মৃত প্রায়।
যাও ভাই পুণ্যধামে—পুণ্য সিংহাসন,
পাতিয়া রেখেছে যিনি নিখিল কারণ!
প্রেমময়ি! মনে রেখো জনমভূমিরে!
বিন্দুমাত্র দিও প্রেম পতিত দেশেরে।
সে অমিয় ধারা পিয়ে অমৃত রমণী—
চলিবে সকলে মিলে সেই পথ চিনি।"

... ...

অত্রত্য রমণীসমাজ দেবী-প্রতিম চপলাবালার স্বর্গমনে মুহূর্ত্তের মাঝে কিরূপ লুপ্তপ্রায়, এবং শক্তিহীন হইয়াছে—এই কবিতায় তাহার সামান্য আভাস পাওয়া যায়। এই অভাবের ক্রন্দন-ছায়া আজ এই প্রদেশের কোন্ পল্লীর গৃহ কোণে পড়ে নাই? উচ্চ আদর্শ, উচ্চতর ধর্ম্ম-প্রাণতা, মহিলা-সমাজের মৌন গৌরব-গীতি যাহার হৃদয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে দীপশিখার ন্যায় কল্পিত হইত, আজ তাহার অন্তরে হঠাৎ দেশে যে অন্ধকার—দুর্ভেদ্য, দুর্লক্ষ্য ঘন—উপস্থিত হইয়াছে, জানি না, কখন তাহা দূর হয়।

চট্টগ্রামে বিগত বৎসর যে বৃহৎ প্রদর্শনী হয়, মহিলারা এবং অন্যান্য শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেখানে নানা কারু দ্রব্যাদি প্রেরণ করেন। এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে সে তৎক্ষণাৎ বলে—'মেয়েদের এই প্রদর্শনী দেখিবার সুবিধাজনক বন্দোবস্ত আছে ত? নচেৎ মেয়েদের শিল্প দ্রব্য পাঠিয়ে কি লাভ? তারা না দেখ্‌লে, না শিখ্‌লে, দেশের কিছু হবে না।"

চট্টগ্রাম জেলা সমিতিতে মেয়েদের দেখিবার এবং শুনিবার সুবন্দোবস্ত তাহার অজেয় উৎসাহেই হইয়াছিল। শিশুবৎ ব্যবহারে সে সকলের হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধন করিত।

বাল্যকাল হইতেই তাহার একাগ্রতা সকলকে বিস্মিত করিত। সে একবার না খেয়েই স্কুলে যায়—খাবার কথা মনেও ছিল না। স্কুলে কোন মাষ্টার তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, আজ কি খেয়েছ? কি উত্তর দিবে, কিছু ঠিক করিতে পারিল না—তখন ও'র মনে হয় যে আজ বাড়ী থেকে খেয়ে আসে নাই—এদিকে মাতৃদেবী লোক পাঠিয়েছিলেন—তা'র সঙ্গে বাড়ী এসে আহার করে' আবার স্কুলে যায়।

শ্রীমান্ মোহিনীমোহন গুহ লিখেছেঃ—"সে প্রতিদিন ঘুমাবার পূর্ব্বে প্রাতে এবং স্নানের পর গলবস্ত্র হ'য়ে প্রণাম কোর্‌ত; আমি একদিন অনেক করে' জিজ্ঞেস করার পর বোলেছিল—"মা বাবাকে নমস্কার করি।" পিতামাতার প্রতি তা'র ভক্তি অসীম—সে কত আক্ষেপ করিত—বলিত যে পিতামাতা মেয়ের জন্য ছোটকাল হ'তে এত করেন—তাঁদের সুখশান্তির জন্য মেয়েরা কিছুই করিতে পারে না। আরো কত কথা বলিত, তা'র ঠিক নাই।" শ্রীমান্ মোহিনীমোহন আবার লিখেছেঃ—"চট্টলের মহিলা-সভা, তার অতি আদরের ছিল—একথা বলাই বাহুল্য। ভবিষ্যতে সে সভার কিরূপভাবে উন্নতি করিবে—কিরূপে সকল মহিলা একত্রিত হ'য়ে স্বদেশের কার্য্যে লিপ্ত থাক্‌বে, স্বদেশের উন্নতির জন্য কাজ করিতে শিখিবে—ইত্যাদি কত কথাই বলিত, ইয়ত্তা নাই। আমি ঠাট্টা করিয়া যদি বলিতাম—"তোমরা দেখ্‌ছি আমাদের অন্তঃপুর শূন্য কোর্‌বে!"—তাহাতে সে বলিত—"আমরা নিজে লেগে পড়ে' কাজ কোর্‌বার জন্য বল্‌ছি? —আমরা শিখ্‌বো—আমাদের জ্ঞান হবে—তা'তে তোমাদের কতদূর লাভ, দেখত—তোমাদের রাজনৈতিক ইত্যাদি জটিল চিন্তার সহায় হ'তে পার্‌ব।"

রমণী-মণি চপলাবালার কত কল্পনা ছিল, ইয়ত্তা নাই। কতদিন অবিরত তিন চার ঘণ্টা এসব বিষয় আলোচনা করিয়া ক্লান্ত হইত না। অমন মিষ্ট মধুর ভাষা, উচ্ছ্বাসিত আবেগ-প্রবাহের স্বচ্ছ সারল্য, শিশুর ন্যায় স্মিত হাস্য, আনন্দে হিল্লোলিত জীবনধারা, জ্যোৎস্নার ন্যায় চারিদিকের ম্লান প্রাণীরাজ্য যেন বিকশিত করিয়া তুলিত।

একবার চপলাবালার কোন জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রস্তাব করিয়াছিল—মেয়েরা সহজে বেড়াইতে পারে—আলোচনা করিতে পারে, পরস্পরের সহিত ভাব বিনিময় করিতে পারে, এমন একটা অন্যের অপ্রবেশ্য উদ্যান রচনা করিলে কেমন হয়? যেখানে একটা স্বচ্ছ দীর্ঘিকা থাকিবে—চারিদিকে নানা বিচিত্র লতাবিতান, পাদপশ্রেণী প্রভৃতি প্রকৃতির বিচিত্র সম্ভার উন্মুক্ত করিবে।

শুধু নারী-রাজ্যের প্রবেশাধিকার থাকিবে! এই প্রস্তাব শুনিয়া সে আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হয়—এবং কতবার তাহার অগ্রজকে ইহার অনুষ্ঠান করিতে প্রতিশ্রুত করাইয়াছে, ঠিক নাই।

বাঙ্গালাভাষার উপর তাহার বড় বিচিত্র অধিকার ছিল। যে কোন সঙ্গীত যেমন তাহার কণ্ঠে একটা অনির্ব্বচনীয় নবরস লাভ করিয়া,নিজদেহে বিদ্যুৎসঞ্চার অনুভব করিত, তেমনি, তাহার হাতে ভাষাটীও যেন অভিমানিনী শিশুহৃদয়ের অফুরন্ত কল্পগীতির ন্যায় সহজ-উৎসাহ অনুভব করিত।

তাহার লেখনীর মুখে যেন আপনা আপনি সাহিত্যসুন্দরী, যূঁই-বেল, অশোক-বকুল বিকীর্ণ করিতেন। ভগবান তাহার জীবনমুকুল বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই নিজের ক্রোড়ে লইয়া গেলেন। তাহার লিখিত চিঠিগুলি তাহার প্রতিভার প্রমাণ, তাহার তরুণ হৃদয়ের প্রতিবিম্বরূপে রহিয়াছে মাত্র।

এই সমস্ত উদ্ধৃত করার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই। যদি তাহার জীবনী লিখিত হয়—তবে বোধ হয় তাহা দেখিবার সুযোগ ঘটিবে।

তাহার জীবনসখার প্রতি বিস্ময়জনক প্রেম-ভক্তি, এবং এই হৃদয়যুগলের মাঝে প্রস্ফুটিত অশ্রান্ত বিগলিত ভাব-রসে কি কথনও এই রূপরসগন্ধময় পৃথিবীর শ্যামল অঞ্চলে কোন সার্থকতা লাভ করিবে না? শ্রীমান্ মোহিনীমোহন গুহ লিখেছেঃ—"আমি ছল করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে চপলা বলিতঃ—স্মৃতি যদি আত্মার মত অবিনশ্বর হয়, যদি আত্মার অনুসরণ করে, তবে তোমাকে অনন্ত অনন্ত কালও ভুলিতে পারিব না।'

এই অবিচ্ছেদ্য অনন্তকালের মাঝে এই রহস্যময় জগজ্জালের সূক্ষ্ম-পেলবনীল হরিৎ তন্তুরাজ্যে কি কোথাও ধীরে ধীরে এই হৃদয়-যুগলের বেদনা ও কল্পনা গ্রথিত হইয়া সফলতা লাভ করিবে না?

বিধাতা রমণী-মণি চপলাবালাকে হৃদয়ের যেরূপ শ্রী দিয়াছিলেন—তেমনি দুর্লভ সৌন্দর্য্যও দান করিয়াছিলেন। তাহার হৃদয়ের কান্তিই অমর হইয়া গেল—তাহার তরুণ দেহশ্রী কোন স্বপ্নের মত কোন্ অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া গেল। তাহার উদ্দেশে পূর্ব্ব-রচিত শ্রীমান্ মোহিনীমোহনের নিম্নলিখিত কবিতাটী চপলাবালার স্বলোকগমনের পর যেন চপলাবালার অমূর্ত্ত হৃদয়লক্ষ্মীকে, তাহার দেবপুরী সঞ্চারী মর্ত্ত্যদেহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে নূতন ভাবে ও ছন্দে শূন্য-ভবনে আহ্বান করিতেছে। ঐ মায়ামূর্ত্তি যেন দিব্য সৌন্দর্য্যে ভাসিতেছে—

"মানস মন্দির মাঝে রূপসী রমণী এক
স্মিতময়ী চঞ্চলা চপলা।
কনক চম্পক গৌরী, সুবর্ণ প্রতিমা যেন
উরমিত কুঞ্চিত কুন্তলা।
চপল সরল শিশু ও বিধুবদন মাঝে;
কি মোহিনী আছে যেন মাথা;
সৌন্দর্য্য-সিকতা ওই স্ফুটিত তরুণ বক্ষে
মোহমন্ত্র আছে যেন আঁকা।"

ইহলোক ত্যাগের তৃতীয় দিবস নিঃশব্দ পল্লীর বাপীরতটে শ্রান্তহৃদয়ে উপস্থিত হইয়া যখন জ্যোৎস্নালোকে তাঁহার শ্মশান-শয্যা দেখিতেছিলাম, তখন সারিসারি আম্রবৃক্ষের রোমাঞ্চিত বীথিকা, কদম্বতরুর নতশীর্ষ পুষ্প-কোরক, ব্যাকুল বাপীর হৃদয়বক্ষে অঙ্কিত বিষণ্ণ মহীরুহ-ছায়া, ঝিল্লির রুদ্ধবক্ষ মর্ম্ম-গুঞ্জনের মাঝে তাহার পবিত্র মুক্ত আত্মাকে স্মরণ করিলাম—ভাবিলাম—

"স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে।"

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

বাঙ্গালায় জাতীয় শিক্ষা।

বাঙ্গালার একজন চিন্তাশীল রসিক-পুরুষ কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়-মন্দিরকে "গোল দিঘীর গোলামখানা" নাম দিয়াছিলেন। ঠিক গোলামখানা না হইলেও, বিদেশীয় রাজপুরুষগণের কার্য্যের সাহায্যের জন্য, রাজজাতীয় লোক অপেক্ষা বহু অল্প বেতনে সন্তুষ্ট অথচ সম্যক্ কার্য্যপটু কতকগুলি কর্ম্মচারী, এবং নিত্য নূতন মামলা মোকর্দ্দমার সৃষ্টি করিয়া রাজকোষ পুষ্ট করিবার জন্য এবং ঐ সকল মোকর্দ্দমায় দোভাষীর কাজ করিবার জন্য কতকগুলি উকীল মোক্তার তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্যেই যে কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বিশ্ববিদ্যালয় গুলির সৃষ্টি হইয়াছিল,—এ দেশের এবং বিলাতের অনেক সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতের ইহাই সিদ্ধান্ত। সুবিখ্যাত অধ্যাপক রেভাঃ ফাদার লাফোঁ এদেশে অধ্যাপনা কার্য্যেই জীবন পাত করিয়া গিয়াছেন। এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান প্রণালীতে একটা অতি বড় বঞ্চনামূলক ব্যাপার বলিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। (The system of University education in this country is a huge sham) স্থিরবুদ্ধি, সুপণ্ডিত, সর্ব্বজনমান্য শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, ইংরাজী শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থিত প্রণালী এ দেশে সন্তোষজনক সুফল প্রসব করিতে পারে নাই। (The existing system of English education has failed to produce satisfactory results.)

সদ্বংশে জন্মলাভ পরম সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভগবৎ-কৃপা সাপেক্ষ। জন্মের পরেই, মানব চরিত্রে শিক্ষা এবং সংসর্গের প্রভাব প্রধানতঃ ক্রিয়া করে। শিক্ষা এবং সংসর্গ গুণে মনুষ্য দেবতা হয়, আবার শিক্ষা ও সংসর্গের দোষেই মানুষ দানবে পরিণত হয়। ইতিহাস-কীর্ত্তিত বহু ব্যক্তির জীবনেই শিক্ষা এবং সংসর্গের প্রভাবের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। জগদ্বিখ্যাত ইংরাজবীর ডিউক অব্ ওয়েলিংটন যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, ওয়াটার্লু বিজয়ের আদি কারণ সুপ্রসিদ্ধ ইটন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই প্রথম উপ্ত হইয়াছিল। (The battle of Waterloo was won on the field of Eton.) পূর্ব্বতন শিক্ষা-দান-পদ্ধতি এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পুণ্যফলে এদেশে পুরাকালে কত দেবচরিত্র মহাপুরুষের দর্শন লাভ ঘটিত। হায়! ভারতবাসী আজ আশ্রম-ভ্রষ্ট, বিপন্ন, তাই ভারতের আজ এত দুর্দ্দশা!!

বৈচিত্র্যময় ভগবানের রাজ্যে মনুষ্যের প্রত্যেক জাতিরই কতক গুলি বিশিষ্টতা আছে। একজন ইংরাজের সহিত একজন নিগ্রো কিম্বা আফ্রিদির কত বৈষম্য, তাহা আমরা অনেকেই অবগত আছি। একজন চিন দেশীয় লোকের সহিত একজন ফরাসির রুচি, প্রকৃতি এবং শক্তির বহু পার্থক্য। এক দেশীয় লোকের সহিত অপর এক ভিন্ন দেশীয় কিম্বা ভিন্ন জাতীয় লোকের শক্তি প্রবৃত্তির বহুলাংশে সৌসাদৃশ্য হইতে পারে

না। ভারতীয় আর্য্য সন্তানগণের স্বাভাবিক মস্তিষ্ক শক্তি এবং বংশানুগত রীতি প্রকৃতির সহিত ইউরোপ-দেশজাত বালকগণের বহু পার্থক্য আছে। বহু শত সহস্র বৎসরের ভারতীয় সভ্যতাসিক্ত আর্য্য ঋষিগণের আধ্যাত্মিক জ্ঞানপুষ্ট, একটী বিশিষ্ট স্বভাবাপন্ন আর্য্য বালকগণের শিক্ষাদান পদ্ধতি,—গঠন পাঠন বিধি এবং পাঠ্যাদিও সুতরাং স্বতন্ত্র রূপ প্রয়োজন।

বিজ্ঞান শাস্ত্রানভিজ্ঞ, উদ্ভিদ তত্ত্বে অধিকার-শূন্য কোন শিশু, শুধু নামের কিম্বা বর্ণের সৌসাদৃশ্যে ভ্রান্ত হইয়া যদি সতেজ, সপত্র, সমূল একটী স্ফুটনোন্মুখ পদ্মকোরক জন্মভূমি-জলাশয় হইতে উত্তোলিত করিয়া তাহার আপন উদ্যানস্থ স্থলপদ্ম বৃক্ষের পার্শ্বদেশে রোপণ করে, তবে অল্প কয়েক দিন মধ্যেই যে নয়নমনোরম সুকোমল পদ্মকোরকটী শুষ্ক হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি ? আমাদের দেশের অনেক বালকের দশাও ঐ পদ্মকোরকের ন্যায় শোচনীয় হইয়াছে। বিকৃত শিক্ষার ফলে সুকোমল নন্দন-পারিজাত, আজ বজ্রাপেক্ষাও ভীষণ কঠোর হইয়াছে, শুনিলে বিস্মিত হইব না।

আত্মহত্যা এদেশে চিরদিন মহাপাপ, ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত। দুঃখের বিষয়,ইংরাজী শিক্ষায় বিকৃতবুদ্ধি বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্যে আজকাল অতি সামান্য কারণে আত্মহত্যার কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ "প্রত্যক্ষ দেবতা" পিতার তিরস্কার-ভয়ে কিম্বা অভিমানে, কেহবা কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া, লজ্জায় অপমান ভয়ে আপনার প্রাণ আপনি বিনষ্ট করিতেছে, এরূপ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। দেশে এ মহাপাপ কেন ও কিরূপে সঞ্চারিত হইল, অনেকে ভাবিয়া আকুল। জড়-বিজ্ঞানের প্রাথমিক অল্পশিক্ষা বা অপশিক্ষায় দ্বারা বিকৃতবুদ্ধি আর্য্যসন্তান, পূর্ব্বপুরুষগণের সেই অধ্যাত্ম তত্ত্বানুরাগ আজ বিস্মৃত হইয়াছে। খ্রীষ্টান পাদ্রী প্রভৃতির মুখে প্রাচীন আর্য্যগণের অহর্নিশি অযথা নিন্দাবাদ শুনিতে শুনিতে, হিন্দুর অধ্যাত্মতত্ত্বানুরাগ—অপদার্থতা কিম্বা বিকৃতবুদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া, উপহাস করিতে শিখিয়াছে। আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, কর্ম্মফলে বিশ্বাস,—এ গুলি কুসংস্কারের অশুভফল বলিয়া সর্ব্বত্র শুনিতে শুনিতে, কিছুমাত্র বিচার আলোচনা না করিয়া, না জানিয়া, না বুঝিয়া, প্রাচীন আর্য্যগণকে 'মূর্খ' সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছে। আর্য্যগণের বিজ্ঞানে কিছুমাত্র বোধ ছিল না, বেদ কৃষকের গান, ইত্যাদি শুনিতে শুনিতে, আর্য্যসন্তান, আজ পরকালে, কর্ম্মফলে অবিশ্বাসী, পাপপুণ্য বিচারের অনিচ্ছুক এবং অনধিকারী। তাহার ফলে আজ এদেশে ভদ্রসন্তানের মধ্যে আত্মহত্যার এত আধিক্য। পাশ্চাত্য প্রেত-পিশাচ এনার্কিষ্ট, নাইহিলিষ্ট, সোসিয়েলিষ্ট, ইত্যাদির অনুকরণে এদেশে একদল বিপ্লববাদীর সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া কিছুদিন যাবৎ শুনা যাইতেছে। আর্য্য-সন্তানের শিক্ষা দীক্ষা এভাবে ঘটিলে—মতি গতি এরূপে পরিচালিত হইতে থাকিলে, কালে আরও কি দেখা যাইবে, কে বলিতে পারে ?

কারণ ব্যতীত জগতে কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। বর্ত্তমান যুগের বিকৃতবুদ্ধি উন্মার্গগামী বাঙ্গালী বালকগণকে আজ অনেকেই অজস্র তিরস্কার করিতেছেন। "যাহারা বিপ্লববাদী এনার্কিষ্ট, যাহারা নরা-

জের ধন মান সুখ শান্তির ব্যাঘাতক, যাহারা পরস্বাপহারী দস্যু, তস্কর কিম্বা নৃশংস নরঘাতক, তাহারা ভগবানের চক্ষে যেমন অপরাধী, প্রকৃতিস্থ মনুষ্যমাত্রের নিকটও তাহারা সেইরূপ দণ্ডার্হ, ঘৃণার্হ। তাহাদের সহবাস এবং সহকারিতা সর্ব্বাংশে পাপ বলিয়া পরিত্যজ্য। কিন্তু ইহাদের এই দুষ্ট-বুদ্ধি কি কারণে প্রণোদিত হইল, নিরীহ শান্ত শিষ্ট ভদ্রলোকের ছেলেরা কেন এরূপ নরশোণিত-লোলুপ নরশার্দ্দূলে পরিণত হইল, তাহা নির্দ্ধারিত করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত কয় জন চেষ্টা করিতেছেন, জানি না।

ভারতীয় আর্য্য-সন্তানগণের ধাতু প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, জড়-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ উপাসক ইংরাজ, তাঁহাদের নিজসন্তানদের উপযোগী, অবিমিশ্র পাশ্চাত্য পন্থার অনুসরণে এদেশের বিদ্যালয় সমূহে আর্য্য-বালকগণের শিক্ষা দান বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ইংরাজ কি উপায়ে সুলভে কেরাণী এবং দোভাষী উকীল মোক্তার পাইবেন, এই চিন্তায় যতটা ব্যাকুল ছিলেন, ভারতীয় আর্য্যজাতির পূর্ব্বতন আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ততটা চিন্তিত হন নাই—এত প্রয়োজনও বোধ করেন নাই। হিন্দুর আদর্শ অব্যাহত রাখিতে পারিলে আজ ভারতের এমন দুর্দ্দশা হইত না।

হিন্দুর ন্যায় প্রাচীন এবং ধর্ম্মপ্রাণ জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নাই। এই হিন্দুজাতির জীবন চারিটী ক্রমোন্নতিশীল আশ্রমধর্ম্মে বিভক্ত। চতুরাশ্রমময় হিন্দুজীবনের প্রত্যেকটী আশ্রমই সত্ত্বগুণের প্রবর্দ্ধক। সত্ত্বগুণের চরমস্ফূর্ত্তির অপর নাম ব্রহ্মপ্রাপ্তি, হিন্দুর সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার প্রধানতম লক্ষ্য ছিল ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মসম্ভোগ। তপোলব্ধ জ্ঞানবলে আর্য্যঋষিগণ নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, একমাত্র ব্রহ্মসম্ভোগেই মানবজীবনের পরম পরিতৃপ্তি। সত্ত্বগুণের সাধনাদ্বারাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির—ব্রহ্মসম্ভোগের সম্ভাবনা। এই সত্ত্বগুণের সাধনাও সময়-সাপেক্ষ,—একদিনে বা অল্প সাধনায় কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। সূক্ষ্মদর্শী ক্রমবাদী হিন্দু জানিতেন যে, মাতৃগর্ভে জন্মলাভের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে পিতামাতার দেহ ও মনের অবস্থাভেদে, মানবশিশুর ভাবীজীবনের স্বাস্থ্য ও প্রকৃতির তারতম্য ঘটে। এজন্য বিবাহ এবং গর্ভাধান সংস্কারের সময় হইতেই ভাবী সন্তানের সতত শুভকামনায়, শাস্ত্রা-দেশ-পরিচালিত পূর্ব্বতন হিন্দুগণ এতটা সাবধান ছিলেন।

নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয় এবং সংস্কার বিধি গুলি ব্যক্তিগত চরিত্রের এবং জাতিগত প্রকৃতির উন্নয়নেরই পরিপোষক এবং সে গুলির প্রতি অবহেলা করিলে ব্যক্তিগত ও সমগ্র জাতিগত প্রকৃতির অবনয়ন ঘটিবারই আশঙ্কা। হায়! কি গভীর পরিতাপের বিষয়! কালধর্ম্ম প্রভাবে, অবস্থাবশে ও ব্যবস্থাদোষে, আর্য্য সন্তান আজ পথভ্রান্ত, আশ্রমভ্রষ্ট। ব্রহ্মচর্য্য-বিচ্যুত, বিলাসিতা-ব্যাধিদুষ্ট, আর্য্যকুমারগণের এই শোচনীয় অধঃপতিতাবস্থার কথা মনে ভাবিয়া, হৃদয়বান সামাজহিতৈষী আর্য্য-সন্তান, আপনি অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে পারেন, কিন্তু তাহাদিগকে অভিসম্পাৎ করিবার পূর্ব্বে আপনার কর্ত্তব্যাবহেলার কথা এবং দেশের শিক্ষাযন্ত্র পরিচালকগণের ত্রুটি ও বিচারবিভ্রমের কথা কি একবারও ভাবিয়া দেখিবেন না? জাতীয় প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া বিজাতীয়—বিরুদ্ধ প্রকৃতির সমাকৃ

উপযোগী, কুশিক্ষা দান করিয়া আমরা,—অভিভাবকগণ কতটুকু অপরাধী, তাহা গণনা না করিলে আমরা কি প্রত্যবায়ভাগী হইব না? হায়! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! যে কুশিক্ষার ফলে অপেক্ষাকৃত অধিকতর বুদ্ধিজীবী বালকগণেরই আজ এমন দুর্দ্দশা,—সেই শিক্ষায় আর্য্য বালিকাগণকে শিক্ষিতা দীক্ষিতা করিবার জন্য আমাদের দেশেরই কতক গুলি লোক আজও পাগল! কলিকাতার বেথুন কলেজেও ইহাদের চিত্তের সম্যক্ পরিতৃপ্তি হইল না। মফঃস্বলের নানা ক্ষুদ্র নগরে—এমন কি, ময়মনসিংহের মত ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র নগরেও একটী গেরলস্ হাই ইংলিশ স্কুল বিদ্যমান। শ্রীমন্মনু বলিয়াছেন—"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ" —বালিকাগণকেও যত্ন পূর্ব্বক সুশিক্ষা দান আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু তা বলিয়া এরূপে আর্য্য কুমারিগণের মস্তক চর্ব্বণ করা কি সঙ্গত না শুভকর? তবে সাহেব সুবার নিকট বাহবা পাওয়া যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

আর্য্য হিন্দুর সমগ্র জীবন এক ধর্ম্ম সূত্রে গ্রথিত। ধর্ম্মের সুকোমল স্নিগ্ধোজ্জ্বল আবরণে আর্য্য জীবন সদাই সুরক্ষিত, অথচ সরস, মধুর, মনোরম। যিনি দুর্ভাগ্য বশে এই 'ধর্ম্ম'-ধনে বঞ্চিত, তিনি বস্তুতই কৃপাপাত্র এবং আর্য্য নামের অযোগ্য। "ধর্ম্ম" এই কথার প্রতিশব্দ অন্য কোন বিজাতীয় লোকের অভিধানে আছে বলিয়া মনে করি না—অন্ততঃ আমি জানি না। পাশ্চাত্য জগতের 'রিলিজিয়ন, (Religion) বলিতে আমাদের ধর্ম্মকে বুঝায়, বোধ করি না। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ—মানব জীবনে এই দশটী মহদ্গুণের সমন্বিত সাধনাই আর্য্যেরা 'ধর্ম্ম' শব্দে বুঝেন। বাল্য কাল হইতে প্রধানতঃ সংযম সাধনা দ্বারা এই 'ধর্ম্ম-ধন' উপার্জ্জন করিতে হয়। সংযম সাধনার দ্বারাই ইহার প্রথম ভিত্তি স্থাপিত করিতে হয়। হায়! সর্ব্ববিধ সাধনার শ্রেষ্ঠ সিদ্ধপীঠ পুণ্যভূমি ভারত আজ আচার-ভ্রষ্ট, আশ্রম-জ্ঞানবর্জ্জিত, উৎমার্গ গামী ইহসর্ব্বস্ব অসুরের করলে পতিত হইয়াছে। তাই নানা বিপরীত বীভৎস দৃশ্যে দেশ আজ পরিপূর্ণ।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় ভারতে অমানিশার ঘনান্ধকারের পর আজ আবার নব অরুণ রেখা—অবশ্য এখনও দূরে—নয়নগোচর হইতেছে। পথভ্রান্ত, দুঃস্থ, বিকৃত, অধঃপতিত, আত্মানাত্মবিবেক-বিহীন ভারতসন্তান আবার এখন এত দিন পরে বিশ্বরাজের কৃপা কটাক্ষ লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে বলিয়া যেন মনে হইতেছে। প্রকৃত সুপথ এখনও অবলম্বন করিতে না পারিলেও, অন্ততঃ এটুকু যেমন জ্ঞান হইতেছে যে, যে পথে এত দিন আমরা চলিতেছিলাম, তাহা প্রকৃত সুপথ নহে। গন্তব্য সুখরম্য সুপথ কোথায় হারাইয়া ফেলিয়া আজ আমরা দিগ্ভ্রান্ত হইয়া মরণের পথে—ধ্রুব বিনাশের পথে চলিতেছিলাম। এইটীই সময়ের শুভ চিহ্ন—ভগবানের প্রসন্নতার প্রথম প্রস্ফুট আলোক রেখা। তাই আজ জাতীয় শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে ভারতের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী অনেক বুদ্ধিমান এবং ধনবান পদস্থ ব্যক্তি মনোযোগী হইয়াছেন। কলিকাতায় জাতীয়-শিক্ষা পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ প্রকৃতি সরস্বতীর

সুপুত্রগণ এক দিকে, এবং ব্রজেন্দ্র কিশোর, সূর্য্যকান্ত প্রভৃতির ন্যায় লক্ষ্মীর কৃপা-পাত্রগণ অপর দিকে, মায়ের মঙ্গল শঙ্খের মধুর নিনাদে আকৃষ্ট হইয়া জাতীয় শিক্ষার সুব্যবস্থা বিধানের জন্য যত্নবান হইয়াছেন।

হিন্দুকে প্রকৃত হিন্দু রাখিতে হইলে, আর্য্য ভাব, আর্য্য প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রাখিতে হইলে, হিন্দুর পূর্ব্ব গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, জাতীয় ভাবে, জাতীয় ভাষার সাহায্যে, উজ্জ্বল জাতীয় আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, জাতীয় শিক্ষা দান জন্য জাতীয় বিদ্যালয়েরই প্রয়োজন বটে। কিন্তু নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়গুলির আদর্শ, পাঠ্য, এবং পঠন-পাঠনরীতি আজও আমাদের সম্যক্ উপযোগী হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। কলিকাতায় ও মফঃস্বলের জাতীয় বিদ্যালয় গুলি ঠিক যেন "কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর" অধীনস্থ স্কুল কালেজেরই 'ছাঁচে' ঢালা বোধ হয়।

পূর্ব্বে আমাদের দেশের গ্রাম্য পাঠশালা গুলিতে "গুরু মহাশয়েরা' আজ কালের 'তথা-কথিত' উচ্চশিক্ষা দিতে না পারিলেও, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত, চাণক্য শ্লোক পড়াইয়া পাঠশালার 'পড়োদিগকে 'মানুষ' করিয়া দিতেন,—বাস্তবিক ইংরাজের তিন আর্ (three Rs.) অপেক্ষা আমাদের পাঠশালার ছাত্রগণ অনেক বেশী শিখিতে পারিতেন এবং প্রকৃত 'মনুষ্যত্ব' লাভ করিতে পারিতেন। আঁক, আখর এবং ধর্ম্ম নীতির প্রবচন গুলি অতি অল্প দিনে অল্প ব্যয়ে শিখিতে পারিতেন। জাতীয় বিদ্যালয় গুলির নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের জন্য কৃত্তিবাস, কাশীরাম পাঠ্য করা আবশ্যক নহে কি? চাণক্য নীতি, বিষ্ণু শর্ম্মার হিতোপদেশ আজও কি জন্মস্থান ভারতভূমিতে উপেক্ষিত হইবে? মনে রাখা উচিত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহণ করিলেও এবং যৌবনে পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং সভ্যতার তীব্র সুরা আকণ্ঠ পান করিলেও, বাল্য কালে তদীয় হৃদয়রাজ্যে কৃত্তিবাস যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব কোন মতে পরিবর্ত্তী কালে অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, জাতীয় বিদ্যালয় গুলিতে ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান—রসায়ণ পদার্থ বিদ্যাকে বাদ দিতে হইবে। তাহা কোন বুদ্ধিবান ব্যক্তিই বলিতে পারেন না। তবে রসায়ন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আপনার পারিভাবিক শব্দের সাহায্যে, সহজ, সরল, সুবোধ্য করিয়া আমাদের বালকগণকে শিক্ষা দিতে হইবে। 'সংস্কৃত' গোত্র-সম্ভূতা ভারতীয় সমস্ত ভাষার বর্ণমালা এক দেবনাগর অক্ষরে লিখিত বা মুদ্রিত হইবার প্রশংসনীয় প্রস্তাব যেরূপ আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি, বিজ্ঞান বিষয়ক সমস্ত পারিভাষিক শব্দও, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের নানা ভাষান্তর ভেদ সত্বেও, সর্ব্বত্র এক এবং অভিন্ন বলিয়া নির্ব্বাচিত, প্রণীত কিম্বা নির্দ্দিষ্ট হওয়া সঙ্গত মনে করি। ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতিও আমাদের আপন মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রদত্ত হউক, এই আমাদের ইচ্ছা। ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে চাই যে, ইংরাজী না শিখিলে কৃষি, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। কিন্তু আমাদের মূল কথা এই যে, জড়বিজ্ঞান দেহের হস্ত, পদা-

দিয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে। সর্ব্বোপরি আর্য্যের ধর্ম্মাদর্শ দেহ যন্ত্রের মস্তিষ্ক শক্তির,—বুদ্ধির কার্য্য পরিচালিত করুক। আর্য্য সাহিত্যের ধর্ম্মভাব, দেবচরিত্র, পুণ্য-প্রভাব যেন সর্ব্বদা আমাদের বিদ্যার্থিগণের চক্ষের উপরে প্রতিভাত হয়।

তীক্ষ্ণদর্শী সমাজহিতৈষী পরলোকগত সৈয়দ আহম্মদ সাহেব মোসলমান বালকগণের জাতীয় শিক্ষার সৌকর্য্যার্থে, অতীব প্রয়োজন বোধ করিয়া, বহুদিন পূর্ব্বে, আলিগড়ে একটী আদর্শ ইসলামী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পঞ্চনদ প্রদেশের আর্য্য সমাজের ভ্রাতৃগণ লাহোরে 'এংলো বৈদিক কলেজ'এবং উক্ত আর্য্য সমাজেরই অপর এক সম্প্রদায়ের কতিপয় দেশহিতব্রতধারী পণ্ডিত ব্যক্তি, পুণ্যক্ষেত্র হরিদ্বারে, পবিত্র জাহ্নবী তীরে 'গুরুকুল' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়টী অতি অল্প দিন যাবৎ ইংরাজী ১৯০১ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার কার্য্য-পদ্ধতি ও পাঠ্যাদি অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। এই অল্প কয়েক বৎসর মধ্যে উক্ত গুরুকুল বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণ অষ্টাধ্যায়ী এবং মহাভাষ্য পড়িয়া পূর্ণ বৈয়াকরণ হইয়া, বৈদিক ও লৌকিক শব্দ সমূহের অর্থবোধ ও প্রয়োগ বিষয়ে সক্ষম হইয়াছেন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বলিতেন যে, তিন বৎসর মাত্র পাণিনীয় ব্যাকরণ পাঠ করিলে যত দূর জ্ঞান জন্মে, "কুগ্রন্থ" অর্থাৎ সারস্বত, চন্দ্রিকা, কৌমুদী, মনোরমাদি পড়িয়া পঞ্চাশ বৎসরেও তাদৃশ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। স্বামী দয়ানন্দের উপদেশানুযায়ী হরিদ্বার গুরুকুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ ইতিমধ্যেই যাস্কমুনিকৃত নিঘণ্টু এবং নিরুক্ত অর্থবোধ সহকারে পাঠ করিতেছেন। অনেকে পাঁচ খানি দর্শন এবং ছয় খানি উপনিষদের পাঠ শেষ করিয়াছেন। শীঘ্র অবশিষ্ট দর্শন এবং আরও ৪ খানি উপনিষদ পাঠ করিবেন। অপর দিকে ইংরাজী সাহিত্য, গণিত, অর্থ ব্যবহার এবং জড়বিজ্ঞানের বিভিন্ন কয়েকটী বিষয়েও ইউনিভার্সিটির অধীনে বহু কলেজের ছাত্রগণ অপেক্ষা, বহু অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে অধিকতর শিক্ষালাভ করিয়াছেন। চরিত্র গঠন, জীবনে ধর্ম্ম অভ্যাস, গুরুকুলের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। অষ্টমবর্ষ বয়সে বালকেরা বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়। বিদ্যার্থিগণের অভিভাবকেরা প্রতিশ্রুত হন যে, পঁচিশ বৎসর বয়স পূর্ণ না হইলে কেহ আপন বালককে অন্যত্র নিতে পারিবেন না, এবং বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করাইতে পারিবেন না। এই ষোড়শ বর্ষকাল কোন বালক বাড়ীতে পত্র লিখিতে কিম্বা বাড়ীর কোন পত্র পাঠ করিতেও পায় না। অভিভাবকেরা প্রতি বৎসর দুই বার আসিয়া বালকগণকে দেখিয়া যাইতে পারেন। খেলার সময় ছাত্রেরা শাদা ধুতি পরিধান করে, পাঠের সময় গৈরিক বসন পরিধান করিতে হয়। সত্য বচন, ধ্যান, প্রাণায়াম প্রভৃতি রীতিমত ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। বৈষয়িক প্রসঙ্গ, বিষয়ী লোকের সহবাস, বিষয়ের চিন্তা, স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন, নির্জ্জনে স্ত্রী জাতির সহিত অবস্থান, আলাপ ও সংস্পর্শ প্রভৃতি অষ্টবিধ বর্জ্জনীয় বিধি লঙ্ঘনের অনিষ্টকারিতা বালকগণকে বুঝাইয়া সর্ব্বদা ঐ সকল হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করা হয়। ভগবান মনু বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারিণী মদ্য, মাংস, গন্ধ মাল্য, রস, (ব্রহ্মচারীর পক্ষে) স্ত্রীসঙ্গ এবং (ব্রহ্মচারিণীর পক্ষে পুরুষসঙ্গ, অন্নভক্ষণ, প্রাণিহিংসা, অঙ্গমর্দ্দন,

মূত্রত্যাগ ভিন্ন সময়ে অকারণে উপস্থেন্দ্রিয় স্পর্শ, নয়নাঞ্জন, চর্ম্মপাদুকাদি অথবা ছত্রধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষা, দ্বেষ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, দ্যূতক্রীড়া, পরনিন্দা, মিথ্যাভাষণ, স্ত্রীলোকের দর্শন কিম্বা আশ্রয়, পরের অনিষ্টকরণ কিম্বা অনিষ্ট চিন্তন প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বদা একাকী শয়ন করিবে, কদাচ বীর্য্যস্খলন করিবে না। (মনুঃ ২।১৭৭—১৮০।)

হরিদ্বারের গুরুকুল বিদ্যালয়ে শ্রীমন্মনুর এই সকল আদেশ ও নিষেধ বিধি প্রতিপালন জন্য উপদেশ ও অন্য নানা উপায়ে সাহায্য প্রদত্ত হয়। মনুস্মৃতি, বাল্মীকির রামায়ণ এবং মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বান্তর্গত বিদুর-নীতি প্রভৃতি যে সকল প্রবন্ধ পাঠ করিলে দুষ্টব্যসন দূরীভূত হয় এবং শিষ্ট সভ্যজনোচিত আচরণ বালকগণ শিক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়। বিদ্যালয়ের বালকগণের ব্যায়ামক্রীড়ারও সুন্দর ব্যবস্থা আছে। মোট কথা দেহ, মন ও আত্মার সমন্বিত উৎকর্ষসাধন জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করা হয়। প্রখরবুদ্ধি পবিত্র হৃদয় ও সুস্থ দেহের একত্র সমাবেশে উপরোক্ত বিদ্যালয়ের বালকগণ, বোধ হয়, আমাদের দেশের ছাত্রগণের আদর্শস্থানীয় হইতে পারেন।

ঐরূপ জাতীয় বিদ্যালয় যেদিন বঙ্গদেশের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই দিনই আমাদের প্রকৃত আনন্দ ও গৌরবের দিন মনে করিব। এজন্য বহু অর্থের এবং বহু ভদ্র সন্তানের ঐকান্তিক যত্ন চেষ্টার প্রয়োজন। মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং মহাপ্রাণ মহম্মদ মহসিনের জন্মভূমিতে, শত শত ব্রজেন্দ্রকিশোর, সূর্য্যকান্ত এই পুণ্য কার্য্যের জন্য দান করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করিবেন, ইহা কিছুমাত্র দুরাশা নহে।

এক্ষণে উপসংহার কালে আমাদের প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরাজ রাজপুরুষগণকে বলি—আপনারাও জাতীয় শিক্ষার নামে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন না,—কিম্বা বৃথা ভয়ে আড়ষ্ট হইবেন না। নানা স্থানের ল-ক্লাশ গুলি একে একে বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে উঠাইয়া দিলেন। এজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত নহি, দেশও একারণে বড় বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইল, মনে করি না। উকীল মোক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, দেশে মোকর্দ্দমার সংখ্যা দিন দিন যেরূপ ভয়ানক রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, অন্ততঃ কিছুকাল উকীল মোক্তারের সংখ্যা না বাড়িলেও কিছু ভাল ফল হইতে পারে। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষায় এক ইংরাজী সাহিত্য পুস্তকের সংখ্যাই প্রায় ১৭।১৮ খানি পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একে অধিকাংশ অভিভাবকের অর্থাভাব, তাহার উপর অধিকাংশ বালকেরও এতগুলি পুস্তক শেষ করিবার সময় এবং ক্ষুদ্রমস্তিষ্কের এত গুলির সার গ্রহণ ও সঞ্চিত করিয়া রাখিবার শক্তির অভাব। বালকের স্বাস্থ্য এবং অভিভাবকের অর্থ, উভয়ই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার ভার বহন করিতে অসমর্থ। কলেজের বিদ্যা ত আরও বেশী মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং ভদ্রসন্তানদের উপায় কি? আরও একটা কথা ভাবিয়া দেখা উচিত। এই সকল ভদ্র সন্তান যদি কোনও একটা আশ্রয় অবলম্বন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিবার সুযোগ না পায়, তাহা হইলে এতগুলি বুদ্ধিজীবী বালক কদাচ মূর্খ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না। তাহা হইলেই কি দেশের অবস্থা ভাল হইবে, আশা করা যায়? কখনই

নয়। ইহাতে দিন দিন অশান্তি আরও যে বাড়িবারই আশঙ্কা!

জাতীয় শিক্ষার-পুণ্য সলিলে এই তাপ-দগ্ধ মৃতপ্রায় ভারতকে সুখসিক্ত করিতে না পারিলে,—আর্য্য সন্তানকে পরলোক-বিশ্বাসী কর্ম্মফল-বিশ্বাসী না করিতে পারিলে,—ধর্ম্ম-ভীরু না করিতে পারিলে—ঈশ্বর-বিশ্বাসী (God-fearing,good citizen) না করিতে পারিলে, ভারতবাসী এবং ইংরাজ, নিশ্চয় জানিবেন, কাহারও আর কল্যাণ নাই। বিকৃত ধর্ম্মপ্রভাবহীন শিক্ষায়, অধিকাংশ শিক্ষাভিমানী ভারতবাসী দিন দিন কার্য্যগত জীবনে যদি নিরীশ্বরবাদী হয়, তবে এই প্রবর্দ্ধমান অশান্তি-অনলে সকলকেই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে। সময় থাকিতে এখনও সকলে সাবধান হউন।

নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়-সংসৃষ্ট কোন ব্যক্তি বিশেষ যদি বিপথগামী হইয়া থাকে, এরূপ সন্দেহ হয়, নীতি-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ,—শিষ্ট-সমাজ-বিগর্হিত কোন কার্য্য করিয়া থাকে, এরূপ প্রমাণিত হয়, তবে সেই দোষে জাতীয় শিক্ষা কিম্বা "জাতীয় পরিষৎ" অপরাধী কিম্বা ঘৃণিত হইতে পারে না। ব্যক্তি বিশেষ দুষ্ট, বিকৃত,ক্ষিপ্ত কিংবা কোন লোমহর্ষণ ব্যাপারে সংসৃষ্ট হইলে তজ্জন্য সমগ্র দেশ, জাতি বা সম্প্রদায় দোষী বা কলঙ্ক-ভাগী হইবে কেন? লর্ড কেভেণ্ডিসের হত্যাপরাধে সমগ্র আইরিশ জাতিকে কেহ অপরাধী বলিবেন কি? বিচারপতি নর্ম্মাণ এবং রাজপ্রতিনিধি লর্ড মেওর শোচনীয় হত্যা কাণ্ডের জন্য ভারতবর্ষের সমগ্র মোসলমান সমাজ ঘৃণা কি সন্দেহের চক্ষে কখনও অবলোকিত হন নাই, হইবার কথাও নহে। প্রেসিডেণ্ট কার্ণো এবং প্রেসিডেণ্ট মেকলিনের প্রাণ নাশের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্যজাতি নিচয় জগতের চক্ষে নৃশংস নর-ঘাতক বলিয়া আখ্যাত হন নাই। পাপ-পুরুষ-সংস্পর্শ-বিরহিত, পুণ্যাত্ম-ময় মনুষ্য-সমাজ পৃথিবীতে কোন দেশে আছে অথবা কখনও ছিল, বিশ্বাস করি না। ভাল মন্দ নিয়াই সংসার। কিন্তু তাই বলিয়া কি সমগ্র মনুষ্য জাতি ঘৃণাস্পদ হইয়া রহিয়াছে? দোষী ন্যায়-দণ্ডে দণ্ডিত হউক, তাহাতে কেহ অসন্তুষ্ট হইবে না। কিন্তু নির্দ্দোষী চিরদিন প্রীতি ও পবিত্রতার চক্ষে অবলোকিত হউক। পুণ্য ও প্রেমময় ভগবানের অংশে যখন মানুষের জন্ম, তখন অবিচারে মনুষ্য মাত্রকে পাপাত্মা বলিয়া সন্দেহ করা কদাচ সাধুজনোচিত কিংবা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না।

মঙ্গলময় বিধাতার নিকট আজ আমাদের এই কাতর প্রার্থনা যে, তিনি যেন সকলকে সুমতি দেন,—যেন সকলের সম্মিলিত পবিত্র শুভ ইচ্ছায়, আমাদের জাতীয় শিক্ষার নবাঙ্কুরিত এই ক্ষুদ্র তরুশাবক, অচিরে ফলাফল-বিশিষ্ট স্নিগ্ধ শ্যামল-ছায়া-সমন্বিত পরম সুন্দর শোভন এক মহীরুহে পরিণত হয়। তাঁহার কৃপা কটাক্ষে এবং শুভাশীর্ব্বাদে আমাদের সকল ক্ষুদ্রতা দূর হউক। আমাদের সকল প্রকার নৈরাশ্য, সন্দেহ, বিভীষিকা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, মতভেদ—সর্ব্ববিধ পাপ যেন বিশ্ব-রাজের বিমল জ্ঞান এবং প্রেমের পুণ্যাগ্নিতে অচিরে ভস্মে পরিণত হয়। আর্য্যবালকগণ জাতীয় শিক্ষা-সুধা-পান করিয়া আবার অমরত্ব লাভের অধিকারী হউক। বন্দেমাতরম্।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

অভ্যর্থনা।

সমবেত প্রতিনিধি ও সভ্য মহোদয়গণ, সর্ব্বমঙ্গলময় করুণানিধান সর্ব্বনিয়ন্তার পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া, অতি বিনীত ভাবে, অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষে, আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ সহ সাদর সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত। রাজসাহী রাজা মহারাজার ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির আবাসভূমি; আজি এই রাজসাহী-সম্মিলনের আমা অপেক্ষা যোগ্যতম কেহ এই প্রীতিকর কার্য্যের ভারগ্রহণ করিলে অতি সুখের ও সঙ্গত হইত। আমার এই মাত্র দাবী যে, আমি আজীবন আপনাদেরই সেবক, রাজসাহী জেলার এক প্রান্তে আপনারা বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া, জেলার হিত কার্য্যের আলোচনা জন্য শুভাগমন করিয়াছেন, এজন্য আমরা আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ। আমাদের সেই কৃতজ্ঞতা বিনীত ভাবে আপনাদিগকে কেবল বাক্যের দ্বারা জানান ভিন্ন উপযুক্ত অভ্যর্থনার আমাদের কিছুই নাই, আপনাদিগকে নানা কষ্ট পাইতে হইবে, তজ্জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনারা আমাদের দরিদ্রোচিত অভ্যর্থনা গ্রহণে আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

বিগত ১৩১৪ সালের প্রারম্ভে রামপুর-বোয়ালিয়ায় রাজসাহী জেলা সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়, যে উৎসাহ ও যেরূপ ধুমধামে তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল, যাঁহারা তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা রাজসাহীর নবযুগ বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন এবং ভাবী মঙ্গলজনক বহু আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন। বিধাতার ইচ্ছায়, তাহার অতি অল্প কাল পরেই বাঙ্গালায় নূতন বিভাগের অন্যান্য স্থানের ন্যায়, রাজসাহীতে যে ভীষণ কাণ্ডের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। ঈশ্বরানুগ্রহে সে অশান্তির অনেকটা এখন প্রশমিত হইয়াছে। কেন এরূপ ঘটিয়াছে, তাহা আলোচনার এ স্থান নহে, সে অতীত দুঃখ-স্মৃতির পুনরালোচনা বাঞ্ছনীয়ও নহে, বরং যত সত্বর তাহা সকলের হৃদয়পট হইতে দূরীভূত হয়,তাহাই মঙ্গলজনক। ইহার উল্লেখ এইজন্য করিতে বাধ্য হইলাম যে,এই অভাবনীয় দুর্ঘটনায় গত বৎসরের সকল উদ্যম,সকল আশা নির্মূল-প্রায় হইয়াছিল। আমার পরম স্নেহাস্পদ সোদর-প্রতিম, দেশের সেবকাগ্রগণ্য, স্বার্থত্যাগী, পরদুঃখকাতর শ্রীমান সারদাচরণ মজুমদারের ও নওগাঁর কৃতবিদ্য কয়েকটী ব্যক্তির আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টায় বহু বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া,মৃতপ্রায় রাজসাহী-সমিতির এই দ্বিতীয় অধিবেশনের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। আপনাদের অনুগ্রহে তাঁহাদের সে যত্ন ও চেষ্টা সার্থক হইলে, আমরা কৃতার্থ হইব। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এবং আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন শ্রীমান সারদাচরণ দীর্ঘজীবী হইয়া অধঃপতিত দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতে তৎপর ও সমর্থ হউন। বঙ্গমাতা শত শত সারদাচরণ-প্রসবিনী হইয়া ধন্যা হউন।

অতি দুঃসময়ে আমরা আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। ধান্যাগার রাজসাহীর

বরেন্দ্রভূমি আজ শ্মশানাকার ধারণ করিয়াছে। দরিদ্র কৃষককুলের মধ্যে হাহাকার রব উঠিয়াছে। স্বদেশবৎসল অমর কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের শোক-গীতি "তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয়" তাহাদের ঘরে ঘরে মর্ম্মভেদী রবে প্রধ্বনিত হইতেছে। এক বৎসরের শস্যহানির এই ভয়ানক পরিণাম চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই চিন্তার বিষয়। এবৎসরের বিশেষত্ব এই যে, অন্নকষ্টের সঙ্গে জলকষ্ট ভীষণতম্ন আকার ধারণ করিয়াছে। ধান্য রক্ষার চেষ্টায় পুষ্করণী আদিতে যাহাকিছু জল সঞ্চয় হইয়াছিল, তাহা নিঃশেষপ্রায় হইয়াছে। ভীষণ দুর্ভিক্ষ রাক্ষস করাল বদন বিস্তার করিয়া একমাত্র ধান্যপ্রাণ বরেন্দ্র ভূমিকে যেন গ্রাস করিতে অগ্রসর হইতেছে। বরেন্দ্র-ভাগ্যে এবার কি হৃদয়বিদারক দুঃখের অভিনয় হইবে, সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানই জানেন। এই ভাবী বিপদাশঙ্কার ব্যাকুলতার মধ্যে আপনাদিগকে আমরা স্মরণ করিয়াছি। এ অবস্থায় সর্ব্বত্রই আমাদের ত্রুটী পরিলক্ষিত হইবে। আপনাদের সমবেত মাভৈঃ শব্দে আশ্বস্ত হইয়া, আমরা এই জীবন-সমরে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতে পারিব, এ আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমরা আজ আপনাদের শরণাপন্ন।

আত্ম শক্তির প্রসার করাইয়া, প্রজাশক্তিকে পরিপুষ্ট করতঃ সভ্য জগতের সমকক্ষ করা, রাজশক্তির চরম উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ স্বাধীনতাপ্রিয় সভ্য জগতের সর্ব্ব প্রধান ইংরেজ রাজের সংশ্রবে ও অধীনে আসিয়া, ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে শিক্ষিত দীক্ষিত হইয়া, ইংরেজ-পথ-প্রদর্শিত সভা সমিতিতে মিলিত হইয়া, জাতীয় সুখ দুঃখ, অভাব উন্নতির আলোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাই ভারতগবর্ণমেণ্টের একটী গৌরবের কথা। বিধি বিড়ম্বনায় রাজপুরুষগণ এই নবশক্তির চালক হইতে পারেন নাই, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য। ভারতের চিরপ্রসিদ্ধ রাজভক্তি অন্য দেশে অনুকরণীয়। রাজকর্ম্মচারীদের ব্যক্তি বিশেষের দুর্ব্বলতা-জনিত বিচার ও কার্য্য-বিভ্রাটে বিকৃত-মস্তিষ্ক অপরিণত বয়স্ক ব্যক্তি বিশেষের অসংযত চেষ্টা ও ঔদ্ধত্য ও অপরিণামদর্শিতা সমস্ত জাতির কার্য্য-পরিচারক নহে ও হইতে পারে না। যে রাজশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতে নবযুগের অবতারণা হইতেছে, ভারত তাহার বিরোধী কদাচ হইতে পারেনা, সিপাহী যুদ্ধের সামরিক বিলোড়ন তাহার জলন্ত প্রমাণ। রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি একই শক্তির বিভিন্ন বিকাশমাত্র, উভয়ের সম্যক্ স্ফুরণ ও সামঞ্জস্যে শক্তির চরিতার্থতা ও সকল মঙ্গল সাধিত হয়, কিন্তু বিরোধে ও সংঘর্ষণে শক্তির অপচয় ও কার্য্যকারিতার অভাব ঘটে। যখনই যে দেশে তাহা ঘটিয়াছে, তখনই সে দেশ শক্তির খর্ব্বতা জন্য নানা অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছে।

রাজা ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়াই ভারতীয় ধারণা। হিন্দুর আদর্শ রাজা ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, শিষ্টের পালনকর্ত্তা ও দুষ্টের দমন-কর্ত্তা। ভারতের আদর্শ রাজা পিতৃস্থানীয়, প্রজারঞ্জনে ও প্রজার মঙ্গলসাধনে সর্ব্বদা তৎপর এবং আত্মত্যাগী। অমর কবি কালিদাস বহু শতাব্দী পূর্ব্বে দিলিপের রাজত্ব বর্ণনে লিখিয়াছেন, রাজা দিলিপই সর্ব্বথারূপে তাঁহার প্রজাবর্গের পিতা ছিলেন ও তদ্রূপ কার্য্য করিতেন; তাহাদের নিজ পিতা কেবল জন্মদাতা মাত্র ছিলেন। নিরক্ষর কৃষিজীবী প্রজা আজিও রাজা জমিদারকে

পিতা বলিয়াই জ্ঞান করে। ইহা আদিমাবস্থার সরলতা নহে। বংশ পরম্পরায় ভারতে যে উদার রাজনীতি কীর্ত্তিত ও ঘোষিত হইয়া জনসাধারণের অস্থিমজ্জাগত হইয়া সাধারণ সংস্কারের ন্যায় হইয়াছে, এই জ্ঞান তাহারই বিকাশ মাত্র। সভ্যতার অভিমানে ও গরিমায় আমরাই তাহা অজ্ঞানতার কার্য্য মনে করিয়া থাকি।

এই সার্ব্বজনীন, উদার আদর্শ—রাজনীতি অবলম্বনে রাজকার্য্য পরিচালিত হইবার ঘোষণা করিয়া, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে, সদাশয়া ভারত-সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও প্রজাবৃন্দ বহুশতাব্দী-ব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লবে ক্লিষ্ট থাকায়, মাতৃ ক্রোড়ে স্থান পাইলেন বলিয়া আশ্বস্ত ও উৎসাহান্বিত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের প্রজাবৃন্দ স্বদেশ-প্রেমের সংঘর্ষণে ভারত-শাসনের মূল নীতি হইতে সময়ে সময়ে বিচলিত হইলেও, সে নীতি প্রকাশ্যে কখন পরিত্যক্ত হইয়াছিল না।

অবাধ বাণিজ্য-নীতি প্রবর্ত্তিত হইবার সময়ে লবণ ও কাপাসের সূতা সম্বন্ধে দেশীয়দের উপর যে নামান্তরিত শুল্ক আদায়ের বিধি করিয়া, বিলাতবণিকদের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ভারত-গবর্ণমেণ্টের স্থাপনের কলঙ্ক। রাজবিধি প্রজার মঙ্গলজনক করিতে হইলে, ভারত সম্রাট যে কোন দেশেরই অধিবাসী হউন না কেন, ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য বিধি প্রণয়ন সময়ে তিনি সম্পূর্ণ ভারত প্রজাবৃন্দের মঙ্গলজনক কার্য্য করিতে বাধ্য। ইংলণ্ডরাজ ইংরেজ-বণিকের হিতাকাঙ্খী হইয়া ইংলণ্ডের রাজ কার্য্য করিতে বাধ্য। একাধারে তিনি উভয় দেশের রাজা হইয়া, একের অনিষ্ট করিয়া অন্যের হিতসাধন করিতে পারেন না, সমদর্শীতার এই সকল ব্যতিক্রমনীতি সর্ব্ব প্রাচীন ও সার্ব্বজনীন ভারতবর্ষীয় রাজনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী, সুতরাং ভারতবাসীর ইহাতে মর্ম্মাহত ও ব্যথিত হওয়া স্বভাবসিদ্ধ। সম্প্রতি কতক দিন হইল, ভারতবর্ষে যে শাসননীতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতে জনসাধারণের মনে নানা আশঙ্কার উদয় হইয়াছে, যাহাতে এই আশঙ্কা দূরীভূত হইতে পারে, রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি পরস্পর-বিরোধী ভাবাপন্ন না হইয়া উঠে, যাহাতে পরস্পর পরস্পরের বল ও সহায় হইয়া অশেষ মঙ্গল সাধিত করিতে পারে, রাজা প্রজা সকলেরই সর্ব্ব প্রযত্নে সমবেত চেষ্টায় তাহা করা কর্ত্তব্য।

জেলা-সমিতি প্রাদেশিক সমিতির শাখা হইলেও ইহার কার্য্যক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ। রাজনৈতিক আন্দোলন ইহার মুখ্য কার্য্য নহে। যে পল্লী সমাজ আমরা হারাইয়াছি, তাহার পুনরুদ্ধার সাধন করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য, কারণ আত্ম শক্তি প্রসারের ইহাই মূলভিত্তি, হিন্দু মুসলমানে মিত্রতা স্থাপনের দেশময় একটা আন্দোলন উঠিয়াছে। কথায় কথায় এখন হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের অপকারিতার আলোচনা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কথাটা অতি অন্তঃসারবিহীন বলিয়াই মনে হয়, পল্লী গ্রাম মাত্রেই এই অভিনব নীতি ঘোষিত হইয়া অশিক্ষিত সমাজে ঘোর অন্তর্বিপ্লবের সূত্রপাৎ হইয়াছে এবং বিগত তিন বৎসর ধরিয়া নূতন বঙ্গে তাহার নানারূপ ঘোর অশান্তিজনক অভিনয় হইয়া গিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে পল্লী সমাজের ধারণা পর্য্যন্ত করা এখন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। নানা শ্রেণীর লোকেরই পল্লীগ্রামে বাস ছিল, এখনও অনেক স্থানেই আছে, ইহাদের মধ্যে

পরস্পর যে সৌহার্দ্দ, সহানুভূতি ও আত্মীয়তার ভাব ছিল, উচ্চ শ্রেণী ও নিম্নশ্রেণী মধ্যে যে কুটুম্বিতা হইত, অথচ নিজ নিজ গৌরব রক্ষা করিয়া সকলেই মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে পারিত, তাহাই পল্লী সমাজের অস্থিমজ্জা, তাহারই উপর পল্লী সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। হিন্দু-মুসলমান-পার্থক্য কথাটার স্থানই তাহাতে ছিল না। জাতিভেদ যে দেশের সমাজ-বন্ধনের মূল মন্ত্র এবং সাম্প্রদায়িকতা যেখানে ব্যবসাগত ছিল, জাতি-পার্থক্যের ঈর্ষাদ্বেষ সে সামাজিকতার অন্তরায় হইতে পারিত কি না, তাহা চিন্তার বিষয়। ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ সম্বন্ধে সামাজিক শাসন যে অতি সুন্দর উপায়, তাহা আজি কালি অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন, সামাজিকতার জীবন্ত ভাবের উপর সেই শাসনবিধি নির্ভর করে। পল্লী সমাজে যখন সেই জীবন্তভাব ছিল, তখন নানারূপেই তাহার উপকারিতা জনসাধারণ লাভ করিতে পারিত এবং নানা পার্থক্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়া পল্লী সমাজকে শান্তিময় করিয়া রাখিতে পারিত, রাজবিধি এবং সমাজবিধি ক্রমে বিরোধী ভাবাপন্ন হইয়া সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির প্রশ্রয়ে সে সমাজ বন্ধন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ও বিরোধ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেকেই এখন বুঝিতে পারিতেছেন, সেই সার্ব্বজনীন পল্লী সমাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠা আত্মশক্তি প্রসারের সর্ব্ব প্রথম কার্য্য এবং সে উদ্যমে সফলতা হইলেই, আমরা নানা পার্থক্য সত্বেও, জাতীয় জীবন লাভে অধিকারী হইতে পারিব, ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক পার্থক্য ও বিগীষা সর্ব্বদেশেই আছে, সমতা রক্ষিত হইলেই তাহাতে অশেষ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, মিলিত চেষ্টা দ্বারাই সভ্য জগৎ সেই সমতা রক্ষা করিয়া জাতিগত উন্নতি সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছে।

যে সকল বিষয় আপনাদের নিকট আলোচনা করার জন্য উপস্থিত করা হইবে, তাহার সর্ব্ব প্রধান, দুর্ভিক্ষ ও স্বাস্থ্য-রক্ষা কারণ ইহারই উপর ব্যক্তি বা জাতিগত উন্নতি অবনতি নির্ভর করে; দেহ ও মনের স্ফূর্ত্তি সাধন, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও মৃত্যু সংখ্যার যতদূর সম্ভব হ্রাস করিতে পারা, এই কয়টী স্বাস্থ্য রক্ষার উপাদান। কি উপায়ে এই কয়টী বিষয়ের সুব্যবস্থা করা যায়, ইহাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়। বাঙ্গালার জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যার হার, বিশেষতঃ শিশু মৃত্যু সংখ্যার হার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। গত বৎসরে পাবনা প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি স্বদেশবৎসল পরম শ্রদ্ধেয় ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় এই বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সকল কার্য্যের ন্যায়, আর তাহার উল্লেখ শুনা যায় নাই। মৃত্যু সংখ্যার প্রকৃত আলোচনা হইলে সে সমাজের সুখ দুঃখের প্রায় সকল অবস্থাই জানিতে পারা যায়, রাজপুরুষেরা এ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন নহেন, কিন্তু যে অনুসন্ধান দ্বারা ইহার কারণ স্থিরীকৃত করা যাইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত আজিও করা হয় নাই।

নানা দিকেই আমাদিগের অবনতি ঘটিয়াছে, কিন্তু কি জন্য তাহা ঘটিল, তাহার অনুসন্ধান না হইলে উন্নতি লাভের আশাই বৃথা। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সংখ্যা দিন দিন যেরূপ হ্রাস হইতেছে, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া

তাহার প্রতিকার করিতে না পারিলে আর এক শতাব্দী পরে কি ঘটিবে, ঈশ্বরই জানেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবিষয়ে নীরব নহে। দুঃখের বিষয়, তাহা স্কুল কলেজের সাধারণ পাঠ্যের অঙ্গ নহে। জাতীয় শিক্ষা বিভাগের এই গুরুতর বিষয়টী হস্তে লওয়া নিতান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক জেলা সমিতির সাহায্যে, প্রতি জেলার সামাজিক ইতিহাস সংগ্রহ করা অতি সহজ। গবর্ণমেণ্ট ফৌজদারী বিভাগে, এখন জেলে জেলে যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান লইতেছেন, সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে সেইরূপ প্রণালীতে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সাহায্যে বিবরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক। বিশুদ্ধ হিন্দু রীতিনীতি যে বিজ্ঞানসম্মত এবং দেশহিতকর, তাহা এখন ক্রমে প্রমাণীকৃত হইতেছে। ইহা দ্বারা এই অনুমান হয়, একসময়ে আর্য্য-ঋষিগণ এবিষয়ের সম্যক আলোচনা করিয়াই হিন্দু রীতিনীতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এই অনুমান সত্য হইলে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সম্মিলন-ভূমি ভারতবর্ষই এই অনুসন্ধানকার্য্যের নেতা হইবার উপযুক্ত। ভারতের এই লুপ্ত-গৌরব উদ্ধার হইলে পুনরায় ভারত সভ্য জগতে উচ্চ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবে, ইহা দুরাশা নহে। আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম-এ, বি-এল মহোদয় জন্ম মৃত্যুপোলক্ষে যে বিবরণ আমাকে দিয়াছেন, তাহা অপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। ১৯০৫, ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালের বাঙ্গালার জন্ম মৃত্যুর হার যাহা জানা গিয়াছে, তাহা এই—

	১৯০৫	১৯০৬	১৯০৭	
জন্ম—	৩৯.৫	৩৭	৩৩	প্রতি হাজারে
মৃত্যু—	৩২	—	৪০	ঐ
শিশু মৃত্যু	—	—	৩৬	ঐ

ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে, গত তিন বৎসরে জন্ম সংখ্যা ক্রমে কমিয়া যাইতেছে ও মৃত্যুসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ১৯০৭ সালে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুসংখ্যা বেশী হইয়াছে এবং তিন বৎসর পূর্ব্বে যাহা জন্ম ও মৃত্যুর হার ছিল, তাহাই তিন বৎসর মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে। অন্যদেশের, শিশু মৃত্যুর হার হাজারে ১৫ হইতে ২০ মাত্র, কিন্তু বাঙ্গালায় তাহা ৩৬। গত ১৯০৭ সালে বাঙ্গালায় কিঞ্চিদধিক সাড়ে এগার লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে, ইহার শতকরা ৬২ জন মেলেরিয়া রোগে মরিয়াছে। গত পঞ্চাশ বৎসরে হিন্দুসংখ্যা শতকরা ৪০জন কমিয়াছে। এই ভাবে চলিলে আর এক শতাব্দী পরে কি ঘটিবে, চিন্তা করিতেও হৃৎকম্প হয়। নব্যভারত ও সাহিত্যে শশধর বাবু "পরবশতা", "ভাব ও কর্ম্ম" "আত্মরক্ষা" প্রভৃতি যে সকল পাশ্চাত্য জগতে গৃহীত গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তাহা সকলেরই বিশেষ বিবেচনার বিষয়। তিনি যেরূপ অধ্যবসায়ে জীবতত্ত্ব ও তদনুষঙ্গিক বিজ্ঞান ও সামাজিক ইতিহাসাদি, ভারতের অমূল্যধন উপনিষদাদি গ্রন্থাদির সহিত মিলিত করিয়া অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ ও আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং অনুকরণীয়। অনেক সময় তাঁহার সহিত এই সকল বিষয়ের আলোচনায় আমার ধারণা হইয়াছে, জীবতত্ত্বের এবং সামাজিক ইতিহাসের সম্যক্ আলোচনা ও শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষার বিষয় এবং সেই শিক্ষাভিত্তির উপর সমস্ত শিক্ষা-পদ্ধতি স্থাপন করা কর্ত্তব্য। জাতীয় শিক্ষা বিভাগে এই বিষয়টী বিশেষরূপে আলোচিত হওয়া এবং তদনুসারে কার্য্যের ব্যবস্থা হওয়া একান্তপ্রার্থনীয়

জন্ম মৃত্যুর বিবরণ আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে, আমাদিগের অবনতির কারণ অনুসন্ধান জন্য দৈহিক ও যান্ত্রিক পরিমাপ, শিরা ও পেশীর শক্তি পরীক্ষা, মানসিক শক্তি পরীক্ষা প্রভৃতি শিক্ষার অঙ্গ হওয়া আবশ্যক এবং তাহার সাহায্যে প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়া মূল ব্যাধির প্রতীকারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এদিকে সাধারণতঃ মেলেরিয়া নিবারণ জন্য পচা নালা ডোবা পূরণ করা, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া পরিষ্কার বাতাস ও রৌদ্রের সুগম করিয়া দেওয়া, পানীয় ভাল জলের ব্যবস্থা করা, বলরক্ষা করা ও বল বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন করা, পুষ্টিকারক আহারীয় সংগ্রহ করা প্রভৃতি কার্য্যের সুব্যবস্থা করা আবশ্যক, কিন্তু এই সকল কার্য্যেরই মূল ধনবল বৃদ্ধি করা। কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি ভিন্ন ধনবল বৃদ্ধি হইতে পারে না। প্রায় সকল সভ্যদেশেই কৃষি ও বাণিজ্য রাজশক্তি দ্বারা পরিপুষ্ট, ভারত গবর্ণমেণ্টও এদিকে দৃষ্টিপাৎ করিতেছেন, "স্বদেশী" নীতি অবলম্বনে রাজপুরুষগণ ও জনসাধারণ কৃষি বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষক হইলেই, ভারতবর্ষ পুনরায় স্বর্ণপ্রসবিনী হইবেন এবং ইংলণ্ডের প্রকৃত গৌরব-রক্ষিত হইবে।

জেলাসমিতির সাহায্যে পল্লীসমিতি সংস্থাপন, শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত মঠ স্থাপন এবং বিবাহ প্রথার পুনঃসংস্কার এই তিন প্রধান উপায়ে আমাদিগকে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা ও প্রসার করিতে হইবে। আপনারা আসুন, সকলের সমবেত চেষ্টায় আমরা সেই মহৎ কার্য্য সাধনোপযোগী হইয়া কৃতার্থ হই।

"স্বদেশী" ও মঠস্থাপন বিষয়ে অনেক কথাই বলিবার আছে, কিন্তু দুই একটী কথা মাত্র আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিব। স্বদেশী কি? স্বদেশী স্বদেশ-প্রেম মাত্র, এবং স্বদেশ-প্রেম বিদেশী বিদ্বেষ নহে। পিতৃ মাতৃ সেবা, অন্ধ আতুর সেবা, অতিথি সেবা, সকলই মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু তাহারও অগ্র পশ্চাৎ আছে। পিতামাতাকে ঘরে অন্নকষ্টে ক্লিষ্ট রাখিয়া কেহ বিলাসিতায় অথবা অন্য দুঃখ দূর জন্য অর্থব্যয় করিলে যেরূপ সে সকলেরই ঘৃণার পাত্র হয়, সেইরূপ, স্বদেশের দুঃখ কষ্টে তাচ্ছিল্য করিয়া বিদেশে কেহ অর্থব্যয় করিলে, সে সকলেরই নিন্দাভাজন হয়। বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণ, ইহাই মূল নীতি। রাজা জমিদারদের নিজপল্লী ছাড়িয়া ব্যয়-সাধ্য দূর সহরে বাস গবর্ণমেণ্টও নিন্দা করেন। স্বদেশজাত দ্রব্য পাইলে বিদেশী দ্রব্য লওয়া হইবে না, পূর্ত্তকার্য্য বিভাগে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ আদেশ আছে। এই নীতি সাধারণে গৃহীত হইলে গবর্ণমেণ্ট কেন তাহার পৃষ্টপোষক হইবে না, তাহার কোন কারণ নাই। আমরা যে দোকানে সর্ব্বদা জিনিস পত্র লই, সে দোকানী ন্যায্য প্রাপ্য জন্যও তাগাদা করিয়া ত্যক্ত করিলে বা ঋণ গ্রহণে তাহার দেনা শোধ করিতে বাধ্য করিলে, স্বতঃই আমরা তাহার দোকানে জিনিস লওয়া বন্ধ করি। বঙ্গভঙ্গে ভাবী উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত হওয়া বিশ্বাসে বঙ্গবাসী ক্লিষ্ট ও বিড়ম্বিত হইয়া ভারতরাজ্য-বিধাতা প্রজাতন্ত্র-রাজ্যের বণিক সম্প্রদায়ের সহানুভূতি না পাইয়া ও তাহাদের উদাসীনতা জন্য বঙ্গবাসী তাহাদের সহিত ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করিয়া কোন দোষের কার্য্য করে নাই। বাণিজ্যের উন্নতি সাধন দেশের ধনবৃদ্ধির এক মাত্র উপায়, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। সুতরাং স্বদেশীই আমাদের উদ্ধারের একমাত্র অমোঘ

উপায়। শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত মঠপ্রথা প্রচার কার্য্যের পরম সহায়। চিরকুমার অথবা আশ্রমবাস পর্য্যন্ত অবিবাহিত, সচ্চরিত্র, পরহিত-রত, ধর্ম্মনিষ্ঠ, স্বার্থত্যাগী ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়া তদ্দ্বারা পরিচালিত পল্লী-আশ্রম অথবা মঠ স্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছে। ঐ আশ্রম অথবা মঠের সাহায্যে পল্লীসমাজে জ্ঞান,ধর্ম্ম ও শিক্ষা প্রচার, স্বাস্থ্য বিধান, দৈহিক,মানসিক ও আর্থিক বলবৃদ্ধির জন্য ব্যায়াম, শাস্ত্রালোচনা ও ব্যবসায় বাণিজ্যাদির উন্নতি বিধান ও পরোপকার ব্রত, আত্মরক্ষা ও সমাজরক্ষা ও তাহার উন্নতি বিধান প্রভৃতি দৈনন্দিন সদনুষ্ঠান শিক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। এইরূপ এক একটী আশ্রম, বিবিধ সদনুষ্ঠান পল্লীমধ্যে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত করিবে; পল্লী বহুকালের নিদ্রালসভাব হইতে জাগ্রত হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে সভাপতি নির্ব্বাচন করা আপনাদের প্রথম কার্য্য। যাঁহাকে (শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে) আপনারা সেই পদে মনোনীত করিয়া আহ্বান করিয়াছেন, তিনি আপনাদেরই একজন। অল্প দিন পূর্ব্বে তিনি আমাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। তাঁহার ন্যায় স্বদেশবৎসল, স্বদেশ-সেবক, রাজসাহীর পরম বন্ধু পাওয়া দুর্লভ। রাজসাহীর ম্যালেরিয়া নিবারণ ও অন্যান্য হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান জন্য আইন সভায় তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। নাটোর মহকুমার মৃত্যু সংখ্যার হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; ইহা তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথমে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপথে উপস্থিত করিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আজিকার এই শুভ কার্য্যের নেতা তাঁহাকে করিতে পারা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আমি আর আপনাদের সময় নষ্ট করিব না। আমার সকল ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন, এই আমার শেষ প্রার্থনা।

শ্রীকিশোরীমোহন চৌধুরী।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন।

জন্ম—১২৫৩ সাল, ২৯শে মাঘ, বুধবার, নয়াপাড়া গ্রাম।
মৃত্যু—১৩১৫ সাল, ১০ই মাঘ, শনিবার, চট্টগ্রাম—লক্ষ্মীভিলা।

যে সকল মহাত্মার পূতনাম স্মরণে বঙ্গ-ভাষা আজ গৌরবান্বিত, তাঁহাদের মধ্যে নবীনচন্দ্র অন্যতম। তাঁহার তিরোধানে আজ বঙ্গে হাহাকার উঠিয়াছে।

ভারতচন্দ্রের বীণার ঝঙ্কার যখন নীরব হইয়াছিল, তখন বঙ্গে একবার মহা হাহাকার উঠিয়াছিল। আর কি এমন সরস লেখা বাহির হইবে, সেই সময়ে অনেকের মুখেই এই কথা প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। আবার যে বঙ্গ প্রাণ মাতোয়ারা বীণার ঝঙ্কারে পরিপূরিত হইবে, তাহা কে জানিত? ধন্য মধুসূদন, ধন্য হেমচন্দ্র, ধন্য নবীনচন্দ্র—তাঁহারা তিনে এক, একে তিন হইয়া,সেই দুর্দ্দিনে, মাতৃভাষার সিংহাসন মস্তকে ধারণ করিলেন;—সুষুপ্ত বঙ্গবাসী—কোকিল-কূজন শুনিয়া বিস্মিত নয়নে, স্থির

বদনে, উৎফুল্ল হইয়া চাহিয়া দেখিল, বঙ্গের দিন ফিরিয়াছে। এমন এক সুধাবিনিন্দিত ভাষার স্রোত বহিয়া গেল, যাহার সমতুল্য আর বঙ্গে হইবে কিনা, জানি না। সকলে আত্মহারা, সকলে প্রমুগ্ধ, সকলে সম্মোহিত! সকলের মুখে এই এক ধ্বনি,—কি শুনিলাম, কি দেখিলাম!! সকলে বুঝিলেন, বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। যাঁহারা বিদ্রূপের নির্ম্মম কশা হস্তে লইয়া বঙ্গভাষাকে সদা কঠোর আঘাত করিতেন এবং ইংরাজি ভাষার বুকনি উচ্চারণে রসনাকে তৃপ্ত করিতেন, তাঁহারাও থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং লজ্জিত হইয়া ভাবিলেন, কাব্য-জগতে আবার মিল্টন, আবার কাউপার, আবার বায়রণ ফিরিয়া আসিলেন কি? উঁহারা অল্পে কি সে দিন সাহিত্য-পরিষদে যোগ দিয়াছেন? যখন লজ্জার উপর লজ্জা রাখিবার আর ঠাঁই পাইলেন না,—তখন বুঝিলেন, এবং স্বীকার করিলেন, বাঙ্গালা ভাষার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল! তাঁহারা অল্পে কি আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রবর্ত্তনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন? সে সকল কাহিনী স্মরণ করিলে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়,—অনেক বিদ্রূপ-বাণ, অনেক ঠাট্টা-কশা নিক্ষেপের পরও যখন দেখিলেন—এ বালিকা কিছুতেই মরে না, সর্ব্বপ্রকার সহানুভূতি এবং সাহায্য-বঞ্চিতা হইয়াও এ বালিকা নানা বেশ ভূষায় অপূর্ব্ব সাজে সাজিয়া দাঁড়াইতেছে, তখন, আর কি করেন, সম্মোহিত অন্তরে, না জানি কি মর্ম্মবেদনার দাহনেই (!) হাসিমুখে বালিকাকে অভিভাষণ করিলেন!! মলিনার আজ সর্ব্বত্র আদর, আজ কুরূপার প্রতি সকলের সাদর আহ্বান ও প্রীতি-সম্ভাষণ দেখিয়া শুনিয়া, ভাই, তুমি কি মনে করিতেছ? ঠাকুরদাস ও বিহারীলাল আজ স্বর্গে, ভূদেব এবং রাজকৃষ্ণ আজ বৈকুণ্ঠে—মলিনার সাদর-অভ্যর্থনা দেখিয়া কে আজ নিভৃতে নৃত্য করিবেন? হায়, আজ নবীন চন্দ্রও স্বর্গে—কুরূপার সাদর অভিভাষণ দেখিবার জন্ম প্রাচীন যুগের আর কে রহিলেন?

মধুসূদন বড়, না হেমচন্দ্র বড়, না নবীন চন্দ্র বড়—সে কথা-বিচারের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনে এক, একে তিন। যেমন অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর এবং প্যারীচাঁদ; যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র এবং দেবেন্দ্রনাথ; যেমন রাজকৃষ্ণ, ভূদেব এবং রাজনারায়ণ;—তেমনই, মধুসূদন, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র। মলিনার সেবা করিবার সময়, এদেশের মহারথীরা, তন্ময় হইয়া জাতি, কুল, অবস্থার গণ্ডি ভুলিয়া গিয়াছিলেন,—পরস্পর একাত্মক হইয়া, এক-ধ্যান, এক-জ্ঞান, এক-রস-সুধাপানে বিভোর হইয়াছিলেন। তাঁহারা এমন মধুর মিলনে মিলিয়াছিলেন যে, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, মূর্খ জ্ঞানী, বৈদ্য কায়স্থ ব্রাহ্মণ, পূর্ব্ববাঙ্গালা পশ্চিম বাঙ্গালা—সব ভেদ ভুলিয়া মলিনার প্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন। চট্টোগ্রাম, যশোহর, হুগলি, ২৪ পরগণা—সব মিলিয়া একাকার। এরূপ সুন্দর দৃশ্য কেহ কখনও দেখে নাই; ভেদ-বুদ্ধি ও অহংজ্ঞানের প্রাবল্যের দিনে, এদেশে, আর কেহ কখনও দেখিবে কি না, তাহাও জানি না। ধন্য বঙ্গ-ভূমি, ধন্য বঙ্গভাষা! সব যখন একাকার, তখন কাহার আদর অধিক হইবে? যুঁই, বেলী, চামেলী—কে কার অপেক্ষা হীন? সকলেরই এক মহাব্রত ছিল, বাঙ্গালা ভাষাকে উদ্ধার করিতে হইবে। কি কঠোর সাধনা বলেই তাহা

তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন! এই পবিত্র ব্রত পালনে, দুঃখ দারিদ্র্য সব তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং এই মলিনার উদ্ধারের কথা ভাবিবার সময়, কেহ যেন কখনও ভেদ-গণনা করেন না,—সকলেই যেন মনে রাখেন, উঁহাদের সকলেরই প্রয়োজন ছিল, তাই তাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা গাহিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা মাতিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই সমানভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই এক-ধ্যান, এক-জ্ঞান, এক-রস-সুধাপানে বিভোর হইয়াছিলেন। কত তপস্যার ফলে আজ বঙ্গে মলিনার বিকাশ হইয়াছে, ভাই, তুমি একবার চিন্তা কর এবং যদি তোমার চক্ষে ভক্তির অশ্রু জমিয়া থাকে, তবে তাহা আজ, প্রীতি-অর্ঘ্য সহ নবীনচন্দ্রের পূত শ্মশানে ঢালিয়া দেও। চট্টগ্রাম আজ স্বর্গে এবং কর্ণফুলী আজ ভক্তি-নদীতে পরিণত হউক।

বঙ্গের মহা-সমস্যা—ভেদ-বুদ্ধির বিনাশ। তাঁহারা বঙ্গে, শুধু বঙ্গে কেন, ভারতে আবার ভেদ-জ্ঞানের রাজত্ব স্থাপনে বদ্ধপরিকর;—আমরা ভেদ জ্ঞান-বিনাশে সচেষ্ট। নির্য্যাতন, নির্ব্বাসন, নিপীড়ন—এ সকল গণিয়া কি আমরা ফিরিব? কই, যাঁহারা সাহিত্যের নেতা ছিলেন, তাঁহারা ত ফিরেন নাই,—বঙ্গভাষার মহা সাধকেরা ত ভয়ে ভয়ে সন্ত্রস্ত হন নাই? তবে আমরা, কাপুরুষের ন্যায়, কি মহারথীদের কথা ভুলিয়া, পা-চাটা পোষ্যপুত্রদের দলে নাম লিখাইব? যদি তাহা হয়, তবে আর কেহ মহারথীদের নাম মুখে আনিও না। ভুলিয়া যাও—

"কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্র কিরণ,
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি,
তুমি অস্তাচলে দেব করিলে গমন,
আসিবে ভারতে চির বিষাদ রমণী।"

এবং এ ভারতকে গাঢ় বিষাদ-অমাবস্যায় আবার গ্রাস করুক। কিন্তু তাহা কি আর সম্ভব? জাগরণের পথ রোধ করে, কাহার সাধ্য? চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে, সভয়ে আজ লিখিতেছি, তাহা সম্ভব নয়—মলিনা যদি অপূর্ব্ব সাজে সাজিয়াছে, তবে জোয়ান-অব-আর্কের ন্যায়, এই মলিনাই ভারতকে জয় করিবে; তুমি, আমি, সে, তাহার বিরোধী হইলে আমরাই পচিয়া ডুবিয়া মরিব, মলিনার তেজোগর্ব্বে ভারত জাগিবেই জাগিবে। আর আমরা যদি তাহার সেবা, তাহার পরিচর্য্যা, তাহার সাদর সম্ভাষণ লইয়া থাকিতে পারি, আমরাও তাহার সহিত ধন্য হইয়া যাইব। বিশ্ববিধাতা এই আশীর্ব্বাদ করুন, বঙ্গভাষা ভারতের সর্ব্বত্র আদৃত হউক এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের মহারথীগণ সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত ও আদৃত হউন!

দারুণ শোকের দিনে নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে আর অধিক কিছু লিখিতে পারিলাম না;—লিখিতে ইচ্ছাও নাই, কেননা, ৪০ বৎসরের বঙ্গসাহিত্যে যে নবীনচন্দ্রের প্রতিভা ওতপ্রোতভাবে বিমিশ্রিত, তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইবার নয়। নবীনচন্দ্রের কীর্ত্তি এদেশে অক্ষয় হইয়াছে। অনন্তকাল তাঁহার প্রতিভা-কীর্ত্তনে কৃতীগণ বিমল আনন্দ পাইবেন।

এস্থলে নবীনচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত "বঙ্গভাষার লেখক" ও "চুচুড়া-বার্ত্তাবহ" হইতে তুলিয়া দিলাম।

"১২৫৩ সালের ২৯শে মাঘ, অর্থাৎ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি, বুধবার, চটগ্রাম জেলার অন্তর্গত রাউজান থানার অধীন সর্ব্বজন-পরিচিত নয়াপাড়া গ্রামে তিনি জন্ম

গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিপুল গ্রামখানির চারিদিক হীরক হারের ন্যায় নদীর দ্বারা বেষ্টিত এবং চট্টগ্রাম সহর হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। নবীনচন্দ্রের মৃতদেহ নৌকাযোগে চট্টগ্রাম হইতে নয়াপড়া গ্রামে সংকীর্ত্তন দল সহ লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহার জন্মস্থান নয়াপড়া গ্রামের শশ্মানঘাটে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম ৺ গোপীমোহন রায় (সেন) এবং মাতার নাম ৺ রাজরাজেশ্বরী দেব্যা। তিনি এমন সরলা ছিলেন যে, দশের অধিক গণিতে জানিতেন না। কুলানুসারে জন্মপত্রিকালেখক লিখিয়াছেন, নবীনচন্দ্র সেন দাস। নবাবদত্ত পৈত্রিক উপাধিক্রমে শৈশবে তিনি "নবীনচন্দ্র রায়" ছিলেন। কেহ কেহ বহু যত্নে বহু ক্লেশে যে "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন, নবীনচন্দ্র তাঁহার জনৈক খুল্লতাত ভ্রাতার ভ্রান্তিতে তাহা হারাইয়াছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা বলেন "রায়" Honorary distinction নামের সঙ্গে আপনি লিখিতে নাই।" তাই নবীনচন্দ্র বিদ্যালয়ে "রায়" কাটাইয়া "সেন" লিখাইয়াছিলেন। যে দুই বৈদ্য বংশ চট্টগ্রামের হিন্দু সমাজের উপর এতকাল আধিপত্য করিয়া আসিতেছেন, বঙ্গের গৌরব কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তাহারই অন্যতরের সন্তান। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা "রাঢ়ভঙ্গের" সময় ষোড়শ শতাব্দীতে হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীর সন্নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রাম হইতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে যাইয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করেন,—শ্রীযুক্ত রায় চট্টগ্রামের রাজস্ব ভার এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্যাম রায় সৈন্য ভার প্রাপ্ত হন। ঢাকার নবাব তথায় শিবিরে অবস্থানকালে শ্যাম রায়ের ক্ষমতা পরীক্ষার্থ এক রাত্রিতে দীর্ঘিকা খনন করিয়া, তাহাতে পদ্মফুল দেখাইতে আদেশ করেন। সেই রাত্রিতেই শ্যাম রায় তাঁহার শিবির সমক্ষে এক বিস্তৃত দীর্ঘিকা খনন করিয়া ও নিকটস্থ কর্ণফুলী নদী হইতে তাহা জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে পদ্মফুল ভাসাইয়া দেন। নবাব প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর, সপদ্ম সরোবর সন্দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। এই সরোবর এখনও চট্টগ্রাম সহরের উপর অংশে "কমলদহ" নামে পরিচিত। শ্যাম রায়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রায় চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তিনি বিশুদ্ধাচারী হিন্দু এবং সিদ্ধ ভক্ত ছিলেন। এক এক সময় তাঁহার স্থাপিত দশভূজার সমক্ষে—ইনি এখনও নবীনবাবুদের কুলমাতা—অহর্নিশি প্রণত থাকিতেন; এই রূপ প্রবাদ, মাতা স্বয়ং দর্শন না দিলে তিনি উঠিতেন না। তাঁহার প্রভুত্বে ঈর্ষা-পরায়ণ তাঁহার অন্য এক ভ্রাতা তাঁহাকে এই প্রণত অবস্থায় খড়্গাঘাতে নিহত করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কনক-মুঞ্জরী প্রতিজ্ঞা করেন, তাঁহার পিতৃব্যের মুণ্ড যদি দর্শন করিতে পারেন, তবে তিনি "বাপ খুড়া" বলিয়া ক্রন্দন করিবেন, অন্যথা কাঁদিবেন না। তাঁহার অনুচরবর্গ পলাতক খুল্লতাতকে হত্যা করিয়া তাঁহার মুণ্ড আনিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া, তাঁহার এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। শ্রীযুক্ত রায়ের দুই পত্নীর দুই অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র ছিলেন। রাজ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা হইলে, তাঁহাদের প্রতিপালনের জন্য একটী বৃহৎ জমীদারী রাখিয়া, নবাব সমস্ত সম্পত্তি "বাজেয়াপ্ত" করেন। এই জমীদারী এখনও অংশক্রমে নবীনচন্দ্র ও তাঁহার বংশীয়দের অধিকারে আছে। তাঁহারা ৯ পুরুষ নয়াপাড়া গ্রামে

বাস করিতেছেন এবং শ্রীযুক্ত রায়ের বংশ বলিয়া এ অঞ্চলে পরিচিত। এ বংশের প্রায় প্রত্যেক পতিপত্নীর নামে নয়াপাড়া গ্রামে এক একটী দীঘি কি সরোবর আছে। নবীন চন্দ্রের পিতা চট্টগ্রামের জজ আদালতের সেরেস্তাদার ও পরে মুন্সেফ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাতেও সংসারের ব্যয় সঙ্কুলন করিতে না পারিয়া অবশেষে ওকালতী ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরোপকারিতা ও দানশীলতা চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রবাদের মত প্রচলিত। নবীনচন্দ্রের পিতা ও পিতৃব্যগণ চারি সহোদর—গোপীমোহন, আনন্দমোহন, মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র। নবীন চন্দ্র পিতামহ ও পিতামহীর জীবতাবস্থাতেই জন্মগ্রহণ করেন, তাই শৈশবে তাঁহার আদরের সীমা ছিল না। তিনি মাতামহীর বড় প্রিয়পাত্র ও স্নেহভাজন ছিলেন। পিতামহী তাঁহাকে বাল্যকালে লালন পালন করিয়াছিলেন; সুতরাং মাতার সহিত বাল্যকালে তাঁহার বড় একটা সংশ্রব ছিল না।

নবীনচন্দ্র অষ্টম বর্ষ বয়সে চট্টগ্রামের গুরুমহাশয়ের পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া চট্টগ্রাম বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তিনি শৈশবে বড় দুষ্ট ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন; কাহাকেও ভয় করিতেন না, কেবল খুড়া মদনমোহনকে দেখিলেই একটু শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিতেন। বিদ্যালয়ে তিনি "Wicked the great" (দুষ্টের শিরোমণি) উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যজীবন কতক লর্ড ক্লাইভের মত। এমন খেলা নাই, যাহা খেলিতেন না, এমন লোক নাই—ক্ষেপাইতেন না। শেষে বিস্তার পরিচয় পুরাতন সাহিত্য পরিষদে সম্যকরূপে দিয়া আসিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের একাদশ বৎসর বয়সে তাঁহার খুড়া মদনমোহনের ওলাউঠায় মৃত্যু হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র চট্টগ্রাম বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা, প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এফ-এ এবং জেনারেল এসেম্বিলি হইতে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যেমন তিনি এক একটী পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন, অমনি লোকে স্তম্ভিত হইয়া বলিতে লাগিল, এমন দুষ্ট ছেলে কিরূপে পাশ হইল? বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহাশয় নবীনচন্দ্রের দুষ্টামিতে উৎপীড়িত হইয়া বলিতেন—"গোপীবাবু মাঘ মাসের শীতে এক গলা জলে তপস্যা করিয়া এমন পুত্র পাইয়াছিলেন।" নবীনচন্দ্রের বিদ্যাধ্যয়নকালে, তাঁহার পিতা গোপীমোহন বাবু বদান্যতা ও আশ্রিত-বাৎসল্য বশতঃ ঋণজালে জড়িত হইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত গৃহদাহ ও পৈত্রিক সম্পত্তি লইয়া জ্ঞাতিদিগের সহিত মামলা মোকর্দ্দমা ও বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহাদিগের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল। এই সময় নবীনচন্দ্র চট্টগ্রাম বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তারপর, তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। এফ-এ, পরীক্ষা দিবার এক মাস পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হয়। গোপীমোহন বাবু প্রথমে এক পাত্রীর সহিত পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন, কিন্তু সে পাত্রী পুত্রের মনোনীত না হওয়ায়, সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়, তজ্জন্য ফৌজদারী মামলায় পড়িয়া গোপীমোহনকে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। গোপীমোহন শেষে পুত্রের মনোনীত পাত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। গোপীমোহন প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়াও ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্রকে দরিদ্রাবস্থায় রাখিয়া স্বর্গী-

রোহণ করেন। এই সময় তিনি কলিকাতায় প্রাইভেট টিউসন করিয়া নিজ অধ্যয়নের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন এবং দয়ার সাগর প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রথম ভাগ "অবকাশ-রঞ্জিনীর" পিতৃহীন যুবক ও শশাঙ্কদূত কবিতায় তাঁহার জীবনের এ অঙ্ক প্রতিভাত হইয়াছে। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নবীনচন্দ্র ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। তিনি বহুকাল বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় সুখ্যাতি সহকারে কার্য্য করিয়াছিলেন। তেজস্বিতা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য ডেপুটী জীবন তাঁহার পক্ষে পুষ্প-শয্যা হয় নাই, বরং সময়ে সময়ে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত তিনি অবসর-বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন। সরকারী কার্য্যে যে সময় তিনি নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় তিনি নিম্নলিখিত পুস্তক সকল লিখিয়াছিলেন :—

১। অবকাশ-রঞ্জিনী ১ম ভাগ। ২। অবকাশ-রঞ্জিনী ২য় ভাগ। ৩। পলাশীর যুদ্ধ। ৪। রঙ্গমতী। ৫। রৈবতক। ৬। কুরুক্ষেত্র। ৭। প্রভাস। ৮। অমিতাভ। ৯। ভানুমতী। ১০। গীতা। ১১। চণ্ডী। ১২। খ্রীষ্ট। ১৩। প্রবাসের পত্র।

তন্মধ্যে তাঁহার রচিত "পলাশীর যুদ্ধ" তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে, যতদিন বাঙ্গালী বাঁচিবে, ততদিন লোকে তাঁহাকে মনোমন্দিরে পূজা করিবে। যাঁহারা বীণার বিনোদ ঝঙ্কারে এতদিন বঙ্গ-বাণীর কমল-কানন মুখরিত হইয়াছিল, যাঁহার ভক্তি, প্রীতি, প্রেম ও স্বদেশানুরাগপূর্ণ কাব্যকলাপের সুধাপ্রবাহ এত দিন বাঙ্গালীর চিন্তাপীড়িত ও দুঃখদলিত হৃদয়ে স্বর্গীয় আনন্দ রস ঢালিয়া দিয়াছে, তাঁহার মৃত্যুতে আজ সমগ্র বঙ্গবাসী দুঃখে ও শোকে ম্রিয়মাণ হইয়াছে। উদয়াস্ত প্রকৃতির নিয়ম। এই নিয়মের অধীন সকলেই। নবীনচন্দ্রও সেই নিয়মে বঙ্গীয় কাব্যগগনে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সমুদিত হইয়া কাব্য-জ্যোৎস্নায় বঙ্গীয় সাহিত্যগগন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সেই নিয়ম বশেই তিনি পুনরায় অস্তমিত হইলেন! যাও, অমর কবি, নবীনচন্দ্র, যাও অনন্তধামে, যেখানে মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ গিয়াছেন, সেই সুখ ও শান্তিরাজ্যে অবস্থান কর! তোমার মহান্ কবিকীর্ত্তি তোমায় মর্ত্ত্যে অক্ষয় ও অমর করিয়া রাখিবে।

নবীনচন্দ্রের একমাত্র পুত্র মিঃ নির্ম্মলচন্দ্র সেন এক্ষণে রেঙ্গুণের চীপ কোর্টে বারিষ্টারী করিতেছেন। ভগবান তাঁহার এবং তাঁহার অন্যান্য পরিজনবর্গের শোকদগ্ধ-হৃদয়ে শান্তি প্রদান করুন।"

নবীনচন্দ্র।

হে কবি-বিহগ ওগো! কাব্য-কুঞ্জবনে,
হে নবীন! চিরদিন গাহিয়ে সঙ্গীত,
সহসা নীরব কেন বীণার ঝঙ্কার।
এখনোত নিশাশেষে হাসেনি তপন,
এখনোত ঊষারাণী গোলাপী-বসনা
পূরব-অর্গল খুলি দাঁড়ায়নি দ্বারে!
এখনোত জলধির ভৈরব গর্জ্জন
ছুটিছে ধাইছে অই প্রলয় তাণ্ডবে!
কোথা গেলে বাঙ্গালীর প্রিয় কবিবর,
কোথা গেলে? এস ফিরে, সহস্র কিরণ
সম দীপ্তময় দেব! শোন হাহাকার!
শোন অই ঘরে ঘরে করুণ-ক্রন্দন!
এস ফিরে—এস ফিরে হে কবি আমার
আবার জাগাও বঙ্গে ডমরু-ঝঙ্কার!

২

একি স্বপ্ন! একি দীপ্ত! কিসের সঙ্গীত,
অই কি সে নন্দনের কবি-কুঞ্জবন?
অই হাসে হেমচন্দ্র বরমাল্য করে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে ফুল্ল শ্রী মধুসূদন!
গাহিছে অপ্সরা কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত!
এস প্রিয় হে নবীন কল্প-কুঞ্জবনে,
এই তব কাব্যভূমি, নেহার অদূরে,
তোমার উত্তরা সতী, 'ভদ্রা' মনোরমা
বীরশ্রেষ্ঠ 'অভি'তব—বীর মোনেলাল
স্মিত হাস্যে কলভাষে করিছে আহ্বান।
অই শোন ধ্বনিতেছে "নির্ব্বাণ! নির্ব্বাণ"
অই তব 'অমিতাভ' ধীর শাক্যসিংহ!
সকলেরি হাসিভরা বদন কমল,
তোমার সাধের বঙ্গে শুধু অশ্রুজল!

'সাধে কি বাঙ্গালী মোরা চির পরাধীন,
কে আর গাইবে কবি জীমূত মন্দ্রণে!
কে ডাকিবে কে কাঁদিবে সম্ভাষি তপনে
ভাবি ঘোর অন্ধকার দীন ভারতের!
কার তুলি এঁকে দিবে অপূর্ব্ব সুন্দরী
সিরাজ-মহিষী-চিত্র সাধ্বী পতিব্রতা?
কে আঁকিবে বীর্য্যবতী রাণী মহীয়সী
রাণী ভবাণীর চিত্র অক্ষয় গৌরবে?
শ্যামল অঞ্চল-ছায় পল্লীর কুটীরে,
তরঙ্গিত নীল নভে অদ্রি মনোহর,
মনোহর তরু শ্রেণী জলধি গর্জ্জনে
কোন্ কবি আত্মহারা গাহিবে সঙ্গীত?
তব প্রিয় জন্মভূমি—চট্টল-জননী,
এতদিনে হারাইল পুত্র গুণমণি।

৪

তবে যাও হে মহান! মর্ত্ত্য-জন্মলীলা,
সমাপন এতদিনে—যাও পুণ্যলোকে,
ভুঞ্জ সেথা অনন্ত সে আনন্দ-সম্ভার!
তুমি নহ মৃত দেব তুমি যে অমর!
শুনি তাই তব নাম সপ্তকোটি মুখে।
ফুল যে ঝরিয়া যায় বিতরি সৌরভ,
তার স্মৃতি ভুলে যায় কোন্ সে পামর?
তোমার আশীষ বাণী—জাগিছে হৃদয়ে,
শুনিতেছি স্বর্গ হ'তে তোমার সঙ্গীত,
ফুরায়েছে বুঝি ওগো! ভীম অন্ধকার,
তাই কি হাসিছে পূর্ব্বে ঊষা মনোরমা।
কোটি জন্ম বেঁচে থাকি সঙ্গীত তোমার,
জাগাইবে নববলে বঙ্গবাসী জনে!
সে কিগো! সফল হবে এ কবি জীবনে?

হে উজ্জ্বল! হে সুন্দর! কবিতা সুন্দরী,
অশোক তরুর মূলে কাঁদিছে মলিনা!
এলোকেশে দীনবেশে সে মুখচন্দ্রিমা,
হারায়েছে শোভা তার, হায় মুখশশী,
শত মলিনতা মাখা! হে মৃত্যু! পামর,
একবার চেয়ে দেখ!—কাঁদিছে রূপসী,
ঝর ঝর ঝরিতেছে শুধু অশ্রুজল!
বীণা তার বাজেনাকো, থেমেছে মূর্চ্ছনা,
কলকণ্ঠ বিনীরব—কোথায় সঙ্গীত?
এস ফিরে—এস ফিরে—এস পুনরায়,
আবার তুলিয়া বীণা বাঁধ সপ্ত স্বর!
সে নাই সে নাই ধ্বনি পশিল শ্রবণে!
হেরিলাম চারিদিকে ঘন অন্ধকার!
গেছে চলে কবিশ্রেষ্ঠ দীন বাঙ্গালার!

৬

যদি গেলে, রেখে গেছ পীযূষ ভাণ্ডার,
সে যে সুধা অমরত্ব আমা সবাকার!
লহ দেব লহ পূজা, করহ গ্রহণ,
অজ্ঞাত ভক্তের এই করুণ তর্পণ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

কবিবর নবীনচন্দ্র।

(দেহাবসান উপলক্ষে)

নাই নাই— সর্ব্ব ঠাঁই,
একি আজ ধ্বনিরে,
শোকে কার্ হাহাকার
করে বিশ্ববাসীরে!

কীর্ত্তি যাঁর বিশ্বজিত, স্মৃতি যাঁর অমলিন,
তুচ্ছ দেহ পরিহারে—নাই কিরে সে নবীন?
নাই নাই— সর্ব্ব ঠাঁই,
এযে মিথ্যা বাণীরে—
পৃথ্বী জুড়ে, মর্ম্মপুরে
তাঁরি সত্তা মানি রে!

২

নাই নাই সর্ব্ব ঠাঁই—
এযে ঘোর অনৃত—
কীর্ত্তিমান্ ত্যজে প্রাণ,—
মৃত্যু কি?—সে অমৃত!
স্মৃতি যাঁর বক্ষে চেপে ধরা গায় যশোগান,
ত্রিদিবের শুভ্রহস্ত গলে করে মাল্য দান,
নাই নাই— সর্ব্ব ঠাঁই
তাঁরে কি বলিস্ রে?—
এযে তাঁর পুরস্কার,
কর্ম্মের আশীষ রে।

নাই নাই— সর্ব্ব ঠাঁই
কেন মিছে ছলনা—
গেহে গেহে, দেহে দেহে,
ব্যাপ্ত আছে, বলনা!
কায়ার বাঁধন খুলে মায়ায় বেঁধেছে ধরা—
সে-ই যে প্রকৃত বেঁচে, তাঁরে কি বলিস্ মড়া?
নাই নাই— সর্ব্ব ঠাঁই
ফের' তাঁরে খুঁজিয়া,
মর্ম্ম-পুরে বিশ্ব-জুড়ে
সত্তা তাঁরি গুঞ্জিয়া?

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত।

কামরূপ। (২)

জড় ও চেতন পদার্থে ভেদ নাই। চেতনের ন্যায় অচেতন পদার্থ সাড়া দিতে পারে, ইহা সম্প্রতি প্রমাণিত হওয়ায় বহুকালের দ্বৈধ মিটিয়া গিয়াছে। মানবতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব, সেই কারণে একসূত্রে আবদ্ধ। ভূমির অবস্থা, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সংস্থান মনুষ্যের শারিরীক ও মানসিক ব্যাপারে কার্য্য করে।

বঙ্গদেশের ভূমি যেমন কোমল, পশ্চিমাঞ্চলের ভূমি তদ্রূপ নহে, ইহাতে বাঙ্গালী অপেক্ষা হিন্দুস্থানী দৃঢ়। বঙ্গের ন্যায় সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা ভূমিতে দীর্ঘ কাল বাস নিবন্ধন আহোম জাতি নির্বীর্য্য হইয়া পড়িল। তাহাদের পূর্ব্ব বাসস্থলী হইতে অক্ষতবীর্য্য মান জাতি হিন্দুর উপরে, মুসলমানের আক্রমণের ন্যায়, বারম্বার ধাবিত হইতে থাকে। পৃথ্বীরাজের সহিত বিবাদ করিয়া জয়চন্দ্র যেমন সাহেবুদ্দিনকে আহ্বান করিয়াছিলেন, গুজরাটের মুসলমান রাজ যেমন মারাঠাদিগের সাহায্য গ্রহণ করিয়া শক্তি হারান, তদ্রূপ, ব্রিটিশবল ভিক্ষা করিয়া পরিশেষে আহোমরাজ আপনার রাজ্য ও আপন জাতির মর্য্যাদা লুপ্ত করিয়াছেন। অন্যের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া কেহ অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারে না। কর্ম্ম না থাকিলে অকর্ম্মণ্য হইতে হয়। পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন থাকা চাই, শ্রমবিমুখ অকর্ম্মণ্যেরা আপন ক্ষমতার অপব্যবহার করে, তদ্দারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

আহোমরাজবংশ অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল, সুতরাং অত্যাচারপরায়ণ না হইবে কেন? মোয়ামরিয়া সম্প্রদায় বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিল, বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে শাক্ত করিবার জন্য বলিদানে ছিন্ন পশুর রুধির দ্বারা উহাদের ললাটে তিলক অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইল। এবম্বিধ রাষ্ট্রনীতি-বিরুদ্ধ নানা কার্য্যে উৎপীড়িত হইয়া প্রজাকুল বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাহাতে "মানব উপদ্রব" বদ্ধমূল হইতে পারিয়াছিল।

উচ্চ ব্রহ্ম হইতে প্রভূত-সাহসী বৌদ্ধ শান জাতীয় যোধগণ আগমন করিয়া কামরূপে, যোগ্যতরের সংরক্ষণ নিয়মানুসারে, আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলে সত্য, পরে তাঁহারাই অযোগ্য হইয়া উঠিলেন। ইহাদের আহম নাম হইবার কার কি, জানি না। তাঁহাদের ইতিহাসকে বুরঞ্জি কহে, উহা শান ভাষায় বিধিবদ্ধ। তৎকালের পুরোহিত বংশে অদ্যাপি বৌদ্ধত্য বিদ্যমান। আমার পরিচিত গোহাই মহাশয়ের আকৃতি ব্রহ্মদেশীয়। তদীয়া কন্যা ক্ষীরোদা বাঙ্গালীর মত হইয়াছে। মধ্যযুগে আহমরাজগণের হিন্দু নামের সহিত একটী করিয়া শান আখ্যা মিলে। যথা সুহিতপাঙ্কফা বা গৌরিনাথ সিংহ, সুদিনফা বা চন্দ্রকান্ত সিংহ ইত্যাদি। সুকাফা হইতে পুরন্দর সিং পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ কালে ছয়শত বৎসর হইয়াছিল। বড়ুয়া, গোঁসাই, গোহাই, ফুকন উপাধি গুলি আহমরাজ প্রদত্ত। আমি শিবসাগর যাইতে পারি নাই। ইহা হইতেই সেই রাজকীর্ত্তির নিদর্শন লইয়া ক্ষান্ত হইলাম। তবে কাশীধামে

চন্দ্রকান্তের খুল্লতাত কর্ত্তৃক ষষ্টি সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত কামরূপের মঠ দেখিয়াছি। গোঁহাইয়ের পরামর্শ ভিন্ন রাজা রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় কোন কার্য্য করিতে পারিতেন না। গোহাই-এর অধীন থাকিয়া বড়ুয়া সামাজিক ও সৈনিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ইহাতে রাজার একাধিপত্য প্রবলভাব ধারণ করিতে পারিত না। দণ্ডশক্তি রাজা পরিচালনা করিতেন। নাসাকর্ণছেদন প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। দেশস্থিতি রীতিপ্রকরণে ইংরাজ অপ-রাধীর দণ্ড লঘু হইতে দর্শন করিয়া এখন আমরা ক্ষুব্ধ হই। ইংরাজের ব্যবহার শাস্ত্রে জাতিবিশেষের জন্য তারতম্য নাই। এখন-কার আদর্শ সাম্য ভৃগু মনুস্মৃতি স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রকে বধ করে, বিড়াল কুকুরঘাতের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আহোমরাজ্যে ব্রাহ্মণের দণ্ড উক্ত নিয়মানু-সারে অতি লঘু হইত। ন্যায় ও উদারতা না থাকিলে রাজ্যমাত্রেই শীঘ্র বা বিলম্বে ধ্বংস লাভ করে।

আহোম জনসংখ্যা ১১৮০০০। পুরো-হিতশ্রেণীর লোককে শীঘ্র স্থিতিশীলতা ত্যাগ করিতে দেখা যায় না। আহোমদিগের পূর্ব্ব গুরু দেওধাইগণ প্রেততুষ্টির জন্য পশুবলি ও ডিম্বস্ফোটন করিয়া ক্ষান্ত হন। আহোম-রাজ নবমতে দীক্ষিত হইয়া মনুষ্য ক্রয় করিয়া কামাখ্যা সন্নিধ্যে বলি দিয়াছেন; তাহার পোষ্যগণ বৃত্তি পাইত। আহোমজাতির বিবাহ অদ্যাপি পূর্ব্বতন নিয়মে আবদ্ধ।

আহোম ইতিহাস আলোচনা করিয়া অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সম্বন্ধে দৃষ্ট হইল, কর্ম্ম ক্ষেত্রে "সর্ব্বঃকার্য্যবশাৎ জনোভিন্নমতে কর্ত্তাতি কোবলন্তঃ।" যে জাতিকে এক সমাজ এক সময়ে ক্ষত্রিয়ের সম্মান দিয়াছিল, অধুনা তাহাদের ক্ষমতালোপে স্পৃষ্টজল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে অসম্মত। ব্রিটিশরাজ যাহার শত্রুদমন করিতে আসিয়াছিলেন, তাহার বংশ-ধর সিংহাসনচ্যুত। যাঁহাকে এখন একমাত্র উত্তরাধিকারী বলা হয়, তিনি অনুগ্রহের ভৃতি মাসিক ৫০ পঞ্চাশ টাকা ত্যাগ করিয়া সিলঙে ১৫০ দেড়শত টাকার বেতন গ্রহণ করিয়া সাধারণ কর্ম্মচারী হইয়াছেন। "যথাত্মানঃ ক্রিয়াঃ প্রাণাঃ সর্ব্বেষাম্ প্রাণিনাম তথা"। ইহা ধর্ম্মক্ষেত্রের কথা, কর্ম্ম ও ধর্ম্মে সামঞ্জস্য বিধানে মনুষ্যত্ব। তাহাই শ্রেয়ঃ।

আহোমদের গ্রাম্যদেবতার সহিত বঙ্গের গ্রাম্যদেবতার ঐক্য আছে। গোয়ালপাড়ায় বিষহরি বা মনসা, হুবাচনি বা সুবচনি পূজিতা। গারো ও মেচ জাতি সিজু বা মনসাবৃক্ষের পূজা করে। নাগপূজা ভারতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। মনসাবৃক্ষের পূজা বাঙ্গালী ভিন্ন কেবল গারোদের মধ্যে দেখিয়া উভয়ে যে কোন সংশ্রব আছে, তাহা অনুমেয়। আমাদের ক্রিয়াকলাপ, বৈবাহিক বেশ ও স্ত্রী আচার প্রভৃতির মধ্যে ইতিহাস প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে।*

সত্যশ্রবা কহিয়াছেন, কোচ্ জাতির জল-স্পর্শ করিলে অপবিত্র হইতে হয়, রিজলি কহেন, ব্রাহ্মণে তাহাদের স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করেন; ইহাতে বিদেশী লেখকের উক্তির প্রতি অনাস্থা জন্মিবার সম্ভাবনা। আমি এতদ্দেশে আসিয়া বিদেশীর অনুসন্ধান কার্য্যের সত্যতা

---

* উত্তরায়ণ সংক্রান্তি (পৌষপার্ব্বণ) দিনে করণীয় "বিহু"তে কামরূপে বাঙ্গালার হত পিঠা প্রস্তুত হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানীদের তদ্বৎ পিষ্টক প্রস্তুত করি-বার নিয়ম নাই। আহোমিয়া জাতির সংস্পর্শে আমরা বা আমাদের সংস্পর্শে তাহারা এই পর্ব্বাহ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে।

প্রত্যক্ষ করিলাম। কাশী ও নবদ্বীপে কোচের দান-গ্রহণ নিষিদ্ধ নহে। আসামের যতগুলি জাতি আছে, তন্মধ্যে জনসংখ্যায় ইহাদের ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ২২১০০০ গণিত হইয়াছে। যোগিনীতন্ত্রে প্রকারান্তরে ইহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে। বাঙ্গালার এই জাতীর রাজা ও ত্রিপুরাধিপ স্বাধীন নৃপতিরূপে আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, কোচরাজ বংশের সহিত এখানকার বেলতলারাজ সংশ্লিষ্ট, কোচবংশ কামরূপে দুইশত বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। আহোমদিগের সহিত তাহাদিগকে সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। কাছাড়ী, লালুঙ, মিকির ও অন্যান্য জাতি হিন্দু হইবার পূর্ব্বে কোচ্ হইয়া পড়ে; অন্যদিকে উত্তর বঙ্গে সামাজিক সম্মানে কোচ্ জাতি হীনতা লাভ করায় রাজবংশী নাম গ্রহণ করিয়াছে। কোচ্দিগের পূর্ব্ব ভাষা লুপ্ত হইয়াছে, যাহা অবশিষ্ট দৃষ্ট হয়, তাহা গারো ভাষার তুল্য। পূর্ব্বে কোচ্ ও মেচ্ জাতিতে বিবাহ হইত, প্রথম জাতি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করায় তাহা রহিত হইয়াছে। পরিবর্ত্তন কেহ নিবারণ করিতে পারে না। অক্ষর রূপান্তর করিতে কোন ব্যক্তি প্রয়াসী হন না, অথচ পূর্ব্বের অক্ষর হইতে এখনকার বর্ণমালা কেমন বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। সুবিধার সহিত ঘনিষ্ঠতা মিশ্রিত হইলে পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। এই রূপে আর্য্যীকরণে গৃহীত অসংখ্য মানব অনার্য্য ভূভাগকে আর্য্যভূমিতে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। কুচবেহারাধিপতিকে এক্ষণে আমাদের বঙ্গাধিপ বলিয়া সম্মান করা কর্ত্তব্য।

উত্তরবঙ্গে কাছাড়িজাতি মেচ্নামে প্রসিদ্ধ। কামরূপে মেচ্বংশীয় রাজগণ গৌরবাস্পদ আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব কাহিনীতে সুখসম্পদ ও ঔজ্জ্বল্যের চিহ্ন না থাকিলে তাহার সংশ্রব রাখিতে কেহ যত্নবান হয় না। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করিতে গিয়া মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনকে আদিপুরুষ নির্ণয় করিয়াছেন। নওগাঁ প্রদেশের বর্ত্তমান ডীমাপুর কাছাড়ের প্রাচীন রাজধানী হিড়িম্বপুর বলিয়া অনুমিত হয়। এই রাজবংশীয় জাতি আসামে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অধিবাসী; তাহাদের অপর নাম বোদো। নরকাসুর, বোধ হয়, এই জাতির লোক ছিলেন। শেষপর্য্যায়ে তিনশত বৎসর আসামে ইহাদের রাজ্য হইয়াছে। বসুন্ধরা কাহারই নহে; তথাপি ইহাদের তৎকালের প্রতিদ্বন্দ্বী আহোমরাজসহ বৈরিতা করিতে হইয়াছিল।

শ্রীহট্টের দিকে অবতরণ করিলে আমরা তাম্রনির্ম্মিতা জয়ন্তেশ্বরী কালিকা দর্শন করিয়া যাইতে পারিতাম; ইহা কামাখ্যার ন্যায় সতীর একপঞ্চাশত পীঠের অন্যতর স্থান। খস ও জয়ন্তী জাতির ভাষা ও আকৃতিতে প্রভেদ নাই। খাসিগণ পর্ব্বতের উপর, কিন্তু জয়ন্তীয়ারা সমভূমিতে বাস করে। তাহাদের গ্রাম্যশাসনে খসভ্রাতৃবৎ প্রতিনিধি-প্রণালী বর্ত্তমান।* জয়ন্তীরাজ ব্রাহ্মণ্যমত গ্রহণ করিয়া ঘোর শাক্ত হইয়াছিলেন। পর্ব্বতরায় (১৫০০—১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে রাজেন্দ্র সিংহ পর্য্যন্ত ৩৩৫ বৎসর আসাম তাঁহাদের করতলস্থ ছিল।

একজন কহিয়াছেন, আমি দেশের স্থানের বিবরণের অপেক্ষা তাহার অধিবাসীর প্রতি অধিক মনোনিবেশ করিয়া থাকি। এক্ষণে আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ক্রমে ঐতিহাসিক বৃত্তান্তে পরিণত করিতেছি। যাহা হউক, জাতিতত্ত্ব কেবল আকৃতি দ্বারা নির্ণীত নহে, পুরাবৃত্ত

* পূর্ব্ব ধর্ম্ম বোধ হয় ত্যাগ করে নাই।

দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করা অধিবাসীর পরিচয়কল্পে প্রয়োজনীয়।

কালিকাপুরাণোক্ত নরবলির অনুষ্ঠান দ্বারা জয়ন্তেশ্বরীকে প্রসন্ন করিবার অধুনা কোন উপায় নাই। জয়ন্তীরাজের আধিপত্য কালে নবরাত্রির সময়, রাজপুত্রের জন্মোৎসবে, বা কোন ইষ্টসিদ্ধি ঘটিলে নরঘাত অবশ্যম্ভাবী ছিল। পারলৌকিক শুভকামনায় স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া প্রায়শঃ হতব্যক্তি বলিরূপে আত্মোৎসর্গ করিতেন। এই মহাত্যাগী পুরুষের সদসৎ সর্ব্বপ্রকার বাঞ্ছাপূর্ণ করিতে কেহ আপত্তি করিত না। স্বভাবসিদ্ধ প্রাণভয়ে সম্মত ব্যক্তি পলায়নপর হইলে রাজা অপরের অধিকৃত স্থান হইতে কাহাকেও ধৃত করিয়া কার্য্য সমাধা করিতেন। ইংলণ্ডীয় সম্রাজ্যের সহিত জয়ন্তীরাজের সংস্রবকালে ঐ প্রকার অপরাধ হইয়াছিল, এই হেতুবাদে জয়ন্তীভূমি বৃটিশরাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

ইংরাজ শাসনকর্ত্তাগণ নরবলির আত্মতত্ত্বানুযায়ী ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন নাই; ইহাতে কামরূপে জনপদগণের জীবন নিরাপদ করিয়াছেন। আত্মদোষ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা লোকের অতি অল্পই থাকে। রাজতন্ত্রে ক্রটি ঘটিলে উদ্দাম নৃপতির পক্ষে সংশোধন করা অসম্ভব; তখন বিপ্লব ভিন্ন সাম্য স্থাপনের গত্যন্তর নাই। বলপূর্ব্বক নরবলী দেওয়া অতি গর্হিত; রাজা ইহাতে লিপ্ত হইলে তাঁহার পতন নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, সে স্থলে স্বদেশীরাজ্য অপেক্ষা বিদেশীরাজা কেনা প্রার্থনীয় জ্ঞান করিবে?

ভারতে বৈষম্য-স্রোত নানাভাবে প্রবল হইয়াছিল। রাজন্যগণ স্বেচ্ছাচারী, দণ্ডশক্তি, ও ন্যায়মার্গচ্যুত পারমার্থিকতার প্রাবল্যে, বহুকাল যাবৎ শান্তি সম্ভোগ প্রভৃতি কারণে অকর্ম্মণ্যতা আসিয়া আমাদিগকে পরাধীন করিয়াছে। আমরা যাঁহাদের অধীন, তাঁহারা বিদেশী, সুতরাং উভয়ের স্বার্থ বিভিন্ন, ইহাতে ইংরাজশাসনে ক্রটি থাকা সম্ভব। ভারতবাসী ইংরাজকে স্বরাষ্ট্র প্রদান করিয়া নানা প্রকারে উপকৃত হইয়াছে, ভারতের দ্বারা তদ্রূপ ইংরাজেরা উপকৃত হইয়াছে; পরস্পরের সাহায্যে মানবজাতি ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। ইংরাজ বৈশ্য জাতি, তাঁহারা যে ধনশোষণ করিতে পটু হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে, কিন্তু আমাদের রাজা বৈশ্যজাতি না হইলে, দেশের ধন ক্ষত্রিয়ের বুদ্ধিতে এবম্প্রকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত না। ইংরাজশাসনের গুণ ও দোষ বর্ণনকালে গুণ এক পৃষ্ঠা ও দোষ চারিশত পৃষ্ঠা লিখিয়া আমরা দেশানুরাগের পরিচয় দিতেছি; ইহাতে অনেকের ভ্রান্তধারণা হইতেছে। বস্তুকত্যা দেশের সুখসমৃদ্ধি অনুকূল অবস্থার সাহায্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। যে পরিমাণে সময়ের গুণে বর্দ্ধমান হওয়া সম্ভাবিত, তাহার ক্রটি ঘটায় সকলে প্রমাদ গণিতেছেন। এরূপ হওয়া উচিত, নহিলে জাতীয় জীবনীশক্তি হ্রাস হইতে পারে। কৃতজ্ঞতা মনস্বিতার পরিচায়ক। আমাদের তজ্জন্য ইংরাজ শাসনের গুণের প্রতি শ্রদ্ধা করা বিধেয়। দেশী বা বিদেশী হউক, প্রতিনিধি প্রণালীর শাসন সংস্থাপিত না হইলে প্রজার কল্যাণ নাই। অনন্যসাধারণ বৈষম্যের লীলাভূমি ভারতবর্ষে বৃটিশ সহায়তা ব্যতীত তাহা সাধিত হওয়া অসাধ্য। নবতন্ত্রের কথায় প্রজাশক্তিকে দেশের নিয়ন্তা করিবার কল্পনা হইয়া থাকে। একচ্ছত্র রাজশক্তির

অভাবে,ভারতের ন্যায় বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন স্বার্থ, সমবেদনাহীন প্রজাশক্তি কার্য্যকরী হইবে না। রাজশক্তি ও প্রজাশক্তের সামঞ্জস্য থাকিলে আমাদের উন্নতির অন্তরায় দূর হইবে; ইহাই এদেশের উপযোগী। রাজ শক্তি এখন সাম্রাজ্যবাদের কুহকে প্রজা শক্তিকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম করিয়াছে; অতএব আমাদের আত্মনির্ভরশীলতার উদ্রেক করিতে হইবেক।

সে কালের আসাম ও একালের আসামে তুলনা করিলে আধুনিক সময়ে সকল বিষয়ে উন্নতি দৃষ্ট হইবে। জগৎ ক্রমে সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিভিন্ন জাতির পরস্পর-সাহায্য সমৃদ্ধির মূল। বণিকরাজ ইংরাজ কামরূপে তাহার নিমিত্ত মাত্র। আসামীরা পূর্ব্বে নাগাদের মত ছিল, বাঙ্গালীর সংশ্রবে সভ্যতা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে।

কামাখ্যায় স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত বলি হইতে প্রস্তুত জনগণের কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা অবৈধ ছিল না; ভোগীগণ লাম্পট্যকে আদরের বিষয় করিত। তান্ত্রিক পণ্ডিত প্রকৃতির উৎপাদন-ক্রিয়াকে স্ত্রী আকারে শক্তি ও ক্ষমতাশূন্য, স্রষ্টা বা পুরুষকে পুং আকারে একত্রিত করিয়া তাহার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ অদ্বৈতভাব প্রদর্শন ও আত্মতত্বের ব্যাখ্যা আনিয়া বন্যভাবের সহিত সভ্যভাবের সমন্বয় করিয়া থাকেন।

আমরা আপনার অস্তিত্বে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। সুতরাং আমরা যাহার অধিক বুঝি না, তাহা সত্য, এইজন্য দার্শনিক ধার্ম্মিক প্রভৃতি বহু আয়াসে আপন মত প্রচার করিতে ব্যস্ত। যদি কোন স্থানে অসঙ্গতি পরিদৃষ্ট হয়, তন্নিবারণ-কল্পে বিধি-মন্তে বদ্ধ হইয়া থাকে। শাক্ত বৈষ্ণবের যেস্থলে পশুভাব আছে, তাহাকে দেবত্ব প্রদানের জন্য সাঙ্খ্যবেদান্ত আশ্রয়-স্থল হইবে, ইহার মূলে মনুষ্যের আত্মাদর প্রবৃত্তি কার্য্য করিতেছে। আত্মতত্ব অতি জটিল।

স্বকীয় মনোভাব অনেক সময় পরিষ্কার করিয়া বুঝা কঠিন। জনসাধারণের মনের গতি স্থির করা তদপেক্ষা দুরূহ। চিত্তের দ্বারা চিত্ত পরীক্ষায় বিশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? মনুষ্য এখন তিন বৎসর বয়সে আরম্ভ করিয়া ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। ইহা উপার্জ্জন করিতে মানবজাতিকে বহু সহস্র বর্ষ তপস্যা করিতে হইয়াছিল। আমরা উত্তরাধিকারিতার ফলে অল্পদিনে তাহা লাভ করিতেছি। মনুষ্যের যতপ্রকার জ্ঞান আছে, তাহার সকল গুলি লইয়া আত্মজ্ঞান। বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা কহেন, ৩০ সহস্র বৎসরের ন্যূনকল্পে মানব জাতি ইহা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। জাতিস্মর শিশু পঞ্চ বা ষষ্ঠ বৎসরে এখন তদ্‌গুণশালী হইতেছে। বর্ণজ্ঞানের পরে গন্ধজ্ঞানের উৎপত্তি; শৈশবের কোন্ সময় মনুষ্য তাহা লাভ করে, অদ্যাপি তাহা নির্ণীত হয় নাই। সঙ্গীতজ্ঞান পঞ্চ সহস্র বৎসরের অনুশীলনের ফল। পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যে যুবক যুবক ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়সের মধ্যে তাহাতে সিদ্ধি লাভ করে। নীতিজ্ঞান অর্জ্জন করিতে নৃসমাজকে অযুত সম্বৎসর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ফলে বা ঊর্দ্ধতন পুরুষের অনুশীলন প্রভাবে এখন আমরা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে সেই ধন লাভ করি। এবম্বিধভাবে সুদীর্ঘকালে লব্ধ বিভিন্ন বোধের আধার আপন অস্তিত্বকে নিতান্ত অভ্রান্ত জ্ঞান করা অসঙ্গত।

কামরূপে নারীজাতির পাতিব্রত্য সম্বন্ধে

শিথিলতা ও তান্ত্রিক অভিচার-ক্রিয়ার প্রাদুর্ভাব বশতঃ পূর্ব্বকালে বঙ্গে নানা গ্লানিসূচক জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র দ্বিজাতি ভিন্ন বিধবার বিবাহ প্রচলিত আছে। অধিকন্তু আসামে বৈধ বিবাহের প্রচলন স্বল্প; তজ্জন্য দাম্পত্য-বন্ধন ছেদন করা দুরূহ হয় না। অনার্য্যগণ আর্য্যীকরণে গৃহীত হইয়া বিবাহ সম্বন্ধে পূর্ব্বতন আচার সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। "আগচালুয়া" বিবাহে সমাগত জনকে পান সুপারি দেয়, ইহা অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে সম্পন্ন হইতে পারে। "গুড় পিঠা-খোয়া-বিবাহ" বর-কন্যার সম্মতি সাপেক্ষ; বর কন্যাকে "খুহা ও মেখলা" নামক বস্ত্র মাদুলি প্রভৃতি অলঙ্কারসহ প্রদান করিলে সম্বন্ধ স্থির হয়। কন্যাকর্ত্তা গ্রামিকদিগকে আহ্বান করিয়া চিপিটক ও গুড় প্রদান করে। স্বর্ণকার, কুম্ভকার, নাপিত, কর্ম্মকার, নট, কাটানি প্রভৃতি জাতির মধ্যে উক্ত প্রকারের বিবাহ প্রণালী প্রচলিত। ঐ সকল জাতির সাধারণ নাম ছোটকলিতা। শাস্ত্রীয় ভাষায় ছোটকলিতার বিবাহকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলিতে হইবে।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গণক ও বড়কলিতা "হোম জ্বালানি" বা প্রাজাপত্য প্রণালীতে বিবাহ করেন। সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় না। ছোট কলিতারা এই প্রণালীতে বিবাহ করা এখন শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিতেছেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থেরা অবশ্য বিদেশী। বড়কলিতা ও কায়স্থে অসবর্ণ বিবাহ হইয়া থাকে। কায়স্থের সংখ্যার ন্যূনতা ইহার কারণ। কলিতা বড় ও ছোটতে প্রভেদ কি, আমরা বুঝিতে পারি না। জীবেশ্বর, মৌজাদার কহিয়াছেন, ভারবহন, হলচালন ত্যাগ করিলে ছোট লোক বড় হয়; ছোট বড় বিশেষণ দ্বারা উভয়ের একজাতিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। বাঙ্গালীকে কলিতা অর্থে কায়স্থ বুঝাইবার চেষ্টা করিতে দেখিয়াছি; তাহার ইতিহাস পর্য্যন্ত আছে। পরশুরামের ভয়ে যে সকল ক্ষত্রিয় অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন, তাঁহারা "কুললুপ্তা" বা কলিতা নামে প্রসিদ্ধ। গান্ধর্ব্ব বিবাহ ছেদন জন্য ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। ত্রিপুরা ও কুচবিহার রাজপরিবারে বিবাহ প্রণালীর বৈধতাকে সূত্র করিয়া ব্রিটিশরাজ উত্তরাধিকারী নির্ণয় করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, গান্ধর্ব্ব বিবাহের জটিলতা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আসামীগণ প্রাজাপাত্য বিবাহের আশ্রয় লইতেছে। গান্ধর্ব্ব বিবাহে কন্যা বয়স্থা হইলেও প্রাজাপত্য বিবাহে কন্যার অল্প বয়সে বিবাহ সংস্কার অবশ্যম্ভাবী। গান্ধর্ব্বের বৈদিক মন্ত্রের পরিবর্ত্তে মাতৃভাষায় দম্পতিকে উপদেশ প্রদত্ত হয়। আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যৌতুক প্রদান করিলে কন্যাকর্ত্তা তাঁহাদিগকে বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন।

ব্রাহ্মণকুমার হস্ত্যশ্ব বা শিবিকা আরোহণ করিয়া বিবাহ করিতে যান; ঢোল করতাল বাজিতে থাকে, পুরস্ত্রিগণ মঙ্গলগীত করিয়া সমভিব্যাহারে যাত্রা করেন, বরযাত্রিক কেহ কেহ হস্তিতে আরোহণ করিয়া থাকেন। দিবাভাগে বিবাহ হইবার আপত্তি নাই। স্বর্ণসূত্রখচিত শ্লথ উপানতধারী বর ধুতি চাদর পরিয়া, অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত হইয়া বনাত বা শাল সহযোগে গাত্রাবরণ করত মস্তকে উষ্ণীষ প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ আপন বিশুদ্ধতা রক্ষার মানসে নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি ভিন্ন ভোজ্যান্নতা রক্ষা করিতে

অক্ষম ; তদ্ধেতুক চিপিটকের অনুরূপ জল-সিক্ত "বোকা" তণ্ডুল দধি কদলী সহ ভোজন করিয়া কুটুম্বকে প্রীত করিয়া আসেন।

একদা খাসি পল্লীতে পরিভ্রমণ করিতে যাইয়া শিলাহট্টবাসী জনৈক বাঙ্গালীর সহিত পরিচিত হইলাম। তিনি এক খস রমণীকে ব্রাহ্মমতাবলম্বিনী করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার গর্ভজাত সন্ততি খস-আবরণ বস্ত্র ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছে, দৃষ্ট হইল। বর্ত্তমান সময়ে বাবুটী খ্রীষ্টান হইলেও, শর্ম্মা উপাধি পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। অধিকন্তু রাজপ্রতিনিধির সমধর্ম্মী হইয়াছেন বলিয়া সুখী হইতেছেন। রাজ পল্লীর শিখর ভাগে উত্থিত হইয়া অন্তদিন দেখিয়াছি, খ্রীষ্টীয় ভজনালয়ে আচার্য্য উপাসকের অভাবে একাকী স্বীয় কর্ত্তব্য বোধে যথাসময়ে সুসমাচার প্রচার করিতেছেন। সেই পার্ব্বত্য স্থানের নিম্নে স্রোতসিনী-বক্ষে সেতুপরি দণ্ডায়মান হইয়া হরিসভায় যোগ দিবার জন্য জনসমাগম দর্শনে আমার মনে হইল, আত্মাদরের কি মোহিনী শক্তি, ইহার প্রভাবে খ্রীষ্টান হিন্দুকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে চায়।

শিলঙ শৈলের পথ সিমলা ও দারজিলিঙ্গের ন্যায় প্রৌঢ় লোকের পক্ষে ক্লেশদায়ক নহে। যদৃচ্ছা ক্রমে কদাচিৎ রক্তিম পথে বিচরণ করিতে গিয়া পথি পার্শ্বে ঘনসন্নিবিষ্ট সরলদ্রুমের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলাম। সুরঞ্জিত অয়স-পত্র-নির্ম্মিত বহুচূড়া সমন্বিত ইউরোপীয় সুবৃহৎ হর্ম্ম্য নয়নপথগামী হইল। অহোঃ, আমি রাজপ্রাসাদের অঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছি। ইতস্ততঃ না করিয়া একবারে চলিয়া যাইতে পারিলে কেহ বাধা দিতে সাহস করে না, সেই জন্য গুরখা প্রহরী আমাকে কিছু বলে নাই, সে সদর্পে স্কন্ধে যন্ত্র রক্ষা করিয়া স্বীয় পাদচারণায় মনোনিবেশ করিয়াছিল। আমি আর অগ্রসর না হইয়া হ্রদের দিকে অবতরণ করিতে লাগিলাম। মহামতি কটন এই স্থানকে উপবনে পরিণত করিয়া গিয়াছেন, ইহাই এখানকার বিশেষ দর্শনীয় স্থান। সুতলে বাপীর উপর সেতু দর্শন করিয়া তদুপরি যাইতে ইচ্ছা হইল। তথা হইতে বারিপাত-উচ্ছ্বাসিত অবরোধ দৃষ্ট হইলে তদুদ্দেশে ধাবিত হইলাম। পার্শ্ববর্ত্তী পথগুলিতে পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া তৃপ্ত হইতে বাসনা হইল। যাহাতে আকৃষ্ট করে, তাহার সকলই মনোরম বোধ হয়। উপরে দেখিতেছি, কর্ত্তিত তৃণাচ্ছন্ন মসৃণ হরিৎবর্ণের ক্রমাবনত ভূমি, অধোদেশে হরিতের মধ্যে রক্তিমা বিস্তার করিয়া কুসুমিকার পার্শ্বে রেখার মত শীর্ণবর্ত্ম জনহীন হইয়া মধুরতার নিকেতন হইয়াছে। এবার অন্য পথ আবিষ্কার করিয়া স্বকীয় কুটীরে উপনীত হওয়া গেল।

শ্লেষ্মার আতিশয্য দেখিয়া সত্বর শৈল পরিত্যাগ করিলাম। বাষ্পীয় তরণী হইতে গোয়ালপাড়ার পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, স্মরণ আছে। জগন্নাথগঞ্জে পাটের ক্ষেত্র-মধ্যস্থ ভোজন-গৃহে আহার করিয়া বুঝিলাম, ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি। তদনন্তর নারায়ণগঞ্জ হইতে কখন গোয়ালন্দে উত্তীর্ণ হইলাম, তাহা স্মৃতিপথারূঢ় হয় না। আসাম অস্বাস্থ্যকর জানে ভ্রমণ বিলম্বিত করিয়া আশঙ্কিত ফল দ্রুত লাভ করিয়াছি।

শ্রীদুর্গাচরণ তুতি।

গিরিজাপ্রসন্ন।(১)

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥

যোগবাশিষ্ট।

গিরিজাপ্রসন্নের জীবন-চরিতের আবশ্যকতা।

বঙ্গসাহিত্য-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট গিরিজাপ্রসন্ন অপরিচিত নহেন। যতকাল সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি বিলুপ্ত না হইবে, আমরা একান্ত সাহস সহকারে বলিতে পারি, গিরিজাপ্রসন্নের স্মৃতিও তত কাল সকলের হৃদয়ে জাগরূক রহিবে।

আজকাল বঙ্গভাষা যৌবনের স্তরে পদার্পণ করিয়াছে। ভারতহিতৈষী বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার স্রষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্র এই ভাষার পূর্ণাঙ্গদাতা। অধিক দিনের কথা নহে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবিতাবস্থায়ই এই মাতৃভাষার যেরূপ দৈন্য দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে এই ভাষা যে এত অল্প দিনে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী হইয়া ভারতের অন্যান্য লোকেরও সেবার যোগ্য হইবে, এরূপ আশা অনেকেই হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই মাতৃভাষার সেবায় জীবন মন সমর্পিত করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষেত্রে কেন—পৃথিবীর সমগ্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে অসাধারণ কীর্ত্তি ও অক্ষয় সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গবাসী এই মহৎ উপকারের জন্য তাঁহার নিকট চির ঋণী। জাতীয় উন্নতি, ধর্ম্মোন্নতি, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি সমস্তই এই মাতৃভাষার উন্নতি-সাপেক্ষ।

আর যিনি বঙ্কিম বাবুর অমৃতময়ী লেখনীপ্রসূত অতুল্য সৃষ্টি-প্রকরণের ব্যাখ্যা করিয়া আশৈশব সকলকেই বুঝাইবার জন্য "বঙ্কিমচন্দ্র" রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সাধু উদ্দেশ্যের জন্য,—গুণগ্রাহীতার জন্য—একটী জাতীয় জীবনকে পরিণতির পথ প্রদর্শনের জন্য, আমরা কি তাঁহার নিকট কম কৃতজ্ঞ?

আজ ঘরে ঘরে সুধিগণ বঙ্কিমবাবুর পুস্তক পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, সকলেই বঙ্কিম বাবুর অসাধারণত্ব এক মুখে স্বীকার করিয়া জন্মভূমির গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। বঙ্কিম বাবু যে আমাদের নিকট এত পূজ্যের, এত আরাধনার, এত অনুকরণের যোগ্য, পূর্ব্বে কয় জন তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন?

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে পদার্পণ করার সময় যাঁহারা তাঁহার অসাধারণত্ব ও বিশেষত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে। আমাদের দেশীয় উজ্জ্বল রত্নগণ তৎকালে বিদেশীয় রাজার সঙ্গে অধিক সম্বন্ধ রাখিতে গিয়া সংসর্গ দোষে অনুসরণীয় পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই বলিয়া আমরা একথা বলিব না যে,সেই সময়ে গিরিজাপ্রসন্নের ন্যায় কেহ সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। যাঁহারা পারিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার গ্রন্থপাঠ সুখে মত্ত হইয়া নিজের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। মনস্বী গিরিজাপ্রসন্ন কেবল নিজের সুখের পথ উদ্‌ঘাটিত করিয়া পরিতৃপ্ত রহেন নাই। তিনি বঙ্কিম-লেখনী-প্রসূত সঞ্জীবনী শক্তি অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই মহৎ চেষ্টার ফল—তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

গ্রন্থ, বঙ্গ সাহিত্যে বড়ই আদরের ধন—"বঙ্কিমচন্দ্র"।

আজকাল বালকের মুখেও বঙ্কিম বাবুর ভূয়সী প্রশংসা শুনিতে পাই। বালকদের কথা কেন, আমরাও কি গিরিজাপ্রসন্নের "বঙ্কিমচন্দ্র" পাঠ না করিয়া বঙ্কিম বাবুর অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশল—শিল্পের রমণীয় চাতুর্য্য—সুখের উপকরণ—চিন্তায় মনোমোহন—প্রতাপ গোবিন্দলাল, শ্রী জয়ন্তী, সীতারাম চন্দ্রশেখর, প্রফুল্ল শান্তি প্রভৃতি নরনারীর চরিত্র-মাধুর্য্য বিন্দুমাত্রও অনুধাবন করিতে পারিতাম? অনেক পণ্ডিতের মুখেও শুনিয়াছি, বঙ্কিম বাবুর পুস্তক পাঠ করিয়া যদি সার ভাগ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে নাকি বেদ বেদান্ত পাঠের ফল লাভ হয়। যদি বঙ্কিম বাবুকে এত উচ্চ আসন দিলে সত্যের রেখা উল্লঙ্ঘিত না হয়, তাহা হইলে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে গিরিজাপ্রসন্নের "বঙ্কিম চন্দ্র" সেই বেদ বেদান্ত প্রচারেরই সাহায্য করিতেছে, গিরিজাপ্রসন্নের "বঙ্কিমচন্দ্র" এক খানি উৎকৃষ্ট উপদেশপূর্ণ ধর্ম্ম গ্রন্থ। হিন্দু উপাস্য মাত্রেরই উপাসনা পথের পরিচালক। ইউরোপীয় বিখ্যাত পণ্ডিত মেকলে বলিয়াছেন "পুস্তকের মধ্য হইতেই গ্রন্থকারকে চিনিয়া লওয়া যায়।" আমরাও বলি, একথা যথার্থ। কিন্তু যে স্থলে লেখক শিক্ষকের আসনে সমাসীন হইবার জন্য উপযুক্ত গুণলব্ধ না হইয়া শিক্ষা প্রদান করেন, সেস্থলে গ্রন্থকারকে পুস্তকের মধ্য হইতে বাছিয়া লওয়া যায় না। যিনি লেখক, তাঁহার উপদেশ খাটি হওয়া চাই, কতক বা তাহার জীবনে প্রতিফলিত করিয়া বাক্য ও জীবনের ঘটনার সঙ্গে ঐক্য রাখা চাই। উপদেষ্টার চরিত্র যদি অনুসরণীয় না হয়, তাহা হইলে, তাহাতে যেমন সজীব শক্তি নিহিত থাকে না, তেমন, লোকের হৃদয়ও আকর্ষিত হয় না। এই হিসাবে, অনেক দেশের লেখকই ঘৃণ্য। এই শ্রেণীস্থ লেখকের উদ্দেশ্য কেবল যশঃ অর্জ্জনেই কেন্দ্রীভূত।

সাহিত্য-সেবা ধর্ম্মজীবনকে স্ফূর্ত্তি দান করিয়া পরিণতির দিকে চালিত করে। উচ্চ বিষয়ক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠন ও সেই সব ভাব নিচয়ের একীকরণ, পুস্তক মধ্যে প্রতিফলিত করণ, ধর্ম্মপথের ক্রমোন্নতি বিধায়ক। যে শ্রেণীর লেখক এই কথাটী ভুলিয়া গিয়া গ্রন্থাদি প্রকাশিত করেন, সে শ্রেণীর লেখকের গ্রন্থ মধ্যে সৎ চিন্তার অবিরল স্রোত প্রবাহিত হয় না। যদিও দৈব কারণে দুই এক স্থানে ইহার বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়, যখন জ্ঞানরত পাঠক ঐ সব লোকের চরিত্র বিষয় চিন্তা করেন, তখনই তাঁহাদের পুস্তকস্থিত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক উপদেশ পাওয়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পুস্তকখানি ফেলিয়া রাখিয়া দেন। লেখকের ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের ও ঘৃণার বিষয় কি থাকিতে পারে?

গ্রন্থকারের সঙ্গে যখন গ্রন্থের নৈকট্য সম্বন্ধ, তখন সকলেই যে গ্রন্থকারের আসনে উপবিষ্ট হইবার যোগ্য নহেন, একথা বোধ হয় স্বীকার্য্য। তাই ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও স্বর্গীয় গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রভৃতি লেখকগণ, গ্রন্থকারের গুণলব্ধ হইয়া গ্রন্থাদি প্রকাশ করায়, বঙ্গ-সাহিত্য-সেবীর আরাধ্য হইয়া পড়িতেছেন। ইঁহারা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে বিশেষ চিন্তা করিয়া, তাহার ফলাফল বিচার করিয়া, কিছু কিছু বা নিজ জীবনে প্রতি-

কলিত করিয়া বলিতে অভ্যস্ত, তাই ইঁহাদের কার্য্যের অস্থি মজ্জায় সঙ্গে উপদেশাবলীর প্রতি ক্রিয়া প্রকাশমান। যখনই পুস্তক পাঠ করিয়া ইঁহাদের জীবনের দিকে তাকাই, তখনই দেখিতে পাই, তাঁহাদের পুস্তকস্থিত ধর্ম্মপূর্ণ বাক্যাবলীই যেন চালকরূপে তাঁহাদিগকে অভীষ্ট পথে লইয়া যাইতেছে। কি আশ্চর্য্য শিক্ষা, মানবহৃদয়ে শিক্ষার আধিপত্যই বা কি আশ্চর্য্য !! গ্রন্থপাঠ কর, তাহাতেও মুগ্ধ হইবে, উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে, চরিত্র বিষয় জ্ঞাত হওয়ার জন্য কার্য্যাবলী প্রত্যক্ষ কর, উহা হইতে পুস্তক পাঠেরই ফল প্রাপ্ত হইবে। ঈদৃশ লেখক হওয়া সাধারণ সাধনার কর্ম্ম নহে। এই লেখক-সম্প্রদায় উচ্চ অঙ্গের সাধক। উঁহারা প্রেমময় ও পরোপকারী, বিশেষতঃ সমাজের উচ্চ শিক্ষাদাতা। গিরিজাপ্রসন্ন এই সম্প্রদায়ভুক্ত, কাজেই তাঁহার চরিত্রে বিশেষত্ব আছে। আমরাও সেই বিশেষত্ব দেখাইবার জন্য, তাঁহার জীবনচরিতের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাবলীর আলোচনা করিয়া যাইব। পাঠকবর্গ দেখিবেন, অনেক স্থলে তাঁহার চরিত্রের ছায়াই পুস্তক, আবার পুস্তকের ছায়াই চরিত্র মধ্যে প্রতিবিম্বিত। আজকালকার দিনে, এরূপ ধার্ম্মিক লোক লেখক-শ্রেণীর মধ্যে বিরল। গিরিজাপ্রসন্ন চরিত্রবলে লেখক-সম্প্রদায়ের পদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তাই তাঁহার নির্ম্মল ও সাধুজীবনের কয়েকটী ঘটনা প্রকাশের আবশ্যকতা বোধ করিয়া সেই কার্য্যে ব্রতী হইলাম।

বংশ পরিচয়।

বরিশাল জেলার সিদ্ধকাঠী গ্রামের বৈদ্য রায় চৌধুরী বংশ ধনে, মানে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা কুলগৌরবে বৈদ্যদিগের মধ্যে যেরূপ সম্মানিত, সম্পত্তি ও সৎকার্য্যেও সেইরূপ সম্ভ্রান্ত। এই প্রসিদ্ধ বংশে সিদ্ধকাঠীর নিজ বাটীতে ১২৬৮ সালের চৈত্র মাসে গিরিজাপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন।

এসময় তাঁহার পিতামহ দুর্গাপতি রায় চৌধুরী জীবিত ছিলেন। পিতা মথুরানাথ রায় চৌধুরীও নিজ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

আকস্মিক বিপদ।

আমাদের দেশে, কি ভিন্ন দেশে, যাঁহারা পরিণত বয়সে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদের বাল্যজীবনের ২।১টা মহৎ বা বিপজ্জনক ঘটনায় প্রায়ই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া প্রতিফলিত থাকে। চৈতন্য, কেশবচন্দ্র সেন, রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ওয়াসিংটন, থিওডার পার্কার প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবনচরিত পাঠ করিলে, এই উক্তির সমর্থনকারী যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়।

গিরিজাপ্রসন্নের বয়স যখন ৫।৬ বৎসর, তখন তিনি একদা ১৭।১৮ হাত উচ্চ গৃহের ছাদ হইতে নীচে পড়িয়া যান। এরূপ উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইলেও তাঁহার জীবনের কোন অনিষ্ট ঘটে নাই। বিধাতা বোধ হয় তাঁহার চরিত্রগত মাধুর্য্যের নিদর্শন দেখাইবার জন্যই তাঁহাকে জীবিত রাখিয়াছিলেন।

পিতৃ মাতৃ গুণ।

গিরিজাপ্রসন্নের পিতা বরিশালে একজন ধার্ম্মিক জমীদার বলিয়া বিশেষ খ্যাত। কেবল দান ধ্যান দ্বারা তিনি এ সুনাম অর্জ্জন করেন নাই। এই সুনামার্জ্জনের প্রধান কারণ তাহার সত্যপ্রিয়তা ও স্বার্থত্যাগ। মথুরানাথের অনেক মহত্বসূচক

ঘটনা আমরা জ্ঞাত আছি। তৎসমুদয় উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তিনি জমীদার ছিলেন জমীদারী কার্য্যে তিনি কিরূপ ধর্ম্মানুরক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এখানে কিঞ্চিৎ বলিতে চেষ্টা করিব। জমীদারগণ বিষয় রক্ষার জন্য অনেক সময় প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। নানারূপ মোকর্দ্দমায়ও তাহাদের ব্যাপৃত থাকিতে হয়। ঐসব ঘটনার মধ্য হইতে তাহাদিগের জীবনের সারাংশ বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। মথুরানাথ ভূম্যধিকারী। তাঁহা-কেও নানারূপ লোকের সঙ্গে বিবাদে ও নানারূপ মোকর্দ্দমায় অনেক সময় জড়িত থাকিতে হইয়াছিল। ঐসব কার্য্যই অনে-কের পতন-দ্বার মুক্ত করিয়া দেয়, কিন্তু মথুরা নাথের উহা উত্থানের কারণ হইয়াছিল। তিনি কদাচ বাহিরে বা আদালতে মিথ্যা কথা বলিতেন না। কাহারও সঙ্গে মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে, বিপক্ষীয় দল তাহাকে সাক্ষী মানিয়া দিত, তাহাদের হৃদয়ে ভয় ছিল না যে, মথুরানাথ বিরুদ্ধপক্ষ, অতএব স্বার্থসাধনের জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া নিজে জয়ী হইবেন। বরিশালের বিচারকগণ, তাঁহাকে বিশেষ সত্যবাদী বলিয়া জানিতেন ও তজ্জন্য তাঁহাকে কোর্টে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। বরিশালের স্বনামধন্য দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় মথুরানাথকে এই সত্যনিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট প্রশংসা করেন। এমন কি, লোকের নিকট বলিয়া থাকেন, "মথুরানাথ স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন।" বোধ হয়, অশ্বিনী বাবুর এই উক্তি দ্বারাই মথুরানাথের মহত্ব পরিস্ফুটিত হইয়াছে।

একবার বরিশালে কোন মোকর্দ্দমা উপলক্ষে পরলোকগত উকীল গোরাচাঁদ দাস বি-এল মহাশয় মথুরানাথের বিপক্ষে মনোনীত হয়েন, ও কুট প্রশ্নদ্বারা মথুরা নাথের নিকট হইতে অনেক কথা বাহির করিয়া মক্কেলকে জয়ী করেন। মথুরানাথ সত্য সাক্ষ্য প্রদানের জন্য বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন। মোকর্দ্দমার পর গোরাচাঁদ দাস উকীল মহাশয় নিতান্ত অনুতপ্ত হইয়া মথুরা নাথের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন এবং বলেন যে "আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক পুরুষ যদি এই সহরে বাস করিত, তাহা হইলে তাঁহার পাদোদক গ্রহণ না করিয়া, আমি অন্য কিছু গ্রহণ করিতাম না। এরূপ যিনি সত্যপ্রিয়, তাঁহার নিকট কুট প্রশ্ন করা পাপের কার্য্য। আমি অর্থলোভে আপনার সঙ্গে অভদ্রোচিত ব্যবহার করিয়াছি, তজ্জন্য ক্ষমা চাহিতেছি।"

গিরিজাপ্রসন্নের মাতৃদেবী অত্যন্ত স্নেহ-শীলা ও প্রতিবেশীগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী ছিলেন। তিনি গরিবের কন্যা, কিন্তু শুভা-দৃষ্টের ফলে ঐশ্বর্য্যের কর্ত্রী হইয়াছিলেন। সাধারণতঃ অবস্থার এরূপ পরিবর্ত্তনে অনেক স্ত্রীলোক গর্ব্বিতা হইয়া থাকেন। গিরিজা প্রসন্নের জননী এসব দোষের অতীত ছিলেন, তাঁহার দয়া এত প্রবলা ছিল যে, তিনি সর্ব্বদাই পরের দুঃখমোচনের জন্য যত্নবতী ছিলেন। তাঁহার এই সদ্‌গুণটীর জন্য দেশস্থ সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা ও ভক্তি করিতেন। অনেকে বলিয়া থাকেন, পিতৃমাতৃ গুণ পুত্রের চরিত্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়, গিরিজাপ্রসন্নও এরূপ সৎ পিতামাতার অনেকগুলি গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন।

প্রতিভার পরিচয়।

গিরিজাপ্রসন্নের শৈশবকালের শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরনাথ রায় মহাশয় বলিয়াছেন "আমি

প্রায় ৪০ বৎসরের অধিক কাল শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত আছি, আমার ছাত্র অনেকেই কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষিত হইয়াছেন, কিন্তু গিরিজাপ্রসন্নের ন্যায় প্রতিভাশালী ছাত্র আমার হাতে আর পড়ে নাই। কোন জটিল বিষয়—গণিতই হউক বা সাহিত্যই হউক—তাহার হৃদয়ঙ্গম করার জন্য একাধিকবার আয়াস করিতে হয় নাই। সকল প্রকার দুরূহ বিষয় তাঁহার নিকট জলের ন্যায় তরল প্রতীত হইত।" শিক্ষকেরই এই উক্তিই বোধ হয় তাঁহার প্রতিভার যথেষ্ট পরিচায়ক।

নৈশ বন-ভোজন।

বাল্যকালে গিরিজাপ্রসন্নের স্বভাব চঞ্চল ছিল। সমপাঠিগণের সঙ্গে তাঁহার অতিশয় সৌহার্দ্দ ছিল। তিনি বাল্যকালে উহাদের সঙ্গে একত্রিত হইয়া সুস্বাদু লিচু,জাম, নারিকেল, শশা প্রভৃতি সংরক্ষিত দ্রব্য বাগান হইতে পাড়িয়া খাইতে ভালবাসিতেন। কখন কখন বা নৈশ বন-ভোজনের উদ্যোগ করিয়া রজনী ভাগে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের ঘরে প্রস্তুত পিষ্টকাদি আহারীয় দ্রব্য ভোজন করিতেন। গিরিজাপ্রসন্নের এইরূপ বালসুলভ চপল ব্যবহারে অথচ অসাধারণ সরলতায় অনেকেই অসন্তুষ্ট হইতেন না, বরং তাহাদের নৈশ বন ভোজন যাহাতে পরিতোষকারী হয়, তজ্জন্য গৃহস্বামী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বালকগণের প্রিয় গৃহরক্ষিত খাদ্যাদি গিরিজাপ্রসন্নকে দিয়া প্রফুল্লিত হইতেন তাহার প্রিয় ব্যবহার ও বাকপটুতা সকল শ্রেণীর লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইত। বালকগণ মিলিয়া মিশিয়া যে সব কার্য্য করে, তাহা কত মধুর, এদেশের লোক তাহা কল্পনা করিতে অনভ্যস্ত নহেন।

ক্রীড়ানুরক্তি।

গিরিজাপ্রসন্নের দেহ বাল্য কাল হইতেই সবল ছিল, তিনি নির্ভীক ছিলেন। হাডুগ্‌-ডুগ্‌ ও ক্রীকেট খেলায় তিনি নির্ভীক ছিলেন। এমন কি, এই সময় বালসঙ্গীদের সঙ্গে একত্রিত হইয়া গ্রামের ২।৩ মাইল বাহিরে ম্যাচ খেলিতে যাইতেন।

তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, শারীরিক শক্তি বলে, বাক্যের মনোহারিত্বে, প্রীতির বিনিময়ে, তিনি ঐ সমস্ত দলের সহজেই নেতৃত্ব লাভ করিতেন।

ঘুড়ি উড্ডানেতে গিরিজাপ্রসন্নের বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। এক একবার তিনি ঘুড়ি উড়াইতে এত মত্ত হইয়াছিলেন যে, তজ্জন্য সময়োচিত আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়া সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সঙ্গীরা তাঁহার সদাশয়তায় এত মুগ্ধ হইয়া পড়িত যে, প্রাণান্তেও উহারা তাঁহার সঙ্গ ত্যাগে সম্মত হইত না। লোককে কিরূপ পরাজয় করিয়া যশের মুকুট শিরে ধারণ করিব, এরূপ একটা প্রবল কামনা-বীজ গিরিজাপ্রসন্নের হৃদয়ে এই সময় অঙ্কুরিত হইয়াছিল। যৌবনে বুঝিয়াছিলেন, বাহিরে লোক জয় করিয়া যশস্বী হওয়া অতি তুচ্ছ। ভিতরের জয়ই বীরত্বের পরিচায়ক। যে জয় লাভের বাসনা বাল্যে তাহাকে বহির্জগতে নিযুক্ত করিয়াছিল, সেই জয়লাভের বাসনাই তাহাকে যৌবনে অন্তর্জ্জগতের উপর আধিপত্য বিস্তারে অত্যন্ত সাহায্য করিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রের একটা প্রধান উপাদান ছিল—বিজয়-তৃষ্ণা। আমি মনে করি, এই তৃষ্ণাটাই তাহাকে সর্ব্ববিধ উন্নতির দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছিল।

সোদর-বাৎসল্য।

সহোদরদের প্রতিও তাঁহার প্রগাঢ় বাৎসল্য ভাব—অনেক কার্য্যে বিকশিত হইয়াছে। তিনি খেলিবার সময় তাহার মধ্যম সহোদরকে তাঁহার বিরুদ্ধ দলে রাখিয়া ক্রীড়াভিজ্ঞতা দেখাইতেন। তিনি বলিতেন যে, ক্রীড়াসঙ্গিগণের মধ্যে তাহার মধ্যম ভ্রাতা ভিন্ন কেহই তাহার প্রতিযোগী হইবার স্পর্দ্ধা রাখে না—দুই ভ্রাতার মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল, উভয় ভ্রাতার মধ্যে আবার সময় সময় মনোমালিন্য ঘটিত, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী। শরতের বৃষ্টি মুহূর্ত্তে আসিত, আবার মুহূর্ত্ত মধ্যে অপসারিত হইত। এই অনুজের কোন কোন গুণে এত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, গিরিজাপ্রসন্ন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন, আমার মধ্যম ভ্রাতা উৎকৃষ্ট যোদ্ধা, কার্য্যকুশল ও বন্ধুবর্গের আনন্দবর্দ্ধক।” গিরিজাপ্রসন্নের এই গুণ গ্রহণের ক্ষমতা বাল্যকাল হইতেই উন্মেষিত হইয়াছিল।

সমবয়স্কদের সঙ্গে তাহার বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। বরিশালের প্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺ বিপিন বিহারী রায়, ডাক্তার রমাপ্রসন্ন রায় ও নবীন চন্দ্র রায় তাহার বাল্যবন্ধু ছিলেন। ইহাদের কাহারও আচার ব্যবহার শেষে অপ্রীতিকর হইলেও, গিরিজাপ্রসন্ন কখন ইহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। গিরিজাপ্রসন্ন প্লেগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইবার সময়, তাহার বাল্যবন্ধু রমাপ্রসন্ন রায় মহাশয় যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করিয়া বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর। তাঁহার ঋণ অপরিশোধনীয়। বিপদে বন্ধুর কি আবশ্যকতা, তাহা রমাপ্রসন্ন বাবুর কার্য্যে বেশ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

লোভ দমন।

গিরিজাপ্রসন্ন নিজ ভবনের স্কুলে পাঠ করিয়া বরিশাল গমন করেন। সেখানে তিনি জেলা স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। এই সময় তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পায়। তিনি বাল্যকাল হইতেই অপবিত্র জিনিষ ভক্ষণ করিতেন না। এমন কি, রসনার পরিতৃপ্তিদায়ক—পাঠ্য জীবনের পরম আশ্রয়—দোকানদারের মিঠাই শারীরিক ও মানসিক উন্নতির অন্তরায় বোধে উপেক্ষা করিতেন। যৌবনের প্রারম্ভেই লোভ- দমনের জন্য রসনা সংযত করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

গিরিজাপ্রসন্ন বরিশালে এণ্ট্রান্স ক্লাশ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতায় গমন করেন। সেখানে সিটি কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েন। এফ্‌্‌এ পড়িবার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হয়েন। এই সময় সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষিত হয়। সিটি কলেজের প্রাচীন সংস্কৃতাধ্যাপক পূজনীয় শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহাকে প্রাইভেট সংস্কৃত পড়াইয়া ঐ ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি জন্মাইয়া দেন। উক্তপণ্ডিত মহাশয় একদিন আমাদের নিকট গল্পচ্ছলে প্রকাশ করিয়াছেন “গিরিজাপ্রসন্ন আমার নিকট সংস্কৃত পাঠাভ্যাসকালে এতদূর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ধারণাশক্তির পরিচয় দিয়াছিল যে, তাহার দ্রুত উন্নতি দৃষ্টি করিয়া আমি প্রকৃতই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। যখন আমি তাহাকে প্রথম পড়াইতে আরম্ভ করি, তখন তাহার সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় না পাইলেও, কিছুকালের মধ্যেই সে আশাতীত জ্ঞানলাভ করিয়াছিল।”

বিবাহ।

গিরিজাপ্রসন্নের পিতামহ দুর্গাগতি রায় চৌধুরী মহাশয় অতি বৃদ্ধ বয়সে মানব-দেহ পরিত্যাগ করেন। তিনি পৌত্রের বাল্যভাব দর্শন করিয়াই ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন—পৌত্র কোন এক সময় তাঁহার বংশ উজ্জ্বল করিতে পারিবে। তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইয়া পৌত্রের বিবাহ দিতে সংকল্প করিলেন। বৃদ্ধের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

গিরিজাপ্রসন্ন ষোড়শ বর্ষ বয়সে পরিণীত হইলেন। দুর্গাগতি রায় একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির লোক ছিলেন, এতদ্দেশে প্রচার—তাঁহার ন্যায় বিষয়ী ও কৌশলী লোক, বরিশাল জেলার জমীদার-শ্রেণীর মধ্যে তৎকালে দুষ্প্রাপ্য ছিল। তিনি মৃত্যুর ২।৪ দিবস পূর্ব্বে পৌত্র ও পৌত্রবধূকে ডাকিয়া সংসার ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশচ্ছলে অনেক কথা বুঝাইলেন এবং পৌত্রবধূকে বলিয়া গেলেন "মা, তুমি যে সাররত্ন পাইয়াছ, কদাচ তাহার অনাদর করিও না। এই বৃদ্ধই যে তোমার এই রত্ন লাভের অনেকটা কারণ, তাহা বিস্মৃত হইও না।" বৃদ্ধের এ উক্তি কালে ফলবতী হইয়াছিল।

গিরিজাপ্রসন্নের পত্নী পরমাসুন্দরী ছিলেন না। গিরিজাপ্রসন্ন রমণীহৃদয়ে যে সৌন্দর্য্য ফুটাইবার জন্য লালায়িত ছিলেন, তাঁহার পত্নীর হৃদয়ক্ষেত্রে সে সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছিল। বিনয়, নম্রতা, লজ্জা, দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণ তাহার পত্নীর চরিত্রের প্রধান উপাদান ছিল। বিবাহ সময়ে ইনি লেখা পড়া জানিতেন না, গিরিজাপ্রসন্নই ইহাকে লেখাপড়া শিক্ষা প্রদান করেন। এই শিক্ষার ফলে ইনি এক জন শ্রেষ্ঠা গৃহিণী ও বিদুষী বলিয়া পরিগণিতা হইয়াছিলেন। গিরিজাপ্রসন্নের ভার্য্যার হৃদয়ে অনেকগুলি গুণ উন্মেষিত হইলেও, তাহার একটী দোষের জন্য পতিকে বড় উদ্বেগ ভোগ করিতে হইত। তাঁহার সে দোষটী কোপনস্বভাব। গিরিজাপ্রসন্নের উপদেশে সে দোষটী নিরাকৃত হইয়াছিল। দম্পতির মধ্যে অকৃত্রিম ভালবাসা জন্মিয়াছিল। গিরিজাপ্রসন্ন কর্ত্তব্য বা ভালবাসারই বিশেষ পক্ষপাতী। কাজেই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালবাসা স্থাপনে বিশেষ গোলযোগে পড়িতে হয় নাই। গিরিজাপ্রসন্নের এই বাল্য বিবাহ তাঁহার অধ্যয়নের অনেক বিঘ্নোৎপাদন করিয়াছিল। এই জন্যই বোধ হয়, তাহার প্রথম বয়সের সন্তানগুলি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। গিরিজাপ্রসন্ন কখনও পুরুষদের বাল্যবিবাহ অনুমোদন করিতেন না। তিনি "গৃহলক্ষ্মী"তে এতদ্বিষয় যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"শুদ্ধ ভালবাসার জন্য যদি বাল্য বিবাহ মন্দ হইত, আমি গ্রাহ্য করিতাম না। কিন্তু এতদ্ভিন্ন অনেক কারণে বাল্যবিবাহ ভাল নহে। এইটী পুরুষদের পক্ষে, বালিকার কথা স্বতন্ত্র, তাহাদের বাল্যবিবাহে অপকারের অংশ অপেক্ষা উপকারের অংশ অধিক।"*

থিয়েটার অভিনয়।

বর্ত্তমান সময় অনেকে রঙ্গালয়ের অভিনয় দর্শন করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করেন। প্রাচীন কালে যে সমস্ত সৎউদ্দেশ্য পূর্ণ গ্রন্থ অভিনীত হইত, আজ কাল নাট্যশালায় প্রায়ই সে সব পুস্তকের নাম নাই। নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্য "চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির" পরিস্ফুটন ও

* গৃহলক্ষ্মী প্রথম ভাগ—বিবাহ প্রাঙ্ক, পৃ ১৬০।

মানব জীবনের জটিল সমস্যাগুলি ব্যাখ্যাত করিয়া লোককে শিক্ষাপ্রদান।

গিরিজাপ্রসন্ন কলিকাতা অধ্যয়ন কালে থিয়েটার দর্শন করিতেন। গ্রীষ্মাবকাশে বা অন্য কোন ছুটী উপলক্ষে তিনি দেশে আসিয়া থিয়েটার-অভিনয় করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিয়োগের পর একবার তিনি হরিশ্চন্দ্রের অভিনয় করিয়াছিলেন, সকলেই তাঁহার অভিনয় দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি উক্ত কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাহার মৃত্যুর ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে একবার দেশে কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের "প্রহ্লাদ-চরিত্র" অভিনীত হয়। গিরিজাপ্রসন্ন ভক্তবীর প্রহ্লাদের মুখে মধুর হরির নাম শ্রবণের জন্য অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঐ নাটকের Rehearsal এর ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার অনুকম্পায় প্রহ্লাদ অভিনয়কারী, দর্শকের হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভক্তিরস সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অভিনয়ের বিষয়গুলি যাহাতে দোষশূন্য ও শিক্ষাপ্রদ হয়, তজ্জন্য তাহার উপর গিরিজাপ্রসন্নের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল।

পুস্তক পাঠ করিয়া যে সমস্ত ঘটনা অবগত হওয়া যায়, তদপেক্ষা ঐ সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষীভূত হইলে যে প্রভূত পরিমাণে শিক্ষা লাভ করা যায়, একথা বোধ হয় সর্ব্ববাদীসম্মত। আমরা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জীবন-চরিতে দেখিতে পাই—তিনি থিয়েটার-অভিনয়ে বিশেষ অনুরক্ত ও সুদক্ষ ছিলেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

জন্মান্তর, কর্ম্ম এবং আত্মোন্নতি।

জীব চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ। জীব মাত্রই জন্ম মৃত্যুর অধীন। মৃত্যুই জীবের পরিণতি, কি প্রবাহ ক্রমে পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে জন্ম মৃত্যুর অধীনে আসিতে হয়? চারি শ্রেণী জীবের মধ্যে এক শ্রেণীস্থ জীবের শ্রেণ্যন্তরে পরিণত হইয়া সম্ভবে কিনা? পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর কারণই বা কি? জন্ম মৃত্যুর অধীনতা হইতে জীবের নিষ্কৃতি আছে কিনা? আত্মোন্নতিই বা কি? এই সকল সমস্যার আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

জীব জগতে মানবই প্রাথমিক অথবা মানবেতর জীবই প্রাথমিক, সৃষ্টির ক্রম দৃষ্টেই তাহার পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণীত হয়। আলোচ্য বিষয়ে ইহার প্রাসঙ্গিকতা ঘনিষ্ঠ; তাই কিঞ্চিৎ বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

"আকাশাজ্জায়তে বায়ুর্ব্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ।
রবেরুৎপদ্যতে তোয়ন্তোয়াদুৎপদ্যতে মহীঃ॥"

বিশ্বসিসৃক্ষু ঈশ্বর প্রথমে শব্দ গুণময় সূক্ষ্মভূত আকাশ (ইথার) সৃষ্টি করিলেন। তাহা হইতে শব্দ স্পর্শ গুণময় বায়ু। বায়ু হইতে বহ্নি অর্থাৎ তেজঃ। ইহার গুণ তিনটী, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। তেজঃ হইতে জল, ইহা শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গুণাত্মক।

জল হইতে মহী অর্থাৎ মৃত্তিকার উৎপত্তি। ইহা শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, রস ও গন্ধ গুণময়। মৃত্তিকার পূর্ব্ব সৃষ্টি জল, সুতরাং স্থলচর জীবের পূর্ব্বেই যে জলচর জীবের সৃষ্টি, তাহার সন্দেহ নাই। অবতার তত্ত্বে প্রথম ও দ্বিতীয়াবতার জলচর মৎস্য ও কূর্ম্ম। জল হইতে মৃত্তিকার উদ্ভব হইলে অরণ্য জীবের উৎপত্তিই সম্ভব। উক্ত সময়ে, তৃতীয়াবতার

বরাহ। তৎপরে মানুষ ও পশুর মিশ্রিত মূর্ত্তি নৃসিংহ চতুর্থাবতার। নৃসিংহ ক্রম বিকাশের নিয়মাধীন নয়। সুতরাং ইহা দার্শনিক মতের পরিপোষক নহে। মানুষ সৃষ্টির বহু পরে হিরণ্যকশিপুর বিনাশার্থ নৃসিংহাবতার। যাহা হউক, মনুষ্য সৃষ্টির পূর্ব্বেই যে ইতর জীবের সৃষ্টি হয়, ইহা প্রমাণীকৃত হইতেছে। পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত ডারউইন সাহেব বলেন, বানরের উৎকর্ষই মানুষ। হিন্দু দর্শনেও ক্রমোৎকর্ষ অস্বীকৃত হয় নাই। পাতঞ্জল দর্শন বলেন—

"জাত্যন্তর পরিণামা প্রকৃত্যা পূরাৎ ॥"

জীব ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিয়া এক জাতি হইতে জাত্যন্তরে পরিণত হয়। বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র উইর মধ্যে একটা অঙ্গুষ্ঠ-প্রমিত দেহ দেখা যায়। ক্ষুদ্র উই ক্রমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া বৃহৎ হইয়াছে। উহা এক জাতিই বটে, কিন্তু ঐ রূপেই জাত্যন্তরেও পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়।

আমরা কর্ম্ম-ফল-বাদী। উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট যোনিত্ব, সুখ দুঃখ সমস্তই কর্ম্মজনিত ফললব্ধ। ইহা হিন্দু দর্শনের স্থির সিদ্ধান্ত। চতুর্ব্বিধ জীবই কর্ম্মফলাধীন। কিন্তু এক গুরুতর প্রশ্ন হইতে পারে যে, ইতর জীবই যখন আদিম সৃষ্ট, তখন কর্ম্মফল কোথা হইতে আসিল? ইতর জীবের যখন ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম নাই, তখন কর্ম্মফলও নাই। বিশেষতঃ প্রথম সৃষ্ট জীবের কর্ম্মফল কিরূপে সম্ভবে? দর্শন-শাস্ত্র এ প্রশ্নোত্তর দানে একরূপ অসমর্থ। সৃষ্টি অনাদি, অনন্তবার এই বিশ্বের সৃষ্টি এবং ধ্বংস হইয়াছে। প্রলয়ান্তে কর্ম্ম সূক্ষ্ম বীজ ভাবে থাকে। তাহা হইতে আবার জীবের সৃষ্টি হয়। সকলের গোড়া খুঁজিয়া পাইবার যো নাই। উহা বীজাঙ্কুরবৎ। বীজ ও অঙ্কুরের যেমন অগ্র পশ্চাৎ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, তেমনি কর্ম্ম ও জীব সম্বন্ধে। যাহা অনন্ত, তাহার ধারণাই, সুতরাং নাই। কর্ম্ম জীব-সৃষ্টির বীজ নয়, এ কথা অস্বীকৃত হইতে পারে না। প্রত্যেক জন্ম কর্ম্ম ফলানুসারিণী গতি-বিশিষ্ট।

জগৎ পরিণামশীল, * এ কথা জড় জগৎ সম্বন্ধে যেমন, জীব জগৎ সম্বন্ধেও তেমনি। সূক্ষ্ম আকাশ যেমন, স্থূল জড় প্রপঞ্চে পরিণত, তেমনি জীবও জীবান্তরে পরিণত হইতেছে। জড় পরিণতির নিদান প্রকৃতি, জীব পরিণতির নিদান কর্ম্ম। প্রকৃতি জড়, সুতরাং জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি তাহাতে নাই। এবং জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তিও অসম্ভব। মানুষ কর্ম্মফলে নিকৃষ্ট জীব হইতে পারে এবং নিকৃষ্ট জীবও কর্ম্মজনিত ফল ভোগের শেষে পুনর্ব্বার উৎকৃষ্ট জীব হইতে পারে। মানুষ ভাল মন্দ কর্ম্ম করে এবং তজ্জনিত ভাল মন্দ দ্বিপ্রকার ফলই প্রাপ্ত হয়। কর্ম্ম থাকে না, কিন্তু কর্ম্ম জন্য ফল থাকে। পাপ পুণ্য কর্ম্মেরই ফল এবং এই কর্ম্মফলেই মানব-জগতে এত বৈষম্য বর্ত্তমান। কর্ম্মজনিত যে সংস্কার, তাহাই কর্ম্মফল বা অদৃষ্ট।

শরীর ত্রিবিধ, স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ। মতান্তরে মহা কারণ চতুর্থ শরীররূপে উক্ত হইয়াছে। সূক্ষ্ম শরীরকে লিঙ্গ শরীরও বলে। স্থূল শরীর এই জড় দেহ। সূক্ষ্ম শরীর সপ্তদশ অবয়বী। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণবায়ু, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ * কারণ শরীর মূল প্রকৃতি। যোগিগণ যোগবলে সূক্ষ্ম শরীরকে দেহ হইতে বাহির করিতে পারেন। এই সূক্ষ্ম শরীরই দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। সূক্ষ্ম শরীরই ভোক্তা। সুখ, দুঃখ, শুভাশুভ এই সূক্ষ্ম শরীরই ভোগ করে। জীবাত্মার নিত্য সান্নিধ্য হইাতে বর্ত্তমান। সুতরাং জড় হইলেও চৈতন্যবৎ। সাংখ্য মতে ইন্দ্রিয় ভৌতিক নহে, আহঙ্কারিক। ঈশ্বরের তমোগুণের সৃষ্টি ভূত, রজোগুণের সৃষ্টি ইন্দ্রিয় এবং সত্ত্বগুণের সৃষ্টি দেবতা। অতএব ইন্দ্রিয় ভূত হইতে পৃথক। চক্ষু হইতে কতকগুলি কিরণ রেখা নির্গত হইয়া বস্তুর উপরে পতিত হয়।

* শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বেদান্তসূত্রের পরিণামবাদে দোষার্পণ করিয়া বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীস্থিত পণ্ডিতগণকে উহার ভ্রান্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক ব্যাস সূত্রের পরিণামবাদ সমর্থন করেন অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতে পরিণত হন। জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হন না।

* মতান্তরে পঞ্চপ্রাণ বায়ু স্থলে পঞ্চ মহাভূত লইয়া সপ্তদশটী গৃহীত হয়।

ঐ কিরণ রেখার মধ্য দিয়া বস্তুর প্রতিবিম্ব স্নায়ুতে আসিয়া দৃষ্টি জ্ঞান জন্মায়। জড় হইলে কিরণ রেখার মধ্য দিয়া জ্ঞান সম্ভবে না। সুতরাং ইন্দ্রিয় আহঙ্কারিক। ঠিক চৈতন্যও নয়, জড়ও নয়। যেন জড় চৈতন্যের মাঝামাঝি এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি। অন্য দর্শনে ইন্দ্রিয়কে জড়ই বলা হইয়াছে। আমেরিক পণ্ডিতগণ নাকি মানব ফটো পর্য্যন্ত তুলিয়াছেন। ইহা কি প্রকার,তাহা তাঁহারাই জানেন। এক্ষণে মৃত্যু ও দেহান্তর সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

যে যে স্থান জীবাত্মার নিবাস তাহাকে পুর বা পুরী বলে। পুরে শয়ন করেন জন্য জীবাত্মার নাম পুরুষ। নিম্নলিখিত ৮টী পুর বা পুরী।

"দেহেন্দ্রিয় মনো বুদ্ধি বাসনা কর্ম্মবায়বঃ
অবিদ্যা চাষ্টকং প্রোক্তং পুর্য্যষ্ট মৃষিসত্তমৈঃ॥

মনুসংহিতা।

দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম্ম বায়ু এবং অবিদ্যা এই আটটী স্থান আত্মার নিবাসপুরী। সুতরাং দেহের কোন অংশই আত্মার অনধিগম্য নয়। এক্ষণে দেখা যাউক, জীবাত্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া কোথায় যায়। ক্রমশঃ। শ্রীজানকীনাথ গোস্বামী।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

২৫। উপনিষদের উপদেশ।—দ্বিতীয় খণ্ড (কঠ ও মুণ্ডক) শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, এম-এ, প্রণীত।

উপনিষদের উপদেশ প্রথম খণ্ড যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অল্প সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া যে আনন্দ লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা প্রথম খণ্ডের সমালোচনায় গ্রন্থের প্রশংসা করিয়াছিলাম, এবার দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিয়া প্রাণের গভীর আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। গ্রন্থের ভূমিকায় বিদ্যারত্ন মহাশয় শঙ্করের দার্শনিক মতের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে উচ্চ-শিক্ষিত পাঠক-সমাজে মতভেদ হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, বিদ্যারত্ন কোকিলেশ্বর উপনিষদের উপাখ্যান সমূহ মধুর ও ওজস্বিনী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গীয় সর্ব্বসাধারণ পাঠকের নিকট এক নূতন রাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। এতদিন পরে প্রাচীন ঋষিগণের সাধন লব্ধ সম্পত্তি বঙ্গের গৃহে গৃহে বিতরণের আয়োজন হইয়াছে। আমরা আশা করি,বিদ্যারত্ন মহাশয় এইরূপে উপনিষদের সমুদয় উপদেশ, রামায়ণ ও মহাভারতের উপদেশ প্রভৃতি প্রচার করিয়া মহাব্রত উদ্‌যাপন করিবেন।

২৬। কমলাকান্তের জীবনচরিত।—প্রকাশক শ্রীহেমচন্দ্র সরকার, এম-এ, প্রফেসর, প্রেসিডেন্সী কলেজ। মূল্য ॥০। সাধু কমলাকান্তের জীবনচরিত—অতি উপদেয় পুস্তক। জীবিত কালে জীবনচরিত প্রকাশ করা সমীচীন নহে; কিন্তু সাধু ভক্তের তিরোধানের পর কে আর তাঁহাদের ভক্তিময় জীবন-কাহিনী প্রকাশ করিবে? এইজন্য জীবিতকালে কমলাকান্তের জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া, আমরা, দুঃখিত না হইয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। দরিদ্র সাধুর জীবনের অমূল্য কাহিনী তাঁহার তিরোধানের পর কে আর প্রকাশ করিত? হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় এই মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ভক্ত বিশ্বাসীদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। তাঁহার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে। পুস্তকখানি অতি সুললিত বাঙ্গালার লেখা। পাঠ করিলে সকলে বিশেষ সুখ লাভ করিতে পারিবেন।

২৭। হস্তলিপি-লিখন প্রণালী।—শ্রীশিব রতন মিত্র প্রণীত, মূল্য ।০। অতি যত্নের

সহিত শিবরতন বাবু এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। শিশুদিগের লিখন প্রণালী অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুস্তকখানি সচিত্র। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। আশা করি, এই পুস্তকের খুব আদর হইবে।

২৮। অবসর। প্রথম খণ্ড।—শ্রীমতী ফুলকুমারী গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ।০। এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা বিমল আনন্দ পাইলাম। ভূমিকায় সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,

"দশ বৎসর পূর্ব্বে লেখিকা স্বদেশীয়তার যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহার সহিত বর্ত্তমান আন্দোলনের তুলনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। মনে হয়, বাণী তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া, ভবিষ্যতের অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া সত্যের বিকাশ করিয়াছিলেন।" এই কথাগুলি অতি সত্য। লেখিকার হৃদয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিম্নের কবিতায় কিরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, পাঠক দেখুন।

"কি শিখিলি এত দিন বৃটনের দেশে,
এবে তাহা শেখা দেখি স্বদেশেতে এসে?
বাঁধিয়া একতা-সূত্রে,
অধম বঙ্গের পুত্রে,
নির্জীব দেহেতে করি' জীবন সঞ্চার
যা শিখিলে এত দিন শেখা একবার,
শৌর্য্য মহত্ত্ব দর্প হৃদয়ের বল,
যাহা বিনে আজি বঙ্গ এত হীনবল,
বরষি সাহস বারি,
দুঃখ ভয় দে নিবারি,
রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষি মনের খলতা,
ভুলাইয়া শেখা ভাই স্বজাতিপ্রিয়তা।"

লেখিকার ক্ষমতার পরিচয়ে আমরা প্রমুগ্ধ; তাঁহার হৃদয় অতি উদার, অতি সু-নির্ম্মল। দিন দিন লেখিকার প্রতিভার স্ফুরণ হউক, বিধাতার নিকট আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

২৯। কাকলী।—শ্রীজগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য /০। ক্ষুদ্র পুস্তিকা। কোন বিশেষত্ব নাই।

৩০। স্বাস্থ্য-চিকিৎসা।—প্রথম খণ্ড, শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ॥০। দেশীয় চিকিৎসার প্রণালী ইহাতে সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকের বহুল প্রচার হইলে দেশের বিশেষ উপকার হইবে;—অনেক অর্থ দেশে থাকিয়া যাইবে।

৩১। রচনা-সোপান।—শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত, মূল্য ১৲। এই পুস্তকে বাঙ্গালা বাক্য রচনা,প্রবন্ধ প্রণয়ন ও অনুবাদ সংক্রান্ত উপদেশ আছে। বাক্য রচনার মধ্যে বাক্যে পদবিন্যাস-প্রণালী, সরল যৌগিক জটিল প্রভৃতি নানাবিধ বাক্য, বাক্যের পরিবর্ত্তন, বাক্য বিস্তৃতি, রচনার রীতি (style) প্রভৃতির বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রবন্ধ রচনাস্থলে প্রবন্ধের বিভাগ, বর্ণনা-বিষয়ক, ঘটনা বিষয়ক ও নীতি-বিষয়ক নানাবিধ প্রবন্ধ লিখিয়া দেখান হইয়াছে। প্রত্যেক প্রকার প্রবন্ধের শেষভাগে তত্তৎ প্রবন্ধ-বিষয়ক বহু প্রশ্ন আছে।

অনুবাদে বিবিধ উপদেশ ও উদাহরণ আছে।

পরিশিষ্ট ভাগে এণ্ট্রান্স ক্লাস হইতে এফ-এ ক্লাস পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকদের প্রদত্ত প্রশ্ন ও কৃতী ছাত্র ও ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক লিখিত উত্তর সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থের বিষয় বিন্যাস-প্রণালী অতি সুন্দর। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

এই পুস্তক খানি,মোটের উপর, উপাদেয় হইয়াছে। ইহা দ্বারা ছাত্র ও ছাত্রীগণের বিশেষ উপকার হইবে। গ্রন্থকারকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি যে, তিনি এই মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সুচারুরূপে তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। এই পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

গিরিজাপ্রসন্ন। (২)

কয়েকখানি পত্র ও উত্তর।

গিরিজাপ্রসন্ন এফ-এ পড়ার সময় কয়েকখানি পত্র ও উত্তর প্রণয়ন করেন। এইখানি তাঁহার সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থ। "পত্র ও উত্তরের" স্থূল উদ্দেশ্য রমণীগণকে লিপি-রচনা-কৌশল শিক্ষা দান। "পত্র ও উত্তরের" কথা শ্রবণ করিয়া কেহ যেন ধারণা করেন না যে,পত্রের আবার কি প্রকার সার নীতি বিষয়ীভূত হইতে পারে? স্বামী পত্রচ্ছলে স্ত্রীকে যে সব সার নীতি শিক্ষা দিয়াছেন, সে সব নীতি আমরা আমাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও জ্ঞানবৃদ্ধ লেখকের লেখায়ও কচিৎ খুজিয়া পাই। এই নবীন গ্রন্থকার সাহিত্য-সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াই কিরূপ রচনা-পটুত্ব দেখাইয়াছেন এবং কতদূর উচ্চ বিষয় চিন্তা করিয়াছেন, তাহা অবগত করাইবার জন্য বিবেক শীর্ষক প্রবন্ধের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"জগৎপাতা জগদীশ্বর বিবেক শক্তি প্রদান করিয়াই মনুষ্যগণকে তাঁহার সৃষ্টির প্রধান করিয়াছেন। এই শক্তি সকলেরই আছে। জ্ঞানী হইতে মুর্খ পর্য্যন্ত সকলেই সমান অংশে এই শক্তি-সম্পন্ন। আমরা যাহা কিছু করি, ইহার আজ্ঞানুযায়ী হইলেই অত্যন্ত সুখপ্রদ হয়। ইহার অনভিমত হইলে, অনুতাপ হৃদয়কে স্তরে স্তরে পোড়াইয়া থাকে। সৎ অসৎ, ভাল মন্দ, এই শক্তি দ্বারাই উপলব্ধি হয়। বালককে—কেবলমাত্র স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে শিখিয়াছে, এরূপ বালককে—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে হইলে এই পর্য্যন্ত বলিয়া দিলেই যথেষ্ট হয় যে, যাহা করিতে গেলে কে যেন অন্তরের ভিতর লুক্কায়িত থাকিয়া নিষেধ করিতে থাকে। যে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে, সেই কার্য্যই অসৎ কার্য্য। যাহা ভাল না মন্দ, তুমি জান না,অথচ তোমার জানা আবশ্যক, ধীরে ধীরে অন্তরের নিকট জিজ্ঞাসা করিও, প্রকৃত উত্তর পাইবে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও, "দয়াবান, আমি ইহা বুঝিতে পারিলাম না, বুঝাইয়া দেও।" অনাবশ্যকীয় না হইলে দয়াবান হরি অবশ্য তোমার কথায় কাণ দিবেন। তখন যাহা বুঝিতে পাইবে, সহস্র নিউটন, সহস্র মিলের যুক্তি শক্তি তাহার নিকট হারি মানিবে। আমরা যখন কোন অন্যায় কার্য্য করি, আমাদের বিবেক শক্তি বড় কষ্ট পায়। যে এত উপকারী, যে এত শ্রদ্ধার জিনিষ, তাহাকে কি কষ্ট দিতে হয়?"

ইউরোপীয় কোন দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াছেন "The first step of life determines the destination of journey." জীবনের প্রথম পাদক্ষেপ গন্তব্য স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। গিরিজাপ্রসন্ন নূতন লেখক, তাঁহার সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থের এই প্রবন্ধটী কি আভাষ দিতে সমর্থ নহে যে, তাহার ভবিষ্যৎ রচনাতেও আমরা অনেক সার তত্ত্ব লাভ করিতে পারিব? গিরিজাপ্রসন্নের স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থগুলি যেরূপ সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ,তাহাতে স্পষ্টই ধারণা হয় যে, উহা দিগন্তগামী ঝটিকাভীত নাবিকগণের গগনস্থ ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায়, সংসার-রহস্যানভিজ্ঞ মায়া-মোহ বিজড়িত রমণীগণের সংসার-সমুদ্রের পথপ্রদর্শক।

কুসংসর্গ পরিত্যাগ।

কলিকাতা বাসকালে গিরিজাপ্রসন্ন ও তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা পাঁচজনের সঙ্গে ছাত্রাবাসে থাকিয়া কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তখন একজন ভৃত্য তাহাদের সঙ্গে বাস

করিত। সেরূপ ভাবে থাকা নিরাপদ নহে। উহাতে চরিত্রবান ও চরিত্রহীন উভয় প্রকার যুবকই একত্র বাস করিয়া থাকে। এ প্রকার আবাসে, অনেক স্থলে নিষ্কলঙ্ক যুবক দুষ্প্রাপ্য। যে পর্য্যন্ত জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়া লোককে লক্ষ্যপথে গমনের সাহায্য না করে, ইন্দ্রিয়গণ মনের বশীভূত হইতে না চাহে, সে পর্য্যন্ত চরিত্রটী অপরের সুতর্ক দৃষ্টির মধ্যে রক্ষিত না হইলে পতন অনিবার্য্য। গিরিজাপ্রসন্ন যে ছাত্রাবাসে থাকিতেন, তাহা "পূর্ব্ববঙ্গ-আবাস" নামে অভিহিত হইত। বলা বাহুল্য, পূর্ব্ববঙ্গের বালকগণের তত্ত্বাবধানেই এই আবাসটী গঠিত হইয়াছিল। গিরিজাপ্রসন্ন যে বাল্যকাল হইতে কেবলমাত্র হিন্দুধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন, এমন নহে; হিন্দুদের আচার পালন ও খাদ্যাদির বিচার করিতেও যত্নশীল ছিলেন। ঐ পূর্ব্ববঙ্গ আবাসের অধিকাংশ লোক, ধর্ম্ম বিগর্হিত নানারূপ কার্য্য ও কেবল মাত্র রসনার তৃপ্তির জন্য নানা শ্রেণীর হিন্দুর অখাদ্য আহার করিতেন। গিরিজাপ্রসন্ন উহাদের ঘৃণিত ব্যবহার দর্শন করিয়া বাক্যালাপ, এমন কি, উহাদের সঙ্গে একত্রে ভোজন করিতে অসম্মত হইলেন। গিরিজাপ্রসন্নের এরূপ আচরণে ঐ দুরাচারগণ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। গিরিজাপ্রসন্ন উহাদের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া, অনতিবিলম্বে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিলেন, এবং পৃথক বাসা ভাড়া করিয়া পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন।

অসৎ সংসর্গে পড়িয়া, অনেকে ঠেকিয়া, দুই একটী পাপ কার্য্যে বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন। ঐরূপ কার্য্যের কেহ প্রতিবাদ করিলে বলিয়া থাকেন—"ভবিষ্যতে বিবেক ধ্বনির অসম্মান করিয়া আর ঐরূপ কার্য্যের প্রশ্রয় দিব না।" পাপাচরণ করিব না, আর পাপাচরণ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্কিত হইব, এই এই দুইটী সংকল্পের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। যেরূপ বারিপূর্ণ কুম্ভের তলদেশ কোন কারণে ছিদ্র হইলে, সেই ছিদ্র দ্বারা—অনায়াসে বারি রাশি বিনির্গত হইয়া কুম্ভটীকে বারিশূন্য করিয়া ফেলে, সেইরূপ, চরিত্রের কোন অংশ পাপ স্পৃষ্ট হইলে চরিত্রটীকেও হীন ও কলঙ্কিত করিয়া ফেলিতে পারে। এ সংসারে শ্রেষ্ঠাসন অধিকার করিতে হইলে "সর্ব্বদা নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করিব" এরূপ একটা ধনুর্ভঙ্গ পণ থাকা চাই। গিরিজাপ্রসন্ন এইরূপ একটা পণ হৃদয়ের মধ্যে দৃঢ় করিতেছিলেন। ঘোড় দৌড়ের সময় যেমন দুই একটা বেগবান অশ্ব দূর হইতে বেড়া দৃষ্টি করিয়া উহা উল্লম্ফনের জন্য দ্বিগুণ বেগে ধাবিত হয়, তেমন, গিরিজাপ্রসন্নের পণ রক্ষার পথ কণ্টকিত হইলে, তাঁহার লক্ষ্য বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা সহস্র গুণ স্ফুটতর হইতে থাকিত। সাধু ও নির্ম্মল ভাবে জীবন যাপনের পথ কুসুম কোমল নহে। এপথ-পর্য্যটনের জন্য সাধনা সম্বল চাই। গিরিজাপ্রসন্ন পাঠ্য-জীবনেই এই পথ ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাঁহার প্রাণপণ সাধনার ফলে সে আশা কতকটা পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

সঙ্গীত-প্রিয়তা।

গিরিজাপ্রসন্ন সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। যদিও তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন না, তথাপিও তিনি সঙ্গীত-বোদ্ধা ছিলেন। তিনি সুস্বর হারমোনিয়ম বাদন করিতে জানিতেন। তাঁহার সঙ্গীতপ্রিয়তার ফলে, "গৃহলক্ষ্মী" প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণে, আমরা সঙ্গীত শীর্ষক একটী প্রবন্ধ দেখিতে পাই। উহা অবশেষে "সাধারণীর" পরামর্শানুসারে অন্যান্য সংস্করণে পরি-

ত্যক্ত হইয়াছিল। একবার তাহার বাটীতে দূরবর্ত্তীস্থানের একজন উচ্চ অঙ্গের গায়ক আসিয়াছিল, গায়ক সঙ্গীত আরম্ভ করিলে, অনেক বাদক তাহার সঙ্গে সঙ্গত করিয়া পরাজিত হওয়ায়, শ্রোতাগণের অনেকে বাদ্যবিহীন সঙ্গীত শ্রবণেই ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিল। গিরিজাপ্রসন্ন সেইস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "সঙ্গীতের সঙ্গে বাদ্য না হইলে গায়কের গীতপটুতা উপলব্ধি করা কষ্টকর।" গিরিজাপ্রসন্নের নিকট কেহ কোন গুণের পরিচয় দিতে আসিলে, তিনি সাধ্যানুসারে গুণগ্রহণ করিতে উৎসাহী হইতেন। এজন্য গুণীব্যক্তি তাহার গুণগ্রহণের ক্ষমতার স্ফূর্ত্তিতে মোহিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। সঙ্গীতপ্রিয় অনেক লোক স্বভাবের বিচার না করিয়া প্রতিভাশালী গায়কের অমৃত মধুর সঙ্গীত শ্রবণে আগ্রহান্বিত হইয়া থাকেন। গিরিজাপ্রসন্নের সঙ্গীতে আনুরক্তি ছিল বলিয়া তিনি চরিত্রহীন গায়কের ভাববিহীন সঙ্গীত শ্রবণে উৎসাহান্বিত হইতেন না। যে সঙ্গীতর মধুর স্বর হৃদয়ের অজ্ঞাত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া হৃদয়তন্ত্রী বাজাইয়া মনকে ভাবাবিষ্ট করিতে সমর্থ, গিরিজাপ্রসন্ন তাদৃশ সঙ্গীত শ্রবণেই উল্লাসিত হইতেন।

পাঠ্যজীবনে তিনি সঙ্গীতবিষয়ক একটা ভাবময়া কবিতা লিখিয়াছিলেন, আমরা এস্থলে উহা উদ্ধৃত করিলাম।

সঙ্গীত।

(১)

কেন এ বিরহ-গীত গাহিয়ে বেড়াও তুমি
স্বরগ-সম্ভব,
পরের দুঃখেতে ভুলি, গাও কি হৃদয় খুলি,
জুড়াইতে অভাগার তাপিত অন্তর ?
(সম দুঃখে সাধুচিত সদাই কাতর)।

(২)

কোমল শরীর তব পড়েগো ঢলিয়ে
দেখি পর দুঃখ,
তাই কি অমন করি, বলিতেছ ধীরি ধীর
বিষাদের অস্ফুটন্ত মধুর ভাষায়,
"সদা কাঁদে পোড়া মন তোদের ব্যথায়।"

(৩)

অশ্রুজল জমাইয়ে গড়িলা কি তব
নিরমল চিত,
দুঃখের কিরণ গায়, লাগিলে গলিয়া যায়,
সরল স্ফটিকরাজি স্বচ্ছ সরোবর,
ফলাইতে বিষাদের মূরতি সুন্দর।

(৪)

তাই কি নিরাশ্বাসে গায় যদি লাগে তব
সলিলের রাশি,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা, করি কি মধুর খেলা,
এ উহার গায়ে ঢলি ভাসিয়ে বেড়ায়,
পরের দুঃখেতে সদা অস্থির হৃদয়।

(৫)

সংসারের দুঃখ দেখি চাহ কি ফিরিতে তুমি
আপন আলয়,
তাই কি ও বিষাদ স্বর, ক্রমে ক্ষীণ কলেবর,
মিলায় আপন তনু আকাশের গায়—
যাইতে সে সুখ স্থানে নিবাস যথায়।

(৬)

শুনিয়াছি সত্ত্বগুণে তমোগুণ যবে
করয় প্রবেশ,
বাড়বানলের প্রায়, সে বড় ভীষণ হয়,
জগতের রীতি এই—গুণের স্বভাব
দ্বিগুণিত করি যেন পূরায় অভাব।

(৭)

তাই কি ও ভীম দেহে এত শক্তি ধর,
উপহাসি বজ্রস্বরে ন্যায়ের পতাকা ধরে,
আশু হও কাঁপাইয়ে বৈরীর অন্তর
তুচ্ছ করি মৃত্যুভয় স্থির কলেবর।

(৮)

দুইটী তোমার ভাব লাগে বড় মোর
প্রাণস্নিগ্ধকর—
দুঃখী পর দুঃখে যবে, আশ্বাসিতে পরজীবে
আবাহন কর তুমি স্বরগের স্বর,
শীতলিতে নিরাশার দগ্ধ কলেবর।

(৯)

শুনি ও বিষাদ মাখা   সুমধুর স্বর তব
মোহে এ পরাণ,
আপনা ভুলিয়ে যায়, তোমাতে মিশাতে চায়—
তাই করি মোক্ষ জ্ঞান-বিমুগ্ধ অন্তর,
এতই মোহন মন্ত্র জান যাদুকর।

(১০)

শুনি সেই প্রণয়ের আলাপ তোমার
শ্রবণ-তোষণ,
উদাস হইয়ে যাই, সংসার ভুলিতে চাই,
জড়বৎ সুখনীরে করি সন্তরণ,
সাগর-বক্ষেতে ক্ষুদ্র তরণী যেমন।

(১১)

কেমনে যে শূন্য হয়ে পড়ে এহৃদয়
কেমনে বলিব,
তোমার স্বরের সনে,   বেড়ায় আনন্দ মনে,
শূন্য মনে শূন্য হয়ে পাগল হৃদয়
করি জীবনের কাজ শুধু স্বরময়।

(১২)

পূরবের সুখস্মৃতি উঠয় জাগিয়া
প্রাণ-বিমোহন,
প্রিয়জন প্রেম কথা—জানিনা কি সূত্রে গাঁথা,
তোমার স্বরের সনে সুখের জীবন
এদেরো কি উপাদান তোমার যেমন।

(১৩)

আরো এক ভাব তব চির সহচর—
অভিন্ন হৃদয়,
যেখানে তোমায় দেখি,   জুড়ায় হৃদয় আঁখি,
দেখিবারে পাই সদা ভকতি তথায়
প্রশান্ত গম্ভীর বেশ চিত প্রেমময়।

(১৪)

বেশি কি বলিব আর যা কিছু যথায়
আছে প্রেমময়,
কোমল মুখেতে মাখা   ধরম হৃদয়ে আঁকা,
সে সকলি তবাধীন রাজ রাজেশ্বর,
কাহার রাজত্ব এত মনের উপর?"

গৃহলক্ষ্মী প্রথম ভাগ।

গিরিজাপ্রস প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েন। তিনি বড়ই অধ্যবসায়শীল ছাত্র ছিলেন। তাঁহার পাঠ্যাবস্থার কথা যেরূপ প্রকাশ, তাহাতে বোধ হয়, তিনি বৃথা সময় ক্ষেপণ অধর্ম্ম মনে করিতেন। কলেজের পড়া শেষ করিয়া যে সময়টুকু বাঁচাইতে পারিতেন, সে সময়টুকু তিনি মাতৃভাষার সেবায় ব্যয় করিতেন। অনেক লাইব্রেরী হইতে পুস্তক আনিয়া গৃহে বসিয়া পাঠ করিতেন। গিরিজাপ্রসন্নের পিতা বিদ্যানুরাগী ছিলেন, কাজেই বিদ্যার্জ্জন জন্য গিরিজাপ্রসন্নকে কোন দিন অর্থের অভাব অনুভব করিতে হয় নাই। তিনি এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ অধ্যয়ন করেন। এই সময় তাঁহার শ্রেষ্ঠ স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ গৃহলক্ষ্মী প্রকাশিত হয়। একে বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া বিশেষ শ্রম-সাপেক্ষ, তৎপর আবার গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন! বিশেষ অধ্যবসায় ও প্রতিভা না থাকিলে কি এই দুষ্কর দুইটী কার্য্য এক সময় নিষ্পন্ন হয়! "গৃহলক্ষ্মী" প্রকাশের পরই তিনি বঙ্গসাহিত্য-সমাজে একজন উৎকৃষ্ট লেখক বলিয়া সাহিত্যসেবীদের নিকট আদরণীয় হইতে লাগিলেন। গৃহলক্ষ্মীর পরিচয় আর আমরা নূতন কি দিব? ইহা নিজগুণে বঙ্গের ঘরে ঘরে বঙ্গনারী কর্ত্তৃক আদৃত হইতেছে। এই গ্রন্থখানির সৃষ্টি বিবরণ সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"অনেক দিন হইল, একদিন বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীর সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে স্বামী ও স্ত্রীর কথোপকথনচ্ছলে উপদেশ সম্বলিত একখানি স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করেন। বিশেষ কোন কারণবশতঃ আমি সেই কার্য্যের ভার শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ন্যস্ত করি। হরিদাস বাবু

তদনুযায়ী একখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন, ঐ পাণ্ডুলিপির অনুযায়ী নামকরণ হয়। প্রথম তিন ফর্ম্মায়—"স্বামী স্ত্রী" "লেখা পড়া" "বেশভূষা" "শ্বশুর ঘর" এই কয়েটী প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। যখন হরিদাস বাবুর সহিত পুস্তক প্রকাশের সম্বন্ধ রহিত হইয়া গেল, তখন আমিই পুস্তক প্রকাশে ইচ্ছুক ও বাধ্য হইয়া পুস্তকখানির অবশিষ্টাংশ সঙ্কলন ও প্রণয়ন করিলাম। হরিদাস বাবুর পাণ্ডুলিপি হইতে সঙ্কলন—অবশ্য হরিদাস বাবুর মত লইয়াই করিয়াছিলাম। এইরূপে "গৃহলক্ষ্মী" কতক হরিদাস বাবুর, অবশিষ্ট আমার লেখা লইয়া, তিন ফর্ম্মা তাঁহার সম্পাদকতায়, অবশিষ্ট আমার তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইল।"

"যখন পুস্তকের দায়িত্ব আমার হইল, তখন পুস্তকের অন্যান্য যে সকল লেখা হরিদাস বাবুর ছিল, তাহাও আবশ্যক মতে আমার মতানুযায়ী করিয়া পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে বাধ্য হইলাম।"

রমণীগণকে গৃহস্থাশ্রমের যাবতীয় কার্য্য শিক্ষা প্রদানই গৃহলক্ষ্মীর উদ্দেশ্য। গৃহলক্ষ্মী দ্বারা এ উদ্দেশ্য আশানুরূপ রক্ষিত হইতেছে। এই পুস্তক খানির একটী প্রধানগুণ, গ্রন্থকার কেবল শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়াই উপদেশ প্রদান করেন নাই। শাস্ত্রীয় অনুশাসনের সঙ্গে যুক্তি প্রদান করিয়া, অনেক স্থলে, কঠিন বিষয়গুলির মীমাংসা করিয়াছেন। এই জন্য গৃহলক্ষ্মী পাঠ করিয়া শাস্ত্রীয় অনুশাসন গুলি পাঠকবর্গের যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি জন্মে এবং উহা পালনেও মন উত্তেজিত হয়।

গৃহলক্ষ্মীর উপদেশগুলি জাতীয় ভাবের উদ্দীপক, ও হিন্দুধর্ম্মে ভক্তি স্থাপনের পরিপোষক। এই দ্বিতীয় গ্রন্থখানি কিরূপ পারিপাট্যের সহিত লিখিত হইয়াছে, গ্রন্থকার এই পুস্তক খানিতে কিরূপ রচনা-কৌশল ও সংসার-ধর্ম্মাভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্য স্বামী ও স্ত্রী শীর্ষক প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মর্ম্মাহত হইতেছি, কাহার দিকেই বা তাকাই। সমাজে যাহারা শিক্ষিতা বলিয়া খ্যাতা, তাঁহারা ত ভালবাসার অধিকার লইয়াই ব্যস্ত, তাঁহারা কি আর ইহধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী হইতে চাহিবেন? ঘরকন্না তাঁহাদের নিকট অতি ক্ষুদ্র কার্য্য। ইহা ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ততা নহেই, প্রত্যুত অতি ঘৃণাজনক হীন কার্য্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। তাঁহারা চাহেন, উচ্চ বিষয়ের দিকে—রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বড় বড় কার্য্য লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত, তাঁহারা কি ঘরকন্নার কথা ভাবিতে পারেন? আর যাঁহারা অশিক্ষিতা, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ঘরকন্না করেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা একটী অতি পবিত্র কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠান ভাবিয়া নহে—না করিলে চলেনা বলিয়া। যেমন উপাসনা, যেমন পূজা, যেমন ব্রত, যেমন যজ্ঞ, তেমনই যে ঘরকন্না, একথা তাঁহারা জানেনই না। তাই এখন আর আমাদিগের গৃহস্থাশ্রম নাই। আছে যাহা, তাহা আহার বিহারের নির্দ্দিষ্ট স্থান মাত্র। গৃহস্থাশ্রমে এখন সহধর্ম্মিণী নাই—আছে প্রণয়িনী মাত্র।"

"তাই আমাদের বড়ই ইচ্ছা হয়, এই হিন্দু পত্নীগণকে আবার সেই গৃহধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিব। ঘরকন্না যে একটী বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান, তাহা বুঝিয়া যদি শিক্ষিতা কামিনীগণ সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তবে আমাদিগের আবার এই গৃহস্থাশ্রমে চতুর্ব্বর্গের ফল পাইতে পারি। হায়, কবে এই আশা সফল হইবে? কবে হিন্দুরমণী আবার সেই সহধর্ম্মিণীর পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, প্রফুল্লের ন্যায় স্বামীর ছোট বড় সকল অনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবেন? এমন দিন কি হইবে?"

আমাদের দেশে দুই শ্রেণীর লেখক বিদ্যমান। কোন শ্রেণীর লেখক বর্ত্তমান অবস্থায় পরিতৃপ্ত না রহিয়া, সমাজটাকে নানারূপ সংস্কার দ্বারা একটা নূতন ছাঁচে গঠিত করিয়া, তাহার তলে সকলকে বিশ্রাম লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করিতেছে। ইঁহাদের সমাজের ভিত্তি ভবিষ্যতের কাল্পনিক ছাযার উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে ইঁহারা প্রাচীন ধর্ম্মরীতি ও নীতির অনুসরণ দেশের কল্যাণজনক বলিয়া বিবেচনা করেন না, অথবা উহা পালন আধুনিক কালের লোকের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে করেন। কোন শ্রেণীর লেখক বর্ত্তমান সমাজকে নব আদর্শে গঠিত করিতে না চাহিয়া, প্রাচীনের ভিত্তির উপর উহা স্থাপিত করিতে চাহেন। প্রচীন কালের স্মৃতি ইঁহাদের নিকট এত প্রিয় যে, ইহারা প্রাচীন ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান লইয়া সুখী হইতে চাহেন না, অথবা সুখী হইতে পারেন না। গিরিজাপ্রসন্ন এই শ্রেণীর লেখক। উল্লিখিত প্রবন্ধটী পড়িয়া আমরা কি গিরিজা প্রসন্নের একটা ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইতে পারি না? প্রাচীন ভারত যেজন্য সর্ব্বত্র গৌরবান্বিত, আমরা যদি তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, প্রাচীন ভারতবাসীর ধর্ম্মজ্ঞান এবং শক্তি যদি আমাদের নিকট অসামান্য বলিয়া অনুভূত হয়, প্রাচীন ঋষিদের প্রদর্শিত পথ যদি নিষ্কণ্টক, তাঁহাদের যুক্তি যদি অভ্রান্ত, ও তাঁহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি যদি হিমাদ্রির ন্যায় অটল ও দৃঢ় হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের কল্পিত পথ পরিত্যাগ করিয়া আদর্শ লাভের জন্য কেন বিভিন্ন পথগামী হইব? তাহাদের স্থিরীকৃত রীতি, নীতি, আচার যদি ন্যায্য ভাবে পরীক্ষিত হয়, তাহা হইলে কি আমরা দেখিতে পাইনা যে, তাঁহাদের প্রদর্শিত শাসন নিয়মাদিই আদর্শ লাভের অনুকূল? তাঁহাদের নির্দ্ধারিত পথই সোজা, বিপদ-শূন্য ও লক্ষ্য বস্তুর নির্দ্দেশক। বর্ত্তমান সংস্কারক দলের ও প্রাচীন ঋষিদের মত বিশেষ রূপ বিচার করিয়া গিরিজাপ্রসন্ন প্রাচীন ঋষিদের মতেই বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তাই বর্ত্তমান সমাজকে ঋষি-প্রদর্শিত মতের বিরুদ্ধে গমনোন্মুখ দেখিয়া, গিরিজাপ্রসন্ন, নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া, উহাকে প্রাচীনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি গুলিতে দেশভক্তি যেরূপ দেদীপ্যমান, তদ্রূপ বিচার শক্তির পরিচয়ও বিলক্ষণ। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু ও মনস্বী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় যেপথ অনুসরণের জন্য হিন্দুদের নিকট গৌরবের ও ভক্তির পাত্র, গিরিজাপ্রসন্নও সেই পথ অনুসরণ করিয়া শ্রদ্ধেয় ও কীর্ত্তিমান হইয়াছেন। সংসারে ধর্ম্মের কিরূপ স্ফূর্ত্তি হয়, তাহার সিদ্ধান্ত ও রমণীগণেকে তৎবিষয়ক উপদেশ প্রদান, উভয়ই বহু জ্ঞান ও বিচার সাপেক্ষ। গিরিজা-প্রসন্ন গৃহলক্ষ্মীর প্রতি পৃষ্ঠায় সেই জ্ঞান ও বিচার শক্তির পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। তাই গৃহলক্ষ্মী গৃহিণীগণের নিকট উজ্জ্বল ভাবে শোভা পাইতেছে। আজকালকার দিনে এরূপ একটা দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া নিখুঁৎভাবে সম্পন্ন করা কম সৌভাগ্যের কথা নহে।

নবীন গ্রন্থকার প্রথম সংস্করণে গৃহলক্ষ্মীকে নির্দ্দোষ করিয়া প্রকাশিত করিতে না পারায়, অনেক সংবাদ পত্র, সমালোচনা করিতে গিয়া, উহার দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সব দোষের পরিমাণ খুব

অল্প। গ্রন্থকার যে সব স্থল প্রকৃত দোষযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সে সব স্থল সংবাদ পত্রের অভিমতানুযায়ী গৃহলক্ষ্মীর ২য় সংস্করণে পরিবর্ত্তিত করিতে ত্রুটী করেন নাই। তবে সংস্কারপ্রার্থী নব্য সমালোচকের কথানুযায়ী এমন কোন স্থল পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করেন নাই, যাহা শিক্ষা দিলে, হিন্দু-সমাজ কি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায়। আমরা দেখিতে পাই, সাধারণীর সম্পাদক বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের অনেক মন্তব্য গৃহলক্ষ্মীর ২য় সংস্করণে গৃহীত হইয়াছে। অগ্নিতে দাহন করাই যেমন কাঞ্চন-বিশুদ্ধিতার অমোঘ ঔষধ, সেইরূপ, বিচারশক্তি প্রবল সমালোচকের সমালোচনাই গ্রন্থ-দোষ ক্ষালনের প্রধান উপায়। আমাদের দেশে যিনি বঙ্গসাহিত্য-সম্রাট বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাঁহার শিল্পচাতুর্য্যে ও রচনা-কৌশলে বঙ্গভাষা পূর্ণকলেবরা, সেই মহাপুরুষও তাঁহার সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ প্রকাশ করার সময়, আশানুরূপ যশঃ লাভ করিতে পারেন নাই।

কবিতা রচনা।

গিরিজাপ্রসন্নের কবিতা রচনারও ক্ষমতা ছিল। আমরা তাঁহার নোটবুকে কয়েকটী সুন্দর কবিতা প্রাপ্ত হইয়াছি এবং বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি, উহা তাঁহারই রচিত; তিনি ঐ কবিতাগুলি কোন পুস্তকে বা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন কিনা, তদ্বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কিছু পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই। আমাদের দেশীয় গদ্য-রচনাকুশল লেখকগণ প্রায়ই কবিতা লিখিতে অভ্যস্ত নহেন। গিরিজাপ্রসন্নের এই কবিতা দুইটী অন্ততঃ গদ্য-লেখকদিগের কথঞ্চিৎ চিত্তরঞ্জনে সমর্থ হইবে, এই আশায় উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"সতীর্থ যুবকের প্রতি ভালবাসায় অধীর-চিত্ত কোন এক যুবকের উক্তি"—

> Not showers to larks so pleasing,
> Nor sunshine to the bee ;
> Nor sleep to toil so easing,
> As those dear smiles to me."
>
> Pope.

(১)

যাহাকে দেখিতে সদা চাহে মন,
বুঝি না সে কেন লুকায় বদন ;
নহেতো রমণী, ভাবিবে কি জানি,
দরশনে কত আপদ আছে।
তবে কি বলিয়ে, প্রবোধিব মনে,
কেন প্রিয়তম থাকে সঙ্গোপনে,
কঠোর হৃদয় ভাবি না তাহায়,
এ হৃদয় ব্যথা পাইবে পাছে॥

(২)

চাহিনা তাহার ভালবাসা আমি,
কেন যে চাহিনা জানে অন্তর্য্যামী,
কেবল দেখিব, কেবল শুনিব।
সে ফুল্ল আনন মধুর বাণী।
ভালবাসি এই চাহি প্রতিদান,
আনিয়ে নয়নে সমস্ত পরাণ,
ভুলিয়ে আমায়, দেখিব তাহায়,
হবেনা বিমুখ সখা তাহা জানি॥

(৩)

কি ক্ষতি তাহার হইবে দেখিলে,
আর কিছু নয় কথাটী শুনিলে,
তবে কেন হায়, দেখিলে আমায়
অধোমুখে প্রিয় স্তব্ধ হয়।
বলিব কি তাকে বিরলে ডাকিয়ে,
প্রাণাধিক মোর দেখগো চাহিয়ে,
হৃদয় ভিতর ও মূর্ত্তি সুন্দর,
দরপণে যথা ফলিত রয়॥

(৪)

থাক নাহি চায় শুনাতে তাহায়,
দেখাতে এ পোড়া তন্ময় হৃদয়,
লুকিয়ে লুকিয়ে দেখিয়ে শুনিয়ে,
সুখী আছে মন বেশী না চায়,

যতদিন দেহে রহিবে পরাণ,
যতদিন চিতে সঞ্চারিবে জ্ঞান,
সুখ শান্তি তার হর্ষে অনিবার
প্রার্থিব জগৎ নিয়ন্তা পায় ॥

"পূর্ব্ব কথিত যুবকের প্রতি পূর্ব্বোক্ত যুবকের"—

Irregular sonnet not (obeying its rules)
"A thing of beauty is a joy for ever"
Keats.

ত্যাজি বৃথা লজ্জা, খুলি ভীমশক্তি বলে
প্রেমের—শক্তিমান মহাভাবের জগতে
মনদ্বার—অবরুদ্ধ চির জ্ঞানার্গলে
সংসারের ; এসেছি ভেটিতে তোমা সথে!
কর ঘৃণা, যদি ইচ্ছা হয়, প্রণয়ী যে,
অভিমান তার না সম্ভবে। মুগ্ধ আমি
দেখি তব বদনমণ্ডলে সরলতা,
(শরতের জলে যেন পবিত্র চন্দ্রিকা)
পবিত্রতা (দয়া মাখা অঙ্গে স্বরগের)।
হাসুক জগৎ, নাহি খেদ—ঘৃণাযুক্ত
হাসি—রূপে মুগ্ধ দেখি আমা, বিস্মরিয়ে
সেই সত্য, কহে যেই, চিরদিন ভবে
পবিত্রতা—প্রতিমূর্ত্তি চিত্তমুগ্ধকর।

কবিতার ভাবই যদি প্রাণ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, পূর্ব্ব-কথিত যুবকের উক্তি বেশ সজীব। প্রণয়াকাঙ্ক্ষী যুবক, ভালবাসা লাভের জন্য অধীর, কিন্তু মুখ ফুটিয়া ভালবাসার কথা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত। কি জানি পাছে যদি তাহাকে নিরাশ হইতে হয়! এক শ্রেণীর প্রণয়ী প্রণয় লাভের জন্য সচেষ্টিত হইয়া, বাহ্যিক ও আন্তরিক ব্যবহার দ্বারা প্রণয় পাত্রের প্রতি প্রণয় লক্ষণ সূচনা করিয়া থাকেন ; এইরূপ ব্যবহার দ্বারা শেষে উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। অপর শ্রেণীর প্রণয়ী হৃদয়ের মধ্যে প্রণয়ারাধ্যের মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া তাহার পরিচিন্তনে নিমগ্ন রহেন। প্রণয়প্রার্থী জানিতে দিতে চাহেন না—প্রণয়-পাত্রের প্রতি তাহার কত অনুরাগ। এই শ্রেণীর প্রণয়ী ফল্গুনদীর স্রোতের ন্যায় প্রণয়-প্রবাহ হৃদয়ের অভ্যন্তরে ধারণ করিয়াই পরিতৃপ্ত রহেন। ইঁহারা, দুইটী কারণে, এইরূপ নীরব প্রণয়ের প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, প্রথম কারণ—ইঁহারা আরাধ্য জনের মধ্যে এত কামনাচরিতার্থোপযোগী গুণ দৃষ্টি করেন যে, উঁহাদের তুলনায় স্বকীয় শক্তি অসার বলিয়া অনুভূত হয়। তাই স্বকীয় শক্তিহীনতার জন্য প্রণয় লাভের অযোগ্য মনে করতঃ প্রণয় জ্ঞাপন করিতে সাহসী হয়েন না ; নীরবে ভালবাসিতে শিক্ষা করিয়া থাকেন। ২য় কারণঃ—প্রণয় পাত্রকে ভালবাসার সূচনাতেই ভালবাসা জানাইতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া গোপনে ভালবাসিতে অভ্যস্ত হয়েন। সেই ভালবাসা শেষে মার্জ্জিত হইয়া পরিপুষ্ট হইলে নিষ্কাম ভাব ধারণ করে। তখন ভালবাসার পাত্রকে ভালবাসা জ্ঞাপন ও অজ্ঞাপন তুল্য সুখপ্রদ মনে হয়। কারণ তাহারা নীরবে ভালবাসিয়াই তখন প্রণয়-কল্পিত সুখ অনুভব করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকেন। প্রণয়াকাঙ্ক্ষী যুবকের উক্তি ও প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া উঁহাকে নিষ্কাম শ্রেণীর প্রণয়ী বলা যাইতে পারে। এই কবিতাটীর রচনাতে শব্দ বিন্যাসের মাধুর্য্য না থাকিলেও, গ্রন্থকার প্রণয়াভিলাষী যুবকের হৃদয়খানি সরল রচনা দ্বারা বেশ স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইতে সমর্থ হইয়াছেন। দ্বিতীয় কবিতাটীতেও বেশ ভাবের উচ্ছ্বাস রহিয়াছে। এই কবিতা দুইটী পড়িয়া কি ধারণা হয় না যে, গিরিজাপ্রসন্ন যদি পদ্য লেখার জন্য কলম ধারণ করিতেন, তাহা হইলে সে রচনাতেও বেশ কৃতীত্ব লাভ করিতে পারিতেন। আমরা স্থানান্তরে তাঁহার আরও দুই একটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

কর্ণেল অলকট।

[মহামতি কর্ণেল অলকট মহোদয়ের ইং ১৮৮৭ সালে নোয়াখালি নগরে আগমন উপলক্ষে কবিবর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেনের রচিত আবাহন। ১]

সুনীল আকাশে শ্বেত মেঘ মত,
নীল পারাবারে মাতা শ্বেতাঙ্গিনী,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা, গৌরব-গর্ব্বিনী,
মার্কিণের * অঙ্কে বসি ধ্যান রত,
হে শ্বেতর্ষি! তুমি দেখিলে কি হায়!
আমাদের মাতা পতিতা ভারত,
পাশ্চাত্য সভ্যতা দর্শন ধুঁয়ায়,
যাইছে ছুটিয়া নিপাতের পথ!

২

শান্তি-সিন্ধু † তীরে শ্বেতাঙ্গ ঈশান,
বিষাণ ঝঙ্কারে কহিলে সম্ভাষি,
"হায় মা! ফিরিয়া দেখ রাশি রাশি,
"তারাময় তব অতীত বিমান!
"যোগীন্দ্র, মহাত্মা, অমরেন্দ্রগণ,
"হিমাদ্রি শেখরে ওই অগণন!
"দাঁড়াইয়া ওই নর নারায়ণ,
'পাঞ্চজন্য-রবে প্লাবিয়া গগন,
"কহিছে;—'ত্যজিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম, নর,
"লও একমাত্র আমার শরণ!'
"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

ফিরিলা জননী, দেখিলা চাহিয়া,
নক্ষত্র-খচিত অতীত তাঁহার!
তব কণ্ঠ তাহে উঠিছে ভাসিয়া,
ডুবায়ে পাশ্চাত্য ঝিল্লির ঝঙ্কার।
মৃতা ভারতের দিলে তুমি প্রাণ,
লও পাদ্য-অর্ঘ, ঋষি আয়ুষ্মান্!

(সংগ্রহকার)

শ্রীআশুতোষ দেব।

গীতার ঐতিহাসিকতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(চ) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়।

ভারতবর্ষের কোন পুরাতন ঐতিহাসিক ঘটনার সময় নির্দ্ধারণ করা অতীব দুরূহ। কারণ আমাদের ক্রমিক এবং ধারাবাহিক ইতিহাস বলিয়া কিছুই নাই; সুতরাং কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সময় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, হয় অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়, না হয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহা নিরূপিত করিয়াছেন, তাহা মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য

(১) তমলুকের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট স্বর্গীয় কবিবরের স্বহস্ত-লিখিত উক্ত কবিতাটী এখনও বর্ত্তমান আছে। ইং ১৮৮৭ সালে যখন কর্ণেল অলকট নোয়াখালিতে পদার্পণ করেন, তখন যোগেন বাবু ও স্বর্গীয় কবিবর নোয়াখালিতে ছিলেন।— সংগ্রহকার।

* America.

† Pacific Ocean.

পণ্ডিতগণ অপর্য্যাপ্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া যে ভ্রান্ত হইয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আধুনিক প্রাচ্য পণ্ডিতগণ অনেক গবেষণা করিয়া আভ্যন্তরিক জ্যোতিষিক প্রমাণ বহুল পরিমাণে আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সময় নির্দ্ধারণ করা অনেকটা সুবিধাজনক হইয়াছে। আমরা প্রথমে সেই সকল জ্যোতিষিক প্রমাণ পাঠকবর্গের সম্মুখে স্থাপিত করিব। সেই সকল প্রমাণ হইতে ঐতিহাসিক ঘটনার সময় অনেক পরিমাণে নির্দ্ধারিত করিতে পারা যাইবে। পরে শ্রীকৃষ্ণের সময় সম্বন্ধে আমরা বহু গবেষণা করিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহা পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিব। আজ চারি পাঁচ হাজার বৎসর হইল, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। এতদিন পরে আমরা এমন কোন নির্বিবাদী এবং নিশ্চিত প্রমাণ আবিষ্কার করিতে পারি নাই, যাহা হইতে আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, মহাভারত এবং তদন্তর্গত গীতা অমুক বৎসরে রচিত হইয়াছে। তবে আমরা ইহা বলিতে বাধ্য যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এতদ্ সম্বন্ধে যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। আমরা নিম্নে তাহার আলোচনা করিলাম।

এদেশের চলিত বিশ্বাস এই যে, কৃষ্ণ দ্বৈপায়নব্যাস বেদ চতুষ্টয় এবং ভারত-সংহিতা সংকলন করিয়াছিলেন। তিনি মহাভারত যুদ্ধের সমকালবর্ত্তী। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডব, তাঁহারই পৌত্র। অত-এব বেদাদি সঙ্কলনের কাল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসাময়িক। আমরা যদি কোন প্রকারে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় নির্দ্ধারিত করিতে পারি, তাহা হইলে ভারত-সংহিতা ও তদন্ত-র্গত গীতা প্রণয়নের সময় এবং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কাল নির্দ্ধারিত করিতে পারিব। অথবা আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কাল নির্দ্ধারিত করিতে পারি, তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় এবং মহাভারত অথবা গীতা প্রণয়নের সময় নির্দ্ধারিত করিতে পারিব।

বেদের সঙ্কলনের কাল যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসাময়িক, বিষ্ণুপুরাণ হইতে আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। পাশ্চাত্য পণ্ডি-তেরাও ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া এই এক সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের সকলেরই এই মত যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও বেদের সঙ্কলন সমসাময়িক ঘটনা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে Colebrook, Wilson এবং Elphinstone বলেন যে,খ্রীঃ পূঃ ১৪ শতাব্দীতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। Wilford বলেন, খ্রীঃ পূঃ ১৩৭০ অব্দে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। Sir William Jones এবং Davis বলেন যে,খ্রীঃ পূঃ ১১৮১ অব্দে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান ছিলেন। Pratt বলেন যে,খ্রীঃ পূঃ ১২শ শতাব্দীতে মহাভারতের যুদ্ধ হইয়াছিল। Bentley সাহেবের মত এই প্রকার যে,খ্রীঃ পূঃ ৫৭৫ অব্দে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশীয় পুরাতত্ত্ব-বিদগণের ধারণা অন্য প্রকার। V.G.Aiyer তাঁহার Chronology of Ancient India নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে,খ্রীঃ পূঃ ১১৭৬ অব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার "আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে,খ্রীঃ পূঃ ৪৫০ অব্দে মহাভারত

রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল নির্ণয় সঠিক কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

বেদ সঙ্কলনের সময় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক বৈদিক সাহিত্য হইতে অশেষ গবেষণা পূর্ব্বক যে সকল জ্যোতিষিক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তিলক শতপথ-ব্রাহ্মণে নিম্নলিখিত বিষয়টীতে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছেন। যথা,—

"এতাঃ (কৃত্তিকাঃ)প্রাচ্যৈ দিশোনচ্যবন্তে। সর্ব্বানি হ বা অন্যানি নক্ষত্রানি প্রাচ্যৈ দিশশ্চ্যবন্তে।" (২।১।২,৩)

এই বচন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যখন শতপথব্রাহ্মণ রচিত হয়, তখন বিষুবন্ (First Point of Arics) কৃত্তিকা নক্ষত্রে ছিল। কিন্তু এখন বিষুবন্ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে রহিয়াছে। অর্থাৎ তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত বিষুবন্ প্রায় ৬০° ডিগ্রি করিয়া আসিয়াছে। ৬০° ডিগ্রিতে=৬০×৬০×৬০ =২১৬০০০ বিকলা। জ্যোতিষীরা স্থির করিয়াছেন যে, বিষুবন্ প্রতি বৎসরে প্রায় ৫০ বিকলা সরিয়া যায়। অতএব মোটামুটী ধরিতে গেলে ইতিমধ্যে ৪৪০০ বৎসর অতীত হইয়াছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, শতপথব্রাহ্মণ রচনার সময় খ্রীঃ পূঃ প্রায় ২৫০০ বৎসর, অর্থাৎ এখন হইতে ৪৪০০ বৎসর। শতপথব্রাহ্মণে পরীক্ষিৎ ও জন্মেজয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং উহা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনেক পরে রচিত হইয়াছে। তাহা হইলে বেদের সঙ্কলন কাল যে প্রায় ৫০০০বৎসরের সমীপবর্ত্তী, তাহা মনে করা অসঙ্গত নহে। যদি বেদের সঙ্কলন কাল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসাময়িক, তাহা হইলে পাশ্চাত্য মত অনুসরণ করিয়া আমরা কেমন করিয়া বলিতে পারি যে, খ্রীঃ পূঃ ১৩শ শতাব্দীতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল? ধরওয়ায়ের অন্তর্গত ইবল্লি নামক স্থানে একটী শিবমন্দিরে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময় স্পষ্টাক্ষরে খোদিত আছে। উহাতে লিখিত হইয়াছে যে "৫০৬ শকাব্দে অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ৩৭৩০ বৎসর পরে" ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এখন ১৮৩০ শকাব্দা, সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ৫০৫৪বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল।

ইহা ভিন্ন অন্যান্য জ্যোতিষিক প্রমাণ আছে। তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত মত দৃঢ়তর হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠিরের সময় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে* এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। যথা:—

"প্রায়াস্যন্তি যদাচৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদানন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কালির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥"
(বিষ্ণু—৪—২৪—৩৭)

"যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদানন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥"
(ভাগবত—১২—২—৩২)

বায়ুপুরাণেও (৩৭ অঃ—১১৩ হইতে ১১৭ শ্লোক) এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে 'বৃহৎ-সংহিতা'—নামক জ্যোতিষ গ্রন্থপ্রণেতা বৃদ্ধ গর্গ এই কথা উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, "আসন্ মঘাসু শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।" কিন্তু আমরা এক্ষণে সপ্তর্ষি-মণ্ডলকে কৃত্তিকা নক্ষত্রে স্থিত দেখিতে পাই।

* কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে আবার অন্য প্রকারও লক্ষিত হয় যে, সপ্তর্ষি পরীক্ষিতের সময় মঘানক্ষত্রে ছিল এবং তখন কলির বয়স ১২০০ বৎসর হইয়াছিল (৪।২৪।৩৪)। কিন্তু জ্যোতিষ গ্রন্থে আমরা অন্য প্রকার দেখিয়া থাকি। সুতরাং কলির বয়স সম্বন্ধে এই অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পুরাণে আরও অনেক জ্যোতিষবচন আছে, তাহারা পরস্পর বিরোধী বলিয়া আলোচিত হইল না।

এই মণ্ডলের নাক্ষত্রিক ভোগকাল শত বৎসর; যথা—"একৈকস্মিন্ ঋক্ষে শতং শতং তে চরন্তি বর্ষাণাং।" যে সপ্তর্ষি পূর্ব্বে মঘা-নক্ষত্রে ছিল, সেই সপ্তর্ষিকে আমরা এক্ষণে কৃত্তিকানক্ষত্রে দেখিতে পাই। সুতরাং ইহার কৃত্তিকাবাসের পূর্ব্বে ভরণীবাস, ভরণীর পূর্ব্বে অশ্বিনী, তৎপূর্ব্বে রেবতী, এইরূপ ব্যুৎক্রম নিয়মে গণনা করিয়া Cunningham সাহেব বলেন যে, নিম্নলিখিত বর্ষগুলিতে মঘা সপ্তর্ষি-মণ্ডলে ছিল এবং থাকিবে। যথা খ্রীঃ পূঃ ৫৮৭৭, ৩১৭৭, ৪৭৭ এবং খ্রীঃ অব্দ ২২২৫,—অর্থাৎ ২৭০০ বৎসর অন্তর ইহাদের পরিবর্ত্তন ঘটে। অতএব যদি সম্ভব অনুসারে মঘাবাসের সংখ্যা গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ৩১৭৭+২৭০০=৫০৮৬ বৎসর হইয়া থাকে। সুতরাং ৫০৮৬ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বিষ্ণুপুরাণে অন্যত্র আমরা দেখিতে পাই যে,—

"প্রথমে কৃত্তিকা ভাগে যদা ভাস্বাংস্তথা শশী
বিশাখানাং চতুর্থেঽংশে মুনে তিষ্ঠত্যসংশয়ম্॥৭১
বিশাখানাং যদা সূর্য্যশ্চরত্যংশং তৃতীয়কম্।
তদাচন্দ্রং বিজানীয়াৎ কৃত্তিকা শিরসিস্থিতম্॥৭২
তদো বিষুবাখ্যো বৈ কালঃ পুণ্যোঽভিধীয়তে॥"৭৩
(২য় অংশ—৮ অধ্যায়)

অর্থাৎ, হে মুনে! যখন সূর্য্য কৃত্তিকার প্রথম ভাগে, অর্থাৎ মেষান্তে এবং চন্দ্র বিশাখার চতুর্থ ভাগে, অর্থাৎ বৃশ্চিকারম্ভে অবস্থিত হয়, কিম্বা সূর্য্য যখন বিশাখার তৃতীয় অংশে অর্থাৎ তুলার অন্তভাগ ভোগ করেন এবং চন্দ্র কৃত্তিকার প্রথম পাদে অর্থাৎ মেষান্তভাগে অবস্থান করেন, তখনই পবিত্র বিষুবনামা কাল, অর্থাৎ ক্রান্তিপাতের সময় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

তৈত্তিরিয় সংহিতা, তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, সূর্য্য যখন কৃত্তিকা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল, তখন বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত। তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণে (১-১-২-১) কৃত্তিকাকে নক্ষত্রগণের মুখস্বরূপ বলা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে (১-১৯-৭) এবং যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে কৃত্তিকানক্ষত্রকে আদি নক্ষত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণের মতে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হইয়া বলিতেছেন যে,—

"মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগ শেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি॥"
(১৬৭—২৭)

এই শ্লোক হইতেও অবগত হওয়া যাইতেছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইবার কিছুদিন পরে অর্থাৎ মাঘমাসের অমাবস্যা হইতে পঞ্চম দিন পরে হৈমন্তিক ক্রান্তিপাত হইয়াছিল।

এই সকল তত্ত্ব হইতে হিন্দুজ্যোতিষীরা স্থির করিয়াছেন যে, বেদ সকলের সময়ে, যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে, অথবা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময়ে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত, অর্থাৎ সেই সময়ে বিষুবন্ কৃত্তিকা নক্ষত্রে ছিল। পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে, সে আজ ৫০৮৬ বৎসরের কথা।

(ছ) শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কাল।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সকল হইতে আমরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় কতক পরিমাণে নির্দ্ধারিত করিতে পারিয়াছি। এক্ষণে দেখা যাউক যে, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ আছে কি না, এবং উহা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ের সহিত মিলে কি না। বিভিন্ন প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া যদি এই দুইটী সময়ের মিল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা

হইলে উহাদের মধ্যে যে কোনটী সময় যে ব্যাসদেবের আবির্ভাবের কাল, সুতরাং গীতা প্রণয়নেরও কাল হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় লইয়া পুরাণাদি শাস্ত্রে মতদ্বৈধ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।" শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"যস্মিন্‌কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ॥"
(১২।২।১৩)

অর্থাৎ, যে দিন শ্রীকৃষ্ণ দিব্যলোকে গমন করিলেন, সেই দিনেই কলিযুগ আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্যত্র আমরা দেখিতে পাই যে,—

"অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌযুগে।
অষ্টাবিংশাতিমে জাতঃ কৃষ্ণাসৌ দেবকীসুতঃ॥"

এই প্রমাণ হইতে আমরা অবগত হই যে, শ্রীকৃষ্ণ কলির প্রথমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

অন্যস্থলে আমরা দেখিতে পাই যে,—

"ভারতং দ্বাপরান্তেঽভূৎ বার্ত্তয়েতি বিমোহিতাঃ

ইহার উপর নির্ভর করিয়া রাজতরঙ্গিণীকার প্রাচীন কহ্লন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণ জন্ম দ্বাপরের শেষে নহে, কলির প্রথমে। তাঁহার মতে 'দ্বাপরান্তে' মানে দ্বাপর যুগ অন্ত হইলে। কুরুপাণ্ডবগণের আবির্ভাবের সময় সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে,—

"গতেষুষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণাম্ অভবন্ কুরুপাণ্ডবঃ॥"

অর্থাৎ কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে কুরুপাণ্ডবগণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণীকার আরও বলেন যে, কাশ্মীররাজ গোনর্দ্দ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক। তিনি কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে, আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং যুধিষ্ঠিরও ঐ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

আবুল ফাজেল আইন-ই-আকবরীতে লিখিয়াছেন যে, আকবরের যখন ৪০ বৎসর রাজত্ব হইয়াছিল, (অর্থাৎ ১৫৯৫ খ্রীঃ অব্দে) তখন যুধিষ্ঠিরের ৪৬৯৬ সংখ্যক বর্ষ অতীত হইয়াছিল। সুতরাং ৪৬৯৬—১৫৯৫=৩১০১ খ্রীঃ পূঃ অব্দে যুধিষ্ঠির রাজা হইয়াছিলেন। এবং তিনি আরও বলেন যে, তখনই কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু আমরা আবুল ফাজেলের কথা সবিশেষ বিশ্বাসযোগ্য মনে করি না, কারণ তিনি পূর্ব্বে এক কথা বলিয়াছেন এবং পরে আর এক কথা বলিয়াছেন। যথা,—মহাভারত দ্বাপর যুগের শেষে হইয়াছিল; কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দ্বাপর যুগের ১৫০ বৎসর থাকিতে হইয়াছিল, ইত্যাদি।

আর্য্যাভট্টের মতে কলিযুগের ৬৬২ বৎসর অতীত হইলে যুধিষ্ঠির রাজা হন। বরাহমিহিরের মতে কলিযুগের ৬৫০ অতীত হইলে মহাভারতের যুদ্ধ হইয়াছিল। বরাহমিহির বৃদ্ধ গর্গের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, শকাব্দ আরম্ভ হইবার ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল বর্ত্তমান ছিল। এখন ১৮৩০ শকাব্দ, সুতরাং ১৮৩০+২৫২৬= ৪৩৫৬ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান ছিলেন।

কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য যে কলিযুগ কবে আরম্ভ হইয়াছে? সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে খ্রীঃ পূঃ ৩১০২ অব্দে, বৃহস্পতিবার, মধ্যরাত্রে, ১৭।১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। আবার কাহার কাহার মতে পরদিন ১৮ই ফেব্রুয়ারি সূর্য্যোদয়ের সময় কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। পঞ্জিকাতে আমরা দেখিতে পাই যে, "মাঘীপূর্ণিমায়াং শুক্রবারে কলিযুগোৎপত্তিঃ।" পাশ্চাত্য মতে জুলিয়ন অব্দের ৫৮৮৪৬৬ সংখ্যক দিনে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা বিক্রম সংবতের ৩০৪৪ বৎসর

এবং শকাব্দের ৩১৭৯ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে।

বোম্বায়ের বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত G. E. Sutcliffe গণনা করিয়া লিখিয়াছেন—খ্রীঃ পুঃ ৩১০১ অব্দে ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। তখন পবিত্র বারাণসীক্ষেত্রে ঠিক সূর্য্যোদয়ের সময়ে সূর্য্যে গ্রহণ লাগিয়াছিল এবং ছয়টী গ্রহের একত্র সংযোগ (conjunction) হইয়াছিল। ঐ ঘটনার ঠিক ৫০০০ বৎসর পরে, গত ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে, সেই ছয়টী গ্রহেরই সেই প্রকার সংযোগ (conjunction) হইয়াছিল এবং সূর্য্যেগ্রহণ লাগিয়াছিল এবং বারাণসী ক্ষেত্রের উপরেই ঠিক সূর্য্যোদয়ের সময়ই ঐ গ্রহণ ত্যাগ হইয়াছিল। * কলির প্রারম্ভ নিরূপণ সম্বন্ধে Sutcliffe এর মতই আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

আর্য্যাভট্ট, বরাহমিহির এবং কহ্লণ পণ্ডিতের মতে যুধিষ্ঠির কলিযুগের ৬৫৩ হইতে ৬৬২ বৎসরের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আমরা কিন্তু এ মতে সম্পূর্ণ আস্থা প্রদান করিতে পারিলাম না। কারণ আমরা মহাভারতে পাইয়াছি যে,—

"অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
সমন্ত পঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডব সেনয়োঃ॥"
(আদি—২—১৩)

অর্থৎ, কলিদ্বাপরের সন্ধিসময়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন যে,—

"কলিদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ কৃষ্ণদ্বৈপায়ণঃ সংবভুব।"

অর্থাৎ, কলি দ্বাপরের সন্ধিতে ব্যাসদেব উদ্ভূত হইয়াছিলেন।

এখন সন্ধি কথাটীর অর্থ কি, তাহা অবগত হইতে হইবে। দ্বাপর ও কলির সন্ধি অথবা কলির প্রারম্ভ বলিলে ঠিক যেদিন দ্বাপর শেষ হইয়াছে বা কলির আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বুঝায় না। সন্ধি অর্থে মিলন। পুরাতন যুগের শেষ কয়েক শতাব্দী নূতন যুগের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করে। এবং কলির প্রারম্ভ বলিলে, কলির প্রাদুর্ভাবের আরম্ভ বুঝিতে হইবে। সুতরাং

* Let me conclude with a hint, which will possibly mean more to Indians than to Englishmen. I gather it from a paper written by an eminent astronomer in Bombay, Mr. G. E. Sutcliffe, in the year 1899. "On February 21st, B. C 3101," the day of the commencement of the Kali Yuga, "there was a conjunction of six planets and an eclipse of the sun *commencing* exactly at sunrise at the holy city of Benares. A cycle of Kali Yuga, (i.e. 5,000 years) ended on December 3rd, 1899, when there was a similar conjunction of the same six planets, and also an eclipse of the sun which *ended* exactly at sunrise at the holy city of Benares. The two events are exactly parallel, therefore, the only difference being that at the biginning of the Kali Yuga the solar eclipse *began* at sunrise, whilst at the end of the Kali Yuga the solar eclipse *ended* at sunrise." What does this mean to the Hindu? It means that a new era has begun, in which the ancient glory of India is to be restored; in which her slumbering spirituality shall be born anew and India become once more the light of the world. Nay there are even whispers abroad that just as five thousand years ago this earth was trod by the feet of an Avatar, a divine Incarnation of God, so the "advent of a new Avatar is approaching," to quote Mr. Sutcilffe's words, "in whom science will see a Newton and religion a Saviour; who will gather up the scattered threads of knowledge and weave them into a grand generalisation; and who will, moreover, collect the truths embodied in the various religions, and focus them into a luminous ray of spiritual light."Such are whispers in India today, and on many sides you will hear that the numbers of great souls are incarnating at the present time for the salvation of India. The time is one of expectation, of waiting for some great event—Indicus in the *Indian Daily News*, September-1908.

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা যে দেখিতে পাই যে, যে দিন শ্রীকৃষ্ণ দিব্যলোকে গমন করিলেন, সেই দিনই কলিযুগ আসিয়া উপস্থিত হইল—তাহার অর্থ আর কিছুই নহে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ ত্যাগের পর কলিযুগের প্রাদুর্ভাব হইল। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, কহ্লন পণ্ডিতের মতে কলির ৬৫৩ বৎসর গতে যুধিষ্ঠির আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এখন আমরা দ্বাপর শেষ হইবার ৬৫৩ বৎসরকে যদি দ্বাপর ও কলির সন্ধিকাল ধরিতে পারি এবং আমরা যদি উক্ত প্রকারে গণনা করি, তাহা হইলে সকল মতের মিল দেখিতে পাই। শঙ্করাচার্য্যের মতে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আবির্ভাব কাল কলি দ্বাপরের সন্ধিতে; মহাভারতের মতে কুরুক্ষেত্রের কাল কলি দ্বাপরের সন্ধিতে; এবং অন্যান্য পুরাণের মতে কৃষ্ণের জন্ম সময় কলির প্রথমে বা দ্বাপরান্তে,—এই সকল গুলি মতেরই মিল দেখিতে পাই, যদি আমরা 'সন্ধি' অর্থ উক্ত প্রকারে প্রয়োগ করিতে পারি। সুতরাং আমাদের মতে 'সন্ধির' অর্থ উক্ত প্রকারে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয়।

খমাণিক্য নামক জ্যোতির্গ্রন্থ হইতে শব্দকল্পদ্রুমে শ্রীকৃষ্ণের নিম্নলিখিত জন্মকোষ্ঠী উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা,—

"উচ্চস্থাঃ শশিভৌম চান্দ্রি শনয়োলগ্নং বৃষলাভগো,
জীবঃ সিংহতুলালিষু ক্রমবশাৎ পূষোশনোরাহবঃ।
নৈশীথঃ সময়োষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মর্ক্ষমত্রক্ষণে,
শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বুজেক্ষণমভূদাবিঃ পরংব্রহ্মতৎ॥"

অর্থাৎ, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ ও শনি—এই চারি গ্রহ যখন উচ্চস্থ ছিল, বৃহস্পতি একাদশস্থ ছিল, সূর্য্য সিংহগত, শুক্র তুলাগত এবং রাহু বৃশ্চিক রাশিগত ছিল এবং যখন অষ্টমী তিথি, বুধবার, রোহিণী নক্ষত্র, বৃষলগ্ন এবং অর্দ্ধরাত্র হইয়াছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ যখন বৃষে চন্দ্র সিংহে রবি, কন্যায় বুধ, তুলায় শনি ও শুক্র বৃশ্চিকে রাহু, মকরে মঙ্গল এবং মীনে বৃহস্পতি ছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি আমরা কোন প্রকারে উক্ত গ্রহ সন্নিবেশের সময় নির্দ্ধারণ করিতে পারি, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কালও নিঃসন্দেহে নির্দ্ধারিত হইবে এবং এই প্রমাণ সকল প্রমাণের অপেক্ষা বলবতী হইবে।

জলপঞ্জিকা-প্রণেতা মেদিনীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত অযোধ্যা নাথ মণ্ডল মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, ৫১৪১ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন দ্বাপরের ১৩২।৭।১০ বাকী ছিল। নিম্নে শ্রীকৃষ্ণের কোষ্ঠীর গ্রহসন্নিবেশ ও গ্রহগণের স্ফুট প্রদত্ত হইল।
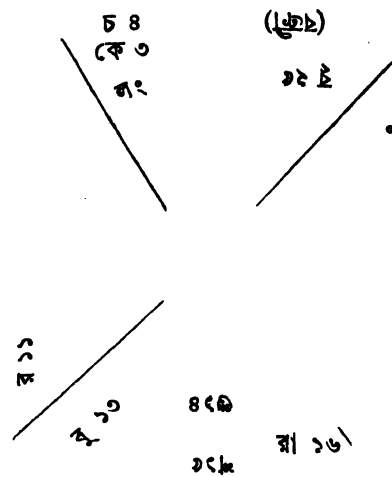
র	৪।১৯।৩৯।২৯	শু	৬।১।৫।০
চ	১।১৯।৩৫।৯	শ	৬।২০।০।৫২
ম	৯।১৫।৩।০ (বক্রী)	রা	৭।২।৩৮।২৩
বু	৫।১৫।৪২।০	কে	১।২।৩৮।২৩
বৃ	১১।১৫।৩৫।১৫ (বক্রী)	লং	১।২৩।২০।০

দ্বাপরের বাকী ছিল ... ১৩২।৭।১০
কলি ১৮৩০ শকাব্দ ... ৫০০৯।০।০

বৎসর গত ৫১৪১।৭।১০

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা সমূহ হইতে আমরা অবগত হইতেছি যে, ৫০০০ বৎসরের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ এই মর্ত্ত লোকে বিচরণ করিয়াছিলেন।

(জ) বৈদিক যুগ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের রচনা কাল খ্রীষ্টজন্মের দুই এক শতাব্দী পূর্ব্বে স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা যে অপর্য্যাপ্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই মতে উপনীত হইয়াছেন, তাহা এখন অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। মহারাষ্ট্র পণ্ডিত তিলক বৈদিক যুগ নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে যে সকল অকাট্য যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে পাশ্চাত্যগণের পূর্ব্বোক্ত মত ভাসিয়া গিয়াছে। তিনি কোন বাহ্যিক প্রমাণের উপর তাঁহার যুক্তি স্থাপন করেন নাই। তিনি বেদগুলি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক যে সকল আভ্যন্তরিক জ্যোতিষিক প্রমাণ পাইয়াছেন, কেবল সেই প্রমাণের উপর তাঁহার মত স্থাপনা করিয়াছেন।

তিনি দেখাইয়াছেন যে, যখন বৈদিক গীতগুলি (hymns) প্রথমে প্রচলিত হইয়াছিল, তখন বাসন্তিক ক্রান্তিপাত মৃগশিরা (Orion) নামক নক্ষত্রে হইল। কিন্তু গণনার দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, খ্রীষ্টজন্মের অন্ততঃ ৪৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত ঐস্থানে হইয়াছিল। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, যখন বেদের ব্রাহ্মণ অংশ প্রচলিত হইয়াছিল, তখন বাসন্তিক ক্রান্তিপাত কৃত্তিকা নক্ষত্রে হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বে শতপথব্রাহ্মণ হইতে দেখাইয়াছি যে, এইরূপ ক্রান্তিপাত খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ বৎসরে সংঘটিত হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত কেটকার (Mr. V. B Ketker) তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণের (৩—১—১—৫) অংশ উদ্ধৃত করিয়া গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, খ্রীঃ পূঃ ৪৬৫০ বৎসরের সময় এইরূপ বৃহস্পতির সংঘটন হইয়াছিল। সুতরাং তিলক যে, খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ বৎসর বলিয়াছেন, তাহার সহিত এই গণনার মিল দেখা যাইতেছে।

তিলক তাঁহার বৈদিক গবেষণার ফলে এইরূপ স্থির করিয়াছেন—"The beginnings of Aryan civilisation must be supposed to date back several thousand years before the oldest Vedic period i.e. 4500 B. C"—অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ বৎসরেরও কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যসভ্যতা স্থাপিত হইয়াছিল।

বৈদিকযুগ সম্বন্ধে তিলক আর আর যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যাঁহারা এতদ্‌সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা তৎপ্রণীত "Orion" এবং "The Arctic Home in the Vedas" *নামক পুস্তকদ্বয় পাঠ করিবেন।*

(১) খ্রীঃ পূঃ ১০,০০০ কিম্বা ৮০০০ বৎসর; এই সময়ে আর্য্যদের বাসভূমি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। আর্য্যেরা পূর্ব্বে উত্তর মেরু প্রদেশে বাস করিতেন; কিন্তু প্রকৃতির বিপর্য্যয়ে আর্য্যভূমি বিধ্বস্ত হওয়াতে, তাঁহারা উত্তর মেরু ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাসভূমির সন্ধান করিতে লাগিলেন।

(২) খ্রীঃ পূঃ ৮০০০ হইতে ৫০০০ বৎসর; এই সময়ে তাঁহারা নুতন বাসভূমি স্থাপন করিয়াছিলেন। বাসন্তিক ক্রান্তিপাত এই এই সময়ে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে হইত। বেদের স্থানে স্থানে এ বিষয়ের ক্ষীণ আভাস আছে মাত্র। খ্রীঃ পূঃ ৮০০০০ বৎসরের সময় পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইয়াছিল।

(৩) খ্রীঃ পূঃ ৫০০০ হইতে ৩০০০থ বৎসর; অনেক বৈদিক গীত (hymns) এই

সময়ের প্রাক্কালে রচিত হইয়াছিল। বৈদিক সাহিত্যের অনেক স্থলে এইরূপ উল্লিখিত আছে যে, মৃগশিরা নক্ষত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। এ সময় বাসন্তিক ক্রান্তিপাত মৃগশিরায় হইত। গণনার দ্বারায় স্থির হইয়াছে যে, খ্রীঃ পূঃ ৪৫০১ বৎসরে এইরূপ ক্রান্তিপাত হইয়াছিল। ঋক্‌বেদের অনেক অংশ এই সময়ে রচিত হইয়াছিল।

(৪) খ্রীঃ পূঃ ৩০০০-১৪০১ বৎসর—এই সময়ে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত কৃত্তিকা নক্ষত্রে হইত। তৈত্তিরিয় সংহিতা এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগুলি এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। উহারা কৃত্তিকাকে নক্ষত্রের ভিতর প্রথম স্থান দান করিয়াছে। এই সময়ের প্রাক্কালে ব্যাসদেব বেদের সঙ্কলন করিয়া সংহিতার আকারে পরিণত করিয়াছিলেন। এই সময়ের শেষ অংশে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ রচিত হইয়াছিল এবং উহাতে ক্রান্তিপাত গুলির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(৫) খ্রীঃ পূঃ ১৪০০-৫০০ বৎসর—এই সময়ের নাম সূত্রযুগ; এই সময়ে দর্শনগুলি সূত্রাকারে রচিত হইয়াছিল।

তিলক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বৈদিক কালকে ভাগ করিয়া ৪র্থ বিভাগের ভিতর বেদের সংকলন কাল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সময়ে ব্যাসদেব যুধিষ্ঠির এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং ঐ সময়েই গীতা রচিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ দেব।

রামায়ণে রাজনীতি।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসাচ্ছলে নারদ অনেক রাজনৈতিক উপদেশ দিয়া ফেলিয়াছেন। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডেও ভরতের প্রশ্ন জিজ্ঞাসাচ্ছলে এইরূপ উপদেশ দেখিতে পাই। এ উপদেশদাতা স্বয়ং রামচন্দ্র। বর্ত্তমান যুগে এই উপদেশ বিশেষ কৌতূহলপ্রদ বলিয়া ইহার কোন কোন অংশের সঠিক বঙ্গানুবাদ পাঠকের নিকট উপস্থিত করা গেল।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

"তুমি বীর, বিদ্বান্, জিতেন্দ্রিয়, কুলীন ও ইঙ্গিতজ্ঞ আত্মতুল্য ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছ ত?" মন্ত্রীর কেবল অন্যান্য মামুলী গুণ থাকিলে চলে না; তাঁহার 'কুলীন'ও 'আত্মতুল্য' হওয়া আবশ্যক।

"তুমি বা তোমার অমাত্য যে মন্ত্রণা প্রকাশ কর নাই, অপরে যুক্তি বা তর্ক দ্বারা তাহা বুঝিতে পারে না ত?" এই মন্ত্রগুপ্তি অনেক স্থলে রাজাদিগের সফলতার এক প্রধান উপায়। আজকালকার সভ্য গবর্ণমেণ্ট পার্লেমেণ্টাদির দ্বারা পরিচালিত হইলেও, সময়ানুসারে মন্ত্রগুপ্তির উপকারিতা বিলক্ষণ বুঝেন।

"তুমি সহস্র মূর্খ অপেক্ষা এক পণ্ডিতকে পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক ত? অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে পণ্ডিত তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া মহোপকার সাধন করেন।" বঙ্কিম বাবু এ মতের বিরোধী; কিন্তু টোলের পণ্ডিত হয়ত কবির লক্ষ্য নহে। প্রতীচ্য পণ্ডিতই আজকাল রাজস্ব বিভাগের কাণ্ডারী।

"উগ্রদণ্ডে প্রজারা উৎপীড়িত হয় নাই ত?" অপরাধের তারতম্যানুসারে যে দণ্ডের তারতম্য আবশ্যক, তাহা ড্রেকো ও আমাদের বিষ্ণু-সংহিতাকার ভিন্ন সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন। সভ্য জগৎ রামায়ণের এ নীতি গ্রহণ করিয়াছে; অবশ্য দেশে রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটিলে বা কর্তৃপক্ষের মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে, ইহার প্রয়োগ ঠিক থাকে না।

"অর্থ গ্রহণে কৌশল-সম্পন্ন বৈদ্য, অপর ব্যক্তিকে দূষিত করে, এমন ভৃত্য এবং রাজসম্পদাকাঙ্ক্ষী শূরকে যে রাজা বিনাশ করেন, তিনি স্বয়ং নিহত হন।" বিশ্বাসঘাতকের জন্য কি কঠোর ব্যবস্থা!

"সৈন্যগণের দৈনিক ও মাসিক বেতন উপযুক্ত সময়ে দাও ত? বিলম্ব ত কর না? সময় মত বেতন না পাইলে ভৃত্যগণ প্রভুর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, তাঁহার নিন্দা করে ও অনর্থ বাধায়।" মোগল সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থা এবং হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলা ও মীরজাফর এই নীতির সত্যতার জলন্ত প্রমাণ।

"প্রধান প্রধান স্বকুলস্থ ব্যক্তি তোমার প্রতি অনুরক্ত ত? তোমার কার্য্যের জন্য তাঁহারা একত্র প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ত?" বিভীষণকে সন্তুষ্ট রাখিলে রাবণের এবং মিরজাফরকে সন্তুষ্ট রাখিলে সিরাজের কি দশা ঘটিত, তাহা কে বলিতে পারে?

ইহার পর গুপ্তচরের প্রয়োজনীয়তা বর্ণন। হিন্দুরাজ্যে গুপ্তচরের মাত্রা কিছু অতিরিক্ত ছিল। এখনও কোন কোন দেশীয়রাজ্যে এ নীতি লঙ্ঘন করিতে প্রস্তুত নহে।

"নিষ্কাশিত শত্রুগণ পুনরায় আক্রমণ করিলে তাহাদিগকে দুর্ব্বলজ্ঞানে অবজ্ঞা কর না ত?" এই অবজ্ঞা যে কত রাজার অকালে পতন ঘটাইয়াছে, ইতিহাসের পৃষ্ঠা অন্বেষণ করিলে তাহার কতকটা আভাষ পাওয়া যায়।

ইহার পর অযোধ্যাপুরীর সুরক্ষণের উপদেশ দিয়া রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কৃষি ও গো-পালন যাহাদের জীবিকা, তাহারা তোমার প্রিয় ত? তাহারা বাণিজ্যে সুখী হইতেছে ত?" কৃষি ও বাণিজ্য-পরায়ণ লোকেই যে সমৃদ্ধ রাজ্যের ভিত্তি, তাহা পুরোহিতপীড়িত দেশেও অস্বীকৃত ছিল না।

"তুমি স্ত্রীগণকে সান্ত্বনা ও রক্ষা কর ত? তাহাদের বাক্যে ত শ্রদ্ধা কর না? গুপ্তকথা ত তাহাদের নিকট বল না? এ সেই চাণক্যের নীতি,—

"বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।"

সভ্য ইউরোপের স্পর্দ্ধাও এপর্য্যন্ত স্ত্রীলোককে পুরুষের সমকক্ষ করিতে পারে নাই।

"প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে উত্থিত হইয়া বিভূষিতশরীরে রাজ-পথে সাধারণকে দর্শন দাও ত?" রাজাকে মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে, ভক্তি আকর্ষণ করিতে হইবে, অথচ প্রত্যক্ষভাবে প্রজার অবস্থা জানিতে হইবে। ইংলণ্ডে রাজকার্য্য বিভক্ত হইয়া মর্য্যাদা-রক্ষা সম্রাটের এবং অবস্থা জানা প্রধান মন্ত্রীর কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

"তোমার কর্ম্মচারীরা নিঃশঙ্ক ভাবে নিকটে উপস্থিত হয় না ত? অথবা তোমার চক্ষুর অন্তরালে থাকে না ত? এক দুইয়ের মধ্যম অবস্থাই শ্রেয়।" যাহাদের সহিত সর্ব্বদা কাজ, তাহারা নিকটে আসিবে অথচ ভয় করিবে—এ নীতি কেবল রাজার নহে, প্রভুমাত্রেরই অবলম্বনীয়। ভৃত্যের কার্য্য

পর্য্যবেক্ষণে বিশেষ হিসাব চাই; ভৃত্য যেন দৃষ্টি অতিক্রম না করিতে পারে, কিন্তু প্রভু সময় বিশেষে তাহার কার্য্য দেখিয়াও দেখিবেন না।

"তোমার দুর্গগুলি ধন, ধান্য, অস্ত্র, জল, যন্ত্র, শিল্পী ও ধনুর্দ্ধর দ্বারা পূর্ণ আছে ত?" যুদ্ধ না করিলেও রাজাকে প্রত্যহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়, ইহা সনাতন রাজনীতি।

"তোমার আয় অপেক্ষা ব্যয় অল্প ত? অপাত্রে দান করিয়া কোষ শূন্য করিতেছ না ত?" সম্রাট্ অশোক যে ভাবে বৃদ্ধ বয়সে দান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, রাজনীতি তাহার বিরোধী।

"শাস্ত্রকুশল বিচারক কর্তৃক যাহার দোষ স্থিরীকৃত না হয়, এরূপ লোক লোভ-বশতঃ হত হয় না ত?" রাজার যথেচ্ছাচারে বাধা দিবার জন্য স্মৃতিশাস্ত্রে বহু ব্যবস্থা আছে। এটাও সেইরূপ একটা ব্যবস্থা। প্রাচীন ভারতে বিচার কার্য্যের যথা-সম্ভব সুবিধান ছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তি শাসন বিভাগীয় কর্ম্মচারীর যথেচ্ছ দণ্ডের পাত্র ছিল না।

"উপযুক্ত কারণে ধৃত ও জিজ্ঞাসিত চোরকে ধন-লোভে মুক্তি দেওয়া হয় না ত?" পুলিশ চিরকালই সমান। তাহার কার্য্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টির আবশ্যকতা, বোধ হয়, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই, স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।

"ধনী ও নির্ধনের মধ্যে বিবাদ বাধিলে তোমার নীতিজ্ঞ অমাত্যগণ অর্থলিপ্সাশূন্য হইয়া বিচার করেন ত?" টীকা নিষ্প্রয়োজন।

"মিথ্যা মোকদ্দমায় দণ্ডিত ব্যক্তির অশ্রু, সুখভোগেচ্ছু শাসনকর্তার পুত্র ও পশুকুল বিনষ্ট করে।" এ সেই প্রতীচ্য ব্যবহারনীতি, দোষী খালাস পায় পাউক, নির্দ্দোষ ব্যক্তি যেন দণ্ড না পায়। শাসনকর্ত্তা কর্ত্তব্যের দিকে দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থ বা আয়াসের জন্য অবিচার করিয়া বসিবেন না।

"তুমি সুখের লোভে অর্থদ্বারা ধর্ম্মকে, এবং ধর্ম্মদ্বারা অর্থকে, অথবা কাম দ্বারা উভয়কে বাধা দিতেছ না ত? ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে বিভক্ত করিয়া যথাকালে তিনেরই সেবা করিতেছ ত?" রাজাদিগের সাধারণ মানবের আদর্শ হওয়া চাই—এক দেশ-সেবা হইলে চলিবে না; ধর্ম্ম ও অর্থের সেবা ত চাই, ন্যায্যভাবে কামের সেবাও তাঁহার বিষয় বুদ্ধি স্থির রাখার জন্য প্রয়োজন। মিশর দেশীয় এক রাজা বলিতেন "মধ্যে মধ্যে জ্যা খুলিয়া না দিলে ধনুক অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।"

"নাস্তিকতা, মিথ্যাকথা, ক্রোধ, অসাবধানতা, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানিগণের সহিত সাক্ষাৎ না করা, আলস্য, ইন্দ্রিয়পরবশতা, রাজ্যের আবশ্যক বিষয়ে একাকী চিন্তা, অব্যবসায়ী লোকের সহিত মন্ত্রণা, স্থিরীকৃত কার্য্য আরম্ভ না করা, মন্ত্রণা ভঙ্গ, মাঙ্গল্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান, নানা দিকে স্থিত শত্রুর বিরুদ্ধে এককালে উত্থান, এই চতুর্দ্দশ রাজদোষ বর্জ্জন করিতেছ ত?" ইহার প্রত্যেক কথায় অমূল্য উপদেশ নিহিত।

তারপর নানাবিধ দোষ ও গুণের উল্লেখ করিয়া রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তুমি এগুলি জান ত?" এই উপলক্ষে আমরা পঞ্চবিধ দুর্গ, বিবিধ বর্গ, বিবিধ বিদ্যা, বিবিধ দৈব ও পার্থিব উপদ্রব, এবং বিবিধ মানবপ্রকৃতির উল্লেখ দেখি। কিরূপ লোকের

সহিত সন্ধি না করিয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, মন্ত্রীর গুণ ও সংখ্যা কেমন হইবে, ইত্যাদি বিবিধ আবশ্যক ও অনাবশ্যক উপদেশ দেখিতে পাই। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারত-ভূমিতে রাজনীতি চর্চ্চা কত উন্নত স্তরে আরোহণ করিয়াছিল!

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

ভারত ধর্ম্মমণ্ডলের আবেদন পত্র।

ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডল বহুবিধ হিতকর কার্য্য করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু যে ভাবে ইহার কার্য্যপ্রণালী পরিচালিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে কোন কোন বিষয়ে কিছু উপকার সাধিত হইয়া থাকিলেও, বিবেচক সুধীবর্গ কখনই ইহার সর্ব্ববিধ কার্য্যপ্রণালীর অনুমোদন করিতে পারিবেন না। ধর্ম্মমণ্ডলের মুখপত্র "ধর্ম্ম-প্রচারক" যেভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে এবং ইহাতে যে শ্রেণীর প্রবন্ধ স্থান পাইতেছে, তদ্দ্বারা জনসংঘের মধ্যে ঐক্য এবং সখ্য সংস্থাপনের জন্য চেষ্টার পরিবর্ত্তে, ভেদনীতির বীজই উপ্ত হইতেছে। ইহার অনেক প্রবন্ধই সঙ্কীর্ণতা ও তরলচিন্তা দ্বারা পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ, যে ভাবে প্রবন্ধগুলি ব্যক্তি বা সমাজবিশেষকে আক্রমণ করিয়া থাকে এবং কটূক্তি প্রয়োগ করে, তাহা অত্যন্ত আপত্তিজনক।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই ভারতধর্ম্ম-মণ্ডলের একটী কীর্ত্তি-কাহিনী পাঠকবর্গকে উপহার দিব। ইহা হইতেই সুধীসমাজ বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতধর্ম্মমণ্ডল কি প্রকারে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ধর্ম্মমহামণ্ডলের কতিপয় জন-লোক, ভারতবর্ষীয় সমগ্র হিন্দুপ্রজাগণের পক্ষ হইতে, বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট শ্রীযুক্ত সার্ এণ্ড্রু ফ্রেজার মহোদয়ের সমীপে একখানি দীর্ঘ আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। যদি এই আবেদন-পত্র সাধারণ হিন্দুপ্রজামণ্ডলীর নামে প্রেরিত না হইত, তাহা হইলে আমাদের তৎসম্বন্ধে কোনই বক্তব্য থাকিত না। কিন্তু আবেদনকারীগণ আপনাদের সংখ্যার অল্পতা উপলব্ধি করিয়া, সংখ্যাগত এই অল্পতা চাপা দিয়া, সমগ্র হিন্দু প্রজাবর্গের নামে ঐ আবেদন রাজসমীপে দাখিল করিয়াছেন। শ্রীধর্ম্মমণ্ডলের নেতৃগণের পক্ষে এরূপ করা নিতান্ত অবৈধ হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। নিতান্ত গোঁড়ামি এবং আবদারপূর্ণ এই আবেদনপত্রখানি ন্যায়পরায়ণ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যদি উপেক্ষিতও হয়, তথাপি প্রজামণ্ডলীর পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক।

উক্ত আবেদনপত্রে গভর্ণমেণ্টের দুইটী কার্য্যের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। (১) মাননীয় সর্ব্বজনপ্রিয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়কে "সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষক" সভার সভাপতি নিয়োগ। (২) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহোদয়কে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ প্রদান।

মহামণ্ডলের আপত্তি সংক্ষেপতঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ সরস্বতী মহাশয়ের সম্বন্ধে এই :—

(১) আশুবাবু সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ নহেন। (২) তিনি তাঁহার বাল-বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। এই দ্বিতীয় আপত্তি এইজন্য যে (ক) বিধবা-বিবাহ ধর্ম্ম শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও প্রচলিত রীতিবিরুদ্ধ; তিনি এই কার্য্যদ্বারা অধ্যাপকমণ্ডলীর অপ্রিয় হইয়াছেন। (খ) এই সভাপতিত্ব একটা 'সামাজিক' ব্যাপার, সুতরাং আশুবাবু দ্বারা তাহা সাধিত হইতে পারিবে না। অতএব আশুবাবুর নিয়োগে স্বধর্ম্মনিরত হিন্দুদিগের মনে একটা উৎকট ভীতি উৎপাদন করিয়াছে এবং পণ্ডিতমণ্ডলী মনে করিতেছেন যে আশু বাবুর হস্তে তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যের সম্মান হইবে না ইত্যাদি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্বন্ধে ধর্ম্মমণ্ডলের আপত্তি এইরূপঃ—

(১) সতীশবাবু অতি অল্পবয়স্ক, তাঁহার বয়স প্রায় ৩৮। (২) রাজকার্য্যেও তিনি উচ্চপদস্থ নহেন। (৩) তাঁহার সংস্কৃতভাষায় পাণ্ডিত্য কিছুই নাই বলিলেও চলে। (৪) প্রধান কথা, তিনি আচার্য্য বা 'গ্রহ-বিপ্র', অতএব হিন্দুসমাজে সম্মানার্হ নহেন। অতএব—

মহামণ্ডল ছোটলাটকে বর্ত্তমান অশান্তির ভয় দেখাইয়া বলিতেছেন যে, ডাক্তার আশুতোষবাবুকে উপাধি পরীক্ষক সভার সভাপতি পদ হইতে অপসারিত করিয়া, অপর কোন সম্ভ্রান্ত সংস্কৃতজ্ঞ ভারতবাসীর নিয়োগ হউক এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ না করিয়া, এ দেশীয়গণের বিশ্বাসপাত্র একজন সৎকুলজ ব্রাহ্মণসন্তানকে উক্তপদে নিযুক্ত করা হউক। প্রথমোক্ত পদে শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরকে নিযুক্ত করিলেই ভাল হয়।

যদি এই আবেদনপত্র সংবাদপত্রে মুদ্রিত না হইত, তাহা হইলে আমরা কদাপি বিশ্বাস করিতে পারিতাম না যে, এই বিংশশতাব্দীতে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি গভর্ণমেণ্টের নিকটে এরূপ অসার যুক্তিপূর্ণ, গোঁড়ামী-সর্ব্বস্ব আবদার করিতে পারেন!! ভারত-মণ্ডল কিন্তু তাহাই করিয়াছেন। হায়! যখন "ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল" স্থাপিত হইবার সংবাদ আমরা পাইয়াছিলাম, তখন আমাদের মনে কত আশার কথাই উদিত হইয়াছিল! ভাবিয়াছিলাম—বুঝি বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের কলহে সতত ছিন্ন-ভিন্ন ভারত একতাসূত্রে বদ্ধ হইবে; বুঝি ভারতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম-সম্প্রদায়সমূহ উদার, বিশাল, পবিত্র-শান্তিময় এক মহাধর্ম্মে একীভূত হইবে! কিন্তু হায়! আমরা ধর্ম্মমণ্ডলের ক্রিয়া-কলাপের উপরে লক্ষ্য রাখিয়া দেখিয়াছি যে, উহার নাম ব্যর্থ হইয়াছে।

কিন্তু আমরা এ প্রবন্ধে ধর্ম্মমণ্ডলের অন্যান্য কার্য্যের আলোচনা করিব না। এবার মহামণ্ডল যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা দুর্লভ!! আমাদের ভয় হইতেছে, শাসক-সম্প্রদায়, রাজার জাতি, ইংরাজগভর্ণমেণ্ট—এই আবেদনে আমাদিগকে কতই না অবজ্ঞা করিতেছেন!!

মহামণ্ডল আপত্তি করিতেছেন,—বরং ইংরেজ ডাইরেক্টরকে সংস্কৃত পরীক্ষক সভার সভাপতি কর, তথাপি আশুবাবুকে করিও না! আশুবাবুর অপরাধ কি? প্রথম অপ-

রাধ—তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ!! দ্বিতীয় অপরাধ—তিনি নিজ বালিকা বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন!! তৃতীয় অপরাধ—তাঁহার হস্তে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সম্মান ও আদর থাকিবে না!! ইংরেজ ডাইরেক্টর নিশ্চয়ই সংস্কৃতে অভিজ্ঞ, এবং তিনি কদাপি নিজ বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে পারেন না!! তাঁহার দ্বারা সামাজিকতাও বেশ রক্ষিত হইবে!! হায়! হায়! কি অস্বাভাবিক অন্ধতা! যে গোঁড়ামী মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছে, যে গোঁড়ামী ক্যাথলিক ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাচার্য্য রাজ-রাজেশ্বর পোপের প্রতিষ্ঠা বিলুপ্ত করিয়াছে,—সেই সর্ব্বশক্তিমান্ গোঁড়ামী যে কয়জন 'স্বধর্ম্মনিষ্ঠ' হিন্দুসন্তানকে অন্ধ করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আবেদনকারিগণের মধ্যে কেহ কি আশুবাবুর সংস্কৃত-বিদ্যার পরীক্ষা লইয়াছেন? তাঁহাকে "সরস্বতী" উপাধি কে দিয়াছিল? "নবদ্বীপ বিদগ্ধজননী সভা" কি বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতবর্গের সভা নহে? ঐ সভার সভাসদগণ যে আশুবাবুকে তাঁহাদিগের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই ত প্রমাণ হইতেছে যে, আশুবাবু সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। আসল কথা এই যে, আশুবাবু হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া, শাস্ত্রের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য, প্রচলিত কুসংস্কারের ও শাস্ত্রানভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন;—তাই তিনি আজ ধর্ম্মমণ্ডলের চক্ষে অনুপযুক্ত!! বালিকা বিধবার বিবাহ অশাস্ত্রীয়,—ইহা সত্য কথা নহে। মহর্ষি মনু, বশিষ্ঠ, পরাশর প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় বরেণ্য আচার্য্যগণ যে বিবাহকে বৈধ বলিয়া গিয়াছেন, তাহাকে কাহার সাধ্য যে অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রমাণ করিবে? আশুবাবুর মত সচ্চরিত্র, বিদ্বান্, বিদ্যানুরাগী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ কয়জন ব্রাহ্মণ বঙ্গে সুলভ? যিনি সমগ্র বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগের কর্ণধাররূপে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সাদরে নিয়োজিত, তিনি সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষক সভার সভাপতি হইবার যোগ্য নহেন, ইহা অপেক্ষা হাস্যাস্পদ সিদ্ধান্ত আর কি হইতে পারে? বর্ত্তমান বর্ষে সংস্কৃত পরীক্ষকদিগের যে তালিকা বাহির হইয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, আশুবাবুর হস্তে বঙ্গদেশের সুশিক্ষিত অধ্যাপকমণ্ডলী কতদূর সম্মান ও আদর প্রাপ্ত হইয়াছেন। ধর্ম্মমণ্ডল আর এক আপত্তি করিয়াছেন যে,—অধ্যাপকগণের মধ্যে কেহ কেহ আশুবাবুর কন্যার বিবাহে প্রতিকূল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া, আশুবাবু তাঁহাদিগের বা তাঁহাদের ছাত্রগণের প্রতি অবিচার করিবেন!! এ প্রকার আপত্তি দেখিয়া লোকে ধর্ম্মমণ্ডলকে কি ঈর্ষাবুদ্ধি-প্রণোদিত বলিয়া মনে করিবে না? আশুবাবু হাইকোর্টের জজ। ঐরূপ অধ্যাপকদিগের কাহারও কোন মোকর্দ্দমা হাইকোর্টে গেলে, তাঁহারা বোধ হয় আপত্তি তুলিবেন যে, তাঁহাদের মোকর্দ্দমার বিচার হাইকোর্টে হইলে নিতান্ত অবিচার হইবে!!! আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি যে, বিগতবর্ষে যে দুই একজন অধ্যাপক প্রকাশ্যে আশুবাবুর প্রতিকূলে মত দিয়াছিলেন; বর্ত্তমান বর্ষে আশু বাবু তাঁহাদিগকেই পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। মহামণ্ডলের এই সকল অকিঞ্চিৎকর আপত্তির মূলে ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা বর্ত্তমান আছে—এইরূপ সন্দেহই স্বতঃ মনে উদিত হয়।

সতীশবাবুর নিয়োগ সম্বন্ধে আপত্তি দেখুন:—

সতীশ বাবু অল্পবয়স্ক, সুতরাং তিনি

অযোগ্য। লর্ড কার্জ্জন তদপেক্ষা অল্পবয়সে ভারত সাম্রাজ্যের রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসমুদ্রহিমাচল এই মহাদেশ শাসন করিতে সমর্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন,—তখন মহামণ্ডল কোথায় ছিলেন? যে দেশের শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন—

"ন হায়নৈ র্ন পলিতৈ র্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ সনো মহান্।"
১৫৪।২।মনু।

"বয়সে, শুক্লকেশে, ধনে কিম্বা সম্বন্ধে মহান্ বা বড় হওয়া যায় না, যিনি জ্ঞানবান্ ও বিদ্বান্ তিনিই মহান্।"—সেই দেশে এখন কথা উঠিতেছে যে, সতীশ বাবুর মোট ৩৮ বৎসর বয়স, তাঁহাকে কি অধ্যক্ষ পদ দেওয়া যায়! মহামণ্ডলের অপর যুক্তি,—সতীশ বাবু সংস্কৃত মোটেই জানেন না! আবেদনকারিগণ যদি নাম-স্বাক্ষর করিতেন, তাহা হইলে বুঝা যাইত, যাঁহারা একথা বলিতেছেন, তাঁহাদের সে বিষয়ে আদৌ অধিকার আছে কিনা! সংস্কৃত ও পালি ভাষায় নিতান্ত নিপুণ এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষার বিদ্যা সমূহে নিষ্ণাত মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র সংস্কৃত জানেন না,একথা কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি বলিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের ধারণা ছিল না। ডাক্তার বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ বলায় তাঁহার অবমাননা হয় নাই;—বিশ্ববিদ্যালয়, গবর্ণমেণ্ট এবং স্বয়ং ভারতী দেবী অবমানিত হইয়াছেন। ইহাতে কেবল যে আবেদনকারিগণ পাপভাজন হইয়াছেন,তাহা নহে, আমরাও পাপের অংশভাক্ হইয়াছি। কবি বলিয়াছেন, "মহান্ ব্যক্তিকে যে নিন্দা করে, সেই কেবল পাপভাক্ নহে, যে শুনে সেও পাপের ভাগী হয়।" সর্ব্বশেষে ঘোরতর আপত্তি সতীশ বাবুর "জাত" লইয়া। তিনি গ্রহ-বিপ্র—সুতরাং অসম্মান-ভাজন! ইংরাজ-রাজ্যে আমরা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে রাজপদ সমূহের প্রার্থী,—রাজাও সেই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। মহামণ্ডলও জানেন যে, এই পদে একজন ইংরাজ ও আর একজন কায়স্থ বহু কাল অধ্যক্ষ ছিলেন। মহামণ্ডলের মতে ইংরাজ "ম্লেচ্ছ" ও কায়স্থ "শূদ্রাধম" *। যে সকল ব্রাহ্মণ, শূদ্র বা ম্লেচ্ছের নিকট অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তার্হ। তথাপি সে সময়ে কোন আপত্তি হয় নাই। মহামণ্ডলের চক্ষে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও ত "হিন্দু" নহেন! তাঁহাদের সময়ে কেহ কোন আপত্তি করেন নাই। আর আজ এই আপত্তি কেন? মহামণ্ডলের প্রার্থনা—এক জন চরিত্রবান্, দেশীয়-বিদেশীয় শিক্ষাসম্পন্ন, বিশ্বাসভাজন, সৎকুলজ ব্রাহ্মণ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হউন্। আমরা জিজ্ঞাসা করি, সতীশ বাবুর কি এ সকল গুণ নাই? মনুর মতে, চিকিৎসক, গ্রাম্যযাজক, শূদ্রযাজক, বাণিজ্যজীবী, রাজকর্ম্মচারী, সেবা-বৃত্তিপরায়ণ, নিরগ্নিক, বেদজ্ঞানবিহীন, কুসীদজীবী, শূদ্রাধ্যাপক, মদ্যপায়ী প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ এত নিন্দনীয় ও নিকৃষ্ট যে, তাঁহারা ব্রাহ্মণ পদবাচ্যই হইতে পারেন না। নক্ষত্রজীবী ব্রাহ্মণ বা গ্রহবিপ্রও এই শ্রেণীর। যদি ছোটলাট বাহাদুর মনুসংহিতা হাতে লইয়া ব্রাহ্মণ নির্ব্বাচন করিতে বহির্গত হন, আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, 'শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডল' তাঁহাকে একজনও ব্রাহ্মণ দেখা-

---

* এই সম্বন্ধে মহামণ্ডলের মুখপত্র "ধর্ম্মপ্রচারকে" বিস্তর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

হয় দিতে পারিবেন না। শাস্ত্রীয় জলগোত্রজাত ব্রাহ্মণ* আজ কোথায়? কুশীজাত ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশজাত কৌশিক, জম্বুকীজাত জাম্বুক, কৈবর্ত্ত কন্যাজ ব্যাসদেব, বিদ্যাবলে যে ভারতে ঋষিত্বলাভ করিয়া অদ্যাপি পূজিত হইয়া আসিতেছেন, সেই ভারতে আজ মহামণ্ডল "জাত" লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছেন!! হায়! হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষাগুরুর শূন্য আসন মহামণ্ডল এইরূপেই পূরণ করিবেন!! ভগবন্! ভারতীয় হিন্দুপ্রজাকে মহামণ্ডলের ন্যায় বন্ধুর হস্ত হইতে রক্ষা কর!!

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

মানব সমাজ। (৩)

সমাজ রক্ষা ও তাহার উন্নতিবিধান করিতে হইলে সমাজের সর্ব্ববিধ কর্ম্ম সমাজের মধ্য হইতেই হওয়া আবশ্যক। অপরে কর্ম্ম করিয়া দিলে, ব্যক্তির পক্ষেও যেমন, সমাজের পক্ষেও তেমনি, দিন দিন অলসতা বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে জড়তা আসিয়া উপস্থিত হয়। এ অবস্থায় সমাজ ক্রমেই অধঃপাতে চলিয়া যায়। সমাজের কর্ম্ম সমাজের মধ্য হইতেই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কর্ম্ম করিবে কে? সমাজস্থ জনগণ কর্ম্ম করিবার যোগ্য হওয়া চাই। তাহারা দেহে ও মনে, সংকল্পে ও শিক্ষায়, উদ্যোগে ও অধ্যবসায়ে কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত হওয়া চাই। এ সকল কিসে হয়, তাহাই বিবেচনা করা আবশ্যক। ইচ্ছা করিলেই ত যোগ্য হওয়া যায় না; আর সকলের ইচ্ছাও হয় না। ব্যক্তি আজিকার পদার্থ নহে। যে পুংকোষ ও স্ত্রীকোষ সম্মিলিত হইয়া বংশের পর বংশ গঠন করিতেছে, তাহা চিরাতীত কাল হইতে বংশানুক্রমের নিয়ম অনুসারেই স্বকর্ম্ম সাধন করিয়া আসিতেছে।† এ নিয়ম সাধারণতঃ পরিবর্ত্তনহীন।

এস্থলে প্রথমে দেহ গঠনের কথা বিবেচনা করা যাউক; তাহা হইলে মনের বিষয় সহজে বুঝা যাইবে। আর দেহের উন্নতি অবনতির সহিত মনের উন্নতি অবনতি যেরূপ ভাবে জড়িত, তাহাতে দেহের কথাই অগ্রে বিবেচনা করা সঙ্গত।‡ দেহ শুক্র শোণিতের মিশ্রণে জাত। পুংকোষ ও স্ত্রীকোষ অতীব ক্ষুদ্র হইলেও এক একটী মহা ভাণ্ডার। উহাদিগের প্রত্যেক অণুতে কত বংশের কত উপাদান সঞ্চিত রহিয়াছে! উহারা কোষমধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে; স্ত্রী ও পুংকোষের অণু সকল পরস্পর মিশ্রিত হইবার সময়েও সে স্থানের বড় বেশি ইতর বিশেষ হয় না। পুংকোষের কতিপয় অণু, স্ত্রীকোষের কতিপয় অণুর সহিত মিশ্রিত হয়; উভয় কোষেরই অবশিষ্ট অণু সকল মিশ্রিত নাও হইতে পারে। যে সকল অণু পরস্পর মিশ্রিত হইতে পারে, তাহারাও ভাঙ্গিয়া গড়িয়া যে কিরূপ পরিণতি (matura-

---

* বজ্র সূচীপোনিষদে ব্রাহ্মণের লক্ষণ দেখুন।

† The molecules of the reproductive protoplasm grow and increase without altering their peculiar nature and without modifying the hereditary tendencies derived from the parents.

Wiesmann's Heredity vol I. p. 74.

‡ Mental and physical degeneration rather go hand in hand. Ibid Vol. II, p. 22.

At present our race is not improving physically, and if not physically it cannot eventually improve mentally.

Rentoul's Race culture p. 8.

tion) প্রাপ্ত হইবে, তাহা কিছুই বলা যায় না। কিন্তু যেরূপ পরিণতিই প্রাপ্ত হউক, পুংকোষের অণু সকল ও স্ত্রী-কোষের অণু সকল আপন আপন শক্তি ও প্রবণতা সকল সময় প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। অনেক সময় উভয় কোষ মিশ্রিত-পিণ্ডে ঐ সকল শক্তি ও প্রবণতা প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়া যায়। স্ত্রী-কোষ ও পুংকোষ মিশ্রিত হইবার সময় ঐ কোষদ্বয়ের অণু সকল যে শক্তি ও প্রবণতা লইয়া আসিয়াছিল, তাহার কিয়দংশ ভ্রূণ দেহে প্রকাশ হয়, অপরাংশ গুপ্তভাবে রহিয়া যায়। এই কার্য্য কোষদ্বয়ের মিশ্রণ সময় হইতেই আরম্ভ হয়। যুক্তকোষের অণু সকল কি এক অনির্ব্বচনীয় শক্তিতে শতধা সহস্রধা বিভক্ত হইতে হইতে অবশেষে তিনটী স্তর গঠিত করিয়া লয়।* তাহা হইতেই অপত্য-দেহ পূর্ণাকারে রচিত হয়।

ইহাই দেহ গঠনের প্রক্রিয়া। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শুক্র-শোণিত-কোষ সকল বংশপরম্পরা ক্রমে যে শক্তি ও প্রবণতা লইয়া মিশ্রিত হইয়াছিল, অপত্য তাহার অধিক কিছুই প্রাপ্ত হইতে পারে না; আর তাহার মধ্যে যে সকল শক্তি ও প্রবণতা প্রচ্ছন্ন রহিয়া গেল, অপত্যের জীবনে সে সকল প্রকাশ লাভ হইতে পারে। অপত্য অনুকূল অবস্থায় পতিত হইলে সে সকল প্রকাশ হওয়া কথঞ্চিৎ সম্ভব, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় প্রচ্ছন্ন শক্তিগুলি ত প্রকাশ হইবেই না, অপর শক্তিগুলিও পূর্ণরূপে বিকশিত হইবার বাধা পাইতে পারে। স্ত্রী-পুংকোষ মধ্যে যে উপকরণ নাই, তাহা কেহই দিতে পারেন না; যাহা আছে, তাহা প্রকাশ হইতে পারে, না হইতেও পারে।*

এক্ষণে সমাজের প্রয়োজনোপযোগী কর্ম্মের কথা বিবেচনা করুন। অপত্য বংশানুক্রম অনুসারে যে সকল শক্তি ও প্রবণতা লাভ করিয়াছে, তদুপযুক্ত কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্ম সে কেমন করিয়া করিবে? আমি এমন বলিতেছি না যে পুরুষ পরম্পরায় একই কর্ম্ম করিতে হইবে। পূর্ব্ব পুরুষগণ যেরূপ শক্তির সহায়তায় যেরূপ কর্ম্ম করিতেন, পরবর্ত্তিগণ তদ্রূপ শক্তির সহায়তায় অন্য কর্ম্মও করিতে পারেন। কিন্তু অপত্য বংশানুক্রমে যে শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, সে শক্তি দ্বারা যাহা সিদ্ধ হইবার নহে, তাহা অপত্য করিতেই পারে না। তাহার দেহ ও মন যে উপাদান, যে শক্তি ও প্রবণতা লাভ করিয়াছে, তাহা দ্বারা যে কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে, সে সেই কর্ম্মেরই উপযোগী; অন্য কর্ম্মের উপযোগী নহে। অন্য কর্ম্ম শিক্ষা দিলেও সে শিক্ষায় সুফল হইবে না, বরং কুফলও হইতে পারে।† কারণ তাহার দেহে যদি অসৎ কর্ম্মের শক্তি ও প্রবণতা প্রচ্ছন্ন থাকে, তবে তাহা শিক্ষা ও সংসর্গ-দ্বারা বিকশিত হইয়া সমাজের অনিষ্টজনক হওয়ার সম্ভব। এই নিমিত্তই বংশানুক্রমের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সক-

* Foster and Balfour. Embryology, 2nd Edition. 323, P. P. and 271—273.

* We have no experience of any means by which transmission may be made to deviate, nor from the moment of fertilization can teaching or hygiene or extortation pick out the particles of evil in that zygote, or put in one particle of good.
Thomsons' Heredity, A 507.

† The so called educating of the mentally backward child in one of the most difficult and one of the most *dangerous* with which we are called upon to deal. With them it is not a question of curing their mental defect, because theirs defect is congenital—born with them * * * It is not honest for us to gull the public into believing that these can be really educated. Race Culture, P. P. 50-51.

লকেই একটা বাঁধা নিয়মে নানারূপ শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা অতীব অসঙ্গত। বালক বালিকার প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমাজের প্রয়োজনোপযোগী শিক্ষা দেওয়াই সঙ্গত। এ নিয়মের অন্যথায় বর্ত্তমান সময়ে যে কুফল ফলিতেছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তথাপিও বংশানুক্রমের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া জনসাধারণের মধ্যে একই শিক্ষা সমান ভাবে বিস্তার করিবার একটা ধুয়া উঠিয়াছে। ইহা বিজ্ঞানানুমোদিত নহে। প্রাচীন হিন্দুগণও ইহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

তবেই দেখা যাইতেছে যে,সমাজের উপযোগী কর্ম্ম সকলের নিকট হইতে আশা করা যায় না। শক্তি ও প্রবণতা অনুসারে সমাজের বিভিন্ন জনগণ বিভিন্ন কর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, নচেৎ কর্ম্ম সুসিদ্ধ হইবে না। সুতরাং সমাজ ক্রমেই অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে হয় ত প্রয়োজনীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবেই না, অথবা অনুষ্ঠিত হইয়াও পরিত্যক্ত হইবে, নচেৎ কার্য্য অসিদ্ধ হইয়া যাইবে। এ স্থলে উপায় কি? সমাজস্থ জনগণ উপযুক্ত উপাদানে গঠিত না হইলে, উপযুক্ত শক্তি অথবা প্রবণতা লাভ করিতে পারেন না। উপাদানের অর্থই বংশানুক্রমিক উপাদান। যে স্থলে কর্ম্মোপযোগী মানুষের অভাব সে স্থলে মানুষ গড়িবার উপায় অবলম্বন করাই উচিত। মানুষ গড়িব কেমন করিয়া? মানুষ ত কাদা দিয়া হাতে গড়িয়া লওয়া যায় না। স্ত্রী-পুরুষ দ্বারাই মানুষ গঠিত হয়; সুতরাং এমন স্ত্রী, এমন পুরুষ একত্রিত করিব, যাহারা বংশ পরম্পরায় ঈপ্সিত কর্ম্মের উপাদান দ্বারা গঠিত হইয়া আসিতেছে। এ স্থলে নিম্ন জীবের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। খেঁকী কুকুরকে সাহসী করিব, সুতরাং ডাল্‌কুত্তার সহিত তাহার সংযোগ না ঘটাইয়া উপায় কি? তাহা হইলে বাচ্চা সাহসী হইবার আশা করা যায়। এ প্রণালী এত সহজ ও পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত নহে যে, ইহা হইতে সর্ব্বত্রই সুফল হইবে। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে যে, বিবাহ দিবার সময় বরকন্যার বংশগত দোষগুণ, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া কার্য্য করিলে অবশ্যই সুফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। অযোগ্যের বংশে যোগ্য পুত্র লাভ করিবার অন্য উপায় নাই বলিলেই হয়। মানুষ গড়িতে হইলে বিবাহবিধির উপর লক্ষ্য রাখা আবশ্যক; কারণ মানুষ গড়িবার অন্য উপায় নাই। কিন্তু যে সমাজে বিবাহক্ষেত্র অতীব সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে, যে সমাজে যোগ্য অযোগ্য ভাবিয়া কার্য্য করিবার অবসর নাই, সে সমাজকে পতিত অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার উপায়ও নাই। এ কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

বংশানুক্রমের ত্রিবিধ নিয়ম জানা গিয়াছে; মিশ্রিত, অমিশ্রিত এবং উভচিহ্নিত। * স্ত্রী ও পুংকোষের অণু সকল সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইয়া এরূপ ভাবে অপত্যের দেহ ও মন গঠিত করিতে পারে যে, উহাদিগের কোন লক্ষণই বুঝা যায় না। উভয়ের লক্ষণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া মিশিয়া যায়। এইরূপ হইলে মিশ্রিত † বংশানুক্রম বলে। অমিশ্রিত বংশানুক্রমের লক্ষণ এই যে স্ত্রী ও পুংকোষের অণু সকল মিশ্রিত হইলেও একের শক্তি ও প্রবণতা এতই প্রবল হয় যে, অপত্য-দেহে উহাই

* Blended exclusive and particulate.

† ইহা কালক্রমে আবার অমিশ্রিতে পরিণত হয়।

প্রকাশ পায়। অপরের শক্তি ও প্রবণতা লুপ্ত হইয়া থাকে। অপর যে স্থলে অপত্য দেহে স্ত্রী-পুংকোষের অণু সকল স্ব স্ব শক্তি ও প্রবণতা পৃথক পৃথক ভাবে প্রকাশিত করে, তাহাকে উভচিহ্নিত বলা যায়। এই ত্রিবিধ বংশানুক্রম অনুসারে অপত্য গঠিত হইয়া থাকে। স্ত্রী ও পুংকোষ পৃথক ভাবাপন্ন হইলে অর্থাৎ এক জাতীয় হইয়াও ভিন্ন দেশোদ্ভব অথবা বিভিন্ন জাতীয় হইলে, অনেক সময় অপত্য উভয় অপেক্ষাই হীন-শক্তি হইয়া থাকে। কখন বা অধিকতর শক্তি-শালীও হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থলে কি ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা বংশানুক্রমের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিবার আশা করা যায়। এইরূপে ঈপ্সিত শক্তি ও প্রবণতা যে বংশে সমধিক দৃষ্ট হয়, সেই সম্বন্ধের তাহাই উপযুক্ত ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে অপত্য ঈপ্সিত শক্তি ও প্রবণতা লাভ করিবার সম্ভব। কর্ম্ম বংশানুগত নহে, কর্ম্মের উপযোগী শক্তি ও প্রবণতাই বংশানুগত। কর্ম্মের উপযোগী উপাদানও বংশানুগত। তৎপ্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া বিবাহ-ক্ষেত্র ক্রমেই সংকীর্ণ করিলে সে সমাজের অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। এই নিমিত্তই এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, পতিত সমাজকে উন্নত করিতে হইলে জীবতত্ত্বের নিয়মানুসারে বিবাহ-ক্ষেত্রের প্রসার বিধান করা অত্যাবশ্যক।

সমাজ ভাবিতে গেলেই সমাজের জন-সংখ্যা ভাবিতে হয়। মানুষ না থাকিলে সমাজ কাহাকে লইয়া? জন্মের সংখ্যা, অন্ততঃ জীবিতের সংখ্যা প্রচুর থাকা চাই-ই, বরং কিছু অতিরিক্ত থাকা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। তাহা হইলে জীবন-সংগ্রামের প্রখরতা হেতু সমাজস্থ জনগণের বুদ্ধি ও শক্তি উৎকর্ষতা লাভ করে।* ঐ অতিরিক্ত জন-সংখ্যা উপযুক্ত সীমা অতিক্রম করিলে মরণজনি[illegible] হ্রাস উপস্থিত হয়; পুনরায় ঐ সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এইরূপে জন-সংখ্যা চক্রের ন্যায় উঠা পড়া করে। ইহাতে সমাজের উত্থান পতন হইতে পারে, কিন্তু ধ্বংস হয় না। ধ্বংসের কারণ আলোচনা করা অত্যাবশ্যক এবং ঐ কারণকে দূরে অব-স্থান করা অথবা তাহা হইতে দূরে অবস্থান করা সমাজের স্থায়ীত্বের পক্ষেই প্রয়োজনীয়। সমাজধ্বংসের সর্ব্ব প্রধান কারণ জনন-শক্তির হীনতা এবং অকাল মৃত্যু। জনন-শক্তির হীনতা ক্রমে বন্ধ্যত্ব আনিয়া উপস্থিত করে। অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ পীড়া; আনু-ষঙ্গিক কারণ বাল্য বিবাহ, খাদ্যের অসদ্ভাব ইত্যাদি। অকাল-মৃত্যু মধ্যে অতিরিক্ত শিশু মরণ বিশেষ আশঙ্কার বিষয়। এক্ষণে এই সকলকে যথাক্রমে আলোচনা করিব।

মানব বহু পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে, কিন্তু চিরাগত আচার ব্যবহার ও প্রথা-পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে না। এ পরি-বর্ত্তন সহজেই জনন-শক্তির হীনতা উৎপাদন করে। যদিও কোন পরিবর্ত্তন জনন-শক্তি বৃদ্ধিকারক, কিন্তু এমন অনেক পরিবর্ত্তন আছে, যাহাতে বন্ধ্যাত্ব আনয়ন করে।† ডারউইন্ বলেন—"অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত জনন-শক্তির যেরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়, বিশেষতঃ বানর শ্রেণীর মধ্যে এই পরিবর্ত্তনের ক্রিয়া যেরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাতে প্রথমে মানবও যে অবস্থার পরিবর্ত্তন বশতঃ বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইত, সেবিষয়ে সন্দেহ করা যায় না।" এই মহাত্মা

* The Evolution of sex, P. 249

† Descent of man, P. 293-94.

অন্যত্র বলিয়াছেন যে, জাতীয় বিলোপের কারণ অনেক স্থলেই বন্ধ্যাত্ব ও পীড়া, বিশেষতঃ শিশুদিগের পীড়া। ইহা আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হইতেই জাত হয়। সে পরিবর্ত্তন সাক্ষাৎ স্বরূপে অনিষ্টজনক না হইলেও উহার ফল অতীব মারাত্মক। * ইহা ব্যতীত, বংশগত পীড়া অথবা দুর্ব্বলতাও জনন-শক্তির হীনতা উপস্থিত করিতে পারে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জনন-শক্তির হানি করে। পীড়া এবং ব্যক্তিগত দুরাচার বন্ধ্যাত্বের এবং অকাল মৃত্যুর অন্যতর কারণ। তারপর আর এক কথা। জনন-হীনতা অথবা বন্ধ্যাত্ব অনেক সময় ব্যবসায়ের উপরও নির্ভর করে। তীব্র উত্তেজনার বেগে, দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমে, দিগ্‌দেশে বিস্তৃত হইয়া বাণিজ্যাদি ব্যবসায় আনয়ন করিলে অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ব্যক্তিগত বন্ধ্যাত্ব ও জাতিগত জনন-হীনতা উৎপন্ন করিয়া থাকে। † জনন-হীনতার এসকল কারণ ব্যতীতও আর একটী কারণ আছে, তাহার নাম দাসত্ব। ইহাতে দেহের ও মনের এরূপ অবসন্নতা আনিতে পারে যে, জনন-যন্ত্র তাহা সহ্য করিতে সক্ষম হয় না। পরবশতায় অনেক ইতর জীবেরও বংশহানি হওয়া প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

* The most potent causes of extinction appear in many cases to be lessened fertility and ill health specially amongst children arising from changed conditions of life, notwithstanding that the new conditions may not be injurious in themselves. Ibid. p, 284.

† In the large cities of America "hustle hustle" is the cry of commerce and of commerce only * * * "hustle hustle" may allow a company to declare a 20 per cent divident and to rush up shares, but it steadily works for sterility and other forms of degeneracy. Race Culture, p. 82,

Many nations have fallen and disappeared when their commercial condition was at its zenith, P, 86.

বন্ধ্যাত্ব এবং অকাল-মৃত্যুর প্রধান কারণ সকল সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। ইহার মধ্যে কতিপয় কারণ নৈসর্গিক, অপর কারণ সামাজিক দুষ্ট বিধির এবং ব্যক্তিগত দুরাচারের ফল। এ সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে সমাজ চলিতে পারে, সে ক্রমেই উন্নত হয়; যে না পারে, সে সমাজ অবনত হইয়া পড়ে, এবং কালে লোপ হইয়া যায়। আচার ব্যবহারের আমূল পরিবর্ত্তন করা, কিছুতেই উচিত নহে। এই সাংঘাতিক কারণের গতি রোধ করা কঠিন নহে। বাল্য বিবাহ, ব্যক্তিগত দুরাচার—এ সকলও নিবৃত্ত করা সহজ; কিন্তু খাদ্যের অসদ্ভাব অথবা দাসত্ব, এ দুই কারণের প্রতিকার করা সহজ নহে। যাহা হউক, সমাজের প্রথম কথাই স্থায়ীত্ব। উপরে যে সকল প্রতিকূল কথা বলা হইল, তাহা ব্যতীতও স্থায়ীত্বের প্রতিকূল আর একটী বিশেষ গুরুতর কথা বিবেচনা করা উচিত। প্রত্যেক সমাজেই অন্ততঃ তিন চারিটী স্তর থাকে—উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন। নিম্ন শ্রেণী হইতে ক্রমে উচ্চ শ্রেণীতে, উচ্চ শ্রেণী হইতে ক্রমে নিম্ন শ্রেণীতে উঠা পড়া হওয়া চাই। সমাজস্থ জনগণ এইরূপে নিম্ন হইতে উচ্চে, উচ্চ হইতে নিম্ন স্তরে উঠা পড়া করিতে না পারিলে সে সমাজ জমিয়া যায়। তাহার জীবনী শক্তি থাকে না। যে জাতির জন-সংখ্যা প্রধানতঃ নিম্নস্তরেই সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ কতকগুলি দরিদ্র, রুগ্ন, অশিক্ষিত, চরিত্রহীন মানব লইয়া যে জাতি গঠিত, সে জাতি অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে না। * এ কথা স্বীকার করি

* If, therefore, a nation has its population recruited not from those who are physically, mentally, financially able to have and to bring up the best stock, but from

যে, প্রত্যেক সমাজেরই অধিকাংশ লোক দরিদ্র, অশিক্ষিত থাকিবে, সন্দেহ নাই। শিক্ষিত, অর্থশালী, বলিষ্ঠ লোকের সংখ্যা সকল সমাজেই অল্প। ইহাঁরাই উচ্চ শ্রেণীর। নিম্ন শ্রেণীতে অর্থহীন, অশিক্ষিতের সংখ্যাই অধিক। কিন্তু আজি যাহারা অর্থহীন অশিক্ষিত, সুতরাং নিম্ন শ্রেণীর, কালি তাহারা অর্থশালী ও শিক্ষিত হইয়া উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইতে পারে, অন্ততঃ উন্নীত হইবার সম্ভাবনাও থাকে, এরূপ বিধান না থাকিলে কোন সমাজই জীবিত থাকিতে পারে না। যে রুগ্ন, অর্থহীন, মুর্খ·········সমাজে তাহার স্বার্থ কি? কোন রূপে তাহার নিজের কালটা কাটিয়া গেলেই হইল। সমাজে তাহার স্বার্থ কি? জীবনে তাহার সুখ কি? এ অবস্থা হইতে এক দিন উন্নত হইতে পারিবে, এমন আশাও যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহা দ্বারা সমাজের কি কাজ হইতে পারে? কিছুই না। উচ্চ শ্রেণীর মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ইহ সংসারের সুখ-ভোগ করুক; কিন্তু সমাজের অধিকাংশ লোক যদি সমাজ রক্ষার বিষয়ে চেষ্টাহীন হইল, তবে সে সমাজ অল্প কালেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে, কখনই উন্নত থাকিতে পারিবে না। যাহাতে সমাজের অধিকাংশ লোকের মনে সমাজ রক্ষার একটা স্পৃহা উৎপন্ন হয়, তাহা করিতেই হইবে। উন্নতি বিধান করা অল্পেরই কর্ম্ম। কিন্তু স্থির রাখিবার চেষ্টা অধিকাংশের থাকা চাই। যে সমাজে অল্প লোক অধিকাংশকে পদদলিত করিতেছে, সে সমাজ মুমূর্ষু অথবা মৃত।

এস্থলে আর একটী কথা বিবেচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ব্যক্তির ন্যায় সমাজেরও একটা আয়ুষ্কাল আছে। বিভিন্ন জীব-সমাজের আয়ুষ্কালও ভিন্ন ভিন্ন। এই কাল জাতিগত, ইহা প্রত্যেক জীবের পৃথক পৃথক। * প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন আয়ুষ্কাল প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্যক্তির পরমায়ু অল্প, কিন্তু জাতির পরমায়ু অত্যন্ত অধিক। তাহা লইলেও জাতীয় পরমায়ুরও সীমা আছে। ইহাই সমাজের পরমায়ু। রুগ্ন, অবসন্ন, অল্পায়ু ব্যক্তি সমাজের আয়ুক্ষয় করে। তেমনই চরিত্র-বলহীন, নৈতিক বলহীন ধর্ম্মে পতিত সমাজও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে না। যাহারা দেহে ও মনে রুগ্ন ও অবসন্ন, তাহারা অপত্য উৎপন্ন করিয়া ভবিষ্যৎ সমাজকেও তদ্রূপ অথবা ততোধিক রুগ্ন ও অবসন্ন করিতে না পারে, সেদিকে সমাজের দৃষ্টি থাকা চাই। সমাজস্থ জনগণ স্ব স্ব সদ্বুদ্ধিতেই এরূপ কার্য্য হইতে বিরত হয়, ভাল। নচেৎ সামাজিক বিধি নিষেধদ্বারা তাহাদিগের অপত্যোৎপাদন ক্ষমতা রহিত করা আবশ্যক। জনন-শক্তির বিনষ্ট করিতে কোনই গুরুতর যন্ত্রণা অথবা পীড়া দেওয়া আবশ্যক হয় না; জীবন ব্যাপারেরও বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত করিবার প্রয়োজন হয় না। জনন-শক্তি বিনষ্ট করিলেও ব্যক্তি যেমন সুখস্বচ্ছন্দে ছিল, তেমনই থাকিতে পারে। কেবল বংশ বৃদ্ধি

the poorer classes, what can be expected of the coming race? Nothing but evil.

* * No nation can survive if its population be recruited from slum-dom·

Ibid P. 106.

বাইশ বলদা তের ছাগলা,
দপের উর্দ্ধ না যায় হেংলা (কুকুর)
মরা গজা বিশা শ
শকুনি হাজার কাক পাঁচ শ।

ফলতঃ ভবিষ্যৎ সমাজকে অধঃপতিত করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু এ অধিকার বোধ হয় কাহারও নাই। ডাক্তার রেণ্টুল্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ মানবের সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি গুরুতর অত্যাচার না করিয়া ভবিষ্যৎ সমাজকে অবসাদের ও ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এইরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন।* ইহা বিবেচনা করিবার বিষয়, সন্দেহ নাই।

শ্রীশশধর রায়।

অদ্বৈতবাদ ও ঋগ্বেদের দেবতা।(২)

আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় বলিয়াছি যে, ঋগ্বেদে এক ব্রহ্ম-সত্বাই বিবিধ নামে ও বিবিধরূপে স্তুত হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমরা কতকগুলি প্রমাণ দিতে চাহিয়াছিলাম; তন্মধ্যে সূর্য্য, ইন্দ্র, সোম, দ্যৌঃ প্রভৃতি দেবতা বা কার্য্যবর্গ সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত কিরূপ, সর্ব্বপ্রথমে তাহাই দেখাইবার জন্য প্রতিশ্রুত ছিলাম। ঋগ্বেদের উল্লিখিত দেবতা সম্বন্ধে আমরা যে সকল প্রমাণের উল্লেখ করিব, তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রে বেদান্তদর্শনের কথা বলা আবশ্যক বলিয়া পূর্ব্বসংখ্যায় প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল। অদ্য সেই প্রমাণেরই আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ২০ সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় পাদের শেষ পর্য্যন্ত,—এই দুই পাদে আমরা অনেকগুলি সূত্র দেখিতে পাই। এই সূত্রগুলির আবশ্যকতা কি? কেন এই সূত্রগুলি রচিত হইয়াছিল, সর্ব্বাগ্রে তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। উপনিষদের অনেক স্থলে এই প্রকারের কতকগুলি উক্তি নিবদ্ধ আছে— "সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষকে যিনি জানিতে পারেন, তিনি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হন।" "সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষ এবং অক্ষিমণ্ডলস্থ পুরুষ একই বস্তু।" "পরিদৃশ্যমান পদার্থ সকল আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় এবং আকাশেই বিলীন হয়।" "আকাশ হইতেই নাম ও রূপ ব্যক্ত হয়।" "দৃশ্যমান ভূতবর্গ প্রাণেই লীন হয় এবং প্রাণের আশ্রয়েই অবস্থান করে।" "সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলি প্রাণেই লীন হইয়া যায়।" আকাশের উপরিভাগে যে জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে, মনুষ্যদেহে জঠরাগ্নিরূপে তাহাই অভিব্যক্ত রহিয়াছে।" "এই জগৎ গায়ত্রীরই অংশমাত্র, গায়ত্রীই সকল।"—ইত্যাদি।

এই সকল শ্রুতিতে সূর্য্য, আকাশ, প্রাণ, জ্যোতি বা অগ্নি, গায়ত্রীছন্দ—প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ আছে। এই শব্দগুলির অর্থ কি? এই শব্দগুলি কি জড়ীয় সূর্য্য চন্দ্রাদি পদার্থকে বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে, না এই শব্দগুলির অন্য কোন অর্থ আছে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্যই, বেদান্তদর্শনের পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলি রচিত হইয়াছিল। এই সূত্রগুলিদ্বারা কি মীমাংসা করা হইয়াছে, এখন আমরা তাহাই দেখিব।

এই সকল সূত্রের প্রত্যেকটীতে ইহাই

* Race Culture, Chap. XX.

মীমাংসা করা হইয়াছে যে, সূর্য্য, আকাশ, অগ্নি, প্রাণ প্রভৃতি শব্দগুলি দ্বারা জড়ীয় ভৌতিক বস্তু বুঝাইতেছে না। এই শব্দ গুলি ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। ব্রহ্মই এই সকল শব্দের প্রতিপাদ্য। শ্রুত্যুক্ত সূর্য্য, আকাশ, অগ্নি প্রভৃতি শব্দদ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইতেছেন। কিন্তু এখন কথা হইতেছে এই যে, সূর্য্য, অগ্নি, আকাশ, প্রাণ—বলিতে ত সকলেই জড়ীয় পদার্থকেই বুঝিয়া থাকে। তবে কেমন করিয়া এই সকল শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইতে পারেন?

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য এই প্রশ্নের দুইরূপ সমাধান করিয়াছেন। প্রথম সমাধান এই যে,—"(ব্রহ্মণঃ) সর্ব্বকারণত্বাৎ সর্ব্বাত্মকত্বোপপত্তেঃ।" ব্রহ্মই সকলের 'কারণ'। কার্য্যবর্গের মধ্যে কারণের সত্তাই অনুগত ও অনুস্যূত হইয়া থাকে; এবং কারণ-সত্তাই বিবিধকার্য্যাকার ধারণ করিয়া অবস্থান করে। সুতরাং সূর্য্য, আকাশ, অগ্নি, প্রাণ প্রভৃতি কার্য্যবর্গ—জগৎ-কারণ ব্রহ্মেরই রূপ। অতএব, সূর্য্যাদি শব্দ দ্বারা, সূর্য্যাদিতে অনুগত ব্রহ্মসত্তাই বুঝিতে হইবে। শঙ্করাচার্য্যের ইহাই প্রথম মীমাংসা। প্রিয় পাঠক, শঙ্করের এই মীমাংসাটী বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। এই মীমাংসাই অদ্বৈতবাদের মূল বীজ। কিন্তু শঙ্করের এই সিদ্ধান্তটী ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, তাঁহার মতে কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ কি প্রকার, অগ্রে তাহাই বুঝিয়া দেখিতে হইবে।

বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে কার্য্য-কারণের তত্ত্ব বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমরা এস্থলে অতি সংক্ষেপে শঙ্করের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া, আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদন করিব। শঙ্কর-মতে, জগতে যত কিছু বিকার, যত কিছু নাম-রূপ, যত কিছু কার্য্য দেখা যাইতেছে, সকলই ব্রহ্ম-সত্তা হইতে অভিব্যক্ত। * ব্রহ্মই জগতের 'কারণ'। এবং এই জগৎ সেই কারণের 'কার্য্য'। কারণ ও কার্য্য—উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ? শঙ্কর বলেন, কারণ হইতে কার্য্যের স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারে না। এক কারণ-সত্তাই কার্য্যবর্গের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। কার্য্য আর কিছুই নহে, উহা কারণ সত্তারই আকার বিশেষ মাত্র এবং এই একটা বিশেষ-আকার ধারণ করাতে কারণ-সত্তাটী কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে না। † মৃত্তিকা হইতে ঘট ও শরাব নির্ম্মিত হইল। ঘট ও শরাব মৃত্তিকারই আকার বিশেষ মাত্র। মৃত্তিকার সত্তাই ঘট ও শরাবের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। মৃত্তিকার সত্তাকে তুলিয়া লও, ঘটও থাকিবে না, শরাবও থাকিবে না। অতএব, মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য; ঘট ও শরাবাদি আকারগুলি অসত্য, অর্থাৎ ঘট ও শরাবাদি আকারগুলির নিজের কোন সত্তা নাই; মৃত্তিকার সত্তাতেই উহাদিগের সত্তা। শঙ্করাচার্য্য কারণ ও কার্য্য সম্বন্ধে এই প্রকার মীমাংসা করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানের নিতান্ত অনুগত সিদ্ধান্ত, পাঠক তাহা বুঝিতেছেন।

---

* "সর্ব্বস্যৈবাস্য নামরূপ-ক্রিয়াকারকফলজাতস্য যাঽভিব্যক্তিঃ, সা ব্রহ্মজ্যোতিঃ 'সত্তা' নিমিত্তা"—বেদান্তভাষ্য, ১।৩।২২।

† "কার্য্যাকারোঽপি কারণস্য আত্মভূত এব।... ন চ বিশেষদর্শন মাত্রেণ বস্ত্বন্তরং ভবতি...........স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ"।—বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৮।

এই সকল তত্ত্ব বিস্তারিতভাবে "উপনিষদের উপদেশ" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় আলোচিত হইয়াছে। এস্থলে অতি সংক্ষেপে কেবলমাত্র সিদ্ধান্তটী প্রদর্শিত হইল।

কার্য্য-কারণের এই তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া, শঙ্করাচার্য্য ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সূর্য্য, অগ্নি, আকাশ, প্রাণ, গায়ত্রী প্রভৃতি কার্য্যবর্গ যখন 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে; উহারা যখন এক ব্রহ্ম-সত্তারই বিকাশ বা আকার মাত্র; তখন সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি শব্দ দ্বারা, উহাদিগের মধ্যে অনুস্যূত সেই ব্রহ্মসত্তাকেই বুঝিতে হইবে। * ব্রহ্মকে 'রূপী' বলা যায়; এবং সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি তাঁহারই 'রূপ।' সুতরাং ব্রহ্ম—'সর্ব্বাত্মক'। অর্থাৎ জগৎ-কারণ ব্রহ্মই সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা ব্রহ্মকেই বুঝান হইয়াছে।

পাঠক, প্রসঙ্গ ক্রমে, এই সিদ্ধান্ত দ্বারা শঙ্করের অদ্বৈতবাদের প্রকৃতিও বুঝিয়া লইবেন। সর্ব্বত্র কেবল এক ব্রহ্ম-সত্তাই বিরাজিত রহিয়াছেন। এই সত্তা ব্যতীত আর কিছুই নাই। জগতে যত কিছু পদার্থ বা নামরূপাত্মক কার্য্যবর্গ দেখা যাইতেছে, উহাদের কাহারই স্বীয় স্বতন্ত্র সত্তা নাই। উহাদের মধ্যে এক ব্রহ্মসত্তাই অনুস্যূত; উহারা সেই ব্রহ্ম-সত্তারই বিবিধ রূপ বা আকার বা অভিব্যক্তি মাত্র। তত্ত্বদর্শী পুরুষ সর্ব্বত্র, সকল কার্য্যবর্গের মধ্যে সেই সত্তাটীকেই সর্ব্বদা অনুভব করেন; তাঁহাদের চক্ষে, সেই এক কারণ সত্তা ব্যতীত কোন পদার্থেরই স্বতন্ত্র সত্তা প্রতীয়মান হয় না। শঙ্করাচার্য্য এই অদ্বৈতবাদই প্রচার করিয়াছিলেন এবং তিনি ঋগ্বেদ হইতেই ইহার মূল সূত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি বেদান্ত ভাষ্যের একস্থলে বলিয়াছেন যে,—"যাঁহারা ঋগ্বেদাধ্যয়নকারী, তাঁহারা সর্ব্বত্র অনুস্যূত এই ব্রহ্মসত্তাকেই তাঁহাদের শাস্ত্রে উপাসনা করেন; যজুর্ব্বেদের আলোচনাকারীগণ অগ্নিরহস্যে এই ব্রহ্মসত্তারই হবন করেন এবং সামগানকারীগণ মহাব্রতনামক যজ্ঞে এই ব্রহ্মসত্তারই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।" †

এতক্ষণ আমরা যাহা আলোচনা করিয়া আসিলাম, তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কার্য্যবর্গকে অবলম্বন করিয়া, কার্য্যবর্গের মধ্যে অনুস্যূত ব্রহ্মসত্তাকে বুঝাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই, উপনিষদের নানাস্থলে সূর্য্য, অগ্নি, প্রাণ প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের ইহাই এক সিদ্ধান্ত। এখন আমরা দ্বিতীয় সমাধানের কথা বলিব।

এই সকল সূত্রেরই ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি শব্দদ্বারা যে কোন জড়পদার্থকে বুঝিতে হইবে না, তাহার আর একটী কারণ এই যে, ঐ সকল শ্রুতিবাক্যে "ব্রহ্মলিঙ্গ" বা ব্রহ্মের পরিচায়ক অনেক বিশেষণ রহিয়াছে। সেই বিশেষণগুলি কখনই জড়পদার্থের উপরে ব্যবহৃত হইতে পারে না। যেমন, কোন স্থলে 'আকাশকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, "সকল ভূতবর্গ আকাশ হইতেই অভিব্যক্ত হয়, আকাশেই লীন হইয়া যায় এবং আকাশের আশ্রয়েই সতত অবস্থান করে।" এস্থলের 'আকাশ' শব্দ যে স্পষ্টই

* "তস্মাৎ গায়ত্র্যাখ্য বিকারেঽনুগতং জগৎকারণং ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং "তদিদং সর্ব্বমি"ত্যুচ্যতে। যথা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"ইতি। কার্য্যঞ্চকারণাৎ অব্যতিরিক্তমিতি বক্ষ্যামঃ।"

† "বিকারদ্বারেণ ব্রহ্মণ উপাসনং দৃশ্যতে—এতংহ্যেব বহ্বৃচা মহতি উক্‌থে মীমাংসন্তে, এতমগ্নাবধ্বর্য্যবঃ। এবং মহাব্রতে ছন্দোগা ইতি।"—বেদান্তভাষ্য, ১।১।১৫।

ব্রহ্মবাচক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কেন না, কেবল এক ব্রহ্মপদার্থই তাবৎবস্তুর উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। অতএব এই সকল ব্রহ্মের পরিচায়ক বিশেষণ দেখিয়াই বুঝিতে হইবে যে, শ্রুতির উল্লিখিত, সূর্য্য, আকাশ, অগ্নি, প্রাণ প্রভৃতি শব্দ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

আমরা সংক্ষেপে, সূর্য্য, অগ্নি, প্রভৃতি কার্য্যবর্গ সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনের দুই প্রকার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিলাম। প্রথম সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নি, সূর্য্য, আকাশ প্রভৃতি আর কিছুই নহে; উহারা এক ব্রহ্ম-সত্তারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও নাম মাত্র। কোন কার্য্যেরই কারণ-সত্তা ব্যতীত 'স্বতন্ত্র' সত্তা থাকিতে পারে না। সুতরাং তত্ত্বদর্শীর নিকটে, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতির স্বতন্ত্র সত্তা নাই; উহারা সেই এক ব্রহ্মসত্তারই নাম-ভেদ বা রূপ ভেদ মাত্র। বেদান্তদর্শনের এই মহামূল্যবান সিদ্ধান্তটীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে আমরা ঋগ্বেদে উল্লিখিত, সবিতা, দ্যৌঃ, অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, মরুৎ প্রভৃতি দেবতাবর্গের তাৎপর্য্যও সহজে বুঝিতে পারিব।

সবিতা, দ্যৌঃ, অগ্নি, রুদ্র, প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্রই, ঋগ্বেদের ঋষিদিগের অন্তঃকরণে সেই ব্রহ্ম-সত্তার কথাই জাগরিত হইয়া উঠিত। তাঁহারা সবিতা নামে, দ্যৌঃ নামে, রুদ্রনামে, সোম নামে সর্ব্বত্র অনুস্যূত সেই জগৎ-কারণ ব্রহ্ম-সত্তারই স্তব করিতেন। কেন না, তত্ত্বদর্শীর নিকটে, কোন'কার্য্যের'ই কারণ-সত্তা ব্যতীত স্বতন্ত্র সত্তা নাই। কার্য্যবর্গকে অবলম্বন করিয়া, কার্য্যবর্গের মধ্যে অনুস্যূত ব্রহ্মসত্তাই ঋগ্বেদের একমাত্র উপাস্য বস্তু। এইজন্যই ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ঋষি গাহিয়াছেন—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু রথোদিব্যঃ স সুপর্ণো. গরুত্মান্।
একং 'সৎ' বিপ্রা বহুধা বদন্তি,অগ্নিংযমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

পণ্ডিতেরা একই সত্তাকে বিবিধ নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সেই একই 'সত্তা' —ইন্দ্র নামে, বরুণ নামে, মিত্র নামে, মাতরিশ্বা নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সেই একই সত্তাকে তত্ত্বদর্শীগণ শোভনপক্ষবিশিষ্ট গরুত্মান্ নামেও ডাকিয়া থাকেন। যজুর্ব্বেদের ৩২ অধ্যায়ের প্রথমেই এই জন্যই উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল যে—

"তদেবাগ্নি স্তদাদিত্য স্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রংতদ্‌ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ॥

সেই এক-ই বস্তুকে অগ্নি, আদিত্য, বায়ু, চন্দ্র, জল নামে পণ্ডিতেরা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাঁহাকে এই সকল বিবিধ নামে কীর্ত্তন করা হইয়া থাকে, তিনিই শুদ্ধ ব্রহ্ম; তাঁহাকেই প্রজাপতি বলিয়া জানিবে।

বেদান্তের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্যটীকে অবলম্বন করিয়াও, আমরা ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ যে ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত স্বতন্ত্র বস্তু নহেন, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। ঋগ্বেদের অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি যে কোন দেবতার যে কোন সূক্ত গ্রহণ করুন্ না কেন, পাঠক তাহাতেই প্রচুর "ব্রহ্মলিঙ্গ" বা ব্রহ্মের পরিচায়ক বিশেষণ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সে কথা বারান্তরে বলিয়া, বেদান্তদর্শনের অন্যান্য সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিব।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

নবীনচন্দ্র।

কবি নবীনচন্দ্র আর ইহজগতে নাই। বঙ্গদেশের অঞ্চলস্থা "শৈলকিরীটিনী, সাগর-কুন্তলা, সরিৎমালিনী" চট্টলভূমির একপ্রান্ত হইতে যে স্বাধীন স্বভাব গায়ক বঙ্গ-সাহিত্যের রঙ্গভূমে উপস্থিত হইয়া, চল্লিশ বৎসর উৎকল সঙ্গীতে বাঙ্গালীর হৃদয় মুগ্ধ করিতেছিলেন, আপনার জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, এই লোকে তাঁহার কণ্ঠ চিরতরে নীরব হইয়া গিয়াছে। তৎপূর্ব্বে তিনি বলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার শেষ উক্তি—"আজ আমার বিজয়া।"

বিদায় নহে, প্রস্থান নহে, নির্ব্বাসন বা মুক্তি নহে—বিজয়া? আমাদের শাস্ত্র বলেন, মানুষের চিরজীবনের আন্তর ধর্ম্ম মৃত্যুকালে প্রবল হয়, এবং তাহারই বর্ণে বর্ণিত হইয়া জীবাত্মা পরলোকে প্রস্থান করে। ইহাই "ধর্ম্মস্তমনুতিষ্ঠতি" বাক্যের লক্ষ্য; ইহাই চিত্রগুপ্তের কার্য্য। নবীনচন্দ্রের এই শেষোক্তিতে প্রকৃত মানুষটীর, প্রকৃত কবিটীর অন্তর্নিহিত ধর্ম্মের ছায়া কি পরিমাণে পতিত হইয়াছে, তাহাই অদ্য আমরা চিন্তা করিব। তাঁহার মাহাত্ম্য ও স্বরূপ উপলব্ধি করাই, অদ্য আমাদের শোক প্রকাশের লক্ষণ হইবে, স্বর্গগতের উদ্দেশে কোনরূপ শোকপ্রকাশ আমাদের সমাজধর্ম্মে ইতিপূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। যদিচ, আমরা কালবশে একটা বিদেশী প্রথাকে গ্রহণ করিতেছি, তবে উহাকে অদ্য স্বীয় সমাজের ভাবানুগত করিয়াই গ্রহণ করিব। পরলোকগত মহাত্মাদের চরিত্র চিন্তনে ও মাহাত্ম্য নিরূপণে জীবিতগণের যে লাভ আছে, অদ্য এই শোক সভায় তাহার অংশভাগী হইতে চেষ্টা করিব।

মানুষের প্রকৃত জীবন অদৃষ্ট; অন্ধকারাচ্ছন্ন; বাহ্যদর্শনে তাহার স্বরূপ জ্ঞান জন্মিতেই পারে না। যাঁহারা সত্যকে বা ভাবকে উপলব্ধি করেন বা প্রকাশ করেন—স্থূল কথায়, যাঁহারা কবি বা দার্শনিক, তাঁহাদের জীবনী এই কারণেই মানব সমাজের অমূল্য সম্পত্তি, বিশেষতঃ, কবিগণের সুখদুঃখ, দোষগুণ, কিম্বা পাপপুণ্য, তাঁহাদের সারল্য ও ব্যবসায় ধর্ম্মে, জ্ঞাতসারে অথবা অতর্কিতে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া যায়, উত্তরাধিকারিগণ উহার অনুধাবনে আপনাপন জীবনের পরমার্থ অর্জ্জন করিতে পারে। এই কারণেই কবিজীবনী, হয়ত শতদোষ স্পৃষ্ট হইয়াও, শত শত শাস্ত্র বা অনুশাসন গ্রন্থ অপেক্ষা মহার্ঘ বিবেচিত হয়; এবং কবিগণের গ্রন্থাবলী শিক্ষা ও আনন্দের যুগপৎ সংবিধান করে বলিয়া, পরম যত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে; আর কবিগণ মরিয়াও ইহলোকে অমর, বরণীয় ও মহনীয় হইয়া থাকেন।

মানুষের অন্তিমোক্তি অনেক সময় তাহাদের সমস্ত জীবনের মূলতত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়াছে। সুতরাং অদ্য আমরা সর্ব্বাগ্রে এই কবির অন্তিমোক্তি ও শেষ অভিপ্রায় চিন্তা করিব। কবির শেষ মুহূর্ত্ত, শুনিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়াছিলাম, যাইয়া দেখি, গৃহে লোকারণ্য; রোগী-চর্য্যার সংযতভাব চলিয়া গিয়াছে; অন্ত্যেষ্টির উপকরণ প্রস্তুত করিয়া

সকলেই ব্যাকুলভাবে প্রতি মুহূর্ত্তে মহা ক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছেন, কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি, কবি সেইমাত্র দীর্ঘ মোহাবসানে নেত্রোন্মীলন করিলেন, আমাকে দেখিয়া চিনিলেন; তাঁহার নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল,উৎফুল্ল মুখে কহিলেন "আজ বিজয়া।" কবির মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় স্কুল ছুটী হইয়াছিল, একান্ত দর্শনেচ্ছু ছাত্রগণ গবাক্ষপথে কবিকে দেখিয়া যাইতেছিল। তিনি উহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বিজয়ার সংবাদ কি সকলেই পাইয়াছে?" পুনর্ব্বার "আজ বিজয়া," কহিতে কহিতে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তৎপর হইতে নির্ব্বাক, নিস্পন্দ ও সংজ্ঞাহীনভাবে নবীনচন্দ্র আরো দুই দিন বাঁচিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু ভবপুরীর সহিত তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ ছিল না। এই ঘটনার পূর্ব্বদিন, নবীনচন্দ্র সহোদরকে তাঁহার শেষ অভিলাষ জানাইয়াছিলেন। তাহা এই, তাঁহার মৃতদেহ স্রকৃচন্দনে ও গৈরিক বসনে সজ্জিত করিয়া জন্ম-পল্লীতে লইয়া যাইবেন; মুখ মৃত্যুচ্ছায়ায় অবিকৃত থাকিলে তাহা অনাবৃত রাখিয়া বহন করিবেন; তাঁহার সহধর্ম্মিণী পদব্রজে শববাহনের অনুগমন করিবেন; পিতৃ শ্মশানের পার্শ্বেই তাঁহার অন্তিম শয়ন রচিত হইবে, ও ইহ পরকালের একমাত্র সম্বল-স্বরূপ গীতা গ্রন্থ তাঁহার বক্ষঃস্থলে ও সঙ্গে দিতে হইবে।

এই অপূর্ব্ব অন্তিমোক্তি ও শেষ আশা যতই চিন্তা করি, ততই এই ক্ষণজন্মা পুরুষের সমগ্র জীবনে ও অন্তরতত্ত্বে নব নব আলোকপাত হইতে থাকে। বলা বাহুল্য, আমি এই আলোচনার শেষ পাই নাই, উহার সীমা নাই, উহা চিরকালের জন্য অনাগত শত পুরুষের ও সাহিত্যসেবীর কৌতুকলী হইয়া রহিল।

মৃত্যুকে লক্ষ্য করিয়া নবীনচন্দ্র বলিয়াছিলেন, 'আজ বিজয়া'। এই বাক্য তাঁহার সমস্ত জীবন মন্থিত করিয়া আপন অর্থসামর্থ্য সংগ্রহ করিয়াছে, ও সহজে, অতর্কিতে বাহির হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের মুখচ্ছবি মৃত্যুর করাল গ্রাসেও বহুক্ষণ বিকৃত করিতে পারে নাই, ঐ কথাটী কহিবার সময় মুমূর্ষুর সেই অম্লান চিরতেজস্ক মুখচ্ছবি যে অপূর্ব্ব তেজঃপ্রদীপে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহা আমি কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না। আমার এই স্বল্প জীবনের গুটিকতক উজ্জ্বল স্মৃতির মধ্যে, আমার জন্মভূমির বরপুত্রের এই শেষ দিন, চিরকাল, পরম মহার্ঘতায় দেদীপ্যমান থাকিবে।

কথা একটী পাইয়াছি—'আজ বিজয়া।' 'বিজয়া' কাহার? আমাদের দুর্গোৎসবের বিজয়ার দিন স্মরণ করি,বিজয়ার দিনেই বিসর্জ্জন। সাধক যে প্রতিমা রচনা করে, যাহাতে দেবাধিষ্ঠান উদ্বোধিত করিয়া সাধনা করে, তাহার বিসর্জ্জন। কেন না, চতুর্থদিনে—সিদ্ধির পরদিনে, তাহা মৃত্তিকা মাত্র। নবীন চন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, ঐ দিন তাঁহার সংসার সাধনার শেষ, তাই ঐ দিন তাঁহার বিজয়া। আবার, বিজয়া হর্ষ-বিষাদের দিন। হর্ষ, সাধকের মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে; বিষাদ, যেই মৃণ্ময়ী-মূর্ত্তির সাহায্যে চিন্ময়ীকে পাইয়াছে, সেই পরমপ্রিয় কমনীয় মূর্ত্তিকে বিসর্জ্জন করিতে হইতেছে। নবীনচন্দ্রের আত্মাদর অতি প্রবল ছিল। তিনি কবি, তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি অমরতা লাভ করিয়াছেন,এই প্রতীতি, এমন কি,অভিমান তাঁহার জন্মিয়াছিল। তাই, সেই দিন, ভবসাধনার অবসানে তিনি উৎফুল্ল মুখে হর্ষ বিষাদে বলিয়াছিলেন "আজ আমার বিজয়া।"

আবার দেখি, 'বিজয়া' কাহার? জিগীষু বীরের। এই অধঃপতনের দিনে বিজয়ার মাহাত্ম্য আমাদের দেশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভারতের সুদিনে বিজয়াকামী নৃপতিগণ এই দিনেই বিজয়যাত্রা করিতেন। এই কারণেও বর্ষান্ত শুক্লাদশমীর নাম বিজয়া। নবীনচন্দ্র ভবপুরী হইতে নির্গত হইয়া অমরলোকে অভিযান করিতেছিলেন। কবি নবীনচন্দ্রের, প্রকৃত নবীনচন্দ্রের জীবন ঐ দিন হইতেই আরব্ধ হইতেছিল। সাংসারিক দুঃখদৈন্য দুর্ব্বলতার কবল হইতে মুক্ত হইয়া, কবির আত্মা ঐ দিন আপন স্থির জীবন প্রাপ্তির জন্য নিযুক্ত হইতেছিল, নবীনচন্দ্র ঐ অর্থটীও কি চিন্তা করিয়াছিলেন? কিছু করিয়াছিলেন বই কি? ঐ অবস্থায় সাংসারিক লোক বলিত—'বিদায়'; জ্ঞানী বলিত—প্রস্থান; যোগী বলিত—"নির্ব্বাণ' বা 'সমাধি'। নবীনচন্দ্র জ্ঞানপন্থী বা যোগী ছিলেন না। সংসারে তাঁহার কিছুমাত্র বৈরাগ্য ছিল না। সাংসারিক ঋদ্ধি ও কবিকার্য্যের কৃতার্থতা লাভই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল, উহাই এই বীরপ্রকৃতি, কর্ম্মশীল কবিজীবনের ধর্ম্ম সাধনা ছিল। কবিকৃত্যের মধ্যে ও ভাববিহ্বলতার মধ্যেই তিনি অসীমের ও আনন্দময়ের স্পর্শ অনুভব করিতেন; কাব্যরসে বিভোর হইয়া ভক্তের মত ভাবপুলকিত হইতেন। ইহাই তাঁহার জীবনের ও কাব্যের সাত্ত্বিকতা। স্বকীয় কাব্যের স্থান বিশেষ পাঠ করিতে করিতে তাঁহাকে আত্মবিস্মৃত হইয়া অবিরল ধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেও দেখিয়াছি।

মনীষী কবি গেটের শেষ উক্তি "আলোক, আরো আলোক।" সৌন্দর্য্যের উপাসক কবি কীটসের শেষ উক্তি—"সুন্দর—অতি সুন্দর।" বীরধর্ম্মী ভাবুক কবি নবীনচন্দ্রের শেষ উক্তি—'আজ বিজয়া'। ইহাঁদের প্রত্যেকের শেষ উক্তিতেই, চিরজীবনের অনুসৃত হৃদগত ধর্ম্ম প্রসূত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সাধারণের চক্ষে, সংসারজীবনে তাঁহারা ক্ষণিকের দৈন্য দুর্ব্বলতা বশতঃ বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের আত্মাপুরুষ সমস্ত সাংসারিক বিবাহ বিক্ষোভের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও যে উন্নত লোক হইতে আপন আহার্য্য সংগ্রহ করতঃ সসার হইয়া উঠিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কবিগণকে ভাব ও ভাষার সাধনা করিতে হয়; মনকে নিশ্চল বা সংযমাধীন রাখিতে গেলে কাব্য রচনা হয় না, অনন্যযোগে ভাবের অন্বেষণে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে ও মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে চিত্ত চালনা করিতে হয়, উহাই কবি জীবনের সঙ্কট স্থান। এই কারণে অনেকের চিত্তও অতর্কিতে চাঞ্চল্য ও রজোগুণাপন্ন হইয়া যায়; অনেকের চরিত্র বা সাংসারিক জীবনও সঙ্কট ও বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া পড়ে। হয়ত, নিজের আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসঙ্গত অনভীষ্ট কার্য্যও তাঁহাদিগকে করিয়া বসিতে দেখা যায়। সাধারণ জন মানবের চক্ষে ঐ রূপ কবির জীবন যেরূপই প্রতিভাত হউক না কেন, এই বিশ্ব ভুবনরূপ কাব্যের কবি যিনি, যিনি অন্তঃকরণ তত্ত্বের পরীক্ষায় ভাল মন্দ বিচার করেন, তাঁহার নিকট কবির প্রেতাত্মা যে পরম প্রীতি ও কারুণ্যভাজন হইয়া থাকে, ইহা আমি বিশ্বাস করি। শত দোষ সত্ত্বেও অমার্জ্জনীয় দৈন্য দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও, অনেক কবি সংসারে যে উত্তরোত্তর প্রীতি ও পূজা প্রাপ্ত হন, অনেক প্রকৃত সাধু সাধক অপেক্ষাও প্রতিষ্ঠা

লাভ করেন, যেরূপে মরিয়াও অমর থাকিয়া যান, বিভু করুণার ইহাই যথেষ্ট-নিদর্শন নহে কি?

পৃথিবীর সকল প্রকৃত কবির নিকট আপন কবিকর্ত্তব্যই ধর্ম্ম। সকল প্রকৃত কবিই আপন প্রাণের ভাবতন্ময়তার ভিতরে সত্যশিবসুন্দরকে অনুভব করিয়া গিয়াছেন। অপর কোন উপাসনা প্রণালীর একান্ত অনুসরণ আবশ্যক মনে করেন নাই, প্রকৃত কবি যুগপৎ স্রষ্টা ও দ্রষ্টা, তাঁহাদের হৃদয় সহজে আধ্যাত্মিক রাজ্য হইতে তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া রসময়ী কবিতায় পরিস্ফুরিত করে, অনেকেই যুগপৎ যোগী ও ভোগী। নবীনচন্দ্রও শ্রেষ্ঠ কবি-হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন, বৃদ্ধ ব্রহ্মার সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্নেহদান তিনি কি প্রকারে আপন কবি কৃত্যে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, জীবন সাধনাকে কি রূপে মহিমময়ী বিজয়ার দিকে, সার্থকতার দিকে পরিচালিত করিয়াছেন, তাহাই আমরা অদ্য সংক্ষেপে চিন্তা করিব।

নবীনচন্দ্রের আন্তরিক চরিত্র বেগবান, ভাবপ্রবণ, সুখে বিহ্বল, দুঃখে অসহিষ্ণু ও যুগবৎ অভিমানী ও সরল ছিল। আমাদের শাস্ত্র এই সকলকে রজোগুণের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে। বস্তুতঃ এই কবির হৃদয় রজঃপ্রধান সত্ত্বগুণে পূর্ণ ছিল, তাঁহার 'শেষ আশার' "স্রকচন্দন ও গৈরিক বসনে" সম্পূর্ণ ভাবে তাঁহার জীবনের অন্তরস্থ বীরাদর্শ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। সত্ত্বগুণ ব্যতিরেকে কবি হইতে পারে না, নবীনচন্দ্রের কার্য্যাদিতেও যে সাত্ত্বিকতার পরিচয় আছে, তাই উহাও রাজসিক উপকরণ সাহায্যেই প্রকট ও সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তাই গীতা অধ্যয়ন করিতে গিয়া নবীনচন্দ্র গীতার কর্ম্মযোগই বুঝিয়াছিলেন, অধ্যাত্মযোগ হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। আত্ম প্রকৃতি যাহার অনুরূপ বা নিকটবর্ত্তী, তাহাই মানুষ প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারে, অন্তঃকরণ তত্ত্বের সহিত সামঞ্জস্য না ঘটিলে কবির হৃদয় কোন বিষয়ে কাব্য প্রয়াসে প্রেরিত হইতে পারে কি? তাই কবি নবীনচন্দ্রের সমগ্র জীবনের পরিণত চিন্তার ফল রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের মূল উদ্দেশ্য 'ধর্ম্ম সংস্থাপন' নহে, 'ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন'। কবি নবীনচন্দ্র কর্ম্মী; জ্ঞানপন্থার ধ্যান ধারণা সমাধি তাঁহার কোন কালেও মনঃপুত নহে, রজোগুণাপন্ন অর্জ্জুন, দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে ভৈরব রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, উহা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারই আত্মরূপ, কেন না, আত্মরূপই বিশ্বরূপ। তৎসঙ্গে নবীনচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সহানুভূতি, কেন না, তিনিও স্বয়ং কর্ম্মী, মানুষের পরমার্থ কর্ম্মে, কর্ম্মেই মনুষ্যত্ব, এবং ঐ কর্ম্মের ফল ও কর্তৃত্ব ভক্তিযোগে ভগবানে আরোপ করাই পরম পুরুষার্থ—ইহাই নবীনচন্দ্রের ধর্ম্ম। এই প্রাচীন ধর্ম্ম উনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপীয় তমোমিশ্র রাজসিক ভাবের প্লাবনযুগে, সুষুপ্ত ভারতে নূতন করিয়া প্রচার করাই নবীনচন্দ্রের দীক্ষা। আপন প্রকৃতির প্রবল স্বাধর্ম্ম্য-বশেই তিনি এই দীক্ষা লাভ করেন। এই দেশের কবি-সমাজে এই সুমহৎ কর্ত্তব্য গ্রহণে তদপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি ছিল না।

নবীনচন্দ্রের প্রতিভাও বীরধর্ম্মাপন্ন ছিল। এই কারণে সমধিক সূক্ষ্মদর্শন বা প্রকাশ অপেক্ষা উহার দ্রুতগতি ও বিপুল শক্তিই সর্ব্বপ্রথমে চিত্তকে আকৃষ্ট এবং মুগ্ধ করে। এই কারণে নবীনচন্দ্রের কাব্যাদিও সর্ব্বত্র

ভাবের বিপুল উচ্ছ্বাসে, ভাষার ঝঙ্কারে ও উদগতজ্বালা প্রাঞ্জলতায় অবকাশ-রঞ্জিনী হইতে অপ্রকাশিত চৈতন্ত পর্য্যন্ত, তাঁহার চরিত্রের সমস্ত সদ্‌গুণে অণুপ্রাণিত হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের সহিত পরিচয় মাত্রেই, যেমন অর্ব্বাচীন ব্যক্তিও তাঁহার সমস্ত গুণ ও দোষের পরিচয় পাইয়াছে, তেমনি, নির্ব্বিশেষ সরলতার দরুণ, তাঁহার সমস্ত কাব্যের গুণ বা দোষও অতি সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হইয়া আছে।

এই কারণে, কি বহির্জগতে কি অন্তর্জগতে, নবীনচন্দ্র অতি সূক্ষ্ম দর্শন করিতেন না; ব্যাপ্ত দর্শন তাঁহার কবিতার মূল তত্ত্ব। ইংলণ্ডীয় কবিগণের মধ্যে কেবলমাত্র বায়রণ ও সেক্সপীয়রই এই গুণের বহুলভাবে অধিকারী ছিলেন। তবে সেক্সপীয়র প্রোক্ত উভয় গুণেরই সমান অধিকারী; বলা বাহুল্য, সাহিত্য-জগতে তৎসদৃশ এতদুভয়ের উচ্চ সমঞ্জসিত শক্তিযুক্ত কবি বিরল। বৃহৎ ভাবকে বৃহৎ-ভাবে বুঝিতে, দ্রুতবেগে বড় বড় তুলিকা সঞ্চালনে তাহার রেখাচিত্র অঙ্কিত করিতে,ও তৎসঙ্গে পাঠকের অনন্ততন্ত্র সহানুভূতি জাগ্রত করিতে নবীনচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। তাই, সাধ্য বিষয়ে বিহ্বল ঐকান্তিকতা, প্রাঞ্জল-রস-সমুজ্জ্বল ভাষা নবীনচন্দ্রের লেখনীর নিত্য সহচরী ছিল। অন্যদিকে, স্বয়ং করুণ রাগিণী আলাপের সময়, অকস্মাৎ নিজের সমগ্র প্রাণ খুলিয়া কাঁদিয়া ফেলিতে, হাস্যরস জমাইবার সময় অকস্মাৎ আত্মবিস্মৃত হইয়া বিভোর ভাবে হাসিয়া ফেলিতে, মহিমার কথা সমুচ্চ কণ্ঠে আলাপ করিতে করিতে অতর্কিতে স্বয়ং আত্মহারা হইয়া মুগ্ধ ও অজ্ঞান হইয়া পড়িতে, একমাত্র কবি নবীনচন্দ্রেই সম্ভবে। সাহিত্য শাস্ত্রে নাকি ইহা অসঙ্গত—আর্ট বা শিল্পকলা-বিরুদ্ধ। কিন্তু শাস্ত্রের কথা মানে কে? পলাসীর যুদ্ধ, রঙ্গমতী, কি রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাসে কবি যে স্থানেই শাস্ত্র অবহেলা করিয়া, যবনিকা মধ্য হইতে স্বয়ং মুগ্ধভাবে নগ্নদেহে বাহির হইয়া আসিয়া অভিনেতৃগণের সঙ্গে মাতিয়া গিয়াছেন, সেইখানেই উহার ফল কবির সাপক্ষে আশাতীত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। সামাজিকগণ কবির এই অনৌচিত্য বিচার করিবার অবকাশ চাহে নাই; কবির আন্তরিকতায়, সরলতায় ও ব্যক্তিগত সংসর্গে মুগ্ধ হইয়া, আবিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বাস্তবিক, নবীনচন্দ্রের কবিতার একটা প্রধান সৌন্দর্য্য এই আন্তরিকতা ও আত্মসম্পর্ক, (Personal element) পাঠক যেন অন্তরে অন্তরে জানিতে চায়, কবি একটা ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছেন, না সত্য প্রদর্শন করিতেছেন? কবি স্বকৃতির মধ্যে আছেন কি? নিজের কথা নিজে বিশ্বাস করেন কি? এই সকল প্রশ্নে আশ্বাস পাইলে পাঠকগণ যেন প্রীত হয় এবং কবিকৃতির মাহাত্ম্য এই কারণেই অনেক বাড়িয়া যায়। নবীনচন্দ্রের বেলায় এই তথ্যের বহু সমর্থন হইয়া গিয়াছে। বায়রণের কবিতাতেও এই Personal element প্রবল ছিল। তবে, বায়রণের অভিমান, সমাজ ও নীতি-দ্রোহিতা ও বিদ্বেষভাব এত প্রবল ছিল যে, উহাতেই তাঁহার কবিতার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বরং বিপক্ষতাচরণ করিয়াছে; পাঠকের হৃদয়ে উহা বহুস্থলে এমন বেদনাদায়ক হইয়া গিয়াছে যে, বায়রণের উচ্চমুগ্ধকারী কবিত্ব শক্তিও কুলাইয়া উঠে নাই।

নবীনচন্দ্রের কবিতাতেও প্রথম প্রথম বায়রণের কোন কোন দোষ যে ছিল না,

এ মন নহে, তবে, বয়সের প্রৌঢ়তায়, বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় সমাজ-সংসর্গের ফলে,নবীন চন্দ্রের কবিতা হইতে, ঐ সমস্ত দোষ ক্রমে নিরাকৃত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। নবীনচন্দ্রের মতন পরিণত বয়স্ক ও সুস্থিত হইতে পারিলে, ইংলণ্ডের বায়রণও নবীন চন্দ্রের ন্যায় শ্রেয়ো-মুখী সমাজ-বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে উপনীত হইতে পারিতেন কিনা, চিন্তার বিষয়। পরন্তু এই উভয় কবির প্রতিভার প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও স্ফুরণ বিচার করিতে বসিলে, উভয়ের নানা স্বাধর্ম্ম্য চিত্তাকর্ষণ করিতে থাকে। অশুভবাদী ও বিদ্বেষধর্ম্মী Manfred, Cain অথবা Heaven and Earth না হইয়া কোন শুভাদৃষ্ট গুণে বাঙ্গালার বায়রণের (?) প্রতিভা রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাসের ও বুদ্ধ চৈতন্যের নিষ্ঠা তত্ত্বকে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই পরম কুতূহল ও প্রণিধানের বিষয়। বায়রণ অতি প্রদীপ্ত ধ্বংসশীল উল্কাশিখার মতন স্বপ্রকৃতির অমিতাচার ও স্বাভাবিক ফলেই যেন অকালে নিবিয়া গিয়াছিলেন। আর, ভারতবর্ষীয় নবীনচন্দ্র মিতকর্ম্মা ও সুরক্ষিত থাকিয়া, দ্বিষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত, আপন জীবনকে বিশ্বাসে ও ধর্ম্মে বিকশিত করার সুবিধা পাইয়াছিলেন। যেই ভাবে এই কবির ধর্ম্ম ও সমাজ জীবন পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার অনুধাবনও প্রত্যেক সাহিত্য-সেবীর বিশেষ কৌতুকাবহ হইবে, সন্দেহ নাই।

আমাদের এই কবি, পণ্ডিত বা কোন বিষয়েই ধৈর্য্যশালী অধীতী ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার পঠিত বিদ্যা কোনরূপেই বহুপ্রসারী বা গভীর ছিল না। প্রথম পরিচয়ে তাঁহার লাইব্রেরীর গ্রন্থাল্পতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম, সেক্সপীয়রের গ্রীক ও লাটিন বিদ্যা বিষয়ে কবি গ্রীন যে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন, নবীনচন্দ্রের সংস্কৃত ভাষা ও দর্শনজ্ঞান বিষয়েও এই সাক্ষ্য নির্ভয়ে দেওয়া যাইতে পারে। যে বায়রণের সহিত সচরাচর তাঁহার তুলনা করা হয়, যাঁহার নিকটে তিনি বহু পরিমাণে ঋণী, এমন আশঙ্কাও করা হয়, সেই বায়রণের Child Harold ও Hours of Idleness মাত্র পড়িয়া শেষ করিয়াছিলেন, এই কথা তিনি আমার কাছেই স্বীকার করিয়াছেন। অবকাশ-রঞ্জিনী ও পলাসীর যুদ্ধের পর, আর তাঁহার বায়রণের সহিত কোন সামঞ্জস্যই দেখিতে পাইতেছি না।

তিনি স্বীয় প্রতিভার অদৃষ্টগত সামঞ্জস্য বশেই বায়রণের সমভাবাপন্ন কবি, এই ধারণা আমার দৃঢ়মূল হইয়াছে। আপনার মানসিক শান্তির বিপুল প্রেরণা ও স্বাভাবিক প্রতিভা বশেই এই কবি চকিত বেগে কার্য্য-বিষয় দর্শন করিতেন ও অবলীলাক্রমে কবিতা চয়ন করিয়া যাইতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ইংরাজী শিক্ষা, ইতিহাস দর্শন ও কাব্য চর্চ্চা ও প্রাকৃত সমসাময়িক বঙ্গসমাজের আব হাওয়া হইতে পরিমিত জীবনীরস সংগ্রহ করিয়া এই স্বভাব কবি, আমাদের দেশের অযত্ন-সংবর্দ্ধিত অশ্বত্থ তরুর ন্যায়, আকাশের ঝড়ে ও রৌদ্রে পরিপুষ্ট প্রকাণ্ড ও মহীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন অনায়াস-সিদ্ধ ক্ষিপ্রতা, প্রকাণ্ডতা, নিশ্চিন্ত নির্ভীকতা সাহিত্য-জগতে অত্যল্প কবির বেলাতেই পাওয়া যায়। যিনি স্বয়ং পণ্ডিত নহেন,তাঁহার কাব্য অপরকে পাণ্ডিত্য লাভে সহায়তা করিবে; যিনি স্বয়ং নিশ্চিন্ত নির্ব্বেদে লিখিয়া যাইতেন,

তাঁহারাই কবিতা অন্যকে গভীর চিন্তায় দীক্ষিত করিবে, শক্তিমাত্রার সুপুষ্কল স্নেহ ও পক্ষপাতিতার ফলে না হইলে বর্ত্তমান কালে সাহিত্য-জগতে এইরূপ ঘটনা সম্ভব হইত না। আমরা দেখিতেছি, পাশ্চাত্য কবি বা কাব্য প্রথার নিকট মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের ঋণ অনায়াসে স্থির করা যায়; কিন্তু নবীনচন্দ্রের কবিঋণ নির্দ্ধারণ নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য।

আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যে একটা নূতন 'হুজুগ' উঠিয়াছে, তাহার মূলমন্ত্র— 'art for arts' sake,' উহার মর্ম্ম—আত্মনিষ্ট শিল্পকলা; অর্থাৎ কাব্যসঙ্গীত প্রভৃতি ললিত কলার একমাত্র উদ্দেশ্য অনলঙ্কৃত স্বভাব বর্ণন, অথবা একোদ্দিষ্ট সৌন্দর্য্য সৃজন, কাব্যের কোনরূপ নৈতিক বা শ্রেয়স্কর উদ্দেশ্য রক্ষার নাকি আবশ্যকতা নাই। এই মতের ভাল মন্দ বিচার বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত; সুতরাং এই মাত্র বলিয়া রাখিব যে,ইতিমধ্যে য়ুরোপেই গেটে, টলষ্টয়, রাস্কিন, ম্যাথু আর্নল্ড প্রভৃতি মনীষীগণ এই মতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রকে এই বিজাতীয় মত স্পর্শ করে নাই। মধুসূদনে উহার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিদৃষ্ট হইবে, নবীনচন্দ্র ভারতীয় ঋষি-সেবিত সাহিত্যগঙ্গা হইতেই স্নানপূত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এই নবীনচন্দ্র প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জীবপুঞ্জের বংশধর; দৈবক্রমে ভারতসমুদ্রের তলদেশ হইতে জটিকাজুষ্ট কবিধাত্রী চট্টল ভূমির উপকূলে উন্নীত হইয়াছিলেন। যাঁহারা পৃথিবীর অন্ধকার যুগে ভারতীয় সাহিত্যে সুবিপুল রামায়ণ, মহাভারত, অষ্টাদশ মহাপুরাণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগবাশিষ্ট ও শ্রীমদ্ভাগবত রাখিয়া গিয়াছেন, ও পরকালে যাঁহারা চৈতন্যচরিত, চৈতন্য ভাগবতে এবং এইদেশে সুবৃহৎ 'জাগরণ' ও 'মনসার পুথি' গান করিয়া গিয়াছেন, এই নবীনচন্দ্রের সহিত তাঁহাদেরই শোণিত ও সবর্ণ সম্বন্ধ দেখিতেছি। মধুসূদন ও হেমচন্দ্র শক্তিধর কবি হইয়াও বিদেশীয় প্রভাবে ভারতবর্ষীয় মনুষ্য-হৃদয়ের মর্ম্মস্থান চিনিয়া লইতে পারেন নাই ও তাহাদের সুবৃহৎ কাব্যস্বার,য়ুরোপীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের হিসাবে, হয়ত অনবদ্য হইয়াও, বঙ্গসমাজের অন্তরঙ্গ সহানুভূতি লাভ করিতে পারে নাই, স্বভাব কবি নবীনচন্দ্রের বিষয় নির্ব্বাচন, বক্তব্য ও উদ্দেশ্য সুবিহিত হইয়াছিল কি না, বঙ্গদেশের পাঠক-সাধারণ চিরকাল সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, জগন্মাতা সর্ব্ব প্রথম সেই শক্তি প্রদানে এই কবিকে প্রেরণ করেন, শেষ পর্য্যন্ত তাহা অপরিবর্ত্তিত ও অক্ষুণ্ণ ছিল। নবীনচন্দ্র প্রকৃতি-দত্ত শক্তির ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র; কোন রূপে উন্নতি ঘটন অথবা নূতন অর্জ্জন করেন নাই। অবকাশরঞ্জিনীর নবীনচন্দ্রে বা চৈতন্যের নবীনচন্দ্রে মৌলিক কোন পার্থক্যই নাই, এই দীর্ঘ জীবন কবি স্বীয় প্রারব্ধের দ্বারা তাহার গুণগত কোন হ্রাস বৃদ্ধি নাই,রচনার প্রকৃতি প্রবৃত্তি বা শক্তি একই জাতীয়। ইহাতেই দেখা যাইবে, এই কবির কবিত্ব শক্তির মূল মস্তিষ্কে নহে—হৃদয়ে, এই ক্ষেত্রে প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের সহিত নবীনচন্দ্রের সবর্ণ সম্পর্ক আরও পরিস্ফুট। ভাবে গদগদ, প্রেমে মুগ্ধ নবীনচন্দ্র হৃদয়ের সামর্থ্যেই কাব্য রচনা করিয়াছেন; জীবন পথেও হৃদয়ের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন। স্বকৃতি বা পরকৃতি

তিনি হৃদয়ের দ্বারাই বিচার করাইতেন; রসের উদ্দীপনা করিয়া তাঁহার হৃদয় স্পন্দন জানাইতে পারিলেই তিনি মুগ্ধ হইতেন, ও অকপটে অতিশয়োক্তি-বহুল প্রশংসা করিয়া ফেলিতেন। বঙ্গদেশের অনেক নবীন সাহিত্যিক কবির এই অকৃত্রিম সহৃদয়তার ও অনন্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। যাত্রার আসরে বা অভিনয়মঞ্চে কোনমতে রসের উদ্রেক করিতে পারিলেই, সর্ব্বাগ্রে নবীনচন্দ্রকে মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত করা কত সহজ হইত, তাহা এই দেশের সকলেই জানেন।

এই হৃদয়-ধর্ম্মে নবীনচন্দ্র কখনও নিজের অন্তরতত্ত্বে দৃষ্টি করেন নাই; ভিতরের মানুষটার প্রতি সবিতর্ক দৃষ্টি নবীনচন্দ্রের প্রণালী-বিরুদ্ধ, তাঁহার আত্মজীবনের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কবিটা কোথায়? পলাশীর যুদ্ধ, বা রৈবতক বা কুরুক্ষেত্র-প্রণেতা বাল্যজীবনের কোন্ স্থানে আপন প্রাণরস প্রাপ্ত হইতেছে? উহার বর্ণিত ঘটনাবলীতেও কেবল একটা উদ্ধত, দুর্দ্দান্ত, সুখ দুঃখে অতিপ্রবণ স্বভাবশিশুকে দেখিতেছি, কবি আত্মজীবন বিবৃত করিতে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা এত সরল, নির্ভীক এবং স্বাভাবিক যে, তাহাই অতর্কিতে তাঁহার চরিত্রের মূল বর্ণ প্রকাশ করিতেছে; এই জাতীয় কবির রচনা-রীতিই তাঁহাদের চরিত্রের মূলতত্ত্ব প্রকাশ করে। উহা জীবনযাপনের ইতিবৃত্ত মাত্র; জীবন গঠনের বা দর্শনের নহে। জার্ম্মাণীর গেটে যেমন শৈশব হইতেই আপনার কবিজীবনের প্রতি মালীর ন্যায় সতর্ক ও সযত্ন দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়াছেন, ও নিজকে জীবনের ঘটনা-সংঘাতের মধ্য দিয়া জাগ্রতভাবে বাহিয়া নিয়াছেন; নবীনচন্দ্র তেমন কখনও করেন নাই। তিনি অতর্কিত কবি। কথাটা সম্পূর্ণ অর্থবাচক হইল না। নবীনচন্দ্র নিজের অদৃষ্ট ও জীবনদেবতার সানুগ্রহ বিধান বশতঃই কবি। ঘটনাবিধান বিপরীত হইলে, এমন কি, পিতার মৃত্যুর পর সংসার যে তাঁহাকে কয়াল বক্ত্র বিবৃত করিয়া গ্রাস করিতে চাহিয়াছিল, তাহা পরাবৃত্ত না হইলে, ও উচ্চ রাজকীয় পদ লাভান্তে জীবনোপায় সুখ সুবিধাজনক না হইলে, তিনি কি হইতেন, বলা যায় না। মনীষী কার্লাইল স্বকীয় 'বীর-পূজা' নামক গ্রন্থে যে সমস্ত শক্তিধর সর্ব্বতোভদ্র পুরুষকে 'বীর' নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নবীনচন্দ্রও এই জাতীয় 'বীর' ধর্ম্মাক্রান্ত ছিলেন। কবিপ্রতিভার প্রবৃত্তি তাহার সমগ্র চরিত্রের অনেকগুলি প্রবল প্রবৃত্তির একতম মাত্র, যে যে দিকে ছুটিত, অন্য সকলকে অভিভূত করিয়াই ছুটিতে পারিত। দেখা যাইতেছে, প্রকৃতিপ্রিয় পুত্রকে এই ক্ষেত্রে অনুপমভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রকৃতি পরম স্নেহে ও সাগুণ্যে নবীনচন্দ্রকে হৃদয়ে ও কার্য্যে কবি করিয়া তুলিয়াছিলেন, কেবল কবি নহে, ক্ষণিকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবতরঙ্গে ঝঙ্কৃত—এমন কবিত্ব নহে, তাঁহার সমস্ত জীবনকে সর্ব্বতোভাবে একটা বিশিষ্ট লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত, সমস্ত কাব্যচেষ্টাকে একটা বিশিষ্ট মঙ্গল-লক্ষ্যে প্রেরিত করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থাবলীর মূলতত্ত্বের পর্য্যালোচনায় উহা পরিস্ফুট হয়।

অবকাশরঞ্জিনীর ক্ষুদ্র কবিতা সমূহে কিশোর বয়স্ক ও যুবক নবীনচন্দ্রের অন্তর তত্ত্বের পরিচয় পাই। স্বাধীন উদ্ধত স্বভাব-শিশু, পরিবারের ও স্বদেশের প্রেমে বিগলিত, সৌন্দর্য্যে আত্মবিস্মৃত, ভাবুকতায় উন্মত্ত, সৌহার্দ্দে সকরুণ, কৃতজ্ঞতায় নতশির ও সর্ব্ব-

প্রকার নীচতার প্রতি একান্ত অক্ষমশীল। নবীনচন্দ্র এই দুই কাব্যের প্রতি ছত্রে আত্ম-প্রকাশ করিতেছেন। পরিণত বয়সেও তাঁহার চরিত্রের এই সমস্ত মূলবর্ণ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। নবযুবক যে স্থানে 'কীর্ত্তিনাশার' কূলে দাঁড়াইয়া বলিতেছে,—

কীর্ত্তিনাশা! বৃথা নাম বৃথা অভিমান,
কি সাধ্য প্রকৃত কীর্ত্তি নাশিতে তোমার?

যে স্থলে কাল প্রবাহে অক্ষত তিন দরিদ্র ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া বিহ্বল হইয়া গিয়াছে; যে স্থলে, সেই ভাবমুগ্ধ পরমৌদ্ধত্যের মধ্যেই ভবিষ্য-কবিবরের পরিচয় পাই; সেই স্থলেই প্রকৃত প্রস্তাবে 'পলাশীর যুদ্ধের' বিভাবিনী শক্তি প্রকট হইয়াছে।

তারপর 'পলাশীর যুদ্ধ' কেবল প্রতিভার স্বেচ্ছা-দৃপ্ত সঙ্গীত, আপাতঃ দর্শনে, উহার কোন লক্ষ্য নাই, কোন নৈতিক ভিত্তি নাই, উহা কেবলি আনন্দ প্রকাশ? কবির হৃদয় আনন্দে নাচিতেছে, কবি হৃদয়ের মধ্যে আত্ম প্রতিভার সমুদ্র কল্লোল ও কামান গর্জ্জন শুনিতেছেন—গান ত অপরিহার্য্য; এখন যে কোন বিষয় অবলম্বন করিয়াই চলুক। বাহ্যতঃ, উদ্দেশ্য ভারাক্রান্ত নহে বলিয়া পলাশীর যুদ্ধ নববসন্তের উৎকণ্ঠ পিকস্বরের মতন উজ্জ্বল, মধুর, রসাল; এক শ্রেণীর কাব্য-রসিকের নিকট চিরকাল হৃদয়গ্রাহী; চিরকাল কবির পরবর্ত্তী সিদ্ধ-লক্ষ্য গ্রন্থাবলী অপেক্ষাও সমাদৃত।

কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের উদ্দেশ্য আমাদের অবস্থা-বৈগুণ্যেই প্রকটিত হইতে পারে নাই। আমরা দেখিব, প্রেম—স্বদেশ প্রেম, স্বজাতি-প্রেম সর্ব্বত্র নবীনচন্দ্রের প্রতিভার উদ্দীপক শক্তি ও অবলম্বন। মধুসূদনে যে স্বদেশ বা স্বজাতি প্রেমের অভাব, অন্ততঃ পক্ষে অস্ফুটতা; সহৃদয় হেমচন্দ্রে নানাস্থানে যাহার কিংকর্ত্তব্য-শূন্য উত্তরঙ্গ উচ্ছ্বাস; নবীনচন্দ্রে তাহারই সমপ্রসিত লক্ষ্যে স্ফূর্ত্তি ও প্রয়াস। বুঝি, ঐ জন্যই, নবীনচন্দ্র কখনও 'মানবতার' ভূমি পরিহার করেন নাই, কখনও অনৈতিহাসিক বা অতিমানব ঘটনা-বলম্বনে কাব্য প্রণয়নে নিযুক্ত হন নাই। 'পলাশীর যুদ্ধের' অন্তস্থলেও ঐ স্বদেশ-প্রেমই কার্য্য করিয়াছে; কবি উহাই উদ্দীপ্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি—গঠন-প্রয়াসী কবি; বায়রণ বা ভলটেয়ারের মতন ধ্বংস-প্রয়াসী নহেন। অধিকন্তু, 'পলাশীর' যুদ্ধে কবি কেবল 'সেরাজুদ্দৌল্লা বধ' লিখিতে অগ্রসর হয়েন নাই, কোন রূপ 'বধ' কিম্বা 'সংহার'; লক্ষ্য করিয়া এই কবি কেবল 'আত্মনিষ্ঠ শিল্প কলার' আদর্শে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। পরাধীন দেশের কবি নবীন চন্দ্রের সতর্ক-রুদ্ধ বাষ্পোচ্ছ্বাস 'পলাশীর যুদ্ধের' প্রধান সৌন্দর্য্য, এই গ্রন্থের স্থল বিশেষের জন্য কবিকে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। স্বাধীন-প্রকৃতি নবীনচন্দ্র এই জন্য নিজের সেবা বৃত্তিকে চিরকাল ধিক্কার দিয়া আসিয়াছেন; সময় সময় নিজের অবস্থানিয়ন্ত্রণায় নিদারুণ যাতনানুভব করিয়া গিয়াছেন।

তৎপর রঙ্গমতী, এই কাব্য কবির আত্ম-প্রতিভার প্রতিকৃতি। জন্মভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমুগ্ধ কবি, প্রত্যক্ষ ভাবে, সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যস্থলে আপন বীণাপাণিকে স্থাপন করিয়া, যদৃচ্ছসঙ্গীতে আপন হৃদয়কে ছাড়িয়া দিয়াছেন। কোন বাধা নাই, অপর কেহ শুনিতেছে কিনা, বিচার করিতেছে কিনা, যেন সেই দিকে কবির কিছুমাত্র লক্ষ্য

নাই, আপন আনন্দ-দত্তে প্রবাহিনী আমাদের এই কর্ণফুলীর ন্যায়, সমস্ত ছন্দোবন্ধ, শাস্ত্র বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্বাধীনতার মধ্যেই কবির প্রকৃত অন্তরতত্ত্ব আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি, সেই গ্রন্থের নায়ক প্রকৃত প্রস্তাবে স্বয়ং নবীনচন্দ্র, বীরেন্দ্র প্রভৃতি বাহ্যিক উপলক্ষ্য মাত্র। সেক্সপীয়রের 'রোমিও জুলিয়েতের' ন্যায় এই গ্রন্থ কবির প্রথম যৌবনোল্লাসের—আত্মিক প্রতিকৃতি।

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক মনে করিতেছি। এই জাতীয় ভাবমুগ্ধ কবির পক্ষে, ছন্দোবন্ধ যেমন একদিকে নিয়ন্ত্রণারূপে কার্য্য করে, অন্যদিকে তেমনি, কবির স্বেচ্ছাচার সীমাবদ্ধ করিয়া মহদুপকার সাধিত করে। মিলটন 'প্যারেডাইস্-লষ্ট' কাব্যের ভূমিকায় কাব্যের ছন্দোবন্দকে নিগৃহীত করিয়া একভাবে সমুচ্চ সাহিত্যের মহদুপকার সাধিত করিয়াছেন। মিলটনের প্রতিভা একদিকে যেমন সমুদ্রের ন্যায় বিপুল উচ্ছ্বাস ও সামর্থ্যময়; অন্যদিকে, তেমনি, আপন প্রকৃতির সুপ্রতিষ্ঠ সংযমবশে নিয়ন্ত্রিত ও নিগৃহীত, মিলটনের পক্ষেই অমিত্রছন্দের স্বাধীনতা সুফলপ্রসূ হইতে পারিয়াছে। আমাদের মধুসূদনও সর্ব্বত্র এই স্বাধীনতার সুব্যবহার করিতে পারেন নাই। 'পলাশীর যুদ্ধের' ছন্দোবন্ধন উল্লঙ্ঘন করিয়া, নবীনচন্দ্র, পরবর্ত্তী কাব্যাদিতে, এক দিকে যেমন স্বাধীনতাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অন্যদিকে, তেমনি, ছন্দের সালঙ্কার ধ্বনি-গৌরব ও সংযমনিষ্ঠাকে হারাইয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্ত প্রত্যেক নবীন সাহিত্য-সেবীর প্রণিধানের বিষয় হইয়া থাকিবে।

রঙ্গমতীতে এই পরাধীন জাতির কবির নিপীড়িত হৃদয় স্বাধীনতার লোকপাবনী মূর্ত্তির দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কাঁদিয়াছে; স্বদেশের স্বজাতির বর্ত্তমান দুরবস্থা পরিদর্শন করিয়া অশক্ত আকুলতায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছে। এই রঙ্গমতীর মধ্যেই রৈবতিক কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের মূল উদ্দেশ্যের সূত্রপাত দৃষ্ট হয়। কবি অতঃপর দীর্ঘজীবন উহারই অনুধাবনে ব্যয়িত করিয়া ঐ কাব্যত্রয়ের বিপুল আয়তনের মধ্যে, সর্ব্ব-প্রযত্নে, ঐ মহাসমস্যার পূরণেই চেষ্টিত হইয়া গিয়াছেন।

কবি-ধর্ম্মের মধ্যেই এই দেশের, এই বিশাল হিন্দু-বৌদ্ধ-মোসলেম-খ্রীষ্টান-নিষেবিত ভারতবর্ষের ভবিষ্য উদ্ধার-বীজ দর্শন করিয়াছিলেন। তাই কিরূপে এই বিভেদ-বিপর্য্যস্ত অবস্থার মধ্যে "এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক ভগবান" সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়, সমস্ত বিভেদের মধ্যেও ঐক্য স্থাপন করিতে পারা যায়, তাহার আদর্শ স্থাপনে কবি-হৃদয় এত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাস সেই উদ্দীপনার ফল; ভারতবর্ষের অতীত যুগ হইতে, সংস্কৃত সাহিত্যের গুহা-গত ভাবধারা নব পরিচ্ছদে পুনরাবর্ত্তিত করিবার ইহাই হেতু, "উনবিংশ শতাব্দার মহাভারত" রচিত হইবার আধ্যাত্মিক কারণ। চণ্ডী ও গীতার অনুবাদ, খ্রীষ্ট, অমিতাভ, চৈতন্য ও মহম্মদের অনুকল্পনা তাহারই অবান্তর ঘটনা মাত্র।

আমাদের সাহিত্যের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য, যে কবি এই 'চৈতন্য' সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এই বঙ্গদেশের কবিগণের মধ্যে চৈতন্যের ভক্তি সমুচ্ছ্বাসিত হৃদয়ের উত্তাল তরঙ্গ হৃদয়ঙ্গম করিবার যোগ্য ছিলেন, একমাত্র

নবীনচন্দ্র। নবীনচন্দ্র একদিকে যেমন ক্লিওপেট্রা ও জরৎকারুর চরিত্রকে অনুপম ভাবে বুঝিয়াছিলেন; অন্য দিকে, তেমনি, শৈশবে সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক শৈব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াও, স্বীয় হৃদয়-সাধর্ম্ম্যে বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছিলেন ও শ্রীচৈতন্যের চরিত্রকে বুঝিতেছিলেন। কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের শ্রীকৃষ্ণে গৌরাঙ্গেরই পূর্ব্বাভাষ পাইয়াছিলাম। চৈতন্যে উহাই সংহত হইতেছিল। ইতিমধ্যেই মহাকালের আশ্বাস আসিয়া পড়িয়াছে; কবি স্বদেশের হৃদয়ে অসম্পূর্ণ কর্ম্ম-সন্তাপ রাখিয়াই মহাপ্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এইরূপে স্বদেশানুরাগে ও বিশ্বজনীন প্রেমে, স্বদেশের ক্ষেত্রে, এই স্বপ্ন-মুগ্ধ বিরাট কবি-হৃদয় আমরণ একনিষ্ঠ থাকিয়া আপন ভাবে মানব-সেবায় ইহ জীবন পাত করিয়া গিয়াছেন। ইহাই তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-সাধনা। কাহারও মুখাপেক্ষা করেন নাই; সম্মিলনের আদর্শ সংস্থাপন করিতে যাইয়া, স্বসমাজের প্রবল ব্রাহ্মণ্য প্রভাবকে নিগৃহীত করিতেও ছাড়েন নাই। তিনি বঙ্গ সাহিত্যের প্রাচীন মহাভারতের মুক্তবায়ু, ও ভারত-সমুদ্রের কল কল্লোল প্রবাহিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। সম্প্রদায় বিশেষের ক্ষুদ্র স্বার্থ বা অভিমান আহত হইতেছে কিনা, তাহার বিচার করিতে চাহেন নাই।

কোন প্রাচীন পণ্ডিত সংস্কৃত সাহিত্যে এক অদ্ভুত প্রণালীর সমালোচনার রেখা-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। "কাব্যেষু মাঘঃ, কবিঃ কালিদাসঃ।" কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? না, মাঘের শিশুপাল বধ, আর কবি কে? না কালিদাস। কবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, তাহা জিজ্ঞাস্য নহে; কারণ প্রশ্নকর্ত্তা অপর কাহাকেও কবি বলিয়াই জানেন না, বহু কবির অস্তিত্ব বিষয়ে কোন আশঙ্কাই হয় নাই। কবি কাহাকে বুঝ?—না, কালিদাস। কালিদাস উৎকৃষ্ট কাব্যকার না হইতে পারেন, তবু, তিনিই কবি। উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিয়াও যাহার নিকট কবির "সার্টিফিকেট" পাওয়া গেল না, এমন সমালোচকটী কে? ফলতঃ,কথাটীর বিস্তর সারবত্তা আছে। উৎকৃষ্ট কাব্য নানা কারণে হয়। কিছু শক্তি, বিস্তর শ্রম, ও 'মধ্য রাত্রির তৈল খরচ'; অভিধান ও অলঙ্কার শাস্ত্র, এত সমস্তের মিলনেই শিশুপাল বধের মত উৎকৃষ্ট (?) কাব্য রচিত হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া, কবি! কবি, সংস্কৃত সাহিত্যে কেবল একজন।

এই ভাবে আলোচনা করিতে বসিলে বলিতে পারা যায়, পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট কাব্যের সংখ্যা অগণ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত কবির সংখ্যা 'হাতের কড়ায়' গণিয়া লওয়া যায়। আরও দেখা যাইবে, তাঁহাদের অনেকেই, হয়ত উৎকৃষ্ট কাব্য একটীও লিখিয়া যাইতে পারেন নাই, ঐ হিসাবে নবীনচন্দ্রের লেখা বিচার করিতে বসিলে, আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবলই এই ধারণা হইতে থাকে—এই একজন প্রকৃত কবি; জগতের কবি-গণনায় যাঁহার নাম বাদ পড়িবে না, তেমনই একজন কবি, তাঁহার কাব্য হয়ত, রসজ্ঞ পাঠকের মন সর্ব্বথা সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না; স্থানে স্থানে হয়ত 'আপশোষ' রাখিয়া যাইবে—কিন্তু তবু কবি? ইংলণ্ডের সেক্সপীয়র বা বায়রণ যেমন শত শত ভুল ভ্রান্তি সত্বেও চিরকালের শরণ্য ও বরণ্যে কবি—এই জাতীয় একজন কবি। সাহিত্য-জগতে এমন কবি দুর্লভ—যাহার কবিত্ব শক্তি ঝড়ের মত,—কোন বাধা বিচার নাই,

ভাষার, ব্যাকরণের, ছন্দের, অলঙ্কারের মুখাপেক্ষা নাই ; যাহার চাল চরিত্রে কোনরূপ সংযম নিরোধ নিবৃত্তি নাই ; ভিতরে বাহিরে কোনরূপ ভয় বিক্ষোভ নাই ;—যে আপন শক্তিদম্ভে যথেষ্ট আস্ফালনে ছুটিয়াছে ; এই ভারতবর্ষের প্রাচীন শিখর শিরোদেশ হইতে নিঃসৃত গঙ্গার ন্যায় ছুটিয়াছে—অথচ সিদ্ধ লক্ষ্যে, ভারত মহাসমুদ্রের দিকেই ছুটিয়াছে।

নবীনচন্দ্রের কবিতার রচনা প্রণালী পর্য্যালোচনা করিতে বসিলেও তাহাই বুঝিব। কোনরূপ নিয়ম শৃঙ্খলা, বিচার বিতর্ক নাই ; সংশোধন প্রসাধন গোপন নাই ; প্রবাহের মত তরতর বেগে ছুটিয়াছে। সময় সময় এক বৈঠকেই এক একটা 'সর্গ' উৎসারিত হইয়া তদবস্থায় মুদ্রাযন্ত্রগত হইবার জন্য গিয়াছে! নবীনচন্দ্রের কোন লেখার কখন নকল-নবীশের আবশ্যক পড়ে নাই। নবীনচন্দ্রের চিন্তা ও রচনা সমগতিক ছিল। বীণার ঝঙ্কারের ন্যায়, তাঁহার ভাবাহত হৃদয়ের স্পন্দনগুলিই কবিতা রূপে প্রকটিত। তাঁহার হৃদয়-শোণিতের সাহায্যেই তাঁহার কাব্যাদি লিখিত হইয়াছে। আত্ম জীবনীর পিতৃ-বিয়োগাধ্যায়ের ও কুরুক্ষেত্র প্রভাসের স্থল বিশেষের, হস্তলিপি এক অপূর্ব্ব, পরম পবিত্র ও সযত্ন-রক্ষণীয় পদার্থ। নবীনচন্দ্রের হৃদয়োৎসারিত বড় বড় অশ্রুবিন্দুতে স্থানে স্থানে মসীলিপি ক্ষালিত হইয়া গিয়াছে!

নবীনচন্দ্রের জীবন আলোচনা করিয়াও তাহাই দেখিব, সম্পূর্ণ স্বাধীন—এমন কি, স্বেচ্ছাতন্ত্রিক জীবন। শৈশব হইতেই উঁহার কোন অভিভাবক নাই। শৈশবে জননী অন্তরালে সরিয়া গিয়া, বালকটীকে সম্পূর্ণ রূপে, প্রকৃতির হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছেন ; অতি স্নেহময় পিতাও স্বীয় হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া, বালকের সমস্ত বন্ধন কাটিয়া দিয়া তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় ইষ্টদেবতা ভোলানাথের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। বালক সমবয়সীর সমস্ত সৃষ্টি করিয়া, হাসিয়া খেলিয়া, নাচিয়া গাইয়া, শিক্ষকদিগকে, পাড়াপ্রতিবেশীদিগকে, বিধিমতে উৎপীড়িত করিয়া, দম্ভে ও অহঙ্কারে উৎকণ্ঠ হইয়া দেশময় ছুটিয়া চলিয়াছে। তারপর, সাংখ্যভূমি হইতে পিতার প্রস্থান—ক্ষণকালের জন্য সংসারের বিভীষিকা মূর্ত্তির প্রকাশ—তাহাতেই জাগরণ, প্রকৃত কবি নবীনচন্দ্রের জাগরণ! সেইদিন, দুঃখের দীক্ষায়, পবিত্র পিতৃভক্তির অশ্রুজলে, দীনহীনা চট্টলভূমির একপ্রান্তে যে কবি জাগিয়াছিলেন, বঙ্গদেশের সাহিত্যকুঞ্জ সেই অকৃত্রিম স্বভাব-কবির প্রমত্ত সঙ্গীতেই এতদিন মুখরিত হইতেছিল ; এবং আজ তাঁহারই সার্থক জীবনের 'বিজয়া' সমাহিত হইয়া গিয়াছে।

আমরা, তাঁহার স্বদেশীগণ, তাঁহার অনুরক্তগণ, তাঁহার কবিতার ভক্তগণ, আজ আমাদের হৃদয়-বেদনা কিরূপে প্রকাশ করিব? আমাদের হৃদয় কি প্রতি মুহূর্ত্তে বলিয়া দিতেছে না, এই দেশের জ্যোতিঃ চলিয়া গিয়াছে ; আমাদের প্রিয়তম সুহৃদ্, আমাদের সাহিত্যের রসকৌমুদী-নির্ঝর নবীন চন্দ্র আর ইহজগতে নাই! যিনি আমাদের জন্মভূমিকে এত ভালবাসিতেন ; জন্মভূমির কোন লোক সাহিত্য-সেবা করিতেছে জানিলে, যাঁহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইত ; জন্মভূমি যাঁহার নিকট সর্ব্বতোভাবে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' ছিল ; যিনি যত্র-তত্র সগর্ব্বে তাঁহার জন্মভূমির গৌরব কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন ; এই দেশের শৈল নদী সাগরকান্তারের মাহাত্ম্য-প্রতিভা যাঁহার

কবিতায় সর্ব্বত্র শতমুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, জন্মভূমির যে বাৎসল্য-মুগ্ধ শিশু, প্রতি বৎসর, দূরপ্রবাস হইতে মাতৃবক্ষে ফিরিয়া আসিয়া স্নেহগদগদ কণ্ঠে অনুপম ভাষায় ডাকিতেন :—

মা! মা! মা! কত কাল পরে
ডাকিলাম ওমা পরাণ ভরে!
শৈল-কিরীটিনী,
সাগর-কুন্তলা
মারুৎমালিনী—হেরিলাম তোরে!

জন্মভূমির সেই প্রিয়তম পুত্র যখন নিজের জীবনের শেষ জানিয়া, দূরদেশ হইতে জন্মভূমির বক্ষে, পিতৃশ্মশানের পার্শ্বে বিশ্রামের জন্য ফিরিয়া আসিলেন ; ও অবশেষে যোগী-বেশে জন্মভূমির বক্ষে সংসার-সন্তপ্ত বক্ষ: রাখিয়া চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন, তখন কি এই বহু প্রাচীনা অবলাভূমি, ইহার শৈল-নদীকান্তার সমুদ্র সহ পরম শোকাবেগে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে নাই? যে কবি যৌবনের প্রারম্ভে গাইয়াছিলেন :—

একদা প্রভাতে সখে, মেলিয়া নয়ন
সিন্ধু প্রান্তে সুসজ্জিত জলদ মালায়,
দেখিলাম জন্মভূমি প্রতিমূর্ত্তি প্রায়!
তেমতি শ্যামল শোভা মণ্ডিত শেখর,
স্থানে স্থানে সমুন্নত অতীব সুন্দর
রহিয়াছে স্থির ভাবে প্রবাহ খেলিয়া,
উর্ম্মির উপরে যেন উর্ম্মি সাজাইয়া!
নিম্নস্তরে সাগরোর্ম্মি সুনীল বরণ
উচ্চস্তরে শেখরোর্ম্মি শ্যাম সুদর্শন!

জন্মভূমির সেই হৃদয়ঙ্গম সন্তান আজ কোথায়? আজ তাঁহার অভাবে এই ভূমি কি আপনার বিপুল সঞ্চিত ভাবিনী শক্তি ও মমতা-বিধায়িনী স্নেহ করুণা লইয়া শূন্য প্রতীক্ষায় নিশ্বাস ফেলিতেছেন না? এই ভূমি চিরকাল কবিভূমি, সাধু, যোগী, ফকির, দরবেশের ভূমি। এই ভূমিই অতীত কালে আপন মহনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও জ্ঞান গরিমায় 'রম্যভূমি' ও 'পতিত বিহার' নামে খ্যাত হইয়াছিল ও ভারতবর্ষের গৌরবস্বরূপ ব্রাহ্মণ্যবিতাড়িত বৌদ্ধধর্ম্মকে আপন নিভৃত শৈলকন্দরে আশ্রয়দানে রক্ষা করিয়াছিল। এই ভূমিই চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে, বাঙ্গালী জাতির জাগরণ যুগে, নবদ্বীপ চন্দ্রের বিশ্ববিজয়ী ভক্তি-সংকীর্ত্তনে, আপনার শান্ত নিভৃত গুহাসদন হইতে স্বভাব সুকণ্ঠ মুকুন্দ ও ভক্ত পুণ্ডরীককে প্রেরণ করিয়াছিল ; এই ভূমিই বঙ্গ-সাহিত্যের নিদানস্বরূপে রামায়ণ ও মহাভারতের পাবনীভাবধারা ভাষান্তরিত করিয়া আপন দরীকান্তার রক্ষা করিয়াছিল ; ও শত শত কবির হৃদয়-রত্নাকর হইতে সুবৃহৎ 'জাগরণ' ও 'মনসার পুঁথি' সঞ্চিত করিয়াছিল ; এই ভূমিই মোস্‌লেম-যুগে সংস্কৃত পারশীক উর্দ্দু ও বাঙ্গালা ভাষায় ও ভাবের মহামিলন সংঘটনে, বাঙ্গালার সাহিত্য-মঞ্চে কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রের সহিত একাসনে বসিবার জন্য, কবিবর আলাওলকে সমুদ্দীপ্ত করিয়াছিল এবং এই ভূমিই পরিশেষে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যসভ্যতার সম্মিলন স্থলে, ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সাহিত্য ধর্ম্ম, রাজনীতি ও সমাজনীতির সঙ্কটযুগে, প্রাচীন মহাভারতের চিরন্তন আদর্শকে নব-পরিচ্ছদে পুনঃপ্রচার করিবার চেষ্টা কল্পে, আপনার শৈলনদী সমুদ্রের প্রতিভায় সমুদ্দীপ্ত করিয়া নবীনচন্দ্রকে বঙ্গদেশের সাহিত্য-রঙ্গে প্রেরণ করিয়াছিল। মায়ের এই শেষ আশা ও প্রযত্ন সফল হইয়াছে কিনা, বা কি পরিমাণে সফল হইয়াছে, তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা বা কর্ত্তব্য আমাদের নহে।

আজ আমরা জননীর প্রিয়পুত্র ও প্রিয়তম আত্মীয়কে শ্মশানানলে ভস্মীভূত করিয়া শোকভারাক্রান্ত-হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

নব্য জাপানের জীবনসঞ্চার।

"All Europe wonders not a little
At the new Empire that has arisen."
Wellheim.

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই, যে দিন আমেরিকার প্রতিনিধিরূপে, অবাধ বাণিজ্যের প্রীতিলিপি হস্তে, অসীম সাহসী কমোডোর পেরী, তাঁহার ধূমোদ্গীরিত রণতরীশ্রেণী সঙ্গে, জাপানের শৈলশোভাময় 'এড্ডো' উপসাগরের কূলে 'উরগা' পল্লীর তীরে, সমুদ্রবক্ষে, দাঁড়াইয়াছিলেন, সে দিন নব্যজাপানের জীবন-ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় দিন। যথার্থই জাপানের পক্ষে সে দিন বিধাতা-প্রেরিত কল্যাণময় দিন। যেন শুভাকাঙ্ক্ষিণী সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর মূর্ত্তিমান আভাসরূপে, পেরীর পোতবহর, বিনিদ্র জাপানবাসীকে জগতের জাগ্রত জাতিদের সহিত জাগিতে আহ্বান করিল।

পেরীর কল্যাণে সেই প্রথম প্রতীচ্যের সহিত সুদূর প্রাচ্যের সম্মিলন। জাপানে বিদেশী-বিদ্বেষ যখন বদ্ধমূল, 'শ্বেত সয়তান'-দের ছলনা হইতে আত্মরক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে জাপান যখন কৃতনিশ্চয়, সাগরবেষ্টিত নিরাপদ দ্বীপমালামধ্যে তাহার নিজস্ব চারুশিল্প, তাহার নিজস্ব চেরীপুষ্পোদ্যানের সুকুমার সাহিত্য, তাহার পুণ্যস্মৃতিময় 'দৈবৎসু,' (বুদ্ধ) তাহার উদ্দীপনাপূর্ণ 'সামুরায়' বীরগাথা, তাহার অফুরন্ত স্বর্ণখনি ও সোণার শস্য, তাহার কবি ও প্রেমিক প্রেমিকাদের লীলানিকেতন নিত্য নব সৌন্দর্য্যময় শুভ্র-কিরীটধারী 'ফুজিইয়ামা,'—এই সব তাহার জীবন ও আনন্দের পক্ষে যখন যথেষ্ট মনে করিতেছিল, 'শ্বেতশয়তানদের নিকট কিছু শিক্ষা করিবার আবশ্যক নাই,' 'শান্তিময় জাপানে বিদেশীর প্রবেশাধিকার দিলে আর রক্ষা নাই,' এই ভাবের প্রবলতার মধ্যে যখন ইয়োরোপের অন্যান্য শক্তিপুঞ্জ জাপানে বাণিজ্যাধিকার লাভের আশায় যথাসাধ্য নিষ্ফল চেষ্টা করিবার পর অবশেষে নিরাশচিত্তে ঘরে ফিরিতেছিল, এমন সময়ে, সহসা যেন যাদুকর ঐন্দ্রজালিকের ন্যায়, পেরী সস্মিতমুখে সাগর-বক্ষ হইতে জাপানকে অভিবাদন করিলেন, তাহার রুদ্ধদ্বার উন্মোচন করিতে উপদেশ করিলেন। নূতন মহাদেশের পত্রবাহক বলিলেন,—"মানুষে মানুষে যে প্রীতিসম্মিলনের স্বাভাবিক স্পৃহা, জাতিতে জাতিতে যে পরস্পর আদান প্রদানের আবশ্যক, তাহারি জন্য আমরা তোমার দ্বারে উপস্থিত।" সঙ্কোচে, সংশয়ে, লজ্জায় জাপান আমেরিকার নিকট আবরণ উন্মোচন করিল। অনেক কল্পনা জল্পনা, অনেক বিঘ্ন বিরোধ, অনেক মতান্তর মনান্তরের পর, পেরীর আগমনের প্রায় নয় মাস পরে, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ, উভয় রাজ্যে পরস্পর সৌহার্দ্দ-সন্ধিপত্র লিখিত হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে হইলে, সেই দিন নব্যজাপানের জীবন-সঞ্চার হইল।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মার্চ্চ জীবনসঞ্চার দিন, আর সেই ঘটনার চল্লিশ বৎসর পরে, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর,মধ্যাহ্ণ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত 'হাই-ইয়াং' দ্বীপ ও 'ইয়ালু' নদীর প্রবেশ পথ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশে, জাপানের কামান শ্রেণীর করাল অগ্নি-গোলকরাশির ভীম ভৈরব নিনাদে, কোরিয় উপসাগরের দিক্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিতে বিস্মিত স্তম্ভিত জগতের নিকট নব্যজাপানের জন্ম-মহোৎসব-সংবাদ প্রচারিত হইল!

এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব যুগান্তর ঘটনা উল্লেখে তাই কোন প্রতীচ্য প্রাচীন রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াছেন,—আজ ইয়ালু জলযুদ্ধের গুরুত্ব সমগ্র পৃথিবীতে স্বীকৃত হইল। সহসা যেন ইন্দ্রজালের ন্যায় ইহা পূর্ব্ব-এশিয়ার এক সম্পূর্ণ অভিনব অবস্থা উন্মুক্ত করিয়া দিল। সেই বিশাল চীন-সাম্রাজ্য, যাহার বৃহত্বকে পাশ্চাত্য জাতি চিরকাল মহত্বরূপে ভুল বুঝিতেছিল, অসীম অন্তর্নিহিত রুদ্ধ শক্তির ভাণ্ডাররূপে যে দেশ গণনীয় ছিল, তাহাই ভ্রষ্টতার এক চলৎশক্তিহীন বিপুল স্তূপরূপে অসহায় অবস্থায় ভগ্নতা প্রাপ্ত হইতেছে, দেখা গেল। আর জাপান—এক অভিনব আলোক ঔজ্জ্বল্যে প্রতিভাত, এক আদর্শ রাষ্ট্রীয় শক্তি-রূপে দণ্ডায়মান; সে আর অন্যদীয় নেতৃত্বের করধৃত রজ্জুদ্বারা পরিচালিত নয়, পরন্তু পূর্ব্বে এশিয়ার শ্রেষ্ঠতম কর্ম্মকর্ত্তৃত্বের দায়ীত্ব গ্রহণে সম্পূর্ণ কৃতনিশ্চয় এবং সম্পূর্ণ যোগ্য; এমন এক শক্তি, যাহার কথা ভবিষ্যতে নবসূর্য্যের উদয়দ্রষ্টা প্রতিবাসী প্রাচ্য দেশ সমূহের সর্ব্ব প্রকার রাজনৈতিক সম্মিলন—সাফল্য উপলক্ষে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য রাজনীতি-বেত্তা-দের দৃঢ়বদ্ধমূল পূর্ব্ব সংস্কার সমূলে উৎপাটিত হইল, জনসাধারণের চিরপোষিত ভ্রান্ত বিশ্বাস সজোরে আঘাত পাইল এবং যখন ইয়ালুর যুদ্ধধূমাবলী চীন-সমুদ্র-তরঙ্গের উপরে উপরে দূর দূরান্তরে প্রবাহিত হইল, তখন পাশ্চাত্য পৃথিবীর বিস্মিত জনসাধারণ দেখিতে পাইল, প্রাচীন প্রাচ্যভূমি সেই উদ্বেলিত সাগর জলে চীন সাম্রাজ্যের স্পর্দ্ধিত জলযুদ্ধ-শক্তির সহিত ডুবিতেছে, তাহার পরিবর্ত্তে এশিয়ার সুদূর পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে সুদৃঢ়ভঙ্গীর সঙ্গে নব্য প্রাচ্যভূমি দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইতেছে। কয়েকটী মাসের মধ্যে সেই 'চঞ্চল প্রকৃতি, পরিহাসজনক অনুকরণকারী ক্ষুদ্র জাপান' একটী জলযুদ্ধ শক্তিরূপে পরিণত এবং যেন বর্ত্তমান কালের সেই মহাকায় রাক্ষস-বধ কর্ত্তা! জাপানের রাজনীতিবেত্তা ও যোদ্ধাগণ, তাঁহাদের স্বদেশকে জগতের নিকট একটী রাষ্ট্রীয় শক্তিরূপে প্রমাণ করিতে যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহারই সম্পূর্ণ সাফল্য দৃষ্টে, তাঁহাদের অধর প্রান্তে কিঞ্চিৎ সংযত হাস্যচিহ্ন দেখা গেল। রাষ্ট্রীয় শান্তিসুখ-সাফল্যের সহিত সংগ্রামের যে কি নিকট প্রয়োজন সম্বন্ধ, তাঁহারা পাশ্চাত্য জাতিদের ধরণ, ধারণ আকৃতি প্রকৃতি হইতে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। যে সব রাজ্য কিছুদিন পূর্ব্বে জাপানকে অতি যৎসামান্য শিষ্টাচার প্রদর্শন করিত, এখন আবার তাহারি সঙ্গে মিত্রতা-সম্বন্ধ পাতাইবার গুরুতর বিষয়ে তাঁহারা বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিলেন! আরও কোন কোন প্রধান শক্তি অন্যান্য শক্তির ন্যায় জাপানকে মহা সম্মান প্রদর্শন করিল সত্য, কিন্তু তাহাকে এখন হইতে বিপজ্জনক প্রতিযোগী বোধে দমন করিবার অভিপ্রায় এক অমানুষিক, অন্যায়, স্বার্থাভিপ্রায়-দুষ্ট একতায়

আবদ্ধ হইল। কি সুহৃদ্, কি শত্রু, সকলেই তখন সেই নবাগত পরিবর্ত্তিত অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হইলেন, কারণ মনোবুদ্ধির অগোচরে এক নব্য প্রাচ্য শক্তির অভ্যুদয় দেখা যাইতেছে! *

সুদূর প্রাচ্যের এই অভাবনীয় ঘটনা সম্পর্কে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মানসিক চঞ্চলতা এতদূর বৃদ্ধি পায়, যাহা অবশেষে জনসাধারণের মধ্যে 'পীতাতঙ্ক' নাম পরিগ্রহ করে। অনেক রহস্যময় উপভোগ্য ইতিহাস এই ঘটনার সহিত জড়িত আছে। এই পীতাতঙ্ককে মূর্ত্তিমান করিবার রাজনৈতিক অভিপ্রায়ে বিগত ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের জার্ম্মান্ সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম স্বহস্তে একটী রূপক চিত্রের আভাস অঙ্কিত করেন, তাহাই সচিত্রিত করার জন্য অধ্যাপক স্নাক্‌ফাসের প্রতি (Professor Knackfuss) ভারার্পিত হয়। সযত্নে রাজাদেশ পালিত হইলে মূর্ত্তিমান 'পীতাতঙ্ক' রাজকরে অর্পিত হইল। সম্রাট তাঁহার সেই স্বকপোল-কল্পিত চিত্রখানি অবিলম্বে তাঁহার পরম বন্ধু 'জার' মহোদয়কে উপহার দিলেন। রুষ সম্রাট এই উপদেশপূর্ণ চিত্রিত চিত্রের নিগূঢ় অর্থ বিলক্ষণ বুঝিলেন এবং কৃতজ্ঞ গদ্গদ চিত্তে শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্‌কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইলেন। তারপর, পাশ্চাত্য জাতির প্রেমে মুগ্ধ, নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার অবতার তুল্য জার্ম্মানীর নব্য ভব্য দ্বিতীয় উইলিয়াম্ চিত্রের নিম্নে স্বহস্তে নিজ নাম স্বাক্ষর পূর্ব্বক জার্ম্মান্ ভাষায় লিখিলেন,—"হে ইউরোপীয় জাতি সকল! তোমাদের গৃহ ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তোমরা সকলে সম্মিলিত হও।"—ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইল, ইংরেজিতে অনূদিত হইল,—"Nation of Europe! Join in defence of faith and your home." এই সদুপদেষ্টা যে তিনিই, জনসাধারণে তাহার নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করিবার একান্ত আগ্রহে, সেই মহতী নীতি কথার নিম্নে স্পষ্টাক্ষরে "Wilhelm, J.R." স্বাক্ষরিত হইল। খ্রীষ্টশিষ্য এই জার্ম্মান্ সম্রাটটীর মিত্য নানা ভাব-প্রসবিণী কল্পনার কথা ইহিপূর্ব্বেই

* The importance of Yalu Sea fight was quickly appreciated throughout the world. It revealed suddenly, as if by magic, the existence of an entirely new, hitherto barely suspected, condition of affairs in Eastern Asia. The huge Chinese Empire, which western world, ever ready to mistake bigness for greatness, had credited with boundless stores of latent strength, was shown to be an inert mass of corruption, feebly drifting towards disintegration, whilst Japan stood revealed in the full glare of a new light as a nation no longer in leading-strings, but capable of being, and fully determined to be, a dominant factor in Eastern Asia—a power to be reckoned with, in future, in any political combination affecting the countries which face the rising sun. Preconceived notions, deeply implanted in the minds of western statesmen, were uprooted, popular misconceptions received a rude shock, and as the battle-smoke drifted away over the waves of the China sea, the astonished eyes of accidentals beheld the old far east sinking in the flood, along with the boasted naval power of China, and in its stead, rising steadily from the "edge of Asia" the new far east came into view. In a few months, "frivolous, superficial, grotesquely imitative, little Japan" had become a naval power, and "the modern Jack the giant killer." The statesmen and the warriors of Japan smiled grimly as they noted the complete success of their efforts to prove Japan a nation. They had rightly gauged the relative value of the triumphs of peace and of those of war in the estimation of the great powers of the west. Governments that had, in the past, treated Japan with scant courtesy now seriously considered the question of an alliance with her. Other great powers paid her the almost equally great compliment of looking upon her as a dangerous rival and formed a monstrous, unnatural coalition for the purpose of coercing her. Friends and foes alike had begun to grasp the changed situation, the new far East was born."

"New Japan", Diosy.

দেশ বিদেশে প্রচারিত ছিল, এবার এই পীতাতঙ্ক তাঁহার অনন্যসাধারণ খ্রীষ্টান-প্রেমের কাহিনীও দিগ্‌দিগন্তে প্রচার করিল। এহেন রাজকপোল-কল্পিত চিত্র খানি আমাদের প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে। রূপক চিত্রে ইয়োরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মূর্ত্তিমতী শক্তিরূপিণী নগ্নকরবাল-ধারিণী (Female Personifications of the Principal nations of Europe) নারীমূর্ত্তি সকলের উজ্জ্বল নয়নে অনন্যনারী-সুলভ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিচ্ছুরিত, সাভিলাষ দৃষ্টি— এ সকলই পীতাতঙ্ক উপলক্ষে বীরত্ববিকাশ। তাঁদের ললিত-মধুর যৌবনের ঢল ঢল সৌকুমার্য্যে কি অসাধারণ চিত্রাঙ্কণী প্রতিভাই প্রকাশিত! আমি নিয়ে তাহার যথাসাধ্য বর্ণনা করিতেছি, প্রিয় পাঠক পাঠিকা তদ্বারা মানস-নয়নে যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ করিবেন।

বৃক্ষলতা সম্পর্কশূন্য কৃষ্ণবর্ণ উচ্চ শৈল-শিখরের পাদপ্রান্ত হইতে খুব সম্ভবতঃ বাঁকা-নদী নেভা যেন একটী রজত রেখার মতন বক্রগতিতে ক্রমে দূর হইতে দূরান্তরে দিগন্তে মিলিত। শুভ্র নদী-সৈকতে প্রাসাদ-সৌধ-সমাচ্ছন্ন উজ্জ্বল ইয়োরোপীয় এক নগর শোভা পাইতেছে। সেই উচ্চ শৈল-শিখরোপরি দেবদূতরূপে (Archangel) জার্ম্মাণীর হৃষ্টপুষ্ট নব্য পুরুষপ্রবর জ্বালাময় নয়নে উন্মুক্ত উন্নত লেলিহান তরবার হস্তে দণ্ডায়মান। য়ুরোপীয় প্রত্যেক দেশের এক একটী রঙ্গিণী রণসঙ্গিণীরূপে তাঁহার পার্শ্বে সমবেত। তিনি সুদৃঢ় দণ্ডায়মান দেহে সেই দূরাগত পীতাতঙ্কের দিকে তাঁহার বামহস্তের অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছেন। তাঁহার উন্নত, বিশাল, সুপুষ্ট পক্ষদ্বয় পৃষ্ঠোপরি প্রসারিত। রমণী মূর্ত্তি কয়েকটীর দেহভঙ্গী, গঠন-সৌকুমার্য্য, মুখশ্রী, দৃষ্টি, পরিচ্ছদ-পরিপাট্য ইয়োরোপীয় বিভিন্ন দেশের বিচিত্র রুচির অনুরূপ পরিস্ফুট। জার্ম্মাণিয়া দীর্ঘাবয়ব অথচ পরিপুষ্টদেহা, পরিপূর্ণ মুখশ্রী, কৌতূহলাক্রান্তা ও অভিলাষময়ী, তাঁহার সুপুষ্ট সমুন্নত বক্ষ সযত্ন-বিন্যস্ত বস্ত্রে আবৃত, শুধু শুভ্র সুগোল বাহুদ্বয় সম্পূর্ণ অনাবৃত। দক্ষিণ করে অত্যুজ্জ্বল, তীক্ষ্ণধার-উন্নত তরবারী, বামকরে দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ ঢাল, গর্ব্বিত, দীপ্ত নয়নে তিনি পীতাতঙ্ক লক্ষ্য করিতেছেন। তাঁহার আজানুস্পর্শী সূক্ষ্ম লৌহবর্ম্ম দোদুল্যমান, কটিতট প্রশস্ত কটিবন্ধে বেষ্টিত, উন্নত ললাটের উপর হীরক শিরস্ত্রাণ, তদুপরি প্রসারিত মুক্তপক্ষ ঈগলপক্ষী।

পার্শ্বেই ফ্রান্স—দুলালী, বিলাসিনী, চিরচঞ্চলতাময়ী ফ্রান্স। তন্বী সুকুমারীর ললিত লাবণ্যময়ী, ভঙ্গীময়ী দেহলতা। প্রতিভা-উজ্জ্বল নীল নয়ন-অপাঙ্গে তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিচ্ছুরিত। নব প্রস্ফুটিত শুভ্র কমল যুগলের মত বুকের উপর সূক্ষ্ম বসনোন্নীত যৌবন-চিহ্ন সুস্পষ্ট। রক্তবর্ণ পাৎলা অধর প্রান্তে প্রচ্ছন্ন কৌতুক-কৌতূহলের বৃথা সংযম আয়াস-সূচক মৃদু মধুর হাসি। শীর্ণ সুন্দর নিটোল ক্ষুদ্র বাহুদ্বয় অনাবৃত; দক্ষিণ করে গগনস্পর্শী উজ্জ্বল ভল্লাস্ত্রযষ্টি, উত্তোলিত ভঙ্গীমাময় বামহস্তের করপল্লবে যেন রৌদ্রালোক হইতে নয়নাচ্ছাদনে একাগ্রনয়নে নদী পারের পীতাতঙ্ক প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাঁহার তিলফুল নাসিকা, স্বর্ণকুন্তলরাশি খোঁপাবাঁধা, অতিক্ষীণ কটিতটে রেশম-বিনির্ম্মিত কোমরবন্দ বেষ্টিত। মস্‌লিনসূক্ষ্ম বস্ত্রাচ্ছাদন হইতে নাভিমূল পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ হইতেছে।

তার পরের সারিতেই জার্ম্মানিয়ার

স্কন্ধদেশে রুশিয়া-সুন্দরী তাঁহার হীরকচূড়ী-পরা তুষারশুভ্র নগ্নবাহু বেষ্টন পূর্ব্বক যেন সখী জার্ম্মানিয়ার প্রেমে গদগদভাবে দণ্ডায়মান আছেন। বামকরে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ কশাক ভল্লাস্ত্র পীতাতঙ্কের দিকে উদ্যত। বক্ষ হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত জার্ম্মানিয়ারই মতন লৌহবর্ম্মে আবৃত, কিন্তু তার কারিগরি জার্ম্মানীর ন্যায় সূক্ষ্ম হয় নাই, মোটা বয়নের লৌহবর্ম্ম, রুশিয়ার স্বদেশজাত শিল্প নিশ্চয় অনুমান হয়। আলুলায়িত কেশরাশিতে পৃষ্ঠদেশ হইতে নিতম্ব পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন। ললাটের উপর হীরকতারা জ্বল জ্বল করিতেছে। তিনি সুন্দরী, তাঁহার তুষার-শুভ্র বর্ণ, আয়ত কৃষ্ণনীলাভ নয়ন, কিন্তু মুখশ্রীতে এমন কিছু বিশেষত্ব নাই।

তার পরে অষ্ট্রিয়ার নারীমূর্ত্তি। তিনি কোন অস্ত্রধারণ করেন নাই। কিন্তু অস্ত্রধারিণী সখীগণের সঙ্গিনীরূপে তাঁহাদের পার্শ্বে বিরাজ করিতেছেন। পীতাতঙ্কিতা সখীদের প্রেমমুগ্ধা অষ্ট্রিয়া তাঁহার পশ্চাৎদিকে দণ্ডায়মানা, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া ব্রিটানিয়া সুন্দরীর শুভ্র সুগোল বাহুখানি আদরে ধারণ পূর্ব্বক সনির্ব্বন্ধ আগ্রহে তাঁহার সখীদের দলভুক্ত হইবার জন্য আকর্ষণ করিতেছেন। তথাপি ব্রিটানিয়া যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া। ব্রিটানিয়ার সরল, সুন্দর, অতি-সুন্দর, বালিকাসুলভ মুখশ্রীতে যেন চিন্তাশীলতা মাখানো। অষ্ট্রিয়াসখীর অনুরোধ-উত্তেজনাতেও সে অপূর্ব্ব মুখশ্রীতে চঞ্চলতার কোন লক্ষণ নাই। ইহার অবশ্য কোন নিগূঢ় কারণ আছে। ব্রিটানিয়ার পাশে শিরাবরণবিহীনা, মুক্তকুন্তলা, আয়তকৃষ্ণনয়না, তন্বী-সুন্দরী ইতালী। সকলের শেষে, প্রায় প্রচ্ছন্ন দেহে দুই নারীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান, সম্ভব : একটী স্পেন, আর একটী পর্টুগাল। নবীনা আমেরিকা দলে মেশেন নাই।

আর পীতাতঙ্ক ? সে এক উদ্ভাসিত অগ্নিগোলকাসনে অধিষ্ঠিত দেহে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

সাঙ্কেতি

যে যুগে হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই"—সে যুগ কবে অতীতে বিলীন হইয়া গিয়াছে,—কিন্তু সে যুগে কি আরকালেকার মত ভয় ও বিভীষিকার রাজত্ব ছিল ? তখন "যাইতে" বা "চাহিতে" হয়ত ভয় ছিল ; এখন "শুইতে," "বসিতে" "আহারে" "আলাপনে"ও ভয় জাগিয়া উঠিয়াছে। সদা ভয়—কখন কাহার ভাগ্যে কি হয়! লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র, এইরূপ ভয়ে দেশ ছাড়িয়া বিলাতে গেলেন, কত কত রূপে কত কত নিরপরাধী ব্যক্তি নির্ব্বাসিত, নির্ব্বাসিত ও কারারুদ্ধ হইলেন! এরূপ দুর্দ্দিন এদেশে আর কখনও সমুপস্থিত হয় নাই!

ভয়ে ?—ভয়ে নয় ত কি ? ঘোষিত হইয়াছে, স্বদেশীর ভয়ে লাজপত রায় দেশত্যাগী, বিদেশীর ভয়ে বিপিনচন্দ্র দেশত্যাগী, এবং অদম্য সুরেন্দ্রনাথ মৃতবৎ নিশ্চল! বুদ্ধি বা জ্ঞান, প্রতিভা বা চৈতন্য, সম্পদ বা ঐশ্বর্য্য—কিসে রাসবিহারী পার্শী মেটা অপেক্ষা হীন ?—কিন্তু তিনিও যে, সে দিন,

মাত্রীকে, বাঙ্গালীর নেতৃত্বকে, হাসিতে হাসিতে, হেলায়, খেলায়, মেটার পদে উৎসর্গ করিয়া আসিলেন, সে কিসের জন্ত ?—আমরা বলি, সেও ভয়ে। ভাই, তুমি বিরক্ত হইও না, কোন "ভয়" না থাকিলে, আজ রাসবিহারী, সুরেন্দ্রনাথ ঐরূপে লোক হাসাইতেন না, আশুতোষ আজ স্কুল কলেজের হর্ত্তারূপে দেদীপ্যমান হইয়া দেশবৈরী সাজ পরিতেন না।[1] আমরা চিরদিন দর্প করিয়া বলিতাম,প্রতিভা স্বাধীনতার প্রসূতি,কিন্তু আজ যে "প্রতিভা"পরাধীনতার ভ্রুকুটীতে মলিন ও নিষ্প্রভ, ইহা কেবল ভয়ে! আশুতোষের প্রতিভা, ইংরাজ-দর্প ভয়ে পরিম্লান, ঘোষ-বানর্জির প্রতিভা শুধু মেটার দৌরাত্ম্যে নয়, ঐভয়েই আজ জ্যোতিহীন! এদেশে কেবলই জাগিয়া উঠিতেছে—নির্ম্মম, কঠোর, মসী-ম্লান বিভীষিকা!! হায় রে দুর্দ্দিন !!!

গবর্ণমেণ্ট ভয় দেখাইবার জন্ত অনেক কাগজ তুলিয়া দিয়াছেন, অনেক প্রেস বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন, অনেক লোককে কারারুদ্ধ ও নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। দুর্দ্দান্ত যাঁহার প্রতাপ,তাঁহার অসাধ্য কি ? যাঁহারা,এইরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ভীত কি না, আমরা জানি না। অথচ, সর্ব্বদাই শুনিতেছি, লোক হাসিতে হাসিতে দণ্ড সহ্য করিতেছে। তবে ভীত কে ? সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, গবর্ণমেণ্ট আর কখানি কাগজ তুলিয়া দিয়াছেন ? এদেশের কাপুরুষ এবং পা-চাটার দল, এ কাগজ, সে কাগজ, কত কাগজ ছাড়িতেছেন ;—অনুসন্ধান কর, জানিতে পারিবে। সম্পাদকদের সকল ঘরেই হাহাকার,—সহানুভূতি বা সাহায্য,—দিন দিনই দুর্ঘট হইয়া উঠিতেছে। ইতালীতে ম্যাটসিনির "নব্য-ইতালী" পত্রিকার মমতায়, যে কাজে, সে দেশের লোকেরা অম্লানবদনে প্রাণ দিয়াছিল, কিন্তু এ দেশে—প্রাণত্যাগ ত দূরের কথা,—একটু খাতির বা সম্মান, একটু স্বার্থ বা খেতাব, প্রতিপত্তি বা অধিকার বিচ্যুতির ভয়েই সকলে অস্থির—এ দিক, সে দিক, চতুর্দ্দিক হইতে পত্র পৌঁছিতেছে—"আর কাগজ চাই না!" হায় রে বিভীষিকা!

এরূপ কেন হইল ? দোষ আমাদেরই ; সত্য কথা বলিতে গেলে, এ কথা না বলিয়া থাকাও কষ্টকর যে, এদেশে, মধ্যপন্থী বা চরমপন্থী রূপী দুই দল নাই। পরাধীনতার রাজ্যে আবার দল, বেদল কি ? বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন কথায় এই দুটী দলের অস্তিত্ব-প্রচার আমরাই করিয়াছি। "যাহা নাই,""আছে আছে" বলিতে বলিতে তাহারই অস্তিত্ব প্রতীত হইয়াছে। এদেশে এনার্কিষ্ট দল আছে, কে বলিল ? দুই দশ জন অবাধ্য স্বেচ্ছাচারী বালক, খেলিতে খেলিতে, কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছিল, তাহাকে গবর্ণমেণ্ট যদি বাতাস দিয়া না বাড়াইতেন, তবে কবে সে খেলা থামিয়া যাইত। গবর্ণমেণ্ট কেন বাড়াইলেন ? এদেশের বিভীষণবর্গ গবর্ণমেণ্টের কাণে কাণে কি কি গুপ্ত কথা যেন বলিয়া দিয়া উড়াইয়া দিলেন ; আর রাখে কে ? অবশ্য যদি বিচক্ষণ কর্ম্মদক্ষ লোক থাকিত, তবে বিভীষণদের কথা গবর্ণমেণ্টের কাণে ধরিত না, উড়াইবার কথা উড়িয়াই যাইত। বুদ্ধির অভাবে, গবর্ণমেণ্ট, কি-যেন-কি-একটা ভয়ের আভাষ গণনা করিলেন, তাই মাতিলেন, খেপিলেন, যাহা অকর্ত্তব্য, তাহাই করিতে লাগিলেন। হায়, মহামতি বেকার সাহেব যদি আর দুই

বৎসর পূর্ব্বে এদেশের ছোটলাট হইতেন,তবে বুঝিবা, এরূপ দুর্দ্দৈব হইত না! কিন্তু বুঝিবা বিধাতার সে ইচ্ছা ছিল না; তাই "রুজভেল্ট" গবর্ণমেণ্ট সর্পভ্রম করিলেন এবং যাহা অকর্ত্তব্য, তাহাই অবাধে করিতে লাগিলেন। আমরাও নানা রূপে সামান্যকে অসামান্য বলিয়া বুঝাইতে লাগিলাম। ফল কি দাঁড়াইল?—গবর্ণমেণ্ট একটা নির্ম্মম ভয়ের রাজ্যকে জাগাইয়া তুলিলেন। ফল কি দাঁড়াইল?—খেলিবার অছিলাতে বালকেরা যাহা করিতেছিল, তাহা হইতে জাগিয়া উঠিল যেন একটা প্রকট নবশক্তি! এখন,যাহা ঘটিতেছে এবং যাহা ঘটিবে,তাহার মূলে কেবল বিধাতারই হাত দেখিতেছি। নব-জাগরণের নব-যুগ, ভয়-বিভীষিকার মধ্য হইতে, দেখিতে দেখিতে, এইরূপে, জাগিয়া উঠিল।

যতদিন মোহের আবরণ থাকে, ততদিন মানুষ, ভালমন্দ, বুঝিতে পারে না। মোহাচ্ছন্নতার জন্যই, স্বদেশীরা, বাঙ্গালী শ্রীচৈতন্যকে চিনিতে পারিয়াছিল না, তাই উৎকলে তাঁহার অলৌকিক নৈষ্ঠিক জীবন যাপিত হইয়াছিল। মোহাচ্ছন্নতার জন্যই, রামমোহনকে, তদানীন্তন কালের লোকেরা চিনিতে বা বুঝিতে পারে নাই, তাই ব্রিষ্টলে তাঁহার মহাসমাধি হইয়াছিল। আর সেদিন, মোহাচ্ছন্নতার জন্যাই, দরিদ্রের অকৃত্রিম সুহৃদ্ বিবেকানন্দকে এদেশের লোকেরা তুচ্ছাতাচ্ছিল্য করিয়া, অসময়ে, বুঝিবা জীবনপাতের কারণ হইয়াছিল! আরো শুনিবে?—আরো বলিব? তিলক, কৃষ্ণকুমার বা অশ্বিনীকুমার—এই মোহাচ্ছন্নতার জন্যাই, শুনিতেছি, উন্মাদ বলিয়া তথা-কথিত বিজ্ঞসমাজে উপেক্ষিত! উপেক্ষিত বলি এই জন্য—তিলক, বিপিনচন্দ্র, অশ্বিনীকুমার ও কৃষ্ণকুমারের নির্ব্বাসনের জন্যই কনগ্রেস এবার এত আনন্দে ভরপুর হইতে পারিলেন এবং একটু দুঃখ প্রকাশ করা দূরে থাকুক, ঐ মেটা বসু-বানার্জির মাথায় পা এবং হাতে মোয়া দিয়া ভুলাইতে সমর্থ হইলেন এবং ইনি, উনি,তিনি কতরূপে "রিফরম মন্তব্যে"র কুহকে মাতিয়া,মলি ও লাট-পাদ-বন্দনার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন! আমরা হাসিতেও চাই না, কাঁদিতেও চাই না;—যাহা আছি, তাহা লইয়াই "স্বভাবে"মজিয়া থাকিতে চাই। "স্ব" জিনিসটা যে এত মহার্ঘ হইয়া উঠিতেছে, কৃষ্ণকুমার বা অশ্বিনীকুমার আমাদের মধ্যে থাকিলে বুঝি এরূপ মহার্ঘ হইত না! মোহাচ্ছন্নতা—তাই আজও বিবাহে বিলাতী বাজনা বাজে, ভোজে বিদেশী চিনির মিঠাই, ও বিলাতী খাদ্য অখাদ্য চলে;—আর বলিব কি, আনন্দের ফোয়ারা ছুটে! মোহাচ্ছন্নতার দিগ্বিজয়ী রাজত্ব!!

কিন্তু মোহাচ্ছন্নতা বিভীষিকার পূর্ব্বাভাস। মোহাচ্ছন্ন রাবণ, মদমত্ততায় দিগ্ভ্রান্ত, রিপু-বাত্যা তাড়নায় কি না করিয়াছিল? দৈত্যকুলশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপু ও কংস কি দর্পেই না মাতিয়াছিল! হায়—ভীতির দিগ্বিজয় প্রকম্পনে দেশ প্রকম্পিত;—চন্দ্র, সূর্য্যও যেন সে কম্পনে দিশাহারা! চতুর্দ্দিকে জাগিতেছিল, কেবল ভয়, কেবল ভয়! দেবকীর অঙ্কের ধনও যেন ভীতিসঙ্কুলনে কাঁপিল;—জন্মাষ্টমীর কালরাত্রি যশোমতির ক্রোড়ে নব-আশা-উষাকে সমর্পণ করিল! কি মোহাচ্ছন্নতা গো!!

এরূপ মোহাচ্ছন্নতা কেবল এদেশের সঞ্চিত পাপ নয়—সকল দেশেরই গুপ্ত রিপু। এই রিপুকে দমন না করিলে, অরূপ-রূপ,

সিদ্ধ যোগীর অভ্যুদয় হয় না। এই রিপু মোহাচ্ছন্নতাকে জয় করিয়া, এদেশে, যেমন রাক্ষণ ইন্দ্রজিত-বিনাশের ক্ষমতা পাইয়াছিলেন, ঐ ইতালীতেও, ম্যাট্‌সিনি অষ্ট্রীয়ার গর্ব্ব চূর্ণ করিবার দুর্দ্ধর্ষ শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। হায়, ম্যাট্‌সিনি কি বিষই না হজম করিয়াছিলেন! চির কৌমার্য্য ব্রত সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলেন, কিন্তু তবুও, ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মিথ্যা, প্রবঞ্চনা তাঁহাকে পরাস্ত করিতে বদ্ধপরিকর! তিনি অভেদ্য শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত, কিন্তু তবুও তাঁহাকে ফিরাইতে কত ছলে, কত রূপে সচেষ্ট! হায়, নির্ব্বাসন, নির্য্যাতন তাঁহার ভাগ্যে কত ঘটিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষী;—কিন্তু মোহাচ্ছন্ন ইতালী—তখনও জাগে নাই। হায়, সুইজারল্যাণ্ড, তোর আকাশে কি বিভীষিকা-বিনাশের বীজ রোপিত ছিল? মুক্ত গবাক্ষ-পথ দিয়া, ক্ষুদ্র পক্ষীর কলকণ্ঠের তানে সে বীজাঙ্কুর কি ম্যাট্‌সিনিকে অমর করিয়াছিল? তুই ধন্য, কেননা, তুই অজপা-জপে ম্যাট্‌সিনিকে সিদ্ধি দিয়াছিলি! আর এদেশের কাব্যবিশারদ বা উপাধ্যায় নাকি স্বদেশের কালিমা স্মরণে জীবন ঢালিয়া গিয়াছেন;—এ আকাশে কি তাঁহাদের শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে না? কে বলিবে, অশ্বিনীকুমার এবং কৃষ্ণকুমার, তিলক এবং বিপিনচন্দ্র কেন এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? ফিরিবার জন্য? মোহাচ্ছন্ন তার জন্য? মরিবার জন্য? শুধু—লোক হাসাইবার জন্য? না—তাহা অসম্ভব। চির সত্য—মোহাচ্ছন্নতার রাজ্যে বাস করে, বিভীষিকা; এবং বিভীষিকার পরপারে বাস করে,—মৃত্যুঞ্জয়-ধর্ম্মমন্ত্র। যখন তখ বিভীষিকা নাই, তখন, সেই অথর্ব্ব যুগের লোক মরিতে জয় পায়। কিন্তু শেষে, চতুর্দ্দিকে যখন কেবল ভয় আর ভয়, তখন লোক মড়িয়া হইয়া যায়—মরণের ভয় আর মানুষকে বিহ্বল করে না। যে মন্ত্রে ভয়কে জয় করা যায়, তখন মানুষ সেই মন্ত্রের আশ্রয় লয়। সে মন্ত্র—ধর্ম্মমন্ত্র। ইতিহাসে চিরদিন এই কথাই ঘোষিত হইয়াছে। মরিতে, মরিতে মরিতে—শেষে লোক মরণ-চিন্তাকে জয় করে,—অমর হইয়া যায়। "আছে, আছে, আছে" বলিতে বলিতে "নাই"ও যেমন সত্ত্বাবান হয়, তেমনি, মৃত্যু-মন্ত্র সাধনে সাধনে মানুষ "অমরত্ব" লাভ করে। "অমরত্ব" লাভের অর্থ কি?—অর্থ আর কিছুই নয়—কেবল ইহাই যে, এ সংসারের লাভালাভ-গণনা ভোজের বাজি, আসক্তি বিরক্তি আকাশ-কুসুম, সার কেবল ধর্ম্ম। ধর্ম্ম চিন্তায় মজিলে মৃত্যু আর ভয়ের জিনিস থাকে না, মৃত্যুর ভিতর দিয়া সচ্চিদানন্দে মানুষ নিমগ্ন হয়। মরে কে, যে পাপে নিমগ্ন। বাঁচে কে? যে পুণ্যে উৎফুল্ল। পাপাসুরকে মানুষ যখন জয় করিয়াছে,—আপন রিপুকুল যখন পরাস্ত বা নির্ব্বাণ হইয়াছে, বিভীষণ যখন ধর্ম্ম-রামে যুক্ত হইয়াছে, তখন সেখানে অধর্ম্মের বিনাশে ধর্ম্ম-সতীর উদ্ধার হইয়াছে। অথবা নিরঞ্জনা-তটে মার পিশুনের অত্যাচার হইতে জাগিয়া উঠিয়াছেন—মহানির্ব্বাণের, মহাদে-বতা—শাক্যসিংহ। অথবা, আসক্তি যখন বিনষ্ট, সতী যখন চক্রে খণ্ড খণ্ড হইয়াছেন, তখন ত্রিপুরারি মাভৈঃ মাভৈঃ রবে জগৎ-কাঁপাইয়া বিচরণ করিতেছেন।

সে ভীত, তুমি ভীত, আমিও ভীত। ভীতির রাজ্যে ভীত নয় কে? তাঁহারা বাড়ী তল্লাস করে, কত পীড়ন করে, কত সন্ধান করে, কত কি নষ্ট করে, বাড়ীকে আপন

করে, শুনিতেছি কত কি করে! ধ্রুব প্রহ্লাদ কি অত্যাচারে সুরক্ষিত ছিলেন? কিন্তু চিন্তা কর, খ্রীষ্ট কি লৌহশলাকায় বিদ্ধ হন নাই? ভাব,ম্যাট্সিনি কি নির্ব্বাসিত হন নাই? কিন্তু তাঁহারা কখনও শত্রুর সহিত শত্রুতা সাধন করেন নাই। এ সংসারে কে ভীতির রাজ্যে নির্ভয়, বলত? ভয়কে যে ভয় করে না, আমরা বলি, কেবল সেই সুরক্ষিত। ভয়কে ভয় না করিয়া পারে কে? যে জন রিপু জয়ে সমর্থ, আর কেহই নয়। রিপু জয়ে সমর্থ কে? যে ঈশ্বরের অনুগত। সব ভীতি নিরসনের মূলমন্ত্র কেবল—ধর্ম্ম। রিপু জয়ে ম্যাটসিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি কোন ভয়েই বিচলিত হইতেন না। মোহম্মদ খ্রীষ্ট, ধ্রুব বা প্রহ্লাদও, ধর্ম্মের অনুসরণে, কোন ভয়কেই ভয় মনে করিতেন না। মনে করিতেন—সকল অবস্থা এবং ঘটনাতেই কেবল রক্ষাকর্ত্তা বিশ্বেশ্বর বিদ্যমান। জীবনে মরণে—সর্ব্ব অবস্থায়, সর্ব্ব ঘটে যে ঈশ্বরকে দেখে, কোন্ ভয় তাঁহাকে ভীত করিতে পারে? আমরা যদি "ঈশ্বর" মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিতে পারি, এ সংসার জয়ের অমোঘ বীজাঙ্কুর প্রাপ্তি আমাদের ঘটিবে; এবং যেমন মহাজনেরা হাসিতে হাসিতে দেহত্যাগ করিয়া অমর হইয়াছেন, আমরাও, সেইরূপ, দেহত্যাগের ভিতর দিয়া নিত্যানন্দে বিভোর হইয়া অমর হইব। কি ভয়, কিসের ভয়? শরীরকে লোকেরা বাঁধিতে পারে, মনকে বাঁধিতে পারে কে? শারীর চিন্তা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করিলে, তবে আমরা সংসারের লাভালাভ-গণনার অতীত নিত্যানন্দধামে পৌঁছিতে পারিব।

তাঁহারা বলিতেছেন, এদেশে "স্ব" বিনাশের আর অধিক বিলম্ব নাই। আমরাও বলিতেছি, "স্ব" জাগরণের আর অধিক অপেক্ষা নাই। "স্ব"—অর্থ আর কিছুই নয়—"স্ব"অর্থ মানুষের মহাধর্ম্ম,—যাহা ভিন্ন মানুষের একদিনও চলে না;—স্ব-ভাব, স্বজন, স্ব-পরিবার, স্বদেশ, স্বজাতি। এই সকলের সেবা মিলিয়া স্বধর্ম্ম। সুতরাং "স্ব"সেবাই—দেহধারী মানবের চরম লক্ষ্য। "স্ব" মূলে প্রথম বিধাতাকে দেখিতে হইবে; তারপর তাঁহার "বিশ্বরূপে" দীক্ষা হইবে। যাহারা কোন সাধনার ধার ধারে না, তাহারাই "স্ব" ছাড়িয়া, ব্যক্তি ছাড়িয়া বিশ্বে ধাবিত হয়। "স্ব"-সাধন ভিন্ন জাতীয় একতা বা আর যাহা বল, সকলই অসম্ভব। বিভীষিকা যখন জাগিয়াছে—তখন স্ব সাধন-ক্ষেত্রে মরণের ভয় নিশ্চয় যাইবে,—স্ব-ধর্ম্মের জয় নিশ্চয় হইবে, পুণ্যের রাজত্ব নিশ্চয় আবার সংস্থাপিত হইবে। সুসময়, কুসময়,—সব সময়ে মানুষের কেবল এক লক্ষ্য হওয়া উচিত—কেবল স্বধর্ম্ম রক্ষা। এ দেশের নরনারী দারিদ্র্য-পীড়নে নিষ্পেষিত, তাহাদিগকে রক্ষা করা যদি তোমার ধর্ম্ম হয়, "স্বদেশীয়" ব্রত পালনে, নির্য্যাতনকে ভয় করিও না। আর "স্বদেশী"কে যদি ধর্ম্মের অঙ্গ মনে না কর, সরিয়া দাঁড়াও; ভয়ে ভয়ে ফিরিও না, আসিও না, দাঁড়াইও না;—"শ্যাম রাখি কি কুল রাখি"—এ চিন্তায় বিভোর হইও না। সঙ্কোচ, প্রকম্পন, ভীতি, জগতের এসব মোহময় স্বপ্ন ভুলিয়া যাও। ঐ মেটা তোমাকে স্বর্গে তুলিবে না, ঐ বিদেশী বণিকেরাও তোমাকে রক্ষা করিবে না। যে দেশ তোমাকে জল বায়ু শস্য দ্বারা রক্ষা করিতেছে, সেই দেশকে রক্ষা করাকে "স্বধর্ম্ম" বলিয়া জানিয়া রাখ। এই ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হও, বদ্ধপরিকর হও, আর কিছুই প্রার্থনা নাই। যদি তাহা পার, এই ধর্ম্মই তোমাকে স্বর্গে রাজা করিবে। অতএব, এই দুর্দ্দিনে, আর কিছুই কর্ত্তব্য নাই—কর্ত্তব্য কেবল—"স্ব" বলিতে যাহা, তাহার সংরক্ষণ। "স্ব"কে, ভাই, কিছুতেই ডুবাইও না, কিছুতেই মরিতে দিও না। যদি "স্ব" যায়—এদেশ মহা দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হইবে,—চির কালের জন্য ডুবিবে। আবার বলি, ভাই, "স্ব" তোমার মন্ত্র হউক, "স্ব" তোমার জপ হউক, "স্ব" তোমার তপ হউক, "স্ব" তোমার রক্ষা হউক। এই স্বধর্ম্মের পথ ধরিয়া, এস, ভাই, আমরা স্বর্গের যাত্রী হই।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩২। জাপানী ফুল।—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। মূল্য ॥০। মণিবাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "কতক গুলি জাপানী গল্পের ছায়া অবলম্বনে এই গল্প সকল রচিত হইল—এগুলি জাপানী গল্পের অনুবাদ নহে। জাপানী গল্পের উপাখ্যান মাত্র অবলম্বন করিয়া আমার নিজের ভাবে সে গুলিকে প্রকাশ করিয়াছি।"

মণিবাবু গল্প সমূহে যে প্রাঞ্জল ভাষা—লিপিকুশলতা, বিচিত্রভাব এবং ঘটনার সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে সমগ্র গ্রন্থখানি শেষ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। বালক পাঠোপযোগী ক্ষুদ্র গল্প রচনায় গ্রন্থকার যে সিদ্ধহস্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটী বিষয়ে আমরা গ্রন্থকারকে অনুরোধ করিতেছি যে, ভবিষ্যতে এরূপ গ্রন্থ রচনাকালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্য কথা সমূহ যেন পরিত্যাগ করেন। সরল সার্ব্বজনীন বঙ্গভাষার পরিবর্ত্তে প্রাদেশিক গ্রাম্যভাষা গ্রহণের কি প্রয়োজন? "মুক্তোর" স্থলে "মুক্তার", "রূপোর" স্থলে "রূপার", "কুঁড়েয় ফিরছে" স্থলে "কুঁড়েতে ফিরছে", লিখলে ভাল হয় না কি? "নিদি নিশ্বিৎ" "দিব্যি গেলে" প্রভৃতি শব্দ পরিত্যাগ করিলে ভাষা কি সৌষ্ঠব-শূন্য হয়?

৩৩। শর-শয্যা। কাব্য। প্রণেতা শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, বি-এল। মূল্য ৮০। বাঙ্গালা ভাষার পরম সৌভাগ্য যে, দিন দিনই কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ইহার অনুশীলনে যত্নবান হইতেছেন। এই পুস্তকের গ্রন্থকার একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি, পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ৪ খানি পুস্তক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এরূপ বিস্তৃত কাব্যে লেখনী চালনা করিবেন, কেহই আশা করিতে পারেন নাই। নবীনচন্দ্রের স্বর্গারোহণের সময়ে, এহেন গ্রন্থকারকে পাইয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। বলা বাহুল্য যে, এই গ্রন্থকারের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত উপকার হইবে। যদিও বাঙ্গালা ভাষা দিন দিন সর্ব্বজনাদৃত হইতেছে, কিন্তু চুটকি সাহিত্য ভিন্ন পয়সা দিয়া বড় কেহ পুস্তক ক্রয় করে না। হিং টিং নাট্য, উপন্যাস বা গল্পই সর্ব্বত্র অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে। এদেশের মাসিক পত্রিকা সকলও চুটকি সাহিত্যেরই অধিক প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। সুতরাং কাব্য বা বিজ্ঞান, ইতিহাস বা দর্শনের সাদর অভ্যর্থনা এদেশে আশা করা যায় না। উৎসাহের অভাবে বড় কেহ এপথে আসিতে চাহেন না। কেহ দুই একবার আসিলেও আবার ফিরিয়া যাইয়া পূর্ব্বের ব্যবসা আরম্ভ করেন। এইরূপ কঠোর সময়ে, যিনি, লাভালাভগণনা পরিত্যাগ করিয়া, শুধু কেবল দেশের ঋণ পরিশোধের জন্য, কলা সাহিত্যের চর্চ্চা করেন, তিনি যে কি দরের ব্যক্তি, এক কথায় তাহা ব্যক্ত হইবার নয়। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষকে আমরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

মহাভারত এদেশের এক অপূর্ব্ব জিনিস:—বুঝিবা পৃথিবীর মধ্যে এরূপ জিনিস আর কোথাও নাই। সকল শাস্ত্র, সকল বিজ্ঞান, সকল দর্শনের সারচুম্বক—মহাভারত। মহাভারতের সার, গীতা শাস্ত্র। বুঝি এই শাস্ত্রের সমীচীন ব্যাখ্যা করাই "শরশয্যার" উদ্দেশ্য। গ্রন্থকারের ক্ষমতা অসাধারণ—তিনি এই কাব্য প্রণয়নে যে অনন্য-সাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, সম্যক রূপে অনুশীলিত হইলে, কালে তাহা দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ উপকার হইবে। গ্রন্থকারের এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র আদৃত হইলে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিব।

৩৪। কাব্য-কথা। শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন, এম-এ, মূল্য ১॥০। কুমারসম্ভবের উমা, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা, বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সম্প্রদায়, দানতত্ত্ব, "খেচুড়ী" সমালোচনা, হিন্দু নাটকের প্রাচীনত্ব, প্রাচীন পাঞ্চাল দেশ ও বাঙ্গালা কবিতার ভাষা ও ভাব, সেকালের পুলিশ, বিরাটপুরী ও মৎস্য দেশ ও মহর্ষি কণ্ব, এই কয়েটী প্রবন্ধ এই পুস্তকে আছে। ইহার কয়েকটী প্রবন্ধ নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতেই পাঠকগণ এই গ্রন্থকারের লিপি চাতুর্য্যের পরিচয় পাইয়াছেন। এই গ্রন্থখানি চিন্তাশীলতার এক বিশেষ উপাদান। লেখা প্রাঞ্জল, ভাব সংযত, রুচি মার্জ্জিত এবং গবেষণা প্রচুর। আশা করি, সর্ব্বত্র এই পুস্তকের আদর হইবে।

বৈদিক সাহিত্য।

(রাজসাহী সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে পঠিত হইবার জন্য লিখিত।)

স্মরণাতীত প্রাচীন কাল হইতে ভারতের যাবতীয় "সম্মিলন-ক্ষেত্রই" অতীব পবিত্র ও মহাফল-প্রসূ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। পঞ্চনদের সম্মিলন-ভূমিতে একদিন ভারতীয় আর্য্যঋষিকুল বৈদিকগাথা উচ্চারণ করিতে করিতে "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" বলিয়া, যজ্ঞে আজ্যধারা ঢালিয়া দিয়া সামাজিক কল্যাণের জন্য বিধাতার নিকটে স্তুতি করিয়াছিলেন। সেই সুপবিত্র পঞ্চনদের সম্মিলনভূমিতেই, সেই সুপবিত্র যজ্ঞক্ষেত্রেই, যে সুপবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান গগনভেদ করিয়া সমুত্থিত হইয়াছিল, বহুকোটী বৎসর পরে, সেই বৈদিক ব্রহ্মজ্ঞানই অদ্য পৃথিবীর সকল জাতির বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে এবং মনুষ্যজাতির মহাকল্যাণের পথ সুগম করিয়া দিতেছে। অদ্যাপি গঙ্গা ও যমুনার সম্মিলনভূমি "প্রয়াগ" হিন্দুজাতির নিকটে কত আদরের ও পবিত্রতার ক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। বিবিধ ও বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের সম্মিলন ক্ষেত্র "জগন্নাথ" অদ্যাপি হিন্দুজাতির চিত্তে ভেদবুদ্ধির বিলোপ সাধন করিয়া দিয়া, একটা মহান্ একত্বের সমাচার বহন করিয়া দিতেছে।

তাই বলিতেছিলাম, যেখানেই কোন কিছুর সম্মিলন, তাহাই পবিত্র এবং তাহাই বিবিধ কল্যাণ প্রসবের আকর বলিয়া, হিন্দুজাতির নিকটে পূজা পাইয়াছে। অদ্য সাহিত্য-সম্মিলনের শুভক্ষেত্রে, বঙ্গদেশের বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, ধীরচিত্ত, ধর্ম্মপ্রবণ মহাপুরুষবর্গ, একত্র সম্মিলিত। তাই অদ্য এই শুভ-অবসরে, আমাদের চিত্তে একথা স্বতঃই সমুদিত হইতেছে যে, এই মিলনের ভূমিও বঙ্গদেশে বহুকল্যাণের উৎস খুলিয়া দিতে সক্ষম হইবে তাই, হৃদয়ের অকৃত্রিম আনন্দের সহিত, দূর হইতে, ভাবি-কল্যাণ কামনায়, সমবেত সাহিত্যিক ধুরন্ধরগণের সমক্ষে অদ্য আমরা ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যসম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

জাতীয় সাহিত্য বলিতে কেবলমাত্র প্রচলিত সাহিত্যকেই বুঝায় না। প্রচলিত সাহিত্য যে মহাসাগরের একটী অংশমাত্র, প্রচলিত সাহিত্য যে মহান্ উৎস হইতে মূলতঃ সমুত্থিত হইয়া শাখা প্রশাখা দ্বারা বিস্তৃতিলাভ করিয়া, অদ্য আপন পদে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে,—সেই উৎস, সেই মহাসাগর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা কখনই অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বিশেষতঃ যেস্থলে সাহিত্যিক ধুরন্ধরবর্গ একত্রিত, সে স্থলে প্রাচীন-সাহিত্যের সম্বন্ধে কয়েকটী বিবেচ্য বিষয়ের উল্লেখ করা আমরা অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়াই বোধ করি।

প্রাচীন ভারতে বৈদিক গ্রন্থের অত্যন্ত আদর ছিল। জননী যেমন নিরাশ্রয় শিশুটীকে আপন বক্ষে, যত্নের সহিত আবরণ করিয়া রাখেন, বৈদিকগ্রন্থগুলিকেও তাৎকালিক আর্য্যগণ, ততোধিক মমতা ও যত্নের সহিত রক্ষা করিতেন। ঋক্, যজু, সাম প্রমুখ বৈদিক গ্রন্থরত্নগুলির প্রতি এতই

আদর ছিল যে, ঐ সকল গ্রন্থ-নিবদ্ধ একটী শব্দও যাহাতে রূপান্তরিত না হইতে পারে, যাহাতে কালপ্রভাবে অন্যদ্বারা একটীমাত্র শব্দও নূতন সংযোজিত বা বিযোজিত না হইতে পারে, তজ্জন্য যৎপরোনাস্তি সতর্কতা অবলম্বিত হইত। পদপাঠ, জটাপাঠ প্রভৃতি প্রণালী অদ্যাপি সেই অসাধারণ সতর্কতার কথা ঘোষিত করিতেছে।

বেদগ্রন্থের প্রতি কেন এত অসামান্য যত্ন ও সতর্কতা গৃহীত ও অবলম্বিত হইত? ইহার কি কোন কারণ নাই?

বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ,ভারতের ঋগ্বেদাদি গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,সেই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়,তবে ঐ সকল গ্রন্থের প্রতি ঋষিগণের সেই অসাধারণ যত্নের মূলে কোনই গুরুত্ব অনুভূত হয় না। ঋগ্বেদ, যদি কেবলমাত্র কতকগুলি প্রাকৃতিক জড়শক্তির প্রতি ভীতি মিশ্রিত বিস্ময়-প্রকাশক স্তুতিগাথা মাত্রই হয়, তবে কিজন্য আর্য্যগণ এমন করিয়া সেই গ্রন্থের সমাদর ও রক্ষাবিধান করিলেন? হিন্দুজাতি পুরুষানুক্রমে এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া আসিতেছেন যে, ঋগ্বেদের তুল্য মহামহীয়ান্ বিরাট গ্রন্থ আর নাই। শাস্ত্রে এমন বিধান দৃষ্ট হয় যে, নিত্য নিয়মিত ভাবে যে গৃহে বেদগ্রন্থ পঠিত না হয়, সে গৃহ শ্মশান সদৃশ এবং ব্রাহ্মণেরা যদি বেদ পাঠ না করেন, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না। জড়শক্তির প্রতি প্রযুক্ত কতকগুলি স্তুতিগীতিই যদি বেদগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হয়, তবে তাহা নিত্য পাঠ করিবার জন্যই বা শাস্ত্রে এমন বিধান থাকিবে কেন? যাঁহারা জগত্তত্ত্বের অন্তস্তলদর্শী দার্শনিক পণ্ডিত, তাঁহারাও একবাক্যে ঋগ্বেদাদি গ্রন্থের গৌরব ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে ভুলেন নাই! কেন এমন হইল? বাস্তবিকই কি ঋগ্বেদে কেবল ভৌতিক পদার্থের স্তুতিগীতি নিবদ্ধ আছে?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ঋগ্বেদের উপরে যে প্রকার অক্লান্ত অধ্যবসায় ও পরিশ্রম ব্যয়িত করিয়াছেন, কেহই তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু তথাপি, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার অগ্রে আমাদিগকে সাবধানে পদবিক্ষেপ করিতে হইবে।

ভারত হইতে যদিও বর্ত্তমানকালে, বেদের পঠন-পাঠন একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, তথাপি এখনও বৈদিককালের এমন গ্রন্থসমূহ বর্ত্তমান আছে, যাহা হইতে বেদ বুঝিবার উপযুক্ত যথেষ্ট উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে। পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, আমাদিগকে অগ্রে সেই সকল উপকরণের প্রতি সাগ্রহে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইবে।

ঋগ্বেদে কি আছে, ঋগ্বেদের দেবতাবর্গের স্বরূপ কি প্রকার, ঋগ্বেদে উল্লিখিত ইন্দ্র, সূর্য্য, দ্যৌঃ, পৃথিবী, অশ্বিন, পূষা প্রভৃতি দেবতাবর্গ কাহাকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে, এই সকল দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত সূক্ত বা স্তুতিগুলিরই বা অভিপ্রায় কি;—এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে, বৈদিকযুগের অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। অদ্যাপি কয়েকখানি বৈদিককোষ প্রচলিত আছে। প্রচলিত দশ বা দ্বাদশখানি উপনিষদে বৈদিক দেবতাবর্গের উল্লেখ আছে। এবং দেবতাবর্গের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বেদান্তদর্শনের পূর্ব্ব-

মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা—এই দুই দর্শন গ্রন্থে বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও সমালোচনা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদে উল্লিখিত দেবতাবর্গের স্বরূপ সম্বন্ধে একটা মীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে, এই সকল গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ঋগ্বেদে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক জড়পদার্থের স্তুতি দেখিতে পাইয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের এই সিদ্ধান্ত যদি, বৈদিককালের অন্যান্য গ্রন্থোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধী হয়, তবে আমরা কেন সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব? এইজন্যই আমাদের মনে হয় যে, ঋগ্বেদে উল্লিখিত দেবতাবর্গের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইলে, আমাদিগকে অতি ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে এবং বৈদিক সময়ের অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্য লইয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

আমরা উপরে বৈদিককালের যে সকল কোষগ্রন্থ এবং উপনিষদের উল্লেখ করিলাম, সেই সকল গ্রন্থে বৈদিক দেবতা-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্য প্রকার মীমাংসা পরিদৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ,বেদব্যাস-প্রণীত বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত, পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তের নিতান্তই বিরোধী। আমরা এই শুভ সম্মিলনক্ষেত্রে সমবেত সাহিত্যিক ধুরন্ধরগণের সম্মুখে বিনীতভাবে, দুইটী বিভিন্নমুখী পথের উল্লেখ করিয়া, তাঁহাদিগের নিকটে উপদেশ প্রার্থনা করিতেছি যে, আমরা ঋগ্বেদের দেবতাদিগের সম্বন্ধে প্রকৃত মীমাংসায় পৌঁছিবার জন্য, এই দুইটী পথের কোন্‌টী গ্রহণ করিব? পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ যে পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন,তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, না আমাদের দেশে চতুর্দ্দশ পুরুষ হইতে যে সকল বৈদিকগ্রন্থ ও বৈদান্তিক দর্শনগ্রন্থ চলিয়া আসিতেছে, সেই সকল গ্রন্থোক্ত পথই গ্রহণ করিব? আমরা সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যেই এই মীমাংসার ভার অর্পণ করিতেছি। এ প্রকার শুভ অবসর হয় ত আর না মিলিতেও পারে।

বেদান্তদর্শনে ও বৈদিককালের গ্রন্থাদিতে দেবতাবর্গ সম্বন্ধে যে প্রকার মীমাংসা আছে, তদ্দারা ইহাই প্রতীত হয় যে, সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মই ঋগ্বেদের উপাস্য বস্তু। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল হইতে শেষ মণ্ডল পর্য্যন্ত একটী বিরাট্‌ অদ্বৈত-বাদ সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত রহিয়াছে।

কথাটা অনেকের নিকটে নূতন বোধ হইতে পারে। কিন্তু কি প্রমাণের বলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি,এস্থলে আমরা তাহা দেখাইব।

(১) ঋগ্বেদে উল্লিখিত "দেবতাবর্গের" স্বরূপ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে বৈদিক অন্যান্য গ্রন্থে কি প্রকার মীমাংসা করা হইয়াছে, সর্ব্বপ্রথমে তাহাই বিবেচনা করা আবশ্যক। কেন না, সমসাময়িক বা তাৎকালিক বৈদিক-গ্রন্থগুলি "দেবতা"বিষয়ে যে মীমাংসা করিয়াছেন, সেই মীমাংসাই সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়। যে দ্বাদশখানি প্রামাণিক উপনিষদ্‌ প্রচলিত আছে, সেই উপনিষদ্‌গুলির নানাস্থানে, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু,সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ আছে এবং এই দেবতাবর্গের স্বরূপ এবং প্রকৃতি কি প্রকার, তদ্বিষয়েও বিশেষ আলোচনা আছে। উপনিষদ্‌গুলি বৈদিক যুগেরই গ্রন্থ। সুতরাং ঋগ্বেদের দেবতাকে বুঝিতে হইলে, উপনিষদের মীমাংসাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তারপর, আর একটী বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে। (২) বেদান্তদর্শনের মীমাংসাই বা দেবতাসম্বন্ধে কি প্রকার, তাহাও আমাদিগকে বুঝিয়া

দেখিতে হইবে। বৈদিক তত্বগুলির ব্যাখ্যা করিয়া দিবার জন্যই ত বেদান্ত দর্শনের সৃষ্টি। সুতরাং বেদান্তদর্শন,এই সকল দেবতা সম্বন্ধে কি মীমাংসা করিয়াছেন, সেই মীমাংসা গ্রহণ করিলে, ঋগ্বেদে উল্লিখিত অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার প্রকৃতি অবশ্যই বুঝিতে পারা যাইবে। (৩) নিঘণ্টু এবং নিরুক্ত নামে দুই-খানি অতি প্রাচীন বৈদিক অভিধান আছে। ইহারাও বৈদিকযুগেরই গ্রন্থ। এই কোষ-গ্রন্থে, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি শব্দের অর্থ নির্ণীত হইয়াছে এবং দেবতাদিগের স্বরূপ সম্বন্ধেও বিশেষ আলোচনা রহিয়াছে। সুতরাং ঋগ্বেদে উল্লিখিত দেবতাবর্গকে বুঝিতে হইলে, এই কোষগ্রন্থের মীমাংসাকেও সমাদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। (৪) অবশেষে,ঋগ্বেদেই বা দেবতাবর্গ কি ভাবে বর্ণিত হইয়াছেন, তাহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ঋগ্বেদে প্রত্যেক দেবতাসম্বন্ধেই বহুপ্রকারের ভিন্ন ভিন্ন সূক্ত আছে, এই সূক্তগুলিতে দেবতা-বর্গের প্রকৃতির সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং ঋগ্বেদে উল্লিখিত অগ্নি, ইন্দ্র, সোম প্রভৃতি দেবতার স্বরূপ বুঝিতে হইলে, স্বয়ং ঋগ্বেদের মীমাংসাও গ্রহণ করিতে হইবে।

আমরা উপরে স্থূলতঃ যে চারিপ্রকারের প্রমাণের উল্লেখ করিলাম, আপাততঃ ইহাই যথেষ্ট। শ্রোতৃমণ্ডলী দেখিতে পাইবেন যে, উপরি উক্ত চারিপ্রকার প্রমাণের কোন প্রমাণের দ্বারাই ঋগ্বেদ যে জড়শক্তির উপা-সনার গ্রন্থ, একথা পাওয়া যায় না। বরং অনিবার্য্যরূপে এই তত্বই পরিস্ফুট হইয়া পড়ে যে, ঋগ্বেদে এক ব্রহ্মপদার্থই পরি-কীর্ত্তিত হইয়াছেন এবং একটী বিরাট্ অদ্বৈতবাদই ঋগ্বেদের মহান্ লক্ষ্য।

এখন আমরা একে একে উপরি-উল্লি-খিত চতুর্ব্বিধ প্রমাণের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলো-চনায় প্রবৃত্ত হইব। এবং এই আলোচনা দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, ঋগ্বেদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের সিদ্ধান্ত ভ্রমা-ত্মক।

উপনিষদ্‌গুলির নানা স্থানে, ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ আছে। আমরা সংক্ষেপে দুই তিনটী স্থল প্রদর্শন করিব। কেনোপনিষদে আমরা একটী আখ্যায়িকা দেখিতে পাই। কতকগুলি অসুরকে পরা-জয় করিয়া, দেবতাবর্গের চিত্তে একটা উৎ-কট গর্ব্বের সঞ্চার হইয়াছিল। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাবর্গ, আপনাদিগের সাম-র্থ্যের ও শক্তির গৌরব ঘোষণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রত্যেকেই ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের ন্যায় পরাক্রমশালী আর কেহই জগতে নাই। একদা আকাশ-মণ্ডলে একটী অলৌকিক জ্যোতির আবি-র্ভাব হইল। এই জ্যোতিটী কি, জানিবার উদ্দেশ্যে ইন্দ্র, প্রথমতঃ অগ্নিকে পাঠাইয়া দিলেন। অগ্নি জ্যোতির নিকটে উপস্থিত হইবা মাত্র, একটী পরমাসুন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তি আকাশমণ্ডলে আবির্ভূত হইল। সেই নারী-মূর্ত্তি, অগ্নির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, অগ্নি সদর্পে উত্তর দিল যে—"আমি জাতবেদা নামে, অগ্নিনামে, বিশ্বে বিদিত এবং আমি ইচ্ছা করিলে এক মুহূর্ত্তে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস করিয়া দিতে পারি।" অগ্নির এবম্বিধ উৎ-কট গর্ব্বোক্তি শ্রবণ করিয়া সেই নারীমূর্ত্তি হাস্য করিয়া এক তৃণখণ্ড দেখাইয়া দিয়া অগ্নিকে বলিলেন—"হে জাতবেদা! হে অগ্নে, তুমি এই সম্মুখবর্ত্তী তৃণ খণ্ডকে দগ্ধ করিয়া ফেল ত!" অগ্নি আপনার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ

করিয়া সেই তৃণ খণ্ডটীকে দগ্ধ করিতে পারিল না। অগ্নি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া ইন্দ্রের নিকটে ফিরিয়া গেল। অগ্নির পরে, বায়ু আসিয়া উপস্থিত হইল। অগ্নির ন্যায়, বায়ুও সেই তৃণ খণ্ডটীকে আপনার সমগ্র বিক্রম প্রয়োগ করিয়াও উড়াইতে পারিল না। এইরূপে দেবতারা একে একে পরাজিত হইলে পর, ইন্দ্র সেই নারীর নিকট উপস্থিত হইল। সেই নারী ইন্দ্রকে বলিয়া দিলেন যে, দেবতাবর্গ বৃথা আত্মসামর্থ্যে গর্ব্বিত হইতেছে। দেবতাবর্গের কাহারই নিজের কোন শক্তি নাই। ব্রহ্মশক্তিতেই উহাদিগের শক্তি। ব্রহ্মশক্তি ব্যতিরেকে কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র শক্তি থাকিতে পারেনা। আমরা এই আখ্যায়িকা হইতে এই তত্ত্বই প্রাপ্ত হইতেছি যে, অগ্নি, সূর্য্যাদি কোন বস্তুরই ব্রহ্মশক্তি হইতে 'স্বতন্ত্র' শক্তি নাই। অগ্নি, সূর্য্যাদি দেবতাবর্গের মধ্যে এক ব্রহ্ম শক্তিই অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম শক্তিতেই উহাদিগের শক্তি;—উহাদের স্বীয়, 'স্বতন্ত্র' কোন শক্তি নাই।

বৃহদারণ্যকেও আমরা প্রকারান্তরে এই তত্ত্বেরই উল্লেখ দেখিতে পাই। সে স্থলে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতি ৩৩টী দেবতা, এক প্রাণ শক্তি হইতেই উদ্ভূত। উহারা এক প্রাণ শক্তিরই বিবিধ বিকাশ মাত্র; সুতরাং বস্তুগত্যা দেবতার সংখ্যা একটী মাত্র। এস্থলেও আমরা এই তত্ত্বই প্রাপ্ত হইতেছি যে, সূর্য্যাদি কোন পদার্থেরই স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা নাই। প্রাণ শক্তির সত্তাতেই সূর্য্যাদির সত্তা। এক প্রাণ শক্তিই সূর্য্যাদি দেবতার মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের "সংবর্গ বিদ্যা"তেও ঠিক অবিকল এই তত্ত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। সংবর্গ-বিদ্যায় ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বাহ্যিক সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতা এক প্রাণশক্তি হইতেই উদ্ভূত হয়, আবার সেই প্রাণশক্তিতেই বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং প্রাণশক্তি ব্যতীত উহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। আবার চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় শক্তিগুলিও এক প্রাণশক্তি হইতে উদ্ভূত এবং মৃত্যুকালে সেই প্রাণ শক্তিতেই বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং আমরা এস্থলেও দেখিতে পাইতেছি যে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক যত কিছু শক্তি বা পদার্থ, সকলই এক মাত্র প্রাণশক্তিকেই অবলম্বন করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে এবং এক প্রাণ শক্তিই ইহাদিগের সকলের মধ্যে অনুস্যূত। প্রাণশক্তি ব্যতীত, ইহাদের কাহারই স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা নাই।

এই প্রকারেই, উপনিষদ গ্রন্থগুলিতে দেবতাবর্গের স্বরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব, আমরা দেবতা সম্বন্ধে, উপনিষদ গ্রন্থের এই মীমাংসাই প্রাপ্ত হইতেছি যে,—সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাবর্গের মধ্যে এক প্রাণ শক্তি বা ব্রহ্মশক্তিই অনুস্যূত রহিয়াছেন। এই ব্রহ্মশক্তিতেই দেবতাদিগের সত্তা। ব্রহ্ম শক্তি ব্যতীত কোন দেবতারই স্বতন্ত্র সত্তা নাই।

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, উপনিষদের এই মীমাংসারই বা তাৎপর্য্য কি?

কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে বেদান্তদর্শনে প্রবেশ করিতে হইবে। এখন আমরা তাহাই দেখিব।

বেদান্তদর্শনই বৈদিক সমুদয় তত্ত্বের মীমাংসাত্মক গ্রন্থ। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যে

প্রণালীতে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভারতবর্ষে তাহারই সমধিক আদর। বেদান্ত-দর্শনে সর্ব্বপ্রথমেই দুইটী কথা পাওয়া যায়। এক পরমার্থ দৃষ্টি, অপর ব্যবহারিক দৃষ্টি। যাঁহারা পরমার্থ দৃষ্টিসম্পন্ন, যাঁহারা তত্ত্বদর্শী,—তাঁহারা এই জগৎকে এক ভাবে দেখিয়া থাকেন। আর যাঁহারা সাধারণ অজ্ঞানী জীব, তাহারা এ জগৎকে অন্যভাবে দেখিয়া থাকে।

তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ এজগতে কেবলমাত্র এক ব্রহ্মসত্তারই দর্শন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সূর্য্য, চন্দ্র, তরুলতা, মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ নাম-রূপাত্মক পদার্থ লইয়াই এই জগৎ। পরমার্থদর্শী পুরুষগণ, কোন পদার্থেরই 'স্বতন্ত্র' সত্তা দেখিতে পান না। তাঁহারা জানেন যে, সকল বস্তুর মধ্যেই এক ব্রহ্মসত্তা অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন; এই ব্রহ্মসত্তাতেই পদার্থগুলির সত্তা; কোন পদার্থেরই স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা নাই।

কিন্তু যাহারা সাধারণ লোক, তাহারা এরূপে জগৎকে দেখিতে পায় না। তাহারা প্রত্যেক পদার্থকে স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট বলিয়া মনে করে। তাহারা ব্রহ্ম সত্তার কোন খবর রাখে না।

আমার একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব।

মনে করুন—স্বর্ণ হইতে হার, বলয়, কুণ্ডল ও মুকুট নির্ম্মিত হইল। এস্থলে স্বর্ণকে 'কারণ' বলা যায় এবং হার, বলয়, কুণ্ডল, মুকুটকে 'কার্য্য' বলা যায়। 'কারণ' ও 'কার্য্য'—এ উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কি প্রকার? কার্য্যগুলি—কারণেরই একটা বিশেষ অবস্থা, একটা রূপান্তর—একটা আকার মাত্র। একটা বিশেষ আকার ধারণ করিলেই কারণটী নষ্ট হইয়া যায় না, কারণটী আপন স্বাতন্ত্র্য হারায় না।

হার, বলয়, কুণ্ডল, মুকুট—ইহারা স্বর্ণেরই একটা বিশেষ অবস্থা,—একটা রূপান্তর,—একটা আকার-বিশেষ মাত্র।

(ক) অজ্ঞানী, সাধারণ লোক মনে করে যে,—স্বর্ণহইতে হার, বলয়, মুকুটাদি পদার্থরূপে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং ইহারা প্রত্যেকে এক একটা 'স্বতন্ত্র' 'স্বাধীন' পদার্থ। স্বর্ণই যে হার, বলয়, কুণ্ডলাদির মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে, সে দিকে আর সাধারণ লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় না। হার, বলয়াদি আকার ধারণ করাতেও, স্বর্ণের যে স্বীয় অস্তিত্ব সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হইয়া যায় নাই,—একথাটী লোকে ভুলিয়া যায়। তাহারা ঐ সকল হার, বলয় প্রভৃতি আকারকে স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়াই বোধ করিয়া থাকে। ইহারই নামে ব্যবহারিক দৃষ্টি।

(খ) কিন্তু যাঁহারা পরমার্থদর্শী, বৈজ্ঞানিক, তাঁহারা এরূপ ভ্রম করেন না। তাঁহারা জানেন যে,—হার, বলয়, কুণ্ডলাদি 'স্বতন্ত্র' 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। উহারা স্বর্ণেরই ভিন্ন ভিন্ন 'আকার' মাত্র। স্বর্ণেরই সত্তাকে অবলম্বন করিয়া ঐ সকল আকার অবস্থিত; স্বর্ণেরই সত্তা উহাদিগের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। স্বর্ণকে তুলিয়া লও, দেখিবে সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল আকারও চলিয়া গিয়াছে। যখন স্বর্ণকে তুলিয়া লইলে, হারাদি আকার গুলি থাকে না, তখন ঐ আকারগুলি নিশ্চয়ই 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। স্বর্ণ-সত্তাতেই হারাদি-আকারগুলির সত্তা। স্বর্ণসত্তা ব্যতীত, হারাদির কোন 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। সুতরাং স্বর্ণের সত্তাই প্রকৃত সত্তা। হারাদি

আকারগুলি আগন্তুক অবস্থা-বিশেষ মাত্র। ইহারই নাম পরমার্থ দৃষ্টি।

বেদান্তদর্শনে, এই দুই প্রকার দৃষ্টির কথা আগাগোড়া উল্লিখিত হইয়াছে। পরমার্থ দৃষ্টি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এইরূপেই জগতের সর্ব্বত্র, সর্ব্ব-পদার্থে এক ব্রহ্মসত্তাকে দেখিতে পান।

"বিকারেঽনুগতং জগৎ-কারণং ব্রহ্মনির্দ্দিষ্টং 'তদিদং সর্ব্ব' মিত্যুচ্যতে। কার্য্যঞ্চ কারণাদব্যতিরিক্তমিতি বক্ষ্যামঃ"—বেদান্ত-ভাষ্য।

সুতরাং বেদান্তদর্শন আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন যে, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি আধিদৈবিক পদার্থগুলি কেহই "স্বতন্ত্র" কোন পদার্থ নহে। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মসত্তাই অনুস্যূত রহিয়াছেন। ব্রহ্মসত্তাতেই ইহাদের সত্তা। ইহাদের স্বীয় কোন 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই।

সুতরাং সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি বস্তুগুলি, ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। ইহারা ব্রহ্মসত্তাতেই সত্তাবিশিষ্ট; সুতরাং সূর্য্য, অগ্ন্যাদির স্তুতির অর্থ—এক ব্রহ্মসত্তারই স্তুতি।

আমরা উপনিষদ এবং বেদান্তদর্শন—উভয় স্থলেই দেবতা সম্বন্ধে এই প্রকার মীমাংসাই পাইলাম।

বেদান্তদর্শনে, দেবতা সম্বন্ধে আরও এক প্রকার মীমাংসা প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলে তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক।

বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম তিন পাদে আমরা কতকগুলি সূত্র দেখিতে পাই। শ্রুতিতে, আকাশ, প্রাণ, বায়ু প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছিল। এই শব্দগুলি কি জড়ীয় পদার্থ বাচক, না এ গুলি ব্রহ্মবাচক,—ইহারই মীমাংসার জন্য এই সকল সূত্র রচিত হইয়াছে। এই সকল সূত্রে ইহাই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, আকাশ, প্রাণ প্রভৃতি শব্দ যে স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই সেই স্থলে যদি কোন "ব্রহ্ম-লিঙ্গ" থাকে,—অর্থাৎ ব্রহ্মের পরিচায়ক কোন বিশেষণ থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, আকাশ,প্রাণ প্রভৃতি শব্দ কোন জড়ীয় বস্তুকে বুঝাইতেছে না; ইহারা ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে এবং এই সকল শব্দ দ্বারা ব্রহ্মই লক্ষিত হইতেছেন। বেদান্ত-দর্শন, প্রথম দুই অধ্যায়ে এই মীমাংসাই করিয়া দিয়াছেন। এই মীমাংসা করিয়া দিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, আকাশ, প্রাণ, প্রভৃতি শব্দ ব্রহ্মেরই, বাচক; অন্যকোন জড়ীয় পদার্থের বাচক নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে দেখান হইয়াছে যে, —"এই বিশ্ব প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাণেতেই স্থিতি করিতেছে এবং প্রলয়ে প্রাণেতেই লীন হইয়া যাইবে।" এস্থলে, অতি সুস্পষ্ট ভাবে "ব্রহ্মলিঙ্গ" বা ব্রহ্মের পরিচায়ক বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। কেন না, সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়ের মূল কারণ ব্রহ্মব্যতীত কেহই হইতে পারেন না। সুতরাং এই সকল স্থলে "প্রাণ" শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকেই বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। আমরা বেদান্তদর্শনের এই একটী মীমাংসা দেখিতে পাই।

এই মীমাংসাটী মনে রাখিলে, ঋগ্বেদে উল্লিখিত, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি শব্দের স্বরূপও আমরা সহজে বুঝিতে পারিব। আমরা যদি ঋগ্বেদে, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার সূক্তগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তবে প্রায় সকল সূক্তেই "ব্রহ্মলিঙ্গ" বা ব্রহ্মের পরিচায়ক বিবিধ বিশেষণ দেখিতে পাই। সুতরাং

এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য্য হইয়া উঠে যে,—ঋগ্বেদের অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র প্রভৃতি শব্দ কোন জড়ীয় শক্তিকে বুঝাইতেছে না। এই সকল শব্দ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপে দুই একটী সূক্তের উল্লেখ করিয়া এস্থলে দেখাইব যে, ঐ সকল সূক্তে যথেষ্ট রূপে "ব্রহ্মলিঙ্গ" বা ব্রহ্মের পরিচায়ক বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে—

"বনেষু ব্যন্তরীক্ষং ততান, বাজমর্ব্বৎসু পয় উস্রিয়াসু।
হৃৎসু ক্রতুং বরুণো অপ্সু অগ্নিং, দিবি সূর্য্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ॥"

এই সূক্তে বরুণ দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে যে,—এই বরুণ দেবতাই বৃক্ষের উর্দ্ধদেশে অন্তরীক্ষকে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, ইনিই অশ্ব সকলের মধ্যে সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন; ইনিই গাভীস্তনে ক্ষীর নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। মনুষ্যের হৃদয়ে বুদ্ধি ও জ্ঞানকে ইনিই অর্পণ করিয়াছেন। ইনিই জলে অগ্নি এবং পর্ব্বতে সোমকে সংস্থাপিত করিয়া দিয়াছেন। ইনিই আকাশমণ্ডলে সূর্য্যকে স্থাপন করিয়াছেন।

হে সমবেত পণ্ডিত-মণ্ডলী! আপনারা লক্ষ্য করিয়া দেখুন, বেদান্তদর্শনের যে "ব্রহ্মলিঙ্গের" কথা সীমাংসা করা হইয়াছে, এই সূক্তে বরুণ-দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া যে কথাগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে, সকলগুলিই ব্রহ্মের পরিচায়ক বিশেষণ কি না?

এতএব আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেছি যে, ঋগ্বেদে উল্লিখিত 'বরুণ' শব্দ দ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইতেছেন; কোন জড়ীয় ভৌতিক পদার্থ প্রতিপাদিত হইতেছে না। অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধেও এই কথা বুঝিতে হইবে।

এখন আমরা ঋগ্বেদে দেবতাদিগের কি প্রকার প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে দুই চারিটী সূক্তের উল্লেখ করিয়া আমাদের সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদন করিব। তদ্দ্বারাও দেখিতে পাইবেন যে, এক ব্রহ্মতত্ত্ব এবং অদ্বৈতবাদই ঋগ্বেদের লক্ষ্য। কোন জাতীয়শক্তির স্তুতি করা ঋগ্বেদের লক্ষ্য নহে।

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু, রথো দিবঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং "সৎ" বিপ্রা বহুধা বদন্তি, অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।"

প্রথমমণ্ডলের অন্তর্গত এই বিখ্যাত সূক্তে, ঋষি দেবতাবর্গের সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ঋষি সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতেছেন যে,—একই 'সত্তাকে' পণ্ডিতেরা বিবিধ নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এক ব্রহ্মসত্তাই—কখনও অগ্নি নামে, কখনও ইন্দ্র নামে, কখনও বা বরুণ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এই সত্তাই সুপর্ণনামে পরিচিত। এই সত্তাকেই পণ্ডিতেরা মিত্র নামে ও মাতরিশ্বা (বায়ু) নামে স্তব করিয়া থাকেন।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, ঋষি ইহা জানিতেন যে, একই ব্রহ্মসত্তা—অগ্নি, সূর্য্য, মিত্র প্রভৃতির মধ্যে অনুস্যূত। অগ্নি, সূর্য্য, মিত্র প্রভৃতি কাহারই 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। ব্রহ্মসত্তাতেই ইহাদের সত্তা। সুতরাং অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতির স্তুতি দ্বারা ঋষি সেই অনুস্যূত ব্রহ্মসত্তারই স্তব করিতেছেন।

সূক্তগুলির প্রতি অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি করিলে, দেখা যায় যে, প্রত্যেক দেবতারই বিশেষণস্বরূপে, "ঋতাবৃধা," "ঋতস্পৃশ," "ঋতাবানঃ," "ঋতস্যনাভিঃ," "অমৃতস্য যোনি," "অমৃতধাম"—এইপ্রকার বিশে-

যণ প্রযুক্ত হইয়াছে। ঋত এবং অমৃত শব্দের অর্থ—অবিনাশী, অপরিণামী ব্রহ্মসত্তা বা কারণ-সত্তা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই সকল শব্দদ্বারা স্পষ্টই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সূর্য্য, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি 'কার্য্য' বর্গের মধ্যে একটী "ঋত" বা "অমৃত"—অর্থাৎ অবিনশ্বর কারণ-সত্তা (ব্রহ্মসত্তা) অনুস্যূত রহিয়াছে। সূর্য্য, বরুণাদি দেবতাবর্গ সেই অবিনশ্বর কারণসত্তাকে স্পর্শ করিয়া অবস্থান করিতেছে;—সেই কারণ-সত্তা দ্বারাই দেবতাবর্গ বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইতেছে; সেই কারণ-সত্তাই দেবতাবর্গের নাভিস্বরূপে অবস্থিত।

অতএব আমরা, এই সকল বিশেষণ দ্বারাও বুঝিতে পারিতেছি যে, দেবতাবর্গের মধ্যে অনুস্যূত ব্রহ্মসত্তাই ঋগ্বেদের ঋষিগণের লক্ষ্য এবং উপাস্য বস্তু।

দেবতাবর্গের মধ্যে অনুস্যূত কারণসত্তাখ্য ব্রহ্মসত্তাই যে ঋগ্বেদের উপাস্য বস্তু, তাহা অন্যরূপেও সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এক ইন্দ্রকেই, সূর্য্যরূপে, রুদ্ররূপে, অগ্নিরূপে, বায়ুরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার, সূর্য্যকে বর্ণনা করিতে গিয়া সূর্য্যকেই, বায়ুনামে, বরুণনামে, ইন্দ্রনামে আহ্বান করা হইয়াছে। সকল দেবতাতেই এই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। কেন এরূপ করা হইল? দেবতারা যদি 'স্বতন্ত্র', 'স্বতন্ত্র' জড়ীয় পদার্থই হয়, তবে এক পদার্থকে অন্য পদার্থ বলিয়া আহ্বান করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। এরূপ করিবার কারণ এই যে, ঋষিগণ কার্য্য কারণের সম্বন্ধের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, একই কারণ-সত্তা, বিবিধ কার্য্যাকারে অভিব্যক্ত হইয়া আছে। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যাকার ধারণ করাতেও, কারণসত্তার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। ঘট-শরাবাদি বিবিধ আকার ধারণ করিলেও, মৃত্তিকার সত্তা ঠিকই থাকে।

সুতরাং দেবতাবর্গের এই প্রকার বর্ণনা দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ইন্দ্রচন্দ্রাদির মধ্যে অনুস্যূত কারণসত্তাই ঋগ্বেদের উপাস্য বস্তু। ইন্দ্রচন্দ্রাদি দেবতাবর্গের, কারণসত্তাতিরিক্ত 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। সুতরাং পরমার্থতঃ, ইন্দ্রচন্দ্রাদি আধিদৈবিক পদার্থগুলি—কারণ-সত্তা বা ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। পরমার্থদৃষ্টিতে, দেবতারা সেই এক ব্রহ্মসত্তা মাত্র। এই ব্রহ্মসত্তাই ঋগ্বেদের উপাস্য তত্ত্ব।

আর একটী কথা দেখিলেও, এই তত্ত্ব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ঋগ্বেদে যে পুরুষসূক্ত আছে, তাহাতে সূর্য্য, আকাশ, বায়ু প্রভৃতি দেবতাবর্গ, পুরুষের "অঙ্গ"রূপে বা অবয়বরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অঙ্গীর সত্তাতেই অঙ্গগুলির সত্তা। অঙ্গগুলির 'স্বতন্ত্র' কোন সত্তা নাই। অঙ্গী এবং অঙ্গের মধ্যে ইহাই সম্বন্ধ। সুতরাং দেবতাবর্গকে পুরুষের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে ইহাই আসিয়া পড়িতেছে যে, পুরুষের সত্তাতেই দেবতাবর্গের সত্তা; দেবতাবর্গের 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। এই ভাবে, পুরুষ-সূক্ত সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছে যে, এক পূর্ণপুরুষেরই সত্তা, সূর্য্যাদি দেবতাদিগের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন। সুতরাং দেবতাবর্গের স্তুতি—সেই অনুস্যূত পুরুষ-সত্তারই স্তুতিমাত্র। এই তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবার জন্যই, ছান্দোগ্যাদি উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষ এবং মনুষ্যের চক্ষুর্মধ্যস্থ পুরুষ, একই বস্তু। মাণ্ডুক্যোপনিষদেও এইজন্যই, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক বস্তুগুলিকে অভিন্ন বলিয়াই

নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এরূপ নির্দ্দেশের ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য যে, একই সত্তা বাহিরে ও ভিতরে বিবিধভাবে বিকাশিত বা অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। যে শক্তি বাহিরে সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুদাদি আকারে অবস্থিত, সেই শক্তিই মনুষ্যদেহের অভ্যন্তরে দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, অন্তঃকরণাদিরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে উল্লিখিত "মধুবিদ্যা"তেও এই মহাতত্ত্বই উল্লিখিত হইয়াছে। মধুবিদ্যায় এই কথাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যে পুরুষসত্তা সূর্য্যে অবস্থিত, তাহাই অক্ষিতে অবস্থিত; যে পুরুষ-সত্তা অগ্নিতে অবস্থিত, তাহাই বাক্যে অবস্থিত; যে পুরুষসত্তা চন্দ্রে অবস্থিত, তাহাই জীবের মনে অবস্থিত। এই সকল কথার তাৎপর্য্য কি? এ সকল কথার তাৎপর্য্য এই যে, একই ব্রহ্মসত্তা, বাহিরে ও ভিতরে বিবিধ আকারে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন। সেই সত্তাব্যতীত কোন আকারেরই (বস্তুরই) 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। এই সকল কথাদ্বারা এই মহাতত্ত্বই উদ্‌ঘোষিত হইতেছে। সুতরাং আমরা বৈদিকযুগের এই সিদ্ধান্তই সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইতেছি যে, দেবতাবর্গের সত্তা একমাত্র ব্রহ্মসত্তার উপরেই অবস্থিত। অতএব ঋগ্বেদের দেবতার স্তুতি,—ব্রহ্মসত্তারই স্তুতিমাত্র।

ঋগ্বেদে আর একশ্রেণীর সূক্ত আছে। তদ্দারাও আমরা এই একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই। এই শ্রেণীর সূক্তগুলিরও এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। সপ্তমমণ্ডলে কতকগুলি "বামদেবীয় সূক্ত" আছে। ঋষি বামদেব সর্ব্বত্র ব্রহ্মসত্তা অনুভব করিয়া, আপন আত্মাতে সকল পদার্থের অনুভব করিতেছেন। 'আমি মনু হইয়াছি, আমি সূর্য্য হইয়াছি, আমিই বসুরূপে ক্রিয়া করিতেছি' —এই প্রকার সূক্তগুলি অতীব স্পষ্টভাবে সেই পূর্ণ, সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মসত্তার কথাই ঘোষণা করিতেছে। দশমমণ্ডলেও "বাক্-সূক্ত" নামে অবিকল এইরূপ একটী সূক্ত আছে। সেস্থলেও, ঋষিকন্যার সর্ব্বত্র ব্রহ্মাত্মভাব উদিত হইয়াছে দৃষ্ট হয়। সেস্থলেও বলা হইয়াছে,—"আমিই সূর্য্যরূপে, বসুরূপে, চন্দ্ররূপে ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছি; আমিই বায়ুরূপে সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছি" ইত্যাদি। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতির মধ্যে যে ব্রহ্মসত্তা অবস্থান করিতেছে, আমার ভিতরেও সেই ব্রহ্মসত্তাই অবস্থিত আছেন, এই বোধ না জন্মিলে কখনই—"আমিই মনু হইয়াছি, আমি সূর্য্য হইয়াছি, আমিই বায়ুরূপে সঞ্চরণ করিতেছি"—এপ্রকার উক্তি সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং এই সকল সূক্তের দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ঋগ্বেদে ব্রহ্মসত্তাই উপাস্য বস্তু। সূর্য্য, চন্দ্রাদি পদার্থের মধ্যে অনুস্যূত ব্রহ্মসত্তাই, সূর্য্যচন্দ্রাদি বিবিধ নামে স্তুত ও গীত হইয়াছেন। কার্য্যদর্শনে কারণসত্তার অনুভূতিই ঋগ্বেদে উপদিষ্ট।

এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করিলাম, তদ্দারা বোধ করি ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঋগ্বেদে কোন জড়ীয় ভৌতিক বস্তু উপাস্য বলিয়া স্তুত হয় নাই। সূর্য্য-চন্দ্রাদিতে অনুস্যূত চেতন ব্রহ্মসত্তাই ঋগ্বেদে সর্ব্বত্র স্তুত হইয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, মুখ্যভাবে ব্রহ্মবস্তুর উপাসনা না বলিয়া, কার্য্যবর্গের মধ্যে অনুস্যূতরূপে কেন ব্রহ্মবস্তু নির্দ্দেশিত হইলেন? ইহার কি কোন কারণ নাই?

বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য তাহা-

রও কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহারই উল্লেখ করিয়া আমরা বক্তব্য শেষ করিব। শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই যে, সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ স্থিরীকৃত হইতে পারে না। ব্রহ্ম—প্রকৃতির অতীত, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়। মন সেখানে যাইতে পারে না, বাক্য সেখানে পৌঁছিতে পারে না। সাক্ষাৎভাবে তাঁহাকে কেবল 'নেতি নেতি' ব্যতীত অন্য প্রকারে নির্ণয় করা সম্ভব নহে! তবে উপায় কি? যদি তিনি মন ও বাক্যেরই অতীত হইলেন, তবে তাঁহাকে জানিবার উপায় কি? তাঁহাকে না জানিতে পারিলেই বা মুক্তিলাভ সম্ভব হইবে কিরূপে? এ বিষয়ে, বেদান্তের মীমাংসা এই যে, যদিও স্বরূপতঃ মুখ্যভাবে ব্রহ্মবস্তুকে নির্ণয় করিবার উপায় নাই বটে, তথাপি "লক্ষণা" দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। লক্ষণা অর্থ এই যে, জগতের সম্বন্ধেই কেবল তাঁহাকে জগতের সাক্ষীরূপে জানিতে পারা যায়। আমরা জগতে বিবিধ বিজ্ঞান ও বিবিধ ক্রিয়ার অভিব্যক্তি দেখিতেছি। এই সকল বিজ্ঞান ও ক্রিয়ার অন্তরালে, ইহাদের সাক্ষীরূপে, ব্রহ্মকেও জ্ঞান স্বরূপ ও শক্তিস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ইহাই বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য এই যে, জগতে অভিব্যক্ত বিবিধ কার্য্য দর্শনেই ব্রহ্মেরও স্বরূপের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। নতুবা কার্য্যবর্গকে বাদ দিলে, ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিবার কোনই উপায় নাই। এই জন্যই বেদান্তে ও গীতায়, এই জগৎ ব্রহ্মের বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঋগ্বেদেও এই জন্যই—"এতাবানস্য মহিমা" বলিয়া জগৎকে ব্রহ্মেরই 'মহিমা' রূপে বর্ণন করা হইয়াছে।

অতএব, এই সিদ্ধান্ত দ্বারা ইহাই পাওয়া যাইতেছে যে, ঋগ্বেদে কেন মুখ্যভাবে ব্রহ্ম নির্দ্দেশিত না হইয়া, অগ্নি সূর্য্যাদি দেবতার মধ্যে অনুস্যূত রূপে ব্রহ্ম নির্দ্দেশিত হইয়াছেন? কার্য্যদর্শনেই কারণের সত্তা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। এই জন্যই ঋগ্বেদে আগাগোড়া ব্রহ্মসত্তা সূর্য্যাদি বিবিধ নামে নির্দ্দেশিত হইয়াছেন।

নিরুক্তকার মহামতি যাস্কাচার্য্য তারস্বরে আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, "আত্মাই একমাত্র মুখ্য দেবতা। অন্যান্য দেবতাবর্গ সেই এক আত্মারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থানীয়।"

আমরা এই সকল সিদ্ধান্ত ভুলিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের অনুসরণ করিয়া বৈদিক গ্রন্থ সম্বন্ধে অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি, ইহার তুল্য ক্ষোভের বিষয় আর কি আছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপ্রতিপাদক ঋগ্বেদকে আমরা, জড়ীয় পদার্থের স্তুতিপূর্ণ গ্রন্থ বলিয়া হতাদর করিতে শিখিতেছি!! হা! দুরদৃষ্ট!! সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী ইহার কি কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিবেন না? ওঁ তৎসৎ। শিবমস্তু।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচর্য্য।

মা ।

আমার জনমভূমি, এতকাল ধরে
যাপিনু তোমার বক্ষে ; বিপুল তৃষ্ণায়
মা বলে ডাকিনু তোরে মন প্রাণ ভরে—
হৃদয়ে অতৃপ্তি তবু রহিল কোথায় !
এখন যাইতে হবে—এই মনে হয়,
চারিদিকে কাল ছায়া আসে ঘনাইয়া !
এত রূপ এত প্রীতি গীতি সুধাময়
অয়ি মা কাহার তরে যাইব রাখিয়া ?
মা তোর মোহিনী উষা, সন্ধ্যা সুরঙ্গিণী,
মা তোর বাঁশের কুঞ্জ, উদার প্রান্তর,
মা তোর হৃদয় জোড়া পাহাড়ের শ্রেণী,
মৃদু কুহেলিতে ঢাকা শ্যামল নধর,
মা তোর শ্যামল স্নিগ্ধ কান্তির প্রান্তরে
সূর্য্য করে ঝলমল সমুদ্রের সীমা,
নিশীথের নিরাবিল স্তব্ধতা-সাগরে
জ্যোতিস্ফুট সহস্রাক্ষ নভের মহিমা,
তরুচ্ছন্ন পল্লিপথ, বিমল তটিনী,
ক্লান্তির কোমল শয্যা স্নেহে টলমল—
এর মাঝে কোথা আছে গোপনে না জানি,
প্রাণের ক্ষুধার অন্ন, তিরিষার জল !
এর মাঝে আছে তোর কোমল হৃদয়—
বিগ্রহ অন্তরে দেবী অন্তরমোহিনী !
ধমনী মরমে যার অন্তর্ব্বহা বয়
নিত্যস্থির, ভূতপুরীচ্ছায়া নিবাসিনী !

অতি স্নেহময়ী তুই, পুতুল যে চায়
তারে তাই দিয়ে মাগো রাখিস্ ভুলায়ে,
যে কাঁদে সকল ত্যজি কেবল তাহায়
আপন বুকের মাঝে নিস্ মা টানিয়ে।

আমি কি চেয়েছি মাগো, ধূলি কুড়াইয়া,
ঘুরি নাই এতকাল সংসারের পথে ?
তুই যদি স্নেহ ভরে দিলি জাগাইয়া
হৃদয়ে টানিয়ে নে মা গোপন অমৃতে।

দেখালি মন্দির তোর, অপদেবতার
পূজা করি রিক্ত যবে হৃদয়ের থাল ;
দেখাইলি বাঞ্ছিতেরে, যখন আমার
হৃদয়-ফুলের মধু হরিয়াছে কাল !

বুঝিয়াছি সার সত্য প্রাণের মহলে—
যেই পারে সেই জন কত ভাগ্যবান,
মানব জীবন পেয়ে জাগিয়া সকালে
সুধা-সাগরের তীরে যাত্রার বিধান।

বুঝিয়াছি, অতর্কিতে গিয়াছে গলিয়া
সময় সুবিধা শক্তি ধৈর্য্য সাধনার ;
যে আগুন স্বর্গ হতে এসেছি বহিয়া
প্রতিষ্ঠা জীবন-যজ্ঞে হয় নাই তার।

বুঝিয়াছি, কিসে তার করেছি যোজনা—
সংসারের ক্ষুদ্র স্বার্থ জীবিকার খেলা !
কে বুঝে অন্তরে কত বৃশ্চিক যাতনা,
হতলক্ষ জীবনের অনির্ব্বাণ জ্বালা।

দিয়েছিলে, সুনির্ম্মল প্রাণের আরশী,
দিয়েছিলে তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রফুল্ল জীবন,
দিয়েছিলে ধ্যানে ধৈর্য্য ভাষা গরীয়সী ;
করেছিলে শত শত সৌভাগ্য ঘটন।

শুধু এই সত্য হল—জীবন ব্যাপিয়া
বসন্তের অগণিত মঞ্জরী সম্ভার,
দু'দিনের মাঝে যার ফুটিয়া গলিয়া,
ফলে পরিণত হয় দু একটী তার !

এই মা বুঝেছি শুধু দুঃখ দারিদ্র্যের,
কঠোর পীড়নে যবে ক্ষুভিত পরাণ,
তখনি পেয়েছি তোরে ; সুখ বিলাসের
উত্তাপে দেখেছি সদা তোর অন্তর্ধান !

চাহিনা নিষ্ফল দুঃখে অনুতাপানলে,
তাপিতে এ মহোদয় দুর্লভ জীবন—
বিপুল বিশ্বের স্রোতে পারে কয়জন ?
সকলের মাঝে আমি অতি সাধারণ।

মাগো বুঝিতেছি যেন কিসের আভাষ,
পাইতেছি অন্তরঙ্গে, নহে পরিচয় !
মনের মৃদ-বেদী-প'রে জ্যোতির প্রভাস—
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়।

শুধু এই চাই মাগো, তাই দেও মোরে,
যাহা বুঝি ছায়াময়ী অনুভূতি ঘোরে,
নিবিড় নীরজস্পর্শ হৃদয়ে যাহার
লুকায়,ধরিতে গেলে আঁচলে ভাষার !
আমার মাঝারে যাহা স্থির অনশ্বর,
অনলে দহেনা যাহা, নাহি হরে কাল,
অতল তরঙ্গহীন সুধার সাগর,
মনের রসনে যাহা অনন্ত রসাল ;

যাহা বুঝি ফুলে পত্রে আকাশে বাতাসে ;
যাহা বুঝি সমুদ্রের বিপুলে বিস্তরে ;
নিত্য নিত্য ঊষা সন্ধ্যা যাহা লয়ে আসে,
যাহা বুঝি ভাষ্যহীন বিশ্ব চরাচরে ;

যাহা বুঝি পর্ব্বতের সমুচ্চ নিবিড়ে,
যাহা বুঝি নিত্য সত্য ঋতু আবর্ত্তনে,
যাহা বুঝি স্তব্ধ হয়ে সজনে বিজনে ;
যাহা বুঝি হৃদয়ের অতল গভীরে !

২

এ হৃদয় সিন্ধু মম বুঝিয়াছি আমি—
যত ডুবি তত পাই গভীরতা যার ;
বিজন গহন দেশ, গুপ্ত মণি ভূমি
আমারি ভিতরে, নাহি মম অধিকার !
উপরে জড়তা বশে বালকের মত
লহরী প্রপঞ্চে মজি ছিনু এতকাল,
বুঝি নাই ও অতল গাম্ভীর্য্য সংযত,
তাহারও বহুমুখী বেদনা উত্তাল !
আজি যদি ধন্য কৈলে, দেখালে নিশীথে
তব কামদুধাযুষ্ট গুপ্ত ছায়া পথ,
যায়না বুজিয়া যেন দিবার আলোতে,
সে পথে নিয়ত যেন চলে মনোরথ !
জ্যোতির্বিন্দু সমাকীর্ণ সুধাসিক্ত বীথি
সুরভির পন্থা ধরি যাহে দ্রষ্টাগণ
নিত্য নিত্য আবরণ করেন লঙ্ঘন ;
—শিশু সম হৃদয়ের পরম আরতি।

আমারে সময় দাও, মজিয়া রসিয়া
তন্তুকীট সমস্থির হৃদয় নিভৃতে,
অলোকের সীমা হতে কুসুম ধরিয়া
বাণীর হিরণ্য কোষে আবরি তুলিতে !
প্রতি তন্তু অন্তর্লীন জ্যোতির আভায়
উদ্ভাসিত হয় যেন ভিতরের হতে,
পবিত্র নীরজ শান্ত যে চাহে মজিতে
প্রথম দেখায় যেন তার আভা পায় !
আমারে হৃদয় দাও সদা দীপ্ত থাকে ;
দৃপ্ত নাহি হয় যেন আত্ম মহিমায় ;
যাহারা ঘুরিয়া মরে সংসারের পাকে
অজ্ঞাত সৌরভ যেন অতর্কিতে পায়।
এ বিশ্ব আমারে দাও, নিশ্চিন্তে বসিয়া
এ বিকচ পুষ্পে করি মধুর সঞ্চয় ;
সে মধু পরের তরে ভাণ্ডার ভরিয়া
রেখে যাই,যবে আসে যাবার সময় !

৪

আমারে কি নিবি মাগো তোর বক্ষঃস্থলে,
ফুটে যথা ফুল গুপ্ত প্রেমের বাঁশীতে ?

সঙ্গীতের মর্ম্ম হতে সৌরভ উথলে—
বিলায়ে রাখিবি মোরে ফুলের হাসিতে ?
আমারে কি নিবি না গো, রাখিবি জাগায়ে,
তরল মৌক্তিক হাস্য বিকসিত মুখে
প্রাণের আবেগ-বিভা তরঙ্গ ছুটায়ে,
ঝাঁপে যথা 'কর্ণফুলী' সাগরের বুকে!
আমারে কি রাখিবি না তোর তপোবনে
লুকাইয়া প্রাণলীন মহা স্তব্ধতায়,
মা তোর সাধক যারা তারা নিরজনে
ধেয়ানে ডুবিলে যেন মোরে দেখা পায়!
যুগে যুগে কত নর আসিবে যাইবে,
ফুটাইবে ভাবরস সৌন্দর্য্য-গরিমা,
সবার অগম্য দেশে সংপ্রজ্ঞাত পুরে,
আমারে কি চিরকাল রাখিবিনে ওমা!

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

মেবার পতন।

(গ্রন্থের একটী শিক্ষা)

কিসের শোক করিস ভাই! আবার তোরা মানুষ হ।
গিয়েছে দেশ, দুঃখ নাই,—আবার তোরা মানুষ হ।

যে উত্তেজনায় ক্ষিপ্ততা নাই, বরং যাহা মনুষ্যত্ব জাগাইয়া তোলে, সেই উত্তেজনা কবি দ্বিজেন্দ্রলালের অনেকগুলি গানের প্রাণ। আমাদের আত্ম-অভিমানের মোহ এখনো কাটে নাই; তাই এখনো আপনাদের দোষ, পরের ঘাড়ে চাপাইয়া, পরবিদ্বেষে আপনাদের চিত্ত নিরন্তর কলুষিত করিতেছি। আমার কপালে যে সাংসারিক উন্নতি ঘটিল না, সেকি "কেবল ফেল্লাম বলে জন্মে ভুলে বিষ্যুৎবারের বারবেলায়?" আত্মপ্রতারিতেরা মনে করে যে, তাদের ঘরের ছেলেরা পাড়ার দশজনের দোষেই বয়ে যায়; অধম কাপুরুষেরা মনে করে যে, চক্ষুশূন্য একটা গ্রহের দৃষ্টিতে, অথবা বর্ব্বর সংস্কারের একটা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মদোষেই তাহাদের যত অধোগতি। এই মোহে, ভ্রান্তিতে, কুসংস্কারে, আমরা নিজের দোষ দেখিতে পাই না। শিশু আছাড় খাইয়া পড়িলে মাটীতে পদাঘাত করিয়া ব্যথা ভোলে; শিশুর পিতা পিতামহেরাও সেই পদ্ধতিতে পরকে গালি দিয়া আর্য্যগৌরব-সুখ অনুভব করেন। কবি এই আত্মপ্রতারিতদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—

পরের পরে কেন এ রোষ,—নিজেরি যদি শত্রু হোস্?
তোদের এ যে নিজেরি দোষ; আবার তোরা মানুষ হ।

ভারতবর্ষ যে একদিন ভারি বড় ছিল, সে কথা কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু আমাদের দেশের যে সাধারণ বিশ্বাস আমাদের দেশের মত দেশ নাই, আমাদের জাতির মত জাতি নাই, সে কি কোন প্রাচীন কালের যথার্থ গৌরবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত? অরণ্যচারী লোকেরাও বলে যে, তাহাদের মত শ্রেষ্ঠ জাতি পৃথিবীতে নাই; তাহারা যে কেন শ্রেষ্ঠ, সে কথা তাহারা বুঝাইতে পারে না। সকলের প্রাণের প্রতি মমতার মত, আপনাদের শ্রেষ্ঠত্বের এই অভিমান, সকল জাতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বরং যে জাতি বা লোকসাধারণ যত বেশি মূর্খ, তাহাদের মধ্যেই এই বিশ্বাস তত অধিক। আমাদের দেশের যে

শ্রেণীর লোক, বিদেশের সাহিত্য এবং অবস্থার সহিত অত্যন্ত অপরিচিত, তাহারাই আপনাদের অত্যন্ত গৌরবে বেশি বিশ্বাস করে। যে কারণে আমাদের যথার্থ গৌরব করিবার কথা, প্রাচীনের সে কাহিনী ত সে দিন পর্য্যন্তও এদেশে সকলের কাছেই অজ্ঞাত ছিল। যে সাহিত্যে অতি প্রাচীনকালের স্বাধীন চিন্তা, সুশিক্ষা এবং চরিত্রনিষ্ঠার ইতিহাস পাই, তাহাত এখনো রোমান অক্ষরে ছাপা হইয়া ইউরোপেই পড়িয়া আছে। মৌর্য্যকুলের গৌরব ত ইংরেজের যত্নে সেদিন প্রকাশিত হইয়াছে; গুপ্ত সম্রাটদের মহিমাও এখনো ফ্লীট্ সাহেবের খোদিত লিপি-গ্রন্থে ডুবিয়া আছে। বৃথা বচন-দম্ভে কেউ কখনো মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না; আমাদের সব ভাল, বলিয়া, কেউ কখনো উন্নতি লাভ করিতে পারে না। যাহা যথার্থ মাহাত্ম্যের জিনিস, তাহা বুঝিয়া লইতে পারিলে স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে মাহাত্ম্য জিনিসটার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে। যে কারণে সেই প্রাচীন মাহাত্ম্য ডুবিয়া গেল,তাহাও যত্নপূর্ব্বক বুঝিয়া লইতে পারিলে "সব-ভালোর" অন্ধতা চলিয়া যায়, এবং উন্নতির পথ পরিষ্কার হয়। কবির গানের একটী ছত্রে এই দোষের কথার পরিস্ফুট আভাস আছে:—

ঘুচাতে চাস্ যদিরে এই হতাশাময় বর্ত্তমান,
হৃদয়ে তোর জাগায়ে তোল্ ভায়ের প্রতি ভায়ের টান্।

আমরা বড় ছিলাম, সেত ভাল কথা; কিন্তু এখন যে কত দিক দিয়া কত ছোট হইয়া পড়িয়াছি, সে কথা ভাবিতে কুণ্ঠিত হই কেন? সত্যের ভিত্তিতে হউক, মিথ্যার ভিত্তিতে হউক, আপনাদের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই স্বদেশহিতৈষণা জাগিয়া উঠিবে, এবং মুক্তির পথ প্রশস্ত হইবে, এ কথায় কোন সমাজ-তত্ত্ববিৎ বিশ্বাস করিতে পারেন না। ধর্ম্ম তত্ত্বের কথায়ও শুনিতে পাই (সেটা আমার মত লোকের শোনা কথা বই নয়) যে, পূর্ণমাত্রায় পাপ এবং অপরাধ বোধ না জন্মিলে কোন ব্যক্তি মুক্তি-পথের প্রয়াসীও হইতে পারেনা। যাহা সর্ব্বত্র নিয়ম, তাহা কেবল স্বদেশ-হিতৈষণার বেলায় অনিয়ম, এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে?

কবির 'রাণা প্রতাপ' নাটকের-নায়ক আদর্শ ক্ষত্রিয়; প্রতাপের শৌর্য্য, তিতিক্ষা, বীর্য্য, ক্ষমা, স্বদেশভক্তি, এ সকল অতি অধিক, অতি গভীর। কিন্তু মেওয়ার পতনের যাহা মূল কারণ, যে বিষ-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া পরে সকল দেশ জর্জ্জরিত করিল, তাহাও যে প্রতাপ-চরিত্রে নিহিত ছিল, কবি সুকৌশলে তাহা তাঁহার নাটকে দেখাইয়া গিয়াছেন। শক্তসিংহ প্রতাপের দক্ষিণ হস্ত; যাহা শক্তের শৌর্য্যে এবং বুদ্ধিমত্তায় আয়ত্ত হইতেছিল, তাহা প্রতাপের কাছে অমূল্য, স্বদেশের লাভের বিবেচনায় অমূল্য। তবুও প্রতাপ, শক্তসিংহকে পরিত্যাগ করিলেন, কেননা শক্তসিংহ মুসলমানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রতাপ যখন বলিলেন, তিনি এতদিন বংশ গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, তখন বুঝিতে পারা গেল যে, এ দেশের কপাল পুড়িয়াছে। কোথায় জাতির সর্ব্বব্যাপী স্বার্থ, আর কোথায় ক্ষুদ্র বংশ-গৌরব! এত নিঃস্বার্থতা, এত ত্যাগ, এত মাহাত্ম্য, ঐ সঙ্কীর্ণতায় গ্রাস করিয়া ফেলিল। যে বিষয়ে মেওয়ার পতনের দৃষ্টান্ত আরও পরিস্ফুট, তাহা দেখাইতেছি। আমাদের সঙ্কীর্ণতা এবং আত্মকলহ, কবিকে বড়ই ব্যথিত করিয়াছে; গীতে তিনি গভীর দুঃখে সকলকে

আহ্বান করিয়া বলিতেছেন ঃ—

ভুলিয়ে যারে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন্‌ কর ;

বিশ্ব তোর নিজেরি ঘর,—আবার তোরা মানুষ হ।

"মা সত্যবতী, মেবারের পতন কি আজ আরম্ভ হোল ? তার পতন, যেদিন থেকে সে নিজের চোখ্‌ বেঁধে আচারের হাত ধরে চলেছে,—যেদিন থেকে সে ভাব্‌তে ভুলে গিয়াছে। যত দিন স্রোত বয়, জল শুদ্ধ থাকে ; কিন্তু সে স্রোত যখন বন্ধ হয়, তখনই তাতে কীট জন্মে। তাই এই জাতিতে আজ নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা, বিজাতি-বিদ্বেষ জন্মেছে। সেই উদার, অতি উদার হিন্দুধর্ম্ম, আজ প্রাণহীন একখানি আচারের কঙ্কাল। জাতি যে পাপে ভরে গেল, তা দেখ্‌বার কেউ অবসর পায় না। মেওয়ার গেল বলে ক্রন্দন কল্লে কি হবে মা !"

মহাবৎ খাঁ মহৎ, মহাবৎ খাঁ বীর। সে জাতিতে হিন্দু, ধর্ম্মে মুসলমান। একজনের যদি আন্তরিক বিশ্বাস জন্মিল যে অমুক ধর্ম্ম সেবা না করিলে তাহার মুক্তি নাই, তখন সে তাহা করিতে পারিবে না কেন ? ধর্ম্ম মতের বিষয় হইল যখন পরলোকের কথা লইয়া, তখন যে যাহা ভাল বুঝিল, তাহার অনুসরণ করিলে তোমার আমার ক্ষতি কি ? ঈশ্বর বলিতে আমি যাহা বুঝি, দেব পূজার পদ্ধতি আমি যেটা মানিয়া থাকি, সেইটী যদি অপর ব্যক্তি না মানিয়া লয়, তবে সে দূর হইয়া চলিয়া যাইবে ? যদি কোন লোক দেশ-প্রচলিত দেব-পূজা পরিত্যাগ করে, তখন, সগরসিংহ মহবৎকে যাহা বলিয়াছিলেন, অবিকল সেই কথাই বলিয়া থাকি। আমরা বলি,—তুমি কি দুপাতা পড়েই এত বড় শাস্ত্র অগ্রাহ্য কর ? হিন্দু ধর্ম্মের মত সনাতন ধর্ম্ম আর আছে ? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এগুলি কি একটা দম্ভ এবং অহঙ্কারের কথা মাত্র নয় ? ধর্ম্ম কি দম্ভ এবং অহঙ্কার ? আর না হয়, তোমার মতই পরম সত্য, এবং তুমিই অগাধ পণ্ডিত এবং বুদ্ধিমান। কিন্তু সকলে তোমার মতে মত দিবে, এবং তুমি যেমন করিয়া ভাব, তেমনি করিয়া ভাবিবে, এত বড় আস্পর্দ্ধা এবং অহঙ্কার তোমার জন্মিল কেন ? মত বিরোধের জন্য মহাবৎকে যদি তাড়াইয়া দাও, তবে সে একটা আশ্রয় গ্রহণ করিবেই ত ! মনে কর যে সে না বুঝিয়াই মুসলমান হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তার পাপ হইল কি ? সে যদি হিন্দু হইতে চায়, তুমি তাহাকে হিন্দু করিয়া লইতে পার ? যে শরীরে ক্ষয়ের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বৃদ্ধির পথ নাই, বিনাশই যে তাহার একমাত্র ভাগ্য, এ কথাগুলি তর্ক করিয়া বুঝাইতে হইবে ? যেখানে তাহার স্বাধীনতা নাই, সেখানে কি প্রতিভা ফুটিতে পারে ? হায় স্বদেশ !

আমরা এত মূর্খ যে, একথাও দম্ভ করিয়া বলি যে, নানা ধর্ম্ম, নানা মতের স্রোত বহিয়া গেল, কিন্তু হিন্দু তাহাতে হিন্দুয়ানি ছাড়ে নাই। সত্য সত্যই কি আমাদের সমাজ, ক্ষয়ের সেই শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যখন জড়তার কঠিন অবস্থায় কোন নূতন ভাব সংক্রামিত হতে পারে না, পরিবর্ত্তন অসম্ভব হয়, এবং বিনাশই একমাত্র পরিণামে অবশিষ্ট থাকে ? যাহারা মৃত আচারের কঙ্কালকেই পূজা করে, তাহারা মহাবৎকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলে ; এবং ফোঁটা কাটিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা করিলে (এবং না

করিলেও) গজসিংহের মত মহাপাপিষ্ঠকে সমাজের একজন বলিয়া সন্তুষ্ট থাকে। স্বদেশবাসি, একবার কবির কথা শোন :—

শত্রু হয় হোক্ না,—যদি সেথায় পাস্ মহৎপ্রাণ,
তাহারে ভালবাসিতে শেখ্, তাহারে কর হৃদয় দান।
মিত্র হোক্ ভণ্ড যে,—তাহাকে দূর করিয়া দে;
সবার বাড়া শত্রু সে!—আবার তোরা মানুষ হ।

মহাবাৎ খাঁ ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্ম-স্থান মেওয়ারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতেন না। কিন্তু মেওয়ার পতনের পূর্ব্বাহ্নে যেদিন সগরসিংহ উদার হিন্দু ধর্ম্মের চরম মাহাত্ম্য বর্ণনার পর, মহাবৎকে সংবাদ দিলেন যে,তাঁহার হিন্দুপত্নী তাঁহাকে দেবতার মত পূজা করে বলিয়া তিনি পিতার গৃহ হইতে তাড়িতা হইয়াছেন, তখন তিনি মেওয়ারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবেন, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। মহাবাৎ খাঁর প্রতিজ্ঞা যে বিশুদ্ধ যুক্তি-অনুমোদিত নয়, একথা তাঁহার হিন্দু পত্নী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া লজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু মহাবাৎ রক্তমাংসে গড়া মানুষ। রমণীর প্রতি অত কঠোর অবিচারের কথা শুনিলে নিঃসম্পর্কীয়েরও রক্ত গরম হইয়া উঠে। আমাদের প্রতিবেশী মুসলমানদিগের মধ্যে যাহারা অশিক্ষিত বলিয়াই গোঁয়ার, তাহারা যে সকল অনাচার অত্যাচারের সৃষ্টি করে,তাহা অত্যন্ত গর্হিত, এবং পাপদুষ্ট। কিন্তু তাহারা যে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়, তাহার মূলে কি আমাদের বহুকাল-সঞ্চিত বিদ্বেষ এবং পাপ নাই? হিন্দু মুসলমানের বিবাদে উভয়পক্ষই, যাহা পরম কল্যাণপ্রদ, তাহা পায়ে দলিতেছে। ভ্রাতৃবিরোধে কল্যাণীই একা পিশিয়া মরিল।

এই ভ্রাতৃবিরোধ রহিত করিতে গিয়া, কি করিয়া মানুষ হইতে হয়, তাহা মানসী রাণাকে বলিয়াছিলেন। মানুষ হইতে হয়, "বিদ্বেষ বর্জ্জন করে; নিজের কালিমা, দেশের কালিমা, বিশ্বপ্রেমে ধৌত করে নিয়ে।" একি বড় আস্‌মানি রকমের কথা? বিশ্বপ্রেম বিকশিত হইলে কি স্বদেশ-প্রেমের প্রগাঢ়তা থাক্‌বে? ধর্ম্মের কথায়ও ঠিক এই রকম সন্দেহই উপস্থিত হয়। যদি সর্ব্বান্তঃকরণে জগদীশ্বরকে ভালবাসিতে যাই, তাহা হইলে আমার সাধের সংসারটী কোথায় পড়িয়া থাকিবে? সংসারকে ভালবাসিতে না পারিলে যে সংসারের পরপ্রান্তে জগদীশ্বরের চরণে আমাদের ভালবাসা পৌছায় না, এবং অন্যদিকে আবার তাঁহাকে পাইলেই যে সব পাওয়া যায়, এ সকল কথা আমরা ভোগাসক্তিতে বুঝিতে পারি না।

বিশ্বপ্রেম একটা লোকাতীত পদার্থ নয়। যে নিজের পরিবারকে ভালবাসিতে পারে না, স্বদেশকে ভালবাসিতে শিখে নাই, তাহার মনে বিশ্বপ্রেম জাগিবে কেমন করিয়া? জগদীশ্বরের প্রতি প্রীতির অনুবৃত্তিতে এখানেও এই কথা খাটে যে, বিশ্বপ্রেম জন্মিলে স্বদেশপ্রীতি এবং আত্ম-প্রীতি বিশুদ্ধ হয়। যাঁহাদের অল্প মাত্রও বিশ্বপ্রীতি আছে, তাঁহারা আটলান্টিকের পরপারেরও দাসত্বপ্রথার অত্যাচার দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন। যদি কোন প্রকারে নিজের দোষে কিম্বা পরের অত্যাচারে কোন জাতি মাথা তুলিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে না পারে, তবে কি সেই জাতির মধ্যে যে ব্যক্তি বিশ্বপ্রেমিক, তিনিই সর্ব্বাগ্রে সে বাধা তিরোহিত করিবার জন্য অগ্রসর হইবেন না? উদাসীন শ্রেণীর ফকিরি, ধর্ম্মক্ষেত্রেও মহাপাপ, সংসারক্ষেত্রেও মহাপাপ। পবিত্রতার অর্থ ফকিরি নয়; পবিত্রতা জ্ঞানকে মাজিয়া

উজ্জ্বল করে, ভক্তিকে সরস করে, এবং শক্তিকে সচল করে। কবি যথার্থই লিখিয়াছেন:—

জগৎ জুড়ে দুইটি সেনা, পরস্পরে রাঙ্গায় চোখ ;
পুণ্যসেনা নিজের কর, পাপের সেনা শত্রু হোক্।
ধর্ম্ম যথা, সেদিকে থাক ; ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ্ ;
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক্ ; আবার তোরা মানুষ হ।

কবির মেওয়ার পতনের মূলমন্ত্রটী মানসীর ঐ গানে। সেইজন্য জাতীয় সাহিত্যের ঐ অমূল্য গানটীর কথায় অনেক কথা বলিতে হইল। ঈশ্বরকে মাথার উপরে আসন দিয়া, ধর্ম্মপথে থাকিয়া, স্বদেশসেবা করিতে গেলে যদি পদে পদে বাধা পড়ে, তবে নিশ্চয় জানিও, তুমি পাপের কুহকে পড়িয়া অপূজ্যকে পূজা করিতে বসিয়াছ ; স্বদেশের চরণপ্রান্তে তোমার পূজার অঞ্জলি পড়িতেছে না। ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং নীচ সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া ফেলিয়া দাও ; বিধাতার আশীর্ব্বাদে সুদিন আসিবে। আবার তোরা মানুষ হ

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

রাজশাহী সাহিত্য সম্মিলন।

যাঁহারা সাহিত্য-সেবী, বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধনে সতত বদ্ধপরিকর, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে কোনও স্থানে একত্র সম্মিলিত হন,ইহা একান্ত প্রার্থনীয়। ইহাতে সাহিত্যিকগণের মধ্যে পরস্পর আলাপ পরিচয় হইবার একটা সুযোগ ঘটে ; এবং যাঁহারা সাহিত্যের বড় একটা ধার ধারেন না, তাঁহারা সাহিত্য-সেবিগণের সংসর্গে আসিয়া সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ-পরায়ণ হইতে পারেন। অতএব যাঁহারা এই সম্মিলনের উদ্ভাবক, তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের পরম উপকারী, সন্দেহ নাই।

সর্ব্ব প্রথম ১৩১৩ বঙ্গাব্দে বরিশাল নগরীতে এই সম্মিলনের কথা ছিল। সাহিত্য-মহারথী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সম্মিলনের সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া সেই স্থানে গিয়াও ছিলেন—আরও বহু সাহিত্য-সেবী সম্মিলনে যোগ দিবার নিমিত্ত বরিশালে পদার্পণ করিয়াছিলেন। হঠাৎ কোনও কারণে—এবং তাহা সকলেই জানেন—সম্মিলনে বাধা পড়িল ; তদর্থে উপস্থিত সকলেই ভগ্নমনোরথে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

সুতরাং বলিতে হইবে, এক অশুভ মুহূর্ত্তেই, বোধ হয়, এই শুভকর সম্মিলনের কল্পনা হইয়াছিল। দ্বিতীয় উদ্যমেও ইহারই প্রমাণ পাইলাম। কাশিমবাজারের শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুরের উদ্‌যোগে মোরশিদাবাদে সম্মিলন সংঘটিত হইবার সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে, এমন সময় মহারাজ বাহাদুরের উপর এক আকস্মিক বিপৎপাত হইল, সেইবারও সম্মিলনে বাধা পড়িল।

তৎপর ১৩১৪ বঙ্গাব্দের দীপান্বিতার পুণ্য-তিথিতে বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধিনায়কত্বে এবং প্রাগুক্ত মহারাজ বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পাদিত হইল।

প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও এই প্রথম সম্মিলনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারি নাই, দ্বিতীয় সম্মিলনে, যেরূপেই হউক, উপস্থিত হইব, এই সংকল্প করিলাম।

প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম, এই বৎসর শ্রীপঞ্চমী যোগে রাজ-

শাহীতে সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে। সরস্বতী পূজার সপ্তাহ খানিক পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ দুইটী নিমন্ত্রণ পত্র পাইলাম; প্রথমতঃ বগুড়া উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের তারিখ ১৮ই ও ১৯শে মাঘ; দ্বিতীয়তঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের, তারিখ ১৬ই ও ১৭ই মাঘ। এত কাছাকাছি দুইটী সম্মিলন, তাহাও একই বিভাগের দুইটী পরস্পর পাশাপাশি জেলায়, ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, বগুড়ার নিমন্ত্রণটী "উত্তর বঙ্গ" সম্পর্কীয়, আমার সঙ্গে বঙ্গের এই ভাগের সম্পর্কই বা কি? অথচ উভয় সম্মিলনে যোগ দেওয়ার নিমিত্ত আবশ্যক পরিমাণে ছুটিও পাইব না ভাবিয়া, এই নিমন্ত্রণ ধন্যবাদ দ্বারা প্রত্যাখ্যান করিয়া, রাজশাহীতে যাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। যাত্রা করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়াছি, এমন সময় এক খানি কার্ড পাইয়া জানিলাম, রাজশাহীর সম্মিলনের তারিখ দুই দিন পিছাইয়া ১৮ই ও ১৯শে মাঘ অর্থাৎ বগুড়ার সম্মিলনের একই তারিখে পড়িল। যাত্রা ভঙ্গ হইল, মনে কিঞ্চিৎ ক্ষোভও হইল। হায় বাঙ্গালী, বিনা ভণ্ডুলে তোমার কি কোনও কাজই হয় না?

যাহা হউক যথাকালে পুনশ্চ যাত্রা করিয়া ১৬ই মাঘ, শুক্রবার, শেষ রাত্রে (প্রায় ৪ টার সময়) নাটোর ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। রাজশাহী-প্রবাসী জনৈক বন্ধুকে ইতিপূর্ব্বে পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, নাটোর ষ্টেশনে সম্মিলনীর উদ্যোক্তাদের হইয়া আগন্তুকবর্গের তত্ত্বাবধানার্থ কোনও স্বেচ্ছাসেবক থাকিবে কি না, ইহার উত্তরে বন্ধুবর লিখিয়াছিলেন, "অবশ্যই থাকিবে।" ষ্টেশনে নামিয়া কিন্তু সেইরূপ কিছুই দেখা গেল না। যাহা-হউক, ২১৪ মিনিটের চেষ্টার পর একটী সহযাত্রীর সাহায্যে কুলির যোগাড় হইল, এবং তৎসহায়তায় "কেরিইং কোম্পানির" শকট-আফিসে গিয়া জানিলাম, তাঁহাদের সমস্ত গাড়ী গুলিই "রিজার্ভ" হইয়া গিয়াছে—কেননা কলিকাতা হইতে প্রেসিডেণ্ট ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়-প্রমুখ অনেক ভদ্রলোক দার্জিলিঙ্ আপ্ মেলে আসিয়া ষ্টেশনগৃহে শুইয়া আছেন, তাঁহারা রাত্রি প্রভাতে রাজশাহী যাইবেন। তখন অন্য কোম্পানির (বি,সি (?)) গাড়ীর আশ্রয় লইতে হইল, কিন্তু কেরিইং-কোম্পানির আফিসে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

ইত্যবসরে কলিকাতা হইতে আগত দুই জন তরুণ বয়স্ক ভদ্রলোক কোম্পানির কেরাণীবাবুর নিকটে আসিয়া বলিলেন "মহাশয়, নাটোরের মহারাজের বাড়ীটা কতদূর? ডাঃ রায় চা না খাইলে নড়িতেই পারিবেন না;* দুধ চাই, ওখানে দুধ পাওয়া যাইবে কি?" ইত্যাদি। তখন রাত্রি পৌনে পাঁচটা আন্দাজ। নানা কারণে মনে কষ্ট হইল। ডাঃ রায় অবশ্য উপযাচক হইয়া সভাপতির কার্য্য করিতে আসেন নাই—রাত্রি ১০টার সময় নাটোর আসিয়া কিনা শুইবার জন্য তাঁহাকে সদলবলে ষ্টেশন-গৃহের আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইল! কেবল কি সম্মিলনের সভাপতিরূপেই

* ধন্য চা! যে মহাত্মাকে সংসারশৃঙ্খল আবদ্ধ করে নাই, তুমি তাঁহার উপর—নারায়ণের উপর যোগ নিদ্রার ন্যায়—কি বিষম চাপিয়াছ! ইহাতে স্বতঃই চক্ষু প্রাচীন আদর্শের দিকে ধাবিত হয়। অশীতিপর বৃদ্ধ অধ্যাপকেরা ২।১ দিন জলগ্রহণ না করিয়াও কেমন স্বচ্ছন্দে ও প্রফুল্লচিত্তে দূরদেশস্থিত নিমন্ত্রণকারীর গৃহে উপস্থিত হন, অনেকেই বোধ হয়, সেইদৃশ্য দেখিয়াছেন।

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় সমাদরের পাত্র? যাঁহার নাম লইয়া আজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতি গৌরব করিতেছে, নাটোরে তাঁহার অভ্যর্থনার একটুও ব্যবস্থা হইল না! তিনি যে সদলে আসিতেছেন, এ কথা অবশ্যই পূর্ব্বে জানিয়াছিল, নচেৎ গাড়ীগুলি রিজার্ভ হইল কিরূপে? ইঁহাদের যখন এই অবস্থা, তখন আমার মত নগণ্যের জন্য যে নাটোরে কোন ব্যবস্থা থাকিবে, ইহা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত; বিশেষতঃ আমি যে কোন্ মুহূর্ত্তে নাটোরে পৌঁছিব, ইহা পূর্ব্বে জানাইও নাই।

আমরা বি, সি, কোম্পানির গাড়ীতে প্রায় ৫ ঘণ্টায় নাটোর হইতে রাজসাহী পৌঁছিয়া দেখি, বিশাল মণ্ডপ সজ্জিত হইতেছে। মণ্ডপের পার্শ্বস্থ একটী দালানে অভ্যাগতগণের—উঁহারা বলেন "ডেলিগেট্"-দের (কিসের "ডেলিগেট্?")—স্থান হইয়াছিল। সম্মিলনের বৈঠকের কাল দুই দিবস পিছাইলেও, কাজ কর্ম্মের যে তখনও সুব্যবস্থা হইয়াছিল, সেরূপ ভাব দেখিলাম না। পর দিন প্রাতেই সম্মিলন-সভা বসিবার কথা, সেইজন্য সারা রাত্রি খাটিয়া উদ্‌যোক্তৃবর্গ কোনও রূপে মণ্ডপ নির্ম্মাণ ও সজ্জার কাজ সারিয়া লইয়াছিলেন।

"রাজশাহী ও বঙ্গসাহিত্য" এই দুইটী সমকালে উচ্চারিত হইবামাত্র যাঁহার নাম সর্ব্বাগ্রে স্মৃতিপথে উদিত হয়, সেই শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয় রাজশাহী ছাড়িয়া নাকি শুক্রবারই বগুড়ায় চলিয়া গিয়াছিলেন। আমি ভিতরকার খবর জানিনা, জানিতে চেষ্টাও করি নাই। কলহ, মনান্তর বা দলাদলির কথা জানিবার বা শুনিবার জন্যও রাজশাহী যাই নাই। বাঙ্গালীর বীজ যেখানে পড়িয়াছে, সেই খানেই ত ইহা বর্ত্তমান।

যাহা হউক, আমার মন কাণ্ডকারখানাটা দেখিয়া বড় দমিয়া পড়িল। এত পথ-ক্লেশ, অর্থব্যয়, আরও নানা অসুবিধা ভোগ করিয়া রাজশাহীতে গিয়াছিলাম—বগুড়ার অন্য সভায় যে অনেকে আকৃষ্ট হইবেন, তাহা পূর্ব্বেই ভাবিয়া আসিয়াছিলাম—কিন্তু ক্ষুদ্র রাজশাহীতেই যে দুইটী দল থাকিবে, ইহাত ভাবি নাই। কলিকাতা হইতে অতি অল্প সংখ্যক মাত্র সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি আসিয়াছিলেন—অনেকে বোধ হয় বিরোধের আঁচ পাইয়া এই সাহিত্য-সম্মিলনে আগমনার্থ পা বাড়ান নাই। আমারই অদৃষ্ট মন্দ!

সভাপতি ডাঃ রায়ের দল প্রায় ১॥ টার সময় রাজশাহীতে পৌঁছেন। ডাঃ রায় এবং অপর একজন বিলাত ফেরত মিঃ—*, একখানি বজ্‌রা নৌকায় পদ্মাবক্ষে বাসা পাইলেন। অন্যান্য ব্যক্তিদের জন্য মণ্ডপের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দালানে ঢালাও বিছানা হইল। ইহা দেখিয়া হৃদয়ে আনন্দ হইল, ভাবিলাম, যা'-হউক, যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গেত অহোরাত্র একত্র থাকিয়া নানা প্রসঙ্গে বহু শিক্ষা লাভ করিতে পারিব। কিন্তু ও বিধি! সেই সাধেও তুমি বাদী হইলে, সাহিত্যরথী অমুক সাহিত্যসারথি অমুকের আবাসস্থলে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অস্মাদৃশ পদাতিদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন! আবার এই "পদাতির" দলেরও কাহাকেই সেই পূর্ব্বোক্ত ঢালাও বিছানায় থাকিতে দেখিলাম না; এই অধমই মাত্র একাকী সেই সুবিস্তীর্ণ কক্ষদ্বয়ের এক ঘরের এককোণে রাত্রি যাপন করিয়াছিল। "একাকী" বলিলে একটু দোষ হয়; কেন না, পর দিন ভোরে

* মোক্তার গেলে যেমন হাজি হয়, তদ্রূপ বিলাতে পা দিলেই অস্মদ্দেশীয়েরা "মিঃ" হইয়া পড়েন।

ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি, সেই বিছানায় দুই একটী ভৃত্য ইতস্ততঃ শয়ান রহিয়াছে!

শনিবারের কথা এখনও শেষ হয় নাই। যখন শুনিলাম, কলিকাতার সাহিত্যিক দল অর্থাৎ সভাপতি ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সাহিত্য-পরিষদ-সম্পাদক-সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি পৌছিয়াছেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ার্থে সেই পদ্মাবক্ষঃস্থিত বজরায় চলিয়া গেলাম। তাঁহারা সকলেই বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন অমায়িক প্রকৃতিক; সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে মিশিতে অধিক সময় লাগিল না। বিশেষতঃ বঙ্গ-জননীর গৌরবের ধন ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্রের অবর্ণনীয় সরল ও নিরহঙ্কার ভাব দেখিয়া প্রকৃতই মুগ্ধ হইলাম। যে সকল শফরী গণ্ডূষ জলমাত্রে ফর্ ফর্ করেন, তাঁহারা যেন এক বার এই অগাধ জলসঞ্চারী নির্ব্বিকার রোহিতটী দেখিয়া যান্।

সেই দিন আর একটী বস্তু দেখিয়াছি। রাত্রে দিঘাপাতিয়ারাজের বাসা বাড়ীতে বিষয় নির্ব্বাচন নিমিত্ত একটী বৈঠক হইয়াছিল। সেইখানে গিয়া দেখি, সাহিত্যিকগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া, নক্ষত্র-বেষ্টিত শশধরের ন্যায়, মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর উপবিষ্ট হইয়া আছেন। তুলসীমালা শোভিত-কণ্ঠ সৌম্যমূর্ত্তি মহারাজকে দেখিলেই জ্ঞান হয় যেন, মূর্ত্তিমান বৈরাগ্য রাজবেশে মর্ত্ত্যভূমে অধিষ্ঠিত। সকলে তাঁহার সাহিত্যে আসক্তি ও বিদ্বদ্বর্গের প্রতি আনুরক্তি দেখিয়া, তাঁহাতে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর চিরসাপত্ন্য ভাবের অভাব অবলোকনে বিস্ময় প্রকাশ করেন। কিন্তু আমি ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিস্মিত হই নাই। লক্ষ্মী ও সরস্বতী অন্যত্র পরস্পরের সাক্ষাৎ লাভে পরাঙ্মুখী হইতে পারেন; কিন্তু নারায়ণে উভয়েই সতীজনোচিত অনুরক্তা। মহারাজের হৃদয়ে সতত নারায়ণ বিরাজমান; লক্ষ্মী সরস্বতী সুতরাং এই আধারে সমভাবে উভয়েই অনুরাগিণী হইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি?

রবিবার প্রাহ্নে ৮ ঘটিকার সময় সম্মিলনের অধিবেশন আরম্ভ হইল। ১০টা পর্য্যন্ত কাজ হইয়া সভ্যগণের স্নানাহার নিমিত্ত সভাভঙ্গ হইল। এই বেলা কেবল অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কুমার শরৎকুমার রায় তদীয় "সম্ভাষণ" এবং সম্মিলনের সভাপতি ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় "অভিভাষণ" পাঠ করিয়াছিলেন। উভয় প্রবন্ধই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। কেবল ডাঃ রায়ের প্রবন্ধের একস্থলে যে ঋষিকল্প রঘুনন্দনের এবং বঙ্গ-গৌরব রঘুনাথ-প্রমুখ নৈয়ায়িকবর্গের উপর কটাক্ষপাত করা হইয়াছে, ইহা প্রাণে বড় বাজিল। বিশেষতঃ সরস্বতীর এমন নিষ্কপট সাধক সংযমশীল ডাঃ রায়ের দ্বারা তাঁহাদের প্রতি ঈষৎ অনাদরের ভাব প্রদর্শন বড়ই অপ্রত্যাশিত —ইহা চাপিয়া গেলে প্রবন্ধেরও কোন অঙ্গ হানি হইত না।*

অপরাহ্নে প্রায় ৩টার সময় পুনঃ কার্য্যারম্ভ হয় এবং সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরেই সেই দিনের জন্য সম্মিলনের কার্য্য শেষ হয়। এইবেলা সম্মিলন উপলক্ষে নানা বিষয়ক নির্দ্ধারণের প্রস্তাব ও সমর্থন হইয়াছিল। এতন্মধ্যে একতমের সমর্থন করিতে গিয়া রাজশাহীর লোকপ্রিয় ডিষ্ট্রীক্ট জজ শ্রীযুক্ত

---

* সেই দিন সন্ধ্যার পর আমি সবিনয়ে ডাঃ রায়ের নিকট আমার এই কথাটী প্রকাশ করিয়াছিলাম। বিনয়াধার ডাঃ রায় ইহা নিতান্ত অগ্রাহ্য বলিয়া মনে করেন নাই।

আবদুল মজিদ সাহেব বঙ্গভাষায় কিয়ৎক্ষণ বক্তৃতা করিয়া, ভাবের ঔদার্য্যে ও ভাষার গাম্ভীর্য্যে শ্রোতৃবর্গের অকপট প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আসামায় মোসলমান, অথচ তাঁহার বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর প্রতি ঈদৃশ সুগভীর সহানুভূতি বাস্তবিক বড়ই আনন্দের বিষয়। সম্মিলনের উপলক্ষে যে সকল রচনা পাঠ হইবার কথা ছিল, ঐদিন তাহার একটীমাত্র পঠিত হইয়াছিল; এই রচনা পাঠক ছিলেন, রাজশাহী কলেজের আরব্য-পারস্যরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আবদুল মোয়াইদ খাঁ। বিষয় "বঙ্গীয় মুসলমানগণের ভাষা।" কি বিষয় সন্নিবেশে, কি লিপিকৌশলে, কি যুক্তির অবতারণায়, কি পড়িবার প্রণালীতে, সর্ব্ব বিষয়ে এইটী অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রায় প্রতি বাক্যের অবসানে তুমুল করতল-সংঘর্ষ-নির্ঘোষদ্বারা প্রবন্ধের মহিমা উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল। পাঠান্তে রচয়িতা আসন পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বে,স্বয়ং সভাপতি দাঁড়াইয়া তাঁহার সঙ্গে কোলাকুলি করিলেন। ইতঃপর সেইদিন অন্য কোনও রচনা পড়া হইতে পারে না, ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া সভাভঙ্গ হইল। সেই দিনকার কার্য্যের এইরূপে মধুরেণ সমাপন হইল।

রাত্রিতে সাধারণ পুস্তকালয়ে অভ্যাগতদিগের বিনোদনের নিমিত্ত আয়োজন অনুষ্ঠান হইয়াছিল। গান,বাদ্য,আবৃত্তি, ছায়াবাজি,জলযোগ প্রভৃতি কোন অঙ্গেরই ত্রুটি ছিল না। রসিক কবি শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের হাসির গান গুলি অতীব প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল।

সোমবার অধিবেশনের দ্বিতীয় এবং শেষ দিন। প্রবন্ধ অনেকগুলি ছিল, তন্মধ্যে কয়েকটী পঠিত বলিয়া গৃহীত হইলেও, পঠিতব্য রচনার সংখ্যা ১০৷১২টীর কম ছিল না। ৮টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হইলেও এবং রচনা পাঠের সময় ১৫ মিনিট নির্দ্ধারিত হইলেও, এই দিনের কাজ শেষ হইতে প্রায় ২টা বাজিয়াছিল। সভাপতি মহাশয়কে এবং এই সম্মিলনের প্রাণস্বরূপ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়। ইতিমধ্যে সভাপতি মহাশয়ের এবং তৎপার্শ্বে সন্নিবিষ্ট মহারাজ বাহাদুর-প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তির ফটো তোলা হইল। চিত্রে সামিল হইবার নিমিত্ত যাঁহাদের আগ্রহাতিশয় ছিল, তাঁহারা সারি বাঁধিয়া সভাপতির পশ্চাদ্‌ভাগে দাঁড়াইয়াছিলেন।

ঐ দিনই প্রায় ৪টার সময় কেরিইং কোম্পানীর ডাকবাহী অশ্বশকটে রাজশাহী পরিত্যাগ করিলাম। যে কয়দিন রাজশাহীতে ছিলাম, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শশধর রায় প্রভৃতি উদারাশয় মহাত্মাগণের আদর আপ্যায়নে কোনও রূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। ক্ষুদ্র হইলেও আমার প্রতি তাঁহাদের সদয় ব্যবহার দর্শনে কালিদাসের সেই কবিতাংশটী মনে পড়িয়াছিল :—

"ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে
মমত্বমুচ্চৈঃ শিরসাং অতীব।"

এই সাহিত্য-সম্মিলন প্রতিবর্ষেই যখন হইবে, তখন ইহা কিরূপ ভাবে হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথার অবতারণা করা অতীব প্রয়োজনীয় মনে করিতেছি।

ইহা সাহিত্য-সম্মিলন, অর্থাৎ সাহিত্য-সেবিগণের একত্র মিলনস্থল, সুতরাং ইহা কলিকাতাস্থ সম্মিলনের ন্যায় সাহিত্যানুরাগীদের একটী বড় মজলিস্। ইহার অপেক্ষা বেশী একটা কিছু যদি কেহ মনে করেন, করিতে পারেন। কিন্তু আমি ক্ষুদ্রমতি,ইহার

অধিক মনে করিতে চাই না। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টির জন্য সাহিত্য-পরিষদ, সাহিত্য-সভা প্রভৃতি আছেন, পরিষদের শাখাও নানা স্থানে হইয়াছে এবং হইবে। "সম্মিলন" দুই দিনের জন্য বসিয়া ঐ সকল সভার হাত হইতে উহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি কাড়িয়া লইয়া ঝুড়ি ঝুড়ি রিজলিউশন্ পাস্ করিবেন, এইটা আমি ভাল মনে করি না। আমরা বাইবেলের গড নহি যে, "অমুকটি হউক" বলিলাম, আর অমনি তাহা হইয়া গেল। এই যে প্রায় দেড় বৎসর হইল, সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে একরাশি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, এ যাবৎ কয়টী কাজ হইয়াছে?

তবে সম্মিলনে কি হইবে? কেন, সম্মিলনে বহুকাজ হইবে। সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতির স্থান কলিকাতায়, সুদূর মফঃস্বলবাসীরা তাহার একটা খবর শুনে বটে, কিন্তু তাহার কিছু দেখে না। সাহিত্য-সেবীদের মধ্যে যাঁহারা দুরদৃষ্টবশতঃ মফঃস্বলে থাকেন, তাঁহারা কেন্দ্রভূমিস্থ কর্ম্মীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও ভাব-বিনিময় করিতে ইচ্ছুক হইলেও সুযোগ পান না। সম্মিলন সেই সুযোগ ঘটাইয়া দেয়। কিয়দ্দিনের জন্য মুরশিদাবাদে বা রাজশাহীতে, পাবনায় বা ভাগলপুরে সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্যানুরাগীদের সমাগমে সে উদ্দীপনা হইবে, ইহাই সাহিত্যের পরম লাভ। এই সকল সম্মিলনে বরং এই করা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক সাহিত্যিক সভা—পরিষদ ও তদীয় শাখাবলী, সাহিত্য সভা, ইত্যাদি—সংবৎসর কাল কি কি কাজ করিলেন, তাহার একটী বিবরণী পাঠ করিতে পারেন। ইহাতে দুইটী ফল হইবে; কোনও সভায় যদি বিশেষ কাজ না হইয়া থাকে, তবে লজ্জা পাইতে হইবে ভাবিয়াও ভবিষ্যতে কাজের দিকে প্রয়াস হইবে; দ্বিতীয়তঃ মফঃস্বলের লোকেরাও অবগত হইবেন যে, সভাগুলির দ্বারা এই এই কাজ হইতেছে,—অতএব তাঁহাদের ঐ সকল কাজে প্রবৃত্তি জন্মিবে।

অতএব কোনও প্রস্তাব করা এই সম্মিলনের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত বলিয়া বিবেচনা করাই উচিত। সম্মিলনের উদ্‌যোক্তৃগণ সে সকল সাহিত্য-সেবক বা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদিগকে নিমন্ত্রণ করিবেন, তাঁহাদের সংবর্দ্ধনার্থ সম্ভাষণ-পত্রপাঠ করিতে পারেন। সভাপতি নিয়োগ পূর্ব্বাবধি করিয়া প্রয়োজন নাই—দরকার মনে হইলে, একজন সভাবিনায়ক উপস্থিত সাহিত্য-সেবকগণ হইতে মনোনীত হইতে পারেন। প্রথম দিন সমাগত নিমন্ত্রিত সাহিত্য-সেবকদিগকে উদ্‌যোক্তৃগণের মধ্যে কেহ সমবেত সাধারণ জনতার নিকট পরিচিত করিয়া দিবেন; তৎকালে তাঁহাদের দ্বারা সাহিত্যের কিরূপ সেবা হইতেছে, বলিয়া দিবেন। প্রথমতঃ এইরূপ অভ্যর্থনাদি হইবে। তারপর প্রত্যেক সাহিত্যসভার কার্য্যসম্বন্ধে তত্তৎসভার প্রতিনিধিগণ বক্তৃতা করিবেন। অতঃপর উপস্থিত সাহিত্য-সেবকগণের কেহ যদি সাহিত্যের উন্নতি ও পুষ্টি সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা বা রচনা পাঠ করিতে চাহেন, তাহা করিবেন। অধিকন্তু তাঁহাদের আমোদের নিমিত্ত নানা প্রকার অনুষ্ঠান হইতে পারে।

নানা সাহিত্য সভা হইতে আগত প্রতিনিধিগণ কেবল যে বক্তৃতা ও রিপোর্ট পাঠ করিবেন, এমন নহে, প্রদর্শনীয় কোনও কিছু যদি উপস্থাপিতও করিতে পারেন।

যাঁহারা রচনা পাঠ বা বক্তৃতা করিবেন, তাঁহারা পূর্ব্বদিনে তাহা সম্মিলনের উদ্যোক্তাদিগকে জানাইবেন। সংক্ষেপে বিষয়টীর বিবরণীও দিবেন। প্রবন্ধ ভাষা বা সাহিত্য বিষয়ক হওয়া চাই। বিগত সম্মিলনে পঠিত "উদ্ভিদের আহার," "পরমাণু-তত্ত্ব," "রঞ্জন শিল্প" "স্বয়ং-বহযন্ত্র" ইত্যাদি প্রবন্ধ অতি উপাদেয় ও শিক্ষাপ্রদ হইলেও, সাহিত্য-সম্মিলনের যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি না। তাহা হইলে, ইহার সাহিত্য-সম্মিলন" নাম না হইয়া "সারস্বত-সম্মিলন" অথবা ইত্যাকার অন্ত কোনও নাম হওয়া উচিত।

স্বীকার করি, সাহিত্যের পুষ্টি বা উন্নতি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বা পুস্তকাদি প্রচার দ্বারা তেমনই হয়, যেমন গল্প, নাটক বা কবিতা পুস্তকের দ্বারা হয়। এই হেতুতে সাহিত্য-সম্মিলনে "থালাস্" এর ন্যায় গল্পের বা "চিত্র দর্শন" এর ন্যায় কবিতা পড়িতে হইলে, কিম্বা "চৈতন্যলীলার" ন্যায় নাটকের অভিনয় দেখিতে হইলে কেমন হইবে? ফলতঃ যাহাতে বঙ্গ সাহিত্যের কিরূপে উন্নতি হইবে, ইহার দোষবর্জ্জন বা গুণার্জ্জন কল্পে কি কি বিধেয়, ইহার অনুশীলন, প্রসার প্রভৃতি কিরূপে বর্দ্ধিত করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয়ই সাহিত্য-সেবিগণের সমক্ষে আলোচিত হওয়া উচিত।* ইহাতে সকলেই অল্প স্বল্প শিক্ষালাভ করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বাঙ্গালা সুকুমার সাহিত্য"সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটী সম্মিলনের বেশ উপযোগী হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতি সভাপতি মহাশয় অতিরিক্ত সময়দানে করুণা প্রদর্শন করেন নাই, অথচ রঞ্জন-শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধে অত্যধিক সময় ব্যয়িত হইয়াছিল।† বোগতিক দেখিয়া বোধ হয় সুলেখক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁহার 'সমালোচনা' বিষয়ক সম্মিলনের উপযোগী অপর একটী প্রবন্ধ শিরঃপীড়া ব্যপদেশে সভায় পাঠ করিতে সম্মত হন নাই।

সম্মিলন যে স্থানে হইবে, সেইস্থানের স্কুল কলেজের ছাত্রদিগকে স্বেচ্ছা-সেবক ভাবে সাহিত্যসেবীদের পরিচর্য্যায় নিয়োজিত করা উচিত। ইহাতে তাহারা সাহিত্যিকগণের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিবার সুযোগ পাইবে। ইহাতে সাহিত্যপরায়ণ হইবার জন্য স্পৃহাও তাহাদের কোমল-হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে পারে। রাজশাহীতে যদিও কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রমুখ অধ্যাপক ও শিক্ষক মহাশয়দের অনেকেই সম্মিলনে সোৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন, তথাপি ছাত্রদিগকে সম্মিলনের কোনও কাজে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কেবল শেষের দিন দেখিলাম, কয়েকটী ছাত্র কিছু কিছু কাজ করিয়াছিল। সেই দিন সেখানে অভ্যাগতদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে পাত পাড়িতেও দেখিয়াছিলাম।

যাঁহারা অকৃত্রিম সাহিত্য সেবক, অথচ অর্থাভাবে সাহিত্য সম্মিলনে যোগ-দান করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের যাতায়াতের ব্যয়-

* বস্তুতঃ "সাহিত্য" অর্থে আজকাল কে কি বুঝেন, জানি না। সেদিন আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হাভেল সাহেবকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছে। হাভেল সাহেবের সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধ কি, আমি ক্ষুদ্র-মতি ত বুঝিলাম না।

† উদারমতি ডাঃ রায় এই বিষয়ে স্বয়ং বেশ চতুরতা সহকারে যজ্ঞেশ্বর বাবুর নিকট পরিহার প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

তারও সম্মিলনের উদ্‌যোক্তৃগণের বহন করা উচিত। তবে এইরূপ অর্থ সাহায্য, দরিদ্র হইলেও,অভিমানে কোন সাহিত্যিক প্রকাশ্যে গ্রহণ করিবেন কিনা, সন্দেহ।

আর যাহাতে যুগপৎ দুইটী স্থানে সাহিত্যিক সম্মিলন না হয়, সর্ব্বাগ্রে ইহার বিধান বা প্রতিবিধান করিতে হইবে।

সাহিত্য-সম্মিলনের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, সম্মিলনের পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণ ইহা অবধান-যোগ্য মনে করিবেন কিনা, জানি না। যদি কিয়ৎপরিমাণেও করেন,তবে এই সম্মিলনে যোগদানার্থ যে আয়াস করা হইয়াছে, তাহা প্রভূত পরিমাণে সফল হইয়াছে, মনে করিয়া, আত্মপ্রসাদ অনুভব করিব।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

গীতার ঐতিহাসিকতা।

[ঝ] গীতা প্রণয়নের সময়ের আভ্যন্তরিক প্রমাণ।

আমরা পূর্ব্বে বাহ্যিক প্রমাণ সকলের উপর নির্ভর করিয়া গীতার সময় নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে গীতার আভ্যন্তরিক প্রমাণের আলোচনা করা যাইতেছে। থিওসফিষ্ট (Theosophist) নামক পত্রিকায়, ১৯০৮ সালে মার্চ্চ, এপ্রিল ও মে মাসে, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রমাপ্রসাদ নিম্নোক্ত প্রকারে দুই একটী আভ্যন্তরিক প্রমাণের আলোচনা করিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে নিজের বিভূতি বর্ণনাকালে বলিয়াছেন যে,—"মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্" (১০।৩৫), দ্বাদশ মাসের ভিতর আমি মার্গশীর্ষ। মার্গশীর্ষের অপর নাম অগ্রহায়ণ। বৎসরের প্রথম মাসকেই অগ্রহায়ণ বলা হয়। মুখ্য মাস বলিয়া ইহাকে ভগবানের বিভূতি বলা হইয়াছে। পণ্ডিত দৈবজ্ঞ সূর্য্য 'পরমার্থ প্রপা' নামক গীতার টীকাতে লিখিয়াছেন যে, মৃগশিরা-নক্ষত্র-যুক্ত পৌর্ণমাসী হওয়াতে এই মাসকে মার্গশীর্ষ বলা হইয়াছে। মৃগশিরার দেবতা হইতেছেন চন্দ্র। এবং যে নক্ষত্র হইতে যে মাসের নাম হয়, সেই নক্ষত্রের যিনি দেবতা, তিনিই সেই মাসের দেবতা হন। সুতরাং মার্গশীর্ষের চন্দ্রই দেবতা। এবং তিনি পূর্ণিমারও দেবতা। মাসের দেবতা, নক্ষত্রের দেবতা এবং পূর্ণিমার দেবতা এক বলিয়া এই মাসের পূর্ণিমা অতি পবিত্র। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, এই মাস আমার বিভূতি।

এখন জিজ্ঞাস্য যে, কোন্ সময়ে মার্গশীর্ষকে অগ্রহায়ণ বা বৎসরের প্রথম মাস বলা হইত? সেই সময় নির্দ্ধারিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণের এবং গীতারও সময় নির্দ্ধারিত হইবে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিয়াছিলেন যে, আমি মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ, তখন মার্গশীর্ষ বৎসরের মধ্যে প্রথম বা মুখ্য মাস বলিয়া পরিগণিত হইত।

জ্যোতিষে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, বাসন্তিক ক্রান্তিপাত যখন যে নক্ষত্রে হয়, সেই নক্ষত্র যুক্ত পৌর্ণমাসীকে বৎসরের

প্রথম মাস বলা হয়। বাসন্তিক ক্রান্তিপাত যখন মৃগশিরায় হইত, তখন মার্গশীর্ষকে মুখ্য মাস ধরা হইত। বাসন্তিক ক্রান্তি-বিন্দু ভ্যানের (ecliptic) সর্ব্বোচ্চ স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সূর্য্য অথবা চন্দ্র যখন এই বিন্দুতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহার সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, চন্দ্র উক্ত নক্ষত্রের, মাসের এবং পূর্ণিমার দেবতা বলিয়া এবং এই সময়ে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত বলিয়া, বৎসরের মধ্যে চন্দ্রের ক্ষমতার প্রকাশ এই সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইত। এই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, আমি মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ।

জ্যোতিষের মতে ২৭ নক্ষত্র বার রাশি ভোগ করিয়া থাকে, অর্থাৎ এক এক রাশি ২¼ নক্ষত্র ভোগ করিয়া থাকে। ২৭ নক্ষত্র ৩৬০ ডিগ্রি ভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং এক এক নক্ষত্র ১৩°—২০' মিনিট ভোগ করিয়া থাকে। যেমন—

মাস	নক্ষত্র	ডিগ্রি	রাশি
	অশ্বিনি	১৩-২০	
আশ্বিন	ভরণী	১৩-২০	মেষ
	কৃত্তিকা ¼	৩-২০	
	কৃর্ত্তিকা ¾	১০-০	
কার্ত্তিক	রোহিণী	১৩-২০	বৃষ
	মৃগশিরা ½	৬-৪০	
	মৃগশিরা ½	৬-৪০	
মার্গশীর্ষ	আর্দ্রা	১৩-২০	মিথুন
	পুনর্ব্বসু ¾	১০-০	
	পুনর্ব্বসু ¼	৩-২০	
পৌষ	পুষ্যা	১৩-২০	কর্কট
	অশ্লেষা	১৩-২০	
	মঘা	১৩-২০	
মাঘ	পূর্ব্ব ফাল্গুনি	১৩-২০	সিংহ
	উত্তর ফাল্গুন ¼	৩-২০	
	উত্তর ফাল্গুনি ¾	১০-০	
ফাল্গুন	হস্তা	১৩-২০	কন্যা
	চিত্রা ½	৬-৪০	
	চিত্রা ½	৬-৪০	
চৈত্র	স্বাতি	১৩-২০	তুলা
	বিশাখা ¾	১০-০	
	বিশাখা ¼	৩-২০	
বৈশাখ	অনুরাধা	১৩-২০	বৃশ্চিক
	জ্যেষ্ঠা	১৩-২০	
	মূলা	১৩-২০	
জ্যৈষ্ঠ	পূর্ব্বাষাঢ়া	১৩-২০	ধনু
	উত্তরাষাঢ়া ¼	৩-২০	
	উত্তরাষাঢ়া ¾	১০-০	
আষাঢ়	শ্রবণা	১৩-২০	মকর
	ধনিষ্ঠা ½	৬-৪০	
	ধনিষ্ঠা ½	৬-৪০	
শ্রাবণ	শতভিষা	১৩-২০	কুম্ভ
	পূর্ব্বভাদ্র পদ ¾	১০-০	
	পূর্ব্বভাদ্র পদ ¼	৩-২০	
ভাদ্র	উত্তর ভাদ্রপদ	১৩-২০	মীন
	রেবতি	১৩-২০	

যে নক্ষত্রে পূর্ণিমা হয়, সেই নক্ষত্রের নামানুসারে মাসের নাম হইয়াছে।*

* It is found that the full-moon day either begins or ends in one of these mansions in the appropriate months. The other asterisms do not give names to the months, although it is seen that the full-moon day begins and ends sometimes in other months also. Thus at a time when the moon becomes full in the beginning of the constellation of Aswini the fullmoon day must have begun in the constellation of Revati; but the month is not calledafter Revati. And this happens in the case of every month. The reason for this is that

পূর্ব্বোক্ত তালিকা হইতে দৃষ্ট হইতেছে যে, বৃষের ২৩ ২০ মিনিট গত হইলে মৃগশিরা আরম্ভ হইয়াছে এবং মিথুনের ৬.৪০ গত হইলে শেষ হইয়াছে। আজকাল বাসন্তিক ক্রান্তিপাত মীনের ৭ ডিগ্রিতে হইয়া থাকে। সুতরাং বৃষের ২৩-২০ মিনিট হইতে মীনের ৭ ডিঃ পর্য্যন্ত হিসাব করিলে (২৩-২০+৩০+২৩) =৭৬.২০ মিঃ পাওয়া যায় এবং মিথুনের ৬ ৪০ মিনিট হইতে মীনের ৭° পর্য্যন্ত হিসাব করিলে (৬-৪০+৬-৪০+২৩-২০+৩০+২৩) = ৮৯° ৪০ মিঃ পাওয়া যায়। পণ্ডিতমণ্ডলী অঙ্ক পাতের দ্বারা এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, ২৫৭৯১ বৎসরে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরিয়া আসে, সুতরাং ৭৬-২০ মিনিট এবং ৮৯-৪০ মিনিট ঘুরিতে যথাক্রমে ৫৪৬৮ এবং ৬৪২৩ বৎসর লাগে। সুতরাং ৫৪৬৮ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ৬৪২৩ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মার্গশীর্ষকে অগ্রহায়ণ বা বৎসরের প্রথম মাস বলা হইত। পণ্ডিত রমাপ্রসাদ বলেন যে, এই সময়ের ভিতর শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং গীতোক্ত উপদেশ দিয়াছিলেন। অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৪৫১৫ বৎসর হইতে খ্রীঃ পূঃ ৩৫৬০ বৎসরের মধ্যে গীতার সময় নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায়।

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতেও ভগবদ্গীতার সময় নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায়। মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বের মধ্যে ভগবদ্গীতা পর্ব্বের অন্তর্গত ১৭শ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"মঘা বিষয়গঃ সোমস্তদ্দিনং প্রত্যপদ্যত"

অর্থাৎ যে দিনে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, সেই দিনে চন্দ্র মঘার দেশে গিয়াছিলেন। ইহার ব্যাখ্যা কালে নীলকণ্ঠ নিম্নোক্ত প্রকারে আলোচনা করিয়াছেন। "মঘা পিত্র্যং নক্ষত্রং তস্য বিষয়োদেশঃ পিতৃলোকস্তদ্গতঃ সোমঃ,"— অর্থাৎ মঘাকে পিতৃ নক্ষত্র বলা হয়, মঘার দেশকে পিতৃলোক বলা হয়। চন্দ্র যখন পিতৃলোকে গিয়াছিলেন, তখন কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। নীলকণ্ঠ ভারত সাবিত্রি নামক গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

"হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশীম্।
প্রবৃত্তং ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে॥"

অর্থাৎ হেমন্তকালের প্রথম মাসে শুক্ল পক্ষের ত্রয়োদশীতে এবং যে নক্ষত্রের দেবতা হইতেছেন যম, সেই নক্ষত্রের ভোগকালে মহাভারতের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন যে, "প্রথমে মার্গশীর্ষে। অত্র ত্রয়োদশী শব্দেন তদ্যুক্তা চতুর্দ্দশ্যেব গ্রাহ্যা,—প্রথম মাস অর্থে মার্গশীর্ষকে এবং ত্রয়োদশী শব্দ দ্বারা তদ্যুক্ত চতুর্দ্দশীকে বুঝাইতেছে। পুনশ্চ,—

"অর্জ্জুনেন হতো ভীষ্মো মাঘ মাস্যাসিতাষ্টমি।
ত্রয়োদশ্যাং তু মধ্যাহ্নে ভারদ্বাজো নিপাতিতঃ॥"

মাঘ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমীতে ভীষ্ম অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হত হন এবং ত্রয়োদশীর মধ্যাহ্নে দ্রোণ নিহত হন। কিন্তু মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যুদ্ধের দশম দিনে ভীষ্ম এবং পঞ্চদশ দিনে দ্রোণ পতিত হন। সুতরাং ১৩র পরিবর্ত্তে ১৪তে, ১০ ও ১৫ যোগ করিলে যথাক্রমে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী

the months had been named originally on the rough principle of the full moon taking place in these asterisms, before deeper calculations and observations showed that the full moon day really began sometimes in other constellations also besides those which had been selected to name the months—The Theosophist, March, 1908.

এবং ত্রয়োদশী পাওয়া যায়। "অত্র পৌষেঽপি মাঘশব্দো মকরায়ণাত্তি প্রায়েণ তদানীং তৎ সম্ভবৎ অসিতাষ্টমীতি চ্ছেদঃ।" এখানে মাঘ শব্দ দ্বারা পৌষকে বুঝাইতেছে। কারণ এই সময়ে অয়ণ অর্থাৎ হৈমন্তিক ক্রান্তিপাত মকরে হইত। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে। শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীর দিন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, এইরূপ ধরিলে ভীষ্ম এবং দ্রোণের পতন যথাক্রমে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী এবং দ্বাদশীর দিন ঘটিয়া থাকে। পুনশ্চ দুর্য্যোধনের মৃত্যু অমাবস্যায় হইয়াছে বলিয়া মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে। নীলকণ্ঠ বলেন যে, এখানে অমাবস্যা অর্থে তাহার পরদিন প্রতিপদকেই বুঝিতে হইবে।

যে নক্ষত্রের অধিপতি যম, সেই নক্ষত্র মৃগশিরাকেই বুঝাইতেছে, ভরণীকে নহে। কারণ মৃগশিরায় দুইটী দেবতা, প্রথম অর্দ্ধের দেবতা শুক্র এবং দ্বিতীয় অর্দ্ধের দেবতা বুধ। যুদ্ধারম্ভের ১৮শ দিবস পরে বলরাম তীর্থযাত্রা হইতে আসিয়া বলিয়াছিলেন যে,—

"চত্বারিংশদহান্যদ্য দ্বে চ মে নিঃসৃতস্য বৈ।
পুষ্যেণ সম্প্রয়াতোঽস্মি শ্রাবণে পুনরাগত॥"

অর্থাৎ, আজ ৪২ দিন গত হইল আমি বহির্গত হইয়াছি; পুষ্যানক্ষত্রে আমি বাহির হইয়াছি এবং শ্রবণায় ফিরিয়া আসিয়াছি। যুদ্ধের শেষেই বলরাম প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং শ্রবণা নক্ষত্রে যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল, এবং ১৮ দিন পূর্ব্বে ঐ যুদ্ধ মৃগশিরা নক্ষত্রে আরম্ভ হইয়াছিল; ভরণীতে হয় নাই, কারণ ১৮ দিনে কখন তিনটী নক্ষত্রের অন্তর্দ্ধান হইতে পারে না। চন্দ্র যখন কৃত্তিকা নক্ষত্রে থাকে, তখনই কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার পরের চতুর্দ্দশী কেবল মৃগশিরাতেই সম্ভব হইয়া থাকে। এইজন্য নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে, বলদেবের বাক্যের দ্বারা মঘায় যুদ্ধারম্ভ নিরস্ত হইতেছে। এইজন্য তিনি বলেন যে "মঘাপদেন তৎসহচরাঃ পিতরো লক্ষ্যন্তে।"

পুনশ্চ উল্লিখিত হইয়াছে যে, দ্বাদশীর দিন রাত্রি যুদ্ধ কালে "ত্রিভাগ মাত্র শেষায়াং রাত্রৌ যুদ্ধমবর্ত্তত,"—অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের তিন মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে চন্দ্রোদয় হইয়াছিল। এবং মৃত্যুর দিন ভীষ্ম বলিয়াছিলেন যে,—"অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ানস্যাদ্য মে গতা"—৪৮ দিন আমি শরশয্যায় শুইয়া আছি। পৌষ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী হইতে মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত ৪৮ দিন হইয়া থাকে।

কৃষ্ণ কার্ত্তিকের শুক্ল দ্বাদশীতে রেবতী নক্ষত্রে হস্তিনাপুরে গিয়াছিলেন। তৎপরে মার্গশীষের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী হইতে পৌষের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ পর্য্যন্ত, ৪২ দিন পাওয়া যায়। যুদ্ধ মার্গশীর্ষের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীর দিন আরম্ভ হইয়াছিল। নীলকণ্ঠ এই প্রকার গণনানুসারে দেখাইয়াছেন যে, পৌষের শুক্ল প্রতিপদের দিন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল।

নীলকণ্ঠের মতানুসারে ভীষ্ম মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে পঞ্চমীতে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত রমাপ্রসাদ স্থির করিয়াছিলেন যে,সেই সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত বাসন্তিক ক্রান্তিপাত ৭০°—২৩,৫ মিনিট সরিয়া আসিয়াছে। ৫০৪৬ বৎসরে এইরূপ ঘটিয়াছে। সুতরাং ৫০৪৬ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্মের ৩১৩৭ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারতের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। ইহার ১৩ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাণ্ডবেরা বনবাসে কাটাইয়া-

ছিলেন। এবং ইহারও তিন বৎসর পূর্ব্বে অভিমন্যুর জন্ম হইয়াছিল, কারণ তাহা না হইলে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তাহার বয়স কখন ১৬ বৎসর হইতে পারিত না। সুতরাং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ এখন হইতে ৫০৪৬+১৩=৫০৫৯ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ৬২৩ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ, এখন হইতে ২৫২৯ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বুদ্ধদেবের জন্মের ২৫২৭ (৫০৫৯—২৫৩২) বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ হইয়াছিল।

পণ্ডিত রমাপ্রসাদ বরাহমিহির হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে,শকে ২৫২৫ যোগ করিলে যুধিষ্ঠিরের অব্দ পাওয়া যায়। এখানে শক মানে তিনি শকরাজ বুদ্ধদেবের জন্মসময়কে বুঝিয়াছেন। বুদ্ধদেব ২৫৩২ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা ৫০৫৮ (২৫২৬+৩৫৩২) বৎসর পাইয়া থাকি। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত গণনার সহিত ইহা মিলিতেছে।*

ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণের মৃত্যুর পর কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। মহাভারতের মৌষলপর্ব্বে,(১—১৩) উল্লিখিত হইয়াছে যে,কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে কৃষ্ণের মৃত্যু হয়। সুতরাং এই ঘটনার ৪৯ বৎসর পূর্ব্বে (৩৬+১৩) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ হইয়াছিল। এখন (১৯০৯) কলির বয়স ৫০০৯। সুতরাং ৫০৫৮ (৫০০৯+৪৯) বৎ-বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ হয় এবং সেই সময় হইতে যুধিষ্ঠিরাব্দ প্রচলিত হইয়াছে।

ইহার বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ মহাভারত হইতে দেওয়া যাইতে পারে, পণ্ডিত রমাপ্রসাদ তাহার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

গীতার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা ইহা অবগত হইলাম যে, অন্ততঃ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ কুরুদিগের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা ব্যাসদেব কর্ত্তৃক গীতাকারে রচিত হইয়া মহাভারতে নিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীআশুতোষ দেব।

সর্ব্বজাতির সমুত্থান।

আজি কালি কায়স্থজাতি উপবীত গ্রহণ ও ক্ষত্রিয়বর্ণ সমুন্নয়নের চেষ্টা করিতেছেন। এজন্য অনেক ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চতর জাতির ঈর্ষা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এ বিদ্বেষ কেন? জগৎ ক্রমোন্নতির একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল, কালে যাহা ক্ষুদ্র পাদপ ছিল, আজি তাহা বৃহৎ তরুতে পরিণত হইয়াছে। কল্য যে বালক স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে, ৫ বৎসর কি ১০ বৎসর পরে সে উচ্চতম শ্রেণীতে উত্থান করিবে। সূর্য্য প্রাতে নিম্ন গগনে বিরাজ করে, মধ্যাহ্নে উন্নত শীর্ষে উন্নীত হয়। সকলেরই উত্থান পতন আছে। আর হিন্দু জাতিই কি কেবল এক

* It may be mentioned that at one time it appeared to be that the saka of Varahamihir meant the era of Salibahan. This however is new detected to be a mistake.—The Theosophist, May 1908.

ভাবে থাকিবে? শূদ্র কি চিরদিন শূদ্র থাকিবে, এবং চিরকাল হিন্দুজাতি পরস্পর ঈর্ষা বিদ্বেষে মত্ত হইয়া থাকিবে? ইহা প্রকৃতির বিরুদ্ধ।

জাপানের ইতিহাসে কথিত আছে যে, তাহার মন্ত্রীরাজ, সামন্ত রাজগণ, সেমুরিয়া বা মহাপুরুষগণ, দেশের উন্নতির জন্য একেবারে তাহাদের উচ্চ লাভের পদ পরিত্যাগ করিয়া সম্রাটের অধীন হইলেন। আমাদের কি এমন সময় আইসে নাই যে, যখন উচ্চ জাতির মহাত্মাগণ বলিবে যে, আমরা জাতীয় উন্নতির জন্য জাত্যাভিমান পরিত্যাগ করিলাম। উচ্চবর্ণস্থ ভ্রাতৃগণ আসুন, আজি ভারতের এই চিরবিচ্ছেদানল নিবারণ করিয়া সকলের সমকক্ষ হই। প্রকৃত মহত্ত্ব জাতিতে নহে, গুণ ও জ্ঞানবলে। আজি আসুন, এই জ্ঞানবলেরই যাহাতে মহত্ত্ব ঘোষিত হয়, তাহাই করা যাক্। চিরদিন জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদ ও বিরোধ সমাজের সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

কায়স্থ জাতির সমুত্থান বিষয়ে আমি কিছু বলিতে চাই। কায়স্থের সমুত্থান ও বৈদ্যের সমুত্থান আমি একই মনে করি। ফলতঃ উভয় জাতির ভিতর আমি অন্তর্নিহিত কোন পার্থক্য দেখিতে পাই না। কিন্তু কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইতে চান কেন? আমার বিশ্বাস, অন্য দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ যোদ্ধৃ ব্যবসা ভিন্ন অন্য বিষয়ে কায়স্থ হইতে সমুন্নত নহেন। ক্ষত্রিয় সমান ত উঁহারা বর্ত্তমানেই আছেন। এ আর উন্নতি কি হইল? গলে সূত্র ঝুলান, ১২ দিন অশৌচ পালন, ইহাতে উন্নতি হয় না। চণ্ডাল, চর্ম্মকার ও হাড়ী, ইহারা যে ১১ দিন অশৌচ প্রতিপালন করে, ইহারা কি কায়স্থদের অপেক্ষা উচ্চ? কখনই নহে। সুতরাং এই অবাস্তবিক প্রভেদ উন্নতির লক্ষণ নহে। আমি বলি, যদি উত্থান করিতে হয়, বেদ বেদান্ত পাঠ করুন, নিজে ঈশ্বরের পূজার অধিকারী হউন, নারীগণকে ব্রহ্মবাদিনী করুন, ব্রাহ্মণের গায়ত্রী গ্রহণ করুন, এবং ব্রাহ্মণরূপেই পরিণত হউন। কোন্ ব্রাহ্মণ রাজনারায়ণ বসু, কি কান্তিচন্দ্র মিত্র হইতে উন্নত? ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলে, জ্ঞানবলেই বা কোন ব্রাহ্মণ সত্যপ্রসন্ন, রাজেন্দ্রলাল, দ্বারকানাথ, রমেশচন্দ্র, সারদাচরণ হইতে উন্নত, বা প্রতিভা বলে মাইকেল, হীরেন্দ্র দত্ত প্রভৃতি হইতে সমুন্নত? তবে কেন ইহারা ব্রাহ্মণত্বের দাবি না করেন?

আমার অনেক বৈদ্য-বন্ধু আমাকে নিন্দা করেন যে, আমি অম্বষ্ঠ সম্মিলনীর অনুষ্ঠিত বৈদ্যের বৈশ্যত্বে কেন যোগ দেই না। আমি বলি বৈশ্যত্ব কেন? ব্রাহ্মণত্ব লইব না কেন? মহাত্মা গঙ্গাধরও কি সে কথা বলেন নাই? কোন্ দেশের বৈশ্য জাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতায় বৈদ্যজাতির সমতুল্য? বৈদ্যজাতি প্রতিভা বলে চিকিৎসার আয়ুর্ব্বেদীয় দিকে একচ্ছত্র সম্রাট, এবং ইংরাজ আগমনে ভারতের সকল ব্যবসায় প্রতিযোগীতায় হীন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আজিও সিবিলসার্জ্জনের হাতের ফেরতা রোগী বিজয়রত্ন, দ্বারকানাথ প্রভৃতি আরোগ্য করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের পদধূলি লইতে কোন্ ব্রাহ্মণ অগৌরব মনে করেন? বোপদেব, মাধব কর, বিজয় রক্ষিত প্রভৃতিকে কে না ঋষি বলিয়া মনে করেন? রায় বাহাদুর হইবার পূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথকে কেনা ব্রাহ্মণ তুল্য ভক্তি করিত? সুতরাং আমরা বৈশ্যত্ব লাভের প্রয়াসী হইব কেন? ব্রাহ্মণত্বই আমাদের লক্ষ্য, যদি উন্নতি লাভ

করিতে চাও, বৈদ্য ব্রাহ্মণ হও, বৈশ্যত্বে পতিত হইও না। নবজীবনের সমুত্থানে সকলে উত্থিত হও। অতুল প্রভাব-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ জাতির উন্নত জীবন গ্রহণ করিতে কি সমর্থ হইবে না? সকলই আমাদের সাধ্য, কেবল এই জ্ঞান ধর্ম্ম লাভে আমরা সমর্থ হইব না? হিন্দুজাতির অন্যান্য বর্ণকেও আমি অনুরোধ করি, যখন "ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ," তখন কেন তোমরা ব্রাহ্মণত্ব প্রয়াসী না হইয়া অন্যদিকে উত্থান করিতে চাও? ব্রহ্ম জানাতি ইতি ব্রাহ্মণঃ, ব্রহ্মই ত আমাদের সকলের জ্ঞাতব্য, তিনি আমাদের জীবনের লক্ষ্য, আশার সফলতা, চিন্তার আদর্শ, সাধনায় সিদ্ধি, মুক্তির সোপান, এই ব্রহ্মই আমাদের লক্ষ্য। যদি তাহা হয়, তবে ব্রাহ্মণ হওয়াই সকল হিন্দু জাতির জীবনের লক্ষ্য। ক্ষত্রিয় হইতে চাও কেন? কলিতে হিন্দুজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব লোপ হইয়াছে, ভারতে কলির ক্ষত্রিয় ইংরাজ, বঙ্গদেশে ত ক্ষত্রিয়ই নাই, সুতরাং ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় বল কেন? বল, আমরা ব্রাহ্মণ হইব। এই ব্রাহ্মণ জাতির উন্নতিই ভারতের উন্নতি, বেদ বেদান্ত উপনিষৎ গীতা এই ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি-স্তম্ভ। ১২০৩ সালে ক্ষত্রিয়ের বিলোপ হইয়াছে। পৃথ্বীরাজের সময়ে ক্ষত্রিয়ের সমাধি হইয়াছে, আর তাহার পুনর্জ্জন্মের কি প্রয়োজন? আজি ইংরাজও বলিতেছেন, তোমাদের ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন নাই। বরং যদি তোমরা ক্ষত্রিয় হইতে চাও, তবে ১৮১৮ সালের ৩ আইন তোমাদের জন্য রহিয়াছে। বাস্তবিক আমাদের এক্ষণে ক্ষত্রিয়ত্বের আবশ্যকও নাই। রাজ্য রক্ষিত হইতেছে, অন্য দেশীয় অন্য জাতি আমাদের রাজারূপে সেবকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

সমগ্র হিন্দুজাতি আজি উত্থান কর, উত্থিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। এক দিন ব্রাহ্মণ জাতি ধরণীর গৌরব ছিলেন, আজি সেই গৌরব পুনরানয়ন কর। জ্ঞান ধর্ম্মের জ্যোতিই ভারতের নিয়তি, এই জ্ঞান ধর্ম্মই আমাদের লক্ষ্য। উঠ, ভাই গাত্রোত্থান কর, বীর বীর্য্য উদ্ধার কর। সম্প্রদায়-ভেদ ভাঙ্গিয়া দেও। শাস্ত্র তোমাদের স্বপক্ষে, বলিতেছে, নবিশেষোস্তি বর্ণানাং। ধর্ম্ম তোমাদের স্বপক্ষে, বলিতেছে, "দুঃখী ধনী মূর্খ জ্ঞানী সকলে সমান।" তিনিই সকলের লক্ষ্য, তিনি "প্রেয়োপুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োমন্যাৎ সর্ব্বস্বাৎ।" তাহা অপেক্ষা আমাদের কি প্রিয়? সেই ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রাহ্মণ হও, আর সকল পরে পাইবে। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও বলিতেছেন, অগ্রে স্বর্গ রাজ্য অন্বেষণ কর, আর সকলই তোমরা প্রাপ্ত হইবে। অতএব আর নীচ বংশীয়েরা মধ্য পথ লইও না, সকলেই ব্রাহ্মণ হও। ব্রাহ্মণগণকেও এই অনুরোধ, জগতের এই প্রধান লক্ষ্য, সর্ব্ব জাতির সমুন্নতি, Greatest good to the greatest number, এই মহান কার্য্যে সহায় হউন।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত।

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম।

শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নিত্য নির্ব্বিকার; সর্ব্ব প্রকার ভেদ রহিত ও অবয়ব রহিত; অনন্ত, এক ও অদ্বিতীয়। এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিলে আর ব্রহ্মকে সগুণ বলা যাইতে পারে না! ব্রহ্মের সগুণত্ব স্বীকার করিলে এই সমুদয় দোষ হইতে পারে। প্রথমতঃ ব্রহ্মের অবয়ব। অংশ ও স্বগত ভেদ স্বীকার করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মের বিকার ও বিনাশ স্বীকার করিতে হয়। সমুদয় গুলিই পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং ব্রহ্মের সগুণই স্বীকার করিলে ব্রহ্মের নিত্যতার ব্যাঘাত পড়ে। গীতাকার এক স্থলে বলিয়াছেন যে, পরমাত্মা অব্যয় কারণ,তিনি অনাদি ও নির্গুণ(১৩।৩২) ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন "যাহার আদি আছে,তাহারই বিনাশ আছে। কিন্তু পরমাত্মা অনাদি, সুতরাং তাঁহার অবয়ব নাই। তাঁহার অবয়ব নাই, সুতরাং তাঁহার বিনাশ নাই। যাহা নির্গুণ, তাহার বিনাশ নাই। কিন্তু যাহা সগুণ,তাহার গুণের বিনাশ হইয়া থাকে। সুতরাং সগুণ বস্তু বিনাশশীল। কিন্তু পরমাত্মা নির্গুণ, সুতরাং তিনি অবিনাশী (সগুণোহি গুণব্যয়াৎ ব্যেতি; অয়ম্ তু নির্গুণত্বাৎ চ ন ব্যেতি ইতি পরমাত্মা অয়ম্ অব্যয়ঃ)

"নেতি, নেতি।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, আত্মাকে সগুণ বলা যাইতে পারে না। যাহার কোন প্রকার গুণ নাই, তাহাকে বর্ণনা করা অসম্ভব। এই জন্য বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম 'বাক্য ও মনের অগোচর।' মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্যে শঙ্কর এ বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন "শব্দ দ্বারা তাঁহাকে প্রকাশ করা সম্ভব নহে, এই জন্য তুরীয়কে সর্ব্ব বিশেষণ বিহীন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে কি তিনি শূন্য? না, তিনি শূন্য নহেন। মিথ্যা কল্পনারও একটা কারণ না থাকিলে চলে না। শুক্তিকা, রজ্জু, স্থাণু উষরাদি না থাকিলে রজত, সর্প, পুরুষ ও মৃগতৃষ্ণাদির কল্পনা হইতে পারে না। (কেহ কেহ এখানে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন—) ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে তুরীয় ব্রহ্ম প্রাণাদি সমুদয় কল্পনার আস্পদ হইলেন। সুতরাং বলা উচিত, ঘটাদি যেমন জলাদির আধার, ব্রহ্মও তেমনি সমুদয় বস্তুর আধার। সুতরাং ব্রহ্ম 'শব্দ বাচ্য' শব্দ দ্বারা তাঁহাকে প্রকাশ করা যাইতে পারে। সুতরাং তিনি নিরুপাধি, একথা বলা উচিত নহে। এ প্রকার আপত্তি করা যুক্তিযুক্ত নহে। শুক্তিকাতে যেমন রজতাদির অভাব, ব্রহ্মেও তেমনি প্রাণাদি কল্পনা—অস্তিত্ব বিহীন। 'সৎ' এবং অসতের কোন প্রকার সম্বন্ধ, নাই (নহি সদসতোঃ সম্বন্ধঃ); ইহা অবস্তু, সুতরাং কোন প্রকার বাক্য দ্বারা ইহাকে প্রকাশ করা যাইতে পারে না। গবাদি যেমন অন্য প্রকার প্রমাণের বিষয়ীভূত, আত্মা স্বরূপতঃ তদ্রূপ নহে, অন্য প্রমাণের বিষয়ীভূত নহেন, কারণ এই আত্মা নিরুপাধি। আত্মা অদ্বিতীয়; ইহাতে সামান্য বা বিশেষ কোন প্রকার ভাব নাই, সুতরাং আত্মা গবাদির ন্যায় নির্দ্দিষ্ট জাতিভুক্ত নহেন। পাচকাদির ন্যায় আত্মা ক্রিয়াশীল,

ইহাও বলা যায় না, কারণ এই আত্মা অবিক্রিয়। নীলাদির ন্যায় আত্মাতে কোন প্রকার গুণ আছে, তাহাও বলা যায় না, কারণ আত্মা নির্গুণ। সুতরাং কোন প্রকার অভিধান দ্বারা আত্মাকে নির্দ্দেশ করা যায় না।"(মাণ্ডুক্য ভাঃ ৭)।

ব্রহ্মকে কেন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না—গীতা-ভাষ্যেও তাহা বর্ণিত হইয়াছে। "শব্দ মাত্রই জাতি, ক্রিয়া, গুণ ও সম্বন্ধ প্রকাশক। জাতি—যেমন গো বা অশ্ব; ক্রিয়া—যেমন পাঠ করা বা রন্ধন করা; গুণ যেমন শুক্ল বা কৃষ্ণ; সম্বন্ধ যেমন ধনবান বা গোমান। ব্রহ্ম কোন জাতিভুক্ত নহেন, সুতরাং তিনি সদাদি শব্দবাচ্য নহেন। ব্রহ্ম গুণবান নহেন যে তাঁহাকে গুণদ্বারা ব্যক্ত করা যাইতে পারে, কারণ তিনি নির্গুণ। তিনি ক্রিয়া শব্দবাচ্যও নহেন, কারণ তিনি নিষ্ক্রিয়—শ্রুতিতে বলা হইয়াছে তিনি নিষ্কল, নিষ্ক্রিয় ও শান্ত। ইঁহার সহিত কোন বস্তুর সম্বন্ধও নাই, কারণ ইনি এক ও অদ্বিতীয় এবং ইনি আত্মা। সুতরাং ইহা বলাই যুক্তিযুক্ত যে, কোন শব্দ দ্বারাই ইঁহাকে বর্ণনা করা যায় না।"

গীঃ ভাঃ ১৩।১৩।

উপনিষদে বলা হইয়াছে 'ইহা নয়' 'ইহা নয়,—'নেতি' 'নেতি'—এই ভাবেই ব্রহ্মকে জানিতে হইবে (বৃহঃ ২।৩।৬ ; ৪।৪।২২) ইত্যাদি।

শঙ্কর অসংখ্য স্থলে এই 'নেতি—নেতি' উদ্ধৃত করিয়া নিজমত সমর্থন করিয়াছেন।

ব্রহ্ম বস্তুতঃ নির্গুণ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম প্রকৃত পক্ষে নির্গুণ। উপাধিবশতই ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়া ভ্রম হয়। 'উপাধি' শব্দের অর্থ কি, তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝান হইয়াছে। স্ফটিকের নিকট জবাকুসুম থাকিলে স্ফটিককে যেমন রক্তবর্ণ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু স্ফটিক কখন রক্তবর্ণ হয় না, তেমনি, অবিদ্যারূপ উপাধি বশতই ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম কখন সগুণ হয়েন না। আমরা শঙ্কর বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিলাম, শঙ্করের ভাষ্যদ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইবে।

ব্রহ্ম মীমাংসা।

(১)

বেদান্ত-ভাষ্যের একস্থলে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

শ্রুতিতে ব্রহ্মকে উভয় লিঙ্গই (অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই) বলা হইয়াছে। 'তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস' ইত্যাদি শ্রুতি সবিশেষ ব্রহ্মবোধক। "তিনি স্থূল নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন" ইত্যাদি শ্রুতি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবোধক। এই সমুদয় শ্রুতিদ্বারা কি প্রতিপন্ন হইল? তিনি কি উভয়লিঙ্গ (অর্থাৎ তিনি কি সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উভয়ই)? না, তিনি একতর লিঙ্গ? আর যদি একতর লিঙ্গ হন, তবে তিনি কোন্‌টী—সবিশেষ না নির্ব্বিশেষ? যখন উভয় লিঙ্গসূচক শ্রুতি রহিয়াছে, তখন হয়ত মনে হইতে পারে, তিনি উভয় লিঙ্গই। কিন্তু আমরা বলি, বস্তুতঃ ব্রহ্মের উভয় লিঙ্গত্ব স্বীকার করা যায় না। (ন তাবৎ স্বতঃ এব পরস্য ব্রহ্মণঃ উভয় লিঙ্গত্বম্ উপপদ্যতে) একটী বস্তু আছে, তাহার বিশেষ বিশেষ রূপও আছে। এই বস্তু স্বতঃ আবার ইহার বিপরীত হইবে, অর্থাৎ রূপাদি বিহীনও হইবে, ইহা আত্মবিরোধী কথা (ন হি একং বস্তু স্বতএব রূপাদি বিশেষো পেতং তদ্বিপরীতঞ্চেতি অভ্যুপগন্তুং শক্যং বিরোধাৎ)। যদি

বল স্থানতঃ পৃথিব্যাদি উপাধি যোগে এরূপ সম্ভব হইতে পারে। আমরা বলি, না, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। উপাধিযোগে একবস্তু অন্যরূপ হইতে পারে না। স্বচ্ছস্বভাব স্ফটিক কখন অলক্তাদি উপাধি যোগে অস্বচ্ছ হয় না। তবে যে অস্বচ্ছ বলিয়া মনে হয়, তাহা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। উপাধিসমূহ অবিদ্যামূলক। এখন যদি বল ব্রহ্ম অন্যতর লিঙ্গ, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্ম সমস্ত বিশেষ রহিত, নির্ব্বিকল্পক অর্থাৎ নির্গুণ, তিনি ইহার বিপরীত নহেন। (অতশ্চ অন্যতর লিঙ্গ পরিগ্রহেঽপি সমস্ত বিশেষ রহিতং নির্ব্বিকল্পকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং, ন তদ্বিপরীতম্)। বেঃ ভাঃ ৩।২।১১।

(২)

অপর একস্থলে শঙ্কর বলিতেছেন "ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্প একলিঙ্গ; ব্রহ্ম ইহার বিপরীত লিঙ্গও (অর্থাৎ সগুণ) নহেন এবং উভয় লিঙ্গও নহেন।" ৩।২।২১।

(৩)

"এই প্রকার অবিদ্যাত্মক উপাধি ভেদবশতঃই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব। কিন্তু পরমার্থতঃ ব্রহ্ম এ প্রকার নহেন (তদেবম্ অবিদ্যাত্মকোপাধি পরিচ্ছেদ্যাপেক্ষ্যমেব ঈশ্বরস্য ঈশ্বরত্বম্, সর্ব্বজ্ঞত্বম্ সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চ ; ন পরমার্থতঃ)বেঃ ভাঃ ২।১।১৪।

(৪)

"শ্রুতিতে সৃষ্টিসূচক ও ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতাসূচক অনেক কথা আছে। এই যে 'সৃষ্টি শ্রুতি' ইহা পরমার্থ বিষয়িনী নহে। ইহা অবিদ্যাজনিত নাম-রূপ ব্যবহার যোগ্য কল্পনা। ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপাদন করাই যে ইহার উদ্দেশ্য, ইহা কখন বিস্মৃত হইও না" (না চেয়ং পরমার্থ বিষয়াঃ সৃষ্টিশ্রুতিঃ, অবিদ্যা কল্পিত নামরূপ ব্যবহার গোচরত্বাৎ ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপাদ্য পরত্বাৎ চ ইতি এতদপি নৈব প্রস্মর্তব্যম্) ২।১।৩৩।

যাঁহারা বলিতে চাহেন যে, ব্রহ্ম স্রষ্টা, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে, "সৃষ্টি-শ্রুতি" সৃষ্টিপ্রতিপাদক নহে; সাবধান এ কথাটা কখনই ভুলিও না—এতদপি নৈব প্রস্মর্ত্তব্যম্।"

(৫)

"তবে কি ব্রহ্ম দুই প্রকার? হাঁ পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম, এই দুই প্রকার। কারণ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, হে সত্যকাম! এই যে 'ওঁ' ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, পরব্রহ্মই বা কি এবং অপর ব্রহ্মই বা কি। ইহার উত্তর এই—যে স্থলে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মে অবিদ্যাজনিত নামরূপাদি বিশেষণ নাই, যেস্থলে 'তিনি অস্থূল' এই প্রকার নিষেধমুখে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করা হইয়াছে—সেই স্থলেই পরব্রহ্মের কথা। আর যেস্থলে উপাসনার জন্য ব্রহ্মে নামরূপাদি বিশেষণ অর্পণ করা হইয়াছে,—যেস্থলে বলা হইয়াছে 'তিনি মনোময় প্রাণ-শরীর ভাবরূপ ইত্যাদি, বুঝিতে হইবে সেইস্থলেই অপর ব্রহ্মের কথা। যদি বল এ প্রকার স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বসূচক শ্রুতির বিরোধী কথা বলা হয়, তাহার উত্তরে আমরা বলিব 'না ইহাতে কোন বিরোধ হয় না, কারণ অবিদ্যাজনিত নামরূপাদি উপাধি বশতঃই এই প্রকার হইয়াছে। এই প্রকার স্বীকার করিলেই সমুদয় বিরোধ পরিহৃত হয়।' বেঃ ভাঃ ৪।৩।১৪

শঙ্কর বলিতেছেন, ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ, উপাধিবশতঃই মনে হয়, তিনি সগুণ।

(৬)

"ব্রহ্মে সর্ব্ব প্রকার বিশেষ প্রতিষেধ করা

হইয়াছে। তিনি নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন…তিনি 'নেতি' 'নেতি' 'ইহা নহেন' 'ইহা নহেন' ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতির বলে এবং যুক্তি দ্বারাও বলা হইয়াছে, পরমাত্মাতে দেশ কালাদি বিশেষ স্বীকার করা যায় না। এস্থলে পূর্ব্ব পক্ষে এইরূপ বলেন—"উপনিষদেই বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম সৃষ্টি,স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু, সুতরাং ব্রহ্মের অনেক শক্তি আছে।" ইহার উত্তর এই :—'না, ইহা বলিতে পার না। কারণ যে সমুদয় শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মে কোন প্রকার বিশেষ নাই, সেই সমুদয় 'বিশেষ নিরাকরণ' শ্রুতি 'অনন্যার্থ' (অর্থাৎ ইহা স্বার্থে,—নিজের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহার অন্য কোন অর্থ নাই, যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই ইহার একমাত্র অর্থ)। যদি আপত্তি কর, 'জগতের উৎপত্ত্যাদি শ্রুতিকে 'অনন্যার্থ' বলনা কেন?'—ইহার উত্তরে বলিব 'না, তাহা বলিতে পারনা, কারণ এই সমুদয় 'সৃষ্ট্যাদি শ্রুতি' একত্ব প্রতিপাদক ভিন্ন আর কিছুই নহে (জগদুৎপত্তিস্থিতি—প্রলয় হেতুত্ব শ্রুতেঃ অনেক শক্তিত্বং ব্রাহ্মণঃ ইতি চেৎ ন। বিশেষ নিরাকরণ শ্রুতীণাম্ অনন্যার্থত্বাৎ। উৎপত্ত্যাদি শ্রুতীনামপি সমানম্ অনন্যার্থত্বম্ ইতি চেৎ। ন। তাসাম্ একত্ব প্রতিপ্রাদন পরত্বাৎ)। সুতরাং ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই উৎপত্ত্যাদি মূলক শ্রুতি। এই জন্য ব্রহ্মে অনেক শক্তি আছে,ইহা স্বীকার করা যায় না (এবম্ উৎপত্ত্যাদি শ্রুতীনাম্ ঐকাত্ম অবগম পরত্বাৎ ন অনেক শক্তি যোগঃ ব্রহ্মণঃ) বেঃ ভাঃ ৪।৩।১৪।

(৭)

'অনেক লোকে নেত্রের তিমির দোষে এক চন্দ্রকে বহু চন্দ্র বলিয়া মনে করে, কিন্তু চন্দ্রমা কখন অনেক হয় না। তেমনি, নাম রূপ মূলক ভেদ অবিদ্যা মূলক। ইহা ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত, এই উভয়াত্মক। ইহা বস্তু কি অবস্তু, তাহা কিছুই বলা যায় না। এই অনির্ব্বচনীয় ভেদ বশতই ব্রহ্মকে সর্ব্ব ব্যবহারাস্পদ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু পারমার্থিক ভাবে তিনি সর্ব্ব ব্যবহারের অতীত ও অপরিণামী। পরিণাম শ্রুতি সমূহ পরিণাম প্রতিপাদনার্থ অভিহিত হয় নাই (অর্থাৎ অনেক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন, কিন্তু এ সমুদয় শ্রুতির অর্থ ইহা নয় যে, সত্য সত্যই ব্রহ্ম জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন)। সর্ব্ব ব্যবহার বিহীন ব্রহ্মাত্ম ভাব প্রতিপাদন করাই এই সমুদয় শ্রুতির উদ্দেশ্য। (ন চ ইয়ম্ পরিণাম শ্রুতিঃ পরিণাম প্রতিপাদনার্থাঃ, সর্ব্ব ব্যবহারহীন—ব্রহ্মাত্ম ভাব—প্রতিপাদনার্থাঃ তু এষা) বেঃ ভাঃ ২।১।১৭।

(৮)

"ব্রহ্মে কোন প্রকার বিশেষ নাই অথচ বলা হয়, তিনি সর্ব্বশক্তিমান। ইহার অর্থ কি? এই ভেদ উপন্যাস অবিদ্যা-জনিত কল্পনা বই আর কিছুই নহে অর্থাৎ অবিদ্যা বশতই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে সর্ব্ব শক্তিমান বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।" (প্রতিষিদ্ধ সর্ব্ব বিশেষস্যাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তিযোগঃ সম্ভবতি ইতি,—একদপি অবিদ্যাকল্পিত রূপ ভেদোপন্যাসেন উক্তমেব) বেঃ ভাঃ ২।১।৩১।

(৯)

"পুরুষ কলাবিহীন; কিন্তু ষোড়শ কলারূপ উপাধির জন্যই অবিদ্যাবশতঃ নিষ্কল পুরুষকে কলাযুক্ত বলিয়া ভ্রম হয়। অবিদ্যা বশতঃ পুরুষে যে উপাধি কলা আরোপ করা

হয়, বিদ্যা দ্বারা তাহা অপনয়ন করিয়া পুরুষকে নির্ব্বিশেষ রূপে দেখাইতে হইবে। এই জন্যই বলা হইয়াছে, যে এই পুরুষ কলাদির উৎপীড়ন কারণ। এই অদ্বিতীয় শুদ্ধতত্ত্বে যদি প্রাণাদি আরোপ করা না যায়, তাহা হইলে ইহার বিষয়ে কোন কথাই বলা যায় না। এই জন্যই ইহাতে কলা সমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় আরোপ করা হইয়াছে" প্রঃ ভাঃ ৬।২।

শঙ্কর বলিতেছেন—ব্রহ্মে কোন বিশেষণ না দিলেও কোন বিষয়ের বর্ণনা হইতে পারে না। এখন উপায় কি? শঙ্কর বলিতেছেন—প্রথমে বল 'ব্রহ্ম কলাযুক্ত'—তাহাব পর বল 'ব্রহ্ম কলাবিহীন'।

(১০)

গীতাকার শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ হইতে ঈশ্বরের সগুণত্ব সূচক এই মন্ত্রটী উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

'সর্ব্বত্র সেই ব্রহ্মের হস্ত পদ, সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু, শির, ও মুখ এবং সর্ব্বত্র তাঁহার কর্ণ। তিনি সমুদয় ব্যাপিয়া রহিয়াছেন" গীঃ ১৩।১৩।

উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়; ব্রহ্ম সগুণ কিন্তু শঙ্কর ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন ঃ—'সেই জ্ঞেয় বস্তুর অর্থাৎ পরমাত্মার সর্ব্বত্র হস্ত পদ'—এখানে সমুদয় প্রাণীর ইন্দ্রিয়াদি উপাধি দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞের অস্তিত্ব ভাবনা করা হইয়াছে। ক্ষেত্ররূপ উপাধির জন্যই ইহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। এই ক্ষেত্রের পানি পাদাদি অনেক প্রকার ভেদ আছে। কিন্তু ক্ষেত্রোপাদি-জনিত ক্ষেত্রজ্ঞের যে ভিন্নতা, তাহা মিথ্যা। ইহা অপনয়ন করিয়াই ক্ষেত্রজ্ঞকে জানিতে হইবে। এইজন্যই বলা হইয়াছে, তিনি 'সৎ'ও নহেন, 'অসৎ'ও নহেন। 'সর্ব্বত্র তাহার হস্ত' 'সর্ব্বত্র তাঁহার পদ' ইত্যাদি উপাধি মূলক মিথ্যা রূপকে যে জ্ঞেয়ের ধর্ম্ম বলা হইয়াছে, ইহা কেবল জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব প্রকাশক। সম্প্রদায়-বিদ্‌গণও বলেন যে "যিনি প্রপঞ্চবিহীন" তাঁহাকে অধ্যারোপ ও অপবাদ দ্বারা বর্ণনা করা হয় (অর্থাৎ প্রথমে নিরুপাধি ব্রহ্মে গুণ আরোপ করা হয়) এই দোষ সংশোধনার্থ শেষে বলা হয়, তাঁহাতে কোন গুণ নাই।"

শঙ্কর বলিতেছেন, ব্রহ্মে অনেক বিশেষণ আরোপ করা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষেই যে ব্রহ্মে এই সমুদয় গুণ আছে, তাহা নহে। 'ব্রহ্ম আছেন' এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই ব্রহ্মে গুণ আরোপ করা হয়। অবস্তুতে কোন গুণ আরোপ করা যায় না। সুতরাং ব্রহ্মে যখন গুণ আরোপ করা হইয়াছে, তখন বুঝিতেই হইবে যে "ব্রহ্ম অস্তিত্ববান'। 'ব্রহ্ম নির্গুণ'—ইহা বলিলে লোকে মনে করিতে পারে, 'ব্রহ্ম বুঝি অবস্তু তিনি বুঝি শূন্যময়'—এই আশঙ্কায় বলা হইল "ব্রহ্ম সগুণ।" ইহা শুনিয়া বা শেষে লোকে মনে করে "ব্রহ্ম বুঝি প্রকৃত পক্ষেই সগুণ'—এই আশঙ্কায় আবার ঐ সমুদয় গুণের অপবাদ করা হইয়াছে।

(১১)

পূর্ব্ব পক্ষ বলিতেছেন—ব্রহ্ম বহুরূপা, বৃক্ষ যেমন বহু শাখান্বিত, তেমনি ব্রহ্মও বহুশক্তি প্রবৃত্তিযুক্ত (এবম্ অনেক-শক্তি প্রবৃত্তি যুক্তম্ ব্রহ্ম); সুতরাং ব্রহ্মের একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সত্য। যেমন বৃক্ষ বৃক্ষরূপে এক, কিন্তু শাখাদি রূপে বহু, সমুদ্র যেমন সমুদ্ররূপে এক, কিন্তু ফেন তরঙ্গাদি রূপে বহু, মৃত্তিকা যেমন মৃত্তিকারূপে এক, কিন্তু ঘটশরাবাদিরূপে বহু—তেমনি, ব্রহ্মের

একত্ব একত্বাংশে মোক্ষব্যবহার এবং নানাত্বাংশে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে ” সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—‘না, এরূপ নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে একটী দৃষ্টান্ত বাক্যে বলা হইয়াছে, মৃত্তিকাই সত্য ; ‘বাচারম্ভণ’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বিকার-জাত বস্তুত মিথ্যাত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে। বেঃ ভাঃ ২।১।১৪।

(১২)

“যখন ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি অভেদ সূচক বাক্য দ্বারা অভেদ জ্ঞান জাগ্রত হয়, তখন জীবের সংসারিত্ব ও ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব সমুদয়ই অপগত হইয়া থাকে। মিথ্যাজ্ঞান বিজৃম্ভিত এই যে ভেদ ব্যবহার, ইহাতে সম্যকজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন কোথায় থাকে সৃষ্টি, আর কোথায় থাকে অহিত করণাদি দোষ ! (অপগতম্ ভবতি তদা জীবস্য সংসারিত্বম্, ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বম্…তত্র কুতঃ এব সৃষ্টিঃ কুতঃ বা অহিত করণাদয়ঃ দোষাঃ) বেঃ ভাঃ ২।১।২২।

(১৩)

“পূর্ব্ব পক্ষের তর্ক—বেদবাদিগণ আত্মায় সৃষ্টি কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। ইহাতে স্বীকার করিতে হয় যে, আত্মার স্বরূপের পরিণাম হয় এবং আত্মা অনিত্যাদি দোষ দুষ্ট হইয়া থাকেন। সিদ্ধান্ত পক্ষের উত্তর—না, এপ্রকার হয় না। আত্মা এক হইলেও ইহাতে ‘অবিদ্যামূলক নামরূপ উপাধি’ এবং ‘অনুপাধি কৃত বিশেষ’—এতদুভয়ই স্বীকার করা যাইতে পারে। অবিদ্যা-জনিত নামরূপ উপাধিই বন্ধন ও মোক্ষমূলক শাস্ত্রের বিষয়। এই প্রকার শাস্ত্রে উপাধি বিশেষের কথা বলা হইয়াছে, এই জন্যই স্বীকার করিতে হয় যে আত্মাতে অবিদ্যাজনিত উপাধি আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা উপাধি বিহীন এক, অদ্বিতীয়, সর্ব্ব তার্কিক বুদ্ধির অগম্য, অভয় ও মঙ্গল স্বরূপ। ইহাতে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব কিম্বা ক্রিয়া কারক বা ফল কিছুই নাই (ন তত্র কর্তৃত্বম্ ভোক্তৃত্বম্ বা ক্রিয়াকারক ফলম্ চ স্যাৎ) প্রঃ ভাঃ ৬।৩।

(১৪)

“পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন—ব্রহ্ম সর্ব্বগত সকলের আত্মা, চুল মাত্র স্থান হইতেও তিনি অন্তরে নহেন। অথচ উপনিষদে বলা হইয়াছে—পিপীলিকা যেমন গর্ত্তে প্রবেশ করে, আত্মাও তেমনি জীবের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া প্রবেশ করিলেন। একথা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে ? সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—এ প্রশ্ন ত অতি সামান্য, ইহা অপেক্ষাও গুরুতর প্রশ্ন হইতে পারে। এ কথাও উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, “তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় নাই, অথচ তিনি দর্শন করেন, কিছু না লইয়াই লোক সমূহ সৃষ্টি করিলেন, জল সমূহ হইতে পুরুষের উপাদান লইয়া তাহাকে গঠন করিলেন। সেই পুরুষের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মুখাদি ফাটিয়া বাহির হইল ; মুখাদি হইতে অগ্ন্যাদি লোকপাল উৎপন্ন হইল, তাহাদিগের সহিত ক্ষুধাতৃষ্ণার যোগ হইল, তাহারা আশ্রয় স্থান প্রার্থনা করিল, তাহাদিগকে গবাদি পশু দেখাইয়া দেওয়া হইল, তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করিল। অন্ন সৃষ্ট হইয়াই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল, পুরুষ বাগাদি দ্বারা ইহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিল ইত্যাদি।” ‘ব্রহ্ম মস্তক বিদীর্ণ করিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং এই সমুদয় ঘটনা একই প্রকার। সুতরাং কেহ কেহ বলিতে পারেন, ‘এ সমুদয়কেই অযৌক্তিক বলা হউক। কিন্তু আমরা বলি, তাহা নহে। এখানে আত্মার অববোধের জন্যই এই সমুদয়

বলা হইয়াছে, ইহা অর্থবাদ সুতরাং ইহাতে দোষ নাই (অত্র আত্মাববোধার্থ মাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ সর্ব্বঃ অয়ম্ অর্থবাদঃ ইতি অদোষঃ)। অথবা এই কথা বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত যে, লোকে শিক্ষার জন্য যেমন মিথ্যা আখ্যায়িকা রচনা করা হয়, তেমনি বলা হইয়াছে যে, মায়াবীর ন্যায় মহামায়াবী সর্ব্বজ্ঞ, ও সর্ব্বশক্তিমান দেবতা সহজে ইহার অবরোধ ও প্রতিপত্তি করিবার জন্য এই সমুদয় করিয়াছেন (রায়া বিবৎ বা মহামায়াবী দেবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্বম্ এতৎ চকার সুখাববোধন—প্রতিপত্ত্যর্থং লোকবৎ আখ্যায়িকা প্রপঞ্চঃ ইতি যুক্ততরঃপক্ষঃ)। এই সৃষ্টির আখ্যায়িকা জ্ঞানে কোন ফল নাই, কিন্তু আত্মার একত্ব জ্ঞানে অমৃতত্ব ফল হয়, ইহা সর্ব্ব উপনিষদের উপদেশ। (ঐতঃ উপঃ ভাষ্য ৪র্থ অধ্যায় আরম্ভ)।

(১৫)

প্রাণীদিগের অবিদ্যাদি দোষ বীজস্বরূপ। এই বীজ দ্বারাই 'কলা' সৃষ্ট হয়। চক্ষুর প্রান্ত ভাগে অঙ্গুলি দ্বারা নিপীড়ন করিলে যেমন দ্বিচন্দ্র, মশক,মক্ষিকাদি সৃষ্ট হয়, কিম্বা স্বপ্নদ্রষ্টা যেমন নানা প্রকার বস্তু সৃষ্টি করে, অবিদ্যা কর্ত্তৃক সৃষ্ট কলাদিও তেমনি। (এবম্ এতাঃ কলাঃ প্রাণিনাম্ অবিদ্যাদি দোষ বীজাপেক্ষয়া সৃষ্টাঃ তৈমিরিক দৃষ্টি সৃষ্টাঃ ইব দ্বিচন্দ্র মশক মক্ষিকাদ্যাঃ স্বপ্নদৃক্ সৃষ্টাঃইব ইত্যাদি) প্রঃ ভাঃ ৬।৪।

(১৬)

"এবিষয়ে সম্যক জ্ঞান জন্মাইবার জন্যই আত্মাতে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়াদি কল্পনা এবং এবং ক্রিয়াকারক ও কলাদি আরোপ করা হইয়াছে। আবার 'নেতি' 'নেতি' এই বাক্য দ্বারা অধ্যারোপিত বিশেষ অপনয়ন পূর্ব্বক, পুনর্ব্বার প্রকৃত তত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে। (এত স্যৈব অর্থস্য সম্যক্ প্রবোধায় উৎপত্তি স্থিতি প্রলয়াদি কল্পনা, ক্রিয়া কারক কলাধ্যারোপণা চ আত্মনি কৃতা তদপোহেন চ 'নেতি' 'নেতি' অধ্যারোপিত বিশেষাপনয়ন দ্বারেন পুনঃ তত্বম্ আবেদিতম্)। যেমন এক হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধতম পর্য্যন্ত সংখ্যা জ্ঞানের জন্য রেখাতে 'এই এক' 'এই দশ' 'এই শত' 'এই সহস্র' ইত্যাদি ভাব আরোপ করিয়া সংখ্যা গ্রহণ করান হয়, বস্তুতঃ সংখ্যাতে রেখাত্ব নাই, কিম্বা যেমন অকারাদি অক্ষরোপ দেশের জন্য পত্রে মসীরেখাদি সংযোগ করিয়া বর্ণতত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়, বস্তুতঃ অক্ষর সমূহে পত্রত্ব, মসীত্বাদি কিছুই বর্ত্তমান নাই—তেমনি উৎপত্ত্যাদি অনেক উপায়ে এক ব্রহ্মতত্ব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, আবার কল্পিত উপায় জনিত দোষ সংশোধনার্থ 'নেতি, 'নেতি' বলিয়া এই তত্ত্বের উপসংহার করা হইয়াছে" বৃহঃ ভাঃ ৪ ৪।২৫।

(১৭)

পূর্ব্বপক্ষের উক্তি—"উৎপত্তির পূর্ব্বে সমুদয়ই এক অদ্বিতীয় বস্তু রূপে ছিল। এই সমুদয় জীব উৎপন্ন হইবার পর ভিন্নতা উপস্থিত হইয়াছে।

সিদ্ধান্ত পক্ষ—না ইহা হইতে পারে না। কারণ উৎপত্তি সংক্রান্ত শ্রুতির অন্য অর্থ আছে। ....মৃত্তিকা লৌহ, বিস্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্তের উপন্যাস দ্বারা যে সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে, তাহা জীব ও পরমাত্মার একত্ব বিজ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ। যেমন প্রাণ-সংবাদে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইবার জন্য রাগাদি, অসুর পাপ্মা, বেধা

ইত্যাদির আখ্যায়িকা কল্পনা করা হইয়াছে, সৃষ্টি ব্যাপারেও তাহাই। গৌঃ কারিকা ভাষ্য ৩।১৫।

উপনিষদে লিখিত আছে যে, ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে কে বড়, এই বিষয় লইয়া কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, প্রাণই শ্রেষ্ঠ। শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, প্রকৃত পক্ষেই যে ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে কলহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা নহে। প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইবার জন্যই একটী আখ্যায়িকা বচনা করা হইয়াছিল। সৃষ্টি ব্যাপার সম্বন্ধেও ইহাই বক্তব্য। প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টি বলিয়া কোন ব্যাপার নাই। আত্মা ও ব্রহ্ম একই, এই সত্যটী বুঝাইবার জন্যই সৃষ্টিরূপ আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে।

(১৮)

পূর্ব্বপক্ষ—"যাঁহারা সৃষ্টি স্বীকার করেন না, তাঁহাদের নিকট সৃষ্টি প্রতিপাদক শ্রুতির প্রামাণিকতা কোথায় ?"

সিদ্ধান্ত পক্ষ—ইহা সত্য যে সৃষ্টি প্রতিপাদক শ্রুতি রহিয়াছে, কিন্তু তাহার অর্থ অন্য। ইহা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ।

পূর্ব্বপক্ষে—যেখানে মুখ্য ও গৌণ, উভয় অর্থই হইতে পারে, সেস্থলে মুখ্য অর্থই গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত।

সিদ্ধান্তী—না, ইহা হইতে পারে না, কারণ সৃষ্টি অপ্রসিদ্ধ এবং নিষ্প্রয়োজন। কাঃ ভাঃ ৩।২৩।

(১৯)

প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য যেমন 'প্রাণসংবাদ' রচিত হইয়াছে, তেমনি সৃষ্টি না থাকিলেও আত্মার একত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য সৃষ্টিকল্পনা করা হইয়াছে। গৌঃ ভাঃ ৩।২৪।

(২০)

"সুতরাং আত্মার একত্ব প্রত্যয় দৃঢ় করিবার জন্যই সমুদয় বেদান্তে উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কল্পনা করা হইয়াছে। এ সমুদয়ে প্রত্যয় স্থাপন করাইবার জন্য নহে (তস্মাৎ একরূপৈকত্ব প্রত্যয়দার্ঢ্যায় এত সর্ব্ববেদান্তেষু উৎপত্তি-স্থিতি-লয়াদি কল্পনা, ন তৎপ্রত্যয় করণায়) বৃহঃ ভা ২।১।২০।

(২১)

'উপনিষদে সুবর্ণ, মণি লৌহ, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রভৃতির দৃষ্টান্তদ্বারা জগৎসৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। একত্ব প্রত্যয় দৃঢ় করিবার জন্যই এই সমুদয় উক্ত হইয়াছে; উৎপত্ত্যাদি ভেদ প্রতিপাদন করিবার জন্য এ সমুদয় কথা বলা হয় নাই। একত্বপ্রত্যয় দার্ঢ্যায় সুবর্ণমণি-লোহাগ্নি স্ফুলিঙ্গ দৃষ্টান্তাঃ ন উৎপত্ত্যাদি ভেদ প্রতিপাদনপরাঃ) বৃঃ ভাঃ ২।১।১০

(২২)

পরমাত্মার একত্ব প্রত্যয় দৃঢ় করিবার জন্যই উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় প্রতিপাদক বাক্য (পরমাত্মৈকত্ব প্রত্যয় দ্রঢ়িম্নে উৎপত্তি স্থিতি লয়-প্রতিপাদকানি বাক্যাণি) বৃহঃ ভাঃ ২।১।২০।

(২৩)

সুতরাং উৎপত্ত্যাদি শ্রুতি আত্মার একত্ব সূচক (তস্মাৎ উৎপত্ত্যাদি শ্রুতয়ঃ আত্মৈকত্ব প্রতিপাদন পরাঃ) বৃঃ ভাঃ ২।১।২০।

(২৪)

লোকে আত্মাতে ভেদ দর্শন করে; এই ভেদ বিদূরীত করিয়া আত্মার একত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই সৃষ্টিসূচক বাক্যের

অবতারণা (ভেদ দর্শনাপবাদাচ্চ সৃষ্ট্যাদি বাক্যানাম্ আত্মৈকত্ব দর্শনার্থ পরত্বোপপত্তিঃ) বৃঃ ভাঃ ১।৪। শঙ্কর বহু স্থলে বলিতেছেন যে "ব্রহ্মের একত্ব বুঝাইবার জন্য সৃষ্ট্যাদি কল্পনা।" ইহার অর্থ কি? একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক—"অগ্নি হইতে যেমন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি ব্রহ্ম হইতে এই সমুদয় নির্গত হইয়াছে।" শঙ্কর বলিতেছেন, অগ্নি হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছে কিম্বা হইতে স্ফুলিঙ্গ পৃথক বস্তু, ইহা বুঝাইবার জন্য উক্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় নাই। উভয়ের একত্ব বুঝাইবার জন্যই উক্ত উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন একই বস্তু, তেমনি ব্রহ্মও একই বস্তু। যে বস্তুকে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহা ব্রহ্মই। এই একত্ব বুঝাইবার জন্যই উৎপত্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। যাহাকে ব্রহ্মে অবস্থিত বলিয়া মনে করা হয়—তাহা ব্রহ্মই। ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন কোন বস্তু রহিয়াছে এবং সেই বস্তু ব্রহ্মে অবস্থিত, ইহা বুঝাইবার জন্য 'স্থিতি'র কথা বলা হয় নাই। উভয়ের একত্ব প্রতিপাদনের জন্যই 'স্থিতি'র উল্লেখ করা হয়। ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন বস্তু ব্রহ্মে বিলীন হয়, ইহা বুঝাইবার জন্য শ্রুতিতে প্রলয়ের কথা বলা হয় নাই। উভয়ের একত্ব প্রতিপাদনের জন্যই এই সমুদয় গল্প রচনা করা হইয়াছে।

(২৫)

গৌড়পাদকারিকাতে (৪।৪২) এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

"উপলব্ধি বশতঃ এবং ব্যবহার দেখিয়া অনেকে বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং অজাতি অর্থাৎ বিনাশকে তাহারা সর্ব্বদাই ভয় করিয়া থাকে। এই সমুদয় লোকের জন্যই জ্ঞানীগণ 'জাতি' অর্থাৎ উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন।"

শঙ্করের ভাষ্য এই ঃ—'উপলম্ভ' শব্দের অর্থ উপলব্ধি; সমাচার অর্থ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের আচরণ। এই দুইটী কারণে অনেকে বস্তুর অস্তিত্বে দৃঢ় আস্থা স্থাপন করে। এই সমুদয় মন্দবিবেকীদিগের একটী উপায় করিবার জন্যই 'উৎপত্তি' বিষয়ক উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহারা এমত গ্রহণ না করিতে পারে, কিন্তু যাহারা বেদান্ত অভ্যাস করিতেছে, তাহারা স্বয়ং অজ, অদ্বিতীয়, আত্মার বিষয়ে বিবেকবান হইবে। পরমার্থ বুদ্ধিতে উৎপত্তি বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয় নাই। অবিবেকী শ্রোত্রিয়গণ স্থূল বুদ্ধিবশতঃ কল্পনা করে যে, ইহা বিশ্বাস করিলে 'আত্মনাশ হইবে। এই প্রকার কল্পনা করিয়া তাহারা সর্ব্বদাই ভীত হইয়া থাকে। ইহাদিগের একটী গতি করিবার জন্যই 'উৎপত্তি' বিষয়ক উপদেশের অবতারণা করা হয়।

অধিক দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্ম নিত্যই নির্গুণ; স্বরূপতঃ তিনি সগুণ নহেন। নিম্নলিখিত কারণে তাহাতে সগুণত্ব আরোপ করা হয়।

(১) জবাকুসুম রূপা উপাধির জন্য যেমন স্ফটিককে রক্তবর্ণ বলিয়া ভ্রম হয়, ভ্রমবশতঃ যেমন লোকে রজ্জু, শুক্তিক, স্থাণু, উষর-ভূমি ও একচন্দ্রকে সর্প, রজত, পুরুষ, মৃগ-তৃষ্ণিকা এবং বহুচন্দ্র বলিয়া কল্পনা করে, লোকে যেমন ভ্রমবশতঃ শূন্যে গন্ধর্ব্ব নগর দর্শন করে, তেমনি অবিদ্যাবশতঃ লোকে নির্গুণ ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়া ভ্রম করে।

(২) ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিলে লোকে তাঁহাকে অবস্তু বলিয়া ভ্রম করে, এইজন্য তাঁহাকে শাস্ত্রে সগুণ বলিয়া বর্ণনা করা হই-

য়াছে। আবার ব্রহ্ম 'নেতি' 'নতি'—ইহা নয়, ইহা নয়, এইরূপ বলিয়া সগুণত্ব আরোপ রূপ দোষও পরিহার করা হইয়াছে।

(৩) প্রকৃত অদ্বৈতবাদের কথা শুনিলে মূর্খলোকে ভীত হইয়া থাকে। তাহারা ভাবে 'তবে বুঝি আমরা নাই'—'তবে বুঝি আমরা থাকিব না'—'তবে বুঝি আত্মীয় স্বজন ও এই সমুদয় ভোগ্য বস্তু নাই' ইত্যাদি। এই সমুদয় লোকের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ও সগুণ ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে।

(৪) ব্রহ্মের একত্ব বুঝাইবার জন্য সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদির গল্প রচনা করা হইয়াছে।

প্রকৃত তত্ত্ব এই যে, ব্রহ্ম 'একরস' নির্ব্বিশেষ নির্গুণ; তিনি সর্ব্বপ্রকার ভেদরহিত, অংশবিহীন ও অবয়ববিহীন। ইহা ভিন্ন যাহা, তাহা অবস্তু।

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

অতৃপ্ত।

নব ইন্দু পূত চিতোরের,
পুত্র সিংহ ভারত-গৌরব,
ষোড়শ বর্ষীয় বীর, পারিজাত পৃথিবীর,
চিতোরে মাখায়ে গেলে
অমর সৌরভ!

২

কে দেবতা এসেছিলে দেশে,
নরত্বের আবরণ নিয়া,
ভস্ম মাখা বৈশ্বানর, মেঘাবৃত প্রভাকর,
না জানিতে না চিনিতে
গেলে যে চলিয়া!

৩

তুমি বুঝি ছিলে পুরাকালে
মৃত্যুঞ্জয় যোগীন্দ্র শঙ্কর,
বিনাশি ত্রিপুরাসুর, রক্ষিলে স্বরগ পুর,
কাল কূট করি পান
রক্ষিলে অমর?

৪

অথবা,
তুমি বুঝি ছিলে অরিন্দম
বিষ্ণুভক্ত দেবতা প্রহ্লাদ,
অভিচারী দ্বিজদলে, বাঁচাইলে যজ্ঞানলে,
ঝাঁপ দিলে সিন্ধুজলে
না গণি প্রমাদ?

৫

অথবা,
তুমি বুঝি ছিলে নরোত্তম
সত্যব্রত হরিশ্চন্দ্র ধীর,
প্রতিজ্ঞা রক্ষার তরে, বিকাইলে অকাতরে
রাজ্য ধন দারা সুত
ও রাজশরীর?

৬

অথবা,
তুমি বুঝি ছিলে ভগীরথ
উদ্ধারিতে পিতৃলোক গণে,
মহতী তপস্যা-বলে, তুষিয়া ত্রিদশ-দলে,
পতিতপাপনী গঙ্গা
আনিলে ভুবনে?

৭

অথবা,
তুমি বুঝি ত্রেতা যুগে ছিলে,
শ্রীরামের "ভরত" অনুজ,
প্রাপ্ত রাজ্য পরিহরি, ভ্রাতৃনির্ব্বাসন স্মরি,
পূজিলে—বিতৃষ্ণ সুখ,
ভ্রাতৃ-পদাম্বুজ?

৮

অথবা,
তুমি বুঝি ছিলে দ্বাপরের
দেবব্রত—জাহ্নবী-তনয়
যতী, ব্রতী, জিতেন্দ্রিয়, শৌর্য্যে বীর্য্যে অদ্বিতীয়,
চিত্তজয়ী, ইচ্ছামৃত্যু
নিষ্কাম নির্ভয়!

পুনঃ বুঝি এলে কলিযুগে
দেখাইতে অমর মহিমা,
বিশ্বপ্লাবী প্রীতিভক্তি, আত্মত্যাগ অনাসক্তি,
সসীম মানব—নাহি
মহত্বের সীমা!

১০

যুগে যুগে আসিয়াছ তুমি
কার্য্য শেষে গিয়াছ চলিয়া,
ভূতলে ত্রিদিব দৃশ্য বিস্ময়ে দেখেছে বিশ্ব,
নিরেট পাষাণ কত,
গিয়াছে গলিয়া!

১১

বীরাঙ্গনা বীর-প্রসবিনী
কর্ম্মদেবী শতধন্যা আজি,
পুত্র কন্যা বধূ সনে চণ্ডী অবতীর্ণা রণে
সবে মিলে স্বর্গে যায়,
দীপ্ত রত্ন রাজি!

১২

বীর তব পুষ্প রথ পানে
চেয়ে তব কোটি কোটি ভাই,
আবার আসিবে কবে, কোন্ যুগে দেখা হবে,
অতৃপ্ত চিতোর-চিত
মনে রেখ তাই।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

গিরিজা (৩)

ইন্দ্রিয়-সংযম।

কয়েক বৎসর কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী ব্যবসা করিয়া গিরিজাপ্রসন্ন পিতার আদেশ ক্রমে বরিশাল-বারে যোগদান করেন। বরিশালে গিরিজাপ্রসন্নের বাসাবাড়ী আছে, তিনি সেইখানেই বাস করিতে থাকেন। তাঁহার বাসাবাড়ীর সন্নিকটে বেশ্যালয় ছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, গিরিজাপ্রসন্ন সুস্বর হারমোনিয়ম বাদন করিতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। একদিন আদালত বন্ধ ছিল, গিরিজাপ্রসন্ন অবকাশ পাইয়া তাঁহার বাদ্যযন্ত্রটী খুলিয়া একটা সময়োচিত রাগিণীর আলাপ করিতেছিলেন, তাঁহার বাদ্যযন্ত্রের চিত্তহারী স্বর শ্রবণ করিয়া, অনতিদূর হইতে, একজন বারাঙ্গনা, হারমোনিয়ার রাগিণীর সঙ্গে একটা সুললিত সঙ্গীত ধরিয়া দিয়াছিল। গিরিজাপ্রসন্ন তৎক্ষণাৎ বাদ্যযন্ত্রটী বন্ধ করিয়া তাঁহার কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার আর এ বাসায় থাকা হইবে না, অদ্যই এই বাসা পরিত্যাগ করিব। তোমরা আমার বাসোপযোগী স্থান স্থানান্তরে নির্দ্দেশ করিয়া দেও।" অনতিবিলম্বে তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল।

তিনি চরিত্র বাঁচাইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবার জন্য বারবিলাসিনীর প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরা এরূপ আরও ৩।৪টী ঘটনায় তাঁহার ইন্দ্রিয়-সংযম প্রবৃত্তির বলবতী স্পৃহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার চরিত্র অনুধাবন কর, তাহাতেও যে শিক্ষা পাইবে, তাঁহার পুস্তক পাঠ কর, তাহাতেও সেই শিক্ষা লব্ধ হইতে পারিবে। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের ছায়া যেন আমরা তাহার পুস্তক মধ্যে প্রতিবিম্বিত দেখি। ইন্দ্রিয় নিগ্রহাভ্যাস সময়ে লোকের প্রলোভনের অন্তরালে থাকা কর্ত্তব্য, কি প্রলোভনের ভিতরে থাকিয়া ইন্দ্রিয় জয়ে সচেষ্ট হওয়া বিধেয়, এতদ্বিষয়ে গিরিজাপ্রসন্ন গৃহলক্ষ্মীর প্রথম ভাগে যে দার্শনিক-তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, আমরা সাধা-

রণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"মানুষের সাধুতাই প্রকৃতি—অসাধুতা বিকৃতি মাত্র। লোকে যে কুকার্য্য করে, সে কতকটা জোর করিয়া; কতকগুলি উদ্ধত ইন্দ্রিয়ের বলে শান্ত হৃদয়কে পরাস্ত করিয়া, ঘটনাধীন সে বল ক্ষীণ হইয়া গেলে—ইন্দ্রিয়গণ শান্তভাব ধারণ করিলে, হৃদয় আবার অনুতাপের সাহায্যে প্রবল হইয়া উঠে। তখন এমনি হইয়া পড়ে যে, পূর্ব্বে সে যত সাধু ছিল; এখন তদপেক্ষা দ্বিগুণতর সচ্চরিত্র হইয়া উঠে। ইহার কারণ এই—পূর্ব্বে সে সৎ থাকিলেও তাহাকে প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিতে হইত। সে সংগ্রামে ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিত, সুতরাং সর্ব্বদা তাহাকে শঙ্কিত থাকিতে হইত। কখনও বা প্রলোভনের দূরে থাকিয়া সাধুতা রক্ষা করিতে হইত। কখন বা সামান্য সংসার জ্ঞান বা সুখ্যাতির ইচ্ছা দ্বারা ইহাকে পরাস্ত করিতে হইত। কিন্তু ভোগ সমাপ্তি হইলে, সে যখন পুনরায় সৎ হয়, ইন্দ্রিয়গণ তাহার উপভোগ্য সুখরাশির অসারতা বুঝিতে পারিয়া আর কখন তাঁহাদের হৃদয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না, সুতরাং সে বিনাক্লেশে প্রলোভনের আকর্ষণী শক্তিকে পরাজয় করিতে সক্ষম হয়।

পূর্ব্বপ্রকারের সাধুদিগের অধঃপতন হইবার সম্ভাবনা খুব অল্প। তবে একটা কথা বলা আবশ্যক, প্রকৃত সাধুতা দেখিবার জন্য যে আমাদিগের প্রলোভনের সামনে গড়িয়া যুঝিতে হইবে, তাহা নহে। আমাদিগের মত দুর্ব্বল লোকের প্রলোভন হইতে দূরে থাকা ভাল। যিনি জিতেন্দ্রিয়, তিনি যাহা ইচ্ছা করুন, আমরা ইন্দ্রিয়-সেবক, আমাদিগের অতটা হইয়া উঠিবে না। বিষ পান করিয়া অমর হইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।"

উপদেশ প্রদানে দক্ষলোক এ সংসারে সংখ্যাতীত। কিন্তু উপদেশ পালনে যত্নবান লোকের সংখ্যা বড়ই বিরল। নীতি অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিকতর কার্য্যকরী। গিরিজাপ্রসন্ন এই সারগর্ভ বাক্যটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া নীতি শিক্ষা দিতেন। তিনি আপনার মনন শক্তির প্রভাবে যে ছবি বা আদর্শ অঙ্কিত করিয়া লইতেন, তাহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য, শুধু ইন্দ্রিয়াদির দমন কেন, জীবনটাকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। নিজ মনন-রচিত আদর্শে যাঁহার যতদূর আসক্তি, তিনি এই পৃথিবীতে ততদূর অভীষ্টসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব কি?

বরিশালে আইন-ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্যতা।

গিরিজাপ্রসন্ন বরিশাল ওকালতী ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিলেন না। উকীলদের ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করিতে হইলে যেরূপ শক্তি ও গুণলাভের দরকার, তাহা তাঁহাতে অপ্রতুল ছিল না। তিনি আইনবোদ্ধা, সুবক্তা ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তত্রত্য শ্রেষ্ঠ উকীলবর্গের সহায়তা ও শ্রদ্ধালাভের যোগ্য হইয়াছিলেন। আর্থিক অবস্থাও তাঁহার অনুকূলে ছিল। শরীর সবল ও শ্রমসহিষ্ণু করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ এই সব অবস্থা যাহাদের প্রতিকূলে দাঁড়ায়, তাহারাই ঐ ব্যবসায় অকৃতকার্য্যতার পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু গিরিজাপ্রসন্নের এ সব অবস্থা তাঁহার বিরুদ্ধে না থাকিলেও, তাঁহার পসার করার পথে একটী বিঘ্ন সমুপস্থিত হইয়াছিল।

১ম বিঘ্ন। এ সংখ্যায় না বলাই ভাল।

২য় বিঘ্ন। সাহিত্য সেবাই তিনি লক্ষ্য পথে অগ্রসর হওয়ার উপর স্থির করিয়া তৎকার্য্যেই ব্রতী ছিলেন। যে যে কার্য্যে ব্রতী, তাহাতেই কিছুদিন পরে তাহার একটা আসক্তি বা অনুরাগ জন্মে। গিরিজাপ্রসন্ন সাহিত্য-সেবার অনুরাগী হইয়া অভীষ্ট পথে

অগ্রসর হইতেছিলেন, কাজেই অন্তকার্য্য তাঁহার নিকট তদ্রূপ গন্তব্যপথ উল্লঙ্ঘন করার সহায় বলিয়া মনে হইল না। যে যে কার্য্যই করুক না কেন, সেই কার্য্যটীকে তাহার জীবনের উদ্দেশ্যের অনুকূল করিয়া লওয়া চাই। গিরিজাপ্রসন্ন সাহিত্য সেবা তাঁহার মহৎ জীবনের উদ্দেশ্যের অনুকূল করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন কিনা, তাহা তাঁহার পুস্তক-পাঠকেরা বিচার করিয়া দেখিবেন। যদি পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাই তাঁহার সাধুজীবনের একটা প্রধানতম বিশেষত্ব।

সত্যপ্রিয় মথুরানাথ যখন জ্ঞাত হইলেন যে, পুত্রের ব্যবসার দিকে বিশেষ আগ্রহ নাই, তখন তিনি তজ্জন্ত বিশেষ মনোক্ষুণ্ণ হইলেন না। পুত্রের যশ ও মান অর্জ্জন অপেক্ষা ধর্ম্মজ্ঞান ও সত্যনিষ্ঠা তাঁহার অধিকতর প্রিয় ছিল। গিরিজাপ্রসন্ন বরিশাল বাস কালে অনেক পরোপকারিতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রামের ও বিদেশের অনেক ছাত্র তাঁহার বাসায় আসিয়া অধ্যয়ন করিত। তিনি কোন কোন বালকের শিক্ষার ব্যয়ও নিজে বহন করিতেন। কয়েকজন আফিসের কর্ম্মচারীও তাঁহার বাসায় আসিয়া কার্য্যনির্ব্বাহের সুবিধা লাভ করিত। লেখা পড়া কিম্বা অন্ত কোন সদুদ্দেশ্যের জন্ত কোন লোক তাঁহার আশ্রয়-প্রার্থী হইলে প্রায়ই প্রত্যাখ্যাত হইত না।

প্রশংসা-লাভের অনিচ্ছা।

একবার বরিশালে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। আজকাল স্বদেশী আন্দোলনের ফলে, একের দুঃখে অপরে ব্যথিত হয়, একের অভাব অপরে বিমোচন করিতে অগ্রসর হয়, একের সর্ব্বনাশে অপরে সর্ব্বনাশগ্রস্ত মনে করে। কিছুকাল পূর্ব্বে এ ভাবটা এদেশ হইতে কিছু দিনের জন্ত তিরোহিত হইয়াছিল। বরিশাল জেলার সেই দুর্ভিক্ষের সময় অনেক লোক অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে ও আশ্রয় স্থানাভাবে মৃতপ্রায় হইয়াছিল। গিরিজাপ্রসন্ন সেই দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া অবলোকন করিয়া, তাঁহার দেশের চতুর্দ্দিকস্থ দুঃস্থ পরিবারবর্গের রক্ষার জন্ত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি স্বহস্তে অনশন-ক্লিষ্ট, অর্দ্ধাশন-পীড়িত, আশ্রয়বিহীন কাঙ্গাল গরীবদিগকে, টাকা পয়সা ও বস্ত্রাদি বিতরণ করিয়া, রক্ষা করিলেন। তাঁহার সেই অদম্য দেশহিতৈষণা ও সহৃদয়তার ফলে অনেকে আশাতীত সাহায্য লাভ করায়, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দাসগুপ্ত মহাশয় ঐ ঘটনাটীর উল্লেখ করিয়া দেশহিতকর "বঙ্গবাসী" পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধে একটী প্রশংসা-সূচক প্রবন্ধ লেখেন। গিরিজাপ্রসন্ন উহা পাঠ করিয়া তাঁহার কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দাসগুপ্ত মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে দুর্ভিক্ষের সেবা-কার্য্যের জন্ত প্রশংসা করিয়া বঙ্গবাসীতে প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছ, বাস্তবিক প্রশংসিত হইতে পারি, দুর্ভিক্ষে এরূপ কোন কার্য্যই আমি করিতে পারি নাই। তুমি কেন ঐরূপ অযথা প্রশংসা করিয়াছ? আমি তোমার বিরুদ্ধে উহার প্রতিবাদ করিব।" ভৃত্য সাধারণতঃ প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্ত তাহার যশ ঘোষণা করিতেই চেষ্টা করে। ইহা অস্বাভাবিক বা অপকর্ম্ম নহে। কিন্তু কয়জন প্রভু, ভৃত্যের সেই দেশ-প্রচলিত প্রশংসা স্মরণ করিয়া, অহঙ্কৃত বা গৌরবান্বিত হওয়ার পরিবর্ত্তে, তল্লাভের উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততা চিন্তা করিয়া থাকেন? গিরিজাপ্রসন্ন কর্ত্তব্য-জ্ঞান-সম্পাদিত কার্য্যের জন্ত প্রশংসা-বর্ষণকে

অযথা প্রশংসা-বর্ষণ মনে করিতেন। এইরূপ অকৃত্রিমতার দৃষ্টান্ত স্মরণ করিলে হৃদয় স্বতঃই প্রফুল্লিত হয়।

শ্রেষ্ঠ জীবনের মূল্য জ্ঞান।

পরোপকারিতার কথা কতইবা উল্লেখ করিব। গিরিজাপ্রসন্নের দেশস্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন কবিরত্ন মহাশয় কবিরাজি ব্যবসা চালইবার জন্য একবার কলিকাতায় ঔষধালয় সংস্থাপন করেন ও তথায় তিনি ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। উক্ত কবিরাজ মহাশয় যেমন বিদ্বান, তেমনই ধার্ম্মিক। তাঁহার ন্যায় নির্ম্মল চরিত্রের সাধুলোক আজকাল বড়ই দুষ্প্রাপ্য। কলিকাতা বাস কালে ইনি হঠাৎ পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়েন, গিরিজাপ্রসন্ন তখন কোন কারণবশতঃ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। সহৃদ্ গিরিজাপ্রসন্ন পূর্ব্ব হইতেই উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দুরারোগ্য পীড়ার সংবাদ শ্রবণ মাত্র তাঁহার সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসাদির বন্দোবস্তের জন্য তাহার কোন ভ্রাতাকে তথায় প্রেরণ করেন। এবং কবিরাজ মহাশয়ের পুনঃ স্বাস্থ্য লাভ পর্য্যন্ত তাঁহার পরিবারবর্গ যাহাতে কোনরূপ ক্লেশ ভোগ না করেন, তাহার সদুপায় বিধান করেন।

ভক্তিভাজন কবিরাজ মহাশয় একদিন গিরিজাপ্রসন্নের গুণের কথা আলোচনা করার সময় ব্যক্ত করিয়াছেন, "গিরিজা বাবুর নিকট আমি চির ঋণী, তাঁহা দ্বারা আমি অনেক সময় অভাবনীয় উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, বিশেষতঃ তিনি আমার ব্যারামের সময় যে উপকার করিয়াছিলেন, তাহা চিরস্মরণীয়। তাহার গুণের সীমা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব।" শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

যৌগিক।

বিজ্ঞান নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, এই পৃথিবীতে, কয়েকটী মাত্র অমিশ্র ধাতুর মিশ্রণে সৃষ্টির যাবতীয় পদার্থ সমুৎপন্ন হইয়াছে—এই পৃথিবী জীবের বাসের যোগ্য হইয়াছে। ধারাবাহিকরূপে সে সকল বৈজ্ঞানিক কথার অভিব্যক্তি, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য অন্যবিধ।

এই পৃথিবীতে জীবে জীবে এবং জীবে জড়ে যে আকর্ষণ—তাহাও বিবিধ কথায় প্রতিপন্ন হইয়াছে। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, প্রেমযোগ, ভক্তিযোগ, প্রবৃত্তিযোগ, নিবৃত্তিযোগ, প্রকৃতিযোগ, পুরুষযোগ, কতযোগের কথাই শুনিয়াছি। সে সকল কথার পুনরাবৃত্তিও এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এ সকলের মধ্যগত যে শক্তি সংসারকে স্বর্গে টানিতেছে, সেই ইচ্ছা-শক্তির বিষয়ই কিছু অনুকীর্ত্তন করিব। ইচ্ছার পরিস্ফুরণেই এই সৃষ্টি অভিব্যক্ত।

একটী বৃক্ষ শাখায় দুটী পক্ষী,—এ বলে আমাকে দেখ্, ও বলে আমাকে দেখ্,—দুই মিলিয়া মিশিয়া একাত্মক। একত্র উপবেশন, একত্র ভ্রমণ, একত্রে আহার, একত্র বিহার, একত্র শয়ন, একত্র স্বপন,—দুই মিলিয়া মিশিয়া যেন এক। এই চিত্রের অনু-

ধ্যানে উপনিষদকার মহা প্রহেলিকায় উপনীত! কি মধুর মিলন!!

বৃক্ষ ছাড়িয়া পরিবারে আসিয়া দেখি, পুরুষ ও প্রকৃতির কি অপূর্ব্ব মিলন;—নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান, কি অপূর্ব্ব যোগে আত্মহারা;—একের অস্তিত্বে অন্য জীবিত—কি অপরূপ মাধুর্য্যে বিভোর!!

আর একটু তলাইয়া দেখি, কি নেশায় বিভোর হইয়া বুদ্ধ,নিরঞ্জন-তটে আত্মবিস্মৃত; ঈশা পালেসটাইনে স্বেচ্ছা-বর্জ্জিত,গোরা সোণার নবদ্বীপের এবং রামকৃষ্ণ কামারপুকুরের সকল আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া,স্বেচ্ছা ও কামনা-বর্জ্জিত হইয়া, মহাসাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন!

আরো অন্তরে একটু অগ্রসর হইয়া দেখি,—পিতামাতার ভালবাসার বন্ধন,ঐশ্বর্য্যের চিন্তন, সব ভুলিয়া, ম্যাট্‌সিনি কি এক মহা শক্তিতে বিভোর,—কিছুতেই ফিরিলেন না, দেশের কালিমার কথা ভাবিতে ভাবিতে, সেই যে আল্পস্ পর্ব্বতে দেহত্যাগ করিলেন,—কই আর ত ফিরিলেন না!!

আরো একটু ডুবিয়া দেখি, অন্তরের ভিতর কে সদা জাগিতেছে? আমার কথা সে শুনে না, আমার সংসারের মঙ্গল সে ভাবে না। সে সংসারের অতীত কি সব কথা বলে, আমি কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারি নাই। প্রবৃত্তির পথ হইতে সে নিবৃত্তির পথে টানিতেছে, সে জড়ের বন্ধনের মধ্যে চিন্ময় বন্ধনের আয়োজন করিতেছে;—আমি কিছুতেই ঠিক হইতে পারিতেছি না। করি কি, যাই কোথা? আমার অন্তরে কে গো নিবৃত্তিরূপে, শ্রেয়রূপে, বাণী রূপে, আদেশ রূপে প্রকাশিত গো! আহা, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার কি মধুর যোগ গো!! আমি ত ধূলি কাদায় মসীম্লান, পাপ সন্তাপে অনাকর্ষিত অমাবস্থা;—আমার প্রতি তাঁহার এ কি ভাব গো!

তাঁহারা বলেন, উহা মিথ্যার খেলা, কল্পনার জড়তা,উহা মোহের প্রকম্পন; কিন্তু সে সব কথা অনেক বার অনেক প্রকারে শুনিয়াও, আমি, তুমি, সে, চির-পরাজিতের ন্যায়, সেই অপরাজিতের দিকেই অগ্রসর হইতেছি কেন? আমরা এ ক্ষেত্রে জ্ঞানহীন, বুদ্ধিহীন, মায়াহীন, মমতাহীন,—পরাজিতের সর্ব্বস্ব গিয়াছে, আমরা এখন আত্মিক জগতে অনাত্মিক, আমরা এখন দেহময় রাজ্যে অদেহী, আমরা এখন জড়ময় ভুবনে মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে দীক্ষিত অমর। তোমরা পাগলের উক্তি শুনিয়া হাসিতে থাক, আমরা অতীন্দ্রিয়ে বিভোর হইয়া থাকি। ইচ্ছা, ইচ্ছা, ইচ্ছা, চতুর্দ্দিকে কেবল ইচ্ছার প্রকম্পন। ইথর বা বিদ্যুৎ হইতেও উহা তীক্ষ্ণ। স্বাধীনতার রাজ্য কোথায়? ঐ মহা ইচ্ছায় ডুবাইবার জন্য ইচ্ছাময়ের কি অনাহত চেষ্টা!

প্রথম যখন ডাক শুনিলাম, বুঝিতে পারি নাই, কে অস্পৃশ্যকে এখন মধুর স্বরে ডাকে। কিন্তু যখন যাত্রা করিলাম,—একাকীত্বের গহনে যখন প্রবেশ করিলাম—কত মধুর রবে, কত সম্মোহন স্বরে, কত স্পষ্ট অজেয় বাণীতে আমাদিগকে আরো ডাকিলেন! আমাদের প্রাণ-রাধা আর সংসারে আবদ্ধ থাকিতে চায় না, আমাদের কামনা-অর্জ্জুন আর স্বাতন্ত্র্যে মজিতে চায় না। সেই যে সুধা-বিনিন্দিত বংশীধ্বনি কবে কোন্ নিভৃতে বাজিয়াছিল,তাহাতে আচম্বিতে আমাদিগকে বিভোর করিল কেন গো! এখন, এই অন্তিমে, বুঝিতেছি, উহা আর কিছুই নয়—ইচ্ছাময়ের মহা ইচ্ছার তাড়না মাত্র। "নেতি, নেতি" বলিতে বলিতে যাত্রা

করিয়াছিলাম, এখন "সেই" "সেই"-ময়-ধামের নিভৃত কন্দরে প্রবেশ করিয়াছি। এখন আর ত কিছু দেখি না, বুঝি না, বুঝি কেবল তিনি, কেবল তিনি। এই বিশ্বসংসার ইচ্ছাময়ের মহা ইচ্ছারই বিবৃতি।

বন্ধুরা প্রতিনিয়তই কতরূপে বলেন, এই জড়ময় ভুবনে, পাপ প্রবৃত্তির এবং আসুর বুদ্ধিরই জয়। তাঁহারা বলেন, "চতুর্দ্দিকে অত্যাচার, অনাচার, কদাচার, —পাপ প্রলোভনের বিভীষিকা, অন্যায় এবং অসত্যের তাড়না; ইহার মধ্যে তোমরা ছাই কি সত্য এবং ন্যায়ের স্বপ্নে বিভোর হইতেছ?" বলেন, "জোর যার মুলুক তার, জান না কি? জান না কি, পাশবশক্তিরই এই পৃথিবীতে জয়?" শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াই বটে, কিন্তু ঐ বংশী তবুও অন্তরে মধুর রবে বাজে। বল ত, এই ভয় বিভীষিকার রাজ্যে আমরা এখন কি করি?

আমরা ত আর কোন উপায় দেখি না, উপায়—কেবল ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা-যোগে যুক্ত হওয়া এবং ঐ বাণীর নির্দ্দেশে অগ্রসর হওয়া। জুডাস্ ইস্কারিয়ট জীবিত, না সত্য জীবিত?—না সত্য-রক্ষক খ্রীষ্ট আজ জীবিত, বলত? সকলে যখন খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করিয়াছে—নির্য্যাতনের চরম দৃশ্যে যখন বধ্যভূমি পরিপূরিত, তখন "তিনি" অবতরণ করিয়া মহা সত্যের জয় ঘোষণা করিলেন;—মেরি ম্যাক্‌ডেলিন তখন তন্ময়, ইচ্ছা-যোগ-স্বরূপে আত্মহারা! যত যোগের কথা শুনিয়াছ, এই ইচ্ছাযোগে যুক্ত হওয়ার অপেক্ষা আর কোন শ্রেষ্ঠ যোগ আছে কি?

আমাদের মন চায় প্রবৃত্তির পথে যাইতে, কিন্তু কে যেন সদা সচকিতে আমাদিগকে ফিরাইতে তৎপর। আদি কাল হইতে এইরূপ তাড়না চলিতেছে। কেবল তোমার আমার উপর এ তাড়না নয়, জগতের সকলের উপর নানারূপ তাড়না চলিতেছে। পিতা মাতা, গুরু নেতা—সকলের তাড়নাই ঐ তাড়না-মূলক। এ-তত্ত্ব কেহ বুঝে না, কেহ দেখে না, কেহ ধরিতে পারে না। কিন্তু ঐ তাড়নার হাতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। ইচ্ছার উপর মহা ইচ্ছার তাড়না, সর্ব্বদা, সর্ব্বদেশে চলিতেছে।

মন যখন বিপথে যাইতে চাহে, তখন "সংযম" বলে, ঐ বাণীর কথানুসারে, প্রতিনিবৃত্ত হওয়া উচিত। একাজ করি, কি ওকাজ করি, চিন্তা না করিয়া, নিজ ইচ্ছাকে সংহত করিয়া ঐ ইচ্ছার অনুসরণ করা উচিত। এইরূপে স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে বলি দিতে দিতে, শেষে "একতমের" ইচ্ছাই কেবল জাগিয়া উঠে। মার পিশুন তখন নিরঞ্জন-তটে নির্ব্বাপিত হইয়াছে, মহেশ্বরের একতম ইচ্ছাই তখন শাক্যকে "সিদ্ধার্থে" পৌঁছাইয়া দিতেছে।

আমরা সদা কেবল বিরোধের রাজ্যে ঘুরিতেছি। সকল বিরোধের মূল কারণ ইচ্ছার বিরোধিতা। স্বামী স্ত্রীতে বিরোধ, পিতাপুত্রে বিরোধ, ভ্রাতাভগ্নীতে বিরোধ,—পরিবার সকল বিরোধের লীলাস্থল। দেশের অবস্থা, পরিবারেরই অনুরূপ,—ঘরে ঘরে, জাতিতে জাতিতে, ধনী দরিদ্রে, জ্ঞানীমূর্খে—কেবল বিরোধ, কেবল সংঘর্ষণ! দেশ ছাড়িয়া রাজ্যে যাও, সেখানেও কত বিরোধ, রাজা প্রজায় কত কত বিরোধ,—রাজার ইচ্ছায় প্রজা চলে না, প্রজার ইচ্ছায় রাজা চলে না, কত বিরোধ! এই সকল বিরোধের সমীকরণ-মন্ত্র কোথায়? মহা-ইচ্ছা-যোগ-যুক্ত না হইলে, এই সংসারে, সর্ব্বপ্রকার বিরোধের সমীকরণ বা নিরসন সম্ভব নয়। ইচ্ছা-যোগই মহাযোগ—

সংসারের শ্রে[illegible]গ। মানব-খ্রীষ্ট যখন বলিতে [illegible] and my father are O[illegible]" অথবা মানব [illegible] তখন বলিতে [illegible] "[illegible], মুই নেই"—তখনই ইচ্ছা-যোগের রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে। অথবা মা[illegible] যখন বলিতে পারে, "যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি"—তখনই পাপ ইচ্ছা সংহত হইয়াছে এবং ইচ্ছাময়ের সুবিমল ধর্ম্ম-রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে।

এই পথে যাওয়ার মূল মন্ত্র কি,—"সংযম।" যেরূপেই হউক, আপন ইচ্ছাকে প্রবৃত্তির পথানুসারিণী না করিয়া, সংযমের পথে আনিতে হইবে। এই সংসারে, কে পিতা, কে মাতা, কে গুরু, কে নেতা, কে রাজা, কে সম্রাট? পিতা মাতা, গুরু নেতা, রাজা সম্রাট যখন মহা-ইচ্ছা-যোগ-সাগরে আপন প্রবৃত্তির স্বাতন্ত্র্য ডুবাইতে পারিয়াছেন, তখন পিতামাতা, গুরু বা নেতা, রাজা বা সম্রাটের ইচ্ছানুসারে চলিতে হইবে। যত দিন জড়ীয় শক্তিতে উঁহারা শক্তিমান, ততদিন বিরোধ বিসম্বাদ কিছুতেই তিরোহিত হইবে না। কিন্তু যখন উঁহারা ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় নিমগ্ন, তখন, উঁহাদের ইচ্ছার অনুসরণ করা, কিম্বা যোগ-পথে বিচরণ করা একই কথা। সর্ব্ব প্রযত্নে, অহং-জ্ঞান-নির্ব্বাপিত, স্বার্থত্যাগী পিতামাতা, নেতা বা রাজার অনুসরণ করাই ইচ্ছা-যোগ পথে বিচরণের উপায়। কিন্তু উঁহারা যখন রিপু ও স্বার্থের দাস, অহংজ্ঞানের চেলা, তখন তাঁহাদের হাত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিয়া, সংসার, দেশ বা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ আত্মার মূলে অবগাহন করিয়া, পরমাত্মা-রূপী ইচ্ছার অনুসরণ করিতে হইবে। ইহাতে যদি পরিবার বা সমাজ, দেশ বা রাজ্য যায়, তাহাতে ভয় পাইতে হইবে না। তখন বীরের ন্যায় সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, স্বরাজ্যের নিভৃতে অনুপ্রবেশ করিতে হইবে। তাহাই আসল যোগের কথা। এই সংসার-বিদ্যালয়ে, স্বতন্ত্রতার রাজ্যেই, সংযম বলে, আপন স্বেচ্ছাকে সংহত করিতে হইবে। যখন এই ব্রত পালনে সমর্থ হইবে, তখন পরিবার সুখের, সমাজ শান্তির, দেশ আরামের এবং রাজ্য মহা গৌরবের জিনিস। তদন্যথা, সব কেবল অশান্তিময়।

ইচ্ছা-যোগ সাধনের নামান্তর—প্রেম-সাধন। সেই মহেশ্বরের মহা ইচ্ছা, জড়ে, জীবে, উদ্ভিদে, কীটে, পতঙ্গে ও উদ্ভিদে সমভাবে কাজ করিতেছে, যখন হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখন কাহাকেও সাধনার বিরোধী মনে হইবে না। তখন যাহাকে দেখিবে, যাহাকে পাইবে, তাহাকেই সাধনার সহায় বলিয়া মনে হইবে। তাঁহাকে জলে স্থলে, জীবে জড়ে পূর্ণ ভাবে অবতীর্ণ দেখিয়া, সকলকেই তখন আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইবে। তখন পরিবার, সমাজ, দেশ, সাম্রাজ্য—একাত্মক, একধর্ম্মক। অথবা ও সকলের অন্য অর্থ—ইচ্ছা-মিলনের মহাযোগ। তখন মানুষ, আত্মা, পরিবার, সমাজ, দেশ ও রাজ্য মধ্যে বিশ্বরূপ দেখিয়া বিমোহিত এবং সকলকে আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ হয়। তাহারই অপর নাম জাতীয় একতা। বিশ্বরূপে জন সাধারণের দীক্ষা হইলে, জাতীয় একতা দেশে অবতীর্ণ হয়।

বলিতে চাহিতেছিলাম, এই ইচ্ছা-যোগ, বা প্রেমযোগ সাধন ভিন্ন জাতীয় একতা—পরিবার-বন্ধন, দেশ-বন্ধন, বা রাজ্য-বন্ধনের আর কি কোন অর্থ আছে? ইচ্ছাযোগ-সাধনই পরম সাধন;—সকল বন্ধনের মূল বন্ধন—ইচ্ছাযোগ বন্ধন। অথবা বিরোধী ইচ্ছার বিলোপ হইলেই, স্বপরিবার, স্বসমাজ, স্বদে

স্বসাম্রাজ্য—শান্তি এবং সুখের হয়। ঐকতানিক বাদ্যের ন্যায় সব সুর যখন মিলিয়া গিয়াছে, তখন একতন্ত্রী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে; তখন একজন এ পথে, আর একজন সে পথে যায় না। তখন এক ইঙ্গিতে সকলে চালিত হয়। জাপান-মিকাডো, জোয়ান-ফ্রান্স, ম্যাট্‌সিনি-ইটালী, প্রতাপ-মিবার, অর্জ্জুন-শ্রীকৃষ্ণ, লক্ষ্মণ-শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি মূর্ত্তির আর অন্য অর্থ নাই;—অর্থ—ইচ্ছাযোগ-সিদ্ধ প্রেমমূর্ত্তি। ইচ্ছা-যোগ-সাধন-বলে জগতের যে উপকার হইয়াছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষী।

আজকালকার ন্যায় ঘোর দুর্দ্দিনে, এই ইচ্ছাযোগ-সাধনে সকলে বদ্ধপরিকর হউন,—এদেশের বায়ু আবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইবে,—আবার জাতীয় একতা অবতরণ করিবে। বিশ্বরূপ ঘরে ঘরে প্রকটিত হউক—মহামায়ার মহা ইচ্ছার জয় হউক।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন

জন্ম—১৭ই ভাদ্র, ১২৫০ সাল, শকাব্দা ১৭৬৫, শুক্রবার, শুক্লপক্ষ, রাত্রি অনুমান ১২ ঘটিকা, খান্দারপাড় গ্রাম। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ।

মৃত্যু—২৯শে মাঘ, ১৩১৫ সাল, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণপক্ষ, ১১ই ফ্রেব্রুয়ারি, ১৯০৯ খ্রীঃ। রাত্রি আনুমানিক ১০ ঘটিকা।

যাঁহাদিগের অভ্যুত্থানে ধরা ধন্য হইয়াছে, দ্বারকানাথ তাঁহাদিগের অন্যতম। দ্বারকানাথ ফরিদপুরের গৌরব। তাঁহাকে পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছিলাম। হায়, দেখিতে না দেখিতে, ভাল করিয়া সম্ভোগ করিতে না করিতে, তিনি স্বর্গত হইলেন। দেশের ঘরে ঘরে আজ আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে।

দ্বারকানাথ সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে দেবদুর্ল্লভ চরিত্র-ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা আজীবন তাঁহাকে সর্ব্বপূজ্য করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও নিরহঙ্কার মূর্ত্তি, তাঁহার উদারতা ও মধুর বাণী সকলকে মোহিত করিত; যে তাঁহাকে দেখিত, সে-ই মনে করিত, দ্বারকানাথ মানব-দেবতা।

দ্বারকানাথ দরিদ্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া, স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতা-বলে, প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু এক দিনের জন্যও তিনি পূর্ব্ব কথা ভুলেন নাই ও বিলাসী হন নাই। এ সংসারে দেখিয়াছি, কত শত শত দরিদ্রের বন্ধু, ধনী হইয়া, শেষে আর দরিদ্র বন্ধুর সহিত সম্বন্ধ রাখেন না; কিন্তু দ্বারকানাথের চরিত্রে এ কলঙ্ক কখনও স্পর্শে নাই—তাঁহার সকল বন্ধুকেই তিনি আজীবন সমান ভাবে ভালবাসা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বজন-বাৎসল্য মহাত্মা বিদ্যাসাগরের যোগ্য। তাঁহার বন্ধুদিগের প্রতি তাঁহার সদয় ব্যবহার স্মরণ হইলে, মনে হয় যেন দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর বঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এরূপ চিত্র অহং-জ্ঞানসর্ব্বস্ব বঙ্গে বড় বিরল।

সে দিন মহামান্য শ্রীযুক্ত এস, পি সিংহের উদারতার কথা শুনিতেছিলাম। তিনি উচ্চপদ পাইয়া, যে সব বন্ধু প্রথমে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল, তাঁহাদিগকেই সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিয়াছিলেন। এই অসাধারণ গুণ দ্বারকানাথের জীবনের ভূষণ ছিল। যে সকল ব্যক্তি তাঁহাকে একদিনও ভালবাসিয়াছিল কিম্বা একদিনও সাহায্য করিয়াছিল, তিনি আজীবন তাঁহাদিগের মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। কৃতজ্ঞতায় দ্বারকানাথ অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর।

পরের উপকার করা তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। তিনি কত দরিদ্র রোগীকে কপর্দ্দক না লইয়াও চিকিৎসা করিয়াছেন এবং কত দরিদ্রকে প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। তিনি বলিতেন,—"চিকিৎসা করা আমার কাজ, অর্থ গ্রহণ আমার কাজ নয়, যে যাহা পারে, দিবে; না পারে, না দিবে।" আরো বলিতেন,—"জানিবেন, কেহ কাহারও নিকট ঋণী থাকে না, যে উপকার পায়, এক দিন সে প্রত্যুপকার করিবেই করিবে।" এই দুই মন্ত্র তিনি চিরদিন জীবনে সাধন করিয়া গিয়াছেন। দ্বারকানাথ আজীবন দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন।

দ্বারকানাথ অদ্বিতীয় পণ্ডিত-কবিরাজ

ছিলেন কিন্তু সে জন্য তাঁহার আদর ছিল [illegible] প্রতিভাশালী ব্যক্তি [illegible] তাঁহার সম্মান [illegible]—তাঁহার দেব- [illegible] প্রতিম ব্যক্তি [illegible] ধর্ম্মসাধন বলে মানব দেবত্বে [illegible] সেই নৈষ্ঠিক ধর্ম্ম-সাধন-বলে [illegible] অনিন্দিত পূতাংশ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন; কেহ কখনও তাঁহার ইন্দ্রিয়-স্খলন বা চিত্তবিচ্যুতির পরিচয় পায় নাই। তদীয় চরিত্র-মাধুর্য্যে সর্দা বিরাজিত থাকিত—বিনয়, সহৃদয়তা, ভক্তি, প্রেম, পুণ্য। তিনি অসাধারণ ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন, এই ধর্ম্মবলেই তিনি অন্তশ্চক্ষুর দৃষ্টিবলে রোগ নির্ণয়ে সমর্থ হইতেন; যাহাকে যে ঔষধ দিতেন, তাহাতেই তাহার রোগ আরোগ্য হইত। তিনি যে রোগীর ভার সানন্দে গ্রহণ করিতেন, নিশ্চয় সে আরোগ্য হইত। এরূপ কত ঘটনা জানি। সন্দিগ্ধ ভাবে, টাকার খাতিরে, প্রায়ই রোগী গ্রহণ করিতেন না; যদি কখনও করিতেন, হয়ত তাহার ফল ভাল হইত না। অনেক সময় অনেক রোগীর ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতেন, "কিছু হইবে না, অযথা অর্থব্যয় করাইতে পারি না।" পূতচরিত্রের বলেই তিনি অসাধারণ চিকিৎসক হইয়াছিলেন। কখনও সংবাদপত্রে একটী বিজ্ঞাপন দেন নাই—তবুও তাঁহাকে না জানে, বঙ্গে এমন লোক নাই। শুধু বঙ্গ কেন, ভারতের এমন স্থান নাই, যে স্থান হইতে তাঁহার নিকট শিক্ষার্থ শিষ্য না আসিত। তাঁহার বাড়ী আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যেন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। আমাদের মনে হয়, তাঁহার সমান চিকিৎসক কলিকাতাতে আর অভ্যুদিত হয় নাই। এই ক্ষমতায় ৺ গঙ্গাধর এবং গঙ্গাপ্রসাদ প্রভৃতি মহাজনদিগকে তিনি অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি চিরকাল "স্বদেশী" থাকিলেও, গবর্ণমেণ্ট, তাঁহাকে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, চিকিৎসকগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম, মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি তাহাতেও "স্বদেশীত্ব" এক দিনের জন্যও পরিত্যাগ করেন নাই। যোগ্য ব্যক্তিতে উপাধি দান এই বঙ্গের প্রথম ঘটনা।

কত সময়ে তিনি কত অমূল্য কথা বলিতেন, এখন নিভৃতে বসিয়া ভাবিতেছি, সে সকলই তদীয় দেবদুর্ল্লভ চরিত্রের যোগ্য। বাহুল্য ভয়ে সে সকল লিখিতে বিরত রহিলাম। কিন্তু এ কথা না লিখিলে প্রত্যবায় আছে যে, আমরা তাঁহার চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া মহেশ্বরের চরিত্রের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। তিনি এই বঙ্গে প্রকট দেবমূর্ত্তি ছিলেন। আজ তাঁহার অভাবে আমাদের হৃদয়শূন্য, ফরিদপুর অন্ধকারাচ্ছন্ন, কলিকাতা শোকাচ্ছন্ন। তাঁহার তুলনা কেবল তিনিই ছিলেন। তাঁহার পূত দেহ-চরিত্র তাঁহার বংশে সংক্রামিত হউক, বিধাতার নিকট কেবল ইহাই প্রার্থনা।

তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত এখানে তুলিয়া দিলাম। "তাঁহার বংশ পূর্ব্ববঙ্গীয় বৈদ্য-সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীন, শক্তিগোত্রীয় হিঙ্গুসেন বংশীয়। কবিরাজ মহাশয়েরা বংশানুক্রমে শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ। এই পরিবারে মহামহোপাধ্যায় অভিরাম কবীন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজা সীতারাম রায়ের সভার প্রধান পণ্ডিত ও রাজবৈদ্য ছিলেন। সীতারাম তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অদ্ভুত চিকিৎসা-নৈপুণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি ভূষিত করেন। অভিরামের পুত্র দুর্গাদাস শিরোমণি পিতার সুযোগ্য পুত্র ও শাস্ত্রচর্চ্চায় বিশেষ কৃতী ছিলেন। এই পরিবারে বংশানুক্রমে যে টোল প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাতে বাঙ্গালাদেশের অনেক শ্রেষ্ঠ কবিরাজ শিক্ষা লাভ করেন। 'রসেন্দ্র সার-সংগ্রহ' নামক বিখ্যাত সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থপ্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ গোপাল কর, দ্বারকানাথের বৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রথিতনামা শঙ্কর কবিরাজের ছাত্র ছিলেন। কুমারটুলীর সুবিখ্যাত গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজের পিতা স্বনামধন্য নীলাম্বর কবিরাজ দ্বারকানাথের পিতামহ রামসুন্দর কবিরাজের নিকট শিক্ষালাভ করেন।

দ্বারকানাথ বাল্যকালে বিক্রমপুরের সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কার অধ্যয়ন করেন। অনন্তর মুর্শিদাবাদে, ভারতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত গঙ্গাধর কবিরাজের টোলে ন্যায় দর্শন, স্মৃতি, উপনিষৎ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী হন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও এইখানে অধীত হয়।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ শুভক্ষণে কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার চিকিৎসার সুযশ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তিনি জীবনে কখনও কোনও বিজ্ঞাপন দ্বারা আত্মপ্রচার করেন নাই. কিন্তু ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে তাঁহার নাম প্রচারিত ছিল। সর্ব্ব সাধারণে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসা-নৈপুণ্যের এতদূর পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, অনেক রোগী তাঁহার দর্শনলাভ মাত্রেই যেন রোগমুক্ত হইলেন, এরূপ মনে করিতেন। এই অসাধারণ গুণবলে তিনি ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হন।

ভারতবর্ষের নানা স্থানের রাজন্যবর্গ তাঁহাকে, পারিবারিক চিকিৎসার জন্য সসম্মানে আহ্বান করিতেন। এই সকল রাজন্যদিগের মধ্যে মিবারের মহারাণা বাহাদুর একতম। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তথাকার যুবরাজ বাহাদুরের বিশেষ অসুস্থতার জন্য, মহারাণা বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের নিকট ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিরাজকে যুবরাজের চিকিৎসার জন্য পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া লিখেন। সরকার বাহাদুর দ্বারকানাথকেই মনোনীত করিয়া মিবারের রাজধানী উদয়পুরে পাঠাইয়াছিলেন।

দ্বারকানাথের অসামান্য চিকিৎসা-খ্যাতিবলে আকৃষ্ট হইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ সমূহ হইতে বহু ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। পাঞ্জাবী, রাজপুত, মারাঠী, মান্দ্রাজী, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালা, ভারতবর্ষে শিক্ষিত এমন হিন্দুজাতি নাই, যাহারা দ্বারকানাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নাই। ভারতবর্ষের বহু স্থানে—বম্বে, মাদ্রাজ, লাহোর, দিল্লী, মুলতান, জয়পুর, রত্নগিরি, হয়দরাবাদ প্রভৃতি কেন্দ্রে ও বঙ্গের প্রায় সকল স্থানেই তাঁহার ছাত্রগণ আজও চিকিৎসা করিতেছেন। গত চৌত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার নিকট আনুমানিক পাঁচ হাজার ছাত্র আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছেন। ছাত্রদিগকে তিনি পুত্রের ন্যায় লালন পালন টীকা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কালের কুটীল গতিবশতঃ তাহা আর শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

দ্বারকানাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সর্ব্বরোগপ্রশমনী চিকিৎসা-ক্ষমতা দর্শনে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই মহামহোপাধ্যায় উপাধি-ভূষিত করেন। তাঁহার পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে আর কেহ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই উপাধি পান নাই।

দ্বারকানাথের মন অশেষ অসাধারণ গুণে পূর্ণ ছিল। তিনি বহু লোকের আশ্রয়-স্বরূপ ছিলেন, যে কোন দরিদ্র অনাথ তাঁহার নিকট আসিত, সে নিরাশ্রয় হইত না। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দান গ্রহীতা ভিন্ন অন্য কেহ জানিত না। দেবতা ও ব্রাহ্মণে তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল; যথার্থ পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ যে কেহ তাঁহার নিকট আসিতেন, তিনি তাঁহাকেই কিছু না কিছু বিদায় দিতেন। কেহ কখনও তাঁহার নিকট প্রত্যাখ্যাত হন নাই। যথার্থ পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগের নিকট, দরিদ্র অনাথ আতুরব্যক্তিদিগের নিকট ও স্বজাতির নিকট তিনি কখনও দর্শনী গ্রহণ করিতেন না। তিনি জীবনে কখনও বিলাসিতার ধার ধারেন নাই। তিনি অতি অমায়িক ও মিষ্টভাষী ছিলেন; সকলের সহিতই হাস্য কৌতুকে আলাপ করিতেন। বিষয় সম্পত্তি রক্ষণে ও মোকর্দ্দমা মামলা পরিচালনে তাঁহার অসামান্য শক্তি ছিল। হাইকোর্টের জটিল মোকর্দ্দমাতেও অনেক সময় উকীল ও ব্যারিষ্টার প্রভৃতি না রাখিয়া স্বয়ংই আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি উৎকৃষ্ট কবি, বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিক ছিলেন; স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তাঁহার স্মরণশক্তি অসাধারণ ছিল; যে রোগীকে একবার চিকিৎসা করিয়াছেন, বিশ বৎসর পরে দেখিলেও তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন। উপনিষদ্ প্রভৃতি তিনি স্বয়ং হাতে লিখিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। একই সময়ে তিনি রোগীর নাড়ী দেখিতেন, কাহারও ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন, কাহাকেও বা উপদেশ দিতেন। পরোপকার তাঁহার

জীবনের সর্ব্ব [illegible] ব্রত ছিল।

স্বদেশের রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনায় দ্বারকানাথ বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসভায় (কংগ্রেসের কলিকাতাস্থ প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই) তিনি সভ্য অথবা অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যরূপে উপস্থিত থাকিতেন। স্বদেশীগ্রহণ ও বিদেশীবর্জ্জনে তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ছিল।

প্রায় আট মাস পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথের একটু [illegible] জ্বর ও [illegible] অসুখ হয়। তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] রোগে পরিণত হয়। গত ভাদ্র মাসে [illegible] কাশীধামে যাইয়া কতকটা সুস্থ হইয়াছিলেন। গত ১৬ই মাঘ কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তাহার পর হইতে রোগ ভয়ানক বাড়িয়া যায়। এই রোগেই গত ২৯শে মাঘ বৃহস্পতিবার রাত্রি দশটার সময়ে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।"

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩৫। সিদ্ধিতত্ত্ব বা কর্ম্মপথ—শ্রীকুমুদিনী কান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত; ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲। পরিপাটী বাঁধাই; ছাপা মন্দ নয়। গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য মহৎ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা গ্রন্থকারের সকল মত অনুমোদন করিতে পারি না। আলোচ্য বিষয়ের অবান্তরিক জটিল কোন কোন প্রশ্ন লইয়া গ্রন্থকার নানা স্থানে বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন; ইচ্ছা করিলেই বোধ হয় সেগুলি অপ্রকাশিত রাখিতে পারিতেন। তবু, পুস্তক খানি বেশ সুখপাঠ্য এবং রচনার পারিপাট্যে উন্নত। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

৩৬। শ্রীরামকৃষ্ণ নামামৃত।—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত; মূল্য।০ আনা। ভূমিকায় প্রকাশ যে পুস্তকখানির উপসত্ত্ব কর্ম্মবীর স্বামী বিবেকানন্দের নামে বেলুড় মঠে যে মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে, তদুদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে। সাধু উদ্দেশ্য। সঙ্গীতগুলি ভক্ত প্রাণের পবিত্র স্বাভাবিক হৃদয়-উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ।

৩৭। মারবার-প্রস্থন।—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বি-এ, এল-এম-এস্ প্রণীত। সুহৃদ্ প্রেসে মুদ্রিত; মূল্য ১৲ টাকা। গোস্বামী মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিত নহেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি নানা বিষয়ের রচনায় দক্ষতা প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার লিখিত এই পুস্তকখানি আমরা আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। এই খানি ধর্ম্মমূলক ঐতিহাসিক নাটক। সরল ভাবে আধ্যাত্মিক জগতের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল গ্রন্থের সর্ব্বত্রই প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে গ্রন্থকারের হৃদয়ের সরল বিশ্বাস ও ভক্তির প্রভূত নিদর্শন পাওয়া যায়। নাটক হিসাবে গ্রন্থখানির সফলতা না হইয়া থাকিলেও, অত্যুচ্চ ভাব, মার্জ্জিত রুচি, সমুন্নত সন্দর্ভে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ; পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

৩৮। দাম্পত্য চিত্র।—শ্রীক্ষিতিনাথ দাস প্রণীত; মূল্য পাঁচ সিকা। আবরণ চাকচিক্যময়। চাকচিক্যে বালক ভিন্ন কে ভুলে? এই গ্রন্থখানির [illegible] কবি এক স্থানে লিখিতেছেন,—"চিত্র অঙ্কনে সমর্থ হইয়াছি কিনা, সে কথা জানিবার জন্য আমার ব্যাকুলতা নাই।" অতএব, সমর্থ হইয়াছেন কিনা, তাহাও প্রকাশ করিবার ভার হইতে সমালোচক নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন। সত্যের খাতিরে বলিতে বাধ্য যে 'কবির' যদি রুচিমার্জ্জিত হইত, তবে তিনি সাহিত্যের যথার্থ সেবা করিতে পারিতেন। রুচি অতি কদর্য্য।

৩৯। বৌ-কথা-কও।—শ্রীক্ষিতিনাথ প্রণীত; মূল্য।৶১০ আনা। দাম্পত্য চিত্রের কবির 'মন এখন কল্পনা জগতে উধাও ছুটিয়াছে; ফিরাইবার উপায় নাই।' আমাদের সবিনয় নিবেদন, তাঁহার ক্ষমতাকে তিনি বিশেষ কৃপণতার সহিত ব্যয় করুন অথবা যদি সম্ভব হয়, তাঁহার অভিরুচিকে অপর কোন উচ্চতর প্রসঙ্গের [illegible] করিতে পারিলে বঙ্গসাহিত্য [illegible] পাশে আবদ্ধ হইবে।